সংশোধিত ও বর্দ্ধিত কলেবরে ৪র্থ সংস্করন

অলি আহাদ

জাতীয় রাজনীতি

১৯৪৫ থেকে ৭৫

জাতীয় রাজনীতি
১৯৪৫ থেকে '৭৫

[সংশোধিত ও বর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ ২০০৪]

অলি আহাদ

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা, চট্টগ্রাম

জাতীয় রাজনীতি

১৯৪৫ থেকে '৭৫

প্রকাশক
এস. এম. রইসউদ্দিন
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

মতিঝিল কার্যালয়
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল
প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৮২
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৮৯
তৃতীয় সংস্করণ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৭
চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ২০০৪
পঞ্চম সংস্করণ ঃ অক্টোবর ২০১২

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
পিএবিএক্সঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ অলংকরণ
আরিফুর রহমান

মূল্য ঃ ৫০০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫২ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

JATIO RAJNITI 1945 THAKA'75 (NATIONAL POLITICS: 1945 TO '75) By: Oli Ahad, Published by: S. M. Raisuddin Director (Publication), **Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. E-mail< booksocietyltd@yahoo.com**
Price : Tk. 500.00, US$ 10.00 ISBN. 984-493-086-3

উৎসর্গ

সারা বিশ্বের অন্যতম ক্ষণজন্মা পুরুষ কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ও সূচনা হতে ভারতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেল, হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী, সাম্প্রদায়িক কমরেড জ্যোতি বসু এবং তাদেরই অনুসারী পাঠান কোটের মওলানা মওদুদী, দেওবন্দের মওলানা হোসেন আহমদ মাদানী, কংগ্রেস শো-বয় মওলানা আবুল কালাম আজাদ, খাকছার নেতা আল্লামা মাশরেকি প্রমুখদের তদানিন্তন বঙ্গদেশে ২৮টি জেলার মধ্যে ১৬টি মুসলিম প্রধান জেলাকে বাদ দিয়ে বাকি ১২টি হিন্দু জনসংখ্যা প্রধান জেলাকে আলাদা করে হিন্দুবঙ্গ প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে স্বাধীন সার্বভৌম বঙ্গদেশ প্রতিষ্ঠায় কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্'র সমর্থনে বঙ্গীয় গভর্ণর ফ্রেডারিক বারুজ (Frederick Burrows) এর সক্রিয় সহযোগিতায় আজাদ হিন্দ নেতা সুভাষ চন্দ্র বোস-এর অগ্রজ শরৎ চন্দ্র বোস, বঙ্গীয় প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, বঙ্গীয় লেজিস লেটিভ এসেমব্লীতে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা বাবু কিরণ শংকর রায়, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী দার্শনিক আবুল হাসেম, বঙ্গীয় সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট পাকিস্তান গণ পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনের সভাপতি বাবু যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিরা Free State of Bengale অর্থাৎ অখন্ড সার্বভৌম বঙ্গদেশ প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং বঙ্গীয় গভর্ণর এর কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স-এর কয়েক বারের মন্ত্রী, ইন্ডিয়ান কাউন্সিলে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করেছিলেন সেই নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী যিনি স্বীয় জমিদারী বন্ধক রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সিংহ ভাগ অর্থ যোগান। আমার বইয়ের এই "চতুর্থ সংস্করণ" তাদের নামে উৎসর্গ করলাম।

মুজিবনগরে গঠিত প্রথম বাংলাদেশ সরকার। বা দিক থেকে-ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ, অর্থ ও বাণিজ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এএইচ এম কামরুজ্জামান এবং পিছনে প্রধান সেনাপতি জে. ওসমানী (১৯৭১)।

ডাকসু ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের চার নেতা বা থেকে আবদুল কদ্দুস মাখন, আ.স.ম. আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, নূরে আলম সিদ্দিকী স্বাধীন বাংলার অঙ্গীরনামা অনুযায়ী শপথগ্রহণ করছেন। (১৯৭১)।

"জাতীয় রাজনীতি
১৯৪৫ থেকে '৭৫"

প্রকাশকের কথা

জনাব অলি আহাদ প্রণীত "জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫" কোন ইতিহাস গ্রন্থ বা ঐতিহাসিক দলিল নয়। লেখক নিজেও তা দাবী করেননি। তবুও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে সমকালীন রাজনৈতিক গ্রন্থাবলীর ক্ষেত্রে এটাই বোধ হয় সবচেয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্য নির্ভর প্রয়াস।

নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শ ও বিশ্বাস কল্পনার মাধুরী মিশিয়ে সমকালীন ইতিহাস রচনার প্রবণতা সাম্প্রতিককালে অনেকের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। বিকৃতির সীমাহীন প্রতিযোগিতায় সত্য হারিয়ে যাচ্ছে। এখন সত্য এবং মিথ্যার পার্থক্য নিরূপন করা খুবই কষ্টকর। এমনি একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে দু'টি বিপরীতধর্মী তথ্যের মোকাবেলায় যারা অন্ততঃ অলি আহাদ সাহেবকে ব্যক্তিগতভাবে জানেন, তারা তাঁর পরিবেশিত তথ্যটি বিশ্বাস করবেন বলেই আমাদের ধারনা।

জনাব অলি আহাদ প্রণীত "জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫" সমকালীন ঘটনার উপর রচিত একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ ।

আমরা জানি জনাব অলি আহাদের স্মৃতিতে বিগত ৪০ বছরের (১৯৭৫) রাজনৈতিক ঘটনার বহু তথ্য সঞ্চিত আছে। বয়সের ভারে নুব্জ স্মৃতি বিভ্রাট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তবুও জনাব অলি আহাদের ন্যায় সত্যনিষ্ঠদের কলম একটু সচল হলে আজ যারা বড় গলায় তথ্য বিকৃতির অসৎ পেশায় সোচ্চার তারা নির্বাক না হলেও তাদের নিঃশঙ্কচিত্তে মিথ্যা রচনার গতিধারা কিছুটা স্তিমিত হবে। আমাদের ইতিহাস বিকৃতির অভিশাপ হতে কিছুটা নিষ্কৃতি পাবে। বিশেষ করে একজন প্রবীন রাজনীতিবিদদের অভিজ্ঞতার আলোকে লেখা পুস্তকটি সাধারণ পাঠক সমাজের নিকটও বিশেষভাবে সমাদৃত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

রাজনৈতিক অঙ্গনের মহীরুহ, ভাষা আন্দোলনের সিপাহসালার জনাব অলি আহাদ দেশ ও জাতির জন্য নিজকে উৎসর্গ করেছেন। এই নির্মোহ ও নির্লোভ রাজনীতিবিদ পদ পদবী ও বৈষয়িক প্রাপ্তির জন্য কখনো কক্ষ্য ও লক্ষ্যচ্যুত হয়ে নিজ আদর্শ, বিশ্বাস এবং নীতি বিসর্জন দেননি। শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তাঁর নীতি, আদর্শ ও বিশ্বাসে রয়েছেন অটল। অন্য রাজনৈতিক নেতাদের মতো যখন যেমন তখন তেমন হতে পারেননি বলেই তাঁর ভাগ্যে কিছুই জোটেনি। এমনকি তাঁর রাজনৈতিক সততার খেসারত নিজ আত্মীয়-পরিজনদেরকেও দিতে হয়েছে।

আমাদের দেশে একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ রয়েছে, "ঝড়-বানে বৃষ্টি, দোষে গুণে সৃষ্টি।"

এই প্রবাদটির নির্গলিতার্থ হলোঃ কেউই দোষ-ক্রটির উর্ধ্বে নয়। মানুষ মাত্রেরই ভুল-ক্রটি থাকা স্বাভাবিক। আমাদের বর্তমান ও অতীতের অনেক স্বনামধন্য জাতীয় নেতাদেরও ভুল-ক্রটি ছিলো। আমাদের জাতীয় জীবনে এই ভুল ক্রটি সংশোধনের প্রয়াসে আগামী দিনে পথ চলার সুগম করতে তিনি বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতি এবং গ্রন্থে যেমন নেতাদের ভুলক্রটি তুলে, ধরেছেন, ঠিক তেমনি তাঁদের প্রশংসনীয় কাজকেও সমান গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন।

ইতিহাসে যাঁর যা পাওনা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সততা ও সাহসের সাথে দিতে তিনি কোন কার্পন্য করেননি বা হীনমন্যতায় ভোগেননি। এঁদের মধ্যে কায়েদ-ই-আযম থেকে শুরু করে বঙ্গবন্ধুসহ অনেক নেতাই রয়েছেন। কায়েদ-ই-আযমের সমালোচনা যেমন করেছেন, ঠিক তেমনি তাঁর যথার্থ অবদানকে কৃতজ্ঞচিত্তে সম্মান জানিয়েছেন। ঠিক তেমনি বঙ্গবন্ধু'র যেমন তীব্র সমালোচনা করেছেন, ঠিক তেমনি 'মুজিব ভাই' বলে সম্বোধন করে তাঁর গুণকীর্তন ও প্রশংসীয় অবদানকে যথার্থ ভাবে জাতির কাছে তুলে ধরতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। এ জন্যে অনেকের কাছেই তিনি বিরাগভাজন, অপ্রিয়।

সঠিক ইতিহাস জাতির সামনে নেই। ইতিহাস হলো একটি জাতির দর্পন। ইতিহাস অসচেতন জাতি কোন দিন প্রকৃত দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত হতে পারে না। আজকের বর্তমান দুর্বিষহ বিষাক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ হলো ইতিহাস বিকৃতির নির্যাস।

রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক এবং লেখকদের পড়ার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু বর্তমানে তাঁদের মধ্যে অনেকের মাঝেই এই সংস্কৃতি বিতাড়িত। এছাড়া অধিকাংশ রাজনীতিবিদ -এর লেখালেখির অভ্যেস নেই। ফলে রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের প্রকৃত পশ্চাদপট এবং তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ পাওয়া যায় না। খবরের কাগজে প্রচার মাধ্যমে যেটুকু পাওয়া যায় তাও মূল ঘটনার পার্শ্বচিত্র মাত্র। এর অন্তরালে চাপা পড়ে থাকে বিচিত্র তাৎপর্যপূর্ণ অনেক প্রেক্ষাপট।

এই প্রেক্ষাপট বা অব্যক্ত কথাগুলো বাদ দিয়ে কোন ঘটনারই অর্থপূর্ণ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। অথচ ইতিহাসবেত্তাগণকে এ কাজটি করতে হচ্ছে। এসব ইতিহাসবেত্তাগণ নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতিহাস রচনার কারণে আমাদের জাতীয় তথা রাজনৈতিক ইতিহাস অসম্পূর্ণ অথবা বিকৃত হয়ে আছে।

অধিকাংশ জাতীয় ঘটনার প্রকৃত তথ্য থেকে জাতি অজ্ঞাত। এর ফলে যে যার মতো করে ঘটনা সাজিয়ে জাতিকে করে বিভ্রান্ত। সৃষ্টি হয় একে অপরের প্রতি সন্দেহ-অবিশ্বাস। এই সন্দেহ-অবিশ্বাস থেকে সৃষ্টি হয় মতানৈক্য, সংঘাত-সংঘর্ষ এবং অশান্তি। যা আমরা সমকালীন রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ করছি।

আনন্দের কথা এই যে, যে কয়জন রাজনীতিবিদ ব্যতিক্রমধর্মী ভূমিকা নিয়ে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ রচনায় হাত দিয়েছেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ জনাব অলি আহাদ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সুক্ষ্মদৃষ্টি এবং বিশ্লেষণধর্মী উদার মন নিয়ে তিনি বিভিন্ন ঘটনাবলী তথ্য ও তত্ত্বের সমাহার ও দূর্লভ ছবি সংযোজনের মাধ্যমে চিত্রিত বা গ্রথিত করেছেন তাঁর লেখনীতে।

"জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫" এই গ্রন্থে ত্রিশ বছরের ঘটনাপঞ্জী স্থান পেয়েছে। বস্তুতঃপক্ষে এই সময়টুকু আমাদের জাতীয় জীবনের অনেক উত্থান-পতন, সংগ্রাম-আন্দোলন, বিপর্যয়-উত্তরণের ইতিহাস।

জনাব অলি আহাদ অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিতি থাকলেও ১৯৪৫ সালে সমগ্র

দেশব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ এবং ১৯৪৮ সালে প্রথম কারাবরণ করেন। ১৯৫০ সালে বি. কম. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেও আর এগুতে পারেন নি। রাজনৈতিক কারণে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত হন।

এরপর থেকে গোটা জীবনটাই কেটে গেছে সক্রিয় রাজনৈতিক তৎপরতার মধ্য দিয়ে। বিস্ময়কর হলেও একথা সত্য যে, দীর্ঘ ৫৯ বছরের রাজনৈতিক জীবনে কোনদিন ক্ষমতা বা ক্ষমতার মোহ তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। এ কারণেই তিনি রাজনৈতিক অঙ্গনে একজন অনন্য সৎ ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া যদি রাজনৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য বা সাফল্যের মাপ কাঠি হয়, তাহলে জনাব অলি আহাদ বাংলাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে একটি ব্যর্থ চরিত্র।

দীর্ঘ পাঁচ দশকের কর্ম-চাঞ্চল্য পরিপূর্ণ বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্রপূর্ণ তাঁর রাজনৈতিক জীবন। অত্যন্ত সমৃদ্ধ তার অভিজ্ঞতা। রাজনৈতিক অঙ্গনের হাজারো ঘটনা ঘটে গেছে তাঁর চোখের সামনে দিয়ে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন এসব কর্মকান্ডের সঙ্গে।

গ্রন্থকার নিজের রাজনৈতিক জীবনের পরিপক্ক অভিজ্ঞতার আলোকে অতীত ও বর্তমান কালের রাজনৈতিক জীবনধারা, ঘটনাবলী স্পষ্ট ও পুষ্টভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন "জাতীয় রাজনীতি" পুস্তকে।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ এর বহু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আর্থিক অসচ্ছলতা তো আছেই। তবুও জাতীয় প্রয়োজনে কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি এ ধরনের একটি পুস্তক প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। এই মূল্যবান বইটি প্রথম প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে ১৯৮২ সালে। এরপর পাঠকদের বিপুল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৯ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে। পাঠকদের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হওয়া সত্ত্বেও অনিবার্য কারণবশতঃ তৃতীয় সংস্করণ আমরা প্রকাশ করতে পারিনি। তা প্রকাশ করে খোশরোজ কিতাব মহল লিমিটেড।

সম্প্রতি দুর্ঘটনা জনিত কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে জনাব অলি আহাদ বিগত ২৩ সেপ্টেম্বর হতে ধানমন্ডি সেন্ট্রাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। আজীবন আপোষহীন সংগ্রামী এই বর্ষীয়ান জননেতার স্বাস্থ্যের অবনতিতে দেশবাসীর সাথে আমরাও উদ্বিগ্ন ছিলাম।

জননেতা অলি আহাদ শুধু রাজনীতিবিদই নন, বেগম জিয়ার ভাষায় তিনি দেশ ও জাতির বিবেক, অভিভাবক। তাঁর উন্নত চিকিৎসার জন্য অনেকেই পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে সরকারকে সরাসরি তত্ত্বাবধানে বিদেশে পাঠানোর দাবী জানিয়েছেন বিশেষ করে প্রবীন রাজনীতিবিদ, ভাষা সৈনিক অবদুল মতিন, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি বদরুদ্দীন উমর, ভাষা সৈনিক এডভোকেট গাজীউল হক, এম, আর, আখতার মুকুল, সাবেক সচিব, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবি বাহাউদ্দিন চৌধুরী নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেন।

"আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, মহান ভাষা আন্দোলনের সিপাহশালার, স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, ৭ দলের প্রধান, আপোষহীন প্রবীন সক্রিয় রাজনীতিবিদ জননেতা অলি আহাদ দুর্ঘটনা জনিত কারণে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে বিগত ২৩শে সেপ্টেম্বর '০৩ হতে ধানমন্ডি সেন্ট্রাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। গত ২৮শে সেপ্টেম্বর'০৩ তাঁহার দেহে অস্ত্রোপাচার করা সত্ত্বেও তার স্বাস্থ্যের তেমন উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। আজীবন সংগ্রামী জাতির বিবেক, নির্লোভ এই বর্ষীয়ান জননেতার

স্বাস্থ্যের অপরিবর্তীতে আমরা গভীর ভাবে উৎকণ্ঠিত।

জননেতা অলি আহাদ শুধু রাজনীতিবিদ নন, তিনি দেশ ও জাতির সম্পদ। তাঁহার সুচিকিৎসার জন্য সরকারী উদ্যোগে তড়িৎ মেডিকেল বোর্ড গঠন করে সরকারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বিদেশে পাঠানোর জন্য আমরা জোর দাবী জানাচ্ছি।

আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে, প্রবীন জননেতা অলি আহাদের দেহে অস্ত্রোপাচার হওয়া সত্ত্বেও মানবিক দৃষ্টিকোন থেকেও এখনো পর্যন্ত দেশের বড় রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ তাঁকে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। এহেন মন-মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী রাজনৈতিক পরিবেশ বিকাশের পরিপন্থী।"

ভাষা আন্দোলনের সিপাহসালার এবং প্রবীন রাজনীতিবিদ নিজকে নিঃস্ব করে দেশ ও জাতির খেদমত করেছেন। জাতির রাজনৈতিক সংকটময় মূহূর্তে সঠিক দিক নির্দেশনা এবং সংকট উত্তরনের জন্য প্রয়াস চালিয়েছেন। জাতি তাঁর কাছে ঋণী। কিন্তু সেই ঋণ পরিশোধে আমরা কিছুই করতে পারিনি। এমনকি তাঁর এই জীবন সায়াহ্নে নূন্যতম চিকিৎসার সুযোগটিও আমরা তাঁকে দিতে পারিনি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। যা হোক আল্লাহপাক তাঁকে সুস্থ শরীরে আমাদের কাছে ফিরিয়ে এনেছেন এ জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে জানাই হাজারো শোকরিয়া।

বিলম্বে হলেও বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ সময়ের দাবী মেটাতে এবং এই সময়ের জনগণের কাছে যথেষ্ট উপযোগী হবে মনে করে উক্ত গ্রন্থটির ৫ম সংস্করণের আঞ্জাম দিয়ে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করছে। সঠিক ইতিহাস রচনা এবং শ্রদ্ধেয় পাঠক মহলকে আমাদের জাতীয় ইতিহাস সম্পর্কে আংশিকভাবে সচেতন করে তুলতে পারলেও আমাদের শ্রম ও আয়োজন সফল বলে মন করবো।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

আমি রাজনীতিবিদ। ব্যস্ত মানুষ। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বইটিকে পূর্ণাঙ্গ করার অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছি। সেই লক্ষ্যে আমার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বর্তমান সংস্করণেও বেশ কিছু তথ্য সংযোজন করেছি। একবারে সম্ভব নয় বিধায় ধাপে ধাপে সংযোজনের মধ্য দিয়েই বইটির পুর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার প্রচেষ্টা আমার অব্যাহত থাকবে। একথা আজ সর্বজন স্বীকৃত যে, আমাদের জাতীয় জীবনে ইতিহাস বিকৃতির ডামাডোলে সত্য আজ বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছে। মিথ্যা আর বিকৃত ইতিহাসই আজ জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। খলনায়ক নায়কে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে ইতিহাস একটি রূঢ় বাস্তবতা। তাকে সাময়িকভাবে হয়তো বা এদিক সেদিক করা যায়। কিন্তু কালের পরিক্রমায় ইতিহাস তার স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হবেই। এর ব্যাতিক্রম হয় না। যুগে যুগে তাই হয়ে আসছে। আর তাই অসত্যের ডামাডোলে যতই ধামা চাপা দেয়া হোক না কেন সত্য তার স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করবেই। ইতিহাস তাই বলে। বইটির তৃতীয় সংস্করণের মতো বর্তমান সংস্করণেও আরো কিছু তথ্য ও ঘটনা সংযোজন করেছি। তৎমধ্যে বাংলাকে স্বাধীন ও অখন্ড রাখতে তৎকালীন বাংলার গভর্ণর স্যার ফেডারিক বরোজের প্রচেষ্টা, মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ভারত সরকারের সাথে স্বাক্ষরিত ৭ দফা গোপন সমঝোতা চুক্তি এবং এ প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে দিল্লীতে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালনকারী পরবর্তীতে পররাষ্ট্র মন্ত্রী, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি ও জাতীয় সংসদের স্পীকার মরহুম জনাব হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর একটি সাক্ষাৎকার, শেখ মুজিব, বেগম মুজিব ও মেজর জিয়া প্রসঙ্গ সংযোজন করেছি। বিশেষ করে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে জাতীয় স্বার্থে শেখ মুজিব কর্তৃক গৃহীত কতিপয় ঐতিহাসিক কার্য্যক্রম, বেগম মুজিবের ত্যাগ-তিতিক্ষার কিছু বিবরণ এবং তৎকালীন মেজর জিয়া কর্তৃক ২৭ শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতারের কালুরঘাট ট্রান্সমিশন কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের প্রেক্ষিত সম্পর্কে কিছু তথ্যের উল্লেখ করেছি। বইটির তৃতীয় সংস্করণে মুদ্রণ প্রমাদজনিত এবং তথ্যগত কিছু ক্রটি ছিল-এ সংস্করণে তা সংশোধন করা হয়েছে এবং স্থানে স্থানে প্রয়োজনে সংযোজন করা হয়েছে। এটা সর্বজন বিদিত যে, শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আমার রাজনৈতিক আদর্শগত বিরোধ চরমে পৌছার কারণেই আমাকে আওয়ামী লীগ হতে বহিস্কৃত হতে হয় অথবা অন্য ভাবে বললে বলা যায় দু'জনের মত এবং পথের চরম ভিন্নতার কারণেই এক সাথে রাজনীতি করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭১ এর ২৫শে মার্চ পাক বাহিনীর নিকট তাঁর 'আত্মসমর্পন' এর কারণে স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বশরীরে নেতৃত্ব দিতে না পারলেও বাংগালীর স্বাধীনতা সংগ্রামে শেখ মুজিবই একচ্ছত্র নেতা এটা মেনে নিতে কোন সংশয় বা দ্বিধা নাই। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান হিসেবে তার রাষ্ট্র পরিচালনার কার্যক্রমের সঙ্গে একমত ছিলাম না। জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কার্যক্রমের তীব্র বিরোধীতা করেছি তাঁর বিরুদ্ধে

কঠোর আন্দোলন সংগ্রাম করেছি, কারাবরণ করেছি। এসব কিছুই রাজনৈতিক। রাজনৈতিক বিরোধীতাকে আমি কখনো ব্যাক্তিগত বিরোধিতায় পর্যবসিত করিনি। বিশেষ করে আমার বইয়ে যা উল্লেখ করেছি এবং যেভাবে উল্লেখ করেছি তা শুধু সত্য ইতিহাসকে তুলে ধরার প্রয়াসে। সে সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনা গুলোই তুলে ধরেছি এবং তা যে কারও বিরুদ্ধে কিংবা পক্ষে যেতে পারে। আমার কাছে রাজনীতিটাই বড়, দেশের স্বার্থটাই বড়। ব্যক্তি স্বার্থকে আমি কখনো বড় করে দেখিনি।

স্বাধীনতার অভ্যূদয়ে জননন্দিত ও জনমানসে প্রতিষ্ঠিত একচ্ছত্র নেতা শেখ মজিবুর রহমান এর সাথে সরকারী সামরিক কর্মচারী মেজর জিয়াউর রহমানকে পাশাপাশি দাঁড় করাবার যে কোন প্রয়াস বা চিন্তাই গর্হিত। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ জিয়াউর রহমানের ২৭শে মার্চের ঘোষণাকে প্রতিঘাত করতে ২৬শে মার্চ শেখ মুজিব কর্তৃক চট্টগ্রামে জহুর আহমদ চৌধুরীর কাছে প্রচারের জন্য প্রেরিত বলে একটি বানোয়াট স্বাধীনতার ঘোষণার গল্প তৈরী করলো-পরবর্তীতে শেখ মুজিবও এটিকে মেনে নিয়ে ইতিহাসে একটি চরম মিথ্যা সংযোজন করলেন। রাজনীতিকে আমি সব সময় সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান দিয়েছি। আমার বইয়ে এরই প্রতিফলন ঘটিয়েছি। যা সত্য তাই তুলে ধরেছি। কার পক্ষে বা বিপক্ষে গেল তার ভ্রুক্ষেপ আমি করিনি।

একারণেই দেখা যাবে যে রাজনৈতিক ভাবে যাদের আমি প্রচন্ড বিরোধীতা করেছি অনেক জায়গায় তাদের মন্দ কাজের সমালোচনার পাশাপাশি জাতীয় স্বার্থে ভালো কাজের প্রশংসা করতেও কুণ্ঠা বোধ করিনি। শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। তাঁর ব্যর্থতা যেমনি পর্বত প্রমাণ সফলতাও তেমনি আকাশ চুম্বি। পাকিস্তান আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানেও ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত শেখ মুজিবের সাথে একযোগে কাজ করেছি। একসাথে সংগঠন করেছি, আন্দোলন করেছি, কারাবরণ করেছি। অনেক সময় রাজনৈতিক কারণে, আন্দোলন সংগঠনে মতবিরোধ হয়েছে, মতপার্থক্য হয়েছে। বিচ্ছিন্ন হয়েছি আবার একাত্ম হয়েছি।

বলা হয় ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবুর রহমান- এটা সর্বৈধ মিথ্যা। ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৪৮ সালে আমরা যখন ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করি তখন তিনি ঢাকায় ছিলেন না, ছিলেন নিজ বাড়ী ফরিদপুরের গোপালগঞ্জে। আমরা তাঁর অনুমতি না নিয়েই আহ্বায়ক কমিটিতে তাকে সদস্যভূক্ত করি। বিশ্বাস ছিল যে তিনি এতে দ্বিমত করবেন না। তিনি তো আমাদের নেতাও ছিলেন। পরে ঢাকায় এসে তিনি পূর্ণ উদ্যোমে নব প্রতিষ্ঠিত এই ছাত্র সংগঠনকে সংগঠিত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। '৫২ সালের রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার গাল-গল্প ডাহামিথ্যা। '৫২ এর সেই উত্তাল সময়ে তিনি কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন। ২১শে ফেব্রুয়ারীর পর সরকার কর্তৃক ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে যখন দেশ উত্তপ্ত আমাদেরকে একে একে কারাগারে নিক্ষেপ করা হচ্ছে সে সময় তিনি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন এবং গোপালগঞ্জে নিজ বাড়ীতে অবস্থান করতে থাকেন। ঢাকা-নারায়নগঞ্জের রক্তঝরা উত্তাল আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে তিনি আসেন নাই। যদিও এটাই ছিল তার দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রতিটি মুহূর্তে আমি তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলাম।

১৯৬৭ সালে তিনি বাংগালীর মুক্তি সনদ নামে অভিহিত ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবী পেশ করেন এবং ৬ দফা আন্দোলন সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেন। পরবর্তীতে ৬ দফা-১১ দফা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, '৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে একচ্ছত্র বিজয়ের মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে যান এদেশের একচ্ছত্র নেতা। ৬ দফার পক্ষে তিনি এতদঅঞ্চলের মানুষের ম্যান্ডেট লাভ করেন। তার ত্যাগ-তিতিক্ষা, আন্দোলন-সংগ্রামই তাঁকে এই স্তরে উপনীত করেছিল। '৫২ এর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংগালী জাতীয়তাবাদের চেতনার যে স্ফুরণ ঘটেছিল, বাংগালীর স্বাধীন সত্তার বিকাশের যে উদগ্রবাসনা জেগেছিল, ৬ দফা-১১ দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা আর সাধারণ নির্বাচনে নিরংকুশ বিজয়-তার সফলতা এনে দেয়। জাতীয়তাবাদের পুনর্জাগরণের সেই মহালগ্নের নেতা হিসাবে দেশবাসী শেখ মুজিবকেই বরণ করে নেয়।

পশ্চিমা উর্দুভাষী শাসক-শোষক গোষ্ঠী নিয়মতান্ত্রিক পথে নির্বাচনে বিজয়ী নেতার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে বাংগালীকে স্তব্ধ করে দিতে ট্যাংক কামান আর বন্দুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে বাংগালীরা-পাক হায়েনা বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করতে বাধ্য হয়। পুরো মার্চ মাসই ছিল বাংগালী জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের মানসিক প্রস্তুতির মাস। ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কর্তৃক স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন, ২রা মার্চ পাকিস্তানের পতাকার স্থলে মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন, ৩রা মার্চ স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ স্বাধীনতা আন্দোলনের সাংগঠনিক প্রস্তুতি নিতে থাকে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দ্যোদুল্যমানতার মধ্যেও স্বাধীনতা সংগ্রামের মতো এতবড় একটি কাজে একমাত্র পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের নেতৃত্ব ছিল সুসংহত, সুগঠিত ও লক্ষ্যে স্থির দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। কিন্তু ২৫শে মার্চ '৭১ এর কাল রাত্রিতে বাংগালীর এই একচ্ছত্র নেতা, স্বাধীনতা আন্দোলনের মূর্ত প্রতীক শেখ মুজিব পাক বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করে আজাদী সংগ্রামীদের বিপদে ফেলে দিলেন। এই পরিস্থিতিতে দেশবাসী না-তাঁকে ফেলতে পারে, না তাঁকে মূর্ত সেনাপতি হিসাবে গ্রহণ করতে পারে।

কিন্তু তাঁর ৬ দফা আন্দোলনের উত্তাল-উন্মাদনায় জাতির মনে স্বাধীনতার স্বপ্ন আর আকাংখা তীব্রভাবে জেগে উঠে এবং মনোজগৎ হয়ে উঠে দুর্জয় শক্তিতে বলীয়ান। ২৫শে মার্চের কালো রাত্রিতে operation search light এ পাক হায়েনাদের কামান বন্দুকের বিরুদ্ধে দেশবাসী কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী মরনপণ সংগ্রামে রক্ত নিতে রক্ত দিতে ঝাপিয়ে পড়ে। শুরু হলো মরনপণ মুক্তিযুদ্ধ। মুজিব মুক্তিযুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন কি ছিলেন না, আত্মসমর্পন করেছেন কি করেন নাই এ নিয়ে '৭১ সালে কারো মনে কোন প্রশ্নই উঠে নাই। মুজিব জাতির মনে যে 'স্বাধীনতার' স্বপ্ন ও আকাঙ্খা জাগিয়ে দিয়েছিলেন মানুষের মনের সে দুর্জয় সাহস ও শক্তিই দেশকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়েছে।

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি শুনতে পান বাংলাদেশ হিন্দুস্থানী ফৌজের দখলে- এতে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হন এবং অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। তাই করাচী হতে লন্ডন, লন্ডন থেকে দিল্লী হয়ে ঢাকায় ফেরার পথে দিল্লীতে মজিব ইন্দিরা গান্ধীর কাছে জানতে চান 'বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য কবে প্রত্যাহার করবেন'? একই কথা তিনি

কলকাতা সফরের সময় ইন্দিরা গান্ধীকে জিজ্ঞেস করার পর তাৎক্ষণিকভাবে ইন্দ্রিরা গান্ধী তাঁর সেনা প্রধানকে ডেকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, আমি ঢাকা যাওয়ার পূর্বেই যেন ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশ হতে প্রত্যাহার করা হয়। এতেই প্রমাণ হয় মুজিব সত্যিই স্বাধীনতার রূপকার এবং প্রাণ পুরুষ ছিলেন।

শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর ১৯৭১ সালের ৬ই নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। সে ভাষনে তিনি বলেন- "...... The cry for independence of Bangladesh arose after the arrest of sheik Mujib, not before. He (Mujib) himself, so far as I know has not asked for Independence even now...................." এই ভাষণই প্রমান করে শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি।

এতদসত্ত্বেও ১৬ই ডিসেম্বর পূর্ণাঙ্গ বিজয় অর্জন পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রামে বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্বটি তাকে ঘিরেই আবর্তিত ছিল। আর স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত দেশবাসীর তিনিই ছিলেন অনুপ্রেরণার মূর্ত প্রতীক। এর পাশাপাশি পরিস্থিতির পারিপার্শ্বিকতায় মেজর জিয়ার মতো মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, মেজর শফিউল্লাহ, মেজর খালেদ মোশাররফ, এমন কি আওয়ামী লীগ নেতা এম,এ, হান্নান প্রমুখ ব্যাক্তিগণও বিভিন্ন স্থান থেকে ইথারে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাই বলে বিশেষ কোন এক মেজরের ঘোষণাকেই একক ঘোষণা ধরে নিয়ে সেই মেজরকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে জাতীয় বীর আখ্যায়িত করার প্রশ্ন উঠে না শেখ মুজিব -শেখ মুজিবই। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হতেই শত ভুল ভ্রান্তি সত্ত্বেও মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে শেখ মুজিবসহ আমরা অগণিত রাজনৈতিক কর্মীর কাফেলা সামরিক-বেসামরিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দাবী দাওয়া আদায়ে অবিরত আন্দোলনে-সংগ্রামে জেল-জুলুম নিপীড়ন আর নির্যাতন সহ্য করে আত্মত্যাগের নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে পাকিস্তানে উচ্চ পদস্থ সামরিক বেসামরিক চাকুরীর ব্যবস্থা করি। এই নিরবিচ্ছন্ন আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় দেশবাসীর মনে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা দেয়। মনে রাখতে হবে এদেশের ব্যবসায়ীদের জন্য ব্যবসা, অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে মুক্তি আর পি.এস.পি, সি.এস.পি মেজর, কর্ণেল, মেজর জেনারেল আমাদের মতো ত্যাগী রাজদনীতিকেরই সংগ্রামের ফল। তাদের অর্জন নয়।

দুঃখের সাথে বলতে হয় অন্যের কৃতিত্ব নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া, অন্যের কৃতিত্বকে অস্বীকার করে একক কৃতিত্বের দাবীদার বনে যাওয়ার এই প্রবণতাও শুরু হয়েছে আওয়ামী লীগের মাধ্যমেই। যেমন শেখ মুজিব ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৪৮ সালে উপস্থিত না থাকলেও তাঁকেই পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের প্রতিষ্ঠাতা বলে চালিয়ে দেওয়া, '৫২ এর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহন না করলেও তাঁকেই ভাষা আন্দোলনের নেতা বানানোর ঘৃণ্য কারসাজি- '৭১ এর ২৫ শে মার্চ কালো রাত্রিতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি স্বাধীনতার কোন ঘোষণা না দেয়া সত্বেও পরবর্তীতে ওয়ারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রামে জহুর আহমদ চৌধুরীর কাছে প্রচারের জন্য স্বাধীনতার ঘোষণা প্রেরণের বানোয়াট কাহিনী প্রচার সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং শেখ মুজিব নিজেও সেই মিথ্যাটাকেই সত্য বলে চালিয়ে ছিলেন। এমনি

সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং শেখ মুজিব নিজেও সেই মিথ্যাটাকেই সত্য বলে চালিয়ে ছিলেন। এমনি আরো অনেক ঘটনায় অপরের কৃতিত্বকে অস্বীকার করে নিজের কৃতিত্ব বলে জাহির করেছে।

স্বাধীনতা অর্জনে ৯ মাসের সশস্ত্র যুদ্ধে হিন্দুস্থানের অবদান অতুলনীয়। সামরিক বেসামরিক, ব্যবসায়ী, সংস্কৃতিসেবী সকল মহলের সহায়তা ও অবদান চির স্মরণীয় এবং এই অবদানের কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। বিদুষী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জগৎ জোরা অবিরাম প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্বব্যাপী জনমত সৃষ্টি হয়। সেই সঙ্গে বিশ হাজার ভারতীয় সৈন্যের রক্ত মুক্তি বাহিনীর রক্তের সঙ্গে বাংলার মাটি ও পানিতে একাকার হয়ে মিশে যায়। অবশ্য চীন ও আমেরিকা বাংলার আজাদী সংগ্রামকে ধ্বংস করতে সব ধরণের প্রয়াস চালায়। কিন্তু ব্যর্থ হয়।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনের নির্দেশে সপ্তম নৌবহর যুদ্ধংদেহী সংহারী মুর্ত্তিতে বঙ্গোপসাগরে অবস্থান নেয়ার পায়তারা করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন সপ্তম নৌ বহরকে বাধা দানের হুমকি দিলে যুক্তরাষ্ট্র অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত হয়। ১৯৭১ সালে ভারত-সোভিয়েত ১৫ সালা সামরিক সহযোগিতা চুক্তি এটাও বিচক্ষণ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দেশ রক্ষা পলিসির ফল।

অবিভক্ত ভারতের আসাম প্রদেশে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মাহমুদ আলী এবং আসাম রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন স্যার সাদ উল্লাহ। দেশ বিভাগের সময় আসাম রাজ্যের অন্তর্গত সিলেট জেলায় গণভোট অনুষ্ঠানের সময় মওলানা মওদুদী, দেওবন্দী হোসেন আহমদ মাদানী, আবুল কালাম আজাদ গোষ্ঠীর অপপ্রচারের বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানীর একক প্রচেষ্টা এবং প্রভাবে সিলেটের জনগণ পূর্ব পাকিস্তানে যোগ দেয়ার ম্যান্ডেট দান করে। এই সাফল্য, কৃতিত্ব এবং অবদান এককভাবে মওলানা ভাসানীর।

এই বিশাল ব্যক্তিত্ব যখন দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে আগমন করেন তখন জনগণকে মাঠ পর্যায়ে নেতৃত্বদানের মত একটি বিরাট শূণ্যস্থান পূরণ হয়। মুসলিম লীগের স্বার্থপর, সুবিধাবাদী ও উর্দুভাষী শাসক শোষকদের তাবেদার দালাল শ্রেণীর নেতৃস্থানীয়দের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদীরা তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৪৯ সালে সোহরাওয়ার্দী ভাসানীর যৌথ উদ্যোগে পাকিস্তানে প্রথম বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয়। ১৯৫৪ সালে এই দলের সঙ্গে শেরে বাংলা ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টির সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটে। এর পরেই ভীত সন্ত্রস্ত উর্দুভাষী শোষক-শাসক পশ্চিমা চক্র প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর ঐক্যে ফাটল ধরাবার প্রয়াস চালায়। ইতিমধ্যে গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ প্রথম গণ পরিষদ ভেঙ্গে দেয় ও '৫৬ সালে দ্বিতীয় গণপরিষদে পাকিস্তানের সংবিধান প্রনীত হয়।

এই বিশাল ব্যক্তিত্বই আবার ১৯৫৭ সালে সদরি ইস্পাহানীর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার করাচী যাওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং করাচীর Beach Luxury-তে মিলিত হয়ে তাঁরা আলাপ আলোচনা করেন। এর কিছুকালের মধ্যেই পাকিস্তানের উভয় অংশে

তখনকার সর্বোচ্চ জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী পদ হতে প্রেসিডেন্ট ইসকান্দর মীর্জা পদচ্যুত করেন।

প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মীর্জা ১৯৫৮ সালের ৮ই অক্টোবর পাক পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়ে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে- সমগ্র দেশে সামরিক শাসন জারী করে জেনারেল আয়ুব খানকে Martial Law Administrator পদে নিয়োগ দেন। এর কিছু দিনের মধ্যে ২৭শে অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইসকান্দর মীর্জা জেনারেল আয়ূব খানকে প্রধানমন্ত্রী ও জেনারেল মুসাকে প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ দেন। জেনারেল আয়ুব খান এই ঘোষণা কে ষড়যন্ত্রের আলামত মনে করে প্রেসিডেন্ট ইসকান্দর মীর্জাকে লন্ডনে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন এবং ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সারা পাকিস্তান ব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনও বাতিল করে দেন।

জেনারেল আয়ূব শাসনকালে আয়ূবী শাসনের ক্রীড়নক হয়ে মওলানা ভাসানী আয়ূব খানের প্রতিনিধি হয়ে চীন ভ্রমনে গেলেন মাও সেতুং এর দর্শনার্থী হয়ে। ১৯৫৪ সালে গভর্ণর ইস্কান্দার মীর্জা ডান্ডা শাসনের আওয়াজ-উঠা সত্বেও কম্যুনিষ্টদের প্ররোচনায় কম্যুনিষ্ট আয়োজিত বার্লিন শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে চলে গেলেন। উত্তরকালে এতে করে তিনি কার্যতই জিহাদী জননেতা থেকে তথাকথিত প্রগতিশীল কর্মীদের নেতাতে পরিণত হলেন।

'৬৯ এর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কারণে গণ অভ্যুত্থান এবং সত্তরের নির্বাচনে এক চেটিয়া গণরায় পেয়ে শেখ মুজিবের অভূতপূর্ব উত্থান ঘটে এবং মুজিবেরই রাজনৈতিক নেতা ও গুরু মওলানা ভাসানী হন জন-বিচ্ছিন্ন।

'৭৫ পরবর্তীকালে জিয়াউর রহমানের ক্রীড়নক হয়ে ভাসানী তাঁর অবস্থানের শেষ চিহ্ন মুছে ফেলেন। তাঁর দলের নির্বাচনী প্রতীক ধানের শীষ জিয়ার দলের দখলে চলে যায়- এমন কি তার দলীয় কর্মীরা জিয়ার দলে যোগ দিয়ে "জনগণের নয়ন মনি, মওলানা ভাসানী" শ্লোগান বদল করে জিয়াকে জনগণের নয়নমনি বানিয়ে ফেলেন।

জিয়ার মার্শাল ল' চলাকালে দেশব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচন বাতিল দাবী করে মওলানা ভাসানী কলঙ্কের ডালি মাথায় নেন- মার্শাল 'ল এডমিনিষ্ট্রেটার এর বরকান্দাজ পদে অভিষিক্ত হয়ে ধন্য বোধ করলেন। আটপৌড়ে জীবন যাপনকারী ঝুপড়িবাসী সর্বত্যাগী সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রাসারনবাদের ত্রাস মওলানা হলেন বরকান্দাজ আর তাঁর অনুগামীরা হলেন দালাল-অর্থে বিত্তে তালুকদার।

বানান বিভ্রাট পাঠককে পীড়া দেয়। এ জন্যে চতুর্থ সংস্করণে অনেক বানান বিভ্রাট ও মুদ্রণ প্রমাদ নিরসনে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। তা সত্ত্বেও একেবারে নির্ভুল বই পাঠকদের হাতে পৌঁছে দিতে পারিনি। এ ছাড়া বয়সের সাথে পাল্লা দিয়ে মানুষের স্মৃতি শক্তিও লোপ পায়। আমার বেলায়ও এর ব্যতিক্রম নয়। এই গ্রন্থে বর্ণিত কিছু ঘটনা স্মৃতি নির্ভরতার কারণে তথ্যগত ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় এই গ্রন্থে (পৃঃ ১৫১) ভুলবশতঃ উল্লেখিত হয়েছে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছিল ২৩ ফেব্রুয়ারী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শহীদ মিনার নির্মাণের সঠিক তারিখ ২৬ ফেব্রুয়ারী।
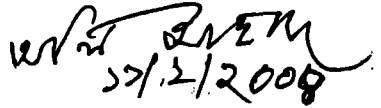
এ ধরণের তথ্যগত ত্রুটি আমাকে জানালে তা কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের সাথে গৃহীত হবে

প্রয়াস নেয়া হবে ইনশায়াল্লাহ।

তৃতীয় সংস্করন প্রকাশকালে কঠোর পরিশ্রম করেছেন রাজনৈতিক সহকর্মী, মুক্তিযোদ্ধা মুন্সি আবদুল মজিদ ও আমার দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক সহকর্মী, বিশিষ্ট রাজনীতিক, মুক্তিযুদ্ধকালে আমার পাশে ছায়ার মত ছিলেন যে জনাব এহসানুল হক সেলিম তাঁরা উভয়ই ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশে তদ্রুপ ভূমিকাই পালন করেছেন। তাদের প্রতি রইল আমার অশেষ অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা কিন্তু ভাষার তুবরীতে তাঁদের ছোট করবার অধিকার আমার নেই।

"জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫" বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের মতো বর্তমানের এই চতুর্থ সংস্করনেও বিভিন্ন সময় নুতন তথ্য সংযোজন ও পরিবর্ধন হেতু ছাপার কাজে ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হয়েছে। কিন্তু প্রেস এতে বিরক্তি প্রকাশ না করে যে বিরল সহযোগিতা প্রদান করেছে এরই ফলশ্রুতিতে বইটি মুদ্রিত আকারে প্রকাশ হতে পেরেছে। এই ধরণের বিরল সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ভাইদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

বিশেষ করে, এর সভাপতি জনাব আ.জ.ম. শামসুল আলম সাহেব যার আন্তরিক উদ্যোগে বইটি প্রকাশিত হলো, তাঁকে জানাই আমার অন্তরের উষ্ণ ভালোবাসা আর অকৃত্তিম শ্রদ্ধা।

১৭.২.২০০৪

(অলি আহাদ)
ফেব্রুয়ারী ২০০৪

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আমি সহজাত লেখক নই। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যাবার পর বিবেকের তাড়নায় ও সুধী পাঠকদের উৎসাহ আর তাগিদে বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশে আমাকে উদ্যোগী হতে হয়েছে। কিন্তু আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য উপযুক্ত প্রকাশনা সংস্থা যখন খুঁজে পাচ্ছিলাম না। চরম হতাশা যখন আমাকে গ্রাস করছিল ঠিক তখনই মহান করুণাময় আল্লাহ পাকের অশেষ কৃপায় বন্ধুবর আখ্‌তার-উল-আলম সাহেব আবির্ভূত হলেন। তাঁর একাগ্রতায় আর মহতি উদ্যোগে খোশরোজ কিতাব মহলের স্বত্বাধিকারী জনাব মহীউদ্দীন আহমদ সাহেব এগিয়ে এলেন। তিনি দায়িত্ব নিলেন বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের। দায়মুক্ত হলাম আমি। ফলশ্রুতিতে বইটি যথাসময়ে পাঠকের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব হয়েছে : জনাব আখ্‌তার-উল-আলম আর জনাব মহীউদ্দীন আহমদ সাহেবের এই মহৎ অবদান আমাকে চির কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছে। আমি তাঁদের কাছে ঋণী হয়ে রইলাম। তাঁদের ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। তাঁদের এই অবদান আমাদের সমসাময়িক কালের ইতিহাসে স্বর্ণ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে। পরম করুণাময় আল্লাহ গাফুরুর রহীম তাঁদের সহায় হোন। আমি রাজনীতিক। ব্যস্ত মানুষ। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বইটিকে পূর্ণাঙ্গ করার অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছি। সেই লক্ষ্যে আমার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বর্তমান সংস্করণে বেশ কিছু তথ্য সংযোজন করা হলো এবং ভবিষ্যৎ সংস্করণেও আরো তথ্য সংযোজন করা হবে। একবারে সম্ভব নয় বিধায় ধাপে ধাপে বিভিন্ন তথ্য সংযোজনের মধ্য দিয়ে বইটিকে পূর্ণাঙ্গ করার ইচ্ছা আমার আছে। আমাদের জাতীয় জীবনে অসত্য আর বিকৃত ইতিহাসের ডামাডোলে সত্য ইতিহাস হারিয়ে যাবার যে প্রবণতা চলে আসছে, আমার এই বইখানির বর্ধিত ৩য় সংস্করণ অনুসন্ধিৎসু সত্যান্বেষী পাঠক সমাজকে অন্ততঃ কিছুটা হলেও তৃপ্তি দান করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। প্রসঙ্গত, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে সাম্প্রতিকালের সৃষ্ট বিতর্ক যেমনি অনাকাঙ্খিত তেমনি অনভিপ্রেতও বটে। মনে রাখতে হবে যে, মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি হঠাৎ করেই সৃষ্টি হয়নি। ১৯৪৭ সালে গান্ধী নেহেরু'র বঙ্গভঙ্গের সর্বনাশা পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বোস-সোহ্‌রায়ার্দীর স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বঙ্গদেশ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। '৫২-এর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় জাতিসত্ত্বার ক্রমবিকাশের ধারায় বিভিন্ন গণতান্ত্রিক, সাংস্কৃতিক স্বাধীকারের আন্দোলনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তি, নৃতাত্ত্বিক আত্ম পরিচয়ের স্বকীয় সত্ত্বার সন্ধানে ব্যাপৃত বৃহত্তর বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর অব্যাহত শোষণ আর শাসনের বিরুদ্ধে ২৩ বছরের আন্দোলনের মধ্য দিয়েই জাতিয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণ ঘটে এবং এর চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে এদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকল মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসে আর অদম্য ইচ্ছাশক্তির কারণে। বাংলার স্বাধীনতা

আন্দোলনের সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকায় যার নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে তিনি হচ্ছেন মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। প্রাসঙ্গিকভাবে বলতেই হয় যে, '৬০-এর দশকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা অর্জনের চূড়ান্ত ধাপে পৌছানোর লক্ষ্যে সৃষ্ট নিউক্লিয়াসে আমার কার্যক্রম আগামী দিনের ইতিহাসে অবশ্যই লিপিবদ্ধ হবে। '৭১-এর জনতার স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্খাই নেতৃত্বকে পেছনে ফেলে অগ্রগামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। জনতার সেই অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে স্বাধীনতার মুলমন্ত্র থেকে অন্য খাতে প্রবাহিত করার ক্ষমতা তৎকালীন কোন রাজনৈতিক নেতৃত্বের ছিল না। আর তাই সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম আপন পরিণতিতে ধাবিত হয়। '৭১-এর ২৫শে মার্চ পর্যন্ত শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ইয়াহিয়ার সাথে আপোষ আলোচনা এক পাকিস্তানের ভিত্তিতেই ছিল। ৭ই মার্চের ভাষণের তাৎপর্য যতই স্বাধীকারের পটভূমিতে বিশ্লেষিত হোক না কেন তাও 'জয় বাংলা' আর 'জয় পাকিস্তানে'র উচ্চকিত শ্লোগানে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত আপোষ মিমাংসার ধুম্রজালে আবদ্ধ ছিল। '৭১-এর ২৫শে মার্চের আলোচনা শেষে যখন জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকবাহিনীকে নিরস্ত্র বাঙালী জনতার উপর সশস্ত্র আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে ভুট্টোসহ তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে করাচির পথে ধাবমান তখন রাত ৮-৩০ মিনিটে, শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের হাই কমান্ডের সাংবাদিকদের নিকট প্রদত্ত বক্তব্য 'আলোচনা ফলপ্রসু হয়েছে আর মাত্র ঘোষণা 'বাকি'-এই বক্তব্যের তাৎপর্য আর যা-ই হোক রাত ১২টায় শেখ মুজিব কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণার কোন প্রেক্ষাপটের সাক্ষ্য বহন করে না। তবে যা বাস্তব তা হলো ২৬শে মার্চ প্রত্যুষ্যে চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব এম এ হান্নান কর্তৃক চট্টগ্রাম বেতার হতে কম শক্তিশালী মাইক্রোওয়েভে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান, পরবর্তীতে ২৭শে মার্চ তৎকালীন মেজর জিয়ার কণ্ঠে প্রথমে এককভাবে তার নামে, পরবর্তীতে সংশোধন করে শেখ মুজিবের নামে স্বাধীনতার ঘোষণা জনমনে সাহস, আস্থা ও স্বস্তি এনে দেয়। সামরিক বাহিনীর সদস্যরাও সেই ঘোষণায় অনুপ্রাণিত হয় এবং নব উদ্যমে সংগঠিত হয়। এইপ্রসঙ্গে বলা অসঙ্গত হবে না সেই সময় অবস্থা এমন ছিল যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের মত এত বড় একটা সংগ্রামে নেতৃত্ব দান করার জন্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের পরিকল্পিত ও সুসংহত দ্বিধা সংকোচহীন নেতৃত্ব ছাড়া কোন সুসংহত পরিকল্পনা কিংবা নেতৃত্বের সমন্বয় ছিল না। সেই কারণেই বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন স্থান হতে যেমন, কুষ্টিয়া, ব্রাক্ষনবাড়িয়া ও জয়দেবপুর হতে যথাক্রমে তৎকালীন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, খালেদ মোশাররফ ও শফিউল্লাহ কর্তৃকও স্বাধীনতার ঘোষণা আসে। পরিস্থিতির বাস্তবতায় তা-ই স্বাভাবিক ছিল। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এসব ঘোষণা স্বাধীনতা আন্দোলনের কোন মাইল ফলক ছিল না। ছিল স্বতঃস্ফূর্ততার বহিঃপ্রকাশ। তবে একথা সত্য যে, সে সময়ে শেখ মুজিবর রহমানের ইমেজ বা জনপ্রিয়তা কিংবদন্তীতুল্য ছিল। আর জনগণ তাঁর নামকে স্বাধীনতার সমার্থক অর্থে গ্রহণ করেছিল। সেই ক্ষেত্রে শেখ মুজিবের উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতি স্বাধীনতা মন্ত্রের প্রতি জনতার বিশ্বাসে কোন ফাটল ধরাতে পারেনি বরং তাঁর 'বিতর্কিত' অনুপস্থিতি জনগণের মনে এক ধরনের সহানুভূতির জন্ম দিয়েছিল। কাজেই মুক্তিযুদ্ধের সকল মহান সংগঠক ও যোদ্ধা সকলেই এই মহান কৃতিত্বের অংশীদার।

স্বাধীনতা সংগ্রামের মাইল ফলক '৫২-এর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের ২১শে ফেব্রুয়ারীসহ সেই উত্তাল দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করে ডঃ আনিসুজ্জামানের লেখা একটি নিবন্ধ এই সংস্করণে সন্নিবেশিত করেছি। এমন আরো কিছু ঘটনা ও তথ্য এই সংস্করণে সংযোজিত করেছি। তন্মধ্যে হীরেন মুখার্জীর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টে পাক-ভারত স্বাধীনতার উপর একটি লেখা, প্রফেসর রেহমান সোবহানের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুই অর্থনীতির সম্ভাব্যতার উপর লেখা একটি সারগর্ভ নিবন্ধ, শেখ মুজিবুর রহমানের গোলটেবিল বৈঠকে প্রদত্ত ভাষণ এবং অতিসম্প্রতি প্রদত্ত ভারতীয় বি.এস.এফ এর সাবেক পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান গোলক মজুমদার এর একটি সাক্ষাৎকার উল্লেখযোগ্য। একটাই উদ্দেশ্য যে ইতিহাস-সচেতন পাঠক সমাজকে অসত্য আর ইতিহাস বিকৃতির ভিড়ে কিছুটা হলেও সত্য ইতিহাসের স্বাদ আস্বাদন করানো। পাঠক সমাজ তৃপ্ত হলে আমার পরিশ্রম স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রণ প্রমাদের কারণে যে সকল ভুল-ত্রুটি ছিল তা সংশোধন করতে প্রয়াস নিয়েছি।

আমার সহকর্মী বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা মুনসী আবদুল মজিদ গতবারের মতো এবারেও বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশে আমাকে অব্যাহত চাপের মধ্যে রাখে এবং তার এই নিরলস প্রাণান্তকর পরিশ্রমের ফলে বইটির তৃতীয় সংস্করণ পাঠকের হাতে সময়মতো তুলে দেয়া সম্ভব হয়েছে। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না। বইটির ছাপানোর ব্যাপারে সার্বিক তত্ত্বাবধানে অক্লান্ত প্রাণান্তকর পরিশ্রম দিয়ে Final Proof থেকে শুরু করে, অঙ্গসজ্জা ও বর্ধিত অংশের সম্পাদনা সুচারুরূপে সম্পন্ন করে বর্তমান এই সংস্করণটি সুন্দর ও পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করতে আমার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মী বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধে আগাগোড়া আমার একান্ত সাথী মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক বিশিষ্ট রাজনীতিক জনাব মোঃ এহসানুল হক সেলিম সহযোগিতা করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। গত দুই সংস্করণ প্রকাশে যে স্বজনদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও কর্মকান্ডে আমাকে দায়মুক্ত রেখেছিল তাদের উদাসীনতা ও অন্যমনস্কতা আমাকে যখন বিপর্যস্ত করছিল সেই মুহূর্তে তিনি আবির্ভূত হলেন তার সাহায্য সহায়তার অকৃত্রিম সহমর্মিতা নিয়ে, আমি অভিভূত কৃতজ্ঞ। আল্লাহ গফুরুর রাহিম তাঁর কৃপা দৃষ্টিতে তাকালেন উৎরে গেলাম আমি। আমি অভিভূত, আমি কৃতজ্ঞ, তাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার নেই। ধনাবাদ জানিয়ে তাকে ছোট করতে চাই না। শুধু হৃদয়ের উষ্ণ অনুভূতিতেই তা ধরে রাখতে চাই। সকলের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

অলি আহাদ
জানুয়ারি, ১৯৯৭

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আমি সহজাত লেখক নই- সুধী পাঠকদের উৎসাহ ও তাগিদ বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে প্রেরণা দিয়াছে। ঘটনাপঞ্জিকে যথাসাধ্য সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি- ভবিষ্যৎ বংশধররা যেন অসত্য তথ্যের বেড়াজালে হারাইয়া না যায়। আমার অক্ষম ও অপারগ লেখনী অধুনাবিকৃত ও অসত্য ইতিহাস পরিবেশনার প্রতিবাদ মাত্র। প্রথম সংস্করণ হইতে দ্বিতীয় সংস্করণ বই প্রকাশ সপ্রমাণ করে যে, সত্যান্বেষী পাঠক সমাজ সত্য ভাষণই চায়- যতই তিক্ত হউক না কেন।

সময়াভাব ও নানা সীমাবদ্ধতার কারণে দ্বিতীয় সংস্করণ বইকে সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ করা সম্ভব হয় নাই। সক্রিয় রাজনৈতিক ও সাংসারিক জীবনে সম্ভবও নহে- একমাত্র অখন্ড অবসরকালেই করা সম্ভব। তবে ভবিষ্যৎ সংস্করণগুলিতে পূর্ণাঙ্গ করিবার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকিবে। প্রথম সংস্করণে মুদ্রণ প্রমাদের কারণে যে সকল ভুল ছিল তাহা সংশোধন করিতে প্রয়াস নিয়াছি। প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করিয়াছি, প্রাসঙ্গিক কিছু কিছু তথ্য সংযোজন করিয়াছি-সহৃদয় পাঠক বন্ধুগণ আনন্দিত হইবেন বলিয়াই আমার বদ্ধমুল ধারণা। পরিশিষ্টে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি মজলুম নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান, সহ-সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ, রাজবন্দী ছমিরউদ্দিন আহমদ, প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা আবদুল হক, আবদুল মতিন, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হারুনুর রশিদের চিঠি ও অন্যান্য কয়েকটি দরকারী দলিল এবং কায়েদে আযমের সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান ও পাকিস্তান গণপরিষদ সদস্যদের উদ্দেশ্যে দেওয়া স্মারকলিপি, অবৈধ সেনাপতি শাসক আইউব খানের বিরুদ্ধে ৯ নেতার বিবৃতি দেওয়া হইল। প্রারম্ভেই বই সম্পর্কে সমালোচনা ও মন্তব্য ছাপানো হইল।

আমার সহকর্মী মুন্সি আবদুল মজিদ দ্বিতীয় সংস্করণ বই ছাপাবার ব্যবস্থার জন্য চাপ দিতেছিল। আমি অর্থাভাবে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও উৎকণ্ঠিত। এমনি দুর্ভাবনা মুহূর্তে মনে হইল ঐশ্বরিক শক্তি যেন হঠাৎ আমাকে চরম দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত মানসিক অবস্থা হইতে মুক্তি দিতে অবতীর্ণ। পরম করুণাময়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

পরম স্নেহভাজন অধ্যাপক মোমিনুল হক চিন্তাশীল বিজ্ঞজন ব্যক্তি। অগাধ পান্ডিত্যের কারণে ও চতুর্মুখী প্রতিভাধর বিধায় তিনি আমার শ্রদ্ধেয়ও বটে। তাঁহার সহজাত মেধা আমার বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে বিভিন্ন দিক হইতে সম্ভাব্য পূর্ণাঙ্গ করিতে আমাকে সর্বোতভাবে সহায়তা করিয়াছে। প্রথম সংস্করণেও অধ্যাপক মোমিনুল হকের অবদান ছিল অতুলনীয়

তখনও তাঁহাকে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ছোট করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। এইবারও দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁহার অবদানকে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ছোট করিব না। তবে আমি তাঁহার নিকট ঋণী-এই ঋণ আমার হৃদয় ঐশ্বর্য্যকে সতেজ হইতে প্রেরণা দিয়াছে।

আমার অনুজসম রেজাউল হক সরোজ দ্বিতীয় সংস্করণ বই প্রকাশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রেরণা বিশেষ ছিলেন। আপাদমস্তক দুর্নীতিবাজ অভিশপ্ত সামাজিক পরিবেশে সৎ জীবনযাপন আক্ষরিক অর্থেই অসম্ভব প্রায়- নিঃসন্দেহে স্বল্পকতক নির্লোভ কায়ক্লেশে জীবনযাপনকারীদের তিনি অন্যতম। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে বিনাস্বার্থে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখা বিরল চরিত্রের ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব এবং তিনি তাই করিয়াছেন। যেহেতু অনুজসম-তাই হৃদয় নিংড়ানো নিখাঁদ স্নেহই তাহার প্রাপ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Education Faculty DEAN ও B.C.S. (Gen. Education) সমিতি প্রেসিডেন্ট প্রিন্সিপাল রাশিদা বেগম যেমনি কলেজ পরিচালনায় তেমনি স্নেহময়ী 'মা' হিসাবে সংসার ধর্ম পালনে সর্বক্ষণ ব্যস্ত তার মধ্যেও বইটি পূর্ণাঙ্গ করিতে যত কষ্টকরই হউক তার অবদান রাখিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই।

সর্বোপরি আমার সহকর্মী ও সহযাত্রী কষ্ট-সহিষ্ণু মুন্সি আবদুল মজিদ পূর্বাপর বই-এর প্রকাশনার পূর্ণ দায়িত্ব স্বেচ্ছায় স্বহস্তে বিনা পারিশ্রমিকে গ্রহণ করে। দ্বিতীয় সংস্করণ বইটির বিভিন্ন তথ্যের খুঁটিনাটির সংশোধন ও সংযোজনের জন্য রাজনৈতিক জীবনের ডামাডোলের মধ্যে তথ্যাবলীর অন্বেষণে গন্ধমাধব পাহাড়ে হনুমানের ঔষধ আহরণে গমনসম-এক একটি তথ্যের জন্য ৪/৫ ঘন্টা ব্যয় করিতে হইয়াছে-সক্রিয় মাঠ রাজনীতিবিদদের পক্ষে সম্ভব কখনও নয়- ইহাই আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা, তথাপি দিতে হইয়াছে মজিদেরই চরম আন্তরিকতা ও ধৈর্যের কারণে। বর্তমান সার্বিক সামাজিক, নৈতিক অবক্ষয়ের দাবানল আপামর সামাজিক জীবনকে অবাধে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া চলিয়াছে- আমার মত দরিদ্র নিঃসহায় ব্যক্তিত্ব বহু পূর্বেই হাল ছাড়িয়া দিয়া নিরাশার অতল গহবরে হারাইয়া যাইত-বই ছাপানোর কাজ সমাধার প্রশ্নই উঠে না। মজিদ শক্তহাতে হাল ধরিয়াছে- কাণ্ডারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে-বই মুদ্রণ কৃতিত্বের সহিত সমাধা করিয়াছে। ধৈর্য, নিঃস্বার্থপরতা, কর্তব্যপরায়নতা, দায়িত্বজ্ঞান, সহৃদয়তা ও স্নেহ, মায়া-মমতার আধার মজিদ ভবিষ্যৎ দুজ্ঞেয় যাত্রা পথে জ্বলন্ত মশাল।

আমি সক্রিয় রাজনৈতিক মাঠকর্মী তাই আমার বইটির ২য় সংস্করণে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজনে যখন যাহা মনে পড়িয়াছে, অগোছালোভাবে তাহাই প্রেসে পাঠাইয়াছি। প্রেস তাহা গ্রহণ করায় বইটি মুদ্রিত আকারে বাহির হইতে পারিয়াছে। এই ধরনের বিরল সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারী ভাইদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

অলি আহাদ
মার্চ ১৯৮৯

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

মুজিব সরকার ৩০শে জুন, ১৯৭৪ইং 'বিশেষ ক্ষমতা আইনে' আমাকে গ্রেফতার করে এবং বিনাবিচারে কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রাখে। ১৫ই আগস্ট (১৯৭৫) ঐতিহাসিক বিপ্লবের পর আমি মুক্তি পাই। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হইতে পরবর্তী আড়াই যুগে তৎকালীন জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হইয়া বহুবার কারাগারে বিনাবিচারে আটক ছিলাম। সত্য বলিতে কি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার দায়ে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিস্কার, জেল-জুলুম, পুলিশী হয়রানি, গ্রামের বাড়ীতে অন্তরীণ ও আত্মগোপন জীবন এ সবই যেন আমার ভাগ্যলিপি।

১৯৭৪ সালেও অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে গিয়াই কারাবরণ করিতে হইয়াছে। সে বৎসরের জুন মাসে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ২৬ নং সেলে পদার্পণ করিতেই বিগত ২৬/২৭ বৎসরের বিভিন্ন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের দৃশ্যাবলী আমার স্মৃতিপটে উদয় হইতেছিল। অতীতের যে অসংখ্য রাজনৈতিক ঘটনার সহিত আমি সরাসরি জড়িত ছিলাম, তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। লেখনীশক্তি আমার নাই; ভাষার উপর দখলও নাই; তথাপি এক অদ্ভুত উৎসাহ ও প্রেরণা, অদম্য আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছাশক্তি যেন আমাকে এইসব ঘটনাপঞ্জী লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছে। সর্বোপরি FAO (U.N.O) কর্মরত আমার স্নেহাস্পদ অনুজ মোহাম্মদ আমিরুজ্জামানের (C.S.P.) তাগাদার পর তাগাদা ও চাপ ছিল আমার সকল প্রেরণার উৎসমূল। সে বুঝিতে চায় না যে, আমার কলম অত্যন্ত দুর্বল, সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা আমাকে তেমন কোন লেখনীশক্তি দেন নাই। কারাগারের নির্জন কক্ষে ছোট ভাইটির স্নেহসিক্ত কোমল মুখখানি মানসপটে উদিত হইলেই লিখিবার ইচ্ছা আমার সকল অপারগতা, অক্ষমতা ও দুর্বলতাকে ছাপাইয়া উঠিত। ছোট ভাইটির চাহিদাই জয়ী হইত। এই বইখানি তাহারই ফলশ্রুতি। (১৯৫৮ সালে আমিরুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ছিল। ১৯৫৮ সালেই উচ্চ শিক্ষার্থে যুক্তরাষ্ট্র গমন করে এবং সিএসপি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় ও ১৯৫৯ সালে C.S.P. একাডেমিক ট্রেনিং গ্রহণের জন্য পাকিস্তান প্রত্যাবর্তন করে)।

আমি জানি, এই বইটিতে বর্ণিত সত্য ও প্রকৃত ঘটনাবিবরণী অনেকের বিরাগের কারণ হইবে। কিন্তু উপায় নাই। আমার সবিনয় নিবেদন, আমার প্রতি বিরূপ না হইয়া নিজ নিজ বিবেককে জিজ্ঞাসা করুন; দেশ ও জাতির অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার জন্য ক্ষমতায় আরোহণকারী কিংবা ক্ষমতার বাহিরে অবস্থানকারী আপনারা দায়ী কিনা? কত ওয়াদা করিয়াছেন, কত ওয়াদা ভাঙ্গিয়াছেন? আমাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে কি লর্ড ম্যাকলে বর্ণিত নিম্ন-গাঙ্গেয় এলাকার বাঙ্গালী চরিত্রের অবিকল চিত্ররূপ ধরা পড়ে না? বস্তুতঃ সিংহের যেমন থাবা, গরুর যেমন শিং এবং মৌমাছির যেমন হুল, তেমনি আমাদের প্রধান অস্ত্র হইল প্রতারণা। বড় বড় অঙ্গীকার, সহজ কৈফিয়ৎ, সুবিধা বিশেষে ফুলানো-ফাঁপানো মিথ্যার ফুলঝুরি এই সবই হইতেছে আমাদের আক্রমণ ও আত্মরক্ষার অস্ত্র। আমার মতে সাধারণ লোককে নয়, সাধারণ লোকের

নেতৃস্থানীয় শ্রেণীকেই ম্যাকলে সাহেব ইঙ্গিত করিয়াছেন, কারণ ম্যাকলে সাহেব নেতৃস্থানীয় লোকদেরই সাহচর্যে আসিয়াছিলেন।

১৯৭১ সালের ভয়াবহ ৯টি মাস মা-হারা সন্তানের ক্রন্দন, সন্তানহারা মায়ের হাহাকার, স্বামীহারা স্ত্রীর অসহায় অবস্থা, স্ত্রীহারা স্বামীর দীর্ঘশ্বাস আজও জাতির চেতনা, বিবেক ও অস্তিত্বকে বিদ্রুপ করিতেছে। পাকসেনা লক্ষ লক্ষ লোককে ভিটামাটি ছাড়া করিয়াছে, দেশান্তর করিয়াছে, প্রাণহানি ঘটাইয়াছে- সংক্ষেপে ধনে-জনে মানে বাঙ্গালী নিঃস্ব হইয়াছে। বিনিময়ে নেতৃত্ব স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে দেশ ও জাতিকে দিয়াছে আভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ ও দিল্লীর সহিত বশ্যতামূলক মৈত্রী। নব্য শাসকগোষ্ঠী পূর্বসুরীদেরই পথ অনুসারী। সুতরাং অত্যাচার ও নির্যাতন তাহাদের অমোঘ অস্ত্র। পাক শাসকদের অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করিয়াছি। কিন্তু মাথা নত করি নাই। আজও মাথা নত করিব না।

ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জন আমার পক্ষে কখনও সম্ভব হয় নাই। রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন জটিল মুহূর্তে নীতির প্রশ্নে প্রতিষ্ঠানের প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের সহিত আমার মতবিরোধ ঘটিয়াছে। সবাই জানেন, নীতি ও আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠে এবং দলীয় নীতি ও আদর্শে মুগ্ধ হইয়াই কর্মীরা স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনে যোগদান করেন। কিন্তু ক্ষমতার পূজারী নেতাদের নীতিহীনতা ও আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় বহুক্ষেত্রেই কর্মীদের বিভ্রান্ত হইতে হয়। তখন তাহাদের পক্ষে নূতন কোন দল খুঁজিয়া নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। অথচ ক্ষমতালোভী, চরিত্রহীন ও চক্রান্তকারী নেতারাই এই ধরনের সত্যানুসন্ধিৎসু ও আদর্শবাদী কর্মীদের হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য দল ত্যাগের অপবাদ দেন, যদিও এইসব কর্মীদের নীতিহীন বা আদর্শত্যাগী বলিয়া আখ্যায়িত করিবার সাহস ঐসব নেতার হয় না।

বিভিন্ন আন্দোলনে অগণিত কর্মী ত্যাগের মহিমা ও কর্তব্যজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিনাদ্বিধায় কারা নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন; দৈহিক নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়াছেন। কেহবা সহায়-সম্পত্তি হারাইয়া হইয়াছেন সর্বস্বান্ত। আবার কেহ আত্মসম্মান ত্যাগ করিয়া অন্যের দ্বারস্থ হইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহাদের সবাইকে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে ও সসম্ভ্রমে স্মরণ করি।

অজস্র কর্মী বিভিন্ন আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে উল্লেখযোগ্য ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়া আন্দোলনকে ধাপে ধাপে সফলতার পর্যায়ে লইয়া গিয়াছেন। যদি এই বইতে কাহারো সেই অগ্রণী ভূমিকার উল্লেখ না হইয়া থাকে, তাহা আমার সরাসরি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাব অথবা অজ্ঞতাপ্রসূত। কাহারো অগ্রণী ভূমিকা অস্বীকার করিবার অর্থ স্বীয় বিবেক ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতারণা করা। উল্লেখিত ও অনুল্লেখিত কর্মীদের সমবেত ও যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা সকল আন্দোলনের মূলভিত্তি এবং তাহাই আমার এই বইটির প্রতিপাদ্য। আশা করি, এই পটভূমিকায় সকলেই আমাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখিবেন।

বইটিতে ১৯৪৫ সাল হইতে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ের রাজনৈতিক ঘটনারাজী সময়ানুক্রমিকভাবে (in chronological order) লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় একই ঘটনার পুনরুল্লেখ থাকিতে পারে।

এই বই লিখিতে গিয়া ইতিহাসের নিকট আমি সত্যকে সম্পূর্ণভাবে তুলিয়া ধরিবার নৈতিক দায়িত্ব অনুভব করিয়াছি যদিও ইহার অধিকাংশই দুঃখজনক এবং তিক্ত। মানুষ মাত্রেই ভুল করে। রাজনীতিবিদগণও ইহার ব্যতিক্রম নহেন। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে

যখন যাহার চরিত্র ও কার্যাবলী আমার দৃষ্টিতে যেইভাবে পরিস্ফুটিত হইয়াছে, অবিকল তাহাই তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি। সত্যের অপলাপ করিয়া রাজনৈতিক কোন কর্মী অথবা নেতার অহেতুক নিন্দা করি নাই। প্রত্যেকের সম্পর্কে আমার প্রতিক্রিয়া ছিল মুক্ত-বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন ও বিবেকপ্রসূত। প্রতিটি চরিত্রের ক্ষেত্রেই কথা ও কাজের যথার্থ মিল বা সঙ্গতি এবং গরমিল বা অসঙ্গতি যখন সেইভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে, যথাস্থানে তাহাই তুলিয়া ধরিয়াছি। সুতরাং, ইতিহাসের প্রতি আমার দায়িত্ব পালনকালে যদি কাহারও মনে সামান্যতম আঘাতও দিয়া থাকি, তবে অনিচ্ছাকৃত সেই ত্রুটির জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। ভুল বা অজ্ঞতাবশতঃ কোন তথ্য বা ঘটনার উল্লেখ বাদ থাকিতে পারে। না থাকাটাই অস্বাভাবিক। আমার বিনীত অনুরোধ, গঠনমূলক মনোভাব লইয়া যে কেহ আগামী সংস্করণে বইটির তথ্যগত ও গুণগত মানোন্নয়নে সহায়তা করিলে আমি একান্ত বাধিত থাকিব।

আমার পরম স্নেহভাজন অধ্যাপক মোমিনুল হক পাণ্ডুলিপি রিভাইজ করিবার সময় প্রয়োজনীয় শিরোনাম বসাইয়া, স্থানে স্থানে ভাষার ত্রুটি শুদ্ধ করিয়া বইটির উৎকর্ষ বিধানে সহায়তা করিয়াছেন। বইটি ছাপাকালে final proof দেখার কষ্টকর কাজটি সমাধা করিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে তাঁহাকে ছোট করিব না। অধ্যাপক মোমিনের পরপরই আমার সহধর্মিনী অধ্যাপিকা রাশিদা বেগম বইটি সম্পূর্ণ তার নিজ হাতে গ্রহণ করে। বেচারীর একদিকে সংসারধর্ম পালন অন্যদিকে চাকুরী। রাজনীতিবিদের সংসার! একা তাহাকে কত দিক যে সামাল দিতে হয়। ইহার মধ্যে সময় করিয়া ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত দেহমনকে বই দেখার কাজে নিয়োজিত করিতে হইয়াছে। অনুজ আমিরুজ্জামানের অনবরত তাগাদা ও দৈনিক ইত্তেফাকের বন্ধুবর আখতার-উল-আলম সাহেবের অবিরাম তাগাদায় শেষ পর্যন্ত বইটি প্রকাশিত হইতে পারিল। অর্থাভাবে বইটি প্রকাশ করা যখন অসম্ভব কল্পনায় পরিণত হয়, আখতার-উল-আলম সাহেব বইটিকে প্রেসে পাঠাইতে বাধ্য করেন এবং এমন কি আমাকে ঋণগ্রস্ত করিয়া ছাড়েন। শুধু তাহাই নহে। বইটিকে পুনঃরিভাইজ করিবার মত দায়িত্বপূর্ণ কাজটি এক প্রকার জোরপূর্বক স্বহস্তে গ্রহণ করেন। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে সুদীর্ঘ একমাস অমানুষিক খাটুনি খাটিয়া আখতার-উল-আলম সাহেব বইটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার অকৃত্রিম সহৃদয়তা ও দরদ ভাষায় প্রকাশ অসম্ভব। আমার ছোট বোনদ্বয় শেলী ও এলী এবং ছোট ভাই জিল্লুর বই কপি করিবার মত নিরানন্দময় কাজটি সমাধা করিয়াছে। সাপ্তাহিক ইত্তেহাদের জেনারেল ম্যানেজার সাঈদ হাসান বইটির জন্য কাগজ, ছাপাখানা অর্থাৎ ছাপাইবার পূর্ণ ঝুঁকি গ্রহণ করে। মাঝে মাঝে আনুষঙ্গিক প্রয়োজনের অর্থ জোগাইবার মত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির সমাধানও সে করিয়া দেয়। ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাহাদের কাহাকেও ছোট করিব না।

অলি আহাদ
মে, ১৯৮২

পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য পরিষদ সভাপতির অনুমোদন নিয়ে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত নিম্নোক্ত বক্তব্য উত্থাপন করেন ঃ

Mr. Dhirendranath Datta : May I speak, Sir?
Mr. President: Yes speak:

Sir, In moving this- the motion that stands in my name- I can assure the House that I do so not in a spirit of narrow Provincialism, but, Sir in the spirit that this motion receives the fullest consideration at the hands of the members. I Know, Sir, that Bengalee is a provincial language, but, so far our state is concerned, it is the language of the majority of the People of the state. So although it is a provincial language, but as it is a language of the majority of the people of the state and it stands on a different footing therefore. Out of six crores ninety lakhs of people inhabiting this State. 4 crores and 40 lakhs of people speak the Bengalee language, So, Sir, what should be the State language of the State? The State language of the state should be the language which is used by the majority of the people of the State, and for that, Sir, I consider that Bengalee language is a lingua franca of our State. It may be contended with a certain amount of force that even in our sister dominion the provincial language have not got the status of a lingua franca because in her sister dominion of India the proceedings of the constituent Assembly is conducted in the Bengalee language but so far as the Bengalee is concerned out of 30 crores of people inhabiting, that sister dominion two and a half crores speak the Bengalee language. Hindustani, Hindi or Urdu has been given and honoured place in the sister dominion because the majority of the people of the Indian Dominon speak that language. So we are to consider that in our state it is found that the majority of the People of the state do speak the Bengalee language than Bengalee should have an honoured place even in the Central Government.

I know, Sir, I voice the sentiments of the vast millions of our State. In the meantime I want to let the House know the feelings of the vastest millions of our State. Even, Sir, in the Eastern Pakistan where the People numbering four crores and forty lakhs speak the Bengalee language the

common man even if he goes to a Post Office and wants to have a money order form finds that the money order is printed in Urdu language and is not printed in Bengalee language or it is printed In English. A Poor cultivator, who has got his son Sir, as a student in the Dhaka University and who wants to send money to him, goes to a village Post Office and he asked for a money order form, finds that the money order form is printed in Urdu language. He can not send the money order but shall have to rush to a distant town and have this money order form translated for him and then the money order, Sir, that is necessary for his boy can be sent. The poor cultivator, Sir, sells a certain plot of land or a poor cultivator purchases a plot of land and goes to the Stamp vendor and pays him money but cannot say whether he has received the value of the money is stamps. The value of the Stamp. Sir is written not in Bengalee but is written in Urdu and English. But he cannot say, Sir, whether he has got the real value of the stamp. These are the difficulties experienced by the Common man of our State. The language of the state should be such which can be understood by the Common man of our State. The common man of the State numbering four crores and four millions find that the proceedings of this Assembly which is their mother of parliaments is being conduct in a language, Sir, which is unknown to them. Then, Sir, English has got an honoured place, Sir, in Rule 29. I know, Sir, English has got and honoured place because of the International Character.

But, Sir, if English can have an honoured place in Rule 29 that the proceedings of the Assembly should be conducted in Urdu or English why Bengalee, which is spoken by four crores forty lakhs of people should not have honoured place. Sir, in Rule 29 of the procedure Rules, So, Sir, I know I am voicing the sentiments of the vast millions of our State and therefore Bengalee should not be treated as a Provincial Language. It should be treated as the language of the State. And therefore, Sir, I suggest that after the word English, the words 'Bengalee be inserted in Rule 29. I do not wish to detain the House but I wish that the Members present here should give a consideration to the sentiments of the vast millions of over State, Sir, and should accept the amendment that has been moved by me.

Mr. President: I may read out the amendment again some Members might not have it.

Amendment moved : That in sub-rule (1) of rule 29, After the word

'English' in line 2, the words 'or Bengalee' be inserted.".

Mr. Prem Hari Barma (East Bengal: General): Sir, I whole-heartedly support the amendment moved by my Hon'ble and esteemed friend. Mr. Dhirendranath Datta. Sir, this amendment does not seek to oust English or Urdu altogether but it seeks only to have Bengalee as one of the media spoken in the Assembly by the members of the Assembly, So, it is not the intention of the amendment altogether to oust English or Urdu, but to have Bengalee also as the lingua franca of the State Sir, as my Honourable friend has told the House, the Majority of the people of the State of Pakistan speaks Bengalee, Therefore, Bengalee must find a place as one of the media in which the Members can address the Assembly. Another difficulty will be that if any member speaks in his mother tongue, but if it is not one of the media in which the members can address the House, the true speech will not be recorded, but only a translation of the speech in the proceedings of the House will be recorded. Therefore, it is necessary for the majority of the people of the State that the speeches which will be delivered in Bengalee should be recorded in Bengalee. With these few words I support the amendment moved by Mr. Dhirendranath Datta.

The Hon'ble Mr. Liaquat Ali Khan (Prime Minister and Minister for Defence): Mr. President, Sir, I listened to the Speech of the Hon'ble the Mover of the amendment with very great care and attention. I wish the Hon'ble member had not moved his amendment and tried to create misunderstanding between the different parts of Pakistan. My Honourable friend has waxed eloquent and stated that Bengalee should really be the lingua franca of Pakistan. In other words, he does not want Bengalee only to be used as a medium of expression in this House, but he has raised indeed a very important question. He should realise that Pakistan has been created because of the demand of a hundred million muslims in this sub-continent and the language of a hundred million Muslims is Urdu and, therefore, it is wrong for him now to try and create the situation that as the majority of the people of Pakistan belongs to one part of Pakistan, therefore, the language which is spoken there should become the State language of Pakistan. Pakistan is a Muslim State and it must have as its lingua franca the language of the Muslim nation. My Honourable friend is displeased that Urdu should replace English. The intention is that instead of changing English as the State language which

it has been so long. Urdu should be the state language, Sir, my Honourable friend never minded it, never presed for Bengalee as long as English was the state language. I never heard in the Central Assembly for years and years any voice raised by the people of Bengal that Bengalee should be the State language. I want to know why is this voice being raised today and I am sorry that he should feel it necessary to bring in this question. We do recognize the importance of Bengalee. There is no intention to oust Bengalee altogether from Bengal. As a matter of fact, it would be wrong for anyone to thrust any other language on the people of a province which is not their mother tongue, but, at the same time, we must have a State language the language which would be used between the different parts of Pakistan for inter-provincial Communications. then, Sir, it is not only the population you have to take into consideration. There are so many other factors. Urdu can be the only language which can keep the people of East Bengal or Eastern Zone and the people of Western Zone jointed together. It is necessary for a nation to have one language and that language can only be Urdu and no other language.

Therefore, Sir, I am sorry, I cannot agree to the amendment which has-been moved. As a matter of fact, when the notice of that amendment was given, I thought that the object was an innocent one. The object to include Bengalee was that in case there are some people who are not proficient in English or Urdu might express their views in that language, but I find now that the object is not such an innocent one as I thought it was. The object of this amendment is to create a rift between it was. The object of this amendment is to take away from the Mussalmans that Unifying force that brings them together.

Mr. Dhirendranath Datt: Certainly not that is not the intention.

Mr. Liaquat Ali Khan : My Honourable friend may go on questioning for the rest necessary for the people of Bengal- Bengalee-speaking People to have remained united ? No, because it was to be a State where Mussalmans were in a majority. Therefore, Bengal must be divided. There was no question of Bengalee language of Bengalee culture taken into consideration at that time.

The Hon'ble Sardar Abdur Rab Khan Nishtar: (Minister for Communications): The Hon'ble Member voted for division.

Mr. Liaquat Ali Khan: Anyhow I am not concerned with that part of

it. I think it is wrong for my Honourable friend to raise that question. It is really that most vital question, a question of life and death for the Muslim nation, not only for Pakistan. But through out this whole subcontinent and I most strongly oppose the amendment which has been moved. I hope the House will not lend its support to such a kind of amendment.

এই ধীরেন্দ্রনাথ দত্তই ১৯৪৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদে Sarat Bose-H.S. Suhrwahdy-Abul Hasham-Burrows -Kiron Sankar Ray-Jogendranath Mandal-এর অখন্ড স্বাধীন বঙ্গ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের বিরুদ্ধে-গান্ধী-নেহেরু-পেটেল, শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর হিন্দু বাংলা প্রতিষ্ঠার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। ফলে স্বাধীন অখন্ড বঙ্গের স্থলে হিন্দু পশ্চিমবঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটাই তাদের অসাম্প্রদায়িকতা-এটাই তাদের বাংগালীত্ব। একমাত্র বাবু কিরণ শংকর রায় ব্যতীত কমরেড জ্যোতিবোস সহ Bengal Legislative Assembly -এর সব হিন্দু সদস্যই ছিলেন চরম সাম্প্রদায়িক ও হিন্দু পশ্চিম বঙ্গ প্রতিষ্ঠার মূল হোতা। সাম্প্রদায়িক হিন্দু এমএলএ দের কারণে পূর্ব বাংলার ৫০/৬০ লক্ষ হিন্দু নিজ ভিটা মাটি ছেড়ে বাস্তহারা পরিচয়ে হিন্দু স্থানে হিজরত করে অমানবিক-অসামাজিক জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছে।

MILESTONES ON THE ROAD TO FREEDOM
By HIREN MUKHERJEE

TODAY IS A RED-LETTER DAY IN INDIA'S ANNALS. TWO DOMINIONS EMERGE-INDIA AND PAKISTAN-AS NEAR TO INDEPENDENCE AS ANY STATE, OUT SIDE THE CATEGORY OF GREAT POWERS, CAN EXPECT TO BE IN AN INTER-DEPENDENT WORLD. IT IS, THEREFORE, A HISTORIC LANDMARK, A DAY OF GOOD CHEER AND YET OF A BECOMING SOLEMNITY.

This in spite of the fact, which cannot be gainsaid, that few people in India today are in a mood of real rejoicing. To our wonted economic woes have lately been added the agonies of a senseless communal carnage that has seared India's soul and besmirched her fair reputation.

Bengal and the Punjab, two of India's vanguard provinces in the struggle for freedom, have had to pay cruelly for the country's leaders' inability to pull together, and to accept artificial bifurcation of their soil. Freedom, besides coming in today's context more as a gift from Britain than as a yearned- for prize won by strenuous battle, carries rightly or wrongly implications that India's militant nationalism may not find too savoury.

But for all that the governance of India today becomes the Indians' own unhampered concern: flags of indigenous design and connotation replace the Union Jack; a stage opens when we have the opportunity to mould the shape of our India nearer to our heart's desire.

On this day, then of all days, one should recall the past, pay homage to the martyrs and leaders who have gone before and re-learn whatever lessons the story of our march to independence still has for us.
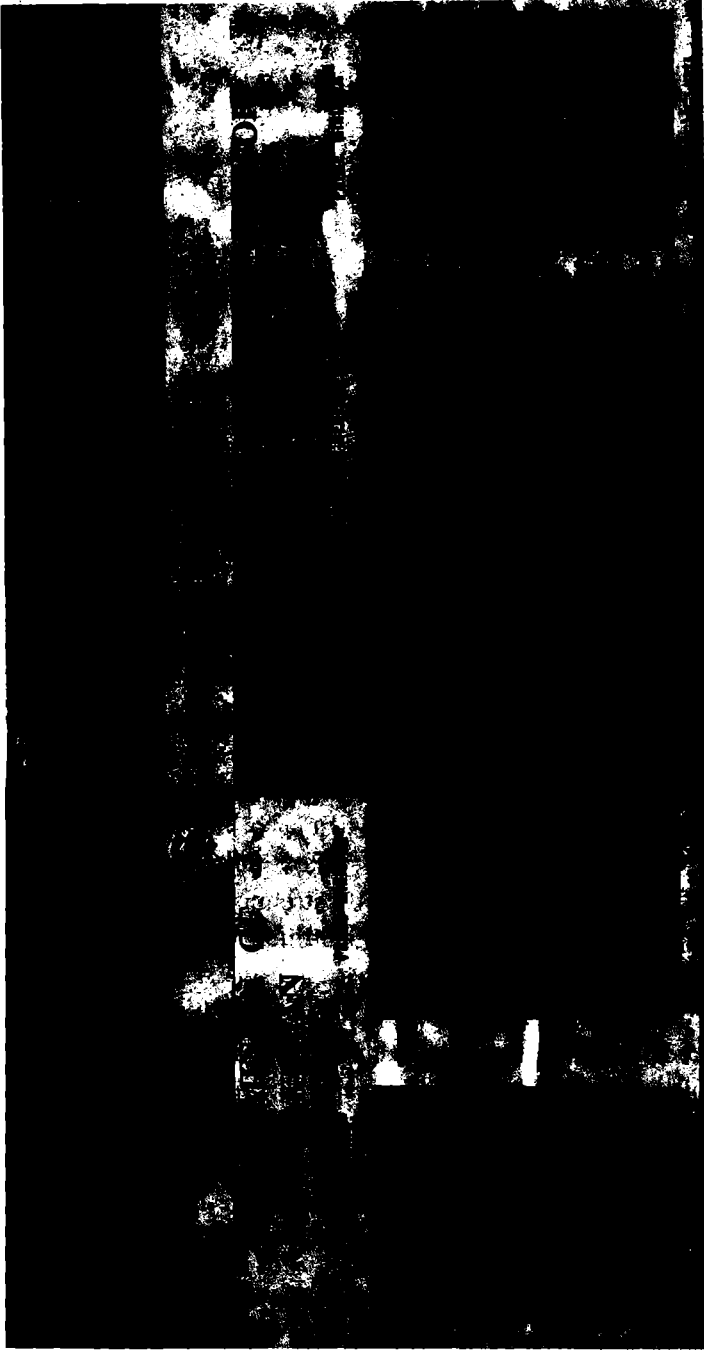
"I said that Jinnah was a Patriot until we decided to re-write history after partition. His record, as opposed to the rewriting, speaks for itself. The reasons why Jinnah was forced to plead for a separate homeland for Muslims much later need to be proved"– Editor Statesman in reply to a letter of Lalita Banerjee dated. 2-2-96

"If Mohammad Ali Jinnah an ardent Nationalist, a man of courage & compassion had not been made to realise that he must always give way to Jawaherlal; the history of the Sub-continent could well have been different"– Editorial ENTER the Fiftieth, Statesman Calcutta 15.8.96.

Even before the foundation in 1885 of the Indian National Congress, the premier and still the most powerful organization of the Indian national movement, there were efforts made, in comparatively primitive fashion, to oust British power from this country. The Wahabis, armed with the ideology of Islamic Puritanism, conducted during a large part of the nineteenth century a religio-agrarian movement which proved a menace to Government. The working masses, from time to time, as in the Indigo Riots of 1859-60 in Bengal, made the administration in certain regions fairly impossible.

Most spectacular of all pre-1885 attempts to throw off the foreign yoke was, of course, the Mutiny of 1857, when Hindus and Muslims, united by xenophobia, fought desperately to demolish the growing structure of Britain's empire in India. None of these were full fledged national movements, but they all, in various ways, presaged the future. By destroying in India the foundations of the old order of society, Britain had been, in Karl Marx's words, "the unconscious tool of history" in the development of India, which in time was bound to "throw off the English yoke altogether."

Birth of Congress

The history of India's national movement is often traced back to the foundation of the Congress in 1885. Alan Octavian Hume, "Father of the Indian National Congress" and Lord Dufferin, the then viceroy, had more than a hand in the business, but the Congress would have emerged anyhow, Hume or no Hume, and since the setting up in Bengal of the British India Society in 1843 and more notably the Indian Association in 1875, indications were not wanting that educated Indians, inspired largely by British constitutional ideals, would have an all-Indian political organization. It is significant, as seen in a memorandum prepared by Hume and quoted by his biographer. Sir William Wedderburn, that in the early eighties "poor men pervaded with a sense of the hopelessness of the existing state of affairs..... were going to do something and stand by each other, and that something meant violence; that a 'terrible revolution' might ensue since a certain small number of the educated classes would

join the movement, assume here and there the lead, give the outbreak cohesion and direct it as a national revolt." (W. Wedderburn, "Alan Octavian Hume," 1913, pp. 80-81.101).

Part of the reason, therefore, for official sponsoring of the Congress was that he desired to see it function as a sort of insurance against "revolution." Soon enough of course the stormy potentialities of Congress began to be apparent, and Dufferin, who has helped it into being, sought to pooh-pooh it as representative only of a "microscopic minority." It indicates, clearly, the double strandard in the role of the Congress ever since; on the one hand, it has been a safety valve against the "menace" of mass movement, and on the other, it has been the leader, ineluectably, of the masses in the national struggle.

Early Policy

There have been four main stages in India's march towards independence; the first (1905-10) comprising what is usually called the Swadeshi movement, mainly in Bengal, Maharashtra and the Punjab, with repercussions elsewhere; the second (1919-22), when Mahatma Gandhi sent out his clarion call for non-violent non-co-operation and roused the country as never before; the third (1930-34), when again he stirred India with his programme of civil disobedience; and the fourth (1940-46)' when the people's militancy, risen to a new qualitative pitch and assisted by the dynamic world, achieved results that are visible today.

Elements whose variegation was not and could not be eliminated have played their part throughout. Hindus and Muslims have fought often together but sometimes as distinguishable strands, notably since 1940, when the Muslim League declared the two-nation theory and its goal of Pakistan. A large part in the movement has been played, particularly since the late 'twenties by the working class and still later the peasantry, growing to class consciousness and linking class objectives with the more immediate and widely shared urgency of a national democratic settlement.

Admiration of the British constitution and hope of sharing its blessings marked the early policy of the Congress but forces soon began to develop which drew sustenance from the European literature of revolt, from pride

in India's storied past and from examples of successful action against foreign domination. A self-confident militancy fortified by all that was heroic and splendid in India's own traditions, and "romantic, mystical, aggressive" quasi-religious appeals for the restoration of the country's self-respect, were propagated by people as diverse as Dayanand, Tilak and Aurobindo Ghose and Brahmabandhab Upadhyay.

The ideology was largely Hindu in coloration but it bore no conscious antagonism towards the Muslims. It was a declaration of war on "political mendicancy," and when Lord Curzon decreed in 1905 the partition of Bengal, India's largest and most advanced province, Bengal did not just groan in agony: she roared in protest meetings and demonstrations were held on an unheard-of scale, the boycott of British goods made striking strides, and the province's pent-up patriotism found vent in the form of stirring songs unmatched before or since, songs that suggest strongly that it was "bliss in that dawn to be alive and to be young was very heaven."

It was not till 1912 that the "settled fact" of the partition of Bengal was "unsettled," but meanwhile, the Congress had split into "moderates" and "extremists," a reconciliation in 1916 lasting no longer than a few years, and the latter, especially with Mahatma Gandhi's advent, held from 1918 onwards a virtual monopoly of the organization. More notably, the terrorist movement in the offing since the nineties of the last century had reared its head. This trend, born of sheer patriotic desperation and the noble impatience which accompanies all emotional upsurge, continued as a factor in Indian politics till the early 'thirties. Almost all ex-terrorists today have lost faith in their early creed, but terrorism was in the Indian context an inevitable phenomenon, it instilled, whatever its deficiencies ethically or politically, a new fearlessness and a whole-hogging passion for freedom. No Indian will ever pour obloquy on the terrorists; for all their mistakes, they were the salt of our Indian earth.

During World War, attempts were made to secure foreign assistance for freeing the country. Muslims and Hindus took part in them, the former "out of humour with the British Government," in the words of the Rowlatt Committee, largely because of Britain's attitude towards Turkey. The

congress and the Muslim League (founded in 1906, with Government playing a part in its establishment very similar to that in the case of the Congress in 1885), supported the war in effusive resolutions, but the country's temper was growing to be menacing. And when the War ended and a myriad economic problems flared up and the Russian revolution stood out as a challenge to all the powers that be, India was ripe for the movement which Mahatma Gandhi came out in all his glory to organize and direct.

1920-22

The story of 1920-22, the Congress-Khilafat movement of non-co-operation, cannot be told in a few words. That was the time when the Congress said goodbye to its old-time respectability and stood out as leader of the masses, the focus of a united and militant national movement. Muslims led by the Ali Brothers, Hakim Ajmal Khan, Abul Kalam Azad and many others joined in with spirit and determination. All over India, there was expectation, following on Mahatma Gandhi's repeated prophecies, that freedom was coming before the year 1921 was rung out. The people's strength found vent in massive hartals, notably on the occasion of the Prince of Wales' tour, and in the peasantry's no-tax compaigns. But all was to be in vain; 1922 came and Swaraj was nowhere in sight. Mahatma Gandhi insisted on a standard of non-violence which his militant followers found impossible, and in February 1922 the non-co-operation movement was withdrawn.

All over the country, exultation gave way to depression and for quite some time India sulked and sorrowed C.R. Das, with Motilal Nehru as his chief lieutenant, came out with scheme of entering the legislature, set up by the Montagu-Chelmsford Reforms Act of 1919 and boycotted so long by the Congress, with a programme of persistent obstruction. It injected some little life into the body politic, but not as much as was wanted.

In desperation, impatient patriots took recourse again to individual terorism. Hindus and Muslims, drawn so close together in the great days of 1920-21, fell again apart, quarrelled over the loaves and fishes of office and with politics lacking fire communal riots came to be a

melancholy feature. Things began to look up only when all the parties that mattered decided to boycott the all-white Simon Commission sent out in 1928 to judge India's fitness for the next round of reforms. Organization of the working class, which was to be a great ally of the national movement, also went on apace, as witness the Cawnpore Bolshevik Conspiracy Case of 1924 the formation of Workers' and Peasants' Party, and the much more celebrated Meerut Conspiracy Case which was instituted in order first to drive a wedge between the working class and the national movement, and secondly, to decapitate the rising working-class organization by stowing away its leaders for long terms.

Not for long could India be kept in leash, however, the Congress in 1929 declared its goal of complete independence and the next year 1930 Mahatma Gandhi re-emerged with his civil disobedience movement.

Civil Disobedience

The struggle of 1930-32 remains vivid in many memories, With a short respite, when Mahatma Gandhi attended the London Round Table Conference in 1931 it raged, fairly relentlessly, for in the first round the number of civil resisters was about 90,000, and in the second about 80,000. It was a distressing finale to an inspiriting drama when the Congress leadership decided in May 1934 to call it off, but it left rich lessons, pride in our common people and determination to fight till freedom was won.

What followed has been too recent to require much elucidation. Since 1936 the Congress acquired, thanks largely to pandit Jawharlal Nehru, a new militancy and reflected, as much as a bourgeois-led organization could, the rising tempo of the working class and pensantry's movement. The Congress Achilles heel however, was the Muslim problem; the alienation since 1922 had never really been healed, the Congress' Contact with Muslim Masses, as Nehru admitted, was fortuitous and unsatisfactory. This cardinal defect has had to be too dearly paid for, and today, as we celebrate Indian independence, we see also regretfully the emergence of two Indias the unwillingness which one hopes and feels is only temporary of Muslims and Hindus to live and work in one proud State of their own.

During World War-II and since its termination, one saw many

examples of our people's strength in spite of the unfortunate estrangement between large sections of the two main communities. There has been no question that on the issue of independence all were unanimous. The Muslim League had declared complete independence as its goal in 1937 and three years later defined it as Pakistan. The Congress, after its offer of co-operation with the war effort on what it considered honourable terms had been refused, experimented with individual satyagraha in 1940, and in 1942 launched the slogan of "Do or Die."

1942 Events

The working class and the peasantry, in so far as it had a conscious class leadership, supported the war in its character of an anti-Fascist struggle with enormous potentialities for peoples liberation everywhere, but they never lagged behind in the demand for complete freedom. In March-April 1942 the British Government made a notable effort at understanding, but for varied and complex reasons, the Cripps Offer was infructuous. And so in August 1942 and subsequent months there started another and a ruthless tug-of-war between Government and the people, the latter leaderless and striking in blind, spontaneous fury.

The struggle of our people for liberation reached a higher phase in 1945-46, when it could no longer be pleaded that the exigencies of war demanded the withholding of Indian freedom. Over the issue of the release of the Indian National Army prisoners, unprecedented demonstrations were held. The mutiny in the Royal Indian navy early in 1946 showed how the spirit of revolt and impatience with subjection had permeated the Armed Forces. Enormous working class upheavals, demonstrated most spectacularly in Calcutta on July 29, 1946, extensive agrarian uprisings in different parts of India and the heroic unassisted struggle of States people from Kashmir to Travancore, underlined the same thing. The British sought agreement, held conferences at Simla (1945-46) with national leaders; sent first a Parliamentary delegation and then the Cabinet Mission. Parleyed with every important group, and ultimately, when the delary in the fruition of the people's hopes and the failure of Congress and League leaders to come together helped to produce a calamitous situation of civil war between the communities, came out with legislation

on Indian Independence. And it is in the terms of the Indian Independence Act of the British Parliament that today is being celebrated.

There is a suspicion, which cannot just be wished away, that our independence today has many a lacuna, that we have been profiered a piece of bread which might well taste like stone, that problems like that of the States and of Hindu-Muslim antagonism are the product of many and dubious machinations. Such worries there are and will be; but that is no reason why Indians should not realize that, in spite of everything, a brave new perspective is opening, that nothing can prevent us, if only we make up our mind turning formal independence into substantial that even out of its apparent wreck our hope can and will create the thing it contemplates and India before long will play, united, her rightful role in world affairs.

**** This article published in the statesman on their supplement, issued on the day of the inauguration of the two new dominions of Pakistan and India. 15 Aug. 1947***

বঙ্গানুবাদ

স্বাধীনতার মাইল ফলক

হীরেন মুখার্জী

আজ ভারতের ইতিহাসে 'লাল রং-এ রঞ্জিত একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিন। এই মাহেন্দ্রক্ষণে প্রাক-স্বাধীনতা পরিপূর্ণ স্বাদে সিক্ত হয়ে জন্ম নিয়েছিল দু'টি স্ব-শাসিত দেশ- ভারত ও পাকিস্তান- যা যে কোন নবজাত রাষ্ট্রের বেলায়ই অত্যুজ্জ্বল একটি ঘটনা। বৃহৎ শক্তিবর্গের দেশটি পৃথিবীর এই আত্মনির্ভরশীলতার নিরিখে অনেক কিছুই প্রত্যাশা করে। এসব দ্বিধার পরেও এটা ঐতিহাসিকভাবে চিহ্নিত একটি দিন-যেদিনে ভরাট উল্লাসের পাশাপাশি ভাবগাম্ভির্যও বজায় রাখার অবকাশ রাখে।

এসবের পরেও ইহা অস্বীকার করা যাবে না যে, আজকের ভারতে সত্যিকার অর্থে প্রাচুর্য ভোগ করছে এমন লোক হাতে গোনার মধ্যেই রয়েছে সীমিত। আমদের চিরচারিত দুর্বল অর্থনীতির সাথে শেষ অবধি যুক্ত হয়েছে বিবেকহীন ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হত্যাযজ্ঞ, যা ভারতের আত্মাকে করেছে বিদীর্ণ এবং সেই সাথে তার সুন্দর ভাবমূর্তিকে করেছে কলঙ্কিত। বাংলা ও পাঞ্জাব-স্বাধীনতা সংগ্রামের এই দুটি ভারতে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী দেশকে নির্মমভাবে চরম খেসারত দিতে হয়েছিল। এক সাথে চলার পথ থেকে সরে পড়ার

জন্য। এভাবে তাদের আত্মার কৃত্রিম বিভক্তি তারা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল দেশের দুর্বল নেতৃত্বের জের হিসেবেই। তাছাড়া স্বাধীনতা-আজকের প্রেক্ষাপটে যত না তীব্র সংগ্রামের মাধ্যমে, ভালোর জনা হোক বা মন্দের জন্যে হোক, ছিনিয়ে আনা 'বিজয়' হিসেবে; এবং এর ফল (নিহিতার্থ) ভারতের জঙ্গী জাতীয়তাবাদী শক্তি খুব একটা মসলাদার বা স্বাদযুক্ত উপাদান, তথা সুখকর পরিস্থিতি হিসেবে মেনে নেয়নি।

কিন্তু এতসব ঘটনার পরেও যেটা সুখের তা হচ্ছে ভারত আজ পেয়েছে নিজের দেশ নিজে শাসন করার অধিকার-তথা স্বরাজ-এর প্রতিষ্ঠিত স্বাদ, যা অনুভূতিতে নিরবিচ্ছিন্ন, নিজ দেশের ঐতিহ্যবাদী নকশাবিদদের দ্বারা প্রস্তুত নিজ দেশের স্বাধীন পতাকা প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছে এবং যা বাধ্য করেছে বলদর্পি প্রভুর ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা নামিয়ে ফেলতে ও মেনে নিতে কালের অমোঘ বিধান, এ স্বাধীনতা ভারতের দ্বারপ্রান্তে এনে দিয়েছে নিজেদের দেশ নিজেরা গড়ার সুযোগ।

এই দিনে এবং আগত এই দিনগুলোতে আমাদের স্মরণ করতে হবে সেসব অতীত দিনের কথা, শ্রদ্ধা জানাতে হবে দেশের সেইসব বরেণ্য সন্তানদের ও নেতাদের কথা, যাঁদের আত্মত্যাগে এ দেশ হয়েছে স্বাধীন এবং নতুন করে আমাদের শিখতে হবে স্বাধীনতার অগ্রযাত্রার পথে যা কিছু শিক্ষণীয় আছে সবই পাথেয় হিসেবে নিতে নিখিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-যাহার জন্ম হয়েছিল ১৮৮৫ সালে এবং ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে দল 'আদি এবং একমাত্র শক্তিশালী ও আন্দোলনে ব্রতী প্রতিষ্ঠান' হিসেবে আজও যে দল সুবিদিত, তারও আগে-এদেশ থেকে বৃটিশরাজ উৎখাতের জন্য একাধিকবার দুর্দমনীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। যদিও তুলনামুলকভাবে এসব আন্দোলন ছিল মধ্যযুগীয় ধারায় প্রভাবিত; তবুও এগুলো ছিল অকৃত্রিম দেশাত্মবোধে ভাস্বর। যেমন 'ওহাবি' আন্দোলন, ১৯০০ শতকের বৃহত্তর সময় ধরে 'ওয়াবিয়া' ইসলামের পবিত্রতম আদর্শের অস্ত্রে সজ্জিত হয় ধর্মীয়-অনুশাসন ও কৃষিভিত্তিক আন্দোলন চালিয়ে বৃটিশ সরকারের যথেষ্ট পেরেশানের কারণ হতে সক্ষম হয়েছিল, এ-দেশের শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী-সময়ে সময়ে বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে "বৃটিশ হঠাও" আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যেমনটি ঘটেছিল ১৮৫৯-৬০ সনে, বাংলায় যাহা "ইন্ডিগো রাঅট" বা "নীল চাষের হাঙ্গামা" হিসেবে ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে চিরকাল। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে নীল চাষের প্রতিবাদে শুধু নীল চাষীরাই ক্ষোভে ফেটে পড়েনি সেদিন; তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল বাংলার আপামর জনসাধারণ বিশেষ করে, লেখক সম্প্রদায়ের লোকেরাও, উদাহরণ 'নীলদর্পন'। এ আন্দোলনের খেসারত দিতে হয়েছিল বৃটিশরাজকে বাংলার বেশ কিছু অঞ্চলে নিজেদের প্রশাসন-যন্ত্রে ধস নামানোর আলামত হজম করে।

বিদেশী শাসনের জোয়াল থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রাক ১৮৮৫-এর সকল প্রচেষ্টাকে দৃশ্যত; ম্লান করেও দেশবাসী সবাইকে নাড়া দিয়ে ১৮৫৭-এর দশকে "হিন্দু ও মুসলমান"-ভারতের এ দুটি সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী একযোগে সম্মিলিত হয়ে ও বেপরোয়াভাবে যে প্রচণ্ডতম স্বাধীনতা যুদ্ধের আঘাত হেনেছিল ভারতে ক্রমবর্ধমানভাবে গড়ে ওঠে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মূল কাঠামোর

উপর তাতে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের "ভিত"ই কেঁপে উঠেছিল থর থর করে। দুর্বল নেতৃত্ব, বিচ্ছিন্ন সমর অভিযান, বৃটিশ-পদলেহীদের সক্রিয় বিরোধিতা ও উপযোগী সমন্বয়ের অভাবের কারণে-দৃঢ়ভাবে প্রোথিত, সুশৃঙ্খল যান্ত্রিক সামরিক বাহিনী এবং ধুর্ত কূটনৈতিক-চালে এ পুষ্ট বৃটিশের রাজত্বের ভিত এ দেশের মাটি থেকে উৎখাত করা সম্ভব হল না এবারেও, এটা আমাদের পরম দুর্ভাগ্য। বস্তুতঃ এসবের কোনটাই জাতীয় পর্যায়ের ও সম্বলিত আন্দোলন ছিল না কিন্তু বিভিন্নভাবে বৃটিশের ভারত ছাড়ার এটাই ছিল "অশনি সংকেত"। ভারতের সনাতন সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়ে 'বৃটেন' কার্ল-মাক্স-এর ভাষায় "অবচেতন-ইতিহাসের হাতিয়ার" তৈরি করতেই কেবল সাহায্য করে চলেছিল ভারতের বুকে; যার ফলশ্রুতিতে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই ভারতের মাটি থেকে পরাধীনতার "ইংরেজ জোয়াল" নিজেরাই উপড়ে ফেলে চিরতরে তথা 'অগস্থ্য যাত্রা' করতে বাধ্য হতে হয়েছিল 'সুচতুর' ইংরেজ সরকার বাহাদুরকে।

কংগ্রেসের জন্ম

নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস অন্দোলনের ইতিহাস খুঁজতে হলে ১৮৮৫ সনে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসের জন্মলগ্ন এর ঘটনাপঞ্জীর দিকে হাত বাড়াতে হবে। কারণ, নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের জনক বলে তথাকথিত খ্যাত অ্যালান অকটেভিয়ান হিউম ও তৎকালীন বড় লাট বা ভাইসরয় লর্ড ডাফেরিন-এর নাম- এদেশের কল্যাণ এর 'চে বেশি করে নিজেদের ব্যবসায়িক সুবিধা আদায়ের কাজে সম্পৃক্ত রেখে কংগ্রেসের জন্মের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে ছিল জড়িত। সে যাই হোক হিউম বা হিউম ছাড়াই যে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের জন্ম ১৮৮৫ সালেই হয়েছিল -এ কথা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য একই ঘটনার পরিণতিতে বাংলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল 'বৃটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি'; ১৮৪৩-এর দশকে এবং এর চেয়েও সমধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৮৭৫ সনে "ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন" এর জন্মলাভ। এসব ঘটনাবলীর আলামতে কিন্তু এটা চাওয়া হচ্ছে না যে, ভারতের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বৃটিশ সংবিধানের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটিকে সমৃদ্ধ করুক। তবে হিউম প্রণীত স্বারকলিপিতে হিউমের জীবনী-প্রণেতা, স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন (Sir Welliam wedderbum) যেভাবে ঘটনার উল্লেখ করেছেন, উহার উদ্ধৃতি এখনে সন্নিবেশিত করা হল; "দরিদ্র জনগণ চলমান আশাহীনতার প্রেক্ষাপটে হতাশা হয়ে .... পরস্পররের সাথে হাত মিলিয়ে 'কিছু একটা' করতে যাচ্ছে এবং সেই 'কিছু একটা'-র অর্থ বুঝতে হবে- সন্ত্রাসী কার্যকলাপ-একটা 'বিপজ্জনক বিদ্রোহ' দানা বাঁধতে শুরু করেছে, অর্থাৎ একটা ছোট আকারের শিক্ষিত শ্রেণী এ শুরু হতে যাওয়া আন্দোলনে যোগ দিতে যাচ্ছে, অনুমান করছি, এখানে সেখানে নেতৃত্ব দিয়ে শেষমেষ এরা অটলভাবে একত্রিত হয়ে একটা জাতীয় বিদ্রোহের বিস্ফোরণ ঘটাতে যাচ্ছে।" W. wedderburn, "Alan octavian Hume". 1913 pp80-8, 10" এ স্মারক লিপিতে, হিউম-ভারতের রাজনৈতিক গগণে যা ঘটতে যাচ্ছে, আকার ইঙ্গিতে তার যথার্থতাই স্বীকার করেছেন এবং ইহা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা তো বটেই। সুতরাং আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করার লালিত ইচ্ছার

কারণসমূহের একটি হচ্ছে- এটা দেখা যে সংগঠনটি যেন সম্ভাব্য "বিদ্রোহের" বিরুদ্ধে এর কার্যকারিতা অব্যাহত রেখে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। শীঘ্রই কংগ্রেসের ঝটিকা-কার্যকলাপ স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করায় বড়লাট ডাফেরিন (Victory Lord Dufferin) সংগঠনটির সার সম্যকভাবে বুঝলেন; এবং যে রাজনৈতিক দলটিকে সংগঠনকালে সাহায্য করেছিলেন তাৎক্ষণিকভাবে তিনি মত পাল্টিয়ে ঘৃণাভরে ফতোয়া জারি করলেন "দলটি আসলে ভারতের একটি ক্ষুদ্রতম অংশকেই প্রতিনিধিত্ব করে"। এর পর থেকেই কংগ্রেসের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে আবিস্কৃত হল দ্বৈতসত্তার অস্তিত্বের-এর একটি হচ্ছে জনগণের দুর্দশার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটা একটি "নিরাপদভাবে উত্তেজনা নিরসনের উপায়" বা "সেফ্টি ভাল্ব" অন্যটি হচ্ছে, অপরিহার্যভাবে জনগণের জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া।

পূর্বের কর্মপন্থা

স্বাধীনতা অর্জনের অগ্রযাত্রা চারটি পর্যায়ে চলমান ছিলঃ প্রথম পর্যায় (১৯০৫-১০) এ অন্তর্ভুক্ত ছিল স্বদেশী আন্দোলন, এ নামেই সচরাচর আন্দোলনটির ছিল পরিচিতি যাহা প্রধানতঃ বাংলা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব এবং অন্যান্য স্থানেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৯১৯-২২) মহাত্মা গান্ধী তাঁহার শান্তিপুর্ণ গণঅভ্যুত্থান ও অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের জনগণের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ রাজাদের বিরুদ্ধে যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন তারই ক্রিয়া-কর্মকান্ডে ছিল সমৃদ্ধ। এর আগে এ ধরনের আন্দোলনের ডাক কেউ দেননি। তৃতীয়তঃ (১৯৩০-৩৪) তিনিই যখন আইন অমান্যকারী আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতে গণজাগরণের জোয়ার এনেছিলেন সে সব কতকথায় পরিপূর্ণ ছিল সেদিনগুলো। এর পরে এলো চতুর্থ পর্যায় (১৯৪০-৪৬)। এ-পর্যায়ে জনগণের জঙ্গী মনোভাব নতুন উৎকর্ষতায় সমৃদ্ধ হয়ে এবং পৃথিবীর চিন্তাশীল রাষ্ট্রনায়কদের রোষদৃষ্টি একগুয়েমিভাবে বৃটিশের স্বাধীনতা-আন্দোলন দাবিয়ে রাখার বিরুদ্ধে বর্ষিত হল তখনই বৃটিশ সিংহ ল্যাজ গুটিয়ে পিঠ-টান দিতে বাধ্য হলেন, এবং ঘটনাটির ফল দৃশ্যতঃ আমরা সবাই এখন ভোগ করছি। বিভিন্ন উপাদান যা বিভিন্ন রঙে আচ্ছাদিত ছিল এবং যা উৎপাটন করা সম্ভব হয়নি এদ্দিন তাদের ভূমিকা শুরু হয়ে গেল এবার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় হিন্দু এবং মুসলমান একত্রে থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল প্রায়ই কিন্তু যখনই পৃথক রাজনৈতিক দল হিসেবে এবং পৃথক স্বাধীন সত্তার অংশ হিসেবে "মুসলিম লীগ" এর জন্ম দিল-দ্বিজাতিক ভিত্তিতে এবং বিশেষ করে যখন মুসলমানদের জন্য পৃথক ও স্বাধীন আবাসভূমি-"পাকিস্তান" দাবি করা হলো- তখন থেকেই শুরু হলো রাজনৈতিক ধারার ডামাডোলের ক্রিয়াকলাপ। বিশেষ করে বিশ দশকের শেষের দিকে যে সব শ্রমজীবী শ্রেণীর একটি বড় অংশ এ আন্দোলনে সামিল হয়েছিল তাঁরা এখনো, কৃষকই রয়ে গেছেন, তাঁরা শ্রেণী-সচেতন হয়ে বেড়ে উঠছে এবং সংযোগ সাধনকারী শ্রেণীর উদ্দেশ্যাবলীর সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে আরও বেশি, তাৎক্ষণিক ও ব্যাপক অংশীদারিত্ব আদায়ের লক্ষ্যে একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক সমাধান চাচ্ছে, জরুরী ভিত্তিতে।

বৃটিশ সংবিধানের প্রশংসাকারীরা এবং এর অংশীদারিত্বের আশির্বাদের প্রত্যাশাকারীরাই কংগ্রেসের "পূর্বের কর্মপন্থা" প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু সংস্থাটির কর্মশক্তির বাহকবৃন্দ, অচিরেই নতুন আঙ্গিকে কর্মপন্থার মূল্যায়ন শুরু করতে শুরু করলেন, এবার তাঁরা ইউরোপের বিদ্রোহ-সংক্রান্ত সাহিত্য, ভারতের অতীত পর্ব এবং বিদেশী অধীনতার বিরুদ্ধে কিভাবে লড়তে হয়-এর সফল কাহিনীর উদাহরণসমূহ সংগ্রামী আত্মবিশ্বাসের বলে বলীয়ান জনগোষ্ঠী যা বীররস এবং ভারতের ঐতিহ্যে-গাঁথা চমৎকার সব কাহিনীতে ঠাসা-যেমন, কল্পকাহিনী, প্রেমোপাখ্যান, রহস্য-কাহিনী (রহস্যোপন্যাস) আগ্রাসনকারীদের কাহিনী, দেশের আত্মসম্মান পুনরুদ্ধারের আবেদন সম্বলিত প্রায় বা আধা-ধর্মীয় বার্তা, দেশের ভিন্নমতাবলম্বী নেতৃবৃন্দ, যেভাবে ঢালাও প্রচার চালিয়েছিলেন যেমন-দয়ানন্দ, তিলক ও অরবিন্দ ঘোষ এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতির উপরে সঠিক নির্দেশনা লাভের জন্য করতে শুরু করেছিলেন।

হিন্দুরা বহুলাংশ বর্ণবাদের শিকার, কিন্তু ইহা মুসলিম জনগণের প্রতি বিবেকহীন বৈরীতা বহন করে না। যখন লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে এক ডিক্রিবলে বাংলাকে বিভক্ত করলেন তখন বাংলার জনগণ এই বিভক্তির বিরুদ্ধে প্রচণ্ডতম ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং "রাজনৈতিক ভিক্ষার" বিরুদ্ধে সমরাভিযান শুরু করে দেয়, কারণ বাংলা ছিল সবচে' বড় এবং সবচে' প্রগতিশীল প্রদেশ। বাংলা তখন শুধু নিদারুণ যন্ত্রণায় আর্তনাদই করেনি-বিভিন্ন সভায় ও প্রতিবাদী ক্ষোভ মিছিলে যে সিংহের মতো হুংকার ছেড়ে গর্জে উঠেছিল প্রচণ্ডতম রোষে-যা ছিল সে সময়ে অশ্রুতপূর্ব ঘটনা। তখন থেকে শুরু হলো বৃটিশের সব রকমের পণ্য-বর্জন অভিযান, দেশাত্মবোধক গণসঙ্গীত, ব্রটিশ রাজের বিরুদ্ধে ক্ষুরধার লেখনী, তথা 'বৃটিশ হঠাও' সংক্রান্ত সব রকমের কর্মকাণ্ড। শেষমেষ কংগ্রেস 'মধ্যমপন্থী' ও 'উগ্রবাদী' এ দু'দলে ধরতে গেলে ভাগই হয়ে গিয়েছিল, মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব, প্রতিষ্ঠানটিকে দৃশ্যতঃ মহাত্মাজীর একাধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল ১৯১৮ দশক ও তার পর থেকে। এবং এ দশকেই ভারতে এক ধরনের ভয়শূন্য (রাজনৈতিকভাবে ও ধর্মীয়ভাবে) সন্ত্রাসীর অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল। কিন্তু ভারতবাসী কোনদিনই এদেশের নিমক-খাওয়া সন্তান হিসেবে উপেক্ষা করবে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশ স্বাধীন করার জন্য বিদেশী সাহায্যের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল, হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই এতে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু সুচতুর বৃটিশ সরকার ঠাট্টার ছলে তুর্কীর কথা তুলে ব্যাপারটা তখনকার মতো ধামাচাপা দিতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষে রাশিয়া ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন যোগাতে ভুল করেনি, মহাত্মাজী অবশ্য দেশের আন্দোলনের হাল ঠিকই ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯২০-২২

এ সময়ে অসহযোগ আন্দোলনের অগ্রযাত্রায় কংগ্রেস- খেলাফত আন্দোলনকারীরা যে দৃষ্টান্তমূলক ঘটনার অবতারণা করেছিল তা এখানে দু-কথায় বোঝানো যাবে না। সে সময় আলী ভাইদের নেতৃত্বে, তথা, হাকিম আজমল খান এবং আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে মুসলমানগণ এবং অন্যরা একসাথে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মহাত্মা গান্ধী ভবিষ্যদ্বাণী করে বসলেন- স্বরাজ ১৯২১-এর আগেই আসছে।' ভারতের জনগণের বাপুজীর

উপর ভীষণ আস্থা, খুশিতে টগবগিয়ে তামাম ভারতবাসী আন্দোলন করলো আরও ঘনীভূত। কিন্তু সবই বৃথা প্রমাণিত হলো। প্রিন্স অব ওয়েলস্-এর ভারত সফরও কোন কাজে এলো না। বরং আগ্নেয়গিরির লাভার মতোই ব্যাপক হরতাল ও কৃষকদের খাজনা বন্ধ আন্দোলনগুলো আরও নাজুক করলো দেশের পরিস্থিতি। সি আর দাস, মতিলাল নেহেরু এগিয়ে এলেন কিন্তু পরিস্থিতি কিছুটা চাঙ্গা হলেও তিমিরেই রয়ে গেল দেশের সার্বিক পরিস্থিতি। যে হিন্দু মুসলমান জনগণ এতদিন একসাথে স্বাধীনতা যুদ্ধ চালিয়েছিল (১৯২০-২১) আবারও 'পাউরুটি' এবং 'মাংস'কে কেন্দ্র করে যে রাজনীতি সৃষ্টি করা হয়েছিল তার জের হিসেবে শুরু হয়েছিল ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, এই ধ্বংসযজ্ঞ ভারতের সার্বিক পরিস্থিতিকে একটা আঁধারের সাগরে নিমজ্জিত করেছিল। বৃটিশ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে শ্রেণী-সংগ্রামে রত শক্তিশালী শ্রমজীবীরা যাতে জাতীয় আন্দোলনের সাথে আঁতাত করতে না পারে সেজন্যে তাদের দূরে সরিয়ে রাখার উদ্যোগ নিয়েছিল।

গণ-অসহযোগ

১৯৩০-৩২-এর সংগ্রাম, তখনও সবার মনে জাগরুক ছিল। তারই প্রেক্ষাপটে এবং কিছুদিন পরে মহাত্মা গান্ধী যোগ দিতে গেলেন লন্ডন 'রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স' বা গোলটেবিল বৈঠকে ১৯৩১ সালে, এ সময় বল্গাহীনভাবে গণ-অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে সংগ্রামকারীদের প্রথম দফায় প্রায় ৯০,০০০ এবং দ্বিতীয় দফায় এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৮০,০০০-এ। ঠিক এ সময় কংগ্রেস হঠাৎ করে এ আন্দোলন বন্ধ করে দিল। কিন্তু সংগ্রামী জনতা কংগ্রেসের এ ডাক উপেক্ষা করে শেষতক স্বাধীনতার বিজয় ছিনিয়েই এনেছিল। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে মুসলমানদের জন্য এবং হিন্দুদের জন্য যথাক্রমেঃ পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান রাষ্ট্রদ্বয়ের অভ্যুদয় ঘটলো।

১৯৪২ সালের ঘটনাবলী দেখা যায়, শ্রমজীবী ও কৃষিজীবীদের শ্রেণী সংগ্রামের কথা যার জের এখনো শেষ হয়নি। এখনো তাঁদের শ্রেণী-সংগ্রামের নিষ্ঠুরতার কাহিনী সভ্যসমাজকে পীড়া দেয়। আশা করবো, এমন একটা সময় আসুক যখন শ্রেণী-সংগ্রামের সহিংসতা ভুলে আমরা একে অপরের প্রতি সহনশীল হয়ে সুখে কালাতিপাত করতে সক্ষম হবো। এছাড়া সংগ্রামের মাধ্যমেই যে আমরা স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছি ব্রটিশরাজকে আমাদের মাটি থেকে বিতাড়িত করে সে কথার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। এখন সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করবো এ স্বাধীনতার স্বাদ যেন সত্যিকার অর্থে অর্থবহ হয়।

* ভারতের দুটি 'ডমিনিয়ন' পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের উষালগ্নে এই নিবন্ধটি ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যায় ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়।

জাতীয় রাজনীতি (১৯৪৫-৭৫) সম্পর্কে ইংরেজী সাপ্তাহিক 'হলিডে'তে ২৬শে আগস্ট ১৯৮৮ প্রকাশিত একটি মূল্যায়ন ঃ

In quest of source of political soul

A book review by AFSAN CHOWDHURY

Jatiyo Rajniti (National Politics) **1945 to '75**

By Oli Ahad

Slowly but confidently autobiographies are lighting up the dark sky of our political memories. The number may not be too high right now but they have already gone beyond finger counting.

These autobiographies serve not just as source materials for studying our past but often defines the source of our political soul.

Oli Ahad is by any account one of the most controversial political leader and polemicists of our time. In fact it is his role as a gadfly and uncompromising critic of martial law that has over taken his identity as a purely party politician.

This if anything heightens his stature because at least he can go on record saying that he always put his money where his mouth was.

We surely do lack people who are willing to stand by and refuse to be tempted away from their beliefs, right or wrong.

In a straight forward and simple but highly caustic tone the 575 pages of the book rolls on. Oli Ahad has no desire to mince his words as he recounts and nor does he. Writing about "Gono Azadi League" which according to many was the first political outfit to oppose the concept of Pakistan outright, Oli Ahad remarks, "Sad to say Gono Azadi League could never become an organisation. Reasons are firstly, the callous inactive role, fear of jail and lack of any sense of sacrifice of its convenor Kamruddin Ahmed. Secondly, intense communal feeling sweeping the country at that time and thirdly, repression of the Muslim League government.

History is summarily dismissed in half a page.

In other words, the approach is that of an opinionated man who bothers little about what one says or thinks about him. This may sound strange but in an era where duplicity in both private and public life is so common the choleric but honest tone of Oli Ahad sounds almost refreshing.

What tires the reader a bit is of course the length and meandering form of the book. One finds little reason to justify sub-chapters on Lahore resolution and large quotes from it.

There is hardly a book of history which doesn't quote the document and Oli Ahad hasn't added any thing to our understanding of the (in) famous text which has shaped our history so much.

In fact Oli Ahad's succumbing to the temptation to go inch by inch over every major political events finds him ultimately guilty of poor editing. Oli Ahad is under the notion that all his memories are worth relating and that relating all of them is what makes a memoir, political or otherwise.

But an autobiography is not a history text book which this book sometimes sounds like.

Had he been aware of this position he could have looped off at least one third of the pages and included a few more anecdotes. But to cram many unnecessary facts into the book he had to be perfunctory more than once. This could have been avoided had he considered editing.

Another reason why he wrote as he did so could he that Oli Ahad found it impossible not to venture an opinion on every major historical event that over-took Bangladesh.

At least that is what it would seem after reading the sub-chapter on Round Table Conference of 1970 returning from which Mujib criticized all his political opponents. Oli Ahad criticizes Mujib for doing so but this is old hat and other than hearing him tick off Mujib we were none the wiser.

These statements shouldn't prevent the reader from relishing Oli Ahad recalling event after event, struggle after struggle. He provides corroboration of innumerable facts a number of times and more than once provides fresh evidence and insight on many political mysteries.

Even his opinions are original and because he is not trying to justify some act of his own past or prove a point they become "true" and therefore valuable.

This book without frills, a collection of memory and opinions is a major historical document because it helps us understand the political as well as emotional background of a major figure of rightist politics in Bangladesh who has won respect from all for his political sincerity and incorruptability even if that respect came grudgingly from some.

জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে সাপ্তাহিক 'হলিডে'তে প্রকাশিত একটি মূল্যায়নঃ

রাজনৈতিক আত্মার উৎসের সন্ধানে

আফসান চৌধুরী

ধীরে অথচ নিশ্চিত প্রত্যয়ে আত্মজীবনীমূলক লেখাগুলো আমাদের তমসাচ্ছন্ন রাজনৈতিক স্মৃতির আকাশ আলোকিত করে তুলছে। এর সংখ্যা এই মুহূর্তে খুব বেশী নয় হয়তোবা। কিন্তু অঙ্গুলী গণনাযোগ্য সংখ্যা অতিক্রম করে গিয়েছে।

এ সমস্ত আত্মজীবনী শুধুমাত্র অতীতকে জানার রসদই জোগায় না বরং আমাদের রাজনৈতিক আত্মার উৎসকে বিশ্লেষিত করে। অলি আহাদ যে কোন হিসেবেই আমাদের কালের অন্যতম বিতর্কিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং বিতর্কমূলক রাজনৈতিক বক্তব্যের জনক। প্রকৃতপক্ষে একজন নির্ভেজাল দলীয় রাজনীতিবিদের পরিচয়কে ছাপিয়ে সামরিক শাসন বিরোধী তার আপোসহীন ভূমিকা ও সমালোচনা তাঁকে স্বনামধন্য করেছে।

যদি কোন কিছু তাঁর ব্যক্তিত্বকে গৌরবোজ্জ্বল করে থাকে তা হচ্ছে তার সদা সাহসী স্পষ্টবাদিতা।

যারা সমস্ত প্রলোভনকে জয় করে স্বীয় বিশ্বাসে নিবেদিত তা ভুল বা নির্ভুল যাই হোক না কেন, আজকের দিনে নিশ্চিতভাবেই সেই চরিত্রের লোকের সংখ্যা বিরল।

সহজ, সরল, স্পষ্টবাদী অথচ খুবই ঝাঁঝালো স্বরগ্রামে বাঁধা ৫৭৫ পৃষ্ঠার এই বই একটি চলন্তিকা যেন। এ স্মৃতিচারণায় মোলায়েমভাবে কথা বলার বাসনা অলি আহাদের নেই। তা তিনি করেনও নি। গণ-আজাদী লীগের প্রসঙ্গে (যা অনেকের মতানুসারে পাকিস্তানের ধ্যান-ধারণা বিরোধী প্রথম সংস্থা ছিল) অলি আহাদ মন্তব্য করেন দুঃখের বিষয় গণ-আজাদী লীগ কখনই একটি সংগঠন হতে পারেনি। এর প্রধান কারণ ছিল; প্রথমতঃ এর আহবায়ক কামরুদ্দীন আহমদের উদাসীন ও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা, তাঁর জেলভীতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার অভাব। দ্বিতীয়তঃ দেশব্যাপী বিরাজমান তীব্র সাম্প্রদায়িক মানসিকতা। তৃতীয়তাঃ মুসলিম লীগ সরকারের দমননীতি। আধ পৃষ্ঠায় এ ইতিহাসের সমাপ্তি।

অন্য কথায় বলা যায়, তাঁর দৃষ্টিকোণ হচ্ছে একজন একগুঁয়ে ব্যক্তির, যিনি লোকে কি বলবে বা ভাববে তার তোয়াক্কা করেন না। অদ্ভুত মনে হতে পারে। এ যুগে যখন ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে দ্বিচারণাই সার্বজনীন তখন অলি আহাদের ক্রুদ্ধ ও সত্যনিষ্ঠ আওয়াজ বহুলাংশে প্রেরণাদায়ক।

অবশ্যই বইটির সুদীর্ঘ পরিক্রমা পাঠকের মনে ক্লান্তি এনে দেয়। লাহোর প্রস্তাবের উপ-অধ্যায়সমূহের বিশাল উদ্ধৃতিগুলোর যৌক্তিকতা খুব সামান্যই। দলিলের উদ্ধৃতি ছাড়া ইতিহাস লেখা হয় না। অলি আহাদ তা দিয়েছেন।

কিন্তু এই (কু) সুবিখ্যাত দলিলটি যা আমাদের ইতিহাসকে এতটা রূপ দিয়েছে তার অধিকতর অনুধাবনে অলি আহাদ নতুন কিছু সংযোজন করেন নি।

প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি প্রধান রাজনৈতিক ঘটনার মধ্য দিয়ে মন্থর গতিতে পরিক্রম করার প্রলোভন অলি আহাদের বইটির সম্পাদনাকে দুর্বল করে দিয়েছে। অলি আহাদের ধারণা, সব স্মৃতিই বর্ণনাযোগ্য আর সমস্ত বর্ণনা দিয়েই রাজনৈতিক বা অন্য কোন স্মৃতি কথামালা গাঁথা। কিন্তু আত্মকথা প্রামাণিক ইতিহাস হতে পারে না যা রচনা করার প্রয়াস মাঝে মধ্যে এ বইটিতে করা হয়েছে।

উপরোক্ত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন থাকলে তিনি অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ বাদ দিয়ে আরো কিছু উপাখ্যান এতে সংযোজন করতে পারতেন। কিন্তু বহু অপ্রয়োজনীয় অংশ বইটিতে ঠেসে দিয়ে লেখককে একাধিকবার ছন্নছাড়া (দায়সাড়া সম্পাদক) হতে হয়েছে। সম্পাদনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলে উপরোক্ত ত্রুটি এড়ানো যেতো।

অলি আহাদ যেভাবে লিখেছেন তার আর একটি কারণ হতে পারে, যে সমস্ত প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা বাংলাদেশে ঘটেছিল সেগুলো সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অন্ততঃ ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফিরে গিয়ে মুজিব উক্ত বৈঠকে যোগদানকারী সমস্ত রাজনীতিবিদদের সমালোচনা করেছিলেন। অলি আহাদ এ প্রসঙ্গে মুজিবের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এ-তো চর্বিতচর্বন! এতে করে মুজিব বিরোধী নতুন কোন জ্ঞান আমরা পাইনি।

এই বিবৃতিগুলো অলি আহাদের ঘটনার পর ঘটনা এবং সংগ্রামের পর সংগ্রামের স্মৃতিচারণকে উপভোগ করা থেকে পাঠককে নিবৃত করে না। তিনি অসংখ্য ঘটনার সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন এবং একাধিক রাজনৈতিক রহস্যের তাজা প্রমাণ যুগিয়েছেন ও অন্তর্দৃষ্টিপাত করেছেন।

এমনকি তাঁর মতামতসমূহও মৌলিক। এবং যেহেতু তিনি তার অতীতের কোন কাজকে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রমাণ বা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেননি, সেগুলো "সত্য" বলে সপ্রমাণিত এবং এ জন্যই সেগুলো মূল্যবান।

বহু স্মৃতিকথা ও অভিমতের সমন্বয়ে অলঙ্কার বিবর্জিত এই বইটি একটি প্রধান ঐতিহাসিক দলিল। কারণ, এটি আমাদেরকে বাংলাদেশের এমন একজন দক্ষিণ-পন্থী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের রাজনৈতিক ও আবেগিক পটভূমি বুঝতে সাহায্য করে যিনি তাঁর রাজনৈতিক সততা ও দুর্নীতিমুক্ত চরিত্রের জন্য সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন, যদিও কারো কারো কাছ থেকে এসেছে ঈর্ষামিশ্রিত শ্রদ্ধা।

সেদিনের একুশ
ডঃ আনিসুজ্জামান

আমাদের কালের অনেকের জীবনের গৌরব এই যে, তাঁরা একই সঙ্গে বাংলাদেশের ইতিহাসের দুই মহৎ ঘটনার ১৯৫২-সালের রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন ও ১৯৭১ সালের

মুক্তিযুদ্ধেরসাক্ষী এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তার অংশীদার এসবই সৌভাগ্যবানদের আমিও একজন। হঠাৎ কখনো কখনো এসব দিনের অভিজ্ঞতা স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে, আনমনা করে দেয়। আবার এও বুঝি, কালের ব্যবধানে কিছু স্মৃতি হারিয়ে যায়। কিছু তারিখের গোলমাল হয়। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ মুহূর্তের ভূমিকা। অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। তবু যেটুকু মনে পড়ে, সেটুকু প্রতিভাত হয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয় বলে।

১৯৫১ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে আমি জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হই। এর অল্পকাল পরে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগে যোগদান করি। ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে, মূলত অলি আহাদের উদ্যোগেই, যুবলীগের অফিস সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করি।

উর্দু একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে, এই মর্মে পল্টন ময়দানে ৩০ জানুয়ারী খাজা নাজিমুদ্দিনের বক্তৃতার পর জগন্নাথ কলেজে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদের সঙ্গে আমি প্রত্যক্ষআবে জড়িত ছিলাম না, যদিও পরিষদের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছি। ৪ ফেব্রুয়ারী ও ১১ ফেব্রুয়ারীর প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে স্থানীয় স্কুল-কলেজে ধর্মঘট আয়োজন করা এবং ভাষা আন্দোলনের পতাকা বিক্রি করা এসব কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সহপাঠিদের সঙ্গে ট্রেনে ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জের পথে এবং ফিরতি পথে পতাকা বিক্রি করেছি। পোগোজ স্কুল, সেন্ট গ্রেগরীজ স্কুলে ধর্মঘট করাতে গিয়েছি। পুলিশ এসে পড়ায় সেন্ট গ্রেগরীজ স্কুলের গেটে অবস্থানরত আমরা দুজন সরে পড়তে বাধ্য হই।

আমরা মূলত যুবলীগের উদ্যোগে আন্দোলন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। যুবলীগের সকল ইউনিটকে কেন্দ্রীয় নির্দেশ লিখে জানাবার দায়িত্ব ছিল আমার।

আমার যতদূর মনে পড়ে, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে একটি পুস্তিকা রচনার ভার মোহাম্মদ তোয়াহাকে দেয়া হয়েছিল। এমনও হতে পারে যে, যুবলীগই এই দায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করেছিল; তবে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ থেকে তাঁর পুস্তিকা বের হবে, এমন ধারণাই আমার জন্মেছিল। তোয়াহা সাহেব লিখতে দেরি করছিলেন। তখন অলি আহাদ আমাকে যথাশীঘ্র সম্ভব একটি পুস্তিকা লিখতে বলেন। আমি লিখে দিলে অলি আহাদ তা সংশোধন করে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের নামে মুদ্রণ ও প্রচার করেন। পুস্তিকাটির নাম ছিলঃ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। সাব-টাইটেল ছিলঃ কি ও কেন?

পুস্তিকায় লেখক হিসাবে কারো নাম ছিল না। এটাই সম্ভবত ফেব্রুয়ারী মাসে ছাপা ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কিত প্রথম পুস্তিকা। এরপর সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের পুস্তিকা বেরিয়েছিলঃ আমারটার চেয়ে আরেকটু বড় ও ভালো হয়েছিল। সেটি লিখেছিলেন বদরুদ্দীন উমর।

২০ ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা জারি হওয়ার পরে রাতে আওয়ামী লীগের নবাবপুর অফিসে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের যে সভা হয় তাতে জগন্নাথ কলেজ সংগ্রাম পরিষদের নাম করে পর্যবেক্ষক হিসেবে সৈয়দ আহমদ হোসেন ও আমি উপস্থিত ছিলাম। তখনই আমাদের মনে হয়েছিল সভায় যদি ১৪৪ ধারা না ভাঙার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তা কেউ মেনে নেবে না। ২১ ফেব্রুয়ারী সকালে আমাদের বাসা থেকে আমরা কয়েক বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে রওনা হয়েছিলাম থমথমে আবহাওয়ার মধ্যে। আমার মা ও বোন সকলকে পরটা-ডিম খাইয়ে দিয়েছিলাম। মা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, পুলিশ আমাদের ধরে নিয়ে গেলে তাদের কি করণীয় হবে।

মোটামুটি ১৪৪ ধারা বাঁচিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে যে সংখ্যক ছাত্র প্রবেশ করছিল, তাতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে, ১৪৪ ধারা ভাঙবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী দশজনের এক-একটি দল বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট দিয়ে রাস্তায় বের হতে শুরু করে। আমার যতদূর মনে পড়ে, প্রথম দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান শেলী এখন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি। আমার সহপাঠি ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেয়ামল বাসির ও আমীর আলী সম্ভবত দ্বিতীয় ছিল। হাসান হাফিজুর রহমান স্মৃতিভ্রমবশত লিখেছেন যে, ২১ ফেব্রুয়ারীতে গুলি চালনার পর তিনি যখন প্রচারপত্র ছাপতে যান, তখন আমীর আলী তাঁর সঙ্গে ছিল।

প্রথম দল বেরিয়ে যাওয়ার পর অলি আহাদ মধুর দোকানের সামনে আমাকে ডেকে নিয়ে যুবলীগ অফিসের চাবি দিয়ে বলেন যে, যে কোনো মুহূর্তে তাঁরা গ্রেফতার হয়ে যেতে পারেন। অফিসের দায়িত্ব আমার থাকবে। অবস্থা বুঝে অফিসের কাগজপত্র সরিয়ে নিতে হবে এবং সকল ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। যুবলীগের যুগ্ম-সম্পাদক ইমদাদুল্লাহকে বাইরে রাখার চেষ্ঠা করা হবে। তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে আমি যেন কাজ করি। এই দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে বলে আমি যেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করি। আমি তার কথা অনুযায়ী কাজ করছিলাম।

১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী দল ক্রমশ বাড়তে থাকে। পুলিশ কলাভবনের গেটের সামনে মৃদু লাঠি চালনা করে। তারপর কাঁদানে গ্যাস। ছাত্ররা ইট-পাটকেল মারতে থাকে পুলিশের দিকে। এ বিষয়ে নেতাদের নিষেধ তারা মানেনি। এক পর্যায়ে ভাইস-চ্যান্সেলর ডক্টর সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেনকে কলাভবনের বারান্দায় দেখি। তাঁকে দেখে বেশ কিছু ছাত্র দৌড়ে যায় এবং তাঁকে পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে বলে। আমি তখন গা থেকে গেঞ্জি খুলে পুকুরে তা ভিজিয়ে নিচ্ছিলাম চোখে পানি দেয়ার জন্য। আমি অন্য ছাত্রদের পিছু পিছু তাঁর দিকে গিয়েছিলাম। ভাইস-চ্যান্সেলর বলেছিলেন যে, পুলিশ তাঁর কথা শোনেননি এবং তিনি প্রতিবাদ করবেন।

মধুর দোকানের পাশের রেলিং টপকে ততক্ষনে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে সবাই সমবেত হতে শুরু করেছিল। সেখান থেকেও পুলিশের দিকে কিছু ইট ছোঁড়া হয়। তারপর হাসপাতালের পশ্চিম দিকের রেলিং পেরিয়ে মেডিকেল কলেজের হোস্টেল প্রাঙ্গণে সকলে জড়ো হয়। হোস্টেলের গেট দিয়ে রাস্তায় বের হওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ লাঠি চালায়

এবং হোস্টেলের মধ্যে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। গ্যাসের টিউব পায়ে এসে পড়ায় বছর দশেকের একটি ছেলে আহত হয়। আমরা জনতিনেক মিলে তাকে ধরে রেলিংয়ের উপর অন্যদের হাতে তুলে দিই-হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

হোস্টেলের প্রাঙ্গণে যাঁদেরকে দেখেছিলাম, তাঁদের মধ্যে ইমাদুল্লাহ, আলাউদ্দিন আল আজাদ, হাসান হাফিজুর রহমান ও মুর্তজা বশীরও ছিলেন। এক সময়ে আলাউদ্দিন আল আজাদ আমাকে বলেন, গুলি চালাতে পারে। তার মিনিট পনেরো পরই গুলি চলে। গুলিতে আহত একজনকে মুর্তজা বশীর ধরেছিলেন, সে কথা পরে তিনি আমাকে বলেন।

গুলি চলার পর পরই আমরা শুনতে পাই যে, আবুল বরকত, সালাম ও রফিকউদ্দিন নামে তিনজন ছাত্র মারা গেছে। এই সালামকে আমরা মেডিক্যাল কলেজের নেতৃস্থানীয় ছাত্র (এখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক) সালাম বলে ধরে নিয়েছিলাম। পরে জানা যায় যে, তিনি মারা যাননি। গুলিবর্ষণের পরে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের একটি ঘরে মাইক্রোফোন বসানো হয়। যিনি পারছিলেন তিনিই বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। আমাকে একটা বক্তৃতা লিখে দিতে বলা হয়। কিন্তু বলার গতির সঙ্গে লেখার গতি তাল রাখতে পারছিল না। ফলে আমাকে মাইক্রোফোন নিতে বলা হয়। আমি পুলিশদের উদ্দেশ্যে একটি বক্তৃতা দিই; পুলিশ ধর্মঘটের সময়ে সরকার তাদের ওপর যে নির্যাতন চালায় তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বাঙালী হিসাবে তাদেরকে আন্দোলনের সঙ্গে সহমর্মিতা প্রকাশ করতে বলি। আমি অল্পক্ষণ বলেছিলাম। তোয়াহা সাহেবও সেখান থেকে বক্তৃতা করেন। গুলি চালানোর সংবাদ পেয়ে বেতারকর্মীরা যে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সে কথাও আমি মাইকে ঘোষনা করি আরেক দফায়। পরে মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ পরিষদ থেকে বেরিয়ে এখানে এসে বক্তৃতা দেন।

পরে সন্ধ্যার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনে রেল লাইন ধরে আমি বাসায় ফিরে আসি।

২২ তারিখে আমার মামাতো ভাই সৈয়দ কামরুজ্জামানের সাইকেলে চেপে আমি বিশেষ করে নেয়ামল বাসিরের জামিন নেওয়ার উদ্দেশ্যে মাহুতটুলীতে সৈয়দ আবদুর রহিম মোক্তারের কাছে যাই। উনি ততক্ষণে কোর্টে চলে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ কোর্টে ঘোরাফেরা করে কাউকে না পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে আসি। ইতিমধ্যে অনেকগুলো মিছিল বেরিয়েছিল। ফেরার পথে নবাবপুরে গুলিচালনার খবর পাই। একটা ল্যাম্পপোস্টে গুলির দাগ সকলে মিলে দেখছিলাম। সংবাদ অফিস আক্রান্ত হচ্ছে, তা দূর থেকে দেখি। হাইকোর্টের সামনে গুলি চলেছে জেনে ওখান থেকেই ফিরে আসি।

২৩ তারিখে আব্বার গাড়িতে (ডাক্তার লেখা) করে লক্ষ্মীবাজারের একটা দোকান থেকে মাইক্রোফোন ভাড়া করে জগন্নাথ কলেজে নিয়ে যাই। কলেজের হোস্টেলের একটি ঘরে তা স্থাপন করে সেখান থেকে বক্তৃতা দেওয়া হয়। আমি কিছুক্ষন বলেছিলাম। তারপর ওই উদ্যোগের সঙ্গে আর আমার যোগ ছিল না। সম্ভবত ২৫ তারিখে পুলিশ হোস্টেলে ঢুকে মাইক নিয়ে চলে যায়।

প্রথম শহীদ মিনার নির্মাণের (২৩ ফেব্রুয়ারী) সময়ে আমি অল্পক্ষণ উপস্থিত ছিলাম। পরদিন আবুল কালাম শামসুদ্দিন তা উদ্বোধন করেছিলেন বলে মনে পড়ে। মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ ছোট্ট বক্তৃতা দিয়ে মোনাজাত করেছিলেন। আমার আব্বা ও মা রিকশায়

করে শহীদ মিনারে গিয়েছিলেন বিকেলে। সকলেই শহীদ মিনারে টাকা পয়সা দান করছিলেন। মা সৈয়দা খাতুন একটি সোনার চেন দেন। চেনটা ছিল আমার মৃত একটি ছোট বোনের। তার স্মৃতি হিসাবে মা এটি রক্ষা করেছিলেন। মুর্তজা বশীরের একটি কবিতায় এই সোনার হারটির কথা আছে। মা এটা যে মিনারে দিয়ে আসবেন, তা আমরা কেউ জানতাম না। উনি দিয়ে এসে আমাদের বলেছিলেন।

নেতাদের নামে হুলিয়া বেরিয়ে যাওয়ায় ইতিমধ্যে তাঁরা খানিকটা আত্মগোপন করেছিলেন। শহীদ মিনার পুলিশ যখন ভেঙে দেয়, তখন হাসপাতালের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমরা। আমার মনে পড়ে, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ইমাদুল্লাহ 'ক্যামেরা ক্যামেরা' বলে চিৎকার করছিলেন, বলছিলেন, 'ওরা মিনার ভাঙছে কেউ একটা ছবি তুলে রাখো।'

বাংলা বিভাগের রফিকুল ইসলাম বোধ হয় মাথার খুলি উড়ে যাওয়া রফিক উদ্দিনের ছবি তুলেছিলেন। সেটা ছাপিয়ে বিলি করা হয়েছিল। ২৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে সামগ্রিক ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়েছিল। ওই আহ্বান জানিয়ে আমি একটা প্রচারপত্র তৈরী করি। পাকিস্তান বুক ডিপোর মালিকের ছেলে মাখন (বদরুদ্দীন আহমদ, এডভোকেট) তাঁদের প্রেসে সেটা ছেপে দিয়েছিলেন। এই যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন জগন্নাথ কলেজে আমাদের সিনিয়র ছাত্র আনোয়ার হোসেন (তাঁর বাবা খন্দকার আহমদ হোসেন চীফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, রাজনীতিবিদ দেওয়ান মাহবুব আলী পরে আনুর বোনকে বিয়ে করেন।) ইশতেহার ইত্যাদি অনেকে লিখতেন এবং প্রচার করতেন। মেডিক্যাল কলেজ, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, জগন্নাথ কলেজ এসব সংগ্রাম পরিষদ থেকে স্থানীয়ভাবেও প্রচারপত্র বের হতো।

২২ বা ২৩ ফেব্রুয়ারীতে ইমাদুল্লাহ আর আমি যুবলীগ থেকে কিছু দরকারি কাগজপত্র আর টাইপরাইটারটা আমাদের বাসায় (৮৭ বামাচরণ চক্রবর্তী রোডে) নিয়ে আসি। পরে যুবলীগ অফিস পুলিশ সীল করে দেয়। কিন্তু ইউনিটগুলোর ঠিকানা আমাদের কাছে থাকায় আমরা কিছু চিঠিপত্র পাঠাতে সমর্থ হই। সেসব চিঠিপত্র ইমাদুল্লাহ সই করেন।

বোধহয় ২৫/২৬ তারিখে অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল মতিন ও ভাষা আন্দোলনের অন্যান্য নেতার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি কাগজে বেরিয়ে আসে। তাঁরা আত্মগোপন করেন। অলি আহাদের ভাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক, ডঃ আবদুল করিম আমার বাসায় এসে খবর দেন যে, অলি আহাদ আত্মগোপন করেছেন। তবে চিরকুটে কেউ বিশেষ একটা শব্দ লিখে আনলে আমাকে বুঝতে হবে যে, অলি আহাদ তাকে পাঠিয়েছিলেন। আমি প্রথম বার্তা পাই চিকিৎসক ডাঃ এম, এ. করিমের মাধ্যমে। তিনি এককালে জগন্নাথ কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ছিলেন, তখন যুবলীগে ছিলেন, পরে কিশোর মেডিক্যাল হল নামে নবাবপুরে একটি ফার্মেসী প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভাসানী ন্যাপে সক্রিয় হন। এই বার্তায় কিংবা তার পরে আরেকটি বার্তায় নির্দেশ ছিল একজনের সঙ্গে যাওয়ার জন্য। তিনি আমার এক ক্লাশ উপরে পড়তেন বোধ হয়। যাই হোক, তার সঙ্গে সন্ধ্যায় র‍্যানকিন স্ট্রীটের উল্টোদিকে ভূতের গলিতে একটা বাসায় যাই। অলি আহাদ সেখানে ছিলেন। তনি আমাকে বলেন, শান্তিনগরে ডাক্তার মোতালেবের বাসায় তাকে পৌঁছে দিতে হবে। সে বাসা আমি চিনতাম তা তিনি কোনোভাবে জেনেছিলেন। ডাক্তার মোতালেবের অনুজ

আবদুল মালেকের সঙ্গে আমার এক সময়ে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল-তিনি এককালে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট দলে সক্রিয় ছিলেন। আমি রিকশায় করে অলি আহাদকে সেখানে পৌঁছে দিই। তখন জেনেছিলাম যে, ভাষা-আন্দোলনের নেতারা সেখানে বৈঠকে বসবেন। আমি যেহেতু সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলাম না, সেহেতু ওই বৈঠকে আমার উপস্থিত থাকবার কোনো প্রশ্নই উঠেনা। অলি আহাদকে পৌঁছে দিয়েই আমি চলে আসি। পরে কাজী গোলাম মাহবুব ছাড়া সভার আর সকলেই সেখানে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। মাহবুব সাহেব পুলিশ আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মাচায় উঠে লুকিয়ে থাকেন। পরবর্তীকালে তিনি আত্মসমর্পন করেন। আন্দোলনের নেতারা সকলে বন্দী হয়ে পড়েন।

ভাষা আন্দোলনের প্রবাহে এভাবে ভাটা পড়ে। ২২ ও ২৩ তারিখে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল হয়েছিল। ২৪ তারিখ রোববার ছিল। ২৫-এর হরতাল সফল হয়নি। ২৬ তারিখ অনেকে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তারপর নেতৃত্বের মধ্যে যোগাযোগের অভাব ঘটে। দমননীতির জন্য কর্মসূচীও ঠিকমত উপস্থিত করায় বিঘ্ন ঘটে। ফেব্রুয়ারী মাস শেষ হওয়ার আগেই আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়ে। আমার শুধু এইটুকু মনে পড়ে যে, বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদের সংগ্রামী ভূমিকা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রবীণ নেতারা সবটা অনুমোদন করেননি। তাছাড়া, আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, ২১ ফেব্রুয়ারীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সভায় যদি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ১৪৪ ধারা না ভাঙার সিদ্ধান্ত উপেক্ষিত হয়, ফলে পরিষদ আপনিই ভেঙে যাবে।

সাধারণ ছাত্র-যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল তারা মার্চের মাঝামাঝি সকলেই ছাড়া পেয়ে যায়। কিন্তু নেতাদের বহুদিন আটকে রাখা হয়েছিল। তবে একুশের চৈতন্য ততদিনে ব্যাপ্ত হয়েছিল দেশময়।

তারপরও খুব অর্থবহভাবে একুশে ফেব্রুয়ারী এসেছে আমাদের জীবনে। ১৯৫৫ সালে ৯২-ক ধারার আমলে একুশে ফেব্রুয়ারী পালনের বিষয়টিও ছিল প্রথম একুশের ঘটনার মতোই দুঃসাহসিক অভিযানের মতো। ১৯৫৭ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী ছিল বিজয়োৎসবের মতো - কারণ সদ্য বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়েছে সংবিধানে। স্বাধীন বাংলাদেশে একুশে ফেব্রুয়ারী উদযাপনের অনুভূতি খুবই ভিন্নরকম ছিল ১৯৭২ সালে। আর এই শহীদ মিনার আবার ভাঙলো, আবার গড়ে উঠলো এবং চিরকাল রয়ে গেলো আমাদের সকলের মিলনক্ষেত্র হয়ে। কিন্তু সেসব কথা আজ নয়।

* ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচারণমূলক এই লেখাটি'৯৫ এর ২১ শে ফেব্রুয়ারী দৈনিক ভোরের কাগজে ছাপা হয়।

* উপরোক্ত প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হাবিবুর রহমান শেলী ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রথম দলের নেতৃত্ব দিয়াছেন বলিয়া যে উল্লেখ আছে তাহা সঠিক নয়। প্রকৃত ঘটনা ছিল, মেডিকেল কলেজ ছাত্র আজমল হোসেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রথম দলের নেতৃত্ব দেন।-অলি আহাদ।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভাঙার প্রস্তুতি চলছে

ভাষা আন্দোলনের শহীদরা

[বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে ভাষা শহীদদের সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। আমারও শহীদদের প্রকৃত সংখ্যা জানা নেই।]

অলি আহাদকে, একজন কবির শ্রদ্ধা

উনিশশো সাতচল্লিশ সালের কিছু কিছু ঘটনার কথা এখনো আমার বিস্ময়কর ভাবে মনে আছে। আটচল্লিশ সালেরও। তখন আমি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র। আটচল্লিশ সালে আমি নবম শ্রেণীতে পড়ি। এক বিস্ময় আর মুগ্ধতার জগতে তখন আমার বসবাস। যেমনটি পৃথিবীর সকল কিশোর আর বালকের জীবনে হয়ে থাকে। ঢাকা তখন অতি ক্ষুদ্র একটি মফঃস্বল শহর মাত্র। দেড় লক্ষ থেকে দু'লক্ষ লোক ঢাকা শহরের বাসিন্দা। দোলাইখাল তখন আমাদের কাছে একটি অন্তরঙ্গ ছোট্ট নদীর মতো রক্ত কণিকায় বহমান আর বুড়িগঙ্গা বিশাল আকাশের এক একান্ত প্রতিনিধি। বুড়িগঙ্গার ওপারে যে গ্রাম-সেই গ্রামের শ্যামল গাছপালা আর সবুজ অবারিত মাঠে মিশে আছে গগণের আশ্চর্য ললাটে। আমরা তখন স্বপ্নহীন ছিলাম না আশাহীন ছিলাম না এবং নিশ্চিত ভাবেই ভবিষ্যৎ বিহীনও ছিলাম না।

সেই সময়কার কিছু কিছু ঘটনা আমার, আগেই বলেছি, আশ্চর্যভাবে এখনো মনে আছে। তার একটির অকুস্থল ঢাকার রমনা রেসকোর্স। আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সাহেব তখন ঢাকায় এসেছিলেন। সেই একবার, প্রথম বার এবং শেষবার। ১৯শে মার্চ তিনি ঢাকা এসেছিলেন। আর ঢাকা রেসকোর্সে বক্তৃতা দিয়েছিলেন ২১ মার্চ। এই দিন ক্ষণের হিসেব আমার মনে থাকার কথা নয়। এগুলো আমার এখনকার সংগ্রহ। আমি ২১ মার্চের সেই ঐতিহাসিক সভায় উপস্থিত ছিলাম। জিন্নাহ সাহেবকে দেখতে সেই সময় সেই রেসকোর্সে প্রায় তিন লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটেছিলো। আমার জীবনে এতো বড় জনসমুদ্র সেই আমার প্রথম দেখা। সেই সময় কেমন ক'রে যেন আমি পুরানা ঢাকার দক্ষিণ মৈশন্ডি এলাকা থেকে হেটে হেটে রেসকোর্স পর্যন্ত পৌছেছিলাম। এখন তা আমার মনে নেই। তবে আমি যে আমার কলেজে পড়া এক মামার সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম সব সময় সেটা বলতে পাড়ি। মামা ব'লেছিলেন এমন মিটিং দেখার সুযোগ আর হবে না কোনোদিন। আমার মামার কথার মধ্যে সম্ভবতঃ একটি অন্তর্গত সত্য নিহিত ছিলো- যা ইতিহাসের ক্রম পরিক্রমায় এখন প্রমাণিত হয়েছে।

ফিরে আসি আমার কৈশোরের সেই রেসকোর্সে।

আমি আমার মামা এবং আরো যেন কে কে- সর্বমোট চারজন ছিলাম আমরা।
কেমন করে যেন মামা আমাদেরকে মঞ্চের সামনা সামনি নিয়ে এসেছিলেন।
বলেছিলেন এখান থেকে জিন্নাহ্ সাহেবকে স্পষ্ট দেখা যাবে।
এবং কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্কে সেদিন মঞ্চের অপরাহ্নের আলোতে

আমরা সত্যি স্পষ্ট দেখেছিলাম। তার ভগ্নী মিস ফাতেমা জিন্নাহকেও।

সেদিন শুধু শুনেছিলাম, দেখেছিলাম এবং প্রত্যক্ষ করেছিলাম। বুঝিনি। জানিনি।

এখন বুঝি এবং জানিও।

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সেইদিন ঢাকার রেসকোর্স মাঠে তার সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতায় নিজেই বপন ক'রেছিলেন পাকিস্তানের ধ্বংসবীজ। জানিনা কার পরামর্শে কোন সে ব্রীফিং এর কারণে তার এমন ধারণা জন্মেছিলো যে উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিৎ। কী সে মহৎ স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন সেদিন যার কারণে তিনি প্রায় তিন লক্ষাধিক বাঙালীর সামনে মঞ্চ থেকে উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন, উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে অন্য কোনো ভাষাই হতে পারবে না, বলতে পেরেছিলেন, Urdu and Urdu alone shall be the state language of Pakistan –no other language can be কায়েদে আজম এমন একটি ঐতিহাসিক জনসভাকে কেন যে বাঙালীদের সামনে এই অসম্ভব একটি উচ্চারণ করার যথোপযুক্ত স্থান ভেবেছিলেন তা আজো আমার বোধের অগম্য রয়ে গেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র সাত মাসের মাথায় কেন যে তিনি তার ধ্বংসবীজের প্রথম শস্যকণাটি নিজেই রোপন ক'রে গিয়েছিলেন বাংলার মাটিতে তা এখনো আমার কাছে এক পরম বিস্ময়।

মঞ্চের সামনে বেশ অনেকটা জায়গা শূন্য ছিলো। সম্ভবতঃ সিকিউরিটির কারণে। যেমনটি এ ধরনের সভায় হয়ে থাকে। তারপরই ছিলো জনমানুষের স্থান।

আমরা সেখানেই ছিলাম। বসেছিলাম প্রায় সামনের সারিতে।

তখনকার ঢাকা শহরের যত বাসিন্দা তার প্রায় দ্বিগুণ বাঙালীর এক অচিন্তনীয় মহাসমুদ্র সেদিন প্রায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে মুগ্ধতার এক বর্ণাঢ্য আবীর মেখে চোখে শুনছিলো জিন্নাহ্ সাহেবের ইংরেজী ভাষার বক্তৃতা। এতো যে মানুষ ছুটে এসেছে এই বাংলার অসংখ্য প্রান্তদেশ থেকে তাদের আসল পরিচয় কী জানতেন জিন্নাহ সাহেব? তারা তো শুধু মুসলমান ছিলোনা বাঙালীও ছিলো এবং পাকিস্তান নামক একটি নতুন রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার জন্যে তারা তো কোথাও এমন কোনো অঙ্গীকার করেনি যে তারা তাদের বাঙালী পরিচয়কে পরিত্যাগ করবে চিরদিনের জন্যে- তাদের মুখের ভাষাকে বিসর্জন দেবে সকল আগামীকালের সমাজ সংস্কৃতি ধর্ম প্রাত্যহিক জীবন কিংবা রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল কর্মকান্ড থেকে। তাহলে জিন্নাহ সাহেব কেন এমন উচ্চারণ করলেন বাঙালীদের সামনে এদেশে তার প্রথম জনসভায়।

আমার মামা সত্যি বলেছিলেন এমন জনসভা সারাজীবনে আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না।

জিন্নাহ সাহেবের সেই দিনের সেই উচ্চারণ সেদিন শুনেছিলো বাঙালীরা।

স্তম্ভিত হয়েছিলো কিন্তু স্তব্ধ হয়নি।

সেই বিশাল জনসমুদ্রের এক প্রান্ত থেকে কারা যেন প্রথম পাল্টা উচ্চারণ ক'রে উঠলো শেম শেম শেম শেম। অসংখ্য অগ্নিকণার মতো সেই শেম শেম ধ্বনি নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো সারা রেসকোর্স জুড়ে। মিনিট দুই এর কম সময় নয় সেই লজ্জা লজ্জা শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল রমনার বিশাল বটগাছে পাতার মর্মরে ঘাসের শুকনো শরীরে। মনে হল সারা পূর্ব বাংলা যেন সমবেত এক ধিক্কারে উচ্চারণ করছে হায় একি লজ্জা এই নতুন স্বাধীনতারঃ আমার মায়ের কণ্ঠে শানিত অস্ত্র চালাবার একি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এই নতুন

আজাদীর?

একটু আগে আব্বাসউদ্দিনের কণ্ঠে কবি গোলাম মোস্তফার গানে মুখরিত ছিলো এই রমনার মাঠ-এই রেসকোর্সের ময়দান।

হঠাৎ একি হল! এ কোন পতনধ্বনি নামলো পূবের বাংলা জুড়ে!

এই যে সেদিনের কথাগুলো লিখলাম এতোদিন পরে। সে সময় কিন্তু ঠিক এমনি ক'রে আমি মোটেই ভাবতে পারিনি। তবে আমার মধ্যে একটি ভীষণ খারাপ লাগা যে কাজ করছিলো তখন সেটা বলতে পারি। হলফ ক'রে বলতে পারি। এবং আমার মতো সবারই খারাপ লাগছিলো। সেই মাঠের সবার।

জিন্নাহ সাহেবকে মাইকের সামনে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম।

জনসমুদ্রের এই আকস্মিক বিস্ফোরণের জন্যে জিন্নাহ সাহেব নিশ্চয়ই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি কেমন যেন হয়ে গেলেন হঠাৎ। তার স্বতঃস্ফূর্ত ইংরেজী বক্তৃতায় হঠাৎ ক'রেই যতি নামলো। সামান্য বিরতি! তারপর পুনরায় কম্পোজড হলেন তিনি। তিনি পরিস্কার উর্দ্দূতে বললেন, অদ্ভুত এক কমান্ডিং কণ্ঠে- খামোশ রহো অওর আপ্না আপ্না জাগাপে বয়ঠো। তিনি আবার ফিরে গেলেন ইংরেজীতে। এবং অল্প ক্ষণের মধ্যেই সভা সমাপ্ত হল।

আমার মামা শুধু বললেন, কাজটা ভালো হল না। মাতৃভাষার উপর আক্রমণ কেউ মেনে নেবে না। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বাধবেই। আজকের মাঠই তো তার প্রমাণ। আজকের এই বিস্ফোরণের যে-ই শুরু করুক না কেন একটা সাহসের সূচনা করেছে সে। একটি নতুন জিজ্ঞাসার নতুন অনুধাবনের।

বহুদিন পরে আমরা জেনেছি, অন্তত আমি জেনেছি সেই বিস্ফোরণের অন্যতম নেতৃত্বে ছিলেন অলি আহাদ। যাকে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের দুইবার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন "অলি আহাদ আমাদের রাজনীতিতে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। নীতির প্রশ্নে তিনি কখনো আপোষ করেন নি। প্রলোভন কখনও তাকে বশীভূত করেনি। বলা যায় তিনি আজ জাতির বিবেকে পরিণত হয়েছেন।"

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় আমি ঢাকার জগন্নাথ কলেজে পড়ি। তখন আমি রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলাম না, এবং এখনো নেই, তবু ভাষা আন্দোলন আমাকে কেমন ক'রে যেন জড়িয়ে ধরেছিলো। এবং সেই সময় আমি প্রথম অলি আহাদের নাম শুনি। ক্রমে জানতে পারি অলি আহাদ সেই ব্যক্তি যিনি ভাষা আন্দোলনের নেপথ্যের প্রধান চালিকা শক্তির সবচেয়ে বড় প্রেরনা ছিলেন।

অলি আহাদ সাহেবের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আলাপ আরও অনেক অনেক পরে। তবে তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা কখনো হয়নি। আসলে রাজনৈতিক বিশাল ব্যক্তিত্ব যারা তাদের কারো সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতার কোনো সুযোগই তখন ছিলো না- আর এ সম্পর্কে আমি তেমন উৎসাহীও ছিলাম না। যদিও আমার জীবনের একটা বড় অংশই আমি কাটিয়েছি সাংবাদিকতার পেশায়। এসব সত্ত্বেও বায়ান্ন সালের পর থেকেই আমি অলি আহাদ-এই নামের যে মানুষটি তার জন্যে একটা গোপন শ্রদ্ধা সব সময়েই পোষণ ক'রে আসছি। তাঁর সম্পর্কে অনেক গল্পও শুনেছি-সপক্ষে এবং বিপক্ষে। বেশীর ভাগই সপক্ষে। সব কিছুকে ছাপিয়ে একটি ঘটনাতে তার সম্পর্কে সবাই একমত হতেন এখনো হন অলি আহাদ আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের আধুনিক কালের সেইসব বিরল মানুষদের একজন যাকে সত্যনিষ্ঠ

ব'লে আখ্যায়িত করা যায়। বাংলাদেশের এখনকার যিনি প্রধানমন্ত্রী সেই খালেদা জিয়া যখন বলেছেন, তিনি আজ জাতির বিবেকে পরিণত হয়েছেন- তখন তিনি নিঃসন্দেহে কোনো অতিশয়োক্তি করেন নি।

জনাব অলি আহাদ তার রচিত 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫' গ্রন্থটিতে অনেক দুর্লভ এবং অমূল্য তথ্য আমাদের জন্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই সঙ্গে কিছু ব্যক্তিগত পত্রও প্রকাশ করেছেন। আমি এখানে একটি কি দুটি পত্র থেকে অংশ বিশেষ উল্লেখ করতে চাই। করাচীর ৭ নম্বর সমারসেট হাউস থেকে ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৫৬ সালে লেখা একটি পত্রে শেখ মুজিবুর রহমান অলি আহাদকে একটি ব্যক্তিগত অনুরোধ করেছিলেন, "তোমাকে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে একটু অনুরোধ করিতে চাই। আমার ছেলে কামালউদ্দীনকে সেন্ট জেভিয়ার্স কনভেন্ট স্কুলে এবং মেয়েকে (হাসিনা) কামরুন্নেসা গার্লস স্কুল অথবা বাংলা বাজার স্কুলে ভর্তি করাইবার জন্য দয়া করিয়া চেষ্টা করিবা। তাহাদের জন্যে একজন ভালো শিক্ষক যোগাড় করিবার চেষ্টা করিবা। সব সময়েই তোমার ভাবীর সহিত যোগাযোগ রাখিবার চেষ্টা করিবা। সে-ও খুব নিঃসঙ্গ বোধ করিতেছে। আমি ভাল। আমার কাছে চিঠি দিও। - *তোমারই মুজিব ভাই।*"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চিঠির এ সামান্য উদ্ধৃত অংশ থেকেই বোঝা যায় অলি আহাদকে ব্যক্তিগতভাবে তিনি কতটুকু ভালোবাসতেন, বিশ্বাস করতেন। আর একটি চিঠিতে মুজিব লিখেছেন, "শরীরের প্রতি যত্ন নিও। কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে তোমার হতভাগা ভাইকে লেখতে ভুলিও না।"

আমার কাছে অলি আহাদ আমাদের ভাষা আন্দোলনের প্রধান নেতা। খালেদা জিয়াও এমন কথা বলেছেন। "ইতিহাস বিকৃতির শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এ সত্যটি আজ ১২ কোটি মানুষের কাছে স্পষ্ট যে অলি আহাদ মহান ভাষা আন্দোলনের প্রধান নেতা"- এ উক্তি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার।

১৯৪৮ সালে রমনার রেসকোর্সের ময়দানে যে প্রতিবাদী কণ্ঠের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আমি প্রায় বালক বয়সে শূনেছিলাম দেখেছিলাম, সেই ধ্বনি তরঙ্গের অন্যতম নির্মাতা ছিলেন অলি আহাদ। সেই ভাষা আন্দোলনই ১৯৫২ সালে এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ও ডাইমেনশান পেয়েছিলো। পাকিস্তান জেনেছিলো, সারা দুনিয়া প্রত্যক্ষ করেছিলো পূর্ব বাংলার মানুষ যুগপৎ বাঙালী এবং মুসলমান। জেনেছিলো, বাঙালী মুসলমানরা একটি পৃথক জাতি হিসাবে বাঁচতে চায়। এবং পরবর্তীকালে এই মানসিক অস্তিত্ব থেকেই বাঙালীরা একদিন স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলো। উনসত্তরের গণ আন্দোলনে দিয়েছিলো আত্মাহুতি। ১৯৪৮ সালের সেই শেম, শেম প্রতিবাদ থেকে ১৯৭১ সালে বাংলার মানুষ একটি মুক্তিযুদ্ধের পতাকাকে উত্তোলন করেছিলো। এনেছিলো স্বাধীনতা।

আমি কী এখন বলবো যে, অলি আহাদ নামের একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষ আমাদের স্বাধীনতার প্রথম ধ্বনিটি উচ্চারণ করেছিলেন। সূত্রপাত করেছিলেন একটি নতুন সংগ্রামের।

আমি একজন সামান্য কবি মাত্র। রাজনীতির সর্পিল পথ আমার জন্যে নয়। আর এ ব্যাপারে আমি কোনো শেষ কথাও বলতে চাই না। শুধু বলতে চাই আমাদের রাজনীতিতে এই যে একজন সত্যিকার সত্যনিষ্ঠ সেনানী তাঁকে যেন আমরা চিরকাল শ্রদ্ধা করি, মনে রাখি। কেননা সত্যকে নির্বাসিত করা মানেই জীবনের উল্টো দিকে যাত্রা করা।

জনাব অলি আহাদ আমার শ্রদ্ধাভাজন। তাঁকে নিয়ে নির্মিত বর্তমান সম্মাননা গ্রন্থটিতে এদেশের বহু গুণী মানী শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা লিখেছেন। এমন একটি গ্রন্থের ভূমিকা রচনার কোনো যোগ্যতাই আমার নেই। সুতরাং আমার এ ক্ষুদ্র লেখাটিকে কোনো ভূমিকা মনে না করে জনাব অলি আহাদের প্রসঙ্গে একজন কবির শ্রদ্ধার্ঘ মনে করলেই যথার্থ হবে। এ কাজের জন্যে আমাকে অনুরোধ করায় স্নেহভাজন মুন্সি আবদুল মজিদ-কে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার বিশ্বাস বর্তমান বাংলাদেশকে একমাত্র আমাদের সততাই বাঁচাতে পার।

ফজল শাহাবুদ্দীন

নিভৃতি॥ ১১/১ মধ্য বাসাবো, ঢাকা ১২১৪॥ ১১.১২.২০০২

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ থেকে প্রকাশিত "চির বিদ্রোহী অলি আহাদ" পুস্তকে বরেন্য কবি ফজল শাহাবুদ্দিন কর্তৃক লিখিত ভূমিকা।]

ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে

শামসুল আলম

দৈনিক ইনকিলাবে প্রদত্ত ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ সালে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে ভাষা আন্দোলনের অগ্রসৈনিক সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রথম আহ্বায়ক, তমদ্দুন মজলিসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জনাব শামসুল আলম এর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত নিম্নে উল্লেখযোগ্য অংশ তুলে ধরা হলো।

ইনকিলাবঃ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃতির প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

শামসুল আলমঃ ইতিহাস বিকৃতির প্রশ্নটি আসে গবেষণা ও মতামত প্রকাশের ক্ষত্রে বস্তুনিষ্ঠতা লংঘিত হলে। বস্তুতঃ ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে- এ পর্যন্ত যতগুলো বই, গবেষণা কর্ম, সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে- কোথাও কেউ ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ চিন্তা ও সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে যেতে পারেনি। অথচ তখন যে কয়টি রাজনৈতিক দল (মুসলিম লীগ কমউনিস্ট পাটি, ও জামায়াত ইসলামী) ছিল, কেউই ভাষা আন্দোলন সমর্থন করেনি। .... অথচ এই সত্যকে পাশ কাটানোর অসৎ উদ্দেশেই অনেকে ভাষা আন্দোলনকে বায়ান্নোর একটি বিএডিএস থেকে প্রকাশিত বইতে ভাষা আন্দোলনকে উপস্থাপন করা হয়েছে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভংগী থেকে। শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব দিয়ে কার্যতঃ তখন তার প্রশ্নই ছিল না। সত্যি বলতে কি ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িতদের কোন রাজনৈতিক পরিচয় ছিল না। কিন্তু আমি অবাক হই প্রচারগুণে কিভাবে ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পর্কহীন ব্যক্তি এ বিষয়গুলো ইতিহাসের অংশ হয়ে যাচ্ছে। ইতিহাসের অনেক পরিচিত নাম ও বিষয়াবলী প্রচার যন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্টতার অভাবে কিভাবে ইতিহাসের নেপথ্যে চলে যাচ্ছে। অথচ এই পুরো প্রক্রিয়াটির সাথে জড়িত থেকেও

সরকার এমনভাবে দেখাচ্ছে যে, তারা অবহিত নয়। কার্যতঃ সরকারই এসব পৃষ্ঠপোষণ করছে। ফলে নতুন প্রজন্ম একটি 'ইলিউশননে' পড়ে গেছে। তারা দিকভ্রান্ত হচ্ছে। ভাষা আন্দোলনের সত্যিকার এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে 'ইলিউশনের মাধ্যমে অন্ধকারে রাখা হচ্ছে। তারা জানে না "অলি আহাদ ইজ এ রিয়েল হিরো অব ল্যাংগুয়েজ মুভমেন্ট।"

মুক্তিযুদ্ধঃ তদানীন্তন বিএসএফ প্রধান
গোলক মজুমদারের সাক্ষাৎকার

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ভারতের সামরিক বাহিনী বিএসএফ-এর মাধ্যমেই প্রাথমিক ধারণা পেয়েছিল-

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী বিএসএফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তখন বিএসএফ এর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান ছিলেন গোলক মজুমদার। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সার্বিক সহযোগিতায় পর্যাপ্ত ক্ষমতা দিয়েছিলেন।

বিএসএফ প্রধান গোলক মজুমদার ছাড়াও আমি আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ বিএসএফ কর্মকর্তার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করি, তিনি হচ্ছেন শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন বিএসএফ-এর গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। "মূলধারা '৭১"গ্রন্থের লেখক মঈদুল হাসানও তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন মুজিবনগর সরকার সম্পর্কে জানার জন্য।

এই সাক্ষাৎকারে গোলক মজুমদার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বেশকিছু চাঞ্চল্যকর এবং তর্কসাপেক্ষ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। সাধারণভাবে বিএসএফ গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে তখন 'র'-এর সম্পর্ক ভাল ছিল না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সাহায্যের ধরন ও রাজনৈতিক প্রকৃতি সম্পর্কে 'র' এবং বিএসএফ-এর অবস্থান ছিল দুই বিপরীত মেরুতে। বিএসএফ তুলনামূলকভাবে ঘনিষ্ঠ ছিল ভারতের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সামরিক বাহিনীর প্রাথমিক ধারণা এবং যোগাযোগ বিএসএফ-এর মাধ্যমেই হয়েছিল।

তাজউদ্দিন আহামদের সঙ্গে শেখ মনি, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ প্রমুখের সঙ্গে কলকাতায় প্রথম সাক্ষাতকারের তারিখ সম্পর্কে "মূলধারা '৭১"-এর তাজউদ্দিন আহমেদের বক্তব্য, বিএসএফ-এর শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং তৎকালীন মুজিব বাহিনীর শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমার আলোচনা থেকে এটাই জানা গেছে যে, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতকারের আগে তাজউদ্দিনের সঙ্গে আওয়ামী লীগের কোনও শীর্ষস্থানীয় নেতার দেখা বা কথা হয়নি। গোলক মজুমদার দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন শেখ মনি, আব্দুর রাজ্জাকদের সঙ্গে তাজউদ্দিনের দিল্লী যাওয়ার আগেই কথা হয়েছিল।

'র'-এর উদ্যোগে মুজিব বাহিনী গঠন সম্পর্কে বিএসএফ কর্মকর্তারা যে অসন্তুষ্ট ছিলেন

গোলক মজুমদারের বক্তব্যে সেটি ধরা পড়েছে। তবে এ বিষয়ে তিনি ইন্দিরা গান্ধীর উপদেষ্টা ডি পি ধরকে প্রশ্ন করে যে উত্তর পেয়েছিলেন সেটিও প্রণিধানযোগ্য। মুজিব বাহিনী গঠনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে ডি পি ধর বলেছিলেন, এক ঝুঁড়িতে সব ডিম রাখাটা ঝুঁকিপূর্ণ, বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এই সাক্ষাৎকারে গোলক মজুমদার বিএসএফ-এর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান হিসেবে নিজের ভূমিকাকে কিছুটা বাড়িয়ে বললেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর এবং বিএসএফের অবদান খাটো করে দেখার কোনও কারণ নেই। নিম্নবর্ণিত সাক্ষাতকারটি গত ১২ এপ্রিল '৯৬ গোলক মজুমদারের কলকাতাস্থ বাসভবনে নেয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি সেখানে অবসর জীবনযাপন করছেন। সাক্ষাতকার গ্রহণে শাহরিয়ার কবির।

শা.ক. ঃ আপনাকে আমার প্রথম প্রশ্ন-আপনি নিজে এবং বিএসএফ কিভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লো?

গো.ম. ঃ একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আমি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম। আমি যখন ১৯৫১ সালে চাকরিতে জয়েন করে এলাম সেই সময়টা ছিল পাকিস্তান এবং ভারতবর্ষের মধ্যে একটা সাংঘাতিক কনফ্রনটেশনের। পরে যার পরিণতি হলো নেহেরু লিয়াকত প্যাক্ট-এ। সেই সময় আমাদের বর্ডারে পশ্চিমে এবং পূর্বে চতুর্দিকে মিলিটারি ছিল। ওদের দিকেও মিলিটারি ছিল পাকিস্তানের দিকে, আমাদের দিকেও মিলিটারি ছিল। এই মিলিটারি সমস্ত বর্ডারে ছড়িয়ে ছিল, তাদের লিয়াজোঁ করার জন্যে লোক দরকার হলো। কেননা পুলিশের লোক বা সিভিল এডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে মিলিটারির লিয়াজোঁ না হলে কি করে কাজ হয়? সেই জন্যে আমাকে একজন লিয়াজোঁ অফিসার বিশেষ করে মিলিটারি লিয়াজোঁ অফিসার করা হয়। আমি তখন সবে ট্রেনিং করে এসেছি মাউন্ট আবু থেকে। আমায় পোস্ট করা হলো, আমি এই পজিশনে পাঁচ-সাত মাস ছিলাম। তখন আপনাদের ওদিকে আমাদের এদিককার বর্ডারে-বনগাঁও বর্ডার, যশোরের বর্ডার, খুলনার বর্ডার, আবার বশিরহাটের বর্ডার, নদীয়ার বর্ডার, এরকম সব পাশাপাশি-আবার ওদিকে কুষ্টিয়ার বর্ডার সবস্থানেই ছিল। ওদের দিক থেকে অনেক ভাল ভাল রেজিমেন্টস এসেছিল-পাঞ্জাব ছিল চতুর্দিকে, পাঠানরা ছিল, তারপরে বালুচ রেজিমেন্ট ছিল। আমাদের দিকেও ভাল ভাল রেজিমেন্ট ছিল। আমাদের দিকে কয়েকটা ব্রিগেড ছিল। চব্বিশ পরগণার যে বর্ডারটা, সেই বর্ডারটার তিনটা ব্রিগেড ছিল। তো আমাকে তিনটা ব্রিগেডের সঙ্গে লিয়াজোঁ করতে হতো। তখনই আমি এই বাংলাদেশের বিষয়ে একটু ইন্টারেস্টেড হলাম। আমি অনেক খরবাখবর পেতাম, লোকেরা আমাকে খবর দিতো, যখন আমি বর্ডারে সাইকেলে করে ঘুরে বেড়াতাম, তখনতো এত যানবাহন ছিল না-সাইকেলে করেই ঘুরে বেড়াতাম। খবর যা পেতাম সেগুলো আবার আমি ফিরে এসে ব্রিগেড কমান্ডারকে বলতাম-এই এই ঘটনা ঘটছে, এগুলো হয়েছে, তো তারা আবার সেগুলো তাদের ওপরওয়ালাদের বলতেন, আর আমি পুলিশকে জানাতাম, বিকজ আই এম এ পুলিশ ম্যান। তখন থেকে আমাদের যোগাযোগ ছিল। তারপরে আবার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেলো। তারপরে আমি যখন চব্বিশ পরগনার এসপি ছিলাম তখন আবার যোগাযোগ হলো। তারপর আমি যখন ত্রিপুরাতে

গেলাম আইজি হয়ে সেই সময় দুটো ছেলে ত্রিপুরাতে এলো কুমিল্লা থেকে।

শা.ক.ঃ কোন সালে?

গো.ম.ঃ এটা হচ্ছে ১৯৬৯ সালে। তারা কুমিল্লা থেকে এলো। আমি তাদের ইন্টারভিউ করলাম। তারা বললো যে, আমাদের পাঠানো হয়েছে এখানে, কেননা আমাদের বাংলাদেশ এখন উত্তাল। বাংলাদেশে তো মুজিবুর রহমানের ট্রায়াল হয়েছে, ঐ কী কন্সপিরেসি কেস যেন, আগরতলা কন্সপিরেসি কেস-এ। মুজিবুর রহমানকে জেলে নেয়া হয়েছে। আরও কী করা হবে জানি না, তো আমরা দেখছি এইভাবে আমরা সহ্য করতে পারবো না, কাজেই আমাদের ওখানে দানা বাঁধছে বিদ্রোহের। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কারা? কি করেন আপনারা? বলে, আমরা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র। তা আপনাদের নেতা কে? কে পাঠিয়েছে আপনাদের? বললো, অলি আহাদ হচ্ছেন আমাদের নেতা। অলি আহাদই আমাদের পাঠিয়েছেন। কিন্তু আমাদের বড় নেতা হলেন গিয়ে মুজিবুরের কাকা বা মামা-নামটা ভুলে গেছি।

শা.ক.ঃ আতাউর রহমান?

গো.ক. ঃ হ্যাঁ আতাউর রহমান। তো আতাউর রহমান আমাদের পাঠিয়েছেন।

শা.ক.ঃ তাঁর সঙ্গে মুজিবের কোন রিলেশন নেই?

গো.ম. ঃ মুজিব তো তখন জেলে। আতাউর রহমান পাঠিয়েছেন। তো আতাউর রহমান কি চাইছেন? অলি আহাদকে দিয়ে, আমাদের সঙ্গে আতাউর রহমানের সাক্ষাৎ কথা হয়নি। অলি আহাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। অলি আহাদ খুব ভাল লিডার এবং তিনি বেশি কথা বলেন না। তিনিই আমাদের বলেছেন আমাদের তিনটা জিনিস চাই। কী জিনিস চাই? এক হচ্ছে প্রথম বড় জিনিসটা হচ্ছে ভারতবর্ষের সহযোগিতা। আচ্ছা, আর কী চাই? আর চাই, আমাদের অস্ত্রশস্ত্র চাই। কী রকম অস্ত্রশস্ত্র? যেসব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমরা ওখানে আইয়ুব খাঁর মিলিটারির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারবো সেরকম অস্ত্র আমাদের দরকার, তা আপনাদের কোন জ্ঞান আছে যে, কী রকমের অস্ত্র নিয়ে আপনারা আইয়ুব খাঁর মিলিটারির সম্মুখীন হবেন। বলে, সেটাতো আমাদের জ্ঞান নেই। আচছা আর কী চাই? ভাই অস্ত্রশস্ত্র যে আপনারা দেবেন সেই অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণ দরকার। আর কী চাই ? বলে, আর চাই টাকাকড়ি। টাকাকড়ি না হলে তো আমরা ঠিক করতে পারবো না। আর আমাদের তো এটা আন্ডারগ্রাউন্ড মুভমেন্ট, কাজেই টাকাকড়ি চাই। তো আমি শুনলাম সব। শুনে আমি তাদের রেকর্ড করে, আমি তাদের 'র' যেতে দিয়েছিলাম। আমাদের রিসার্চ এন্ড এনালাইসিস ওয়িং। 'র' সবে তৈরি হয়েছিল। সেটা উনিশ শ' আটষট্টি-উনসত্তর সালে তো, তখনই 'র' তৈরি হয়েছিল। তো 'র' যেতে দিলাম। 'র'এর অফিসাররা এলো। এসে তাদের ইন্টারভিউ টিন্টারভিউ করলো। তারপরে কী হলো আমি জানি না, আমি দিল্লীতে বদলি হয়ে গেলাম। দিল্লীতে যখন বদলি হয়ে গেলাম তখন আমার কাজ ছিল-বিএসএফ-এর এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেটআপ, সেটাকে ঠিক করা। তো আমি সেই কাজে লিপ্ত হয়ে গেলাম। এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেটআপ ঠিক করা মানে হচ্ছে ধরুন কাশ্মীরেতে একটা ব্রিগেড তৈরি করতে হবে,

ইনডিপেন্ডেন্ট ব্রিগেড। তো এখানে আমাদের নতুন করে কিছু করতে হবে, তো এইসব করতে গেলে সেই সবের যে স্যাংশনকভার-হ্যাঁ, সেইসব জিনিস করা, সেইসব আমার কাজ ছিল। তারপরে, তখন জিনিসটা, ইট ওয়াজ হটিং আপ, তখন মিস্টার রুস্তমজি (বিএসএফ প্রধান) আমায় ডাকলেন। ডেকে বললেন, তুমি চলে যাও, কলকাতায় চলে যাও, ইউ টেক চার্জ। আমি বললাম, আমি কী করে কী করবো। বললেন যে, প্রাইম মিনিস্টার চান যে তুমি চলে যাও সেখানে। তো আমি বললাম, আমি কী করবো? বললেন, কী করবে সেটা তুমি নিজে ঠিক করবে, তুমি চলে যাও। তা, আমি যদি ঠিকই করি, কতদূর অগ্রসর হবো? তো সেটাও উনি বলেছেন যে, তুমি ঠিক করবে। তোমার লিমিট তুমিই ঠিক করবে। কী উপায়ে আমি কাজ করবো? বললেন, উপায়ও তুমি ঠিক করবে। আমাকে এই রকমের একটা ব্রড কমিশন দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হলো। এখানে যখন এসে পৌঁছলাম তখন তো ওখানে আপনাদের সাংঘাতিক কাণ্ড হচ্ছে, ক্র্যাকডাউন হয়ে গেছে। ক্র্যাকডাউন হয়ে যাবার পরেই-।

[সাক্ষাতকারটি ধারাবাহিকভাবে ১৬ই সেপ্টেম্বর '৯৬ থেকে দৈনিক জনকণ্ঠে ছাপা হয়েছে। এখানে প্রথম অংশ মুদ্রিত হলো।]

আমার রাজনীতির কাফফারা

অগ্রজদের ও অনুজদের পদোন্নতিতে কুঠারাঘাত

জেষ্ঠ ভ্রাতা-এ, কে, এম. আবদুস সাত্তার , এম. এ. (আলীগড়); এম.এ. (ঢাকা)। ১৯৭১ এর স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে যুগ্ম সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর দেশে ফিরে এলে সচিব পদে নিয়োগের চূড়ান্ত পর্বে অলি আহাদের ভাই হবার অপরাধে তাঁর এ নিয়োগ বাতিল করা হয়।
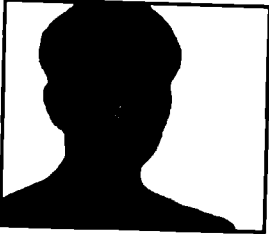
মেঝ ভ্রাতা জনাব আজিজুর রহমান পাকিস্তান প্লানিং কমিশনে (Pakistan Planning Commission) DIVISION CHIEF ছিলেন। স্বাধীন বাংলা সরকার প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে Division Chief-এর স্থলে Section Chief এর মত নিম্নপদে নিয়োগ দেন। অপরাধ তিনি আমার অগ্রজ।

অগ্রজ ডঃ আবদুল করিম, (পোস্ট ডক্টরেট নাফিল্ড স্কলার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার পরবর্তীতে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর হিসেবে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। অলি আহাদের ভাই হওয়াতে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে ভাইস চ্যান্সেলর করেননি। যদিও তখন তিনি officiating V.C.ছিলেন।

অনুজ মোঃ আমিরুজ্জামান, এম.কম. এম. এ (ঢাকা) এম. এ. (ভ্যানডারবিল্ট, যুক্তরাষ্ট্র); এম.এ. (ম্যানচেস্টার, ইংল্যাণ্ড) (C.S.P) । ১৯৭৬ সালে অতিরিক্ত সচিব পদে তার পদোন্নতির আদেশ রাষ্ট্রপতি জাস্টিস সায়েম কর্তৃক স্বাক্ষরিত হওয়া সত্ত্বেও জিয়াউর রহমান প্রধান সামরিক শাসনকর্তা ও রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন সময়ে এই পদোন্নতির আদেশ গেজেট বিজ্ঞপ্তি করা হয়নি এবং তাঁকে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতির নিয়োগপত্র দেওয়া হয়নি। সচিব পদে নিয়োগের জন্য ফাইল রাষ্ট্রপতি এরশাদের কাছে গেলে তা নাকচ হয়ে যায়, কারণ সে অলি আহাদের ভাই। এই সময় আমিরুজ্জামান জাতিসংঘের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

কনিষ্ঠ আকরামুজ্জামান সি.এস.এস. (পদত্যাগী) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডীন ও প্রফেসার ময়মনসিংহ।

সূচনা

স্মৃতি মন্থন করিয়া প্রাক-পাকিস্তান ও পাকিস্তানোত্তরকালের বিভিন্ন ঘটনাবলীর সাধারণ বিবরণ সহোদর অনুজ আমিরুজ্জামানের অনবরত তাড়ার দরুন লিপিবদ্ধ করার তাগিদ অনেকদিন যাবৎ তীব্রভাবে অনুভব করিতেছিলাম। বিভিন্ন মহল কর্তৃক ভুল, বিভ্রান্তিকর ও বানোয়াট তথ্য ছাপার অক্ষরে পরিবেশিত হওয়ার ফলে পাকিস্তানের অভ্যুদয় হইতে বাংলাদেশের সৃষ্টি অবধি সংশ্লিষ্ট প্রকৃত ঘটনারাজি বিকৃতির চরম সীমায় পৌছাইয়াছে। বিশেষ করিয়া আওয়ামী লীগ সরকারের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় সত্য ঘটনাকে চাপা দিয়া কাল্পনিক ও স্বীয় মনঃপূত সম্পূর্ণ মিথ্যা অথবা অর্ধ সত্য বিবরণ সৃষ্টির দুঃখজনক অপচেষ্টা সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। কর্তার ইচ্ছায় কীর্তন করিয়া ঐতিহাসিক সত্যকে চাপা দেওয়ার এক নজির সৃষ্টি করা হয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, পূর্বসূরীদের চিন্তা ও কর্মধারা ভবিষ্যৎ অগ্রাভিযানে উত্তরসূরীদের অন্যতম পাথেয়। এই সকল কর্মধারার সঠিক ও নিরপেক্ষ লিপিবদ্ধকরণ পূর্বসূরীদের নৈতিক দায়িত্ব। তাই এই গ্রন্থে আমার নাতিদীর্ঘ কর্মজীবন বিবৃত করার মাধ্যমে আমার জানা সত্য ঘটনা পাঠক সমীপে তুলিয়া ধরিবার বিনীত প্রয়াস পাইয়াছি।

রাজনৈতিক জীবনে হাতে খড়ি

কৈশোর হইতেই আমি ব্যাপক রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও আন্দোলনের সঙ্গে জড়াইয়া পড়ি। তদানীন্তন ভারতীয় মুসলিম সমাজে যে অভুতপূর্ব পুনর্জাগরণ দেখা দিয়াছিল তাহার তরঙ্গাঘাত আমার তরুণ মনে দারুণ রেখাপাত করে। আব্বা দৈনিক আজাদ, সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, মাসিক মোহাম্মদী ও মাসিক সওগাতের নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। এই সকল দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকায় সচিত্র খেলার বিবরণ, বিশেষ করিয়া ফুটবল খেলার মাঠে কলিকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল এবং ১৯৪০ ও ১৯৪১ সালে ক্রমাগত একটানা বিজয় সংবাদ আমার কিশোর মনে তথা আবালবৃদ্ধবনিতা মুসলমানদের মনে এক লুপ্তপ্রায় সত্বার পুনর্জাগরণের আহবান ও আবেদন জানাইত। গ্রামোফোন রেকর্ডে নজরুল রচনা ও আব্বাস উদ্দিনের কণ্ঠ বাংলার মুসলমান মাত্রেরই যেন গর্বের বস্তু ছিল। অর্থাৎ নজরুলের রচনা, গীত, গজল, আব্বাস উদ্দিনের কণ্ঠ ও মোহামেডান স্পোর্টিং-এর কলিকাতার খেলার মাঠে বিজয় আত্মজ্ঞানহারা, ম্রীয়মান পশ্চাদপদ মুসলমান সমাজকে আত্মস্থ, আত্মসচেতন ও আত্মবলে বলীয়ান করার মূল্যে বিশেষ অবদান রাখিয়াছে। ফলে মুসলমানদের ভারতের বুকে স্বীয় ও স্বতন্ত্র বাসভূমির দাবী আমার কঁচি মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। তাই স্কুল জীবনেই অপরিণত বয়সে প্রস্তাবিত মুসলিম বাসভূমি পাকিস্তান দাবীর সক্রিয় ছাত্রকর্মী হই।

Jinnah and Federalism
Jinnah's famous 14 points

These 14 points were actually accepted as the decisions of the Muslim All-Parties Conference at Delhi on December 31, 1928, under the presidency of H.H. The Aga Khan. These 14 points were also later accepted by the Muslim League Conference in March 1929 held at Delhi, and were later described as "Mr. Jinnah's 14 points." Of these points 1-2 and 13-14 are directly related to the federal question.

The 14 points which are as follows:(1) The government of India should be federal. (2) Residuary powers to vest in the provinces and the States. (3) Any Bill opposed by three- fourth members of any community present shall not be proceeded with. (4) Right of separate electorates of Muslims to remain intact till they themselves give it up. (5) One-third representation of Muslim members in the Central Legislature. (6) Retention of the present basis, of representation in the provinces where the Muslims are in a minority. (7) No majority to be converted into minority or equality. (8) Reforms be introduced in Baluchistan and in the N.W.F.P. (9) Separation of Sind. (10) Reservation for the Muslims in the services. (11) Protection of Muslim culture, language, religion and education, personal laws and waqf. (12) Proper representation of Muslims in the Education Department of the Governement. (13) No changes in the Constitution of India to be brought about without the willing consent of the provinces. (14) No change in the Constitution of India to be brought about without the willing consent of the Indian States.

It may also be mentioned here that Mr. Jinnah accepted the Cabinet Mission Plan in 1946 which proposed three autonomous zonal states under a federal system. Since the three zones were not proposed to be independent and sovereign, the question of an Indian Confederation under the Plan did not arise. It should further be mentioned here that in spite of the Lahore Resolution and the demand for pakistan, Jinnah agreed to ``sacrifice"

Pakistan and accepted the Cabinet Mission Plan which was soon bombarded by Nehru and the Congress, even after initially agreeing to the Plan. To that Jinnah reacted by declaring his Direct Action plan which meant that nothing short of partition was any longer acceptable to them.

In between the 14 points and the Cabinet Mission Plan, there were a number occasions when Mr. Jinnah talked about and demanded a federal state in India.

- By Courtesy of : BADAR UDDIN OMAR (OXON) EX Reader-Rajshahi University.

মিঃ জিন্নাহ্'র ঐতিহাসিক ১৪ দফাঃ

মহামান্য আগা খানের সভাপতিত্বে ১৯২৮ সনের ৩১শে ডিসেম্বর দিল্লীতে সর্বদলীয় মুসলিম দলগুলোর এক সম্মেলনে এই চৌদ্দটি দফা গৃহীত হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯২৯ সনের মার্চে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ সম্মেলনেও এ দফাগুলো গৃহীত হয়। এগুলোই "মিঃ জিন্নাহর চৌদ্দ দফা" হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। এ দফাগুলোর প্রথম ও দ্বিতীয়, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ দফা প্রত্যক্ষভাবে ফেডারেল পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত।

এই চৌদ্দটি দফা হচ্ছেঃ

১। ভারতের সরকার পদ্ধতি হবে ফেডারেল।

২। Residuary powers প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যগুলোর উপর ন্যস্ত থাকবে।

৩। যদি কোন সম্প্রদায়ের তিন চতুর্থাংশ কোন বিলের বিরোধিতা করে, তাহলে সে বিল নিয়ে আলোচনা হবে না।

৪। মুসলমানদের জন্য আলাদা নির্বাচনের অধিকার অক্ষুন্ন থাকবে-যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা স্বেচ্ছায় সে অধিকার ছেড়ে না দেয়।

৫। কেন্দ্রীয় বিধান সভায় এক তৃতীয়াংশের মুসলিম সদস্যদের আসন সংরক্ষিত থাকতে হবে।

৬। মুসলমানরা যে যে প্রদেশে সংখ্যালঘু, সেখানে তাদের প্রতিনিধিত্বের বর্তমান ব্যবস্থা অক্ষুন্ন থাকবে।

৭। কোন সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় কোন অবস্থাতেই সংখালঘুতে বা সম-অধিকার সম্পন্ন সম্প্রদায়ে পরিণত হবে না।

৮। বেলুচিস্তান এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সংস্কার সাধন করতে হবে।

৯। সিন্ধুকে আলাদা করতে হবে।

১০।চাকুরী বাকুরীতে মুসলমানদের চাকুরীর সংখ্যা সংরক্ষণ করতে হবে।

১১।মুসলমানদের তাহজীব তমুদ্দন, ধর্মীয় অনুভূতি ও শিক্ষা, পার্সোনাল ল' এবং ওয়াকফের বিধান সংরক্ষণ করতে হবে।

১২।সরকারের শিক্ষা বিভাগে মুসলমানদের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে।

১৩।প্রদেশগুলোর স্ব-প্রণোদিত অনুমতি ব্যতিরেকে ভারতের শাসনতন্ত্রের কোন পরিবর্তন সাধন করা যাবে না।

১৪।ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলোর স্ব-প্রণোদিত অনুমতি ব্যতিরেকে ভারতের শাসনতন্ত্রের কোন পরিবর্তন সাধন করা যাবে না।

লাহোর প্রস্তাব

১৯৪০ সালের ২২শে ও ২৩শে মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগ অধিবেশনের সমাপ্তি দিবসে অবিভক্ত ভারতবর্ষের দশ কোটি মুসলমানের স্বকীয় জীবনধারা স্বাধীনভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র বাসভূমি কায়েমের দাবীতে অবিভক্ত বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী শেরেবাংলা এ,কে, ফজলুল হক নিম্নোক্ত প্রস্তাব পেশ করেন। স্বতন্ত্র বাসভূমি দাবীর এই প্রস্তাবই ইতিহাসে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে খ্যাত। মূল প্রস্তাবটি নিম্নরূপঃ

"-That it is the considered view of this session of the All India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles viz, that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be constituted with such territorial readjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority, as in the North western & Eastern zones of India, should be grouped to constitute independent states in which the constituent Units shall be autonomous & sovereign."

"That the adequate, effective and mandatory safeguards should be specifically provided in the constitution for minorities in the units and in the region for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them and in other parts of India where Musalmans are in minority, adequate, effective and mandatory safequards shall be specifically provided in the constitution for them and other minorities for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them."

This session further authorises the working committee to frame a scheme of constitution in accordance with these basic regions of all powers such as defence, external affairs, communications, customs and such other matters as may be necessary."
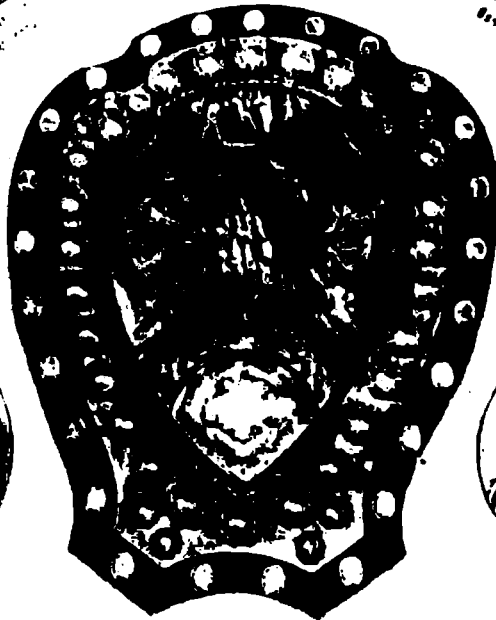
কলিকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড়বৃন্দ।

অর্থাৎ 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অত্র অধিবেশনের সুবিবেচিত অভিমত এই যে, এ দেশে কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাই কার্যকর কিংবা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না, যদি না অতঃপর বর্ণিত মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে তাহা পরিকল্পিত হয়। যথা, ভৌগলিক নৈকট্য সমন্বিত, ইউনিটগুলো প্রয়োজন অনুসারে স্থানিক রদবদলপূর্বক সীমানা চিহ্নিত করিয়া অঞ্চল গঠন করিতে হইবে এবং মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল যেমন, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল সমন্বয়ে অবশ্যই স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করিতে হইবে, যেখানে অন্তর্ভুক্ত ইউনিটগুলো স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম হইবে।"

"ইউনিট ও অঞ্চলগুলিতে সংখ্যালঘুদের সহিত পরামর্শক্রমে তাহাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ-সংরক্ষণের নিমিত্ত সংবিধানে পর্যাপ্ত, কার্যকর ও ম্যান্ডেটরী নিরাপত্তার সুনিশ্চিত বিধান সংযোজন করিতে হইবে এবং ভারতের যে সকল অংশে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রহিয়াছে তাহাদের সহিত পরামর্শক্রমে তাহাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যও সংবিধানে পর্যাপ্ত কার্যকরী ও বাধ্যতামূলক নিরাপত্তার সুনিশ্চিত বিধান সংযোজন করিতে হইবে"।

"অত্র অধিবেশন ওয়ার্কিং কমিটিকে অনুরূপ অঞ্চলগুলির যাবতীয় ক্ষমতা যেমন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, বৈদেশিক বিষয়, যোগাযোগ, শুল্ক এবং প্রয়োজনমত অন্যান্য বিষয়ের উপর চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রদানের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত মূলনীতিগুলির ভিত্তিতে একটি সাংবিধানিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য আরও ক্ষমতা দিতেছে।"

পরিতাপের বিষয়, "লাহোর প্রস্তাবের" প্রস্তাবক বঙ্গীয় প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে মুসলিম লীগ হইতে বহিস্কৃত হইলে ১৯৪২ সালে হিন্দুমহাসভা নেতা ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর যোগসাজসে শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা গঠন করেন। মাত্র ৪০ জন এম, এল, এ, মুসলিম লীগে থাকিয়া গেলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ (Bengal Legislative Assembly)-এর ২৫০ জন সদস্যের ২১০ জন শ্যামা-হক মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করেন; তন্মধ্যে ৮৮ জনই হিন্দু সদস্য। জনপ্রিয়তার অগ্নি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইল কায়েদে আযমের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নাটোর উপনির্বাচনে। মাওলানা আক্রাম খাঁ সম্পাদিত 'দৈনিক আজাদ'ই ছিল একমাত্র মুসলিম লীগ সমর্থক। বাকী কলিকাতার ১২টি দৈনিক ও মুসলিম মুখপাত্র 'নবযুগ' এক সুরে মুসলিম লীগ ও কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র মণ্ডুপাত করিতেছিল।

নাটোর উপ-নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভই করে নাই বরং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর জামানতও বাজেয়াপ্ত হয়। নাটোরের ভোটারগণ, তথা নাটোরের একমাত্র মুসলিম জনতা প্রমাণ করিল ব্যক্তির চেয়ে প্রতিষ্ঠান বড়। জাতির স্বার্থ নিয়া ছিনি-মিনি খেলিলে দেশবাসী যে বাংলার চাষী, বাংলার মুসলিম জনতার অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক,

শিক্ষা, চাকুরী-বাকুরী অঙ্গনে অগ্রযাত্রার একচ্ছত্র পথপ্রদর্শক ও মুসলিম স্বার্থ রক্ষক শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হককেও ক্ষমা বা বরদাশত করে না; নাটোর উপ-নির্বাচন এই শিক্ষাই দিল। মুসলিম রাজনীতিতে আবার নূতন আশার সঞ্চার হইল। ইহাই ছিল ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম জনতার স্বতন্ত্র আবাসভূমি "পাকিস্তান" দাবীর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনের পূর্বাভাষ। শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা পতন হইলে ১৯৪৩ সালের ২৪শে এপ্রিল খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে বঙ্গে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।

ছাত্রলীগ ও মুসলিম লীগের সহিত সম্পর্ক

অবিভক্ত বঙ্গদেশে নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ ছিল পাকিস্তান আন্দোলনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সংগ্রামী ছাত্র সংগঠন। ১৯৪৪ সালে যথারীতি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হই এবং কলেজে আগমনের পরই আমি ঢাকা কলেজ মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হই।

ঢাকা কলেজ গভর্ণমেন্ট হোস্টেলের সহ-আবাসিক ও সহপাঠি জনাব আবদুল হাই (বর্তমানে ডাক্তার) ১৫০ নং মোগলটুলী মুসলিম লীগ কর্মীশিবির কার্যালয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক চিন্তানায়ক জনাব আবুল হাশিমের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দেন। উপস্থিত কর্মীবৃন্দের উদ্দেশ্যে জনাব আবুল হাশিমের রাত্রিভর পবিত্র কালেমার ব্যাখ্যা, প্রস্তাবিত রাষ্ট্র পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনে ইসলামী মূল্যবোধের সুস্পষ্ট রূপরেখা আমার কিশোর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী আসরেই সর্বজনাব শামসুল হক, শামসুদ্দিন আহমদ, কমরুদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, তাজুদ্দিন আহমদ, নইমুদ্দিন আহমদ ও শওকত আলীর সহিত আমার পরিচয় হয়। তাঁহারাই উক্ত কার্যালয়ের প্রাণ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ঢাকার ১৫০ নং মোগলটুলীর দ্বিতল ও ত্রিতল ছিল পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগ কর্মীশিবিরের প্রাণকেন্দ্র এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ সার্বক্ষণিক ত্যাগী রাজনৈতিক কর্মীদের প্রধান কার্যালয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রগতিশীল তরুণ নেতা জনাব শামসুল হক উপরোক্ত কার্যালয়ের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। কালে ঘটনাবিবর্তনে আমি মুসলিম লীগের উক্ত প্রগতিশীল অংশের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া পড়ি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৫ সনের ১৬ই নভেম্বর কলিকাতার ৩ নং ওয়েলসলি ফার্স্ট লেইন হইতে কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিসের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'মিল্লাত' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটিই ছিল মুসলিম লীগের উক্ত প্রগতিশীল অংশের চিন্তাধারার মুখপত্র।

১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন

১৯৪৫ সালের ৯ই মে জার্মানী ও ইটালীর আত্মসমর্পণের পর আফ্রো-ইউরোপীয় রণভূমিতে যুদ্ধ বন্ধ হয়। ইহার অব্যবহিত পরই গণতান্ত্রিক দেশ যুক্তরাজ্যে (United Kingdom) ১৯৪৫ সালের ২৬শে জুলাই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ী শ্রমিক দল মিঃ ক্লিমেন্ট এটলীর নেতৃত্বে সরকার গঠন করে। অক্ষশক্তির অন্যতম অংশীদার জাপান ২রা সেপ্টেম্বর (১৯৪৫) আত্মসমর্পণ করিলে এশীয় রণভূমিতে যুদ্ধ বন্ধ হয় এবং

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। মহাযুদ্ধোত্তরকালে পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন অনুধাবন করিয়া ভারতীয় জনমত যাচাই করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেন এবং ভারতে নিযুক্ত তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়াভেল কর্তৃক ২৫শে জুন (১৯৪৫) আহূত সিমলা কনফারেন্স ব্যর্থ হইলে ২৯শে আগস্ট (১৯৪৫) তিনি ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতীয় উপমহাদেশে স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম আবাসভূমি 'পাকিস্তানের' দাবীতে দশ কোটি ভারতীয় মুসলিম অধিবাসীর নিকট শান্তিপূর্ণ রায়দানের সুযোগ গ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানান।

বঙ্গদেশে নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করার জন্য ৩০শে সেপ্টেম্বর (১৯৪৫) কলিকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও জনাব আবুল হাশিমের যৌথ নেতৃত্বে পরিচালিত প্রগতিশীল অংশ খাজা নাজিমুদ্দিন ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ পরিচালিত রক্ষণশীল অংশকে পরাজিত করে। নির্বাচিতব্য পাঁচটি আসনেই জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, জনাব আবুল হাশিম, জনাব আহমদ হোসেন, মাওলানা রাগিব আহসান ও জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী (লাল মিঞা) নির্বাচিত হন। নয় সদস্যবিশিষ্ট পার্লামেন্টারী বোর্ডের অপর চারজন সদস্য প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দীন মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (বঙ্গীয় মুসলিম লীগ সভাপতি হিসাবে পদাধিকার বলে), বঙ্গীয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত জনাব নুরুল আমিন ও বঙ্গীয় লেজিসলেটিভ এসেম্বলীর মুসলিম লীগ সদস্যবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত জনাব ফজলুর রহমান পূর্বাহ্নেই স্থিরীকৃত ছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ নির্বাচনে মুসলিম লীগ ১১৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১১৩টিতে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে। ২রা এপ্রিল (১৯৪৬) জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী দলের সর্বসম্মতনেতা নির্বাচিত হন এবং ২২শে এপ্রিল (১৯৪৬) বঙ্গীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পরামর্শে পার্লামেন্টারী বোর্ড জেলা, মহকুমা ও থানা পর্যায়ে সর্বক্ষণ কর্মী পরিচালিত নির্বাচনী বোর্ড স্থাপন করে। ছাত্রলীগের কার্যব্যাপদেশে কলিকাতা অবস্থানকালে তদানীন্তন নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা জনাব নূরুদ্দিন আহমদ ভারতীয় দশ কোটি মুসলমানের আবাসভূমি পাকিস্তান দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনে মুসলিম ছাত্রদের অংশগ্রহণের অপরিহার্যতা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করিয়া চার সদস্যবিশিষ্ট ত্রিপুরা জেলা নির্বাচনী বোর্ডের অন্যতম সর্বক্ষন কর্মী হওয়ার আহবান জানাইলে আমি তাহাতে সানন্দচিত্তে সম্মত হই এবং ১৯৪৬ সালে আই.এস.সি. পরীক্ষাদানে বিরত থাকি।

কলিকাতা হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়া আমার শ্রদ্ধেয় অগ্রজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এস.সি. শেষবর্ষের ছাত্র জনাব আবদুল করিম (পরবর্তীকালে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ও ডীন) সাহেবকে আমার রাজনৈতিক অভিমত জ্ঞাপন করিয়া

তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করি। আমার কাকুতি-মিনতি উপেক্ষা করিতে না পারিয়া স্নেহান্ধ ভাই অগত্যা আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং আব্বাজান ও বড় ভাইকে বুঝাইয়া বলিবার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালের অনুষ্ঠিতব্য আই.এস.সি পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফলের আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহাদের সমর্থন লাভে সক্ষম হই। আমি মধ্যবিত্ত সরকারী চাকুরে পরিবারের সন্তান। হাজারো সমস্যাসঙ্কুল পরিবার আমাকে কেন্দ্র করিয়া ভবিষ্যত স্বচ্ছলতার স্বপ্ন রচনা করিয়াছিল। আমার রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও কার্যাবলীর ফলস্বরূপ আমাদের গরীব পরিবারকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের নিকট হইতে অন্যায় এবং অবিচার সহ্য করিতে হইয়াছে।

ত্রিপুরা জেলা নির্বাচনী বোর্ডে আমি ব্যতীত বাকী অপর তিনজন সদস্য ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহম্মদ, জনাব এ,কে,এম, রফিকুল হোসেন ও জনাব সিরাজুল ইসলাম। খন্দকার মোশতাক আহম্মদ জেলা নির্বাচনী বোর্ডের কর্মাধ্যক্ষ (Workers-in-Charge) ছিলেন।

১৯৪৬ সালের ২০শে মার্চ নির্বাচনী প্রচারণা চালাইতে বরুড়া উপস্থিত হইলে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও কৃষক প্রজা দলীয় কর্মীদের অতর্কিত হামলায় সর্ব জনাব নূর মিঞা, আবদুর রব, শাহ আলম, আবদুল হামিদ, রেয়াজত আলী ও আমি গুরুতরভাবে আহত হই।

সর্বভারতীয় নির্বাচনী ফলাফল ছিল নিঃসন্দেহে পাকিস্তান দাবীর পক্ষে ভারতীয় দশ কোটি মুসলমানের দ্ব্যর্থহীন সমর্থনের সাক্ষ্য। এই ফলাফল ছিল নিম্নরূপঃ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ৩০টি মুসলিম আসনের ৩০টি আসন ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচনে আসামে ৩৪টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৩১টি, বঙ্গদেশে ১১৯টির মধ্যে ১১৩টি, বিহারের ৪০টির মধ্যে ৩৪টি, উড়িষ্যায় ৪টির মধ্যে ৪টি, যুক্তপ্রদেশে ৬৬টির মধ্যে ৫৫টি, পাঞ্জাবে ৮৬টির মধ্যে ৭৯টি, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৩৮টির মধ্যে ১৭টি, সিন্ধুতে ৩৫টির মধ্যে ২৮টি, বোম্বেতে ৩০টির মধ্যে ৩০টি, মধ্য প্রদেশে ১৪টির মধ্যে ১৪টি, মাদ্রাজে ২৯টির মধ্যে ২৯টি অর্থাৎ সর্বমোট ৫২৫টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৪৬৪টি আসন লাভ।

দিল্লী কনভেনশন

সাধারণ নির্বাচনে বিপুল জয়ের পর মুসলিম লীগের একচ্ছত্র নেতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ৭, ৮ ও ৯ এপ্রিল (১৯৪৬) দিল্লীতে এ্যাংলো এরাবিক কলেজে মুসলিম লীগ লেজিসলেটারস্ কনভেনশন আহবান করেন। উক্ত কনভেনশনে দর্শক হিসাবে আমার যোগ দিবার ঐকান্তিক ইচ্ছা সত্ত্বেও নানা কারণে আমি দিল্লী যাইতে পারি নাই।

দিল্লী এ্যাংলো এরাবিক কলেজে অনুষ্ঠিত লেজিসলেটারস কনভেনশনের ৯ই এপ্রিল অধিবেশনে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পেশকৃত নিম্নোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়ঃ

Resolved (1) That the zones comprising Bengal & Assam in the North-East and the Punjab, North-west Forntier Province, Sind & Beluchistan

in the North-west of India, namely Pakistan zones where the Muslims are in dominant majority, be constituted into a soverign independent state and that an unequivocal undertaking be given to implement establishment of Pakistan without delay.

(2) That two separate Constitution making bodies be set up by people of Pakistan & Hindustan for the purpose of framing their respective constitution.

(3) That the minorities in Pakistan and Hindustan be provided with safe-guards on the lines of the All India Muslim League Resolution passed on 23rd March, 1940 at Lahore.

(4) That the acceptance of the Muslim League demand of Pakistan & Its implementations without delay are the sine-qua-non for Muslim League co-operation and participation in the formation of an interim government at the centre.

অর্থাৎ প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল যে,

(১) ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বে বঙ্গদেশ ও আসাম এবং উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান অঞ্চলগুলি যাহা 'পাকিস্তান অঞ্চল' নামে অভিহিত এবং যেখানে মুসলমানরা প্রধান সংখ্যাগুরু তাহাদের সমবায়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা হউক এবং অবিলম্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা কার্যকর করার নিমিত্ত দ্ব্যর্থহীন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হউক।

(২) স্ব স্ব সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের জনগণ কর্তৃক দুইটি পৃথক সংবিধান রচনাকারী সংস্থা গঠন করা হউক।

(৩) ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কর্তৃক লাহোরে গৃহীত প্রস্তাবানুসারে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হউক।

(৪) মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর স্বীকৃতি ও অবিলম্বে ইহার বাস্তবায়নই কেন্দ্রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনে মুসলিম লীগের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে অপরিহার্য শর্ত।

জনাব আবুল হাশিম উপরোক্ত দিল্লী প্রস্তাবকে লাহোর প্রস্তাবের সরাসরি বরখেলাপ বলিয়া তীব্র ভাষায় বিরোধিতা করেন এবং তিনি সঠিকভাবে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পূর্ণাঙ্গ জাতীয় সম্মেলন যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে এবং ১৯৪১ সালের মাদ্রাজ অধিবেশনে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ যাহাকে মূলনীতি (Creed) হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে ঐ প্রস্তাবকে বাতিল বা ইহার সংশোধনকরণ লেজিসলেটারস কনভেনশনের এক্তিয়ার বহির্ভূত। লাহোর প্রস্তাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে দুইটি সার্বভৌম রাষ্ট্র সৃষ্টির দ্ব্যর্থহীন অঙ্গীকার ছিল। গভীর পরিতাপের

বিষয়, ১৯৪৬ সালের ৯ই এপ্রিল দিল্লী মহানগরীস্থ এ্যাংলো এরাবিক কলেজে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ লেজিসলেটারস কনভেনশনে বঙ্গদেশেরই ভাবী প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবক্রমে লাহোর প্রস্তাবানুযায়ী একাধিক রাষ্ট্র গঠনের পরিবর্তে একটি রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নেতা সোহরাওয়ার্দীর জাতীয় রায়কে বাতিল করার প্রয়াস আমাদের তরুণ মনকে অত্যন্ত আহত করে। যে কায়েদে আজমের সভাপতিত্বে ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, সেই কায়েদে আজমেরই সভাপতিত্বে ১৯৪৬ সালে দিল্লী প্রস্তাব গৃহীত হয়। নেতৃবৃন্দ বেমালুম হজম করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, সর্বভারতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচনে মুসলমানগণ লাহোর প্রস্তাবের পক্ষেই দ্ব্যর্থহীন রায় দিয়াছিল। কি প্রখর নীতিজ্ঞান নেতৃকূলের!

ক্যাবিনেট মিশন

ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পরই বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্লিমেন্ট এটলী ১৫ই মার্চ (১৯৪৬) বৃটিশ হাউস অব কমন্স-এ ঘোষনা করিলেন যে, বৃটিশ সরকার ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দানে সহায়তা করার মানসে ভারত সচিব লর্ড প্যাথিক লরেন্স, বাণিজ্য বোর্ড সভাপতি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, নৌ-বিভাগের প্রথম লর্ড (First Lord of admiralty) এ, ভি, অ্যালেকজান্ডার সমবায়ে গঠিত ক্যাবিনেট মিশন ভারতে পাঠাইবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। তদানুযায়ী 'ক্যাবিনেট মিশন' ২০শে মার্চ, (১৯৪৬) করাচী অবতরণ করে। নিম্নোক্ত কারণগুলি বোধ হয় ইংরেজ সরকারকে উপরে বর্ণিত সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচিত করে ঃ

প্রথমতঃ ভারতব্যাপী সদ্য অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে ভারতবাসী স্বাধীনতার পক্ষে রায় দিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন (Govt. of India Act, 1935) মোতাবেক ভারতবর্ষের এগারটি প্রদেশে ভারতীয় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক সরকার পরিচালনার সুযোগ ভারতবাসীকে আত্মসচেতন ও স্বাধিকার সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। তৃতীয়তঃ প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বিশ্বশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মহাচীন, সোভিয়েট রাশিয়া ভারতবাসীর হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করিতেছিল। চতুর্থতঃ (ক) দীর্ঘকাল যাবৎ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে দীক্ষিত সর্বভারতীয় বিপ্লবী সংগঠনগুলির প্রচেষ্টা, (খ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সর্বভারতীয় বিপ্লবী অগ্নিপুরুষ নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর সর্বাধিনায়কত্বে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর একটি অংশ কর্তৃক জাপান ও জার্মানীর সহায়তায় আই, এন, এ (Indian National Army) গঠন ও স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণা, (গ) মহাযুদ্ধোত্তর ভারতের বোম্বাই বন্দরে ভারতীয় নৌবাহিনীর বিদ্রোহ ইত্যাদির মধ্যে দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ইংরেজ রাজশক্তির একটি অংশ ভারতবাসীর মধ্যে সশস্ত্র পথে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার অদম্য ও দুর্দমনীয় স্পৃহা লক্ষ্য করে। স্মর্তব্য, ভারতকে আজাদী দান প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে ১৯৪২ সালের ১১ই মার্চ বৃটিশ সরকারের অন্যতম মন্ত্রী কূটনীতিক স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, ১৯৪৫ সালের জুন মাসে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়াভেল

আহূত সিমলা কনফারেন্স ও বৃটিশ পার্লামেন্টারী মিশন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিরাজমান মতভেদ নিরসনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মতভেদ ও মতামত যাচাই করিয়া ভারতকে স্বাধীনতা দান কল্পেই ক্যাবিনেট মিশনের ভারতে আগমন ঘটে।

বৃটিশ ক্যাবিনেট মিশন প্রায় দুই মাস ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনা এবং দেন-দরবারের পর ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক জটিলতা অপনোদন মানসে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলি সাধারণ্যে প্রকাশ করেঃ

(1) There should be a Union of India embracing both British-India & States which should deal with Foreign Affairs, Defence & Communications & should have the powers necessary to raise the finances required for the above subjcet.

(2) All subjects other than the Union subjects and all residuary powers should vest in the provinces.

(3) The states will retain all subjects & powers other than those added to the Union.

(4) Provinces should be free to form groups with Executives & Legislative Assembly & each group could determine the provincial subjects to be taken in common.

(5) The constitutions of the Union & of the groups should contain a provision whereby any province could by a majority votes of its legislative Assembly call for a reconsideration of the terms of the constitution after an initial period of ten years and at ten yearly intervals thereafter.

India be divided into 3 sectiohs.

Section-A Madras, Bombay, United Provinces, Behar, Central province & Orissa with 167 general seats & 20 Muslim seats.

Section-B Punjab, North West Frontier Province, Sind with a general seats, 22 Muslim seats & 4 shikh seats.

Section-C Bengal and Assam with 34 general seats & 36 Muslim seats.

অর্থাৎ

(১) বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ সমবায়ে ভারতীয় ইউনিয়ন সংগঠিত হওয়া উচিত, যাহার বিষয়াবলী থাকিবে পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা ও যোগাযোগ। উপরোক্ত বিষয়াবলীর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানোর আবশ্যকীয় ক্ষমতা থাকা উচিত।

(২) ইউনিয়ন অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বিষয়গুলি ব্যতীত সকল বিষয় এবং বাদ বাকী সর্বক্ষমতা প্রদেশগুলির উপর ন্যস্ত হওয়া উচিত।

(৩) কেন্দ্রীয় বিষয়গুলি ব্যতীত সকল বিষয় ও ক্ষমতা দেশীয় রাজ্যসমূহের আয়ত্তাধীন থাকিবে।

(৪) প্রশাসন ও আইন পরিষদসহ গ্রুপ গঠন প্রদেশগুলির এক্তিয়ারাধীন। কোন কোন প্রাদেশিক বিষয় সাধারণভাবে গ্রহণ করা হইবে তাহা প্রত্যেক গ্রুপই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৫) কেন্দ্রীয় ও গ্রুপগুলির সংবিধানে বিধান থাকা উচিত যে, প্রারম্ভিক দশ বৎসর এবং তৎপরবর্তী প্রত্যেক দশ বৎসর অন্তর অন্তর যে কোন প্রদেশ স্বীয় আইন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংবিধানের ধারাগুলি পুনঃ বিবেচনার দাবী করিতে পারিবে।

ভারতবর্ষকে তিনভাগে বিভক্ত করা হউক।

সেকশন-এঃ মাদ্রাজ, বোম্বে, সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, মধ্য প্রদেশ ও উড়িষ্যা- ১৬৭টি সাধারণ আসন ও ২০টি মুসলিম আসন।

সেকশন-বিঃ পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশ ৯টি সাধারণ আসন, ২২টি মুসলিম আসন ও ৪টি শিখ আসন।

সেকশন-সিঃ বঙ্গদেশ ও আসাম-৩৪টি সাধারণ আসন ও ৩৬টি মুসলিম আসন।

নেহরুর ভুলঃ হিন্দু মুসলিম ঐক্য প্রচেষ্টা বানচাল

২৪শে মে (১৯৪৬) নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি "স্বাধীন, অখণ্ড ও গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের" সংবিধান প্রণয়নকল্পে প্রস্তাবিত গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৬ই জুন (১৯৪৬) নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের গোপন বৈঠক ও ২৫শে জুন (১৯৪৬) নিখিল ভারত মুসলম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ছয়টি সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশাবলী যথা বঙ্গদেশ, আসাম, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান সমবায়ে একটি গ্রুপ গঠনের দাবী তুলিয়া ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান গ্রহণ করিয়া গণপরিষদে যোগ দিতে সম্মত হয়। কিন্তু ১০ই জুলাই (১৯৪৬) বোম্বে শহরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নিখিল ভারত কংগ্রেসের সদ্য নির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরুর অবিবেচনা প্রসূত ঘোষণা- "কংগ্রেস গণপরিষদ কেবলমাত্র অংশগ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছে এবং যাহা সর্বোৎকৃষ্ট মনে করে সেই মোতাবেক ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানকে পরিবর্তন বা সংশোধন করার ব্যাপারে নিজেকে স্বাধীন মনে করে-We are entirely and absolutely free to determine অর্থাৎ আমরা নির্ধারণ করার বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে ও নিঃশর্তভাবে স্বাধীন", মুসলিম লীগ মহলকে শঙ্কিত করে এবং অখণ্ড সর্বভারতীয় কাঠামো বজায় রাখার অধিকাংশ মহলের সর্বপ্রকার ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে বানচাল করে। অবশ্য নেহরুর মন্তব্যের প্রতিধ্বনি ১৯৪৭ সালের ২৫শে এপ্রিল ভারতীয় গণপরিষদের অধিবেশনে শোনা যায়। অতঃপর অখণ্ড ভারতের সংবিধান রচনার মানসে ভারতীয় গণপরিষদে যোগদান মর্মে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যমত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। বিদেশী ইংরেজ শাসকচক্র অবিভাজ্য ও অখণ্ড স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র কায়েমের প্রচেষ্টায় যখন আপ্রাণ চেষ্টায় নিয়োজিত, নিখিল ভারত কংগ্রেসের অখণ্ড ভারত দাবীদার অপরিপক্ক নেতৃবৃন্দ স্বীয় কার্যক্রম দ্বারা ভারতকে দ্বি-খণ্ডিত করার

হুতাসন যজ্ঞের সর্বপ্রকার আয়োজন করিয়া ফেলিলেন। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে তখনকার দিনে ভারতবাসীর মনে যে উচ্চাশা ও প্রত্যয় জন্মিয়াছিল, তাহা অচিরেই ধূলিসাৎ হইয়া গেল। ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া এক অশুভ ও অভিশপ্ত খাতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিষবাষ্পে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক এত বিষাক্ত হইল যে, হিন্দু মুসলমানের পাশাপাশি বাড়িতে সহঅবস্থান চিন্তার অতীত হইয়া পড়িল। পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশে স্বীয় বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া রিক্ত, পর্যদুস্ত ও সহায়সম্বলহীন হতভাগ্য লক্ষ লক্ষ লোক ভিনদেশযাত্রী হইল ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের শিকারে পরিণত হইল। স্বার্থপর ক্ষমতালোভী ভারতীয় নেতৃত্ব ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ঘৃণিত গোষ্ঠী হিসাবেই চিহ্নিত হইবে- ইহাই আমার তখনকার তরুণ বয়সের প্রতিক্রিয়া।

মুসলিম লীগের সিদ্ধান্ত

সাংবাদিক সম্মেলনে পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরুর মন্তব্যের পটভূমিকায় উদ্ভুত সমগ্র রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার নিমিত্ত কায়েদে আজম কর্তৃক আহূত ২৭, ২৮ ও ২৯শে জুলাই (১৯৪৬) বোম্বে শহরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের তিনদিন স্থায়ী বিশেষ অধিবেশন ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান গ্রহণ সম্পর্কিত পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া নিম্নোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেঃ

Whereas the council of the All India Muslim League has resolved to reject the proposals embodied in the statement of the Cabinet Delegation & the Viceroy dated 16th May 1946 due to the intransigence of the Congress on the one hand and the breach of faith with the Muslims by British Govt. on the other & whereas muslim India has exhausted without success all efforts to find a peaceful solution of the Indian problem by compromise & constitutional means & whereas the Congress is bent upon setting up Caste Hindu Raj in India with connivance of the British & whereas recent events have shown that power politics and not justic & fairplay are the deciding factors in Indian affairs, and whereas it has become abundantly clear that Muslims would not rest contented with anything less than the immediate establishment of an independent & fully sovereign state of pakistan & would resist any attempt to impose any constitution making machinery or any constitution long term or short term or the setting up of an interim Govt. at the centre without the approval or consent of the Muslim League, the council of the All India Muslim League is convinced that now time has come for the Muslim nation to resort to direct action to achieve Pakistan, to assert their just rights, to

vindicate their honour & to get rid of the present British slavery & the contemplated future Caste-Hindu dominations.

"The council calls upon the Muslim nation to stand as one man behind their sole representative authoritative organisation, the All India Muslim League and to be ready for every sacrifice."

"This council directs the working committee to prepare forthwith a programme of direct action to carry out the policy enunciated above & to organise Muslims for the coming struggle to be launched as & when necessary".

"As a protest against & in token of their deep resentment of the attitude of the British, this council calls upon the Muslims to renounce forthwith the titles conferred upon them by the Government."

অর্থাৎ "যেহেতু কংগ্রেসের অনমনীয়তা ও বৃটিশ সরকারের বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিল কেবিনেট ডেলিগেশন ও ভাইসরয় কর্তৃক ১৬ই মে (১৯৪৬) প্রদত্ত বিবৃতিতে সন্নিবেশিত প্রস্তাবাবলী প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত নিয়াছে, যেহেতু সমঝোতা ও নিয়মতান্ত্রিক পথে ভারতীয় সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে মুসলিম ভারত সর্বপ্রচেষ্টা নিঃশেষ করিয়াছে; যেহেতু বৃটিশের পরোক্ষ সমর্থনে বলীয়ান হইয়া কংগ্রেস বর্ণ-হিন্দু রাজ প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধ পরিকর; যেহেতু সাম্প্রতিক ঘটনাপঞ্জী প্রমাণ করিয়াছে যে, ভারতীয় ব্যাপারে ন্যায় বিচার ও নিরপেক্ষতা নয় বরং ক্ষমতার রাজনীতিই নির্ধারণী বিষয়বস্তু; যেহেতু ইহা সবিশেষ স্পষ্ট হইয়াছে যে, স্বাধীন ও পূর্ণ সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের তাৎক্ষণিক প্রতিষ্ঠা ব্যতীত ভারতীয় মুসলমান শান্ত থাকিবে না এবং মুসলিম লীগের অনুমোদন ও সম্মতি ব্যতীত কোন সংবিধান রচনাকারী সংস্থা অথবা দীর্ঘ মেয়াদী কিংবা স্বল্প মেয়াদী সংবিধান অথবা কেন্দ্রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের যে কোন প্রচেষ্টাকে বাধা দেবে; নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, পাকিস্তান অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আশ্রয় গ্রহণ করার, তাহাদের ন্যায্য অধিকার রক্ষা করার, তাহাদের সম্মান রক্ষা করার এবং বর্তমান বৃটিশ দাসত্ব ও ভবিষ্যৎ বর্ণ হিন্দু আধিপত্য ঝাড়িয়া ফেলিবার সময় মুসলিম জাতির জন্য আসিয়াছে।

"এই কাউন্সিল জাতিকে তাহাদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক সংগঠন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পিছনে দাঁড়াইবার ও যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুতি নিবার আহবান জানাইতেছে।"

"উপরে ঘোষিত নীতিকে কার্যকর করিতে ও প্রয়োজনবোধে আশু সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য মুসলমানদিগকে সংগঠিত করিতে অবিলম্বে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য ওয়ার্কিং কমিটিকে কাউন্সিল নির্দেশ দিতেছে।"

"ইংরেজের মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও তাহাদের গভীর ক্ষোভের প্রতীক হিসাবে সরকার প্রদত্ত সর্বপ্রকার খেতাব বর্জনের জন্য মুসলমানদের প্রতি এই কাউন্সিল আহবান জানাইতেছে"।

১৬ই আগস্ট, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাণ্ডবলীলা

উপরোক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ১৬ই আগস্টকে "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস" ঘোষণা করা হয় এবং খাজা নাজিমুদ্দিন, নওয়াব ইসমাইল ও চৌধুরী খালেকুজ্জামান সমবায়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি অব এ্যাকশন বা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। একদিকে ইংরেজ সরকার বিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাকে ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত, অন্যদিকে খেতাব বর্জনের নির্দেশে বিচলিত খেতাবধারী স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন কলিকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত এক সভায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া মন্তব্য করেন যে, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ইংরেজের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দুদের বিরুদ্ধে। মুসলিম লীগের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা খাজা নাজিমুদ্দিনের অপব্যাখ্যা সাম্প্রদায়িক হিন্দুদিগকে কলিকাতার বিভিন্ন এলাকায় সংগোপনে দাঙ্গা প্রস্তুতি নিতে ইন্ধন যোগাইয়াছিল, সাধারণ শান্তিপ্রিয় হিন্দুকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল। অথচ ২রা আগস্ট (১৯৪৬) মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বোম্বে নগরীতে অনুষ্ঠিত সভা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস কর্মসূচী নিম্ন প্রস্তাবাকারে ঘোষণা করেঃ

"Calls upon the Muslims of India to suspend all business on August 16, 1946 & to observe complete hartal"

অর্থাৎ "ভারতীয় মুসলমানদিগকে ১৬ই আগস্ট (১৯৪৬) সকল কাজ-কর্ম বন্ধ রাখিতে ও পূর্ণ হরতাল পালন করিতে আহবান জানাইতেছে।"

২২শে জুলাই (১৯৪৬) কেন্দ্রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব জানাইয়া ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস সভাপতি যথাক্রমে কায়েদে আজম ও পণ্ডিত নেহরুকে পত্রে সহযোগিতার আহবান জানান। কায়েদে আজমের পত্রে লর্ড ওয়াভেলকে ১৬ই জুন (১৯৪৬) ক্যাবিনেট মিশন ও ভাইসরয় প্রদত্ত যুক্ত ঘোষণা স্মরণ করাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও লর্ড ওয়াভেল ১২ই আগস্ট (১৯৪৬) পণ্ডিত নেহরুকে অন্তবর্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের দায়িত্ব দিলেন। ২রা সেপ্টেম্বর (১৯৪৬) পণ্ডিত নেহরু ১২ সদস্যবিশিষ্ট সরকার গঠন করেন। কেন্দ্রে একদলীয় কংগ্রেস সরকার গঠনের প্রস্তুতি দাঙ্গাবাজ সাম্প্রদায়িক হিন্দুদিগকে অত্যন্ত উৎসাহিত করিল।

তদানিন্তন বঙ্গীয় প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও কায়েদে আজম যদি সেদিন "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" সম্বন্ধে অপব্যাখ্যার অপরাধে স্যার নাজিমুদ্দিনের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে ১৬ই আগস্ট কলিকাতার রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় অনাহূত নিরীহ কলিকাতাবাসীকে প্রাণ দিতে হইত না। ধনে-জনে-মানে মুসলিম সম্প্রদায়ই সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র ভারতব্যাপী এমনকি বিদেশেও মুসলিম ও মুসলিম লীগ সরকার অর্থাৎ সোহরাওয়ার্দী সরকারকেও এই কলঙ্কময় অধ্যায়ের জন্য দায়ী হইতে

হইয়াছে। ইহার প্রতিক্রিয়ায় বিহারে নির্দোষ নিরীহ মুসলমানদিগকে উন্মত্ত সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের হাতে কচুকাটা হইতে হইয়াছে, অবলা নারীকে সতীত্ব হারাইতে হইয়াছে, ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত ও অগ্নিদাহ হইয়াছে। ইতিপূর্বে কলিকাতায় সংগঠিত নারকীয় দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় নোয়াখালী জেলার কতিপয় এলাকায় উগ্র সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের হাতে নিরপরাধ শান্তিপ্রিয় সাধারণ হিন্দুকে ধনে-জনে-মানে মাশুল দিতে হইয়াছে।

অথচ পাশাপাশি দৃষ্টান্ত ঢাকা শহরে ১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনকালে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই, যদিও ঢাকাই ছিল হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আখড়া। ইহাই হইল ঢাকার অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতা শামসুল হক ও শামসুদ্দিন আহমেদের স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন নেতৃত্বের কৃতিত্ব। জনাব হক ও জনাব আহমদ যথাক্রমে পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগ কর্মী শিবিরের কর্মাধ্যক্ষ ও ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক ছিলেন।

নোয়াখালীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর মহাত্মা গান্ধীর স্বয়ং দাঙ্গা দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে নোয়াখালীর পথে কলিকাতা পৌছার পূর্বদিন বিহারে মুসলিম নিধনযজ্ঞ শুরু হয়। অপেক্ষাকৃত শান্ত নোয়াখালীর পথে যাত্রা স্থগিত রাখিয়া সদ্য দাঙ্গা কবলিত বিহারই ছিল গান্ধীজীর উপযুক্ত কর্মস্থল। তবে, ঝানু রাজনীতিবিদ গান্ধীজী তাহা করিতে যাইবেন কেন? নোংরা রাজনীতির তাগিদে ঋষিতুল্য গান্ধীজীকেও কত নীচস্তরে নামিতে হইয়াছিল। গান্ধীজীর তখনকার দৃষ্টিতে 'সবার উপরে মানুষ সত্য' ছিল না, ছিল সবার উপরে রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার। এতদসত্ত্বেও বঙ্গীয় প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্বয়ং গান্ধীজীর নোয়াখালী যাত্রা ও অবস্থানের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা স্বীয় ব্যক্তিগত জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার মানসে গান্ধীজীর নোয়াখালী অবস্থানের সুযোগ গ্রহণ করিয়া অনর্থক স্থানীয় মুসলিম নেতৃত্বকে নানাভাবে পুলিশী হয়রানির শিকারে পরিণত করিয়াছিল। তাই প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ২রা ডিসেম্বর (১৯৪৬) মহাত্মা গান্ধীকে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগত পত্র লিখিয়াছিলেনঃ

"I appreciate very much your desire to bring about peace between the Hindus & Muslims of Bengal but Muslims feel that if you really wish to pursue your objective to establish good fellowship. Behar should be the real field. Your stay has encouraged many of your followers to manufacture evidence and to place it before you to carry on the persecution of the local Muslims, the local Muslim League Leaders, which will not possibly lead to mutual confidence in the near future."

অর্থাৎ "বাংলার হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আপনার ইচ্ছাকে আমি অতীব মূল্যবান জ্ঞান করি। তবে, মুসলমানরা মনে করে যে, আপনি যদি পারস্পরিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার নীতি বাস্তবিকই চালাইয়া যাইতে চান, তাহা হইলে বিহারই প্রকৃত ক্ষেত্র হওয়া উচিত। আপনার অবস্থান আপনার অনুগামীদের অনেককেই বানোয়াট প্রমাণাদি

উদ্ভাবন করিতে এবং স্থানীয় মুসলমান ও স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকে হয়রানি করার উদ্দেশ্যে আপনার সমীপে তাহা পেশ করিতে উৎসাহিত করিয়াছে, যাহা অদূর ভবিষ্যতে পারস্পারিক আস্থা স্থাপনে সম্ভবত সহায়ক হইবে না।"

২৪শে আগস্ট (১৯৪৬) কেন্দ্রে এক দলীয় কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ দান করিয়া গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়াভেল রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় বিধ্বস্ত কলিকাতা নগরী সরেজমিনে পরিদর্শন কল্পে ২৫শে আগস্ট কলিকাতা আগমন করিলেন। কলিকাতায় সোহরাওয়ার্দী-ওয়াভেল আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৪৬) কায়েদে আজমের সহিত তাঁহার বোম্বের 'মালাবার হিল' বাসভবনে সাক্ষাত করেন। কায়েদে আজমের সহিত আলোচনার পর ৮ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে পুনরায় সোহরাওয়ার্দী-ওয়াভেল বৈঠক হয়। সোহরাওয়ার্দী-ওয়াভেল বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে ৯ই সেপ্টেম্বর কায়েদে আজম দীর্ঘক্ষণ বৈঠকের পর ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৪৬) ভারতীয় সমস্যা নিরসনকল্পে সর্বদলীয় বৈঠকের আহবান জানান। গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়াভেলের আমন্ত্রণে ১৬ই এবং ১৮ই সেপ্টেম্বর কায়েদে আজম-ওয়াভেল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ভূপালের নওয়াবের উদ্যোগে গান্ধী-জিন্নাহ-ভূপাল নওয়াব একদফা আলোচনা হয়। আলোচনার পর গান্ধী ও জিন্নাহ যুক্ত বিবৃতিতে সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার আহবান জানান। স্মর্তব্য যে, ভারতীয় সমস্যা সমাধানকল্পে ১৯৪৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর কায়েদে আজমের বোম্বের মালাবার হিল বাসভবনে গান্ধী-জিন্নাহ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বটে; তবে ভারতের মেঘাচ্ছন্ন ভাগ্যাকাশে সূর্যোদয়ের কোন পূর্বাভাষ পাওয়া যায় নাই। বরং অনাগত ভবিষ্যত ভারতবাসীর জন্য বহিয়া আনে দুর্বিষহ দুঃখ ও যাতনা।

৪ঠা ও ৭ই অক্টোবর (১৯৪৬) দিল্লীস্থ ভূপাল হাউজে জিন্নাহ-নেহরু বৈঠক হয়। ১২ই ও ১৩ই অক্টোবর কায়েদে আজম-ওয়াভেল বৈঠকে ফলপ্রসূ আলোচনা হয় এবং ১৩ই অক্টোবর নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদানের প্রস্তাব গ্রহণ করে। তদানুযায়ী ২০শে নভেম্বর (১৯৪৬) জনাব লিয়াকত আলী খান (অর্থ), জনাব আই,আই, চুন্দ্রীগড় (বাণিজ্য), সরদার আবদুর রব নিশতার (যোগাযোগ), রাজা গজনফর আলী খান (স্বাস্থ্য) ও বাবু যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল (আইন) অর্ন্তবর্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ দেন। বাবু যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল পরিচালিত সিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের সর্বসময় মুসলিম লীগ সংগঠনের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ সহানুভূতি ছিল। তাই মুসলিম লীগ শ্রী মণ্ডলকে কেন্দ্রীয় সরকারের সদস্য হিসাবে মনোনীত করে। উক্ত সফল পরিণতির একক কৃতিত্ব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন জনাব সোহরাওয়ার্দীর।

আমাদের মত ক্ষুদ্র কর্মীদের তরুণ মন তখনকার নেতাদের আচরণে আশা-নিরাশায় দুলিতেছিল। দলমত নির্বিশেষে আমরা অতি আন্তরিকভাবেই ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের শুভ পরিণতি চাহিতেছিলাম। কিন্তু তাহাতো হইবার নহে। নেতাদের আত্মস্বার্থ তাহা হইতে দিবে কেন? তথাপি শেষরক্ষার কামনায় আল্লাহ আল্লাহ করিতে লাগিলাম। অনভিপ্রেতের সূত্রপাত হইল। ৯ই ডিসেম্বর (১৯৪৬) অনুষ্ঠিত ভারতীয় গণপরিষদের অধিবেশনে যোগদান করা হইতে মুসলিম লীগ বিরত রহিল।

বৃটিশ গভর্নমেন্ট ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৭) ঘোষণা করিলেন যে, ১৯৪৮ সালের জুনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে বৃটিশ সরকার বদ্ধপরিকর। ২২শে মার্চ (১৯৪৭) লর্ড মাউন্টব্যাটেন গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়াভেলের স্থলাভিষিক্ত হইয়াই ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরু ঘোষণা করিলেন যে, অনিচ্ছুক অংশ বাদ দিয়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় কংগ্রেসের কোন আপত্তি নাই। ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস-লীগ নেতৃবৃন্দের সহিত সবিশেষ বিস্তারিত আলোচনার পর ৩রা জুন (১৯৪৭) ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করিলেন। ইহাই বিখ্যাত "৩রা জুন পরিকল্পনা" নামে অভিহিত।

বঙ্গ ভঙ্গের দাবী

ভারত বিভাগ সম্ভাবনা আঁচ করিতে পারিয়া ভারতীয় হিন্দু মহাসভা নেতা বঙ্গ সন্তান ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী ২৩শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৭) এক বিবৃতিতে বঙ্গ বঙ্গের দাবি করেন এবং তদনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ৫ই এপ্রিল তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসম্মেলনে হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠ জেলাগুলোর সমবায়ে হিন্দুবঙ্গ প্রদেশ গঠন করার দাবি উত্থাপন করেন। উক্ত দাবীর ভিত্তিতেই নিখিল ভারত কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনী বঙ্গভঙ্গ দাবীর সমর্থনে মার্চ মাসে (১৯৪৭) প্রকাশ্য বিবৃতি দান করেন।

স্বাধীন বঙ্গের দাবী

উগ্র সাম্প্রদায়িক সর্বনাশা দাবীর বিরুদ্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি শ্রী সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টি নেতা শ্রী কিরণ শঙ্কর রায়, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর অগ্রজ শ্রী শরৎ চন্দ্র বসু, জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, জনাব আবুল হাশিম এমন কি খাজা নাজিমুদ্দিন ও জনাব ফজলুর রহমান স্বাধীন বঙ্গের আওয়াজ তুলিয়াছিলেন। জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৭ সালের ২৭শে এপ্রিল নয়াদিল্লীতে জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাধীন সার্বভৌম বঙ্গ প্রস্তাব দেশবাসীর সমীপে পেশ করেন। একই তারিখে খাজা নাজিমুদ্দিনও স্বাধীন সার্বভৌম বঙ্গদেশের দাবী উত্থাপন করিয়া বিবৃতি দান করেন। জনাব আবুল হাশিম ৩০শে এপ্রিল (১৯৪৭) এক বিবৃতিতে সার্বভৌম অখণ্ড বঙ্গদেশ প্রতিষ্ঠাবিরোধী শক্তির সকল যুক্তি খণ্ডন করিয়া বঙ্গবাসীর প্রতি ঐক্যের আহ্বান জানান। ১১ই মে (১৯৪৭) জনাব আবুল হাশিম ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর অগ্রজ শরৎ চন্দ্র বসু সোদপুর আশ্রমে গান্ধীজীর সহিত সার্বভৌম অখণ্ড বঙ্গদেশ প্রস্তাব আলোচনার জন্য এক বৈঠকে মিলিত হন। ১২ই মে (১৯৪৭) জনাব সোহওয়ার্দী তদীয় মন্ত্রীসভার সদস্য জনাব ফজলুর রহমানসহ সোদপুর আশ্রমে মহাত্মা গান্ধীর সহিত পুনঃসাক্ষাত করেন। স্বাধীন অখণ্ড বঙ্গদেশ প্রচেষ্টার অগ্রগতি অবহিত করার জন্য কায়েদে আজমের সহিত জনাব সোহরাওয়ার্দী দিল্লীতে ১৫ই মে এক বৈঠকে মিলিত হন। ইতিপূর্বে ২৮শে এপ্রিল দিল্লী হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের পর প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমুদ্দিন, আবুল

হাশিম, বঙ্গীয় মন্ত্রীসভার সদস্য ফজলুর রহমান এবং ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শরৎ চন্দ্র বসু ও ২৯শে এপ্রিল মুসলিম লীগ সাব কমিটির সদস্যবৃন্দ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, নূরুল আমিন, ফজলুর রহমান, হামিদুল হক চৌধুরী ও ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শরৎ চন্দ্র বসু এবং ৩০শে এপ্রিল মুসলিম লীগ সাব কমিটির সদস্যবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ও তদীয় মন্ত্রীসভার সদস্য ফজলুর রহমান, শরৎ চন্দ্র বসু ও কিরণ শঙ্কর রায় পৃথক পৃথকভাবে কয়েক দফা বৈঠকে নিম্নোক্ত প্রস্তাবাবলী আলোচনা করিয়াছিলেনঃ

১। বঙ্গদেশ একটি সার্বভৌম স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হইবে। সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রই ভারতের অন্যান্য অংশের সহিত সম্পর্ক নির্ধারণ করিবে।

২। সংবিধান রচনা ও চালু করার পর বঙ্গীয় আইন পরিষদ প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারে যুক্ত নির্বাচন ভিত্তিতে নির্বাচিত হইবে।

৩। উভয় পক্ষ কর্তৃক ১ম ও ২য় প্যারা গৃহীত হইলে ও বৃটিশ সরকার (এইচ,এম,জি) বঙ্গদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করিলে, বর্তমান মন্ত্রীসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে এবং প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত সমসংখ্যক মুসলমান ও হিন্দু (তফসিলী হিন্দুসহ) সমবায়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হইবে ও প্রধানমন্ত্রী মুসলমান হইবে।

৪। অন্তর্বর্তী সরকার তফসিলী জাতিসহ হিন্দু ও মুসলমানকে চাকুরীতে সমহারে নিয়োগ করিবে।

৫। ১৯৪৮ এর জুন বা তৎপূর্বে বৃটিশ সরকার বঙ্গীয় অন্তবর্তীকালীন সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিবে।

৬। সংবিধান রচনা করিতে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস যথাক্রমে ১৬ জন মুসলমান ও ১৪ জন হিন্দু একুণে ৩০ জন সদস্য বিশিষ্ট অস্থায়ী সংবিধান রচনাকারী সংস্থা গঠন করিবে।

বাংলাকে স্বাধীন ও অখন্ড রাখতে গভর্নর বরোজের প্রচেষ্টাঃ

Burrows efforts to keep Bengal independent

Sir Frederick Burrows, the Governor of Bengal, made a herculean effort to keep Bengal united and independent, Jinnah and the League had given wholehearted support to the idea. He was also supported by London but all his efforts were rendered fruitless. It was the machination of Patel, Nehru, and Gandhi that frustrated this magnificent initiative -Writes. K.Z. Islam.

On 17 May, 1947, the Secretary of State for India Lord Listowel circulated a memorandum of Draft Statement Policy for consideration on Mountbatten's arrival a revised version of the Viceroy's latest draft.

Among other points noted:

"4(a) The arguments for giving an option to Bengal to remain united are:

i) With or without Sylhet, Bengal is large enough to form an independent state.

ii) In any event Bengal, if it does not adhere to Hindustan, will be in effect a separate state even though politically linked with North-Western Pakistan. To give the option in this case does not therefore open us to the charge of balkanization.

iii) Partition would be most damaging to the inhabitants of Bengal owing to the economic consequences of separating a large part of the hinterland from Calcutta."

It appears that at the highest level of the British Government there still prevailed some enlightened appreciation of the Bengal situation as compared to Mountbatten's anti independent Bengal stance. Just before his departure for his final round of discussions with the British Cabinet Mountbatten wrote to Sir Frederick Burrows, Governor of Bengal:

"My talks with Nehru at Simla led me to believe that it is extremely unlikely that the Congress High Command will accept an independent Bengal or allow their followers to support such a proposal, as their view is that Bengal has no future except in Hindustan; but I do not mean by this meet I should wish Suhrawardy to abandon his efforts for unity."

In the crucial meeting of the India and Burma Committee held on 19 May, 1947, chaired by Prime Minister Attlee in which Mountbatten was present, Bengal was discussed. Mountbatten informed the meeting that the Bengal Governor was anxious that the Province should not be partitioned; Suhrawardy thought that it might be kept united on the basis of joint electorates and a Coalition Government. Jinnah considered that, with its Muslim majority, an independent Bengal would be a sort of subsidiary Pakistan and was therefore to agree to Suhrawardy's plan. Congress might also agree, but only on condition that Bengal did not form part of Pakistan and that special arrangements, which were unlikely to be acceptable to the Muslims, were made with the Central Government of Hindustan. They were opposed to Jinnah's proposal that Calcutta should become a free city as they believed that, without Calcutta, Eastern

Bengal might well, within 2 or 3 years, rejoin western part of the Province. Mountbatten had informed the parties that if, before 2 June, 1947 they were able to reach some agreement between themselves as to the future of the Province, he would embody such an agreement in the statement.

On 19 May, 1947, Governor of Bengal Sir Frederick Burrows cabled to Mountbatten in London.

The gist of his cable was that it contained a memorandum by Congress and League on Independent Bengal:

Burrows reported that the trend of Discussions among the League and Congress leaders was satisfactory and there was agreement in which Sarat Bose agreed to drop the proposed name 'Socialist Republic of Bengal' in favour of 'The Free State of Bengal.'

Burrows was impressed by the urgency of an immediate agreement if the British Government was to avoid reference to a possibility of partition of Bengal in proposals to be laid before Indian leaders on June 2nd and he had therefore discussed with Suhrawardy and Kiran Sankar Roy separately a new approach, namely, that their present attempts to settle the broad outlines of future constitution of Bengal and its links, if any, with rest. India as basis of a coalition should be reversed and that immediate steps be taken to form a coalition for bengal at once, Before content and text of Viceroy's paper of June 2nd are irrevocably settled, leaving these matters to be thrashed out in the coalition of the Bengal Constituent Assembly later. Burrows believed that when faced with formation of such a coalition in Bengal the high command of Congress could not repudiate it and that there were advantages in setting out to frame a constitution for a free state of Bengal untrammeled by conditions such as those set out in Sarat Bose's list of points. Suhrawardy agreed and said though he could persuade his part and Jinnah to accept this solution. Kiran Sankar Roy also gave Burrows his personal but very cordial agreement both as regards the line of action and to proposition that nothing else would avert bloodshed now or, at all events, after the British left. Kiran Sankar Roy was meeting representatives of his party and Sarat Bose that evening and would put the matter to them. Suhrawardy had made it plain to Burrows that the success of proposal,

from his point of view, depended entirely on his ability to assure his party that formation of a coalition then would avert any reference to partition of Bengal in statement of June 2nd.

As a result of his talks with the Governor Suhrawardy had great hopes of forming a Coalition Ministry. If that could be assured in time he hoped it would be possible for H.M. Government.

(i) to omit any reference in the statement to be made on June 2nd to the possibility that Bengal may be partitioned and

(ii) to omit any reference to ultimate or constitutional connections of future Bengal, tacitly leaving these to Bengal Constituent Assembly when Coalition Cabinet would get elected.

Mountbatten in his letter of 16 May, 1947, to Burrows had remarked that "Bengal is going to be a difficult case to fit into the new plan." Burrows hoped that solution on lines described above might assist but in any case he advocated it on its own merit and as a means, perhaps the only means, of averting grave disorders in Bengal. Burrows was not aware of the form the statement of june 2nd may then take but if reference to Bengal could be restricted to something on the following lines, it would meet wishes of leaders he had consulted and avoid immediate risks of a conflagration. The formula he suggested was "In Bengal where two major parties have recently agred to form a Coalition Ministry a separate Constituent Assembly will be elected to draft the future constitution."

The memorandum that the League and Congress leaders submitted said:

1. Bengal is to be a free independent State. The Free State of Bengal will decide its relations with the rest of India.

2. It is agreed that constitution of Bengal will provide for elections to Bengal Legislature on the basis of joint electorate with reservation of seats proportionate to the population among the Hindus and the Moslems. (The seats as between the Hindues and the Scheduled Castes will be distributed among them in order to give to the Scheduled Castes their existing proportion). The constituencies will be multiple constituencies and votes will be distributive and not cumulative. A candidate who gets majority of votes of his own community and 25 per cent of votes of other communities cast during the elections will be declared elected. If no candidate satisfies

these conditions, that candidate who gets largest number of votes of his own community will be elected. The franchise should be as wide as possible and should ultimately be adult franchise. In the case of women the franchise will be restricted on property qualification basis, as at present, for the next 10 years.

3. On the announcement that the proposal of Free State of Bengal has been accepted and that Bengal will not be partitioned, the present Bengal Ministry will be dissolved and a new Ministry brought into being consisting of an equal number of Moslems and Hindus (including Scheduled Caste Hindus) but excluding the Chief. In this Ministry, the Chief Minister will be a Moslem and the Home Minister a Hindu.

4. Pending the final emergence of a Legislature and a Ministry under a new constitution the Hindus (including the Scheduled Caste Hindus) and the Moslems will have an equal share in the Services includinhg military and police. The Services will be manned by Bengalis.

5. A Constituent Assembly composed of 30 persons, 16 Moslems and 14 Hindus, will be elected by the Moslem and non-Moslem members of Legislature or by the Moslem League and the Congress respectively. Power will be transferred to this Constituent Assembly on or before June 1948. Alternatively, the persons already elected to the Constituent Assembly from Bengal Legislature will form the Constituent Assembly of the Free State of Bengal.

It can be seen that Sir Frederick Burrows, the Governor of Bengal, made a Herculean effort to keep Bengal united and independent Jinnah and the League had given wholehearted support to the idea. Burrows had a very intimate and close appreciation of the situation prevailing in Bengal from the British point of view. He was supported by London but all his efforts were rendered fruitless. It was the machinations of Patel, Nehru and Gandhi that frustrated this magnificent initiative. Whether the people of Bengal would have been better off within an independent Bengal instead of being partitioned and becoming parts of two states still remains a question.

বাংলাকে স্বাধীন ও অখন্ড রাখতে
গভর্ণর বরোজের প্রচেষ্টা পণ্ড

বঙ্গের গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বরোজ বঙ্গদেশকে অখন্ড এবং স্বাধীন রাখার জন্য প্রচন্ড চেষ্টা করেছিলেন, জিন্নাহ এবং মুসলিম লীগ এ প্রয়াসের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দেন। তিনি লন্ডনের সমর্থনও পেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়। এই মহান উদ্যোগকে ভন্ডুল করে দেয় প্যাটেল, নেহরু এবং গান্ধী।

১৯৪৭ সনের মে মাসে ভারত সংক্রান্ত সেক্রেটারী অব স্টেট লর্ড লিস্টওয়েল মাউন্ট বেটনের সর্বশেষ খসড়া পূর্ণবিবেচনার জন্য একটি নীতি নির্ধারক স্মারক প্রেরণ করেন। এতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্তগুলো উল্লেখযোগ্যঃ

ক) বঙ্গদেশ অখন্ড রাখার পক্ষে যুক্তিগুলো হচ্ছে-

১) সিলেট সহ কিংবা সিলেট ব্যতিরেকে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য ভুখন্ডের দিক দিয়ে বেশ বড়।

২) যদি বঙ্গদেশ হিন্দুস্থানের সাথে যুক্ত না থাকে, তাহলে কার্যতঃ এটা একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রই হবে যদিও উত্তর পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে এ রাষ্ট্রের সম্পর্ক থাকতে পারে। শুধুমাত্র এ সংযোগের আশংকায় স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবকে দেশকে খন্ড বিখন্ড করার প্রয়াস হিসেবে গণ্য করা যায় না।

৩) বঙ্গবিভাগ এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনবে বিশেষতঃ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কারণ কলিকাতার একটি বিশাল পশ্চাদভূমি আলাদা হয়ে যাবে।

বৃটিশ সরকারের উচ্চ মহলে বঙ্গদেশ সম্পর্কে উদার চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। মাউন্টম্যান্টেনের স্বাধীন বঙ্গদেশ বিরোধী মনোভঙ্গির বিপরীতে।

বৃটিশ মন্ত্রীসভার সাথে সর্বশেষ আলোচনার জন্য যাওয়ার পূর্ব মূহূর্তে বঙ্গের গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বরোজকে লর্ড মাউন্টব্যাটান এক চিঠিতে লেখেন-

"শিমলায় নেহরুর সাথে আমার আলোচনার প্রেক্ষিতে বলতে পারি একটি স্বাধীন বঙ্গদেশ কংগ্রেস হাই কম্যান্ড যেমন মেনে নেবে না তেমনি তাদের অনুসারীদেরকেও এ ধরনের প্রস্তাব সমর্থন করতে দেবে না, তাদের ধারনা হচ্ছে হিন্দুস্থান ছাড়া বঙ্গের কোন ভবিষ্যত নেই। কিন্তু আমি এটা বোঝাতে চাচ্ছি না সোহরাওয়ার্দী তাঁর অখন্ড বঙ্গদেশ গঠনের উদ্যোগ থেকে নিবৃত্ত হন।

বৃটিশ সরকারের ভারত ও বার্মা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৭ সনের ১৯শে মে। মাউন্টব্যাটেন এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী এটলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বঙ্গদেশ প্রশ্নটি আলোচিত হয়। মাউন্টব্যাটেন প্রধানমন্ত্রীকে জানান যে বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবিভাগের ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। সোহরাওয়ার্দীর ধারণা ছিল এটাকে যুক্ত নির্বাচন এবং কোয়ালিশন সরকারের মাধ্যমে অখন্ড রাখা যায়। জিন্নাহ ভেবেছিলেন

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্পন্ন স্বাধীন বঙ্গদেশ এক ধরনের সাবসিডিয়ারী পাকিস্তানের মত হবে এবং সেজন্য সোহরাওয়ার্দীর পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন প্রদান করেন। কংগ্রেস হয়ত রাজী হত কিন্তু এ শর্তে যে বঙ্গদেশ যেন পাকিস্তানের অংশে পরিণত না হয় এবং হিন্দুস্থানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে যা নাকি কোন অবস্থাতেই মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হত না।

জিন্নাহ কলিকাতাকে 'ফ্রি সিটি" বা অবাধ নগরী হিসাবে চেয়েছিলেন যার বিরোধিতা করে কংগ্রেস কারণ তারা মনে করে কলিকাতা ছাড়া, পূর্ববঙ্গ দুই তিন বছরের মধ্যে প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে পূণর্বার যুক্ত হয়ে যেতে পারে। মাউন্টব্যাটেন রাজনৈতিক দলগুলোকে জানান যে প্রদেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে, যদি তারা ১৯৪৭ সনের ২রা জুনের আগে কোনরকম সমঝোতায় পৌছাতে পারে তাহলে তিনি তা তাঁর বিবৃতিতে সংযোজন করবেন।

১৯৪৭ সনের ১৯শে মে বঙ্গের গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বরোজ মাউন্টব্যাটেনকে এক তার বার্তা প্রেরণ করেন।

তাঁর তার বার্তায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের স্বাধীন বঙ্গদেশ সম্পর্কে তাদের স্ব স্ব স্মারক সন্নিবেশিত ছিল।

বরোজ জানালেন যে লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছে তা সন্তোষজনক এবং এমন একটি চুক্তি হয়েছে যার ফলে শরৎ বসু তাঁর প্রস্তাবিত "সমাজতান্ত্রিক বঙ্গদেশ প্রজাতন্ত্র" নামের পরিবর্তে "স্বাধীন বঙ্গদেশ" নাম রাখতে সম্মত হয়েছেন। ২রা জুন বঙ্গভঙ্গ সংক্রান্ত ভারত সরকারের প্রস্তাব ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে বৃটিশ সরকারের প্রস্তাব পেশ করার কথা ছিল-এ বিষয়টিকে সামনে রেখেই যাতে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব পেশ করা না হয় সেজন্য গভর্ণর বরোজ একটি আশু সমঝোতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং এ প্রেক্ষিতেই তিনি সোহরাওয়ার্দী এবং কিরণ শংকর রায়ের সাথে আলাদা আলাদা ভাবে এক নতুন আলোকে আলোচনা করেন। তাঁর নতুন প্রস্তাবের মধ্যে ছিল ভারতের অন্য যে কোন অংশের সাথে সম্ভাব্য সম্পর্ক সম্পর্কে তাঁদের পূবর্তন অবস্থানের পরিবর্তন সাধন করে কালবিলম্ব না করে বঙ্গদেশের জন্য একটি কোয়ালিশন প্রস্তাব গ্রহণের আশু পদক্ষেপ নেয়া অত্যাবশ্যক। ভাইসরয়ের ২রা জুনের প্রস্তাবনা বিতর্কাতীত ভাবে গৃহীত হওয়ার আগেই এ সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। অন্যান্য বিষয় বঙ্গীয় কোয়ালিশন সরকারের আইন সভায় আলোচনা করে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করা যাবে। বরোজের বিশ্বাস ছিল বঙ্গে এমন একটি কোয়ালিশনের প্রস্তাবের বিরোধিতা কংগ্রেস হাই কমান্ড করতে পারবে না এবং স্বাধীন বঙ্গ রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে অনেক সুবিধা রয়েছে যদি এতে শরৎ বসুর শর্তাবলী গুলো না থাকে। সোহরওয়ার্দী এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে যান তিনি বিশ্বাস করতেন যে এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তিনি জিন্নাহ ও তার দলকে রাজী করাতে পারবেন। কিরণ শংকর রায়ও বরোজের প্রস্তাবকে এবং এ ব্যাপারে প্রস্তাবিত পদক্ষেপের প্রতি তাঁর আন্তরিক সমর্থন স্থাপন করেন-যে পদক্ষেপে বৃটিশ থাকাকালে অথবা তাদের চলে যাওয়ার পরে রক্তপাত এড়ানো যাবে। কিরণ শংকর রায়ের সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর দলের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং শরৎ বসুর সাথে সাক্ষাত করার কথা। সোহরাওয়ার্দী অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন

যে, প্রস্তাবটির সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ২রা জুনের বিবৃতিতে বঙ্গ বিভাগ সম্পর্কিত কোন প্রস্তাব থাকবে না এ মর্মে তাঁর দলকে নিশ্চিত করার উপর।

গভর্ণরের সাথে আলোচনার পর একটি কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনের সাফল্য সম্পর্কে সোহরাওয়ার্দী প্রচন্ডভাবে আশান্বিত ছিলেন। যদি এটা নিশ্চিত করা যেত তাহলে বৃটিশ সরকারের পক্ষে

১) ২রা জুনের বিবৃতিতে বঙ্গ বিভাগ সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ না করা। এবং

২) ভবিষ্যত বঙ্গদেশের শাসনতান্ত্রিক সম্পর্কজনিত কোন প্রকার উল্লেখ না করে কৌশলে ভবিষ্যতের নির্বাচিতব্য কোয়ালিশন মন্ত্রী সভার উপর ন্যাস্ত করা।

মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সনের ১৬ই মে বরোজকে যে চিঠি লেখেন তাতে মন্তব্য করেন "বর্তমান পরিকল্পনায় বঙ্গকে সন্নিবেশিত করা কঠিন ব্যাপার।"

বরোজ মনে করেছিলেন যে উপরে বর্ণিত প্রস্তাব বঙ্গ সমস্যার সমাধানে সহায়ক হবে। কিন্তু প্রচন্ড নৈরাজ্য থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি বর্ণিত সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে উত্থাপন করেন। ২রা জুনের বিবৃতিতে কি থাকবে সে সম্পর্কে বরোজের কোন ধারনা ছিল না। তিনি যে ফর্মুলা দিয়েছিলেন তাতে বলা হয়েছিল "বঙ্গে দুটো প্রধান দল রয়েছে-সম্প্রতি তারা একটি কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনে সম্মত হয়েছেন এবং ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি আলাদা বিধান সভা নির্বাচিত হবে। লীগ এবং কংগ্রেস নেতারা তাদের স্মারকে যে উল্লেখ করেছিলেন তা নিম্নরূপঃ

ক) বঙ্গদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে। এ স্বাধীন দেশ ভারতের অন্য অংশের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ করবে।

খ) এ ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বঙ্গদেশের শাসনতন্ত্রে বঙ্গের আইন সভার নির্বাচন যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে হবে, এতে হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে আসন সংরক্ষিত থাকবে সিডিউল কাস্ট সম্প্রদায়ের এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আসন এমনভাবে সংরক্ষিত থাকবে যাতে সিডিউল কাষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য তাদের বর্তমান হারের আসন সংরক্ষিত থাকে।

নির্বাচনী এলাকা একটি হবে না অর্থাৎ ভোট পূর্ণভোটের ভিত্তিতে (cumulative) না হয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী থেকে প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে গণনা হবে। একজন প্রার্থী যদি তার নিজস্ব সম্প্রদায়ের মেজরিটি ভোট এবং অন্য সম্প্রদায়ের ভোটারদের ২৫ শতাংশ ভোট পায় তাহলে তাকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে। যদি কোন প্রার্থীর ক্ষেত্রে এ সব শর্তাবলী পুর্ণ না হয় তাহলে স্বীয় সম্প্রদায়ের সর্বাধিক ভোট থেকে তাকে নির্বাচিত ঘোষনা করা হবে। ভোটাধিকার যত বেশী সম্ভব ব্যাপক করা হবে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন হবে। বর্তমানে চালু পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পদের ভিত্তিতে ভোটাধিকার থেকে মহিলাদের ভোট দেয়া থেকে বিরত রাখা হবে।

গ) স্বাধীন বঙ্গদেশ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এবং বঙ্গ ভঙ্গ হবে না মর্মে ঘোষণা দেয়া হলে বর্তমানের বঙ্গীয় মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং একটি নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করা হবে। সে

মন্ত্রী সভায় মুসলমান ও হিন্দু (তফসিলী জাতিসহ) সমান সংখ্যক মন্ত্রী থাকবে কিন্তু এটা প্রধানমন্ত্রীর বেলায় প্রযোজ নয়। প্রধানমন্ত্রী হবেন মুসলমান এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হবেন হিন্দু।

ঘ) নতুন শাসনতন্ত্রের অধীনে একটি আইন সভা ও মন্ত্রী পরিষদ গঠন হওয়া পর্যন্ত হিন্দু সম্প্রদায় (তফসিলী জাতিসহ) এবং মুসলিম সম্প্রদায় চাকুরী বাকুরীতে সম সংখ্যক হবেন।

ঙ) গণ-পরিষদ সদস্য সংখ্যা হবে ৩০, ১৬ জন মুসলমান, ১৪জন হিন্দু। তারা মুসলমান ও হিন্দু অথবা মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। ১৯৪৮ সনের জুন মাসের আগে অথবা ঐ তারিখেই ক্ষমতা এ গণপরিষদে ন্যস্ত করতে হবে। বিকল্পভাবে, বঙ্গীয় আইন সভায় যারা ইতিমধ্যে বঙ্গীয় আইন সভা থেকে গণপরিষদে নির্বাচিত হয়েছেন তাদের সমন্বয়ে স্বাধীন বঙ্গ রাষ্ট্রের গণপরিষদ গঠিত হবে।

বঙ্গ-ভঙ্গ বনাম স্বাধীন বঙ্গ

বঙ্গীয় মুসলিম লীগ ও বঙ্গীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীন অখণ্ড বঙ্গ-আন্দোলন প্রয়াসে লিপ্ত থাকাকালীন অবাঙ্গালী হিন্দু নেতা আচার্য কৃপালনী, পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরু, পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন, সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল, চরম সাম্প্রদায়িক হিন্দু মহাসভা নেতা বঙ্গসন্তান শ্রী শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী সৃষ্ট বঙ্গ-ভঙ্গ দাবীকে সর্বভারতীয় প্রবল হিন্দু দাবীতে পরিণত করিয়াছিলেন। পরিহাস ও পরিতাপের বিষয়, যে হিন্দু সম্প্রদায় ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করার উদ্দেশ্যে ভারতে ও ভারতের বাহিরে এক অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন করিয়া সম্রাট পঞ্চম জর্জকে ১৯১১ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ ঘোষণা করিতে বাধ্য করাইয়াছিল, সেই হিন্দু সন্তানরাই ১৯৪৭ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ দাবীতে সমগ্র হিন্দু-ভারতকেই প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, ইংরেজ রাজের কুটিল সহায়তায় বঙ্গ-ভঙ্গ হইয়া গেল। বঙ্গীয় হিন্দু-মুসলিম নেতারা বাঙ্গালী জাতিকে সুসংঘবদ্ধ করার নিমিত্ত হিন্দু-মুসলিম সমস্যাকে বাস্তব দৃষ্টিতে মোকাবিলা করিতে স্বতঃই প্রয়াস পাইতেছিলেন। দূরদর্শী বিচক্ষণ বাঙ্গালী রাজনীতিজ্ঞ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ২৩শে এপ্রিল (১৯২৪) বেঙ্গল প্যাক্ট করেন। কিন্তু অবস্থা বৈগুণ্যে বিভ্রান্ত হইয়া তদীয় অনুগামী সুভাষ চন্দ্র বসু নিজ সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কৃষ্ণনগর কনফারেন্সে (১৯২৯) বেঙ্গল প্যাক্ট বা বঙ্গ চুক্তি বাতিল ঘোষণা করেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে নেতাজী এই ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইল না- ত্রিপুরী কংগ্রেস সম্মেলনে দ্বিতীয়বারের জন্য কায়েমী স্বার্থের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হইলেন বটে, তবে অবাঙ্গালী ঊর্ধ্বতন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কারসাজিতে অচিরেই পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। স্পষ্ট হইয়া গেল যে, অবাঙ্গালীরা কখনই বাঙ্গালী নেতৃত্বকে বরদাশত করিতে রাজী ছিল না। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু স্বীয় ভ্রম উপলব্ধি করিলেন ও তাঁহার রাজনৈতিক গুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া স্থানীয় সমঝোতার মাধ্যমে কলিকাতা মুসলিম লীগ নেতা আবদুর রহমান সিদ্দীকীকে কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র মনোনীত ও নির্বাচিত করিলেন। এইবারও বাঙ্গালী জাতির সঙ্কট মুহূর্তে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বঙ্গীয় কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্র মোহন

ঘোষ, কিরণ শঙ্কর রায় ও শরৎ চন্দ্র বসু এবং মুসলিম লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম মিলিতভাবে হিন্দু মুসলমানের স্বাধীন ও সার্বভৌম বঙ্গদেশ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহারা মহাত্মা গান্ধী ও কায়েদে আজমকে উপরে বর্ণিত খসড়া চুক্তির মর্ম অবহিত রাখিয়া চলিলেন। কিন্তু সর্বভারতীয় শীর্ষ নেতৃদ্বয় স্ব স্ব অহমিকা ও কর্তৃত্বের বশবর্তী হইয়া বঙ্গ-ভঙ্গ অপরিহার্য করিয়া তুলিলেন। আর সেই মুহূর্তেই বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমান উগ্র সাম্প্রদায়িকতার সর্বনাশা বিষপানে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। বঙ্গীয় কংগ্রেস-লীগ খসড়া চুক্তির কপিসহ ২৩শে মে (১৯৪৭) শ্রী শরৎ চন্দ্র বসু কর্তৃক লিখিত পত্রোত্তরে গান্ধীজীর ৮ই জুনের লিখিত জবাবের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলামঃ

"I have gone through your draft. I have now discussed the scheme roughly with pandit Nehru and Sardar Patel. Both of them are dead against the proposal,...... you should give up the struggle for Unity of Benglal & cease to disturb the atmosphere that has been created for the partition of Bengal."

অর্থাৎ "আপনার খসড়া আমি সম্পূর্ণ পাঠ করিয়াছি। পণ্ডিত নেহরু ও সর্দার প্যাটেলের সহিত স্কীমটি মোটামুটি আলোচনা করিয়াছি। তাঁহারা উভয়েই প্রস্তাবটির ঘোর বিরোধী- অখণ্ড বঙ্গদেশ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আপনার ত্যাগ করা উচিত এবং বঙ্গ-ভঙ্গের পক্ষে সৃষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বিনষ্ট করা হইতে বিরত হউন।"

কত কৌশলই না জানেন নেতারা! পূর্বাহ্নে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানকে বানচাল করার জন্য বঙ্গ-আসাম গ্রুপিংয়ের বিরুদ্ধে আসাম প্রদেশের সাম্প্রদায়িক প্রধানমন্ত্রী গোপীনাথ বরদৌলীর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রতিবাদের ঝড়কে কতই না উৎসাহ দিয়াছেন মহাত্মাজী। শ্রদ্ধাভাজন নেতারা বারবার সংকীর্ণ স্বার্থপ্রণোদিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আর দেশবাসী ও আমাদের মত তরুণ কর্মীরা হই তাহাদের হুতাশন-যজ্ঞের কাঠ খড়ি। আফসোসের বিষয়, এতদসত্ত্বেও বাঙ্গালী হিন্দুদের নিকট সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদই গৃহীত হইল-বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ নহে। আমার ধারণা, বর্তমান রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও রাষ্ট্রীয় সীমারেখা যাহাই হউক না কেন, ঐতিহাসিক অগ্রগতির এক পর্যায়ে লাহোর প্রস্তাবের সার্থক বাস্তবায়ন হইবে ও বৃহত্তর বঙ্গদেশ রাষ্ট্র গঠিত হইবে। ইহারই ইংগিত রাখিয়া গিয়াছেন শরৎ চন্দ্র বসু ও আবুল হাশিম। এই নেতৃদ্বয় ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৪৭) এক গোপন দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় বাংলা ভাষাভাষী বৃহত্তর বঙ্গদেশ গঠনের খসড়া প্রণয়ন করেন। প্রণীত খসড়া অনুযায়ী বিহার প্রদেশের বাংলা ভাষাভাষী পূর্নিয়া জেলা ও বঙ্গদেশের বর্ধমান ডিভিশনভুক্ত জেলাগুলি সমবায়ে পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ, প্রেসিডেন্সী ডিভিশন, রাজশাহী ডিভিশন, ঢাকা ডিভিশন, চট্টগ্রাম ডিভিশন ও শ্রীহট্ট জেলা সমবায়ে মধ্যপ্রদেশ এবং শ্রীহট্ট জেলা ব্যাতিরেকে আসাম প্রদেশের জেলা সমবায়ে পূর্ববঙ্গ প্রদেশ গঠিত হইবে। আর এই প্রদেশগুলির সমবায়ে গঠিত হইবে বৃহত্তর বঙ্গদেশ রাষ্ট্র।

মুসলিম লীগের সোহরাওয়ার্দী আবুল হাশিম নেতৃত্বাধীন অংশ ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট

direct action day পালন দিবসে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় অখন্ড বাংলার দাবীতে প্রধান মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তার ৪০ নং থিয়েটার রোডস্থ বাসভবনে এক প্রতিনিধিত্ব মূলক সভা আহ্বান করেন। উক্ত সভায় জনাব আবুল হাশিম, সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রী সভায় তফসিলী সম্প্রদায়ের মন্ত্রী শ্রী যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল, দৈনিক ইত্তেহাদের তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিঞা, অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস লীগের প্রাক্তন জেনারেল সেক্রেটারী নুরুদ্দিন আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান, পূর্ব বঙ্গ মুসলিম লীগের কর্মী শিবির নেতা পরবর্তীতে পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল সেক্রেটারী জনাব শামসুল হক, ঢাকা জেলা মুসলিম লীগ সম্পাদক সামসুদ্দিন আহমদ সহ অনেকেই যোগ দেন।

আমরা ঢাকায় বঙ্গ-ভঙ্গ অন্দোলনের বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়ে তুলিবার প্রচেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োজিত করিলাম। ছাত্র মহলই ছিল আমাদের কর্মক্ষেত্র। স্বাধীন ও সার্বভৌম অখণ্ড বঙ্গদেশ পরিকল্পনা সমর্থনে হিন্দু-মুসলিম ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা পরিচালনাকালে ছাত্রনেতা শ্রী সরোজ দাস ও শ্রী অজিত কুমার হাজরার সহিত আমার হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়। তখনকার উগ্র সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত হাওয়ায় দেশ জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও সংকল্প ও আদর্শের মিল আমাদিগকে ভ্রাতৃত্বের রাখী বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল।

পূর্বসূরী শরৎ চন্দ্র বসু, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিমের স্বপ্ন বাস্তবায়নের ভার উত্তরসূরী বংশধরদের উপর ন্যস্ত।

রাজা গোপাল আচারীর প্রস্তাব ঃ

১৯৪২ সালে বৃটিশ কুটনীতিক ও মন্ত্রী-স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস ভারতে আসেন। তিনি মুসলিম লীগ নেতা কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং কংগ্রেস নেতাদের সাথে আলোচনা করেন।

কংগ্রেসের অখন্ড ভারতের দাবী থাকলেও কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতা রাজা গোপাল আচারী স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এর কাছে এই মর্মে প্রস্তাব রাখেন যে- যে সমস্ত জেলাসমূহ ও নিকটবর্তী জেলা সমূহ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট সেগুলো একত্রে মুসলিম জোন এবং যে সমস্ত জেলা সমূহ ও নিকটবর্তী জেলা সমূহ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সেগুলি একত্রে হিন্দু জোন গঠিত হইবে।- ফলশ্রুতিতে পাঞ্জাব ও বেঙ্গল বিভক্ত হয়।

অন্যদিকে বাংলার গভর্নর মিঃ বরোজ এর প্রস্তাব ছিল গনভোটের।

মুসলিম লীগ কর্তৃক ৩রা জুন পরিকল্পনা গ্রহণ

নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিল ৫ই জুন (১৯৪৭) অধিবেশনে ইংরেজ সরকার ঘোষিত ভারত বিভাগজনিত ৩রা জুন পরিকল্পনা ৪০০-৮ ভোটে গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, নিখিল ভারত কংগ্রেসের অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় নেতা রাজা গোপালাচারী ১৯৪৩ সালে ক্রিপ্স মিশন ভারতে অবস্থানকালে কায়েদে আজমের সহিত আলোচনার সময় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির সমবায়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দিয়াছিলেন।

"৩রা জুন পরিকল্পনা" রাজা গোপালাগারীর প্রস্তাবের প্রায় অভিন্নরূপ। লাভের মধ্যে হইল হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের চরম অবনতি, ব্যাপক হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, লুঠ, রাহাজানী, অগ্নিসংযোগ ও মেয়েদের সতীত্ব হরণ। নেতাদের রহস্য সত্যি বুঝা দায়!

১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম অধ্যুষিত সীমান্ত প্রদেশে খান আবদুল গফ্ফার খান ও ডাঃ খান সাহেব ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস প্রার্থীরা মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে বিপুলভাবে জয়লাভ করে। তাই ৩রা জুন ঘোষণা মোতাবেক উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশবাসীদের মতামত যাচাইয়ের জন্য গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটে সীমান্ত প্রদেশবাসী পাকিস্তান রাষ্ট্রে যোগদানের রায় দেয়। তদনুরূপ আসাম প্রদেশভুক্ত শ্রীহট্ট জেলায় ৬ই ও ৭ই জুলাই (১৯৪৭) অনুষ্ঠিত গণভোটে শ্রীহট্ট জেলা পাকিস্তান রাষ্ট্রে যোগ দেয়। আমি কতিপয় বন্ধুসহ শ্রীহট্টে অনুষ্ঠিত গণভোটে অংশগ্রহণ করিয়াছিলাম।

পাকিস্তান ও ভারতের জন্ম

যথাক্রমে ১৪ই ও ১৫ই আগস্ট পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রদ্বয়ের জন্ম হইল। ভারতবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামের ফসল ভারত হইল বিভক্ত; পাঞ্জাব বিভক্ত হইল; বঙ্গদেশ বিভক্ত হইল; আসাম বিভক্ত হইল। লক্ষ লোকের কাফেলা বাস্তভিটা ত্যাগ করিয়া ভিন দেশ পানে যাত্রা করিল। যাত্রাপথে কেউ প্রাণ হারাইল, কেউ স্বদেশেই পলকের মধ্যে বিদেশী হইল ও রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যায় ভূষিত হইল, কেউ মুহূর্তের মধ্যে কাঙ্গাল ভিক্ষুকেও পরিণত হইল, কেউ গৃহহারা ও বাস্তহারা হইল। সমৃদ্ধশালী অতীত যেন অট্টহাসি হাসিতে লাগিল। একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীই ইহার নিদারুণ মর্মব্যথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, অন্য কেউ নয়। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ব্যথায় জর্জরিত হইয়াছি, কিন্তু প্রতিকার করার ক্ষমতা ছিল না; বিষাক্ত পারিপার্শ্বিকতা অসহায় করিয়া রাখিয়াছিল; মনুষ্যত্ববোধ, বিবেক, শিক্ষাদীক্ষা বিফল ছিল। নারকীয় আচার বাহবা কুড়াইত, পশুত্ব প্রদর্শনই ছিল বীরত্ব।

স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভাঃ

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ঠ নিম্ন লিখিত নেতৃবৃন্দদের নিয়া পাকিস্তানের প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভা গঠিত হয়-

১) নওয়াব জাদা লিয়াকত আলী খান- প্রধানমন্ত্রী ও দেশরক্ষা মন্ত্রী
২) স্যার জাফরুল্লাহ খান (আহম্মদীয়া সম্প্রদায়) -পররাষ্ট্র মন্ত্রী
৩) গোলাম মোহাম্মদ (আমলা) - অর্থ মন্ত্রী
৪) সরদার আবদুর রব নিশতার (সীমান্ত প্রদেশ)- যোগাযোগ মন্ত্রী
৫) শ্রী যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল তফসিলী সম্প্রদায়, পূর্ব পাকিস্তান
৬) ফজলুর রহমান (পূঃপাক) শিক্ষা ও শিল্প।
৭) পীরজাদা আবদুস সাত্তার (সিন্দু প্রদেশ) খাদ্য।
৮) খাজা শাহাবুদ্দিন (পূর্ব পাকিস্তান) তথ্য।

পাকিস্তানোত্তর রাজনৈতিক সূচনা

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব নয়, ১৯৪৬ সালের দিল্লী প্রস্তাব মোতাবেক ভারত খণ্ডিত হইয়া একটি পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম হইল। ২৭শে জুন (১৯৪৭) বঙ্গীয় মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ঢাকাকে পূর্ববঙ্গের রাজধানী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ৫ই আগষ্ট (১৯৪৭) পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি বৈঠকে খাজা নাজিমুদ্দীন ৭৫-৩৯ ভোটে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পরাজিত করিয়া পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা নির্বাচিত হইলেন।

আমি ঢাকা গভর্ণমেন্ট ইন্টারমিডিয়েট কলেজ হইতে ১৯৪৭ সালের ইন্টারমিডিয়েট বিজ্ঞান (Intermediate Science) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.কম.ক্লাশে সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র হিসাবে ভর্তি হইলাম।

অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী ও অবিভক্ত বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করায় আমরা (শহীদ-হাশিম গ্রুপ কর্মীবৃন্দ) পূর্ব পাকিস্তান রাজনীতিতে নেতৃত্বহীন হইয়া পড়িলাম।

বিভাগোত্তর সাম্প্রদায়িক কলহ

দেশ বিভাগোত্তরকালে সাম্প্রদায়িক কলহ ভারত ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর চরম আঘাত হানিল। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে হিন্দু জনতা এবং পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব পাঞ্জাব হইতে মুসলিম জনতা স্ব স্ব বাস্তভিটা ত্যাগ করিয়া ভিন্‌দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মহাত্মা গান্ধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধে ব্রতী হইলেন এবং মহানগরী কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া পাক-ভারত উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক শান্তিস্থাপন মিশনে আত্মনিয়োগ করিলেন। জনাব হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীও মহাত্মাজীর সহচর হিসাবে যোগদান করিলেন। বিভাগোত্তর কালে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় মহাত্মাজীর প্রচেষ্টাকে উগ্র সাম্প্রদায়িক ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ অত্যন্ত বিষ নজরে দেখিত। অবশেষে সেবক সংঘেরই অন্যতম সদস্য নাথুরাম গডসের পিস্তলের গুলীতে ৩০শে জানুয়ারী ১৯৪৮ মহাত্মাজী দিল্লীর প্রার্থনা সভায় প্রাণ হারাইলেন। সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহাত্মাজীর নৈতিক দায়িত্ববোধ কর্মদ্যোগ মানবকূলে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। গান্ধীজীর নির্মম হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পর কায়েদে আজমের উক্তি 'A great Hindu Leader' বা "এক মহান হিন্দু নেতা" কার্যতঃ সত্য হইলেও অনেককেই মর্মাহত করিয়াছিল। কলিকাতা ও পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় সংঘটিত মুসলিম নিধনযজ্ঞ বন্ধ করার দাবীতে মহাত্মা গান্ধীর অনশন ব্রত পালনের ফলেই দাঙ্গা প্রশমিত হয় এবং উল্লেখ্য যে, গান্ধীজী ৪ঠা সেপ্টেম্বর জনাব সোহ্রাওয়ার্দীর হস্তে কমলালেবুর রস গ্রহণ করিয়া অনশন ভঙ্গ করেন। গান্ধীজী তাঁহার সহজাত শুভবুদ্ধিতে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, পাক-ভারত সরকারদ্বয়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হইলেই হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাই ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের নির্দেশক্রমে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক পাকিস্তানকে দেয় ৫৫ কোটি টাকা পরিশোধ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলে মহাত্মা গান্ধী পাকিস্তানকে দেয়

টাকা পরিশোধের দাবীতে ও দিল্লীতে মুসলিম নিধনযজ্ঞের প্রতিবাদে পুনঃঅনশন ধর্মঘট ঘোষণা করেন। ধর্মান্ধ উগ্র সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা নির্মমভাবে গান্ধীজীর প্রাণ সংহার করিয়া এই মহান প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

সোহ্‌রাওয়ার্দীর কলিকাতা অবস্থানঃ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার প্রাণপণ প্রচেষ্টা

কায়েদে আজম কর্তৃক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত ইত্যাদি পদে নিয়োগ প্রদান সত্ত্বেও জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী বিভাগোত্তর ভারতে অবস্থানকারী চার কোটি মুসলমানের জান-মাল-ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধানের মহান দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারত বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নেতাদের ন্যায় পাকিস্তান অভিমুখে রওয়ানা হন নাই। তিনি প্রাণভয় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া উভয় রাষ্ট্রের হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক স্বাভাবিক ও মানবিকরণ প্রয়াসে "সংখ্যালঘু সনদ" তৈয়ারী করিয়া দিল্লী ও করাচী সরকারদ্বয়ের নিকট ধর্না দিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণর ডঃ কৈলাশ নাথ কাট্‌জু ও মুখ্য মন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষকে পূর্ব বঙ্গ শুভেচ্ছা সফরে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, কলিকাতা শান্তি সেনা গঠন করিয়াছেন, স্বয়ং ৩রা জুন ১৯৪৮ শান্তি মিশনে ঢাকা আগমন করিয়াছেন-যদিও খাজা নাজিমুদ্দিন সরকার শহীদ মিশন নিয়া ঢাকা আসিবার অর্থ বহির্বিশ্বে পাকিস্তানের উপর কলঙ্ক আরোপ ইত্যাদি অপব্যাখ্যা ও অপবাদ দিয়া পূর্ব বঙ্গ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা যত উৎসাহের সহিত শহীদ সাহেবকে বরণ করিয়াছিলাম, তাহার লক্ষগুণ মলিন বদনে তাঁহাকে ঢাকা ত্যাগ কালে বিদায় দিয়াছিলাম।

বিভাগোত্তর যুগে ভারতীয় মুসলমানদের মনে সাহস ও বলদানের উদ্দেশ্যে সোহরাওয়ার্দী সাহেব কলিকাতায় থিয়েটার রোডস্থ স্বীয় বাসভবনে ৯ই ও ১০ই নভেম্বর (১৯৪৭) ভারতীয় মুসলিম কনভেনশন অনুষ্ঠান করিলেন এবং তথা হইতে সংখ্যালঘুদের দেশপ্রেমে সন্দেহ প্রকাশ না করিতে ও "সংখ্যালঘু সনদ" গ্রহণ করিতে পাক-ভারত সরকারদ্বয়ের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাইলেন।

পাকিস্তান ও পূর্ববঙ্গ নেতৃত্বের প্রতি প্রগতিশীল কর্মীদের বীতশ্রদ্ধা

জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও জনাব আবুল হাশিমের নেতৃত্বে আমরা যাহারা মুসলিম লীগ বা মুসলিম ছাত্রলীগ সংগঠনের কর্মী ছিলাম, তাহারা ভারত ও বঙ্গ বিভাগের পর পাকিস্তান ও পূর্ববঙ্গ নেতৃত্বের উপর নিম্নোক্ত কারণে বীতশ্রদ্ধ ছিলামঃ

প্রথমতঃ ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চে গৃহীত "লাহোর প্রস্তাব" কে সংশোধন করিয়া ১৯৪৬ সালের ৯ই এপ্রিল লেজিসলেটারস্ কনভেনশনে অন্যায় ও অবৈধভাবে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে দুইটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের স্থলে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনমর্মে 'দিল্লী প্রস্তাব' ভারতীয় মুসলিম জনতার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ জনাব সোহরাওয়ার্দী কলিকাতা ও দার্জিলিং শহরদ্বয়কে বার্লিনের ন্যায় মুক্ত শহরে পরিণত করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। পরিতাপের বিষয়, শেরে বাংলা এ,কে,

ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত প্রখ্যাত ও বিখ্যাত আইনজীবিদিগকে নিয়োগ না করিয়া কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতৃত্ব বিহারের এক অবাঙ্গালী অখ্যাত আইনজীবি জনাব ওয়াসিমকে 'বাউণ্ডারী কমিশনের' সামনে ওকালতির জন্য নিযুক্ত করিল। বঙ্গীয় মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ২৭শে জুনের সভায় এক প্রস্তাবে ঢাকাকে পূর্ববঙ্গের অস্থায়ী রাজধানী করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আকরম-নাজিম চক্রের ভয় ছিল শেরে বাংলা সোহরাওয়ার্দীর যুগপৎ ক্ষুরধার সওয়াল-জওয়াবে যদি সাফল্য অর্জিত হয়, তাহা হইলে মুসলিম বাংলার হৃদয়ে তাঁহারা স্থায়ী আসন পাইয়া যাইবেন এবং পাকিস্তান রাজনীতিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন। তাই লিয়াকত-নাজিম চক্র নবগঠিত রাষ্ট্রের স্বার্থ হানিকর কার্য সজ্ঞানে করিতে এতটুকু বিবেক দংশনবোধ করে নাই। ক্ষমতার কুটিল অভিযানে সবই হয়।

তৃতীয়তঃ দায়-সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করিবার জন্য বেঙ্গল পার্টিশান কাউন্সিলে মুসলিম লীগ প্রতিনিধি ছিলেন জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমুদ্দিন এবং কংগ্রেস প্রতিনিধিদ্বয় ছিলেন বাবু নলিনী রঞ্জন সরকার ও বাবু ধীরেন মুখোপাধ্যায়। গভর্ণর আর, জি, কেসী ছিলেন চেয়ারম্যান। কেন্দ্রীয় পার্টিশান কাউন্সিলে মুসলিম লীগ প্রতিনিধি ছিলেন নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলী এবং কংগ্রেস প্রতিনিধিদ্বয় ছিলেন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ও আই, এম, প্যাটেল। গভর্ণর জেনারেল মাউন্ট ব্যাটেন স্বয়ং চেয়ারম্যান ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব দালান-কোঠা, ইমারত, স্থাবর সম্পত্তি ইত্যাদি মার্কেট ভেল্যুতে মুল্যায়ন দাবী করিলে কংগ্রেস প্রতিনিধি বুক ভেল্যু মুল্যায়ন প্রস্তাব করেন। বেঙ্গল পার্টিশান কাউন্সিল একমত হইতে না পারায় কেন্দ্রীয় পার্টিশান কাউন্সিলে সিদ্ধান্তের জন্য পাঠান হইল। পার্টিশান কাউন্সিল নীতিগতভাবে সম্পত্তির মূল্যায়ন করিল বুক ভেল্যু অনুসারে। এইরূপে বিনা ক্ষতিপূরণে কলিকাতা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তান পাইল লাহোর, করাচী, পেশোয়ার ও কোয়েটা শহরসমূহ এক প্রকার বিনা অর্থব্যয়ে। এভাবে শুরুতেই পূর্ববঙ্গ বঞ্চিত হইতে লাগিল।

পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুব লীগের জন্ম

পূর্বেই বলিয়াছি, জনাব সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের ভারত অবস্থান হেতু তাঁহাদের অনুসারী ও সমর্থকবৃন্দ পূর্ববঙ্গে সবিশেষ হতাশ ও হতোদ্যম হইয়া পড়েন। স্মরণীয় যে, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি পদ হইতে ইস্তফা দিলে, উক্ত শূন্য আসন নির্বাচনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তদানিন্তন সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল হাশিম এবং আকরম-নাজিম চক্রের সমর্থনপুষ্ট শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হক সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতাকালে বঙ্গীয় প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রত্যক্ষভাবে জনাব আবুল হাশিমকে সমর্থন জানান নাই এবং ১৯৪৭ সালের ৫ই আগষ্ট পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী নেতা নির্বাচনে খাজা নাজিমুদ্দিনের বিরুদ্ধে জনাব সোহরাওয়ার্দীকে আবুল হাশিম সক্রিয় সমর্থন না দেওয়াতে কার্যতঃ সোহরাওয়ার্দী-হাশিম জোট সমর্থকবৃন্দ দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া গেলেন। এমতাবস্থায় কর্মীদের স্তিমিত সাহস ও উদ্যম

পুনর্জাগরণ প্রয়াসে তরুণ নেতা শামসুল হক সাহেব ১৫০ নং মোগলটুলীতে (ঢাকা) কর্মীসভা আহবান করিয়া বিভাগোত্তর রাজনীতিতে ভূমিকা নির্ধারণকল্পে যুব সম্মেলন আহবানের প্রস্তাব করিলেন। জনাব কফিলুদ্দিন চৌধুরীকে সভাপতি ও জনাব শামসুল হককে সম্পাদক নিয়োগ করিয়া একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হইল। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান খান সাহেব আবুল হাসনাতের বেচারাম দেউড়ীস্থ বাসভবনের হল কামরায় ৬ই ও ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ মহাউৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল। জনাব তসাদ্দক আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ২৫সদস্য বিশিষ্ট পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুব লীগ (Pakistan Democratic youth League) গঠিত হয়। সদ্য আজাদী প্রাপ্ত পাকিস্তানের মাটিতে উজীরে আলা নাজিমুদ্দিন ও আকরম খাঁ পরিচালিত ধর্মান্ধ রক্ষণশীল মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সম্মেলন বিরোধী ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করিয়া ও মুসলিম লীগের জনসমর্থিত দোর্দণ্ডপ্রতাপকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি প্রদর্শনপূর্বক সম্মেলনের জন্য তাঁহার বাসভবনকে ব্যবহার করিতে দিয়া এবং সম্মেলনের উদ্যোক্তা ও অংশগ্রহণকারীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে গিয়া জনাব আবুল হাসনাত যে সাহসিকতা, সহৃদয়তা ও দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিয়াছিলেন, সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা তাহা আমৃত্যু কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবেন। ট্রাকে ট্রাকে মুসলিম লীগ বাহিনীর সম্মেলন বিরোধী অসৌজন্যমূলক শ্লোগানসহ ঢাকা নগর প্রদক্ষিণ ও সম্মেলন সম্পর্কে ঢাকাবাসীর বিরূপ মনোভাব ভুলিবার নহে। আমরা সেদিন ঢাকাবাসীদের দৃষ্টিতে ভারত কর্তৃক নিয়োজিত পাকিস্তান বিধ্বংসী ভারতীয় চর বিশেষ ছিলাম। তবে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জনগণ এই চেনা মুখগুলিকেই মাঠে ময়দানে ও পুরোভাগে দেখিয়াছে, তাই কিছুটা সংশয়ও তাহাদের মনের কোণে ছিল বৈকি।

গণ আজাদী লীগ

লাহোর প্রস্তাবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া এক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা, ৩রা জুন (১৯৪৭) প্ল্যান ঘোষনা অনুযায়ী ভারত বিভাগকালে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ কর্তৃক অবাঙ্গালী নেতৃত্বে বাউন্ডারী কমিশন গঠন ও পার্টিশান কাউন্সিলে পূর্ববঙ্গকে হৃদয়হীনভাবে বঞ্চিত করিবার তিক্ত অভিজ্ঞতাকে স্মরণে রাখিয়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কিছুকালের মধ্যে আমি ও সর্বজনাব কমরুদ্দিন আহমদ, তাজুদ্দিন আহমদ, নইমুদ্দিন আহমদ ও মোঃ তোয়াহা ধারাবাহিক আলোচনার প্রেক্ষিতে জনাব কমরুদ্দিন আহমদকে আহবায়ক নিযুক্ত করিয়া 'গণ আজাদী লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করি। লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কল্পনায় আমরা পূর্ব পাকিস্তানকে একটি ভিন্ন রাষ্ট্রজ্ঞান করিয়া পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক ঘোষণা পত্র জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছিলাম। যতটা ছিল সংকল্প, তাহার চাইতে বহুগণ বেশি ছিল বাঙ্গালী বিদ্বেষী কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আক্রোশ ও রাগের অভিব্যক্তি। দুঃখের বিষয়, গণ আজাদী লীগ গণ-সংগঠনে পরিণত হইতে পারে নাই। ইহার কারণ, প্রথমতঃ আহবায়ক কমরুদ্দিন আহমদের কর্ম-বিমুখ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা, কারাগার ভীতি ও ত্যাগী মনোভাবের অভাব, দ্বিতীয়তঃ সমগ্র দেশে উৎকট সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত আবহাওয়া, তৃতীয়তঃ তদানীন্তন

মুসলিম লীগ সরকারের কঠোর দমননীতি।

নাজিমুদ্দিনের এক চোখা নীতিঃ মওলানা ভাসানীর আগমন

খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের সোহরাওয়ার্দী সমর্থক কাহাকেও তাঁহার মন্ত্রী সভায় গ্রহণ করেন নাই। এমনকি অবিভক্ত বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী কেবিনেটের সদস্যগণ সর্বজনাব মোহাম্মদ আলী চৌধুরী (বগুড়া), আহমদ হোসেন (রংপুর), আবদুল গোফরান (নোয়াখালী) পূর্ববঙ্গ সরকারের মন্ত্রীসভায় স্থান পান নাই। ডাঃ আবদুল মালেক, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের ডেপুটি স্পীকার তফাজ্জল আলী, আবদুস সবুর খান ও জনাবা আনোয়ারা খাতুন প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অবস্থাদৃষ্টে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এমনি জটিল হতাশা ব্যাঞ্জক পরিস্থিতিতে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এদেশে আসিলেন এবং সরকার বিরোধী শক্তিকে সংগঠিত করার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন।

উল্লেখ্য যে, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ইস্ট হাউজের দক্ষিণদিকের মাঠে অনুষ্ঠিত এক সভায় সর্বপ্রথম ভাষণদান করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন হলের আবাসিক ছাত্র আবদুর রহমান চৌধুরী। মওলানার তেজোদৃপ্ত ভাষণের মধ্য দিয়া এই সভায়ই সরকার বিরোধী ছাত্র শক্তি ও জননেতার মধ্যে যোগসূত্রের সূচনা হয়। আমরা বৃদ্ধ নেতার মধ্যে আগামী দিনের সম্ভাব্য নেতৃত্বের আভাস পাই, যাহা আমরা ইতিপূর্বে পাঞ্জাবের মিঞা ইফতেখার উদ্দিন কিংবা সিন্ধুর পীরজাদা আবদুস সাত্তারের বক্তৃতায় পাই নাই।

আজাদী উত্তর ছাত্র অসন্তোষ

প্রশাসনিক অব্যবস্থার দরুণ ঢাকায় পর্বত প্রমাণ ছাত্র সমস্যা দেখা দেয়। নাজিমুদ্দিন সরকার সমর্থক শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত নিখিল বঙ্গীয় মুসলিম ছাত্রলীগ স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াসে ব্যতিব্যস্ত থাকার দরুন ছাত্র অসন্তোষ ধূমায়িত হইতে থাকে। ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে বর্তমান স্থান হইতে ঢাকা মেডিকেল কলেজকে স্থানান্তরিত করিবার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবং ঢাকা মিটফোর্ড স্কুল ছাত্রদের কনডেন্সড এম,বি,বি,এস, কোর্স ও আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল ছাত্রদের কনডেন্সড ডিগ্রীকোর্স প্রবর্তন করিবার দাবীতে ঢাকা শহরের ছাত্র সমাজ বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। সমগ্র শহরে পূর্ণ ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়, সভা হয়, মিছিল হয় এবং মিছিল সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এ (ইডেন বিল্ডিং) গমন করে। ইডেন বিল্ডিং-এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মিছিল জমায়েতে আমি দীর্ঘ সময় বক্তৃতা করি এবং আমাদের দাবী মানার জন্য নাজিমুদ্দিন সরকারের নিকট আবেদন জানাই। সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীবৃন্দ স্বীয় কাজ ফেলিয়া, সর্বপ্রকার শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া আমাদের সভায় যোগ দেয়। যাহা হউক, অবস্থা বেগতিক দেখিয়া প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন স্বয়ং দ্বিতল ব্যালকনিতে আসিয়া আমাদের দাবী মানার সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষনা করেন। আমরা

হৃষ্টচিত্তে স্থান ত্যাগ করি। ছাত্র আন্দোলনের প্রারম্ভিক বিজয় আমার মনে নূতন সাহস ও উদ্যমের সঞ্চার করিল। শাহ আজিজুর রহমান পরিচালিত নিখিল বঙ্গীয় মুসলিম ছাত্রলীগ ছাত্র-সাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল এবং সোহরাওয়ার্দী-হাশিম জোট সমর্থক ছাত্র কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি পাইতে শুরু করিল। অতঃপর আমরা প্রতিটি ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে লাগিলাম। ছাত্র নেতা জনাব নুরুদ্দিন আহমদ কলিকাতা হইতে ঢাকা না আসিলেও তদীয় গ্রুপের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যথা আবদুর রহমান চৌধুরী ও শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন। জনাব আবদুল মতিন খান চৌধুরী (বর্তমান হাইকোর্ট জজ) পূর্ব হইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্রনেতা ছিলেন। তাঁহাদেরই সহায়তায় ছাত্র সমাজে ক্রমশঃ আমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্মরণীয় যে, ৩১শে আগস্ট, (১৯৪৭) জনাব আজিজ আহমদের সভাপতিত্বে ফজলুল হক হল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিতব্য ছাত্রসভাকে ভীত সন্ত্রস্ত সরকার সমর্থক ছাত্ররা গুণ্ডামীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বানচাল করিয়া দেয়।

সরকার বিরোধী মনোভাবের সূচনা

বাঙ্গালী উঠতি মধ্যবিত্ত, সরকারী নিম্ন বেতন ভুক কর্মচারী সম্প্রদায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। কলিকাতা হইতে ঢাকা সেক্রেটারীয়েটে ও অন্যান্য অফিসে কাজে যোগদানের পর সরকারী কর্মচারীগণ নানা সমস্যায় যথা-বাসস্থান ইত্যাদিতে জর্জরিত হইয়া পড়িল। বিভাগীয় শহর ঢাকা সদ্য আজাদী প্রাপ্ত দেশের পূর্বাঞ্চলের রাজধানীতে পরিণত হওয়ায় বাসস্থান সমস্যা নিরসনকল্পে সরকারকে অতিদ্রুত পলাশী ব্যারাক, নীলক্ষেত ব্যারাক নির্মাণ করিতে হয়। স্বাভাবিক বোধগম্য কারণেই পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও অন্যান্য দৈনন্দিন জীবন যাপনের নিত্যাবশ্যকীয় সরবরাহ অহরহ বিঘ্নিত হইতে থাকে। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসেই নীলক্ষেত ব্যারাকবাসী নিম্ন বেতন ভুক কর্মচারীগণ পানির অভাবে অতিষ্ঠ হইয়া ভোর বেলা লোটা-বদনাসহ প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে পানির দাবীতে বিক্ষোভ মিছিলসহ উপস্থিত হয়। এইভাবেই সরকার বিরোধী মনোভাব সমাজের বিভিন্ন স্তরে খন্ড ভাবে দানা বাধিতে থাকে।

নাজিমুদ্দিনের স্থবিরতা ও উর্দুভাষীদের দৌরাত্ম্য

প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন স্থবির ও অত্যন্ত পশ্চাদমুখী চিন্তাধারার নেতা ছিলেন। পূর্ববঙ্গের মত স্পর্শকাতর এলাকার শাসনভার চালাইবার মত মানসিক গড়ন তাঁহার ছিল না। তিনি নিজে উর্দুভাষী পরিবারের সন্তান এবং বাংলা ভাষায় তাঁহার কোন দখল ছিল না। তাঁহার পরিবার কাশ্মীর হইতে ঢাকায় আসেন। সুতরাং পূর্ববঙ্গের জলবায়ু ও মাটির সন্তানদের সহিত তাঁহার নাড়ীর সম্পর্ক ছিল না। ভাষায়, সংস্কৃতিতে, চলাফেরায় তিনি মূলতঃ আপনজন ছিলেন না। ভাগ্যান্বেষণে তাঁহার পূর্বপুরুষগণ পূর্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন এবং ইংরেজের অনুগ্রহে এদেশে সামন্ত প্রভুশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং শোষণই

ছিল তাঁহাদের মূল পেশা, পূর্ববঙ্গবাসীর সহিত আত্মিক সম্বন্ধ তাঁহাদের হয় নাই। তাই তাঁহার আমলে, সূচনাতেই উচ্চপদস্থ উর্দুভাষী সরকারী কর্মচারীগণ প্রভুসুলভ আচরণ শুরু করেন। তাহাদের মুখের ভাষাকে বাংলা ভাষাভাষী সমগ্র অধিবাসীদের উপর চাপাইয়া দেওয়ার প্রয়াসে রেডিও প্রোগ্রামে ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলা শব্দের পরিবর্তে উর্দু শব্দ যথা- রাষ্ট্র প্রধানের স্থলে সদরে রিয়াসাত, স্থিরীকৃত স্থলে মোকররার, প্রধানমন্ত্রীর স্থলে উজীরে আজম, মুখ্যমন্ত্রীর স্থলে উজীরে আলা, মন্ত্রীর স্থলে উজির, প্রতিনিধির স্থলে নোমায়েন্দা, সংবাদের স্থলে এলান, ছবির স্থলে তসবির ইত্যাদি যথেচ্ছ ব্যবহার করতে শুরু করে। এমনকি মনিঅর্ডার ফরম, টেলিগ্রাম ফরম, ডাক টিকিট ও মুদ্রায় উর্দু ভাষা ব্যবহৃত হইতে থাকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই ১৯৪৭ সালের ১৮ই মে মজলিসে-ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের উদ্যোগে হায়দারাবাদে অনুষ্ঠিত উর্দু সম্মেলনে যুক্ত প্রদেশ মুসলিম লীগ নেতারা পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা উর্দু হইবে বলিয়া ঘোষনা করিয়াছিলেন। উপরোক্ত বক্তৃতাংশে উর্দুভাষী মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের প্রকৃত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এবং আজাদী-উত্তর পাকিস্তানের প্রশাসনে উর্দুভাষী সরকারী চাকুরেদের মধ্যে ইহার বাস্তবরূপ তাহাদের কার্যকলাপে প্রতিফলিত হয়।

মহান ভাষা আন্দোলনের গোড়া পত্তন

উপরে বর্ণিত কারণেই স্বাভাবিকভাবে বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রতিবাদমুখর হইয়া উঠিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপকদ্বয় আবুল কাসেম ও নূরুল হক ভূঁইয়া ধুমায়িত অসন্তোষকে সাংগঠনিক রূপদান প্রচেষ্টায় ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস গঠন করেন। নব গঠিত তমদ্দুন মজলিসই মহান ভাষা আন্দোলনের গোড়াপত্তন করে। অক্টোবরে (১৯৪৭) পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ও পূর্ববঙ্গ সরকারের মন্ত্রী, সাহিত্যিক হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরীর সভাপতিত্বে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষারূপে স্বীকৃতিদানের প্রথম প্রকাশ্য দাবী উত্থাপিত হয়।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ জিয়াউদ্দিন আহমদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করিবার সুপারিশ করেন। জ্ঞান তাপস ভাষাবিদ ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ইহার প্রতিবাদে বলেন, 'যদি বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজী ভাষা পরিত্যক্ত হয়, তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষারূপে গ্রহণ না করার কোন যুক্তি নাই। যদি বাংলা ভাষার অতিরিক্ত কোন দ্বিতীয় ভাষা গ্রহণ করিতে হয়, তবে উর্দু ভাষার দাবী বিবেচনা করা উচিত।" সচেতন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিরোধিতা সুকৌশলে এড়াইবার মানসে করাচী শাসক-চক্র উর্দুকে Lingua franca বা ব্যবহৃত সাধারণ ভাষারূপে গ্রহণ করাইবার চেষ্টায় লিপ্ত হন।

বস্তুতঃ করাচী হইতে ঢাকা পর্যন্ত উর্দু ভাষা-ভাষী ও বাংলা ভাষা-ভাষী মহলের উর্দুকেই রাষ্ট্র ভাষা অথবা লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা বা সাধারণ ভাষারূপে গ্রহণের বাদ-প্রতিবাদই পরবর্তীকালে

শিক্ষাঙ্গন ও সাংস্কৃতিক অঙ্গন অতিক্রম করিয়া রাজনৈতিক অঙ্গনে জটিল রাজনৈতিক সমস্যায় রূপান্তরিত হয়।

যাহা হউক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাঙ্গন এবং সাহিত্যসেবী বিদগ্ধজনের দ্রুত সমর্থনপুষ্ট দাবী "বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের অফিস-আদালত ও শিক্ষার মাধ্যম করিতে হইবে" অচিরেই পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সার্বজনীন দাবীতে পরিণত হইল। ঢাকার বিভিন্ন সভা ও মিছিলের মূল আওয়াজ ছিল "পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই"। ক্রমশঃ আন্দোলন পরিচালনাকারীদের বোধোদয় হয় যে, পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য বিধায় আমাদের দাবী প্রাদেশিক ভাষা করিবার দাবীতে পর্যবসিত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা রহিয়াছে। অতএব প্রাথমিক ভুল দাবী সংশোধন করিয়া আমাদের দাবী উত্থিত হইল, "বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিতে হইবে।" রাজধানী ঢাকার রাজপথে মিছিলে শুনা গেল "রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই", "উর্দু বাংলায় বিরোধ নাই", "উর্দু-বাংলা ভাই ভাই," "উর্দুর পাশে বাংলা চাই"। উল্লেখ্য যে, নির্দয় সরকারী হামলা রুখিয়া দাঁড়াইবার ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যসেবী, সংস্কৃতিসেবীদের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া সেইদিন সর্বত্যাগী নির্ভয় তরুণ ছাত্র সমাজের উপরেই এই সক্রিয় আন্দোলনের মূল ও গুরু দায়িত্ব বর্তিয়াছিল। সেই দাবী পূরণের স্বার্থেই রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বে ও পুরোভাগে ছাত্র সমাজের আবির্ভাব এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয় পূর্বকাল পর্যন্ত এই ধারাই অব্যাহত ছিল। বলাই বাহুল্য যে, ইহা ছিল দুর্বল রাজনৈতিক নেতৃত্বেরই ফলশ্রুতি। তাই উত্তরকালে বাঙ্গালী জনতাকে দিতে হইয়াছে চরম মূল্য ও পোহাইতে হইয়াছে নজীরবিহীন দুর্ভোগ।

করাচীতে অনুষ্ঠিত সরকারী শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা অথবা লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা করিবার প্রস্তাবের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ৬ই ডিসেম্বর (১৯৪৭) পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসের সেক্রেটারী অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে ছাত্র সভায় বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাস্থল হইতে এক বিরাট মিছিল পূর্ববঙ্গ সরকারের মন্ত্রী মোহাম্মদ আফজল এবং মন্ত্রী নূরুল আমিনের বাসভবনে গমন করেন। মন্ত্রীদ্বয়ের নিকট হইতে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করিবার আশ্বাস পাইয়া এই মিছিলযোগে আমরা অর্থমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরীর বাসভবনে উপস্থিত হই। মন্ত্রী মহোদয় আমাদের দাবী সমর্থন করিতে অস্বীকৃতি জানান। তথা হইতে আমরা মিছিলসহ মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবন বর্ধমান হাউজে উপস্থিত হই। কিন্তু অসুস্থতার অজুহাতে খাজা সাহেব আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই।

এমনি অস্বস্তিকর পরিস্থিতে বাস ট্রাক ভর্তি একদল উচ্ছৃঙ্খল মুসলিম লীগ সমর্থক ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের ও পলাশী ব্যারাক নিবাসী সরকারী কর্মচারীদের উপর অসৌজন্যমূলক হামলা চালায়। এই গুণ্ডামীর প্রতিবাদে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রাঙ্গণে সভা অনুষ্ঠানের পর মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল অপরাহ্ন বেলা আনুমানিক সাড়ে তিন ঘটিকার সময় শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদের আবদুল গনি রোডস্থ বাসভবনে গমন করে। শিক্ষামন্ত্রী লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় উপর তলা হইতে

নিচে মিছিলকারীদের নিকট আসেন। তিনি মিছিলকারীদের দাবীর সহিত একাত্মতা ঘোষনা করেন এবং একটি কাগজে তাহা লিখিয়াও দেন। এই বিরাট বিক্ষোভ মিছিলটি অতঃপর মন্ত্রী মহোদয়সহ সেক্রেটারিয়েট ভবনমুখে অগ্রসর হয়। সেক্রেটারীয়েটের প্রধান ফটক বন্ধ থাকিবার দরুন মিছিলের অগ্রভাবে অবস্থানরত আমরা কয়েকজন দেওয়াল টপকাইয়া ভিতরে প্রবেশ করি এবং ফটক খুলিয়া দেই। মিছিলের গগনবিদারী আওয়াজে মন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মদ আফজল স্বীয় দফতর হইতে বাহির হইয়া মিছিলকারীদের মাঝখানে আগমন করেন। তিনিও আমাদের দাবী লিখিতভাবে স্বীকার করেন। মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ও অন্যান্য মন্ত্রী ১৫ই ও ১৬ই ডিসেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিতব্য মুসলিম লীগ কাউন্সিল সভায় যোগ দিতে ইতিমধ্যে ঢাকা ত্যাগ করিয়াছিলেন। অকপটে স্বীকার করিতে হইবে যে, মিছিলকারীদের কেহ কেহ মন্ত্রী মহোদয়ের প্রতি উগ্র আচরণ করিতে ছাড়ে নাই। তবুও এমনকি অশোভন দৈহিক হামলা পরিচালনা সত্ত্বেও মন্ত্রীদ্বয় নেতৃসুলভ ধৈর্যের পরিচয় দেন এবং মিছিলকারীদের সহিত অত্যন্ত ভদ্রোচিত ব্যবহার করেন। আমাদের কাহারো কাহারো অভদ্রজনিত ব্যবহারকে উপেক্ষা করিয়াই কৃষিমন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মদ আফজল মিছিলকারীদের দাবী অনুযায়ী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেলে গমন করেন। গুণ্ডামীর চিহ্ন স্বচক্ষে দেখিবার পর মিছিলসহ সরকারী কর্মচারীদের আবাসস্থল পলাশী ব্যারাকেও যান এবং তথায় মাগরিবের নামাজ আদায় করেন। তিনি এই স্থলে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত জেলা প্রশাসক এস, রহমতুল্লাহ ও পুলিশের ডি,আই,জি, সৈয়দ ওবায়েদুল্লাহকে প্রতিকার গ্রহণের নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য যে, কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক রাজনীতিতেই জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা উপরোক্ত আচরণ সম্ভব, কোন মিলিটারী ক্যু কিংবা কোন টোটেলিটারিয়ান ডিকটেটরদের দেশে ইহা অকল্পনীয়।

কিন্তু অবস্থাগতিতে উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার ফলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটিল। একই দিন বিকাল বেলা কোর্টের উল্টাদিকে অবস্থিত ও, কে, রেষ্টুরেন্ট (বর্তমানে মাইরেন্ডার) হইতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগ কর্মী শিবিরের (১৫০ নং মোগলটুলী, ঢাকা) অন্যতম নেতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নঈমুদ্দিন আহমদ (পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের প্রতিষ্ঠাতা আহবায়ক ও উত্তরকালে ঢাকা হাইকোর্ট বার সেক্রেটারী) গুণ্ডা বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত ও প্রহৃত হন। মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের একটি মিছিলও রায় সাহেব বাজারে গুণ্ডা কবলিত হয়। শিক্ষিত সম্প্রদায় উক্ত ঘটনাবলীকে খুব একটা সহজভাবে নিতে পারেন নাই। ইহার প্রতিবাদে ১৩ই ডিসেম্বর সেক্রেটারীয়েটের কর্মচারীরা ধর্মঘট পালন করেন। সরকার প্রত্যুত্তরে ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করিয়া ১৫ দিনের জন্য সভা, মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আত্মপ্রকাশ

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে কায়েমের আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা যতই তীব্র হইতে লাগিল, অর্থপূর্ণ ও সাংগঠনিক শক্তিতে বলীয়ান ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনের অপরিহার্যতা ততই আমাদের কাছে বড় হইয়া দেখা দিল। সাংগঠনিক শক্তি ব্যতিরেকে বৃহত্তর

জাতীয় পর্যায়ে ছাত্র আন্দোলন কার্যকরী ভূমিকা পালনে সক্ষম হয় না। সরকার বিরোধী ছাত্র শক্তিকে সংগঠিত করিবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ছাত্র ফেডারেশনই ছিল তখনকার দিনে একমাত্র সক্রিয় ছাত্র প্রতিষ্ঠান। মুসলমান ছাত্র সমাজের একটি অংশ উক্ত সংগঠনকে বিদেশী শক্তির তল্পীবাহক বলিয়া সন্দেহের চোখে দেখিত। এহেন সাংগঠনিক শূন্যতা নিরসনকল্পে আমি ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করি এবং সর্বজনাব আবদুর রহমান চৌধুরী, আবদুল মতিন খান চৌধুরী, আবদুল হামিদ চৌধুরী, ও মোল্লা জালাল উদ্দিনের সহিত আলাপ আলোচনা চালাইতে থাকি। আমি তাহাদিগকে ঢাকায় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ কাউন্সিলের তলবী সভা আহবান করিবার উদ্দেশ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ জানাই। আমার যুক্তি ছিল এই যে, এই পদ্ধতিতেই মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সরকারের তল্পীবাহক শাহ আজিজুর রহমানকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অপসারিত করা যাইবে ও কাউন্সিলের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নূতন কমিটি নির্বাচন করিয়া ছাত্র আন্দোলনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে; কিন্তু তাঁহারা আমার প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই। বোধহয় কাউন্সিলে সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থন সম্বন্ধে তাঁহারা সন্দিহান ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শেখ মুজিবুর রহমান তখনও স্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাস করিতেন না। তখন পর্যন্ত ঢাকার বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলনের সহিত তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না।

মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভা ঢাকার ছাত্র মহল হইতে যত বিচ্ছিন্ন হইতেছিল, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সমর্থকবৃন্দের মর্যাদা ছাত্র মহলে ততই বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই সময়ে আমি জাতীয় ছাত্র সমস্যা নিরসনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই নূতন ছাত্র সংগঠন গঠন করিবার তাগিদ তীব্রভাবে বোধ করিতেছিলাম। তাই একমনা ছাত্র নেতৃবৃন্দের সহিত প্রাথমিক আলোচনা করিয়া ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী অপরাহ্নে ফজলুল হক হল মিলনায়তনে এক ছাত্র কর্মীসভা আহবান করি। সেই মুহূর্তে ঘটনাচক্রে ফেনী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক নাজমুল করিম উপস্থিত ছিলেন। আমরা তাঁহাকেই সভাপতি করিয়া সভার কাজ আরম্ভ করি। সভায় নূতন ছাত্র সংগঠন সাম্প্রদায়িক না অসাম্প্রদায়িক হইবে এই প্রশ্নে উপস্থিত অনেকের সহিত আমার মতানৈক্য দেখা দেয়। আমি সংগঠনের অসাম্প্রদায়িক নামের পক্ষে ছিলাম। যাহা হউক, অধিকাংশের মতের পক্ষে স্বীয় প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া অবশেষে আমরা সর্বসম্মতিক্রমে 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' গঠন করি। জনাব নঈমুদ্দিন আহমদকে ও আমাকে আহবায়ক করিয়া যথাক্রমে পূর্ব পাকিস্তান ও ঢাকা শহর কমিটি গঠন করা হয় এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সদস্য করিয়া পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়ঃ

(১) নঈমুদ্দিন আহমদ (রাজশাহী) আহবায়ক, (২) আবদুর রহমান চৌধুরী (বরিশাল), (৩) শেখ মুজিবুর রহমান (ফরিদপুর), (৪) অলি আহাদ (কুমিল্লা), আহবায়ক ঢাকা শহর কমিটি (৫) আজিজ আহমদ (নোয়াখালী), (৬) আবদুল মতিন (পাবনা), (৭) দবিরুল

ইসলাম (দিনাজপুর), মফিজুর রহমান (রংপুর), (৯) শেখ আবদুল আজিজ (খুলনা), (১০) নওয়াব আলী (ঢাকা), (১১) নূরুল কবির (ঢাকা সিটি), (১২) আবদুল আজিজ (কুষ্টিয়া), (১৩) সৈয়দ নূরুল আলম (ময়মনসিংহ), (১৪) আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী (চট্টগ্রাম)।

শেখ মুজিবুর রহমান তখন ঢাকা ছিলেন না এবং এই সংগঠন সম্পর্কে তিনি কিছুই অবহিত ছিলেন না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সাংগঠনিক কমিটিতে তাঁহার অন্তর্ভুক্তি তিনি সানন্দেই গ্রহণ করিবেন। এবং তিনি সত্যই কোন দ্বিধাদ্বন্দ বা অনীহা প্রকাশ না করিয়া বরং সংগঠনকে দৃঢ় ও মজবুত করিবার প্রয়াসে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। উল্লেখ্য যে, অধুনা অনেকেই শেখ মুজিবুর রহমানকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রচার করিতেছেন। কিন্তু ইহা ইতিহাসের বিকৃতিমাত্র।

জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা ছাত্র ফেডারেশনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের আত্মপ্রকাশ খুব একটা উৎসাহের চোখে দেখেন নাই। কিন্তু আমাদের সহিত অতীত সাহচর্যের দুর্বলতার জন্যই তিনি সংগঠনের অগ্রগতিতে কোন বাধাও দেন নাই।

ছাত্র মহল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তাই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করে। প্রকৃতপক্ষে প্রদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের বিভিন্ন সন্ধিক্ষণে ছাত্রলীগ এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করিয়াছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের একক দাবীদার এই ছাত্র সংগঠন। ভাবীকালে এই সংগঠন পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর রূপায়ন ও পরিবর্তনে এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনেই জনাব দবিরুল ইসলামকে সভাপতি ও জনাব খালেক নেওয়াজ খানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। জনাব দবিরুল ইসলামের পর জনাব শামসুল হক চৌধুরী ১৯৫৩ সালে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশন পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৩ সালের কাউন্সিল অধিবেশন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগকে অসাম্প্রদায়িক করিবার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ নাম পরিবর্তন করিয়া পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ নাম রাখে। উল্লেখ্য যে, ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরের দিকে সৈয়দ নজরুল ইসলামের (সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অর্গানাইজিং কমিটির সভায় আমি পুনরায় এই সংগঠনের অসাম্প্রদায়িক নামকরণের প্রস্তাব করিয়াছিলাম; কিন্তু প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ার প্রতিবাদে আমি পদত্যাগ করি। যেহেতু পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা বিভিন্ন সময়ে পালন করিয়াছে, তাই বিভিন্নকালের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলামঃ

১৯৪৮	নঈমুদ্দিন আহমদ	আহ্বায়ক
১৯৪৯-৫৩	দবিরুল ইসলাম	সভাপতি
	খালেক নেওয়াজ খান	সাধারণ সম্পাদক
১৯৫৩-৫৪	কামরুজ্জামান	সভাপতি
	এম, আবদুল ওয়াদুদ	সাধারণ সম্পাদক
১৯৫৪-৫৫	আবদুল মমিন তালুকদার	সভাপতি
	এম, আবদুল ওয়াদুদ	সাধারণ সম্পাদক
১৯৫৫-৫৬-৫৭	আবদুল মমিন তালুকদার	সভাপতি
	আবদুল আউয়াল	সাধারণ সম্পাদক
১৯৫৭-৬০	রফিকুল্লাহ চৌধুরী	সভাপতি
১৯৫৭-৫৮	কাজী আজহারুল ইসলাম	সাধারণ সম্পাদক
১৯৫৮-৫৯-৬০	শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন	সাধারণ সম্পাদক
১৯৬০-৬৩	শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন	সভাপতি
	শেখ ফজলুল হক মনি	সাধারণ সম্পাদক
১৯৬৩-৬৫	কে, এম, ওবায়দুর রহমান	সভাপতি
	সিরাজুল আলম খান	সাধারণ সম্পাদক
১৯৬৫-৬৬-৬৭	মাজহারুল হক বাকী	সভাপতি
	আবদুর রাজ্জাক	সাধারণ সম্পাদক
১৯৬৭-৬৮	ফেরদৌস আহমদ কোরেশী	সভাপতি
	আবদুর রাজ্জাক	সাধারণ সম্পাদক
১৯৬৮-৬৯	আবদুর রউফ	সভাপতি
	খালেদ মোহাম্মদ আলী	সাধারণ সম্পাদক
১৯৬৯-৭০	তোফায়েল আহমদ	সভাপতি
	আ,স,ম, আবদুর রব	সাধারণ সম্পাদক
১৯৭০-৭২	নূরে আলম সিদ্দিকী	সভাপতি
	শাজাহান সিরাজ	সাধারণ সম্পাদক

ভাষা আন্দোলনের আরেক পর্যায়

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠনের অব্যবহিত পরই ৮ই জানুয়ারী (১৯৪৮) সলিমুল্লাহ মুসলিম হল সংসদের সহ-সভাপতি শফিউল আজম, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ আহবায়ক নঈমুদ্দিন আহমদ, আবদুর রহমান চৌধুরী, আবদুল মতিন খান চৌধুরী, মোঃ তোয়াহা ও আমি ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা, মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সহিত তাঁহার বাসভবন বর্ধমান হাউসে

সাক্ষাৎ করি। এই বৈঠকে পূর্ববঙ্গ সরকারের শিক্ষা দফতরের সচিব এফ,এ, করিম উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সহিত বাংলা ভাষার ইতিহাস ও তত্ত্ব নিয়া তর্ক-বিতর্কে শফিউল আজম সাহেব বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া ছাড়িলেন। উল্লেখ্য যে, ভারত বিভাগের পর পরই ঢাকায় আসিবার পর হইতেই জনাব ফজলে করিম (শিক্ষ দফতরের সেক্রেটারী) সলিমুল্লাহ হল মসজিদে নামাজ আদায়ের জন্য আসিতেন এবং মোনাজাতের পর ইসলামী তাহজীব ও তমদ্দুন বিষয়ে উর্দু ভাষায় সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিতেন। এই ধরনের এক শ্রেণীর অবাঙ্গালী উর্দুভাষী বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে ইসলামী তাহজীব ও তমদ্দুন শিক্ষা দিবার ব্যাপারে অত্যুৎসাহ প্রদর্শন করিতেন। তাহাদের প্রভুসুলভ আচরণ ও নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিবার অতিগরজী মানসিকতাই বাংলা ভাষা-ভাষী মধ্যবিত্ত মুসলমান শ্রেণীর অসন্তুষ্টি ও বিরাগের অন্যতম কারণ। যাহা হউক, সেইদিন আমাদের প্রতিনিধি দলকে খাজা নাজিমুদ্দিন এই মর্মে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম ও কেন্দ্রে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় ভাষা করা হইবে।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ডাক টিকিট, মনিঅর্ডার ফরম, মুদ্রা এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন, সেনা বিভাগ, নৌ-বিভাগ ও বিমান বিভাগের পরীক্ষায় উর্দুর যথেচ্ছ ব্যবহার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার সম্পূর্ণ অনুল্লেখ ছাত্র সমাজকে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। এই তপ্ত হাওয়ায় অনুষ্ঠিত সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদ নির্বাচনে আমরা সরকার বিরোধী বক্তব্যের মাধ্যমেই সরকার সমর্থক নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ (নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের পরিবর্তিত নাম) প্রার্থী রেজাউর রহমানকে পরাজিত করিয়া সৈয়দ নজরুল ইসলামকে বিপুল ভোটে হল সংসদ সহ-সভাপতি পদে জয়যুক্ত করি। পরিতাপের বিষয়, নির্বাচিত হওয়ার পরেও সরকারী রক্তচক্ষু ও সরকারী কোপানলে পতিত হওয়ার ভয়ে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সক্রিয়ভাবে কোন আন্দোলনে আমাদিগকে সাহায্য-সহায়তা করেন নাই; উপরন্তু তিনি পাকিস্তান সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করিয়া সরকারের আয়কর অফিসার (Income Tax Officer) পদে যোগ দিয়াছিলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে চাকুরী ত্যাগ করিয়া আইন ব্যবসায় যোগদান করেন এবং উত্তরকালে বাংলাদেশ সরকারের উপরাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। নব নির্বাচিত ছাত্র সংসদের অভিষেক অনুষ্ঠানে ২রা ফেব্রুয়ারী (১৯৪৮) ভাষণ দানকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ভাষী ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ মাহমুদ হাসান বাংলাকেই শিক্ষার মাধ্যম করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তাহার উক্ত অভিনন্দনযোগ্য মন্তব্যে আমাদের মনোবল দ্বিগুণ হইল।

ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সরকার বিরোধী প্রগতিশীল নেতা মোঃ তোয়াহা তাঁহার মনোনীত কেবিনেটসহ বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে যথাক্রমে বাবু অরবিন্দ ঘোষ ও জনাব গোলাম আযম নির্বাচিত হন।

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠিত হইবার পর হইতে সংগঠনটিকে নেতৃস্থানীয় সংগঠনে পরিণত করিবার মানসে আমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করি। তাই ২৬শে ফেব্রুয়ারী

হইতে ৬ই মার্চ অবধি কলিকাতায় আহূত দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় যুব সম্মেলনে নিম্ন-শর্তাধীনে প্রাথমিকভাবে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিঃ

প্রথমতঃ খাজা নাজিমুদ্দিন সরকার সমর্থক শাহ্ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ (উত্তরকালে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ) সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পাইলে, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করিবে না; দ্বিতীয়তঃ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ মনোনীত প্রতিনিধিই সম্মেলনে পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের নেতা হইবেন। শর্ত পরিপূরিত হইল। তদনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কমিটির সদস্য আবদুর রহমান চৌধুরীই পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দান করিলেন। ইহাতে আমাদের সংগঠনের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল এবং ইহাই ছিল আমাদের কাম্য। প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্য ছিলেন, জনাব শামসুল হক (পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ) শহীদুল্লাহ কায়সার (পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন) মিসেস লিলি খান ও মিস্ লুলু বিলকিস বানু (মহিলা অবজার্ভার) এবং মিস লায়লা আরজুমান্দ বানু (আমন্ত্রিত)।

১১ই মার্চের (১৯৪৮) হরতাল

গণপরিষদের অধিবেশনে ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী উর্দু ও ইংরেজীর সহিত গণপরিষদে বাংলাকে অন্যতম ভাষা হিসাবে ব্যবহারের স্বপক্ষে দাবী উত্থাপন করেন বাবু ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত। এই অপরাধে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান ও অন্যান্য বক্তা অসৌজন্যমূলক ভাষায় তাঁহাকে আক্রমণ করেন। ঢাকায় পুনঃপুনঃ দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া পূর্ববঙ্গের উজীরে আলা খাজা নাজিমুদ্দিন গণপরিষদ অধিবেশনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিবার পক্ষে ওকালতি করেন। ইহার প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের ৪ কোটি ৪০ লক্ষ অধিবাসীর মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় সংকল্পবদ্ধ তরুণ ছাত্র সমাজ বিভিন্ন শিক্ষায়তন হইতে ২৬শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয় এবং অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বাবু ধীরেন্দ্র নাথ দত্তকে অভিনন্দন জানায়। শুধু তাই নয়, খাজা নাজিমুদ্দিনের এই উক্তির প্রতিবাদে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে সাংগঠনিক রূপদান করিবার প্রয়োজনে ২৭শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৮) তমদ্দুন মজলিসের রশিদ বিল্ডিংস্থ অফিসে অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সলিমুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র জনাব শামসুল আলমকে আহবায়ক নিয়োগ করিয়া আমরা Committee of Action for state Language অর্থাৎ রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ গঠন করি। ইতিপূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক নূরুল হক ভুঁইয়া তমদ্দুন মজলিসের রাষ্ট্রভাষা সাব-কমিটির আহবায়ক ছিলেন। একই বৈঠকে ১১ই মার্চ হরতাল, সভা ও বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস" ঘোষণা করা হয়।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বশীল করিবার নিমিত্তে ২রা মার্চ (১৯৪৮) ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত সভায় পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, গণ-আজাদী লীগ, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক ইয়ুথলীগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল

ছাত্র সংসদ এবং কলেজ প্রতিনিধিবৃন্দকে লইয়া পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিত্বশীল কমিটি গঠন করা হয়। পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে সোহরাওয়ার্দী সমর্থক মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যদের তরফ হইতে জনাব তফাজ্জল আলী, জনাব আলী আহমদ খান ও মিসেস আনোয়ারা খাতুন কমিটির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। তবে, একমাত্র মিসেস আনোয়ারা খাতুনই ১১ই মার্চের হরতাল সাফল্যমন্ডিত করিবার জন্য সর্বোতভাবে সহায়তা করিয়াছেন। ১১ই মার্চ আয়োজিত সাধারণ ধর্মঘট সাফল্যমন্ডিত করিবার আহবান জানাইয়া ৩রা মার্চ ঢাকা হইতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ এক বিবৃতি দেন। উহা কলিকাতার ইংরেজী দৈনিক অমৃতবাজারে প্রকাশিত হয়। এই বিবৃতি দানকারীরা হইলেন, জনাব শামসুল আলম, আহবায়ক, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ; অধ্যাপক এম; এ, কাসেম, সেক্রেটারী, তমদ্দুন মজলিস; জনাব নঈমুদ্দিন আহমদ, আহবায়ক, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ; জনাব তফাজ্জল আলী এম এল এ, মিসেস আনোয়ারা খাতুন এম এল এ, সম্পাদিকা, পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি; জনাব আলী আহমদ খান এম এল এ, জনাব কমরুদ্দিন আহমদ, প্রাক্তন অফিস সম্পাদক, ঢাকা জিলা মুসলিম লীগ; জনাব শামসুল হক, সংগঠক, মুসলিম লীগ (পূর্ববঙ্গ); জনাব এ, সালাম, সম্পাদক, দৈনিক পূর্ব পাকিস্তান; জনাব এস, এম, বজলুল হক, সম্পাদক, কাফেলা; জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল; জনাব মোঃ তোয়াহা, সহ-সভাপতি ফজলুল হক মুসলিম হল; জনাব অলি আহাদ, আহবায়ক, ঢাকা নগর মুসলিম ছাত্রলীগ; জনাব আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী, সম্পাদক ইনসান। বিবৃতির কিয়দংশ নিম্নে দেওয়া হইলঃ

"For some time past considerable agitation is going on to make Bengali as the (i) official language of East pakistan, (ii) as one of the State Languages of the Central Pakistan, (iii) as one of the languages of Pakistan consembly".

"Bengali is the mother tongue of the two third population of the whole of Pakistan. It is a matter of shame that agitation has become necessary to establish this language in the life of the state .... To record a protest against these, the East Pakistan Muslim Students League & the Tamaddun Majlish have declared a general strike on Thursday, March 11. We appeal to all political cultural and educational institutions & all students & citizens irrespective of cast & creed of East Pakistan to observe this strike according to the programme of this joint State Language sub-committee peacefully & with discipline .... Our agitation should not be mistaken in Central Pakistan & in the consembly. We believe that if instead of treading down this democratic demand, the Bengali Language is conceded, it will be the basis of Unity

of East & West Pakistan".

অর্থাৎ "(১) বাংলাকে পুর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনিক ভাষা, (২) কেন্দ্রীয় পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা ও (৩) পাকিস্তান গণপরিষদের অন্যতম ভাষা করিবার দাবীতে কিছুকাল যাবৎ ব্যাপক আন্দোলন চলিতেছে।

"বাংলা সমগ্র পাকিস্তানের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসীর মাতৃভাষা। লজ্জার বিষয় যে, এই ভাষাকেই রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে আন্দোলনের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে .... ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্যই পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিস ১১ই মার্চ রোজ বৃহস্পতিবার সাধারণ হরতাল ঘোষণা করিয়াছে। সংযুক্ত রাষ্ট্রভাষা সাব-কমিটির কর্মসূচী অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবে ও শৃঙ্খলার সহিত ধর্মঘট পালন করিবার জন্য আমরা সকল রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাঙ্গন এবং পূর্ব পাকিস্তানের জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল ছাত্র ও নাগরিকদের প্রতি আবেদন জানাইয়াছি। .... কেন্দ্রীয় পাকিস্তান ও গণপরিষদে আমাদের আন্দোলনকে ভুল বুঝা উচিত হইবে না। এই গণতান্ত্রিক দাবীকে দমন না করিয়া বাংলা ভাষাকে মানিয়া লইলে, আমরা বিশ্বাস করি ইহাই হইবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের একতার ভিত্তি।"

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ৪ঠা ও ৫ই মার্চের সভায় ১১ই মার্চের সাধারণ হরতালকে সফল করিবার জন্য বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ১০ই মার্চের সভায় সরকার কর্তৃক ১৪৪ ধারা জারি করা হইলে, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হইবে কি হইবে না ইহা লইয়া বিতর্ক উঠিলে, আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাইয়া দিয়াছিলাম যে, "আমরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিবই, সরকারী কোন বিধি-নিষেধের নিকট আত্মসর্পণ করিয়া আন্দোলন প্রত্যাহার করিব না।" সেই সভায় আমি ইহাও বলিয়াছিলাম যে, "যাঁহারা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি বা আন্দোলনের দোহাই পাড়েন, তাঁহাদিগকে পুনর্বিবেচনা করিতে আমি অনুরোধ জানাই।" এই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেকটি ছাত্রাবাসের (হল) দেওয়ালে দেওয়ালে স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইল। ১১ই মার্চ সাধারণ হরতাল আহবানের সংবাদ পত্রিকায় পাঠ করিয়া আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিবার নিমিত্ত শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ হইতে ১০ই মার্চ রাত্রে ঢাকায় আসেন।

সকাল নয়টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান, আবদুল ওয়াদুদ এবং আমি সেক্রেটারিয়েট ভবনের প্রথম গেটে উপস্থিত হই। তখনও সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীবৃন্দ আসেন নাই। ইতিমধ্যে তরুণ জননেতা জনাব শামসুল হক কয়েকজন কর্মীসহ আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল, তিন হইতে পাঁচজন সেক্রেটারিয়েটের গেটগুলির প্রত্যেকটিতে পিকেটিং করিব এবং এক গ্রুপ ধরা পড়িলে পরবর্তী গ্রুপ পিকেটিং করিবে। পূর্বাহ্ন বেলা ৯-৩০ মিনিট হইতে ১০ টার মধ্যে সেক্রেটারিয়েটগামী কর্মচারীদিগকে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বাধা দিতে শুরু করিলাম। সিটি এস, পি, আবদুল গফুরের হুকুমে পুলিশ তৎপর হইয়া উঠিল। ইংরেজ ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ মিঃ চ্যাথাম লাঠি চালনার আদেশ দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে শামসুল হক ও তাঁহার গ্রুপের কতিপয় কর্মী

গ্রেফতার হইলেন। ইহার পর শেখ মুজিবুর রহমান আর এক গ্রুপসহ গ্রেফতার হইলেন। পুলিশ বাহিনী অধৈর্য হইয়া উঠিল এবং বেপরোয়া লাঠি চালনা আরম্ভ করিল। জনাব আবদুল ওয়াদুদ ও আমি পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত হই। পুলিশ আমাদের আহত অবস্থায়ই জীপে বস্তাবন্দী করিয়া ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়া তথাকার হাসপাতালে ভর্তি করাইল। পুলিশের আঘাত ও ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় আমার হাত ঘড়িটি উধাও হইয়া গিয়াছিল। পুলিশের লাঠি-পিটায় প্রায় জ্ঞানহারা অবস্থায় উত্তেজিত কণ্ঠে এ্যাংলো ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্জেন্টকে লক্ষ্য করিয়া শাসাইয়া বলিয়াছিলাম "ক্ষমতায় আসিলে তোমাকে দেখাইয়া দিব"। প্রত্যুত্তরে সার্জেন্টটি বলিল, "Whats of that to me whether Nazímuddin stays or Suhrawardy comes. Whatever the Govt. I shall carry on." সন্ধ্যা নাগাদ ৬৯ জনকে গ্রেফতার করিয়া সরকার ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক করিল।

কারাগার একটি ভিন্ন জগত। যত অসৎ চরিত্র ব্যক্তিরাই কারাগারবাসী। আইন-শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য। কারাগারে আগন্তুকদের প্রথমে 'ফাইল-গাইল-ডাইল' সমস্যার ধাক্কায় মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম হইতে হয়। ১৩ই মার্চ সন্ধ্যায় আমাদের ওয়ার্ডের দরজা বন্ধ করিবার পূর্বে বন্দী সংখ্যা গুণিবার বিধি অনুযায়ী জমাদার আমাদিগকে শৃঙ্খলার সহিত ফাইলে বসিতে অনুরোধ জানাইল। তরুণ ছাত্র বন্দীদের অত ঝামেলা পোহাইবার মত মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। জমাদার তিন তিনবার গুণিয়া তিনটি ভিন্ন সংখ্যা পায়। সে স্বাভাবিকভাবেই বিরক্ত হইয়া মেজাজ দেখায়। ইহাতে উত্তেজিত ছাত্রবন্দীগণ তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে জমাদার এক লাফে ওয়ার্ডের বাহিরে গিয়া সংকেত বাঁশি বাজাইতেই সমগ্র জেলে পাগলা ঘন্টি পড়ে। ইহা এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। সাধারণতঃ পাগলা ঘন্টি বাজার সঙ্গে সঙ্গে কারাগার রক্ষী বাহিনী ও বাহির হইতে আগত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কারাগার অভ্যন্তরের সংক্ষুব্ধ এলাকায় বন্দীদের যথেচ্ছ অমানুষিক নির্যাতন শুরু করে। কোন কোন সময় নিরস্ত্র বন্দীদের উপর গুলী চালনা করা হয়। পাগলা ঘন্টি পড়িবার সাথে সাথে তাই দরদী ও বুদ্ধিমান কার্যরত টহলদার সিপাহীটি আমাদের দ্বিতীলস্থ ওয়ার্ডটি ত্বরিৎ তালাবদ্ধ করিয়া অকুস্থল হইতে অন্যত্র সরিয়া পড়িয়াছিল। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় কারাগার সুপারিন্টেনডেন্ট ইংরেজ সন্তান মিঃ বিল আগত উন্মত্ত বাহিনীকে স্বস্ব স্থানে ফিরিবার আদেশ দান করিয়া আমাদের কামরায় প্রবেশ করিলেন। মিঃ বিল বন্দী সংখ্যা গণনার প্রয়োজনীয়তা আমাদিগকে ব্যাখ্যা করিয়া কারাগার আইন-কানুন পালনের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের বিনয়ের সহিত অবহিত করিলেন। কারাধ্যক্ষ মিঃ বিল যদি বিচক্ষণতার সহিত প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন না করিতেন, তাহা হইলে আমাদের বন্দীশালায় সেইদিন লঙ্কাকান্ড ঘটিত এবং ছাত্র বন্দীদের উপর নির্যাতনের কোন ইয়ত্তা থাকিত না।

১২ই মার্চের পত্রিকা পাঠে অবগত হইলাম যে, শেরেবাংলা এ,কে, ফজলুল হক ১১ই মার্চ পুলিশী হামলার প্রতিবাদে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ হইতে পদত্যাগের আহবান জানাইয়াছেন। কিন্তু কৌতুকের বিষয়, ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া অবধি নিজেই পদত্যাগ করেন নাই। এই ধরনের বহু ঘটনা জীবনে বহুজনের ব্যাপারে বহু

বারই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দেখিয়াছি, একশ্রেণীর নেতা গদীর অন্বেষণে বিভিন্ন সংকটময় মুহূর্তে দেশবাসীকে প্রতারিত করেন এবং স্বীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার প্রয়াস পান।

১১ই মার্চ, পুলিশী নির্যাতন ও আমাদের কারান্তরালে নিক্ষেপের ফলে সমগ্র ঢাকা নগরীর রাজপথ মিছিলে মিছিলে, বিভিন্ন ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে প্রকম্পিত হইয়া উঠে। ১৫ই মার্চ পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন চলাকালে ভীত সন্ত্রস্ত খাজা নাজিমুদ্দিন সরকার রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের সদস্যদের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হন। উভয়পক্ষ এক খসড়া চুক্তি প্রণয়ন করেন। চুক্তি পত্রটি ১১ই মার্চ ধৃত বন্দীগণ কর্তৃক অনুমোদনের জন্য অধ্যাপক আবুল কাসেম ও জনাব কমরুদ্দিন আহমদ কারান্তরালে আমাদের সহিত বৈঠকে মিলিত হইলেন। জনাব শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান ও আমি বন্দীগণের পক্ষ হইতে খসড়া চুক্তির শর্তাবলী পরীক্ষা নিরীক্ষার পর নাজিমুদ্দিন ও রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের পক্ষ হইতে জনাব কমরুদ্দিন আহমদ স্বাক্ষর করেন। নিম্নে চুক্তিনামাটি দেওয়া হইলঃ

১। ২৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৮) হইতে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাহাদিগকে গ্রেফতার করা হইয়াছে, তাহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তিদান করা হইবে।

২। পুলিশী অত্যাচারের অভিযোগ সম্বন্ধে উজীরে আলা স্বয়ং তদন্ত করিয়া এক মাসের মধ্যে এই বিষয়ে বিবৃতি দিবেন।

৩। ১৯৪৮ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদে বেসরকারী আলোচনার জন্য নির্ধারিত তারিখে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার এবং ইহাকে পাকিস্তান গণপরিষদে এবং কেন্দ্রীয় চাকুরী পরীক্ষা দিতে Central services Examination উর্দুর সম-মর্যাদাদানের নিমিত্ত একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

৪। পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে এপ্রিল মাসে একটি প্রস্তাব তোলা হইবে যে, প্রদেশের অফিস-আদালতের ভাষা ইংরেজীর স্থলে বাংলা হইবে।

৫। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কাহারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

৬। সংবাদপত্রের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে।

৭। ২৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে পূর্ববঙ্গের যে সকল অংশে ভাষা আন্দোলনের কারণে ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে, তাহা প্রত্যাহার করা হইবে।

৮। সংগ্রাম পরিষদের সহিত আলোচনার পর আমি এই ব্যাপারে, নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে, এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়।

চুক্তি মোতাবেক ঐদিন (১৫ই মার্চ) অপরাহ্নেই আমাদের মুক্তির আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট মামলার অজুহাতে জনাব শওকত আলী ও কাজী গোলাম মাহবুব এবং কমিউনিস্ট পার্টি সদস্যভুক্ত অজুহাতে বাবু রনেশ গুপ্তকে কারামুক্তির আদেশ দেওয়া হয় নাই। আমরা উপরোক্ত বন্দীগণ ব্যতীত কারামুক্ত হইতে অস্বীকৃতি জানাইলে, সরকার কালবিলম্ব না করিয়া তাহাদিগকেও আমাদের সহিত মুক্তিদানের আদেশ জেল গেটে পাঠাইয়া দেন। মুক্তির পর ফজলুল হক হলে আমাদিগকে সংবর্ধনা দানকালে কতিপয় ছাত্রের মধ্যে এক চাপা অসন্তোষ লক্ষ্য করিলাম। তাহারা ছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী-আত্মগোপনকারী

কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য কর্মী। তাহাদের পার্টির দায়িত্বই ছিল আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী গণতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে বিভেদ, ভুল বুঝাবুঝি ও কলহের বীজ বপন করা। গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের মধ্যে বা বিরুদ্ধে বিভেদ সৃষ্টি করিতে পারিলেই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সাধারণ জনতাকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিয়া ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে প্ররোচিত করা সহজ হয়। আন্দোলনে যাহাতে ফাটল বা অনৈক্য সৃষ্টি হইতে না পারে, সেই জন্য আমরা ১৬ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বেলতলায় এক সাধারণ ছাত্রসভা আহবান করি। সদ্য কারামুক্ত শেখ মুজিবুর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করেন। পূর্ববঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম ও কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন ছাত্র ফেডারেশন কর্মীবৃন্দ এই সাধারণ ছাত্র সভাকে বানচাল করিতে নানাভাবে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। কিন্তু সাধারণ ছাত্রের সচেতন সংগ্রামী চেতনা উপরোক্ত প্রয়াসকে ব্যর্থ করিয়া দেয়। যাহা হউক, উক্ত সভায় পুলিশী জুলুম তদন্তের জন্য তদন্ত কমিশন গঠন, চুক্তিনামার ৩ ও ৪ ধারা কার্যকর করিবার জন্য আইন পরিষদ অধিবেশনে নির্দিষ্ট তারিখ ধার্য ও পাকিস্তান গণপরিষদ সদস্যবর্গের ও পূর্ববঙ্গের মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলি পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের হস্তে প্রদান করিবার জন্য সভার অপর এক প্রস্তাবে আমার উপরে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেই মর্মে আমি উক্ত প্রস্তাবগুলি যথাসময়ে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট প্রদান করি।

উল্লেখ্য যে, এই সভা হইতে এক বিক্ষোভ মিছিলসহ আমরা পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ ভবন (জগন্নাথ হল মিলনায়তন) অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলাম। মিছিলের ধ্বনি ছিল "পাকিস্তান-জিন্দাবাদ" "রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই" "উর্দু-বাংলা ভাই ভাই" "বাংলার সহিত উর্দুর বিরোধ নাই"। যাহা হউক, পরিষদ ভবন গেটে আমরা মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সাক্ষাৎ প্রার্থী হইলে কয়েক মিনিটের মধ্যে স্থান পরিত্যাগ করিতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া পুলিশ বাহিনী হিংস্র মূর্তি ধারণ করে ও আমাদের উপর লাঠিচার্জ আরম্ভ করিয়া দেয়। লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করিবার অন্য একটি উদ্দেশ্য ছিল ঘেরাওকৃত আইন পরিষদ সদস্যদের মুক্ত করা মন্ত্রীদের বাড়ী যাইবার পথ সুগম করা। মিছিলকারীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া কিছু অংশ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে এবং কিছু অংশ সলিমুল্লাহ হল ও জগন্নাথ হলের মধ্যবর্তী মাঠে জমায়েত হয়। সন্ধ্যার পর পুনরায় কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করিলে আমরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ি ও পূর্ববঙ্গে তদানীন্তন জি, ও, সি, আইয়ুব খানের (পরবর্তীকালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট) জবানীতে জানিতে পারি, উজীরে আলা পরিষদ ভবন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ সেই দিনের সেই অবস্থা হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত ভীত মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সৈন্য বাহিনীও তলব করিয়াছিলেন।

নাজিমুদ্দিন সরকারকে সমালোচনা করিবার কারণে সোহরাওয়ার্দী প্রতিষ্ঠিত ও কলিকাতা হইতে প্রকাশিত জনপ্রিয় দৈনিক ইত্তেহাদের পূর্ববঙ্গে প্রবেশ ১৯৪৭ সালেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছিল। কিন্তু ভাষা আন্দোলনে দৈনিক ইত্তেহাদের অনন্য অবদান ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে। এই প্রসঙ্গে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা, দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক স্বাধীনতার বলিষ্ঠ ভূমিকাও পূর্ববঙ্গ সরকারের

রোষের কারণ হওয়ায় এবং ১৩ই মার্চ দৈনিক অমৃতবাজার, দৈনিক আনন্দবাজার ও দৈনিক স্বাধীনতা পূর্ববঙ্গে প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। যুগান্তর ইতিপূর্বেই সরকারী কোপানলে পতিত হইয়াছিল।

১৬ই মার্চ পরিষদ ভবনে বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে ১৭ই মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের বেলতলায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহবায়ক নঈমুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভার প্রারম্ভেই পূর্ববঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য নেতা অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম কতিপয় সমর্থকদের সহায়তায় গোলযোগ সৃষ্টির প্রাণপণ চেষ্টা করেন। ইহা নাকি তাহাদের বিপ্লবের স্বার্থে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কর্মসূচীভুক্ত। তাহারা সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ বিপ্লবের নেশার ঘোরে গণ-বিপ্লব দ্বারা সরকারের উৎখাতের প্রয়োজনে ধ্বংসাত্মক কর্মসূচী দাবী করিতেছিলেন। তরুণ নেতা শামসুল হক ও কাজী গোলাম মাহবুবের বক্তৃতার পর শেখ মুজিবুর রহমান ও আবদুর রহমান চৌধুরীর পীড়াপীড়িতে আমাকে সভাপতির আহবানে বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। সেই দিনের সেই সভায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াসকে শক্ত ভাষায় আক্রমণ করিয়া বলিয়াছিলাম, "যাহারা কলিকাতায় সদ্য অনুষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করিয়া বিপ্লবের অলীক স্বপ্নের বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন এবং 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' বলিয়া প্রকাশ্যে গগনবিদারী আওয়াজ তুলিতেছেন, তাহারা দেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না। সুতরাং 'কমিটি অব এ্যাকশন' বা কর্ম পরিষদে তাঁহাদের কাহাকেও গ্রহণের প্রশ্নই উঠে না। আমরা মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলন করি, ছাত্র সমস্যা সমাধানের আন্দোলন করি, সরকারের গণবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াই, কিন্তু দেশের আজাদীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করি না।"

আমার বক্তৃতার সমর্থনে সাধারণ ছাত্রদের একাত্মতা লক্ষ্য করিয়া গোলযোগ প্রিয় কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থকগণ সভা হইতে বিষন্ন বদনে পিছটান দিলেন। সভায় ১৬ তারিখ অপরাহ্নে পরিষদ ভবন সম্মুখে পুলিশী জুলুমে আহতদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পুলিশী জুলুমকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করা হয়। জাতির জনক কায়েদে আযমের আসন্ন পূর্ববঙ্গ সফরকে স্বাগত জানাইয়া তাঁহাকে যথাযথ সম্বর্ধনা দানের আহবানের মধ্য দিয়া সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে পরলোকগত সাংবাদিক সাপ্তাহিক ইনসানের সম্পাদক মরহুম আবদুল ওয়াহেদের ভূমিকা লিপিবদ্ধ করা আমার পবিত্র দায়িত্ব বলিয়া আমি মনে করি। কারণ, অনেকেই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ না করিয়াও অধুনা নানাভাবে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইতিহাসে চিহ্নিত থাকিবার লোভে বিভিন্ন বন্ধু-বান্ধবের কলমের আঁচরে আনুকূল্য কুড়াইতেছেন। করাচীর কুচক্রী ও তাহাদের দোসর বঙ্গ সন্তানদের ন্যাক্কারজনক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার মরণপণ সংগ্রামে শাসকচক্রের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করিয়া সর্বপ্রকার অত্যাচার, নির্যাতনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তরুণ সমাজকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে জনাব ওয়াহেদ বলিষ্ঠ তেজোদ্দীপক সম্পাদকীয়ের মাধ্যমে উদাত্ত আহবান জানাইতেন।

তাঁহার সম্পাদকীয় সংগ্রামী ও সচেতন তরুণ ছাত্র সমাজকে আত্মত্যাগের মন্ত্রে দারুণভাবে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান দিবস ৮ই মার্চ, খেলাধুলা প্রতিযোগিতার ফাঁকে ফাঁকে সমবেত ছাত্র, শিক্ষক ও দর্শকদিগকে ১১ই মার্চ রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন দিবসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিতে অনুপ্রাণিত করিবার মানসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেসিয়াম মাঠে মাইকের মাধ্যমে জনাব ওয়াহেদ কর্তৃক লিখিত সম্পাদকীয় পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলাম। সম্পাদক ওয়াহেদ সাহেব স্বয়ং জিমনেসিয়াম খেলার মাঠে আমাদের সাথে ছিলেন। অতি তরুণ বয়সেই তিনি ইহধাম ত্যাগ করিয়া পরপারে পাড়ি জমাইয়াছেন। আজও ব্যথাবিধুর হৃদয়ে তাঁহাকে স্মরণ করি।

ভাষা আন্দোলনের প্রতি ঢাকার আদিবাসীদের মনোভাব

ঢাকা শহরের আদিবাসীরা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ঘোর বিরোধী ছিল। তাহাদের দৃষ্টিতে আমাদের আন্দোলন ছিল মুসলিম ঐক্য বিনষ্টকারী ও হিন্দুদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। পাকিস্তান শিশু রাষ্ট্র ও পাকিস্তানকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করিবার অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া ভারতীয় পঞ্চম বাহিনী মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন ছলছুতার সুযোগে বিভেদ সৃষ্টির জন্য সদা সচেষ্ট। আমরা অসতর্ক মুহূর্তে ভাবাবেগবশতঃ উক্ত খপ্পরে পতিত হইয়াছি। তাই আমাদের ছাত্রাবসের বাবুর্চি মৌলভীবাজার, বেগমবাজার ও চকবাজারে কেনাকাটা করিতে গেলে আদিবাসীরা কটুক্তি করিত, মারধর করিত, এমনকি তাহার নিকট সওদা পর্যন্ত বিক্রি করিত না। তাহাদের ধারনা, পূর্ববঙ্গে এক কোটির মত হিন্দু আছে এবং তাহারা সবাই পাকিস্তান ধ্বংসের কারসাজিতে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত।

একচেটিয়া শাসন-শোষণ ও লুটপাট পূর্ণোদ্যমে বজায় রাখার অপপ্রয়াসেই আজাদী উত্তর রাজনীতিতে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িকতা, অনগ্রসর সামন্ত অর্থনীতি, বন্ধ্যা শিক্ষানীতি ও স্থবির আমলাতান্ত্রিক প্রথাকে সুচতুরভাবে চালু রাখিয়াছিল। ইহাতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থ হয়তবা চরিতার্থ হইয়াছে, কিন্তু দেশ ও জনগণকে দিতে হইয়াছে চরম মূল্য।

কায়েদে আযমের পূর্ববঙ্গ সফর

স্বাধীনতার পর কায়েদে আযম প্রথম পূর্ববঙ্গ সফর উপলক্ষে ১৯শে মার্চ ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করিলে তাঁহাকে অশ্রুতপূর্ব ও স্বতঃস্ফূর্ত ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ঢাকা বিমান বন্দর হইতে রেসকোর্স পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য ছিল, তিল ধারণের স্থান ছিল না। হর্ষোৎফুল্ল জনতার এই ঢল দেখিয়া কে বলিবে, মাত্র দুই দিন পূর্বেও ঢাকা শহরে সরকার বিরোধী আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ ঢাকার কর্তাব্যক্তিদের মসনদকে টলটলায়মান করিয়া তুলিয়াছিল। দেশবাসীর কি অকৃত্রিম ভালবাসাই না ছিল রাষ্ট্রের জনকের প্রতি। অতি পরিতাপের বিষয়, কায়েদে আযম ২১শে মার্চ রেসকোর্সে অনুষ্ঠিত জনসমাবেশে ভাষণদানকালে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে, উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা

হইবে এবং ভাষা আন্দোলন বিদেশী চক্রান্ত বিশেষ।

১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে তিন লক্ষ লোকের সমাবেশে পাকিস্তনের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলীর জিন্নাহর ভাষণ ঃ (অনুবাদ)

আস্‌সালামু আলায়কুম॥

আমি প্রথমে সম্বর্ধনা আয়োজন কমিটির চেয়ারম্যানের মাধ্যমে ঢাকাবাসী এবং প্রদেশের সবাইর নিকট, আমাকে এই সম্মান জানানোর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পূর্ব বাংলায় আমার এই সফর, আমার জন্য বড় আনন্দদায়ক মনে হচ্ছে। পূর্ববাংলা পাকিস্তানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ অংশে পৃথিবীর এক বিরাট সংখ্যক মুসলমান, একটা নির্দিষ্ট জায়গার ভিতরেই, অবিচ্ছিন্নভাবে বাস করছে। এই অঞ্চল সফর করার প্রচন্ড আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণে, আমার সফরের কিছুটা দেরী হয়ে গেছে।

আপনারা অবশ্যই কতগুলি জরুরী বিষয় জানেন যে, ভারত ভাগের সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবে কী ঘটনা ঘটে গেছে। পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী এবং এর নিকটবর্তী এলাকাগুলি থেকে, ওখানে বসবাসরত লাখ লাখ মুসলমানদেরকে, তাদের জায়গা- জমি, ঘরবাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এসব ভাগ্যহত মুসলমানদের বাঁচিয়ে রাখা, আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা এবং পুনর্বাসনের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে, এরূপ ঘটনা খুব কমই খুঁজে পাওয়া যাবে যে, একটি নতুন রাষ্ট্রকে এত বড় কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। আল্লাহর মেহেরবানীতে, সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের পক্ষে, এই বিরাট এবং কঠিন সমস্যা অত্যন্ত যোগ্যতা ও সাহসের সাথে মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের দুশমনদের মনের বাসনা ছিল, পাকিস্তান জন্মের সাথে সাথেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। শত্রুদের কামনাকে মিথ্যা প্রমাণ করে, তাদের চাপিয়ে দেওয়া কঠিন সমস্যা সমাধানে পাকিস্তান সক্ষম হয়েছে এবং পাকিস্তান দিনের পর দিন শক্তিশালী হয়ে উঠছে। পাকিস্তান টিকে থাকার জন্যই এসেছে এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে এদেশটির জন্ম হয়েছে, আমরা সেই লক্ষ্যপানে কাজ করে যাব।

এই সম্বর্ধনা সভায় যে সব বক্তৃতা হলো, তাতে আপনারা বলেছেন যে, বিপুল সম্ভাবনাময় এই প্রদেশের কৃষিখাত এবং শিল্পখাতকে জোরদার করে তুলতে হবে। প্রদেশের সকল তরুণ, যুবক এবং নারীদের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের সশস্ত্রবাহিনীতে এ অঞ্চলবাসী যেন যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে, সে অবস্থাকে নিশ্চিত করতে হবে। চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়নের কথা বলেছেন। পাকিস্তানের সাথে এই প্রদেশের যোগাযোগ সহজ এবং সুগম করার কথা বলেছেন। শিক্ষা বিস্তারের কথা বলেছেন। সবশেষে আপনারা জোর দিয়ে বলেছেন যে, পাকিস্তানের এই পূর্ব অংশের প্রতিটি নাগরিক তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে যেন, কোনভাবেই বঞ্চিত না হয় এবং সরকারের প্রতিটি স্তরে তাদের ন্যায্য হিস্‌সা নিশ্চিত করা হয়।

আমি এখনই আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই, আপনাদের উদ্বেগ নিরসন এবং ন্যায্য দাবীসমূহ কিভাবে এবং কত তাড়াতাড়ি পূরণ করা যায়, আমার সরকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা সহকারে উল্লিখিত আপনাদের দাবীসমূহের অনেকগুলি বাস্তবায়নের কাজ ইতিমধ্যে হাতে তুলে নিয়েছে এবং কোন রকম শিথিলতা ছাড়াই কাজ করে যাচ্ছে। বিষয়গুলি ভেবে দেখা হবে, এরকমের সময় নষ্ট করারও অবকাশ থাকবে না। পাকিস্তানের এই অংশ, তার ন্যায্য ও পূর্ণ পাওনা যত দ্রুত সম্ভব লাভ করবে। এই অঞ্চলের অতীত ইতিহাস বলে, পূর্ববাংলার মানুষেরা শৌর্যে, বীর্যে, পরিশ্রমে এবং মেধায় অনেক যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছে। সরকার এ প্রদেশের তরুণ ও যুবাদের জনশক্তিতে রূপান্তরের জন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং প্রদানের কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। সরকার এদেশের যুবকদের তাদের নিজ দেশের সশস্ত্রবাহিনী এবং পাকিস্তান ন্যাশনাল গার্ডে যথাযোগ্য ভূমিকা পালনের পথ খুলে দিয়েছে এবং খোলা থাকবে। আমি একথা জোর দিয়ে বলে যাচ্ছি, দেশের সশস্ত্র বাহিনীতে পূর্ববাংলার তরুণেরা সকল সুযোগ সদ্ব্যবহার করে, নিজ দেশকে দুশমনদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জীবন বিলিয়ে দেবার অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারবে না।

এবার আমি এদেশের অন্য আরো কিছু নিয়ে কথা বলবো। সে কথা বলার আগে আমি পূর্ব বাংলার অধিবাসী এবং সরকারকে আরেকবার মোবারকবাদ জানাতে চাই এজন্য যে, গত সাত মাসে আপনারা দেশ গড়ার কাজে বহু কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার করেছেন। ভারত ভাগ হওয়ার পরপরই যে অব্যবস্থা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে পড়েছিল, তার ঢেউ ঢাকার ওপরেও পড়েছে। সে অব্যবস্থাকে একটি শৃঙ্খলার মধ্যে ফিরিয়ে আনতে এখানকার অনুগত ও ত্যাগী প্রশাসন যে পরিশ্রম দক্ষতা ও মেধার পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য তাদেরকে জানাই আমার শ্রদ্ধা এবং সালাম। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে ঢাকার সরকার নিজ দেশের মধ্যে যেন পরবাসী ছিল। ভারত থেকে চলে আসা হাজার হাজার সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এখানে মাথা গোঁজার মত, কোন স্থানেরই ব্যবস্থা ছিল না। গত বছরের (১৯৪৭) ১৫ আগস্টের আগে ঢাকা ছিল একটি মফস্বল টাউন মাত্র। সুশৃঙ্খল হয়ে উঠতে পারেনি, এমন একটি নবগঠিত প্রশাসনের নিকট বিরাট মাথা ব্যথার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ভারতের রেলওয়ে সহ অন্যান্য প্রায় ৭০ হাজার কর্মচারীদের পরিবার পরিজনদের আশ্রয় এবং পুনর্বাসন করা। ভারত বিভক্তির কারণে সৃষ্ট গোলযোগ, হুমকি এবং অনেকটা ভয়ের মুখে এসব লোকেরা কলকাতা ও ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে জীবন বাঁচাবার জন্য এখানে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়।

একইভাবে এখান থেকে হিন্দুরা পাইকারীভাবে দেশত্যাগ করার ফলে প্রশাসনে হঠাৎ শূন্যতা সৃষ্টি হয়ে যায়। প্রশাসন, যোগাযোগ এবং পরিবহন ব্যবস্থায় ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসে। এই সময়ে প্রশাসনের সবচেয়ে জরুরী কাজ হয়ে দাঁড়ায়, কত দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রশাসন ব্যবস্থাকে সংগঠিত ও সচল করে তুলে প্রদেশকে অকল্পনীয় বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা থেকে বাঁচিয়ে তোলা। আমাদের এই নতুন প্রশাসন কঠিন পরীক্ষার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে,

সীমাহীন ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে জাতিকে রক্ষা করেছেন। প্রশাসন সকল বাধা সরিয়ে ফেলে মানুষের জীবন যাত্রাকে স্বাভাবিক এবং সুগম রেখেছেন। আরেকটি মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয়, প্রশাসন কেবল নিজেদের সংগঠিত করে তুলেনি; প্রশাসনের অব্যবস্থার সুযোগে যে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, তাকেও মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে। নতুন প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার সুমহান দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করেছে।

একই সাথে এসব ব্যাপারগুলি সমাধানের জন্য জনগণ বিপুল উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন। আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টির প্রতি। তারা এ রাষ্ট্র গঠনে এবং পরবর্তীতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারত বিভক্তির পরবর্তী কয়েকটি মাসে, লাগাতারভাবে, ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর যে নারকীয় তান্ডব, জুলুম এবং হত্যা নেমে এসেছিল, এতসব উস্কানীর মুখেও এদেশবাসী চরম সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। এত ভয়াবহ অবস্থা ঘটে যাওয়া স্বত্ত্বেও পূর্ববাংলায় এবারের পূজার সময় হিন্দু ভাইয়েরা প্রায় ৪০ হাজার মিছিল বের করেছেন। এসব মিছিলে কোন অশান্তির ঘটনা ঘটেনি এবং উৎসব পালনে কোন নির্যাতনের বা বাধার খবর আমার কাছে আসেনি।

যে কোন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক আমার সাথে একমত হবেন যে, গত কয়েক মাসে সারা ভারত জুড়ে যে মহাতান্ডব ঘটে গেল, তার প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানে কিছুই ঘটেনি। বরং পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের জানমাল নিরাপত্তায়, কঠোর নজর রাখা হয়েছিল। আপনারা নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, পাকিস্তান আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে সক্ষম। কেবল ঢাকার সংখ্যালঘুরা নয়। সারা পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা অনেক দেশের চেয়ে এখানে অধিক নিরাপদ এবং জীবনহানি ঘটনার কোন শংকায় শঙ্কিত নন। আমরা যে কোন মূল্যে, কঠোর হাতে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখবো এবং শান্তি বিঘ্নিত হতে দেবো না। আমার সরকার কোনরূপ গণরাজত্ব অথবা বন্য গণআদালত সৃষ্টি হতে দেবে না।

আমি আবারও একই কথা উল্লেখ করছি, সদ্য প্রতিষ্ঠিত একটি দেশে, ত্যাগ স্বীকারকারী একটি প্রশাসন গড়ে তোলা, অবশ্যাম্ভাবী দুর্ভিক্ষ এড়ানোর জন্য প্রায় ৪ কোটি মানুষের খাদ্যের সংস্থান এবং শান্তি বজায় রাখা আমার সরকারের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল। অনেকে প্রশাসনের এসব বিষয়কে বিবেচনায় আনতে চান না। এগুলি যে অতি সহজ সাধারণ ব্যাপার, তা ধারণা করাও মোটেই উচিত হবে না। সমালোচনা অতি সহজ। দোষ বের করা আরো সহজ। মানুষের জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয় জনতা অতি তাড়াতাড়ি সেসব ভুলে যায় এবং যেসব কাজ হাতে নেওয়া হবে এবং বাস্তবায়ন করা হবে তাও ভুলে যাবে। অথচ পাকিস্তানের আজাদীর সংগ্রামে আমাদেরকে কত পরীক্ষা, বিষাদ, মুসিবত এবং খুন ঝরাতে হয়েছে এবং পাকিস্তান লাভের পর গত কয়টি মাসের কঠিন সমস্যাগুলি সমাধান করতে কী সব দিন কেটে গেছে তা কী জনতার মনে পড়ছে? মনে আছে কী?

প্রশাসনের কথা বার বার এসে যাচ্ছে। আমি জানি, আমরা যা যা আকাঙ্খা করছি তা পুরোটা বর্তমান প্রশাসন মিটাতে পারছে না অথবা এ শাসন ব্যবস্থায় অনেক খুঁত রয়ে

গেছে। আমি বলিনা যে, এই অবস্থাকে উন্নত করা সম্ভব নয়। এমনটাও নয় যে, একজন দেশপ্রেমিকের সমালোচনা গ্রহণ করা যাবে না। বরং সৎ সমালোচনাকারীদের প্রতি আমার আহবান, আপনারা আমাদের ভুল ধরিয়ে দিতে সাহায্য করুন। কিন্তু আমি যখন দেখি, কিছু কিছু মহল কেবল অভিযোগের পর অভিযোগ করে যাচ্ছেন এবং আমাদের দোষ খুঁজে বেড়াচেছন; যেসব ভাল কাজ করা হয়েছে তার সামান্য প্রশংসা বা স্বীকৃতি দিতে বড় কুণ্ঠাবোধ করেন, তখন সরকারে যারা আছেন এবং প্রশাসনের নিবেদিত কর্মকর্তা ও কমচারীবৃন্দ যারা দেশের জন্য দিনরাত অক্লান্ত খেটে মরছেন তাদের মাঝে নেমে আসে গভীর হতাশা। আর এজন্য স্বাভাবিকভাবেই আমিই বেশী কষ্ট পাই।

ভাইদের বলবো, আমরা যেসব ভাল কাজ করেছি তার প্রশংসা না করতে পারুন তবে না করুন। অযথা অভিযোগ এবং সমালোচনা করে জনগণকে বিভ্রান্ত করবেন না। একটা দেশের বিরাট প্রশাসনের মধ্যে অবশ্যই ভুলত্রুটি কিছু না কিছু ঘটতে পারে বা ঘটেছে। মানুষের পক্ষে শতকরা একশত ভাগ নির্ভুল ও সুবিচারপূর্ণ প্রশাসন নিশ্চিত করা সত্যি সম্ভব নয়। এতদসত্ত্বেও আমাদের লক্ষ্য থাকবে, পাকিস্তানের প্রশাসনকে যতটা সম্ভব অন্যায় ও ত্রুটিমুক্ত রেখে সৎ, দক্ষ, গতিশীল, উপকারী এবং ন্যায় বিচারবোধ সম্পন্ন একটি কর্মচঞ্চল প্রশাসন হিসেবে গড়ে তোলা।

আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন কী ভাবে এ ব্যবস্থা অর্জন করা যেতে পারে? হ্যাঁ, সরকারের উদ্দেশ্যকে সামনে এনে সে ব্যবস্থা অর্জনের পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। সেটা হলো সরকার কিভাবে জনগণের সেবা করতে চায়, সরকার কী কী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে এবং এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কী কী কর্মসূচী হাতে নিয়েছে তা জনগণকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে রাখতে হবে।

আপনারা জেনে রাখুন, সরকার বদলের ক্ষমতা এখন আপনাদেরই হাতে। আপনাদের যত দিন ইচ্ছা এই সরকারকে ক্ষমতায় রাখতে পারেন এবং যখনই অপছন্দ হবে এই সরকারকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে দিতে পারবেন। ক্ষমতার এই পরিবর্তন অনিয়মতান্ত্রিক পথ ধরে করা যাবে না। আপনাদের হাতে যে ক্ষমতা এসেছে, সেই অধিকারকে নিয়ম মোতাবেক প্রয়োগ করার চর্চাকে অনুশীলন করতে হবে। আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার এবং পরিবর্তনের নিয়মগুলি রপ্ত করে নিতে হবে। শাসনতান্ত্রিক নিয়মের ভিত্তিতেই, এক সরকারের বদলে অন্য সরকার আসবে এবং যাবে।

অতএব, সরকার বদলের ক্ষমতা এখন আপনাদের হাতে। আমি আপনাদের কাছে আকুল আরজ করবো, আপনারা আরো অধিক ধৈর্যের পরিচয় দিন। বর্তমানে যারা সরকারের হাল ধরে আছে তাদেরকে সমর্থন দিন। তাদের সাথী হোন। তারা যে, অসুবিধা, সীমাবদ্ধতা এবং দুরাবস্থার মধ্য দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন, তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করুন এবং তাদের পক্ষে আপনাদের সকল সমস্যা রাতারাতি পূরণ করা যে অনেকটা অসম্ভব, সেটাও উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। আপনারা সহযোগিতার হাত আরো বাড়িয়ে দিলে, আমাদের দেশের সমস্যা শুধু একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠার।

আমার সবিনয় প্রশ্ন এই লক্ষ জনতার কাছে, আপনারা কী আপনাদের এবং আপনাদের পূর্ব পুরুষদের বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এই দেশটিকে রক্ষা করবেন নাকি আমাদের বোকামীর জন্য দেশটিকে ধ্বংস করে দেবেন? আপনারা কী চান এই দেশটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক? আমি জানি, আপনারা নিজ দেশের ধ্বংস চাইবেন না বরং জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে দেশটিকে রক্ষা করবেন। এরজন্য দরকার একটি কাজের। সেটি হলো আমাদের সকলের মধ্যে শীসার প্রাচীরের মত ঐক্য এবং সংহতি। আপনারা জেনে রাখুন, আমাদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত দেশটির মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করতে আমাদের দুশমনেরা বসে নেই। আমাদের মধ্য থেকে, আমাদের মানুষকে বেছে নিয়ে, অর্থ দিয়ে আমাদের ভবিষ্যতের সকল স্বপ্নকে ধ্বংস করে দিতে তারা ইতিমধ্যে উদ্যত হয়েছে। আমার আকুল আহবান, আপনারা এসব ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সতর্ক থাকেন। এদের মনভুলানো এবং আকর্ষনীয় শ্লোগানের মায়াজাল থেকে নিজেদেরকে হেফাজত করুন।

এরা বলা শুরু করেছে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার এবং পূর্ববাংলার প্রাদেশিক সরকার তাদের মাতৃভাষা বাংলা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র হাতে নিয়েছে। এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কিছুই হতে পারে না। আমি সুস্পষ্টভাবে এবং পরিস্কার ভাষায় বলতে চাই, আমাদের ঐতিহাসিক দুশমনদের এজেন্ট এবং অনেক কমিউনিষ্ট আমাদের মাঝে ঢুকে পড়েছে। আপনারা যদি এদের ব্যাপারে সজাগ না থাকেন তবে এরাই আপনাদের ধ্বংস করে দিতে যথেষ্ট। আমি বিশ্বাস করি, ভারত থেকে পূর্ববাংলা বেরিয়ে আসাকে এরা মেনে নিতে পারে নি। এরা পূর্ববাংলাকে ভারতের সাথে মিশিয়ে দেখতে চায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ষড়যন্ত্রকারীরা দিবাস্বপ্ন দেখছে। পূর্ববাংলার মুসলমানরা কখনও তাদের দেশকে ভারতে মিশিয়ে নেবে না এবং মিশতে দেবে না। আমাকে জানানো হয়েছে যে, প্রদেশ থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের বহুলোক দেশ ত্যাগ করেছে। ভারতের পত্রিকাগুলি দেশ ত্যাগের সংখ্যাকে দশ লক্ষেরও বেশী বলে মিথ্যা সংবাদ ছাপছে। আমাদের সরকারের হিসাব মতে এই সংখ্যা বেশী করে ধরলেও দুই লাখের উপরে যাবে না। এতে আমি একটা স্বস্তিবোধ করছি এজন্য যে, সংখ্যালঘু যেসব ভাইরা দেশ ত্যাগ করেছেন তারা কিন্তু মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের নির্যাতনের ফলে দেশ ত্যাগ করছেন না। আমাদের দেশের সংখ্যালঘুরা যে স্বাধীনতা এখানে ভোগ করছেন এবং নিজেদের সহায় সম্পত্তি সংরক্ষণের যে গ্যারান্টি পাচ্ছেন ঠিক একই অধিকার ভারতের সংখ্যালঘুরা পাচ্ছেন না। তাদের দেশ ত্যাগের কারণগুলি তালাশ করলে দেখতে পাওয়া যাবে ভারতের সাম্প্রদায়িক ও যুদ্ধবাজ নেতাদের বেফাঁস কথাবার্তা একটি অন্যতম কারণ। তারা গুজব ছড়িয়ে দিচ্ছে পাকিস্তান ভারতের মধ্যে শীঘ্রই যুদ্ধ বেধে যাবে। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সংখ্যালঘুদের ওপর যে অত্যাচার এবং নির্যাতন চলছে তার প্রতিক্রিয়া এখানেও দেখা দিবে। অমূলক এই ভয় এবং নির্যাতনের আশংকায় অনেক হিন্দু দেশ ত্যাগ করছেন। তাছাড়া ভারতের কতিপয় পত্রিকায় হিন্দুদেরকে, পাকিস্তান ছেড়ে আসার জন্য অবিরতভাবে লেখালেখি চলছে। এদের লেখাগুলির মধ্যে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার, নির্যাতনের মনগড়া ও মিথ্যা কাহিনীকে তুলে ধরা হচ্ছে। ভারতের হিন্দু মহাসভা এদের মদদ দিয়ে

যাচ্ছে। এতদ মিথ্যা প্রচারণা সত্ত্বেও এদেশে প্রায় সোয়া কোটি সংখ্যালঘু সমাজ শান্তিতে তাদের নিজ জন্মভূমিতে বসবাস করছে এবং অন্যদেশে যাওয়ার চিন্তা প্রত্যাখ্যান করছে। আমি আবার উল্লেখ করতে চাই, আমরা পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার ভোগ করার প্রশ্নে কোন শৈথিল্য বা দ্বিধার সুযোগ রাখবো না। ভারতের চাইতে পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের জানমালের হেফাজত সুরক্ষিত রাখার প্রশ্নে আমরা কঠিন সংকল্পবদ্ধ। পাকিস্তানের আইন, শৃঙ্খলা, শান্তি এবং প্রতিটি মানুষের পূর্ণ নাগরিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে, আমরা কোন সম্প্রদায়, শ্রেণী এবং জাতির বিভেদকে বরদাস্ত করবো না।

ভাল বলছি কী মন্দ বলছি জানিনা। সবার কাছে প্রীতিকর নাও হতে পারে। আমি কিছু নাজুক কথা এখন বলবো। আমাকে জানানো হয়েছে যে, এখানে আসা অবাঙালী মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন কোন মহল স্থানীয় মুসলমানদের দিয়ে, জাতিগত বিদ্বেষ ছড়ানোর পথ বেছে নিয়েছে। একই সাথে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনার জন্য ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্তের অপেক্ষাধীন, উর্দু কী বাংলা ভাষা হবে, তা নিয়ে বেশ উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস চলছে। আমি এও জানতে পারলাম যে, সুযোগ সন্ধানীরা তাদের দুরভিসন্ধিকে অর্জন করার লক্ষ্যে এবং প্রশাসনকে বিব্রত করে তোলার জন্য ঢাকার ছাত্র সমাজকে ব্যবহার করা শুরু করেছে। এই সভায় উপস্থিত আমার যুবক এবং ছাত্র বন্ধুরা, আমি তোমাদেরই একজন, যে কিনা তোমাদের জাতির ভালবাসার এবং তোমাদের বিকশিত জীবন গড়ে তোলার আকাংখায় গত দশটি বছর আরামকে হারাম করে দিয়েছি। ঈমানদারী এবং বিশ্বস্ততাকে বুকের ভিতরে চেপে ধরে জীবনের এ সময়গুলিকে ব্যয় করেছি। এরকমের একটি লোকের মুখ থেকে তোমাদেরকে সাবধান হওয়ার কথা শুনাতে চাই; তোমরা যদি কোন রাজনৈতিক দলের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ো, তবে যে ভুল ঘটে যাবে, তা হয়তো আর কোন দিন শোধরানো সম্ভব হবে না। তোমরা মনে রেখ, যে দেশটি এখন আমাদের, এটি একটি বিপ্লবের ফসল। বর্তমান সরকারতো আমাদের নিজেদের সরকার। আমরা তো এখন আর গোলাম জাতি নই। আমরা এখন একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রের মালিক। আমাদের দেশকে আমরা কীভাবে চালাবো তা আমরাই ঠিক করে নেব। স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিকের মতই আমাদের আচরণ হতে হবে। কারো রাজত্বের অধীনে বা কোন বিদেশী কলোনীর মধ্যে আমরা এখন আর বাস করছি না। আমরা গোলামীর শিকল ছিঁড়ে ফেলেছি, উপড়ে ফেলেছি। আমার যুবক বন্ধুরা, আমার স্বপ্নের পাকিস্তানের তোমরাই নির্মাতা। তোমাদের কাছে আমার আকুল মিনতি, তোমরা বিভ্রান্ত হয়ো না। কারো চক্রান্তের শিকার হয়ো না। তোমরা নিজেদের মধ্যে সুমহান ঐক্য এবং সংহতি গড়ে তোল। যুবকরাই সকল কিছু বদলে দিতে পারে এমন নজির গড়ে তোল। তোমাদের আসল কাজ নিজেদের প্রতি সুবিচার করা। অর্থাৎ নিজেদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। পিতা-মাতাকে সম্মান করা আর স্বদেশ, স্বজাতির কল্যাণে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে রাখা। তোমরা যদি শিক্ষায়, গভীরভাবে মনোনিবেশ করতে পার তবে দেশ শিক্ষিত হয়ে উঠবে। শিক্ষিত দেশই কেবল শক্তিশালী দেশ হতে পারে। আমি তোমাদেরকে লেখাপড়ায় মনোযোগ দেওয়ার জন্য

আকুল আহবান জানিয়ে গেলাম। তোমাদের শক্তি, প্রতিভাকে যদি অপচয় করে ফেল তাহলে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং গভীর মনস্তাপে সারাটা জীবন দুঃখময় হয়ে যাবে। তোমরা কলেজ ইউনিভার্সিটির পড়াশুনা শেষ করে, পূর্ণ বিবেচনা করার শক্তির অধিকারী হয়ে, দেশকে গড়ে তোলার জন্য সত্যিকারের অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এতগুলি কথার মধ্য দিয়ে, আমি তোমাদেরকে পুনরায় হুশিয়ার করে জানিয়ে রাখতেই চাইঃ পাকিস্তান এবং পূর্ববাংলার যে বিপদসমূহের কথা আগে বলেছি, তা আমাদের উপর থেকে এখনও কেটে যায়নি। আমাদের ঐতিহাসিক দুশমনেরা পাকিস্তান সৃষ্টির বিরুদ্ধে শত চেষ্টা করে বিফল হয়েছে। তারা এখনও বসে নেই। এখন তারা তাদের কৌশল বদলিয়েছে। তারা এখন আমাদের দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাঁয়তারা খুঁজছে। আর তারা ভাল করেই জানে, আমাদের মধ্যে প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা জাগিয়ে তুলতে পারলে, আমরা বিভক্ত হয়ে যাব এবং তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে। আর আমরা যতক্ষণ না আঞ্চলিকতা এবং প্রাদেশিকতাকে আমাদের মন থেকে, চিন্তা থেকে এবং রাজনীতি থেকে ছুঁড়ে ফেলতে না পারবো, ততদিন পর্যন্ত আমরা একটি শক্তিশালী ও আধুনিক রাষ্ট্রের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত এবং গড়ে তুলতে পারবো না। আমরা কী এই পরিচয়ে পাকিস্তান করেছি যে, আমরা বাঙালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, বেলুচী, পাঠান, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এগুলি অবশ্যই আমাদের জাতিসত্তার এক একটি ইউনিট। আমি আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই তেরশত বছর আগে আমাদের কাছে যে হেদায়েত এসেছে, সে কথা কী আমরা ভুলে গেছি।

আমি ইতিহাসের সত্য কথাটি বলতে চাই, এই পাকিস্তানে আমরা যে যেখানেই বাস করছি, আমরা সকলেই বহিরাগত। এই বাংলায় যারা বাস করছেন, তারা কেউই এখানের আদি অধিবাসী নন। সুতরাং আমরা বাঙালী, আমরা পাঠান, আমরা পাঞ্জাবী বলে কী লাভ? আমাদের সকলের প্রথম পরিচয় আমরা মুসলমান।

ইসলাম আমাদেরকে এই কথাই শিক্ষা দিয়েছে। আমি মনে করি তোমরা আমার সাথে একমত হবে যে, আগে আমরা কি ছিলাম বা না ছিলাম, কিভাবে এখানে আসলাম, এসবের প্রাসঙ্গিকতার চেয়ে, বর্তমানে আমাদের প্রধান পরিচয় আমরা মুসলিম। প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা, তোমাদের একটি স্বাধীন দেশ হয়েছে। এটা ছোট্ট একফালি জমির দেশ নয়। এখন একটি বিরাট ভু-খন্ড তোমাদের হয়েছে, এই ভু-খন্ডটির মালিক কোন পাঞ্জাবীর, কোন সিন্ধির, কোন বেলুচির, কোন পাঠানের বা কোন বাঙগালীর নয়। এটি আমাদের, তোমাদের সবার। তোমরা একটা কেন্দ্রীয় সরকার পেয়েছো, যেখানে সকল ইউনিটের প্রতিনিধি রয়েছে। তাই বলতে চাই, তোমরা যদি একটি শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে দুনিয়ার বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাও, তবে আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাদের কাছে আরজ করছি, তোমরা প্রাদেশিক হিংসা, আঞ্চলিক ক্ষুদ্রতাকে ঝেড়ে ফেলে দাও। আঞ্চলিকতা এবং প্রাদেশিকতা আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় অভিশাপ। বিভেদের আরো যেসব রয়েছে, শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্ব এসবকেও দূরে সরিয়ে রাখ।

এ ধরনের বিরাজিত অবস্থা নিয়ে, পরাধীন আমলের সরকারগুলির মাথা ব্যথা ছিল না। তারা এরূপ অবস্থায় অস্বস্তিবোধ করতো না। তাদের লক্ষ্য ছিল বাণিজ্যের দিকে। ভারতবর্ষকে

যেভাবে এবং যতভাবে শোষণ করা যায় তাকে নিরুপদ্রব রাখতেই আইন-শৃঙ্খলার প্রতি নজর রাখতো। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে গেছে। আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি, বর্তমান আমেরিকার কথা ধরুন, তারা যখন ব্রিটিশদের তাদের দেশ থেকে বের করে দিয়ে নিজেরা স্বাধীনতা ঘোষণা করলো, তখন তাদের দেশে এত জাতি-গোষ্ঠী ছিল যার বর্ণনার শেষ করা যাবে না। স্পেনিক, ফরাসী, জার্মান, ইতালিয়ান, ইংরেজ, ওলন্দাজ, ইত্যাদি ইত্যাদি। এদের নিজেদের ভিতর জাতিগত সমস্যা ছাড়াও, শত সমস্যা নিয়ে তারা সেখানে বাস করতো। লক্ষ্য করুন, এতসব নিজেদের সমস্যাকে কাটিয়ে পৃথিবীর একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়েছে। আর আমাদের ভিতর এ ধরনের কোন জটিল সমস্যার অস্তিত্বই নেই। তাছাড়া, আমরা সবেমাত্র পাকিস্তান হাসিল করেছি। মনে করুন, আমেরিকায় ফরাসী বংশোদ্ভূত কেউ একজন যদি বলে, আমি একজন ফরাসীয়। আমি পৃথিবীর অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ জাতির সদস্য। আমার এই এই গৌরব রয়েছে। অন্যরাও যদি অনুরূপ কথা বলতো, তাহলে পরিস্থিতি বা কী দাঁড়াতো? তাদের মধ্যে তাদের নিজেদের সমস্যা উপলব্ধি করার যথেষ্ট শক্তি ছিল এবং এর ফলে অতি অল্প সময়ে তারা, তাদের ভিতরকার সমস্যাগুলি মিটিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে এবং স্ব-স্ব জাতি, গোষ্ঠীর বিভেদের দেওয়ালকে সরিয়ে ফেলতে পেরেছে। তারা নিজেদের জার্মান, ফরাসী, ইংরেজ, স্পেনিক পরিচয় মুছে দিয়ে আমেরিকান হিসাবে পরিচয় দিতে কোন কুণ্ঠাবোধ করেনি। তাদের ভিতর নিজ দেশের জাতিগত চেতনা, এত শক্তিশালী হয়েছে যে, তারা এখন গর্বভরে বলে থাকে আমি একজন আমেরিকান অথবা আমরা আমেরিকান। সুতরাং এরকম করেই কী আমরা নিজেদের চিন্তা করতে পারি না? আমরা সবাই কী আমাদের দেশ পাকিস্তান, আমি, আপনি এবং আমরা সবাই পাকিস্তানী, এই ধারণাকে আমাদের হৃদয়ের ভিতরে প্রবেশে করিয়ে দিতে পারি না? আমি আবারও আপনাদের কাছে অনুরোধ করে যাচ্ছি আপনারা প্রাদেশিকতা এবং আঞ্চলিকতা থেকে নিজেদের মুক্ত করে ফেলুন। পাকিস্তানের রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা রাজনীতিতে যদি প্রাদেশিকতার বিষ ঢুকে যায়, আপনারা কখনও শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হবেন না। পাকিস্তানকে একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করার যে সংকল্প পোষণ করি, তা অর্জিত হবে না। আপনারা মনে করবেন না, আমি আপনাদের পরিচয়ের অমর্যাদা করছি। এরকম অবস্থার মধ্য দিয়েই ধ্বংসকামী দুষ্টচক্র জন্ম নেওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়। এরা এভাবে বলে থাকে পাঞ্জাবীরা বড় অহঙ্কারী আবার অবাঙ্গালী বা পাঞ্জাবীরা বলে থাকবে বাঙ্গালীরা এমন, এমন। এরা আমাদের পছন্দ করে না, তারা আমাদেরকে এদেশ থেকে বের করে দিতে চায়। এরকমের পরিস্থিতি সৃষ্টি করাই দুশমনদের কৌশল এবং চক্রান্তের বিষাক্ত জাল। এ ধরনের অবিশ্বাস ও সন্দেহ আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেলে সেটা সমাধান করা কারো পক্ষে সম্ভব হবে বলে, আমার মনে হয় না। দেশপ্রেমিক ভাইদের প্রতি আহবান জানাই, এসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না।

ভাষাকে ইস্যু করে, যা কিনা আমি আগেও বললাম, মুসলমানদের মধ্যে একটা বিশৃংখলা সৃষ্টির পাঁয়তারা চলছে। আপনাদের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে আমি সন্তুষ্ট। তিনি বলেছেন, এ বিষয়কে ইস্যু করে কোন নৈরাজ্যবাদী রাজনৈতিক মহল, দুশমনদের

অর্থপুষ্ট কোন এজেন্ট যদি প্রদেশের শান্তি-শৃংখলা বা উন্নতিকে ব্যাহত করার অপচেষ্টা চালায় তবে তা কঠোর হাতে দমনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই প্রদেশের অফিসিয়াল ভাষা যদি বাংলা করতে হয় তবে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্পূর্ণ এক্তিয়ার নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধিদের রয়েছে। এবং তারাই তা নির্ধারণ করবেন। আমি বিশ্বাস করি, এই সমস্যার সমাধান অবশ্যই এই প্রদেশের অধিবাসীদের আশা আকাঙ্খা অনুযায়ী যথা সময়ে নিস্পত্তি ঘটবে। আমি পরিস্কার ভাষায় একথা আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই, বাংলা ভাষার প্রশ্ন নিয়ে এই প্রদেশবাসীর দৈনন্দিন জীবন-যাপনে, চাকুরী-বাকুরীতে কোনরূপ হতাশা, উদ্বেগ বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ ঘটবে না। আবারও বলছি এ প্রদেশের অধিবাসীরাই তাদের প্রাদেশিক ভাষা যথা সময়ে নির্ধারণ করে নিতে পারবেন। কিন্তু, আমি আপনাদের কাছে এ কথাটি পরিস্কার করে জানিয়ে রাখতে চাই, নিখিল পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা উর্দু হতে হবে। কোন প্রাদেশিক ভাষা রাষ্ট্র ভাষা হতে পারে না। আর এ ব্যাপারে আপনাদেরকে যারা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে তারা অবশ্যই পাকিস্তানের জানি দুশমন। রাষ্ট্রের যদি একটি রাষ্ট্র ভাষা না করা যায়, তাহলে সে রাষ্ট্রটিকে একটি শক্তিশালী ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করা যাবে না। পৃথিবীর ইতিহাস এবং বড় বড় দেশগুলির দিকে আপনাদের তাকাতে বলবো। সেসব দেশসমূহে রাষ্ট্রভাষা কয়টি এবং অধিকাংশের বোধগম্য ভাষাটিকে কী রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে নির্বাচন করা হয়নি? সুতরাং, পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা উর্দুই হওয়া দরকার। কিন্তু রাষ্ট্রভাষার বিষয়টিও এ মুহূর্তের কোন বিষয় নয়। সময়ের প্রয়োজনের সাথে মিলিয়ে, রাষ্ট্র ভাষার বিষয়টির সুরাহা করা হবে।

বক্তৃতায় আমি বারবার যে কথা বলছি, তা হলো, প্রিয় দেশবাসী আপনারা পাকিস্তানের দুশমনদের মিষ্টি কথার ফাঁদে পা দিবেন না। এসব দুশমনরা স্বদেশের এবং স্বজাতির বিরুদ্ধে কাজ করছে। এরা পঞ্চম বাহিনী। আমি দুঃখিত এবং ব্যথিত যে, এদের পরিচয়ে রয়েছে মুসলিম নাম। আমার এসব ভাইয়েরা সর্বনাশা ভুলের পথে পা বাড়িয়েছে।

আমরা কোন দেশদ্রোহমূলক তৎপরতাকে বরদাশত করবো না। আমরা পাকিস্তানের দুশমনদের সহ্য করবো না। আমাদের দেশে কোন বিশ্বাসঘাতকদের দেখতে চাই না। এসব পঞ্চম বাহিনীর সদস্যরা তাদের অপতৎপরতা এখনই বন্ধ না করলে, আমার বিশ্বাস প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার এসব নাশকতামূলক কাজ বন্ধ করতে কঠিন পথ বেছে নিবে। এরা জাতির জন্য বিষ।

আমি ভিন্নমত পোষণ করার অধিকারের বিষয়টি বুঝি এবং মানি। এদিক ওদিকে কেউ কেউ বলছেন, আমাদেরকে কেনো একটি মাত্র পার্টিতে থাকতে হবে? অন্যটিতে নয় কেনো? এ ব্যাপারে আমার মন্তব্য হলো এবং আশা করছি আপনারাও একমত হবেন যে, আমাদের অক্লান্ত মেহনত এবং সংগ্রামের ফসল হিসাবে, সবেমাত্র ৭ মাস হলো আমরা পাকিস্তানকে হাসিল করেছি। আর মুসলিম লীগের মাধ্যমেই এই অসাধ্য সাধন হয়েছে। এদেশের অনেক মুসলমানের কথা বলবো, তারা আমাদের আন্দোলনের ব্যাপারে উৎসাহীতো নয়ই বরং অনেক ক্ষেত্রে বিরোধিতা করেছেন বা উদাসীন ছিলেন। কেউ কেউ ভীত ছিলেন যে,

পাকিস্তান হয়ে গেলে, তারা সে সময়ে যে সুযোগ-সুবিধা বা কায়েমী স্বার্থ ভোগ করছিলেন, সেগুলিকে হারিয়ে ফেলবেন। এদের অনেকে আমাদের শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে তৎপর ছিলেন। আল্লাহর অসীম মেহেরবানীতে সকল ষড়যন্ত্র, ক্রোধ এবং বিরোধিতার বিরুদ্ধে প্রাণপন সংগ্রাম করে আমরা পাকিস্তানকে অর্জন করে এনেছি। সারা দুনিয়া অবাক বিস্ময়ে আমাদের এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করেছে। এজন্য মুসলিম লীগ আমাদের কাছে একটি পবিত্র আমানত। দেশবাসীর কল্যানের লক্ষ্যে এবং দেশকে রক্ষা করার অতন্ত্রপ্রহরী হিসেবে আমাদের এই বিশ্বস্ত দলটিকে সুসংগঠিত করা দরকার নয় কী? নাকি হঠাৎ গজিয়ে উঠা দলসমূহ, যাদের নেতৃত্বে রয়েছে এমন সব লোকজন যাদের অতীত নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। তাদের হাতে পাকিস্তানের নেতৃত্ব তুলে দিলে তারা বহু ত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া দেশটির বিনাশ ঘটাবে না তার কি কোন গ্যারান্টি আছে?

সমবেত জনতা আমি আপনাদের প্রশ্ন করতে চাই আপনারা কি পাকিস্তান টিকে থাকুক তা চান কিনা? (জনতা উত্তর দিল চাই) আপনারা পাকিস্তান অর্জন করেছেন তার জন্য কি বেজার না খুশী। (জনতার উত্তর খুশী খুশী) আপনারা পাকিস্তানের অংশ স্বাধীন পূর্ব বাংলা ইন্ডিয়ার সাথে মিশে যাবে তা কি চান? (জনতার উত্তর না না)। আমি আশ্বস্ত হলাম। আমি খুশী হলাম। আপনারা তাহলে পাকিস্তানকে গড়ে তোলার জেহাদে নেমে পড়ুন। পাকিস্তানকে গড়ে তুলতে সমৃদ্ধ করে তুলতে এ সময়ের দাবী হলো আপনারা মুসলিম লীগে শরীক হোন এবং দেশের খেদমতে নেমে পড়ুন। নতুন গড়ে ওঠা দলগুলির নেতাদের অতীতকে জানুন। এই মুহূর্তে আমাদের বিভক্ত হওয়া উচিত হবে না। আমি এসব দল সমূহের বিরুদ্ধে কোন মনোভাব পোষণ করিনা বা হাসি ফুটিয়ে তোলার জন্য আপনাদের আরো যদি দুঃখ, কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয় এমনকি জীবন কোরবানী দিতে হয় এসবের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমার এ দাবীটি জানিয়ে বক্তৃতা শেষ করতে চাই। একটা জাতির কল্যাণের জন্য একটা দেশকে গড়ে তোলার পেছনে আপনাদের মেহনত বৃথা যাবে না। এই পথ বেয়েই আমরা পৃথিবীতে এক শক্তিশালী রাষ্ট্র এবং সম্মানিত জাতি হিসেবে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরতে পারবো। শুধু জনসংখ্যার হিসেবে পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম দেশ হয়ে থাকতে চাই না, শক্তি সমৃদ্ধির সাথেই আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশ এবং জাতিগুলি থেকে শ্রদ্ধা সম্মান অর্জন করে নিতে চাই। এ কথাগুলি বলেই আমি মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এবং আমাদের তৌফিক দানের জন্য মুনাজাত করছি।

২১ শে মার্চের ভাষনে কায়েদে আযমের মন্তব্য ছাত্র সমাজকে মর্মাহত করিল এবং যত ক্ষীণ কণ্ঠে হউক, ইহার প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটিল ২৪শে মার্চ কায়েদে আযমের সম্মানার্থে আয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে।

১৯৪৮ সালের ২৪শে মার্চ কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র ভাষণঃ

STUDENT'S ROLE IN NATION-BUILDING

Mr. Chancellor, Ladies and Gentlemen,

When I was approached by your Vice-Chancellor with a request to deliver the convocation Address, I made it clear to him that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects with which this University deals, such as Arts, History, Philosophy, Science, Law and so on. I did, however, promise to say a few words to the students on this occasion. And it is in fulfillment of that promise that I will address you now.

First of all, let me thank the Vice-Chancellor for the flattering terms in which he reffered to me. Mr. Vice-Chancellor, whatever I am, and whatever I have been able to do, I have done it merely as a measure of duty which is incumbent upon every Mussalman to serve his people honestly and selflessly.

In addressing you I am not here speaking to you as Head of the state, but as a friend and as one who has always held you in affection, Many of you have today got your diplomas and degrees and I congratulate you. Just as you have won the laurels in your University and qualified yourselves, so I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. Many of you have come to the end of your scholastic career and stand at the threshold of life. Unlike your predecessors, you fortunately leave this University to enter life under a sovereign, independent state of your own. It is necessary that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary

change that took place on the birth of Pakistan. We have broken the shackles of slavery, we are now a free people. Our state is our own state. Our Government is our own Government, of the people, responsible to the people of the state and working for the good of the state. Freedom, however, does not mean licence. It does not mean that you can now behave just as you please and do what you like, irrespective of the interests of other people or of the state. A great responsibility rests on you and, on the contrary, now more than ever, it is necessary for us to work as a united disciplined nation. What is now required of us all is constructive spirit and not the militant spirit of the days when we were fighting for our freedom. It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom. It is easier to go to jail or fight for freedom than to run a Government. Let me tell you something of the difficulties that we have overcome and of the dangers that still lie ahead. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan, our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. Thus hardly had the new state come into being when came the Punjab and Delhi holocaust. Thousands of men, women and children were mercilessly butchered and millions were uprooted from their homes. Over fifty lakhs of these arrived in the Punjab within a matter of weeks. The care and rehabilitation of these unfortunate refugees, stricken in body and in soul, presented problems which might well have destroyed many a well-established state. But those of our enemies who had hoped to kill Pakistan at its very inception by these men were disappointed. Not only has Pakistan survived the shock of that upheaval, but it has emerged stronger more chastened and better equippeed than ever.

There followed in rapid succession other difficulties, such as withholding by India of our cash balances, of our share of military equipment and lately, the institution of an almost complete economic blockade of your province. I have no doubt that all right-thinking men in the Indian Dominion deplore these happenings and I am sure the attitude of the mind that has been responsible for them will change, but it is essential that you should take note of these developments. They stress the importance of continued vigilance on our part. Of late, the attack on

your province, particularly, has taken a subtler form. Our enemies, among whom I regret to say, there are still some Muslims, have set about actively encouraging provincialism in the hope of weakening Pakistan and thereby facilitating the re-absorption of this province into the Indian Dominion. Those who are playing this game are living in a Fool's paradise, but this does not prevent them from trying. A flood of false propaganda is being daily put forth with the object of undermining the solidarity of the Mussalmans of this state and inciting the people to commit acts of lawlessness. The recent language controversy, in which I am sorry to make note, some of you allowed yourselves to get involved even after your Prime Minister had clarified the poison is only one of the many subtle ways whereby the position of provincialism is being sedulously injected into this province. Does it not strike you rather odd that certain sections of the Indian press to whom the very name of Pakistan is anathema, should in the matter of language controversy set themselves up as the champion of what they call your "Just rights"? It is not significant that the very persons who in the past have betrayed the Mussalmans or fought against Pakistan, which is after all merely the embodiment of your fundamental right of self-determination, should now suddenly pose as the saviours of your just rights and incite you to defy the Government on the question of lanquage ? I must warn you to beware of these fifth coulmnists. Let me restate my views on the question of a state lanquage for Pakistan. For official use in this province, the people of the province can choose any language they wish. This question will be decided solely in accordance with the wishes of the people of this province alone, as freely expressed through their accredited representatives at the appropriate time and after full and dispassionate consideration. There can, however, be only one lingua faranca, that is, the language for inter communication between the various provinces of the state, and that language should be Urdu and can not be any other. The state language, there fore, must obviously be Urdu, a language that has been nurtured by a hundred mullion of Muslims of this sub continent, a language understood through out the length and breadth of pakistan and above all, a language which, more than any other provincial language

embodies the best that is in Islamic culture and Muslim tradition and is nearest to the language used in other Islamic countries. It is not without significance that Urdu has been driven out of the Indian Union and that even the official use of the Urdu script has been disallowed. These facts are fully known to the people who are trying to exploit the language controversy in order to stir up trouble. There was no justification for agitation but it did not suit their purpose to admit this. Their sole object in exploiting this controversy is to create split among the Muslims of this state, as indeed they have made no secret of their efforts to incite hatred against non-Bengali Mussalmans. Realising however, that the statement that your Prime Minister made on the language controversy, on return from Karachi, left no room for agitation, in so far as it conceded the right of the people of this province to choose Bengali as their official language if they so wished. These persons changed their tactics. They started demanding that Bengali should be the state language of the Pakistan Centre and since they could not overlook the obvious claims of Urdu as the official language of Muslim State, they proceeded to demand that both Bengali and Urdu, should be the State languages of Pakistan. Make no mistake about it. There can be only one State language if the component parts of this State are to march forward in unison and that language, in my opinion, can only be Urdu I have spoken at some length on this subject so as to warn you of the kind of tactics adopted by the enemies of Pakistan and certain opportunist politicians to try to disrupt this state or to discredit the Government. Those of you who are about to enter life, be on your guard against these people. Those of you who have still to continue your studies for some time, do not allow yourselves to be exploited by any political party or self-seeking politician. As I said the other day, your main occupation should be in fairness to yourselves, in fairness to your parents and indeed in fairness to the State, to devote your attention solely to your studies. It is only thus that you can equip yourselves for the battle of life that lies ahead of you. Only thus will you be an asset and a source of strength and of pride to your state. Only thus, can you assist it in solving the great social and economic problems that confront it and enable it to reach its destined goal among the most

progressive and strongest nations of the world.

My young friends, I would, therefore, like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware. Firstly, beware of the fifth columnists among ourselves. Secondly, guard against and weed out selfish people who only wish to exploit you so that they may swim. Thirdly, learn to judge who are really true and really honest and unselfish servants of the States who wish to serve the people with heart and soul and support them. Fourthly, Consolidate the Muslim League Party which will serve and build up a really and truly great and glorious Pakistan. Fifthly, the Muslim League has won and established Pakistan and it is the muslim League whose duty is now, as custodian of the sacred trust, to construct Pakistan. Sixthly, there may be many who did not lift their little fingers to help us in our struggle, many even opposed us and put every obstacle in our great struggle openly and not a few worked in our enemy's camp against us, who may now come forward and put their own attractive slogans catch-words, ideals and programmes before you. But they have yet to prove their bonafides or that there has really been an honest change of heart in them, by supporting and joining the League and working and pressing their views within the League Party organisation and not by starting mushroom parties, at this juncture of very great and grave emergency when you know that we are facing external dangers and are called upon to deal with internal complex problems of a far-reaching character affecting the future of seventy millions of people. All these demands complete solidarity, unity and discipline I assure you. "Divided you fall, United you stand."

There is another matter that I would like to refer to. My young friends, hitherto, you have been following the rut. You get your degrees and when you are thrown out of this University in thousands, all that you think and hanker for is Government service. As your Vice-Chancellor has rightly stated the main object of the old system of education and the system of Government existing, hitherto, was really to have well-trained, well-equipped clerks. Of course, some of them went higher and found their level, but the whole idea was to get well qualified clerks. Civil Service was mainly staffed by the Britons and the Indian element was

introduced later on and it went up progressively. Well, the whole principle was to create a mentality, a psychology, a state of mind, that an average man, when he passed his B.A. or M.A. was to look for some job in Government. If he had it he thought he had reached his height. I know and you all know what has been really the result of this. Our experience has shown that an M. A. earns less than a taxi driver, and most of the so-called Government servants are living in a more miserable manner than many menial servants who are employed by well-to do people. Now I want to get out of that rut and that mentality and specially now that we are in free Pakistan. Government cannot absorb thousands, Impossible. But in the competition to get Government service most of you get demoralised. Government can take only a certain number and the rest cannot settle down to anything else and being disgruntled are always ready to be exploited by persons who have their own axes to grind. Now I want that you must divert your mind, your attention, your aims and ambition to other channels and other avenues and fields that are open to you and will increasingly become so. There is no shame in doing manual work and labour. There is an immense scope in technical education for we want technically qualified people very badly. You can learn banking, commerce, trade, law etc.; which provide so many opportunities now. Already you find that new industries are being started, new banks, new insurances companies, new commercial firms are opening and they will grow as you go on. Now there are avenues and fields open to you. Think of them and divert your attention to them, and believe me, you will thereby benefit yourselves more than by merely going in for Government Service and remaining there, in what should say, a circle of clerkship, working there from morning till evening, in most dingy and uncomfortable conditions. You will be far more happy and far more prosperous with far more opportunities to rise if you take to commerce and industry and will thus be helping not only yourselves but also your state. I can give you one instance. I know a young man who was in Government service. Four years ago he went into a banking corporation on two hundred rupees, because he had studied the subject of banking and today he is Manager in one of their firms and drawing fifteen hundred rupees a month in just

four years. There are the opportunities to have and I do impress upon you now to think in these terms.

Finally, I thank you again Mr. Chancellor and particularly you Mr. Vice Chancellor for the warm welcome you have given me and the very flattering personal references made by you. I hope, may I am confident that the East Bengal youth will not fail us.

কায়েদ আযমের ভাষণে "Urdu & Urdu shall be the state Language- এই মন্তব্যের সাথে সাথে সমাবর্তন উৎসবে উপস্থিত ছাত্রদের একাংশ No No অর্থাৎ 'না' 'না' বলিয়া প্রতিবাদ জানাইল। ২০শে মার্চ কায়েদে আযম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদ সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক; ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্র সংসদ সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা হল ছাত্র সংসদ সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদ সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদিগকে সাক্ষাৎ দান করেন।

২২শে মার্চ কায়েদে আযম নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দলের সহিত সাক্ষাৎ দান করেন। অতঃপর ২৩শে মার্চ নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ (উত্তরকালে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ) প্রতিনিধি শাহ আজিজুর রহমান ও মাজহারুল হক কুদ্দুস এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠাতা আহবায়ক নঈমুদ্দিন আহমদ ও মোঃ তোয়াহা এক যুক্ত বৈঠকে কায়েদে আযমের সহিত মিলিত হন। উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণের পর ২৪শে মার্চ কায়েদে আযম পুনরায় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিনিধি শাহ আজিজুর রহমান ও মাজহারুল হক কুদ্দুস এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ সাংগঠনিক কমিটির সদস্য আবদুর রহমান চৌধুরী ও মোহাম্মদ তোয়াহার সহিত এক বৈঠকে মিলিত হইলেন। ধৈর্য সহকারে আদ্যপান্ত শুনিয়া তিনি নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগকে মৃত ঘোষণা করিয়া পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে যোগ দিতে নির্দেশ দিলেন। ছাত্রনেতৃবৃন্দও লিখিতভাবে এক অঙ্গীকার পত্রে সহি করিলেন যে, তাহারা পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে একযোগে কাজ করিবেন। কায়েদে আযম নব গঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগকে আশীর্বাদ জানাইয়া একটি বাণী দিলেন; কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সাপেক্ষে উহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। ইতিমধ্যে অদৃশ্য হস্তের কারসাজিতে কায়েদে আযম স্বীয় মত পাল্টাইলেন এবং ২৭শে মার্চ তিনি শাহ আজিজুর রহমান ও মাজহারুল হক কুদ্দুসের সহিত পৃথকভাবে আলোচনার পর পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিনিধিদ্বয় আবদুর রহমান চৌধুরী ও মোঃ তোয়াহার সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজনই আর বোধ করিলেন না। কায়েদে আযমের আচরণে মর্মাহত হইয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া আবদুর রহমান চৌধুরী সংবাদপত্রে বিবৃতি মারফত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের উপর কায়েদে আযমের 'আর্শীর্বাদ বাণী' সাধারণ ছাত্রদের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন।

কায়েদে আযমের আমন্ত্রণে ২৪শে মার্চ অপরাহ্নে সর্বজনাব শামসুল হক, নঈমুদ্দিন আহমদ, কামরুদ্দিন আহমদ, আজিজ আহমদ, শামসুল আলম, তাজুদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক আবুল কাসেম, মোঃ তোয়াহা এবং আমি রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহার সহিত পূর্ব বঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদের বাসভবনে (পরবর্তীকালে মিন্টু রোডস্থ গণভবন) এক বৈঠকে মিলিত হই। পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর কায়েদে আযমের সহিত আলোচনা শুরু হয়। আলোচনার প্রারম্ভেই কায়েদে আযম মন্তব্য করেন যে, একাধিক রাষ্ট্র ভাষা রাষ্ট্রীয় সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর। ইহার জবাবে কামরুদ্দিন আহমদ বলেন যে, সুইজারল্যান্ড ও কানাডায় একাধিক রাষ্ট্র ভাষা জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি করিয়াছে। কায়েদে আযম তদুত্তরে অসহিষ্ণু স্বরে বলেন যে, তাঁহাকে ইতিহাস শিখাইতে হইবে না। তিনি ইতিহাস জানেন। অবচেতনভাবে আমি প্রতিউত্তরে বলিয়া ফেলিলাম যে, ইতিহাস নিশ্চয়ই আপনি জানেন, তবে রাষ্ট্র ভাষার বিষয়ে ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করিতেছেন। অতঃপর কায়েদে আযম ধীরস্থির শান্তকণ্ঠে পাকিস্তান সংগ্রামের ইতিবৃত্ত চুম্বক ভাষায় বিবৃত করিয়া আবেগের মুহূর্তে আমাদের ইংরেজীতে বলিলেন, In the interest of the integrity of Pakistan, if necessary, you will have to change your mother tongue" অর্থাৎ "পাকিস্তানের সংহতির খাতিরে প্রয়োজনবোধে তোমাদিগকে মাতৃভাষা পরিবর্তন করিতে হইবে।" কায়েদে আযমের উক্ত বিস্ময়কর মন্তব্য সকলকেই বিস্মৃত, বিমূঢ় ও হতবাক করিয়া ফেলিল। এই কি যুক্তিবাদী কায়েদে আযম কথা বলিতেছেন, না আর কেহ? বেসামাল অবস্থা কিছুটা সামলাইয়া লইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিবার মধ্যেই আমি অতিষ্ঠভাবে বলিয়া উঠিলাম, "Sir, Britain, U.S.A., Canada, Australia & Newzeland speak the same language, preach the same religion, come of the same stock, could they form one state? Despite the same religion Islam, same language Arabic, same semitic blood, one same land Arab, why are there so many states on Arab land?"

অর্থাৎ "স্যার, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড একই ভাষা, একই ধর্ম, একই বংশোদ্ভুত হওয়া সত্ত্বেও তাহারা একই রাষ্ট্র গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছে কি? একই ধর্ম ইসলাম, একই ভাষা আরবী, একই সেমেটিক রক্ত ও একই আরব ভূমি সত্ত্বেও আরব জগতে এতগুলি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কেন?" বেশ বুঝিতেছিলাম যে, কায়েদে আযম আমার উত্তর হজম করিতে বেগ পাইতেছেন, কিন্তু জবাবে তাঁহার বলিবার কিছু ছিল না। এমন সময় জনাব শামসুল হক মাগরিবের নামাজের সময় হইয়াছে স্মরণ করাইয়া দিয়া মাগরিবের নামাজ আদায়ের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কায়েদে আযম নামাজ আদায়ের অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও শামসুল হক সাহেব নামাজের জন্য সভাকক্ষ ত্যাগ করেন নাই বরং আলোচনায় অংশগ্রহণে ব্যাপৃত রহিলেন। অতঃপর তিনি আবার নামাজের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন কায়েদে আযম বিরক্তির সহিত বলিলেন, "Why don't you go out & say

prayer" অর্থাৎ "বাহিরে যাইয়া নামাজ আদায় কর না কেন?" কায়েদে আযম নামাজের সময় নামাজের বিরতি না দিয়া আলোচনা করিতেছেন বিধায় জনাব শামসুল হক ইচ্ছাকৃতভাবেই সবার নিকট কায়েদে আযমকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহাই বোধহয় কায়েদে আযমের ধারণা জন্মিয়াছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই আলোচনা জমিতেছিলনা এবং মোটামুটি একটি তিক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। কায়েদে আযমের অন্য সাক্ষাৎকারের কর্মসূচী মিলিটারী সেক্রেটারী স্মরণ করাইয়া দিলে প্রস্থানকালে বিদায় সম্ভাষণের সময় লাহোর প্রস্তাবের উল্লেখ মাত্র তিনি জনাব শামসুল হকের পানে অংগুলী নির্দেশ করিয়া রাগতঃস্বরে বলিলেন, "I know you" অর্থাৎ "তোমাকে চিনি"। ইহা বলার অর্থ বোধহয় এই যে, জনাব আবুল হাশিমের সহিত জনাব শামসুল হক "লাহোর প্রস্তাব" সংশোধন করিয়া "দিল্লী প্রস্তাব" গ্রহণের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে কায়েদে আযমের অতীত স্মৃতি তাঁহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। রাগতঃমুখে হঠাৎ আমার পানে তাকাইয়া আমাকেও তর্জনী নির্দেশে মন্তব্য করিলেন, "I know you also অর্থাৎ "তোমাকেও আমি চিনি"। রসনা সংযত করিতে ব্যর্থ হইয়া আমিও তদুত্তরে বলিয়া ফেলিলাম, I also know you are the Governor General whom the Queen of England can remove on our appeal." "অর্থাৎ "আমিও জানি যে, আপনি সেই গভর্নর জেনারেল, যাহাকে ইংল্যান্ডের রাণী আমাদের আবেদনক্রমে পদচ্যুত করিতে পারেন।"

বিদায় গ্রহণকালে রাষ্ট্র ভাষা কমিটির তরফ হইতে ইংরেজী ভাষায় নিম্নোক্ত স্মারকলিপিটি কায়েদে আযমের নিকট হস্তান্তর করা হয়ঃ যাহা বাংলায় নিম্নরূপঃ

সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সংগঠনের মুসলমান যুবকদের দ্বারাই গঠিত। সংগ্রাম পরিষদের মত-বঙ্গ ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করা হউক।

কারণ, প্রথমতঃ উহা পাকিস্তানের লোক সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের ভাষা ও পাকিস্তান জনগণের রাষ্ট্র বিধায় সংখ্যাগুরু অধিবাসীর দাবী গ্রহণ করা বিধেয়।

দ্বিতীয়তঃ আধুনিককালে কোন কোন রাষ্ট্র একাধিক রাষ্ট্র ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত কয়টি দেশের নাম উল্লেখ করা যায়, বেলজিয়াম (প্লমিং ও ফরাসী ভাষা), কানাডা (ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা), সুইজারল্যান্ড (ফরাসী, জার্মান ও ইতালীয় ভাষা), সাউথ আফ্রিকা (ইংরেজী ও আফ্রিকান ভাষা), মিসর (ফরাসী ও আরবী ভাষা), থাইল্যান্ড (থাই ও ইংরেজী ভাষা); ইহা ছাড়াও সোভিয়েট রাশিয়ায় ১৭টি রাষ্ট্র ভাষা চালু রহিয়াছে।

তৃতীয়তঃ সম্পদের দিক হইতে বাংলা ভাষা পৃথিবীতে সপ্তম ভাষারূপে স্বীকৃত বিধায় এই রাষ্ট্রে একমাত্র বাংলা ভাষা অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার তুলনায় রাষ্ট্র ভাষা হওয়ার উপযুক্ত।

চতুর্থতঃ আলাওল, নজরুল ইসলাম, কায়কোবাদ, সৈয়দ ইমাদাদ আলী,

ওয়াজেদ আলী ও আরো অনেক মুসলিম কবি ও সাহিত্যিক তাঁহাদের রচনা সম্ভারে বাংলা ভাষাকে সম্পদশালী করিয়াছেন।

পঞ্চমতঃ বাংলার সুলতান হোসেন শাহ সংস্কৃত ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও উক্ত ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করিয়াছিলেন। এই ভাষার শব্দ সম্ভারের শতকরা ৫০ ভাগ আরবী ও ফরাসী ভাষা হইতে উদ্ভূত।

পরিশেষে আমরা পেশ করিতে চাই যে, যে কোন পূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেক নাগরিকের কতকগুলি মৌলিক অধিকার আছে। সুতরাং আমাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া অবধি বঙ্গ ভাষার আন্দোলন চলিতে থাকিবে।

উল্লেখযোগ্য যে, কায়েদে আযমের সহিত ইহা আমার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। ১৯৪৬ সালে নির্বাচনী সফরে আসাম যাইবার পথে আখাউড়া রেলওয়ে জংশনে সুদীর্ঘ কয়েক ঘন্টাকাল কায়েদে আযমের সাহচর্য ভোগ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে ট্রেনযোগে আসিবার সময় পথিমধ্যে লক্ষ লক্ষ জনতার সংবর্ধনার কারণে আখাউড়া জংশনে পৌঁছিবার পূর্বেই আসামগামী মেইল ট্রেন আখাউড়া ত্যাগ করে। তাই কায়েদে আযমের সেলুনকে আখাউড়ায় পরবর্তী ট্রেনের অপেক্ষায় কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। কায়েদে আযমের সফরসূচী পূর্বাহ্নে জ্ঞাত ছিলাম। আমরা ত্রিপুরা জেলা ইলেকশন বোর্ডের তরফ হইতে তাঁহাকে সম্বর্ধনা দিতে আখাউড়া গিয়াছিলাম। লক্ষ লোকের স্বতঃস্ফূর্ত সম্বর্ধনায় আমার বিশেষ কিছু করিবার ছিল না। মাঝে মাঝে মাইকে ভাসিয়া উঠিতেছিল বিভিন্ন ধ্বনি "পাকিস্তান-জিন্দাবাদ" "কায়েদে আযম-জিন্দাবাদ" "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান" ইত্যাদি ও শৃঙ্খলা রক্ষার আবেদন। কায়েদে আযম সংক্ষিপ্ত ভাষণে ঐক্য, ঈমান, শৃঙ্খলার পরিচয় দিতে ও আগামী নির্বাচনে মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থীকে হ্যারিকেন লণ্ঠনে ভোট দিয়া পাকিস্তানের পক্ষে রায় দিতে উদাত্ত আহবান জানাইলেন। দুই এক ঘন্টার মধ্যে জনতার ভিড় হালকা হইয়া উঠিলে কায়েদে আযম অংগুলী ইশারায় আমাকে তাঁহার নিকট ডাকিলেন। ইহার কারণ বোধ হয় আমার পরিধানে মুসলিম লীগ ব্যাজ ছিল। ভয়, দ্বিধা ও সংকোচে জড়সড় হইয়া তাঁহার জানালার নিকট উপস্থিত হইলে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচয় শুনিবার পর স্নেহের সুরে বলিলেন, "Young boy, remember character first, after election rejoin the classes" অর্থাৎ "তরুণ বালক, স্মরণ রাখিও চরিত্রই প্রথম। নির্বাচনের পর পড়াশুনায় পুনঃমনোনিবেশ করিও।"

কায়েদে আযমের নির্দেশ ও উপদেশ আজও আমার মধ্যে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে। যাহা হউক, কায়েদে আযমের সহিত দ্বিতীয় বৈঠকের কথা বলিতেছিলাম। কায়েদে আযমের অদ্যকার ভূমিকা আমার সামগ্রিক সত্ত্বার উপর এক প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছে, আমি হতভম্ব ও দিশেহারা। মাতৃভাষার দাবী প্রতিষ্ঠাকল্পে তর্ক-বিতর্ক স্থলে ও দায়িত্বের খাতিরে কায়েদে আযমের প্রতি কঠিন মন্তব্য করিতে বাধ্য হইলেও তাঁহার নেতৃত্ব ও অবদানের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। গণতান্ত্রিক জীবনে বিভিন্ন প্রশ্নে মতভেদ অস্বাভাবিক কিছু নয়।

পরিতাপের বিষয়, বঙ্গ ভাষা ও বাঙালী চরিত্র সম্বন্ধে কেহ তাঁহাকে সঠিক ধারণা দেয় নাই বরং ভুল তথ্যই তাহাকে বোধহয় পরিবেশন করা হইয়াছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বঙ্গ সাহিত্য লেখক শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন অকপট মনেই লিখিয়াছেন, "মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ই বঙ্গ সাহিত্য শ্রীবৃদ্ধির কারণ।" আরাকান বৌদ্ধ রাজসভা ও ত্রিপুরা মহারাজ সভায় মুসলমান কবি-সাহিত্যিকগণ বঙ্গ ভাষাতেই কবিতা ও সাহিত্য রচনা করিতেন। ষষ্ঠ হইতে দশম শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের সুবিধার্থে সংস্কৃত ভাষার হামলার বিরুদ্ধে বৌদ্ধ সম্প্রদায় স্থানীয় বঙ্গ ভাষায় চর্যাপদ রচনা করেন। ইহার পর মুসলমান নৃপতিদের বাংলা আগমন এবং তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধিত হয়। মিথ্যা জাল বোনার হীন স্বার্থেই এই নিরেট ঐতিহাসিক সত্যকে চাপা দেওয়া হয় এবং এতদ্বারা রাষ্ট্রীয় ঐক্যে বিরাট ফাটল সৃষ্টি হয়।

কায়েদে আযমের ব্যক্তিত্বের পিছনে একচেটিয়া গণসমর্থন ছিল। তাই তাঁহার পূর্ব বঙ্গ সফরের পর ভাষা আন্দোলনে ভাটা দেখা দেয়। কায়েদে আযমের নির্দেশে সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের কার্যতঃ ত্রিনেতা, মোহাম্মদ আলী চৌধুরীকে (প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী) ব্রহ্মদেশে রাষ্ট্রদূত করা হইল এবং তোফাজ্জল আলী (প্রাক্তন ডেপুটি স্পীকার, বঙ্গীয় আইন পরিষদ) ও ডাঃ আবদুল মোত্তালেব মালিক (শ্রমিক নেতা) নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রীসভায় মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিলেন। ফলে পূর্ব বঙ্গ আইন পরিষদে সোহরাওয়ার্দী সমর্থক সদস্যদের কেন্দ্র করিয়া কালের গতিতে ঘটনার বিবর্তনে পরিষদ অভ্যন্তরে যে অর্থপূর্ণ বিরোধী দল গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তাহা বিনষ্ট হইল। এমন কি, তৎসঙ্গে আইন পরিষদের বাহিরে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও ১৫০ নং মোগলটুলী কর্মী শিবিরের প্রভাবে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক মত সংগঠিত হওয়ার যে সুযোগ দেখা গিয়াছিল, তাহাও আপাততঃ তিরোহিত হইল। উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭ সালের ২০শে ডিসেম্বর জনাব লবিবউদ্দিন আহমদ সিদ্দিকীর বেগম বাজারস্থ 'বলিয়াদি হাউসে' ও ২২শে ডিসেম্বর জনাব তোফাজ্জল আলীর জয়নাগ রোডস্থ বাস ভবনে অনুষ্ঠিত সোহরাওয়ার্দী সমর্থক পূর্ব বঙ্গ আইন পরিষদ সদস্যদের সভায় তরুণ নেতা শামসুল হক, শওকত আলী, তাজউদ্দিন আহমদ, কামরুদ্দিন আহমদ ও আমি সহ অন্যান্য কর্মীরা অংশগ্রহণ করি। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডাঃ আবদুল মোত্তালেব মালিক ও সিরাজুল ইসলামকে কলিকাতায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঢাকার কর্মীদের মনোভাব তাঁহার গোচরীভূত করিয়া তাঁহাকে ঢাকা আসিবার আবেদন জানাইবার জন্য অনুরোধ করা হয়। সোহরাওয়ার্দী সাহেব ঢাকা আসিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে মোহাম্মদ আলী, তোফাজ্জল আলী, ডাঃ মালিক পরিচালিত গ্রুপের একটি অংশ হতোদ্যম হইয়া পড়ে। পরে তাঁহারা রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের সুযোগে কায়েদে আযমের আদেশে রাষ্ট্রদূত ও মন্ত্রী পদ গ্রহণ করিয়া সরকার বিরোধী রাজনৈতিক ভূমিকা ত্যাগ করেন। ইহাতে পার্লামেন্টারী রাজনীতি অশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

নাজিমুদ্দিনের নূতন রূপ

এই মাহেন্দ্রক্ষণে উজীরে আলা খাজা নাজিমুদ্দিন ১৫ই মার্চে স্বাক্ষরিত ৮দফা চুক্তির ৩ ধারা শর্ত অবলীলাক্রমে হজম করিয়া ৬ই এপ্রিল পূর্ব বঙ্গ আইন পরিষদে বাংলাকে পূর্ব বঙ্গের সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করিবার এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং ৮ই এপ্রিল নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়ঃ

(ক) পূর্ব বঙ্গ প্রদেশে ইংরেজীর স্থলে বাংলাকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করা হইবে এবং যতশীঘ্র সম্ভব বাস্তব অসুবিধাগুলি অপসারণ করা যায় ততশীঘ্র তাহা কার্যকর করা হইবে।

(খ) পূর্ব বঙ্গের শিক্ষায়তনসমূহের শিক্ষার মাধ্যম যথাসম্ভব বঙ্গ ভাষা হইবে, কেননা ইহা অধিকাংশ বিদ্যার্থীর মাতৃভাষা।

ভাষা আন্দোলনের ভাটা

আমরা গ্রেফতার হওয়ার পর সংগ্রাম পরিষদে নানা কারণে অনৈক্য দেখা দেয়। কর্মপরিষদের আহবায়ক শামসুল আলমের পদত্যাগের পর জনাব আজিজ আহমদ কিছুকাল আহবায়কের দায়িত্ব পালন করেন। ক্রমশঃ আন্দোলন তীব্রতা হারাইয়া ফেলে এবং ইহার ফলে সংগ্রাম পরিষদের গুরুত্ব হ্রাস পায়। এইদিকে ১৫০ নং মোগলটুলীস্থ ঢাকা কর্মী শিবিরের কতিপয় সদস্যের উপস্থিতিতে আয়োজিত এক সভায় জনাব আবদুল মান্নানের উপর আহবায়কের দায়িত্ব চাপাইয়া দেওয়া হয়। আর এইভাবেই সংগ্রাম পরিষদ স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করিবার প্রাক্কালে এক কাগুজে সংস্থায় পরিণত হইয়া পড়ে।

১১ই মার্চ রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনে তিন শ্রেণীর অন্দোলনকারীর সমাবেশ লক্ষ্য করিয়াছিঃ

(ক) অতি বিপ্লবী বাক্যবাগীশ। ইহারা কথায় কথায় সরকার উৎখাত চায়; সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তনের বড় বড় বুলি আওড়ায়; কিন্তু জনতার সঙ্গে পুলিশ মিলিটারীর জুলুম ভোগ করিতে নারাজ। কারাবরণে ইহাদের অনীহা; আন্দোলনে বাস্তব ও সক্রিয় অংশগ্রহণেও তাহারা বিমুখ।

(খ) চতুর সুবিধাবাদী ভীরু ফোঁপর দালাল শ্রেণী। ইহারা মুখে মুখে আন্দোলনের সক্রিয় ও খাঁটি সংগঠকদের সহিত বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতা সৃষ্টিতে তৎপর; শুধু তাই নয়, ইহারা এইভাবে ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলে যে, দেখিলে মনে হয় 'ধরি মাছ না ছুই পানি' ইহাদের আদর্শ; আন্দোলনে নাই এই অপবাদও ইহারা নিতে রাজী নয়, আবার সরকারী কর্তৃপক্ষের কোপানলেও পড়িতে নারাজ। ইহারা একদিকে আন্দোলনের সক্রিয় ত্যাগী সংগঠকদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও যোগাযোগ রাখে অন্যদিকে আন্দোলনে নিজেদের অশীদারিত্বের প্রামাণিক দলিল ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকদের নিকট হস্তান্তর করে! দেখিয়াছি সর্বত্রই এই ধরনের ফাঁকিবাজ অতি বুদ্ধিমানদের পোয়াবারো। কারাবরণ করিতে হয় না, সময়-সুযোগ মত তরুণ বয়সেই বিরোধী দলের জনপ্রিয়তার আনুকূল্যে আইন সভার সদস্য হওয়া যায়- কি মজা!

(গ) একনিষ্ঠ, সক্রিয় ও সৎকর্মী। সরকার বা কর্তৃপক্ষ বিরোধী আন্দোলনের প্রাথমিক কাজ পোস্টার লেখা হইতে আরম্ভ করিয়া অর্থ যোগান, পুলিশী জুলুম ভোগ, কারাবরণ,

প্রতিকূল অবস্থাকে পরোয়া না করিয়া সভা সমিতির আয়োজন অর্থাৎ কোন লোভ-লালসার বশবর্তী না হইয়া আন্দোলনের সফলতার জন্য সর্বক্ষণ নিরলস। এই শ্রেণীর আন্দোলনকারীর সংখ্যা অতি নগণ্য বটে, তবে তাহারাই মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রার পথিকৃৎ; তাহারাই সভ্যতার পিলসূজ।

কূচক্রীদের নূতন পায়তারা

সম্মুখ রণে বাংলা ভাষা আন্দোলন বানচাল করিতে ব্যর্থ হইয়া প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ভিন্ন পথ গ্রহণ করিল। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বঙ্গ সন্তান ফজলুর রহমান করাচীতে ১৯৪৮ সালের ২৭শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান শিক্ষক সম্মেলনে আরবী হরফ প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। শুধু তাই নয়, ১৯৪৯ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের এক সভায় এই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী আরবী হরফ প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যাও করিলেন।

১৯৪৯ সালের ১৪, ১৫ এবং ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য অধিবেশনে পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড কর্তৃক আরবী হরফ প্রবর্তনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনার খবরে বিচলিত ও শঙ্কিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সমাজ প্রতিবাদের জন্য কর্মচঞ্চল হইয়া উঠিল। তদুদ্দেশ্যে ৭ই ডিসেম্বর (১৯৪৯) রাত্রে এম, এ, ওয়াদুদ ও মোঃ তাহা ৪৩/১, যোগীনগরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করিবার পর আমি তখন ১৯৫০ সালে অনুষ্ঠিতব্য বি.কম. পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলাম।

যাহা হউক, নেতৃদ্বয়ের অনুরোধে পরের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রাম পরিষদ বৈঠকে যোগ দেই। সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আমরা বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের সাধারণ সভায় আরবী হরফ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিতে সরকারের নিকট আহবান জানাই এবং সরকারকে সতর্ক করিয়া দেই যে, আরবী হরফ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলে ছাত্র সমাজ দেশব্যাপী সক্রিয় আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে বাধ্য হইবে। সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হইল। আরবী হরফ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত বাতিল হইয়া গেল।

পরবর্তীকালে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ও অর্থানুকূল্যে আরবী হরফে প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের কয়েকটি নিস্ফল প্রচেষ্টা নেওয়া হইয়াছিল। এই কার্যে দেওবন্দের মওলানা হোসেন আহমদ মাদানীর চেলা মওলানা আতাহার আলী প্রমুখ আরবী শিক্ষিত ধর্মান্ধ অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ দেশবাসীর সহজাত শুভবুদ্ধি তাঁহাদের ভ্রান্ত প্রচেষ্টাকে যথাসময়ে ব্যর্থ করিয়া দেয়।

উল্লেখ্য যে, ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মত জ্ঞানতাপস বিশ্ববিখ্যাত ভাষাবিদও আরবীকে রাষ্ট্র ভাষা করিবার দাবী করিয়াছিলেন। তবে, পাকিস্তানের কোন অংশে সমর্থন না থাকায় আরবীকে রাষ্ট্র ভাষা করিবার দাবীও অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্মপরিষদ গঠন

ঢাকায় ছাত্র আন্দোলনে আমাদের ভূমিকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দের আশার সঞ্চার করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ, প্রমোশন, স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব, স্বল্প বেতন ও অবসর গ্রহণ ইত্যাদি সমস্যা অবহিত করিবার জন্য ১৫ই জুন (১৯৪৮) কতিপয় অধ্যাপক পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ সাংগঠনিক কমিটির সভায় যোগদান করেন। তথায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মচারীদের বিবিধ সমস্যা আলোচিত হয়। স্থির হয় যে, ৩০শে জুন (১৯৪৮) বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সাধারণ ছাত্রসভা আহবান করা হইবে। যথাসময়ে সেই সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই সভায় বিভিন্ন সমস্যার ভিত্তিতে আন্দোলন করিবার জন্য জনাব আবদুর রহমান চৌধুরীকে আহবায়ক করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্মপরিষদ গঠিত হয়।

সরকারী হিংস্রতার একটি নজির

আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকিবার কারণে নিয়মিত ক্লাসে যোগ দিতে না পারায় পড়াশুনা করিবার প্রয়োজনীয়তায় আমি রমজানের ছুটিতে বাড়ী না গিয়া হলেই থাকিবার সিদ্ধান্ত নেই। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.কম. ক্লাসে ভর্তি হইয়াছিলাম। কমার্সের সবকিছুই ছিল আমার নিকট নূতন। তাই ছুটির সময় পড়াশুনার ক্ষতি পূরণ করিবার তাগিদেও বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর সুযোগ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বাড়ী যাই নাই। এমনি একদিন রমজানের বোধহয় ২৭ তারিখ অর্থাৎ ১৪ জুলাই অপরাহ্নে আমার ১৭৭ নং রুমের জানালার নিকট বসিয়া কাজ করিবার সময় দেখিলাম, সলিমুল্লাহ হলের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ রাজপথ বাহিয়া সেনাবাহিনী ভর্তি গাড়ী লালবাগ অভিমুখে দ্রুত ছুটিয়া যাইতেছে। ইহার প্রায় ৩০ কি ৪৫ মিনিট সময়কালের মধ্যে অনবরত গুলীর আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। প্রকাশ, ধর্মঘটী পুলিশদের দখল হইতে লালবাগ থানার অস্ত্রাগার মুক্ত করিবার প্রয়াসে নাকি সেনা বাহিনী সেইদিন গুলী চালাইয়াছিল। লালবাগ থানার অস্ত্রাগারের পার্শ্বে রক্তসিক্ত স্থান ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিবার কালে আমাকে গ্রেফতার করা হয় এবং থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ২৪ ঘন্টা আটক রাখা হয়। সেইদিন সেই গুলীতে কতজন ধর্মঘটী পুলিশ কনস্টেবল নিহত হইয়াছেন, কেহ সঠিক সংখ্যা বলিতে পারেন নাই। গুলীর পর পরিস্থিতি আয়ত্তে আসিলে যথেচ্ছ গ্রেফতার ও মামলা রুজু শুরু হয়। ধর্মভীরু বলিয়া কথিত উজীরে আলা খাজা নাজিমুদ্দিনের কি চমৎকার প্রশাসনিক দাওয়া! আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত বলিতে পারি ধর্মঘটী পুলিশ কনস্টেবল কেহই রাষ্ট্রদোহী ছিলেন না; কোন ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপও ছিল তাহাদের কল্পনাতীত। কিছু বেতন বৃদ্ধি ও ছোট খাট অবশ্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি ন্যূনতম দাবীই ছিল তাহাদের সেইদিনের ধর্মঘটের উদ্দেশ্য।

এই নূন্যতম দাবী পূরণ সরকারের পক্ষে অতি সহজ ছিল। কিন্তু কথিত ধর্মভীরু খাজা নাজিমুদ্দিন রমজান মাসে রোজাদার স্বল্প বেতনভোগী পুলিশ কনস্টেবলদের উপর সৈন্য বাহিনী লেলাইয়া দিয়া হত্যা করিতে বুকে এতটুকু কম্পন বোধ করেন নাই। ১৯৫২ সালের

ফেব্রুয়ারী মাসে ভাষা আন্দোলনের পর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক থাকাকালে এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করিবার অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত কতিপয় পুলিশ কনস্টেবলের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাহাদের জবানীতে পূর্ণ কাহিনীটি অবগত হই। বন্দী পুলিশ কনস্টেবলদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ ঘটনা শুনিবার পর আমার মনে হইয়াছে, বহুল প্রচারিত পরহেজগার খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বাধীন সরকারের এই নিষ্ঠুরতা নজিরবিহীন।

কায়েদে আযমের তিরোধান

দেশকে সংবিধান দেওয়ার পূর্বেই রাষ্ট্রের জনক কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দেশবাসীকে শোক সাগরে ভাসাইয়া ১১ই সেপ্টেম্বর (১৯৪৮) পরলোকগমন করিলেন। তাঁহার তিরোধানে জাতির ও গণতন্ত্রের যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, তাহারই মাশুল উত্তরকালে দিতে হইয়াছে পাকিস্তানকে।

কায়েদে আযম ন্যাশনস্টেট ও ডেমোক্রেটিক মালটিপার্টি স্টেট বা গণতান্ত্রিক বহুদলীয় রাষ্ট্র গঠনে প্রয়াসী ছিলেন। তিনি পাকিস্তানকে আধুনিক রাষ্ট্রে রূপদান করিতে চাহিয়াছিলেন। মৃত্যুর মাত্র এক বৎসর আগে সভাপতি হিসাবে ১০ই আগস্ট (১৯৪৭) তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনেই উদ্বোধনী ভাষণে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পাকিস্তান জাতির গোড়াপত্তনের উদাত্ত আহবান জানানঃ "you may belong to any religion, or caste or creed: that has nothing to do with the business of the state: Incourse of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims not in the religious sense because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the State".

অর্থাৎ "আপনি যে কোন ধর্ম, জাতি ও বিশ্বাসভুক্ত হইতে পারেন, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। কালের গতিতে হিন্দু আর হিন্দু থাকিবে না, মুসলমান আর মুসলমান থাকিবে না, ধর্মীয় অর্থে নহে- কারণ, উহা প্রত্যেক ব্যক্তির বিশ্বাস- ইহা হইবে রাষ্ট্রীয় নাগরিক হিসাবে, রাজনৈতিক অর্থে।"

একই বক্তৃতায় কায়েদে আযম আরও বলেন, "আজ হইতে আমরা আর হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান জাতি নই, আমরা সকলে এক পাকিস্তানী জাতি"।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ১৯৪৭'এর ১০ই আগষ্ট ভাষনে বাবু যোগেন্দ্র নাথ মন্ডলের সভাপতিত্বেই পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনের প্রারম্ভিক মুসলমানদের নাজুক সাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারণা পরিবর্তনের ব্যাপারে কায়েদে আযমের প্রথম সুকৌশল মনস্তাত্বিক পদক্ষেপ।

উল্লেখ্য যে পাকিস্তান গণ পরিষদের উক্ত উদ্বোধনী অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তান হইতে নিম্ন বর্ণিত হিন্দু সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন- সর্বশ্রী কিরন শংকর রায়, শরৎ চাট্যার্জী- কামিনী কুমার দত্ত, ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী, ভুপেন্দ্র নাথ দত্ত, প্রেম হরি রমন, বিরাট চন্দ্র মন্ডল, ধনঞ্জয় রায়, অক্ষয় কুমার দাস প্রমূখঃ

কায়েদে আযম বহু দলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তদুদ্দেশ্যেই ১৯৪৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী করাচীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সভার পর গভর্ণর জেনারেলের বাসভবন হইতে ২৫শে ফেব্রুয়ারী এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তিনি ঘোষণা করেন, "মুসলিম লীগ এতকাল ভারতের সমস্ত মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছে। দেশ ভাগের পর মুসলিম লীগ এখন হইতে একটি দল হিসাবে কাজ করিবে; পূর্বের ন্যায় সমগ্র মুসলমান জাতির প্রতিনিধিত্ব করিবে না"।

আমি দৃঢ় মত পোষণ করি যে, কায়েদে আযমের মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় কোন রাষ্ট্রীয় পদ গ্রহণ না করিলে সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও শোভন হইত। অগত্যা যখন রাষ্ট্রীয় পদ গ্রহণই করিলেন, তখন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব তাঁহারই গ্রহণ করা একান্ত সমীচীন ছিল। তাহা হইলে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় শক্তি সঞ্চারিত হইত; ঘোষিত নীতি, আদর্শ ও বাস্তব কর্মকান্ডের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য ঘটিত না এবং পাকিস্তানের যাত্রাপথে অশুভ ভবিষ্যতের সূচনা হইত না। রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় জীবনে পূর্বসূরীদের নীতিনিষ্ঠ বাস্তব কর্মকাণ্ডই জাতির অগ্রাভিযান ও অগ্রগতিতে উত্তরসুরীদের প্রেরণার মূলভিত্তি। প্রেরণার অভাব হইলেই জাতি উদ্দেশ্যবিহীন জাতিতে পরিণত হয়। শুরু হয় জাতীয় জীবনে অবক্ষয় ও অধঃপতন। ইতিহাসের পাতায় পাকিস্তান ইহার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

কায়েদে আযমের ইহধাম ত্যাগের অব্যবহিত পরই পূর্ববঙ্গের উজীরে আলা খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন।

নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খানের পূর্ববঙ্গ সফর

প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খানের ১৯৪৮ সালের ১৮ই নভেম্বর পূর্ববঙ্গ সফরকালে ঢাকা কলেজ, ইডেন কলেজ, কামরুন্নেসা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন দাবী সম্বলিত আন্দোলনে ঢাকা নগর প্রকম্পিত ছিল। ২৭শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক গোলাম আজম পঠিত মানপত্রে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবী জানান।

প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খানের সম্মানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক গোলাম আজম কর্তৃক পঠিত মানপত্রঃ

AN ADDRESS OF WEL-COME TO THE HON'BLE JANAB LIANQUAT ALI KHAN PRIME MINISTER OF PAKISTAN.

Sir,

It is with a heart, throbbing with joy and emotion that, we, the students of the University of Dhaka, welcome you in our midst as the first Prime Minister of our new, free and sovereign State of Pakistan. Even in the midst of these joyful surrounding our thoughts naturally go back to the day when only a few months back we had the honour and privilege of welcoming the beloved Quaid-e-Azam in our midst. Though he is no more with us his message and his work are our most precious heritage which shall continue to guide and inspire us in future. The most fitting homage that we can pay to his memory is to build up our State in accordance with the Islamic ideals of equality, brotherhood and justice.

Sir, with the dawn of independence a great responsibility has devolved on us. We can assure you that, we, who have contributed our mite to the national cause, are quite alive to the fact that the future well being and stability of the state rest on us. Hence the task of building up those, who will build up the state should be given the utmost importance. We must revolutionise our outlook and reconstruct our thought to shape ourselves in the new order of life. The present system of education, which was introduced by the Britishers to suit their requirements should be throughly reorganised in the light of the altered circumstances. The lamentable failure of our Provincial Government to give any lead in the matter till now and the present pitiable plight of primary, secondary and University education in our province have compelled us to draw your kind attention to the matter. The exodus of non-Muslim teachers who formed the bank of the teaching staff in pre-partition period in the secondary and the University stages, coupled with the dirth of efficient

substitutes has been a serious blow. The technical branches of education, viz, the Engineering, the Medical and the Agricultural which should be given the utmost care are also badly sufering for want of efficient teachers and technical equipment. Steps should be taken to secure efficient teachers and technical equipment, if necessary, from abroad, and more students from East pakistan should be sent overseas for higher education and training. Female education is another subject which is also not receiving its due attention. More facilities and encouragements should be given to our sisters who are now coming forward in increasing number to avail themselves of every opportunity of education and serving the country. We also urge on you sir, to introduce compulsory free military training in all the colleges and the Universities with facilities for our sisters too. The problem of accommodation is getting more and more acute since the partition. Both students and teachers are greatly suffering on this account and the authorities are also experiencing great difficulties in accommodating the growing number of students in different educational institutions. We therefore appeal to you to use your good office to remedy the present deplorable state of affairs affecting the growth and future wellbeing of the nation.

Sir, the magnificent efforts that you are making to strengthen the defence of Pakistan has evoked the admiration of all. We however beg to impress upon you with all the emphasis at our command that to encourage our youth to join the armed forces we need Army, Naval and Air academies in this province. The only cause for this other slow response from our youth is not lack of enthusiasm or determination on their part but the absence of these facilities in this province. We pledge our whole hearted support and can assure you that given proper facilities you shall have from amongst us the best in every branch of the armed forces.

Sir, the food problem is causing us a great concern. The price of essential commodities and cloth have gone beyond the purchasing power of the average citizen and perhaps the cost of living here in East Pakistan is the highest in the world except in China. Steps should be taken to increase our food production to make ourselves self-sufficient. This can

only be made possible by abolishing the permanent settlement without compensation and throughly re-organising our land tenure system and by the introduction of co-operative farming on a scientific basis.

Let us tell you, Sir, that we greatly appreciate your determination to ruthlessly deal with corruption and black-marketing. Here in East Pakistan the anti-corruption department was doing splendid work. But unfortunately the department has been amalgamated with another department and the work has alarmingly slowed down thuough the corruption here is still as rampant as ever. We hope you will kindly see that the work and efficiency of the department is not allowed to be hampered by interested individuals however big they may be.

Sir, there can not be any economic progress in the country unless it is industrialised. We hope, Sir, that in any industrial planning of the country. East Pakistan would legitimately get a major share.

Sir, though the two parts of our state happen to be separeted by nearly two thousand miles we are one with our brethren of West Pakistan in their joys and sorrows, happiness and tribulations. Provincialism is a word unknown to us and quite foreign to our sentiment. We take this opportunity of conveying through you our best wishes and most sincere greetings to our brethren in West Pakistan and the youth in particular.

Sir, the policy of the Britishers to impart education through the medium of a foreign language accounts for the poor percentage of literacy amongst our people. The best way to impart education is through the medium of the mother tongue, and we are glad that our Provincial Government has already accepted this principle. The introduction of Bengali as the medium of instruction and as the official language has opened before us a great opportunity of educating our people and developing ourselves according to our own genius. We are happy to note that our Central Government under your wise guidance has given Bengali an honoured place. This is a step in the right direction which shall go a long way to further strengh-then our cultural ties, with our brethren in West Pakistan. Interchange of thoughts and ideas and mutual understanding are essential if we have to develop a homogeneous and healthy national outlook. We have accepted Urdu as our Lingua Franca

but we also feel very strongly that Bengali, by virtue of its being the official language of the premier province and also the language of the 62% of the population of the state, should be given its rightful place as one of the state languages together with Urdu. Otherwise we in East Pakistan shall always be under a permanent handicap and disadvantage. Thus alone we shall have full scope of development and forge closer offinity with our brethren of the other part and march forward hand in hand.

Sir, you are aware of the pitiable plight of the people of East Bengal and Muslims in particular, who were victims of the worst kind of political oppression and economic exploitation. We are confident Sir, that our legitimate claim in our Armed Forces and the Central Services on the basis of population percentage shall be given effect to immediately.

Sir, we appreciate the tremendous odds that you had to surmount and we are also alive to the difficulties that face us to-day. We would however take this opportunity of requesting you most earnestly to see that the framing of our constitution is not delayed any further. The last general elections were in fact a plebiscite on the issue of Pakistan and now that we need more able men and fresh blood to come in and shoulder responsibility. We beg to impress upon you the necessity of having an early general election on a wider basis.

Sir, we have been watching with increasing grief and concern the repressions to which our students friends most of whom are tried Muslim League workers with admirable record of service and sacrifice, are being subjected. Many of us are being harassed and even put under detention without trial in our attempt to fight out corruption and injustice and bring them to the notice of the Government. The bogey of communism is raised to justify those injustices but we assure you most sincerely that all other "isms" excepting Islamic message of peace, equality and social justice are quite foreign to our outlook.

We hope Sir, and we are confident that the points we have raised shall recieve your earnest attention and sympathetic consideration.

Sir, we are afraid that we have taxed you long enough but we could not help expressing our feelings. So, we have been frank to you even at

the risk of being misunderstood only out of our sincere and intense love for the future well-being of the State. We are happy that the reins of administration of our State are in the able hands of one who injoys the full confidence and love of all the Pakistanis. We have watched with admiration and regard your services and sacrifice to the cause of the nation. We pray to the Almighty for your sound health and long life to enable you to lead us through the critical times ahead. We thank you most cordially for the honour you have done to us in consenting to come and address us.

Dacca	We beg to subscribe ourselves,
Pakistan Ziadatad	The students of the University of Dacca
The 27th November, 1948	

প্রধানমন্ত্রী স্বীয় ভাষণ দানকালে সুকৌশলে এই দাবী এড়াইয়া যান। বেগম রানা লিয়াকত আলী মিটফোর্ড স্কুল ও হাসপাতাল পরিদর্শনকালে ছাত্র বিক্ষোভ সৃষ্টির অভিযোগে মিটফোর্ড স্কুলের ছাত্র ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নেতা জনাব আলী আহমদকে কর্তৃপক্ষ মিটফোর্ড স্কুল হইতে বহিস্কার করেন।

২১শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের রাজশাহী সফরকালেও ছাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। এই অপরাধে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের অপর নেতা গোলাম রহমানকে রাজশাহী হইতে বহিষ্কার করা হয় এবং সাধারণ ছাত্র-কর্মীদের উপর চলে পুলিশী অত্যাচার ও নির্যাতন।

জুলুম প্রতিরোধ দিবস

উপরে বর্ণিত ছাত্র দলন ও দমননীতি, ছাত্র নির্যাতন ও গ্রেফতার এবং পুলিশ ও মুসলিম লীগের গুণ্ডামীকে নীরবে সহ্য করা সম্ভব ছিল না। তাই আমরা পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ সাংগঠনিক কমিটি ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বরের বৈঠকে ১৯৪৯ সনের ৮ই জানুয়ারী সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান ব্যাপী শিক্ষায়তনগুলিতে ছাত্র ধর্মঘট, ছাত্র সভা অনুষ্ঠান মারফত "জুলুম প্রতিরোধ দিবস" পালনের আহবান জানাই। যথারীতি ধর্মঘট পালনের পর বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দলে দলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেসিয়াম মাঠে জমায়েত হয়। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহবায়ক নঈমুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে সভার কার্য শুরু হয়। জনাব শেখ মুজিবর রহমান, জনাব দবিরুল ইসলাম ও আমি বক্তৃতা করি। সরকারকে অবিলম্বে জুলুম বন্ধ করিবার আহবান জানাইয়া এক মাসের

মধ্যে প্রয়োজনবোধে কর্মসূচী ঘোষণা করিবার প্রস্তাবও গৃহীত হয়। দিনাজপুরে অপ্রতিরোধ্য ছাত্র আন্দোলনের সূচনা হইলে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ নেতা দবিরুল ইসলাম, নূরুল হুদা কাদের বখ্‌স ও এম, আর, আখতার (মুকুল) কারারুদ্ধ হন। কারাগারে তাহাদিগকে দিনাজপুর কারারক্ষী বাহিনী বেদম প্রহার করে। শেখ মুজিবুর রহমান, আবদুল হামিদ চৌধুরী, আবদুল আজিজ দিনাজপুর পদার্পণ করিলে, জিলা প্রশাসক ৪৮ ঘন্টার মধ্যে তাহাদিগকে দিনাজপুর ত্যাগের নির্দেশ দেন।

ছাত্রলীগকে অসাম্প্রদায়িক সংগঠনে পরিণত করার চেষ্টা

ইতিমধ্যে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ সমর্থিত সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী জনাব আবদুর রহমান চৌধুরী ও তাঁহার কেবিনেট বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ বিভিন্ন জাতীয় সমস্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে ছাত্রদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠনে পরিণত হয়। সলিমুল্লাহ হলের ১২ নং কামরায় ১৯৪৯ সালের জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত অর্গানাইজিং কমিটির সভায় আমি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগকে অসাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠন করিবার ও জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে সকল ছাত্রকেই ইহার সদস্য হওয়ার অধিকার প্রদানের দাবীতে প্রস্তাব পেশ করি। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান, আবদুর রহমান চৌধুরী ও নঈমুদ্দিন আহমদের তীব্র বিরোধিতার মুখে আমার প্রস্তাব বাতিল হইয়া যায়। ঐ বৈঠকেই আমার পদত্যাগপত্র দাখিল করিলে, শেখ মুজিবুর রহমান আমার সেই ইস্তফাপত্র ছিঁড়িয়া ফেলেন। তাঁহার গভীর ভালবাসা, দুর্বলতা ও দরদকে অস্বীকার করিবার মত মানসিক শক্তি আমার ছিল না। আমার পদত্যাগের সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িলে পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লাহ কায়সার এবং বাহাউদ্দিন চৌধুরী আমাকে কমিউনিস্ট ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দিতে বলিলে প্রত্যুত্তরে তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, ছাত্রলীগ সংগঠন হইতে পদত্যাগ করিলেও আমি ছাত্রলীগের সহযোগী হিসাবেই আন্দোলন অংশগ্রহণ করিব।

পাকিস্তান 'স্টুডেন্টস র‍্যালির' আহবায়ক জনাব গোলাম কিবরিয়ার সহিত আলোচনায় আমি অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী চরিত্রের জন্য 'স্টুডেন্টস র‍্যালীর' প্রতি দুর্বলতা প্রদর্শন করিলেও তাঁহাকে বলিলাম যে, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের পরীক্ষিত সহকর্মী বন্ধুদিগের সহিত আমি সহযোগী হিসাবেই ছাত্র আন্দোলনে থাকিব।

বিশ্ববিদ্যালয় নিম্ন বেতনভুক কর্মচারীদের ধর্মঘট

বিশ্ববিদ্যালয় নিম্ন বেতনভুক কর্মচারীদের ধর্মঘট সমর্থনে আমরা ৩রা মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে সহানুভূতিসূচক ছাত্র ধর্মঘট করি। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জুন গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্মপরিষদের আহবায়ক জনাব আবদুর রহমান চৌধুরী আমার অনুরোধে ৫ই মার্চ কর্মচারীদের ধর্মঘটের সমর্থনে পুনরায় ছাত্র ধর্মঘট ও সভা অনুষ্ঠানের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। যথারীতি ছাত্র ধমর্ঘঘটের পর আবদুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ছাত্রসভায় ধর্মঘটী নিম্ন

বেতনভুক কর্মচারীদের দাবী না মানা পর্যন্ত অবিরাম ছাত্র ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভাশেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল সহকারে আমরা ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসভবনে গমন করি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নানা হুমকি উপেক্ষা করিয়া ছাত্র ধর্মঘট অব্যাহত রাখিলাম। সর্বশেষ পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য কর্মপরিষদের আহ্বায়ক আবদুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সভা চলাকালে ধর্মঘটী নিম্ন বেতনভুক কর্মচারীদের দাবীগুলি সহানুভূতি সহকারে বিবেচনার জন্য অনুরোধ করিতে আমরা সভা হইতে মিছিল করিয়া দ্বিতীয়বার ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাড়ী যাই। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যদের মৌখিক আশ্বাসে আশান্বিত হইয়া রাত নয়টার দিকে স্থান ত্যাগ করি। পরদিন অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের ১০ই মার্চ জনাব আবদুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জনাব দবিরুল ইসলাম ও জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরীর যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতার পর ধর্মঘটী নিম্ন বেতনভুক কর্মচারীবৃন্দ কাজে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ ছাত্রগণ অবিরাম ধর্মঘট খুব প্রীতির চোখে দেখিতেছিল না। ইহাই আমাদিগকে ভাবাইয়া তুলিয়াছিল। অতএব ধর্মঘট প্রত্যাহার সময়োচিত ও বাস্তবসম্মত ছিল।

পরিতাপের বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের সদিচ্ছাকে ভুল বুঝিলেন এবং বেলা ১ টার মধ্যে কর্মে যোগদানের কথা ছিল এই মিথ্যা অভিযোগ ও অজুহাতে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে ধর্মঘটী কর্মচারীদের যোগদানপত্র তাহারা প্রত্যাখান করিলেন। শুধু তাই নয়, ১১ই মার্চ হইতে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হইল।

কর্তৃপক্ষের অযৌক্তিক নির্দেশের বিরুদ্ধে ১২ই মার্চ সকাল বেলা মিছিল সহকারে আমরা ভাইস চ্যান্সেলরের বাসভবনে গমন করি, কিন্তু ভাইস চ্যান্সেলরের সাক্ষাৎ না পাওয়ার দরুন মিছিল শহরের বিভিন্ন এলাকা যেমন চকবাজার, মিটফোর্ড, ইসলামপুর, সদরঘাট, নওয়াবপুর প্রদক্ষিণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেসিয়াম মাঠে জমায়েত হয় ও যথারীতি প্রস্তাব গ্রহণের পর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ছাত্রাবাসগুলির ডাইনিং হল বন্ধ করিয়া দেওয়ায় আমরা কতিপয় ছাত্র ব্যতীত অন্যান্য আবাসিক ছাত্ররা হল ত্যাগ করে।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকাকালে ২৯শে মার্চ (১৯৪৮) এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল নিম্নলিখিত ২৪ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ছাত্রদের অপরাধ- তাহারা নিম্ন বেতনভুক কর্মচারীদের ধর্মঘটের সমর্থনে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিয়াছিল।

(ক) ৪ বৎসরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কারঃ

(১) দবিরুল ইসলাম (আইন ছাত্র), ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, (২) আবদুল হামিদ চৌধুরী (এম.এ.ক্লাস), (৩) অলি আহাদ (বি.কম. দ্বিতীয় বর্ষ), (৪) আবদুল মান্নান (বি.এ.ক্লাস), (৫) উমাপতি মিত্র (এম.এস. সি. পরীক্ষার্থী), (৬) সমীর

কুমার বসু (এম.এ.ক্লাস)।

(খ) বিভিন্ন হল হইতে বহিস্কারঃ

(১) আবদুর রহমান চৌধুরী (আইন ছাত্র), সহ-সভাপতি, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদ, (২) মোল্লা জালালউদ্দিন আহমদ (এম.এ. ক্লাস), (৩) দেওয়ান মাহবুব আলী (আইন ছাত্র), (৪) আবদুল মতিন (এম.এ. ক্লাস), (৫) আবদুল মতিন খান চৌধুরী (আইন ছাত্র), (৬) অবদুর রশিদ ভুঁইয়া (এম.এ.ক্লাস), (৭) হেমায়েত উদ্দিন আহমদ (বি.এ. ক্যস), (৮) আবদুল মতিন খান (এম.এ. পরীক্ষার্থী), (৯) নূরুল ইসলাম চৌধুরী (এম.এ. ক্লাস), (১০) সৈয়দ জামাল কাদেরী (এম.এস.সি ক্লাস), (১১) আবদুস সামাদ (এম.কম. ক্লাস), (১২) সিদ্দীক আলী (এম.এ. ক্লাস) ১৩) আবদুল বাকী (বি.এ. ক্লাস), (১৪) জে, পাত্রনবিশ (এম.এস.সি ক্লাস) (১৫) অরবিন্দ বসু (আইন ছাত্র), সহ-সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ।

(গ) পনেরো টাকা জরিমানাঃ

(১) শেখ মুজিবুর রহমান (আইন ছাত্র), (২) কল্যাণ দাস গুপ্ত, (এম.এ.ক্লাস) সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা হল ছাত্র সংসদ, (৩) নঈমুদ্দিন আহমদ, (এম.এ.ও ল'র ছাত্র) আহবায়ক, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ (৪) মিস নাদেরা বেগম (এম.এ. ক্লাস), (৫) আবদুল ওয়াদুদ (বি.এ. ক্লাস)।

(ঘ) দশ টাকা জরিমানাঃ

মিস লুলু বিলকিস বানু (আইন ছাত্রী)।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ৪ বৎসরের জন্য বহিস্কৃত আমরা ছয়জন ছাত্র ব্যতীত বিভিন্ন সাজাপ্রাপ্ত বাকী একুশ জনকে ১৭ই এপ্রিলের মধ্যে লিখিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট মুচলেকা দাখিল করিবার নির্দেশ জারি করা হয়।

ইংরেজ সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে প্রবর্তিত ও আমলাতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অর্জিত বিকৃত মূল্যবোধসম্পদন্ন উচ্চশিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অভুক্ত, অর্ধভুক্ত, স্বল্প বেতনভুক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে জঘন্য ও হিংস্র সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। ১৯৪৮ সালে পূর্ববংগ আইন পরিষদে বাজেট অধিবেশন চলাকালে ঢাকা নগরে ছাত্র আন্দোলনের যে তিক্ত-অভিজ্ঞতা সরকারের হইয়াছিল ইহার প্রেক্ষিতেই ভীতসন্ত্রস্ত নূরুল আমিন সরকার ১৯৪৯ সালের ১১ই মার্চ আহূত বাজেট অধিবেশনকালে ছাত্র বিক্ষোভ এড়াইবার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করিবার পরামর্শ দান করেন। কর্তার ইচ্ছায় কীর্তন। তাই হইল। ইহার পর ছাত্র আন্দোলন দমনের নিমিত্ত নূরুল আমিন সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ অবস্থায়ই আমরা সাতাশ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে উপরোক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

কর্তৃপক্ষের প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিকারের প্রয়াসে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার তারিখে অর্থাৎ ১৭ই এপ্রিল (১৯৪৯) সাধারণ ছাত্র ধর্মঘট ঘোষণা করে। পরিতাপের বিষয়, ইতিমধ্যে জনাব নঈমুদ্দিন আহমদ,

আবদুর রহমান চৌধুরী, দেওয়ান মাহবুব আলী, আবদুল মতিন খান চৌধুরী প্রমুখ ছাত্রনেতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক মুচলেকাপত্র বা বণ্ড স্বাক্ষর করিয়া স্বীয় অতীত কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত বলিয়া ক্ষমাপ্রার্থী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নীতিহীন ভূমিকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট হয়, ছাত্র সভা হয় ও ছাত্র সভাস্থল হইতে মিছিল সহকারে আমরা ছাত্র বহিষ্কারাদেশ বাতিলের দাবীতে ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসভবনে গমন করি। ভাইস চ্যান্সেলর সাক্ষাৎ দিতে অস্বীকৃতি জানাইলে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত অবস্থান ধর্মঘট পালন করি। পরদিন পুনরায় ছাত্র ধর্মঘট ও ছাত্র সভার পর আমরা আবারো মিছিল সহকারে ভাইস চ্যান্সেলরের বাসভবনে গমন করি। আনুমানিক অপরাহ্ন পাঁচ-ছয় ঘটিকার দিকে জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরীর উদ্যোগে ঢাকা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান সুসাহিত্যিক অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ, মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ টি, আহমদ, প্রফেসর আবদুল হালিম, ঢাকা হলের প্রভোষ্ট ডঃ পি,সি, চক্রবর্তী, পূর্ববংগ সরকারের জয়েন্ট সেক্রেটারী মিজানুর রহমান ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোষ্ট প্রফেসর ডঃ ওসমান গনি প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যের সহিত ভাইস চ্যান্সেলরের বাসভবনেই আমাদের আশাব্যঞ্জক আলাপ-আলোচনা হয়। কিন্তু গভীর রাত্রিতে পর্দার অন্তরালে অদৃশ্য হস্তের খেলায় সবকিছুই ভণ্ডুল হইয়া গেল। অবস্থাদৃষ্টে শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের সহিত আলোচনা করিয়া অবস্থান ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কর্মপরিষদের আহবায়ক আবদুর রহমান চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করায় আমাকে আহবায়ক নিযুক্ত করিয়া ছাত্র কর্মপরিষদ পুনর্গঠিত করা হইল। ২০শে এপ্রিল ঢাকা শহরে ছাত্র ধর্মঘট, সভা, বিক্ষোভ মিছিল ২৫শে এপ্রিল দেশব্যাপী সাধারণ হরতাল আহবান করা হইল। ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষের আহবানে ভাইস চ্যান্সেলরের বাসভবনে সশস্ত্র ও লাঠিধারী পুলিশ মোতায়েন হয়। গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীগণও অবস্থান ধর্মঘটের সংবাদে আমাদের চারিদিকে আনাগোনা আরম্ভ করে। সন্ধ্যার দিকে গ্রেফতার হইবার কিছু পূর্বে শেখ মুজিবুর রহমান আমাকে আন্দোলন পরিচালনার স্বার্থে গ্রেফতার এড়াইবার নির্দেশ দিলেন। আমি তদনুযায়ী ভাইস চ্যান্সেলরের বাসভবন পরিত্যাগ করি। এই ১৯শে এপ্রিলই অবস্থান ধর্মঘট পালন অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমানসহ কয়েকজনকে গ্রেফতার করিয়া ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক করা হয়। কিন্তু আমাদের ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। ২০শে এপ্রিল ধর্মঘটের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেসিয়াম মাঠে যথারীতি ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাস্থল হইতে মিছিলসহকারে আগাইয়া যাওয়ার সময় জিমনেসিয়াম মাঠ এবং ঢাকা হলের মধ্যবর্তী রাজপথে পুলিশ বাহিনীর সহিত সংঘর্ষ ঘটে। শোভাযাত্রা ছত্রভংগ করিবার নিমিত্ত পুলিশ লাঠিচার্জ করে ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। পুলিশের সহিত এক পর্যায়ে হাতাহাতি-ধস্তাধস্তি চলাকালে আমাকে গ্রেফতার করিয়া ঢাকা জিলা গোয়েন্দা বিভাগ অফিসে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার দিকে আমাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করে। কেন্দ্রীয় কারাগারের ৫ নং ওয়ার্ডে ঢোকা মাত্রই মুজিব ভাই আমাকে বকাবকি করিতে লাগিলেন। শান্ত হইলে বুঝাইয়া বলিলাম, আমার কোন দোষ নাই। গোয়েন্দা কর্মচারীবৃন্দ কম সতর্ক ছিল

না, তাই আমাকে মিছিল হইতেই পাকড়াও করিতে পারিয়াছে। ইতিমধ্যে জনাব আবদুল মতিন, নিতাই গাংগুলি, এনায়েত করিম, বাহাউদ্দিন চৌধুরী, আবুল হাসনাত, আবুল বরকত, (শহীদ বরকত নয়) খালেক নেওয়াজ খান, আতাউর রহমান, মাজহারুল ইসলাম, মফিজুল্লাহ প্রমুখ গ্রেফতার হইয়া জেলখানায় নীত হন। আমরা গ্রেফতার হইবার পর আন্দোলনে স্বাভাবিকভাবেই ভাটা পড়ে। পত্রিকাপাঠে মনে হইল ২৫শে এপ্রিল অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ হরতালের ডাক সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমন্ডিত হয় নাই। ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ২৭শে এপ্রিল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস চলিতে থাকে।

টাংগাইল উপনির্বাচন

আসাম হইতে আগত আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী দক্ষিণ টাংগাইল নির্বাচনী কেন্দ্র হইতে করটিয়ার জমিদার খুররম খান পন্নী ও অপর দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। নির্বাচনী ক্রুটির অপরাধে গভর্ণরের এক আদেশ বলে মওলানা ভাসানী, খুররম খান পন্নী ও অন্যান্য প্রার্থীকে ১৯৫০ সাল অবধি নির্বাচন প্রার্থী হইবার অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করা হয়। উপরোক্ত শূণ্য আসন পূর্ণ করিবার প্রয়োজনে সরকার ২৬শে এপ্রিল (১৯৪৯) উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করে। এইবার মুসলিম লীগ সরকার স্বীয় স্বার্থেই খুররম খান পন্নীর পূর্ব ঘোষিত অযোগ্যতা বাতিল করে এবং তিনি অনুষ্ঠিতব্য উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ববঙ্গে রাজনৈতিক বিরোধী দল জন্ম না নিলেও মুসলিম লীগ সরকার বিরোধী মনোভাবের অন্তঃসলিলা প্রবাহের সক্রিয়া নেত্রত্বে ছিল ঢাকার ১৫০ নং মোগলটুলীতে অবস্থিত পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগ কর্মীশিবির। তরুণ নেতা জনাব শামসুল হক উক্ত কর্মী শিবিরের নেতা ছিলেন। তিনিই এই উপনির্বানে সরকারী প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়
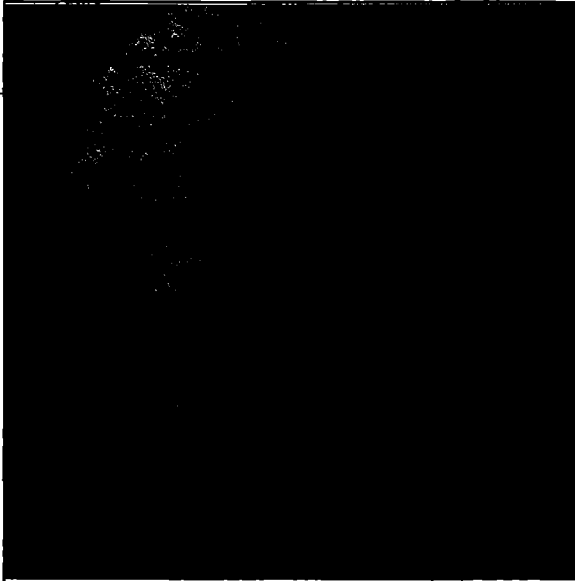
১৯৪৯ সালে ২৩ জুন প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক।

অবতীর্ণ হইলেন।

খন্দকার মোশতাক আহমদ, ইয়ার মোহাম্মদ খান, আজিজ আহমদ, জনাব শওকত আলী, জনাব হজরত আলীর পরিচালনায় তরুণ কর্মীবৃন্দ সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় এমনকি জীবনের ঝুঁকি লইয়াও গরীব-নিঃস্ব প্রার্থী শামসুল হকের পক্ষে নির্বাচন প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন ও পরাক্রমশালী মুসলিম লীগ সংগঠনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সরকার মনোনীত প্রার্থী জমিদার খুররম খান পন্নী সর্বত্যাগী, নিঃস্ব ও আদর্শস্থানীয় নেতা শামসুল হকের নিকট পরাজয়বরণ করেন। ইহার পর নূরুল আমিন সরকার ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত ৩৫টি শূন্য আসনে কোন উপনির্বাচন হইতে দেন নাই। ক্ষমতা আঁকড়াইয়া থাকিবার কি মারাত্মক মানসিক প্রবণতা! জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় মুসলিম লীগ সরকার উপনির্বাচনে জনগণকে মোকাবিলা করিবার সৎসাহস হারাইয়া ফেলিয়াছিল। এইভাবেই এইদেশে গণতন্ত্র হত্যার গোড়াপত্তন করিলেন নূরুল আমিন সরকার! যাহা হউক এই উপনির্বাচনে আইন পরিষদ সদস্য শামসুল হকের বিরুদ্ধে নির্বাচনী মামলা দায়ের করিল। বিচারপতি আমিনুদ্দিন, জেলা জজ ইনায়েতুর রহমান ও শহরুদ্দিন সমবায়ে গঠিত নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ১৯৫০ সালে জনাব শামসুল হকের নির্বাচন নাকচ করিয়া দেন। মওলানা ভাসানী তাঁহার মুরিদানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসাম গেলে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে আসাম কংগ্রেস সরকার তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া ধুবড়ী কারাগারে আটক করে। জনাব হজরত আলী ধুবড়ী কারাগারে বন্দী মওলানা ভাসানীর স্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্র জনাব শামসুল হকের স্বপক্ষে ভোটদানের জন্য প্রকাশও করেন। আবেদনপত্রে ধুবড়ী কারাগারের কোন সীলমোহর ছিল না। তাই ট্রাইব্যুনাল উক্ত আবেদন-পত্রকে জাল বলিয়া নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করেন।

জনাব শামসুল হকের বিজয় কারাগারে আমাদের মনোবলকে বর্ণনাতীত-ভাবে বৃদ্ধি করে। আমরা টাংগাইল উপনির্বাচনে উল্লসিত ও আত্মহারা হইয়া পড়ি। ৮ই মে পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগ কর্মীশিবির নব নির্বাচিত পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ সদস্য জননেতা শামসুল হককে ঢাকা নগরবাসীর পক্ষ হইতে ভিক্টোরিয়া পার্কে প্রাণঢালা গণসম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।

কারাগার-তখন এবং এখন

নূরুল আমিন সরকারের কারাগার মন্ত্রী জনাব মফিজুদ্দিন আহমদ কারাগার পরিদর্শনকালে আমাদের ৫নং ওয়ার্ডে দেখা করিতে গেলে শেখ মুজিবুর রহমান বন্দীদের পক্ষে খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কিত অসুবিধার প্রতিকারের অনুরোধ করেন। মন্ত্রীমহোদয় মুজিব ভাই-এর অনুরোধ মোতাবেক রাজবন্দীদের প্রথম শ্রেণীর কয়েদীর মর্যাদা দান ছাড়াও রাজবন্দীদিগকে অন্যান্য সম্ভাব্য বিশেষ সুবিধা দানের নির্দেশ দেন। অতীব দুঃখের সহিত লিখিতে হয়, ১৯৭৪-৭৫ সালে মুজিব আমলে রাজবন্দী হিসাবে আমি প্রায়শঃ অর্ধাহারে কাল কাটাইয়াছি। কি শীত কি গ্রীষ্ম সবসময়ই বস্ত্র, তৈল, সাবান, তোয়ালে পাদুকা, খবরের কাগজ ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য এমন কি রোগে ঔষধ হইতেও বঞ্চিত হইয়াছি। মুজিব সরকার নিজস্ব বাড়ী হইতে রন্ধন করা খাদ্য দূরে থাকুক এমন কি কাঁচা ডিম পর্যন্ত কারাগারে সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৯৪৮ সাল হইতে

১৯৬৯ সাল পর্যন্ত বৎসরের পর বৎসর কারাজীবন কাটাইয়াছি। এমন অমানুষিক দুঃসহ দৈহিক ও মানসিক কষ্ট আর কখনও পাই নাই। ক্ষমতা একজনকে কত অমানুষ করিতে পারে, শেখ মুজিবুর রহমান ইতিহাসে ইহারই একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। জেনারেল আইউবের শাসন আমলে চার বৎসরের বেশী কারাজীবন কাটাইয়াছি। শেখ সাহেবের তুলনায় আইউব ফেরেশতা ছিলেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৭ সালে সরকার পূর্ববঙ্গ বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া বিনাবিচারে আটকের ব্যবস্থা করিলেও নিরাপত্তা বন্দীদের জন্য কোন বিধি প্রণয়ন করা হয় নাই। ইংরেজ আমলে ১৯৪০ সালে নিরাপত্তা বন্দীবিধি (সিকিউরিটি প্রিজোনারস রুল) মোতাবেক রাজবন্দীদের কতিপয় সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইত এবং মুসলিম লীগ সরকারের নির্দেশে কারাগারে রাজবন্দীদিগকে বিচারাধীন বন্দীদের পর্যায়ে ফেলা হয়, বেশীর ভাগ রাজবন্দীদের তৃতীয় শ্রেণীর বিচারাধীন আসামী হিসাবে গণ্য করা হয়; ফলে অখাদ্য-কুখাদ্য খাইয়া জীবনধারণ একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান মুসলিম লীগের পদাংক অনুসরণ করিয়া রাজবন্দীদের কারাগারে আসামীর মর্যাদা দানের সরকারী নির্দেশ দেন। অত্যাচারীদের চেহারা অভিন্ন।

কারাগারে অনশন ধর্মঘট ও কমিউনিষ্ট পার্টির হঠকারিতা

কারাগারে অধিকাংশ নিরাপত্তা বন্দীই ছিল কমিউনিষ্ট পার্টিভুক্ত। ১৯৪৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস সশস্ত্র বিপ্লবের মারফত সরকার উৎখাতের ডাক দেয়। সদ্য আজাদীপ্রাপ্ত পাক-ভারত রাষ্ট্রদ্বয়ের সরকারের পিছনে অকুণ্ঠ গণ-সমর্থন ছিল এবং ইহাতে প্রশ্নের কোন অবকাশ ছিল না। প্রায় দুই শত বৎসর অবর্ণনীয় ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া ইংরেজদের তাড়াইয়া স্বাধীনতা অর্জন করা হইয়াছে। এমনি বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক জনগণের নিকট উন্মাদ বিশেষের প্রলাপ মনে হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি। এই অবাস্তব নীতির দরুনই কমিউনিষ্ট পার্টিকে ১৯৪৮-৫০ এই তিন বৎসর উভয় সরকারের প্রচন্ড দমননীতির দুর্বিষহ স্টিমরোলার সহ্য করিতে হয়। পার্টির এই বাস্তব বিবর্জিত, অসার, অলীক ও উন্মাদ নির্দেশকে বৃহত্তর কর্মকাণ্ডের অংশ হিসাবে মানিয়া লইয়া আটক নিরস্ত্র, অসহায়, সম্বলহীন কমিউনিষ্ট রাজবন্দীগণ কারান্তরালেই সংগ্রামের পথ বাছিয়া লইলেন এবং কারাগারে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার দাবীতে ১৯৪৯ সালের ১১ই মার্চ অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করেন। দাবী গৃহীত বা আলোচিত হইবার পূর্বেই অনশনরত বন্দীগণ ঢাকা কারাগারে চার দিনের মধ্যে এবং রাজশাহী কারাগারে আটত্রিশ দিনের মধ্যে অনশন ধর্মঘট ভঙ্গ করেন।

১৯৪৯ সালের ২২শে মে তাহারা পুনরায় অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে বা আশ্বাসে অনশনরত কমিউনিষ্ট বন্দীগণ ঢাকা কারাগারে মে-জুন মাসে চব্বিশ দিন পর এবং রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে একচল্লিশ দিন পর অনশন ভঙ্গ করেন। তাহাদের অনশনকালে আমরাও ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে আবদ্ধ ছিলাম। আমাদের সঙ্গে অনশন বিষয়ে তাহারা কোন যোগাযোগ করেন নাই। পর

পর দুইটি অনশন ধর্মঘটই ব্যর্থ হইল। তথাপি জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন ক্রিয়াকলাপ তাহারা পরিত্যাগ করে নাই। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁহারা পুনরায় অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। এইবারও কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অনশনরত কমিউনিষ্ট রাজবন্দীগণ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে চল্লিশ দিন পর ও রাজশাহী কারাগারের বন্দীগণ পঁয়তাল্লিশ দিন পর অনশন ধর্মঘট ত্যাগ করেন। কর্তৃপক্ষের মিথ্যা আশ্বাসে বিভ্রান্ত হইয়া অনশন ধর্মঘট পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহার সত্ত্বেও বাস্তবে কোন ফলোদয় না হওয়ায় কমিউনিষ্ট রাজবন্দীগণ ১৯৪৯ সালের ২রা ডিসেম্বর পুনঃ অনশন ধর্মঘটের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অনশনরত বাবু শিবেন রায় ৮ই ডিসেম্বর দিবাগত রাত্রে প্রাণত্যাগ করেন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অনশনরত কমিউনিষ্ট রাজবন্দী ও সরকারের মধ্যে আপোষ-আলোচনার চুক্তি মোতাবেক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ও রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে অনশনরত রাজবন্দীগণ যথাক্রমে ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে আটান্ন দিন ও একষট্টি দিন পর অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন। চুক্তিপত্র নিম্নরূপঃ

(১) বন্দীগণকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করা,

(২) প্রতি সপ্তাহে একটি চিঠি লিখিবার অধিকার,

(৩) প্রতি পনের দিনে আত্মীয়স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করান,

(৪) খেলাধুলার সুযোগ, কাপড়-চোপড়, সাবান, টুথব্রাশ, টুথপেষ্ট ইত্যাদি সরবরাহ।

উল্লেখ্য যে, রাজবন্দীর এই মর্যাদা অর্জনকল্পে এগার মাসের মধ্যে কমিউনিষ্ট রাজবন্দীগণকে সর্বমোট ৪টি ধর্মঘটে ঢাকা কারাগারে একশত সাতাশ দিন ও রাজশাহী কারাগারে একশত পঁচাশি দিন অনশন ধর্মঘট করিতে হয়।

অনশনরত বন্দীদের দাবী ছিল নিম্নরূপঃ

(১) সকল নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক বন্দীকে বিনাশর্তে অবিলম্বে মুক্তিদান অন্যথায়-

(ক) দৈনিক খাদ্য বাবদ তিন/চার টাকা

(খ) খাট, তোষক, হাঁড়ি, বাসন, আসবাব পত্র ও দুইশত পঞ্চাশ টাকা প্রাথমিক ভাতা।

(গ) ব্যক্তিগত ভাতা মাসিক পঞ্চাশ টাকা,

(ঘ) পারিবারিক ভাতা মাসিক একশত টাকা,

(ঙ) প্রতিমাসে চারটি চিঠি বাহিরে পাঠান, দুই সপ্তাহ অন্তর দেখা, উপযুক্ত থাকার স্থান, খেলাধুলার ব্যবস্থা,

(চ) হাজত ও অন্যান্য বিচারাধীন রাজবন্দীদিগকে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দান,

(ছ) অন্য সকল রাজনৈতিক বন্দীর জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা দান,

(জ) উন্নত খাদ্য ব্যবস্থা, উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা, দৈনিক খবরের কাগজ, পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা চালু, উন্নততর জীবন-যাপন, সরকারী খরচায় ধুমপানের ব্যবস্থা, 'এ' ওয়ার্ডে রেডিও বসান এবং নির্দেশিত সমস্ত খবরের কাগজ ও পত্র-পত্রিকা সেন্সার না করিয়া দেওয়া এবং সেলে রেডিও স্থাপন।

১৯৫০ সালের ৫ই এপ্রিল কমউনিষ্ট বন্দীদের প্রেরণায় কতিপয় দাবীর ভিত্তিতে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের সাধারণ কয়েদীগণ অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। ইহা কমিউনিষ্ট বন্দীদের সর্বাত্মক বৈপ্লবিক কর্মধারার একটি দিক। কারা বহির্ভাগে সমগ্র দেশবাসী যখন তাহাদের সশস্ত্র বিপ্লবের ডাকে কোনপ্রকার আমলই দেয় নাই, তাহাদের " ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যয়, লাখো ইনসান ভূখা হ্যায়" মুখোরোচক আওয়াজকে কতিপয় বিভ্রান্ত আদম সন্তানের মতিভ্রম বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে, তখন তাহারা কারান্তরালেই সরকার উৎখাতের বৈপ্লবিক প্রেরণায় সাধারণ কয়েদীদিগকে প্ররোচিত করেন। একাত্মতা প্রকাশের নাম করিয়া কমিউনিষ্ট বন্দীগণ ৭ই এপ্রিল হইতে অনশনরত সাধারণ বন্দীদের দাবীর সমর্থনে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। সরকারের সহিত আপোষ-মীমাংসায় স্থির হয় যে, কয়েদীরা নিজের পয়সায় কারান্তরালে ধুমপান করিতে পারিবে, দ্বিতীয়তঃ কয়েদীগণকে দিয়া ঘানি টানানো হইবে না; তৃতীয়তঃ কয়েদীদিগকে অযথা প্রহার করা হইবে না। দাবী মানিয়া লইবার পর ১৫ই এপ্রিল কয়েদীগণ অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন।

রাজশাহী জেলের হত্যাকাণ্ড

উপরোক্ত ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যে ১৯৫০ সালের ২৪শে এপ্রিল রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে এক হৃদয়-বিদারক ও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়া গেল। ঐ দিন রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের সুপারিনটেন্ডেন্ট মিঃ বিল কারাগার পরিদর্শনকালে কারান্তরালে 'খাপড়া' নামক ওয়ার্ডে গমন করিলে ওয়ার্ড প্রতিনিধি জনাব আবদুল হক বিভিন্ন সমস্যা আলোচনাকালে তর্ক-বিতর্কের সময় ভারসাম্য হারাইয়া ফেলেন। বন্দীগণ মিঃ বিল ও ২ জন ডেপুটি জেলারকে বলপূর্বক খাপড়া ওয়ার্ডের ভিতরে লইয়া যায়। মিঃ বিল কোন প্রকারে দৈহিক শক্তির দ্বারা ওয়র্ডের বাহিরে চলিয়া আসেন। ইতিমধ্যে জেলার মান্নান পাগলা ঘন্টি দেওয়ার জন্য সংকেত বাঁশি বাজান। পাগলা ঘন্টি বাজিলে, সশস্ত্র কারাগার রক্ষীবাহিনী খাপড়া ওয়ার্ড পানে ধাবিত হয় ও অবাধ গুলী চালায়। গুলীতে ওয়ার্ডের অভ্যন্তরেই খুলনার ছাত্র-কর্মী আনোয়ার হোসেন, শ্রমিক নেতা হানিফ শেখ, মোঃ দেলওয়ার, সুধীন ধর ও সুখেন ভট্টাচার্য প্রাণ হারান। দিনাজপুর জেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত আহত দিনাজপুর কৃষক নেতা কম্পরাম সিং ও বিজন সেন মৃত্যুবরণ করেন। অন্যান্যের মধ্যে জনাব আবদুল হক (যশোহর), আমিনুল হক বাদশা (পাবনা), মনসুর হাবিব (বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ), অমূল্য লাহিড়ী (পাবনা), আবদুস শহীদ, বাবর আলী, নূরুন নবী চৌধুরী, ভুজেন পালিত এবং ওয়ার্ডে আটক ২ জন ডেপুটি জেলারের মধ্যে একজন গুলীবিদ্ধ হইয়া আহত হন। ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালে আমি রাজশাহী কারাগারে বন্দী থাকাকালে উপরে বর্ণিত খাপড়া ওয়ার্ডটি আগ্রহভরে দেখি এবং পূর্ণ কাহিনীটি অবগত হই।

কারাগারই হইতেছে সর্বদেশের সর্বকালের জালেম সরকারের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত দুর্গ। দুর্গান্তরালে নিরস্ত্র বন্দীদের পক্ষে কোনপ্রকার বিদ্রোহাত্মক ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ আত্মঘাতী। জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কারান্তরালে ন্যূনতম সংগ্রামও সম্ভব নয়। ভারতীয় কমউনিষ্ট পার্টির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি ১৯৫১ সালে সন্ত্রাসবাদী উন্মাদ পরিকল্পনা পরিহার করিবার পরই কারান্তরালে কমিউনিষ্ট রাজবন্দীগণ

মানসিক ভারসাম্য পুনঃ লাভ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে গ্রেফতার হইয়া ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক থাকাকালে কারান্তরালে কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের এই হঠকারী পদক্ষেপগুলি অবগত হইবার সুযোগ পাই।

সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ঢাকা আগমন

১৯৪৯ সালে কারাগারে আটক থাকাকালে পত্রিকাপাঠে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ঢাকা আগমন বার্তা আমরা জানিতে পারি। তিনি ঢাকায় আসিয়াছিলেন দিনাজপুর কারাগারে আটক পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক দবিরুল ইসলামের হেবিয়াস কর্পাস মামলা পরিচালনার জন্য। ১৯৪৯ সালের ১১ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটি ঘোষণা করিলে জনাব দবিরুল ইসলাম নিজ জিলা দিনাজপুরে চলিয়া যান। সেখানে তাহাকে পূর্ববঙ্গ বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স বলে গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ করা হয়। কারা কর্তৃপক্ষ সরকারী মুসলিম লীগ কর্তা ব্যক্তিদের ইংগিতেই জনাব দবিরুল ইসলামের উপর কয়েদখানায় অকথ্য দৈহিক নির্যাতন চালায়। দবির ভাই শারীরিকভাবে শক্তিহীন হইয়া পড়েন এবং অপ্রত্যাশিতভাবে অতি তরুণ বয়সেই হৃদরোগ ও অন্যান্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন।

উল্লেখ্য যে, ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে দবির ভাই যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান লেজিসলেটিভ এসেম্বলীতে সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন; পূর্বে বর্ণিত পুলিশী জুলুমের পরিণতিতে তাঁহার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল বিধায় কয়েক বৎসরের মধ্যে অতি তরুণ বয়সে তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

কারা জীবনে বৈচিত্র্য

বৈচিত্র্যহীন কারাজীবন মাঝে মাঝে বিভিন্ন ঘটনারাজীর সমাবেশে কিছুটা আনন্দদায়ক ও কৌতুকময় হইয়া উঠে। রাজনৈতিক মতভেদ সত্ত্বেও জনাব বাহাউদ্দিন চৌধুরী আমার বন্ধু ছিলেন। তিনি বরিশালের বিখ্যাত উলানিয়া জমিদার পরিবার তনয়। মা-বাবার আদরের দুলাল। জেল ফটকে সাক্ষাৎকারের সময় তাঁহাকে স্নেহময়ী মা স্বহস্তে তৈরী বরফী, মোরব্বা সমেত কিছু বিদেশী বিস্কুটের টিন দিয়া গিয়াছিলেন। আমার মায়ের স্বহস্তে তৈরী নানা সুস্বাদু দ্রব্য আমার মনে পড়িল। বাহাউদ্দিন সাহেব ঘুম-কাতর। সকালে বেশ বিলম্বেই তিনি শয্যা ত্যাগ করেন। গভীর রাত্রের অন্য সহবন্দীদের ঘোর নিদ্রার সুযোগে রহমান সাহেব নামক সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী বন্ধুর প্ররোচনায় আমরা কয়েকজন বেশ আরামে তাঁহার মায়ের দেওয়া উপাদেয় বরফী, মোরব্বা, বিদেশী বিস্কুটগুলি সংযোগে রসনা তৃপ্ত করিলাম। তবে একেবারে নিঃশেষ করি নাই। বেশ কিছু অংশ নিদ্রামগ্নদের প্রাতঃরাশের নিমিত্ত রাখিয়া দিলাম। সকাল বেলা চৌধুরী সাহেব অভ্যাস মত ৯-৩০ মিঃ কি ১০ ঘটিকার দিকে নাস্তা করিতে বসিয়াই বোকা ও হতভম্ব হইয়া গেলেন। সব ভদ্রবন্দী, ওয়ার্ড তালাবদ্ধ। বাহিরের অন্য কোন দুশ্চরিত্র সাজাপ্রাপ্ত বন্দীর প্রবেশ অসম্ভব। তিনি নিজে ভূতে বিশ্বাস করেন না অথচ কাণ্ডটা ভৌতিক। মুজিব ভাইয়ের কানে ঘটনাটি উঠিল। মুখ চাওয়া-চাওয়ি, "তাইতো

কি করিয়া হইল" ইত্যাদি অনুতাপ-আক্ষেপ ও মন্তব্য ছাড়া কাহারো কিছু বলিবার ছিল না। গোল বাঁধাইলেন রহমান সাহেব। তাঁহার পেটে কোন কথা থাকে না। অতএব চোর ধরা পড়িলাম। অগত্যা স্বীকার করিলাম, একটু আধটু-চুপিচাপি আহারাদি অন্যের অলক্ষ্যে করিয়া থাকি। ইহা আমার আশৈশব 'প্রশিক্ষণ' বা 'অভ্যাস'। কিশোর বয়সে কালাজ্বর রোগাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও চিকিৎসকের নিষেধাজ্ঞা ও মায়ের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়া গভীর রাত্রে কুপথ্য চিংড়ি মাছ চুরি করিয়া খাইতাম- মা অবশ্য বমাল ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। মুজিব ভাইকে বলিলাম, আমি একা নই, অনেকেই একযোগে এই সৎ কাজটি করিয়াছি। একঘেয়ে কারাজীবনে বৈচিত্রের স্বাদ সবাইকেই দিলাম, তাই ধন্যবাদ আমাদেরই প্রাপ্য। উল্লেখ্য যে জনাব বাহাউদ্দিন চৌধুরী ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন, মুজিব ভাইয়ের নেতৃত্বে ৬দফা আন্দোলনে দেশ যখন উথাল পাতাল ও প্রকম্পিত তখন তারই সুযোগ্য নেতৃত্বে ঢাকা নগরের আয়ূব মোনায়েম বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে। পরবর্তীতে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের সরকারের তথ্য সচিব ছিলেন।

রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনের পটভূমিকা

১৯৪৯ সালের জুন মাসেই এনায়েত করিম, শাসসুল হুদা এবং আমি একই দিন শুক্রবার ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করি। কারা মুক্তির পরই পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগ কর্মী শিবির অফিস ১৫০ নং মোগলটুলীতে জনাব শওকত আলীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নেতা শামসুল হক সাহেবের টাঙ্গাইলে উপনির্বাচনের বিজয় কাহিনী গর্বের সহিত শুনিলাম। তাঁহার নিকট আরো অবগত হইলাম যে, আগামী ২৩শে ও ২৪শে জুন ঢাকায় মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন আহবান করা হইয়াছে ও তদুপলক্ষে মওলানা আবদুল হামিদ খানকে (ভাসানী) সভাপতি ও ইয়ার মোহাম্মদ খানকে সম্পাদক করিয়া একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হইয়াছে। ১৫০ নং মোগলটুলী, ঢাকা, ১৯৪৪ সাল হইতে মুসলিম বাংলার রাজনীতিতে প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রাণকেন্দ্র। ১৯৪৩ সালের ৬ই নভেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিল সভায় জনাব আবুল হাশিম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ায় মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে নূতন যুগের সূচনা হয়। তিনি অনাগত পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক রূপরেখা ইসলামী জীবনের দর্শনের আলোকে খুবই সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্নভাবে সাধারণ্যে তুলিয়া ধরিলেন। তাঁহার দার্শনিক ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় বুদ্ধিজীবী ও তরুণ মুসলিম ছাত্র সমাজ উদ্বুদ্ধ হইলেও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বশংবদ ভূস্বামী, সুদখোর মহাজন ও ধর্মান্ধ শ্রেণীর লোকেরা দার্শনিক নেতা আবুল হাশিমের উপর খড়গহস্ত হইয়া উঠিল। যাহা হউক, আবুল হাশিম সাহেবের সাংগঠনিক শক্তির দ্বারাই পাকিস্তান হাসেল সম্ভব হয় এবং ইহার দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের খুঁটি নওয়াব, স্যার, খান বাহাদুর ও খান সাহেবদের অশুভ প্রভাব হইতে মুসলিম লীগকে মুক্ত করা সম্ভব হয়। সাংগঠনিক তৎপরতার অন্যতম পদক্ষেপ হিসাবে তিনি ১৯৪৪ সালের ৯ই এপ্রিল তরুণ নেতা শামসুল হকের সুযোগ্য

কর্তৃত্বাধীনে ঢাকায় ১৫০ নং মোগলটুলীর দ্বিতল ও ত্রিতলে পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগ কর্মী শিবির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাতে সার্বক্ষণিক কর্মীদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল।

ঢাকা জেলা মুসলিম লীগ ঢাকা নওয়াব বাড়ীর কুক্ষিগত ছিল। রক্ষণশীলতার দুর্গ ঢাকায় নওয়াব বাড়ীতে ১৯৪৪ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ঢাকা জেলা মুসলিম লীগ নির্বাচনে কর্মী শিবির মনোনীত প্রার্থীদ্বয় মানিকগঞ্জের আওলাদ হোসেন বিশ্বাস ও মুন্সীগঞ্জের কপর্দকহীন তরুণ নেতা শামসুদ্দিন আহমদ ঢাকা নওয়াব বাড়ী মনোনীত প্রার্থীগণের বিরুদ্ধে যথাক্রমে ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হইয়া নূতন চিন্তাধারার জয়যাত্রা সূচনা করেন। দ্বিতীয়তঃ ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসের সাধারণ নির্বাচনে মনোনয়ন দানকল্পে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে কলিকাতার মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়; উহাতে হাসান ইস্পাহানীর ইংরেজী 'দৈনিক ষ্টার অব ইণ্ডিয়া', খাজা নূরুদ্দিনের ইংরেজী 'দৈনিক মর্নিং নিউজ' ও মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর বাংলা 'দৈনিক আজাদ' প্রভৃতি পত্রিকার একচেটিয়া বিরোধীতা সত্ত্বেও দার্শনিক আবুল হাশিমের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ তরুণ সম্প্রদায়ের একান্ত প্রচেষ্টায় পাঁচটি আসনে শহীদ-হাশিম জোট জয়লাভ করে। ভারতবর্ষ ও বংগদেশ বিভক্তির পর খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ববঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ পূর্ববঙ্গ আগমনের পর সাবেক প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির পূর্ববংগীয় সদস্যবর্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সিলেট জেলার সদস্যবৃন্দ সহযোগে পূর্ববঙ্গ লীগ ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়। ইহাতে আসাম প্রদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান (ভাসানী), সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ আলী, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ও দেওয়ান বাসেত সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাপার বিশেষ সুবিধাজনক মনে না হওয়ায় পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ভাঙ্গিয়া দিয়া মওলানা আকরম খাঁকে চেয়ারম্যান, জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী ও জনাব আসাদুল্লাহকে যুগ্ম আহবায়ক, ডাঃ আবদুল মোত্তালেব মালিক ও সর্বজনাব আহমদ হোসেন (রংপুর), নূরুল আমিন, মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী, হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী ও সিলেটের মনোয়ার আলীকে সদস্য করিয়া পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি পুনর্গঠন করা হইল। ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ই ডিসেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পাকিস্তান এলাকাভুক্ত কাউন্সিল সদস্যদের সমন্বয়ে চৌধুরী খালেকুজ্জামানের নেতৃত্বে পাকিস্তান মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

শহীদ হাশিম জোট সমর্থক মুসলিম লীগ ও ছাত্র কর্মীবৃন্দ কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে হইতে ঢাকায় আসিয়া ১৫০ নং মোগলটুলীস্থ পূর্ববংগ মুসলিম লীগ কর্মী শিবিরের শক্তি বৃদ্ধি ও ইহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। উজীরে আলা খাজা নাজিম-আকরম খাঁ জোট ১৫০ নং মোগলটুলী কর্মীশিবির বা ওয়ার্কারস ক্যাম্পকে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক অংগন হইতে বিতাড়িত করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাই বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড নায়েব সালারে সুবা জহিরুদ্দিন আহমদকে উজীরে আলা খাজা নাজিমুদ্দিন

প্রথমে কারাগারে প্রেরণ ও পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গ হইতে বহিস্কার করিলেন। রাজনীতি আর কাহাকে বলে! ওয়ার্কারস ক্যাম্পের তরফ হইতে কর্মী শিবিরের তরুণ নেতৃবর্গ যথা শামসুল হক, ফজলুল কাদের চৌধুরী, আবদুস সবুর খান, আতাউর রহমান খান, খন্দকার মোশতাক আহমদ, শেখ মুজিবর রহমান, কামরুদ্দিন আহমদ ও মিসেস আনোয়ারা খাতুন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কমিটি চেয়ারম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ রসিদ বই সরবরাহ করিতে অনুরোধ জানাইলেন। মাওলানা আকরম খাঁ অনুরোধ রক্ষা করিতে অস্বীকৃতি জানাইলে নারায়ণগঞ্জ রহমতুল্লাহ ইনষ্টিটিউটে মুসলিম লীগ কর্মীদের সম্মেলন আহবান করা হয়। খান সাহেব ওসমান আলী এম,এল,এ, কে সভাপতি নির্বাচিত করিয়া একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হয়। রহমতুল্লাহ ইনষ্টিটিউট ব্যবহারে সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইলে সম্মেলন পাইকপাড়া ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে স্থির হয় যে, সর্ব জনাব আতাউর রহমান খান, আবদুস সালাম খান, ফজলুল কাদের চৌধুরী, খয়রাত হোসেন এম,এল,এ, ও মিসেস আনোয়ারা খাতুন করাচী মুসলিম লীগ প্রধান চৌধুরী খালেকুজ্জামানের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। প্রকৃতপক্ষে জনাব আতাউর রহমান খান ও আনোয়ারা খাতুন করাচী গেলেন; চৌধুরী খালেকুজ্জামান প্রতিনিধিদ্বয়ের বক্তব্য আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিলেন বটে তবে প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহে রসিদ বই সরবরাহ করিবার ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন। মুসলিম লীগ আকরম খাঁ- নাজিম চক্রের কুক্ষিগত হইল। এইভাবেই নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক ও প্রগতিশীল যুব সম্প্রদায় মুসলিম লীগ সংগঠনে অপাংক্তেয় ও অবাঞ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বলিতে ভুলিয়াছি, ইতিমধ্যে ১৯৪৮ সালের ১৯শে অক্টোবর মাওলানা আকরম খাঁ সাহেবের নিজস্ব 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকা ঢাকায় স্থানান্তরিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল এবং 'আজাদ' উহার নিজস্ব ধারায় প্রচারকার্য চালাইয়া যাইতেছিল। যদিও দৈনিক আজাদ ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রত্রিকা তথাপি আজাদ কর্তৃপক্ষ পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে জমিজমাসহ সকল প্রকার সরকারী মদদ লাভ করিয়াছিলেন। এটাই আমাদের চরিত্রের নমুনা।

রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে যোগদান

যাহা হউক, এই সম্মেলনকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য জনাব শওকত আলীর আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল অতুলনীয়। মুসলিম লীগ সরকারের ভয়-ভীতি, ত্রাস ও নির্যাতনকে উপেক্ষা করিয়া সম্মেলনে সহযোগিতা করিতে অনেক সহৃদয় ঢাকাবাসী সক্রিয়ভাবে অগ্রসর হইতে সাহস পান নাই। এমনকি সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য কোন পাবলিক 'হল' পর্যন্ত ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। জনাব কে, এম, বশীর তাঁহার কে, এম,দাস লেনস্থ বাসভবন রোজ গার্ডেনের 'হল' কামরায় সম্মেলন অনুষ্ঠানের অনুমতি দানের সৎসাহস প্রদর্শন করেন। তিনি সরকারী ভ্রুকুটী উপেক্ষা করিয়া আগাইয়া না আসিলে সরকারী লীগ পান্ডাদের হামলায় সম্মেলন হয়ত বা তছনছ হইয়া যাইত। তদানীন্তন বিরাজমান স্বৈরাচারী রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পরিবেশের স্মৃতি যতই মানসপটে ভাসিয়া উঠে ততই তখনকার মত ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্য জনাব বশীরকে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি।

২৩শে জুন (১৯৪৯) যথারীতি 'রোজগার্ডেন' হল কামরায় সম্মেলন শুরু হয়। প্রায় ২৫০ হইতে ৩০০ জন ডেলিগেট ইহাতে যোগ দেন। অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান মওলানা আবদুল হামিদ খান (ভাসানী)-এর লিখিত ভাষণ পাঠের পর সম্মেলনের মূল সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্মেলনে শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হকও যোগ দেন এবং কয়েক মিনিট বক্তৃতা দিয়া সম্মেলনকক্ষ ত্যাগ করেন। হয়ত তাঁহার ভয় ছিল, পাছে না সরকারী আনুকুল্য হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়েন অর্থাৎ উজীরে আলা নূরুল আমিন সরকারের এডভোকেট জেনারেলের পদ হারাইতে হয়।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন

সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে আমি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল নাগরিকের প্রবেশাধিকার দিয়া সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠন করিবার প্রস্তাব করি। নারায়ণগঞ্জের তরুণ নেতৃদ্বয় সর্বজনাব আলমাস আলী ও আবদুল আওয়াল প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে গিয়া আমার উপর রোষে ফাটিয়া পড়েন। দেখা গেল, আমরা কতিপয় ছাত্র ব্যতীত আর সকলেই আওয়ামী মুসলিম লীগ নামকরণের ঘোর পক্ষপাতী। তাঁহাদের যুক্তি, আমরা সকলেই আওয়ামী মুসলিম লীগ কর্মী। আকরাম খাঁ, নূরুল আমিন, চৌধুরী খালেকুজ্জামান ও লিয়াকত আলী পরিচালিত মুসলিম লীগ হইল সরকারী মুসলিম লীগ এবং আমাদেরটি হইবে আওয়ামের অর্থাৎ জনগণের মুসলিম লীগ। ঢাকা হাইকোর্টে জনাব দবিরুল ইসলামের হেবিয়াস কর্পাস মামলা পরিচালনার জন্য জনাব সোহরাওয়ার্দী যখন ঢাকায় আসিয়াছিলেন, তখনই তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নেতা মানকী শরীফের পীর সাহেবের অনুকরণে সংগঠনের নাম আওয়ামী মুসলিম লীগ রাখার পরামর্শ দিয়াছিলেন। স্মর্তব্য যে, জনাব সোহরাওয়ার্দী ছিলেন পাকিস্তান গণপরিষদে মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য। বিরোধবশতঃ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া ১৯৪৮ সালের শেষার্ধে জনাব সোহরাওয়ার্দীর গণপরিষদের সদস্যপদ বাতিল ঘোষণা করেন। অথচ এই দিকে ভারত সরকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবশতঃ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নিকট ৬৭ লক্ষ টাকা আয়কর দাবী করিয়াছিলেন। ভারতে তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যাংক একাউন্ট বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। এমন কি তাঁহার মোটর গাড়ীটি পর্যন্ত ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছিল। এইভাবেই বাস্তহারা সোহরাওয়ার্দীকে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে ভারতভুমি ত্যাগ করিয়া কপর্দকহীন অবস্থায় লাহোর আসিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, জনাব সোহরাওয়ার্দীর আসনে উপনির্বাচন ঘোষণা করা হইল এবং এই উপনির্বাচনে জনাব সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থী ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিবাসী জনাব শহীদুল হকের নিকট পরাজয় বরণ করেন। উল্লেখ্য যে, পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের মুসলিম লীগ সদস্যগণই ছিলেন এই উপনির্বাচনের নির্বাচক মন্ডলী। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার এতকাল যাবৎ সরকার বিরোধী রাজনীতিতে যে সংগঠনিক শূন্যতা বিরাজ করিতেছিল, তাহা বিদূরিত হইল। বিশেষ করিয়া বিভাগ পূর্ব আসাম প্রাদেশিক

মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান (ভাসানী) ও টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে সদ্য নির্বাচিত তরুণ নেতা জনাব শামসুল হক যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করায় আপামর জনতার মধ্যে আস্থার ভাব পরিলক্ষিত হইল। সর্বোপরি, এই নব গঠিত সংগঠনের সহিত জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর একাত্মতা তাঁহাকে মুসলিম লীগ প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খানের বিকল্প সর্ব-পাকিস্তানী নেতারূপে উপস্থাপিত করিল।

এই দিকে জনাব সোহরাওয়ার্দীর মাধ্যমে মানকী শরীফের পীরের নেতৃত্বে গঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের সহিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের যোগসূত্র সৃষ্টির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হওয়ায়, সংগঠন নিখিল পাকিস্তানী চরিত্র ও মর্যাদা লাভ করিতে শুরু করিল। এই বাস্তব পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক নামের জন্য যদিও আমি আওয়ামী মুসলিম লীগের সদস্য হইতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছিলাম তথাপি ইহার সহযোগী রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে কাজ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদকরূপে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিটি কর্মসূচীকে সফল করিতে সর্বপ্রকার সক্রিয় সহযোগিতা করিয়াছি।

যাহা হউক, সম্মেলনে নিম্নলিখিত নেতৃবর্গসহ চল্লিশ সদস্যবিশিষ্ট অর্গানাইজিং কমিটি গঠিত হইলঃ

মওলানা আবদুল হামিদ খান (ভাসানী)	সভপতি
আতাউর রহমান খান, এডভোকেট	সহ-সভাপতি
সাখাওয়াত হোসেন, প্রেসিডেন্ট, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স	সহ-সভাপতি
আলী আহমদ খান, এম.এল.এ.	সহ-সভাপতি
আলী আমজাদ খান, এডভোকেট	সহ-সভাপতি
আবদুস সালাম খান, এডভোকেট	সহ-সভাপতি
শামসুল হক	সাধারণ সম্পাদক
শেখ মুজিবুর রহমান	যুগ্ম সম্পাদক
খন্দকার মোশতাক আহমদ	সহ-সম্পাদক
এ,কে,এম, রফিকুল হোসেন	সহ-সম্পাদক
ইয়ার মোহাম্মদ খান	কোষাধ্যক্ষ

উল্লেখ্য যে, শেখ মুজিবর রহমান কারাগারে আটক থাকিবার দরুন উক্ত সম্মেলনে যোগদান করিতে পারেন নাই। আমরা জনকয়েক সদ্য কারামুক্ত ছাত্রের প্রস্তাবেই তাঁহাকে একমাত্র যুগ্ম সম্পাদক করা হইয়াছিল।

২৪শে জুন অপরাহ্নে সরকারী লীগের হুমকি ও হামলা উপেক্ষা করিয়া আরমানিটোলা ময়দানে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে নব গঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট পার্টি

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে আজাদী লাভের পর জাতীয় কংগ্রেস পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে ও পাকিস্তান গণপরিষদের বিরোধী দলীয় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে। কিন্তু পরিষদের বাহিরে অবস্থার বিপাকে পড়িয়াই কংগ্রেস হিন্দু সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষায় জড়িত হইয়া পড়ে। কংগ্রেসে নেতৃত্ব ও কাঠামো স্বাভাবিকভাবেই ছিল হিন্দু অধ্যুষিত। এইদিকে ভারত বিভাগজনিত কারণে পাক-ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গুণগত যে পরিবর্তন দেখা দেয়, উহার ফলে সেই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করিয়া পাকিস্তানের মাটিতে, তাহাদের পক্ষে প্রকাশ্যে কার্যকর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা যে একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

কমিউনিষ্ট পার্টির অবস্থা ছিল কিছুটা ভিন্ন। সাধারণ সম্পাদক পূরণ চন্দ্র যোশীর (পি,সি, যোশী) পরিচালনায় ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি আজাদী লাভের পর অর্থাৎ ইংরেজ কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের পর পাক-ভারত উভয় সরকারকে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সমর্থনদানের নীতি ঘোষণা করে। সরকারের সহিত সহযোগিতার নীতির আড়ালে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে ভারত হইতে কমরেড ভবানী সেন ঢাকা আগমন করেন এবং কোন মহল হইতে বাধাপ্রাপ্ত না হইয়াই ঢাকার সদরঘাটস্থ করনেশন পার্কের এক জনসভায় বক্তৃতা দেন। এমন কি কমরেড মোজাফফর আহমদও কলকাতা হইতে আসিয়া ঢাকার রথ-খোলার ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর দ্বারোদঘাটন করেন। গোল বাঁধিল কলিকাতায় ১৯৪৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অধিবেশনের পর। এই অধিবেশনেই কমরেড ভালচন্দ্র ত্রিথৃক রনদিভের (ভি,টি, রনদিভ) তত্ত্ব অনুযায়ী কমিউনিষ্ট পার্টি সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদের মূলোচ্ছেদ, ইংগ-মার্কিন সরকারদ্বয়ের দোসর ধনিক-বণিক, ভূস্বামী প্রতিভূ পাক-ভারত সরকারকে উচ্ছেদ করিবার প্রয়োজনে সমাজতান্ত্রিক সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠনের আহবান জানায়।

এই দিকে ভারতীয় উত্তর প্রদেশবাসী কমরেড সাজ্জাদ জহিরকে সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত হয়। কমিউনিষ্টদের নবদীক্ষা "ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়, লাখো ইনছান ভুখা হ্যায়" পাক-ভারত সরকারদ্বয়কে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলে। ইহারই বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় ঢাকায় ১১ই মার্চ (১৯৪৮) কমউনিষ্ট পার্টি কাপ্তানবাজারে অবস্থিত কেন্দ্রীয় দফতর ও কোর্ট হাউস স্ট্রীটে অবস্থিত ঢাকা নগর দফতরের উপর জনতার আক্রমণে। কমিউনিষ্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন, ছাত্র ফেডারেশন, শ্রমিক সংগঠন, রেইল রোড ওয়ার্কাস ইউনিয়ন ও কৃষক সংগঠন এবং কিষাণ সভার বহু কর্মী সশস্ত্র পথে সরকার উৎখাত করিবার নীতির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জুন অপরাহ্নে সদরঘাটস্থ করনেশন পার্কে সুসাহিত্যিক মুনির চৌধুরীর সভাপতিত্বে কমিউনিষ্ট পার্টি আহূত জনসভা অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু জনতার আক্রমণে ভীত- সন্ত্রস্ত কমিউনিষ্ট কর্মীরা স্ব স্ব-প্রাণ বাঁচাইবার প্রয়াসে সভাস্থল হইতে উর্ধ্বশ্বাসে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন। সরকার সমর্থক মুসলিম ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহ আজিজুর রহমান বীরদর্পে বক্তৃতা মঞ্চে আরোহণ করিয়া জনতার

উদ্দেশে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দান করেন। এইভাবেই রাষ্ট্রদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিক বলিয়া অভিযুক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীবৃন্দ ধীরে ধীরে প্রকাশ্য কর্মসূচী বর্জন করিয়া গোপন সংগঠনের দিকে মনোনিবেশ করে।

আত্মগোপন অবস্থায় কমরেড মনি সিংহ ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার অন্তর্গত দুর্গাপুর অমুসলমান হাজং এলাকায়, কমরেড ইলা মিত্র রাজশাহী জেলার নওয়াবগঞ্জ মহকুমা অন্তর্গত অমুসলমান সাঁওতাল সম্প্রদায় অধ্যুষিত নাচোল এলাকায়, কমরেড সুব্রত পাল সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার থানার অন্তর্গত অমুসলমান, নমঃশূদ্র ও দাস সম্প্রদায় অধ্যুষিত সানেশ্বর এলাকায়, পার্টি নেতৃত্ব খুলনা জেলার ডুমুরিয়া ও অমুসলমান নমঃশূদ্র প্রধান ধানমুনিয়া এলাকায়, যশোহর জেলার সদর মহকুমা ও নড়াইল মহকুমাভুক্ত বাম্যপাড়া ও নড়াইল থানা অন্তর্গত জামদিয়া, সেখাটি, তুলারামপুর, নড়াইল ও কলোরা ইউনিয়নগুলির অমুসলমান নমঃশূদ্র এলাকায় সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থান ঘটায়। এইভাবেই অমুসলিম সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক অন্ধ পাকিস্তান বিদ্বেষকে মূলধন করিয়া পার্টি কমরেডগণ শ্রেণী সংগ্রামের ভাওতা ও দোহাই দিয়া পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাইবার বহু চেষ্টা করিয়াছে। রূঢ় হইলেও বাস্তব সত্য এই যে, কমিউনিষ্ট পার্টি পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা আশি হইতে পঁচাশি জন মুসলিম অধিবাসীর বিন্দুমাত্র আস্থা অর্জন করিতে পারে নাই।

উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি সম্পাদক কমরেড সাজ্জাদ জহির সশস্ত্র বিপ্লবের কদর্থ করিয়া সরকার উৎখাতের উন্মত্ততায় সামরিক বাহিনীতে উচ্চাভিলাষী সমর নেতাদের চক্রান্তের সহিত জড়াইয়া পড়েন এবং মেজর জেনারেল আকবর খানের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাইবার চেষ্টা করেন; জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুন এই ধরনের উগ্র ও বিকৃত মানসিকতা দেখা দেওয়া মোটেও বিচিত্র নয়। এইভাবে ভুল কর্মসূচী গ্রহণের ফলে সম্ভাবনাময় কমিউনিষ্ট পার্টির বিভিন্ন গণসংগঠন যদিও ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল তবুও তাঁহাদের সংগ্রামের ফলে সৃষ্ট সাধারণ সরকার বিরোধী মনোভাব আওয়ামী লীগ সংগঠনকে অগ্রযাত্রায় বহুলভাবে সহায়তা করিয়াছিল।

ইলা মিত্রের জবানবন্দী

তখনকার দিনে ধৃত কমিউনিষ্ট পার্টি সংগঠক, কর্মী ও সমর্থকদের উপর কিরূপ পাশবিক দৈহিক নির্যাতন করা হইত নাচোল এলাকার সাঁওতাল কৃষক বিদ্রোহের নেত্রী কমরেড ইলা মিত্রের উপর অকথ্য দৈহিক নির্যাতন উহার একটি লোমহর্ষক নিদর্শন। ১৯৫০ সালের ৫ই জানুয়ারী সাঁওতাল কৃষক ও পুলিশ সংঘর্ষে তিনজন মুসলমান ও একজন হিন্দু পুলিশ নিহত হয়। ঐ কারণেই ৭ই জানুয়ারী রোহনপুর স্টেশনে ইলা মিত্র গ্রেফতার হন। গ্রেফতারের পর পুলিশ ইলা মিত্রের উপর অকথ্য অত্যাচার করে। স্পর্শকাতর ও ক্ষুব্ধ মনের তাড়নায় আমি সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে ইলা মিত্রের রাজশাহী কোর্টে দেয় জবানবন্দীটি ঢাকার ঠাঁটারীবাজারের 'মনমোহন প্রেস' হইতে অতি গোপনে ইস্তেহার আকারে ছাপাইয়া সন্তর্পণে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র বিলির ব্যবস্থা করি। মুল জবানবন্দীটি ইংরেজীতে ছিল। ইংরেজী ও উহার বঙ্গানুবাদ আমি উক্ত প্রেস হইতেই ছাপাই। অন্য কোন প্রেস মালিক মুসলিম লীগ

সরকারের ভয়ে ইহা ছাপাইতে রাজী হয় নাই। মনোমোহন বাবু সর্বপ্রকার ঝুঁকি লইয়াই কাজটি করিয়াছিলেন। তিনি তখনকার মত পরিস্থিতিতে যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, আমি অদ্যাবধি কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা স্মরণ করি।

ইস্তেহারটির বিবরণ

"কেসটির ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। বিগত ৭-১-৫০ তারিখে আমি রোহনপুরে গ্রেফতার হই এবং পরদিন আমাকে নাচোলে লাইয়া যাওয়া হয়। যাওয়ার পথে পুলিশ আমাকে মারধর করে এবং তাহার পর আমাকে একটি সেলের মধ্যে লইয়া যাওয়া হয়। হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সবকিছু স্বীকার না করিলে আমাকে উলঙ্গ করিয়া দেওয়া হইবে এই বলিয়া এস,আই, আমাকে হুমকি দেখায়। আমার যেহেতু বলিবার মত কিছু ছিল না, কাজেই তাহারা আমার সমস্ত কাপড়-চোপড় খুলিয়া নেয় এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গভাবে সেলের মধ্যে আমাকে বন্দী করিয়া রাখে।

আমাকে কোন খাবার দেওয়া হয় নাই, একবিন্দু জল পর্যন্তও না। সেইদিন সন্ধ্যা বেলাতে এস,আই-এর উপস্থিতিতে সিপাইরা তাহাদের বন্দুকের বাট দিয়া আমার মাথায় আঘাত করিতে শুরু করে। সেই সময় আমার নাক দিয়া প্রচুর রক্ত পড়িতে থাকে। ইহার পর আমার কাপড়-চোপড় আমাকে ফেরত দেওয়া হয় এবং রাত্রি প্রায় বারোটার সময় সেল হইতে আমাকে বাহির করিয়া সম্ভবতঃ এস,আই-এর কোয়ার্টারে লইয়া যাওয়া হয়। তবে এই ব্যাপারে আমি খুব নিশ্চিত ছিলাম না।

যে কামরাটিতে আমাকে লইয়া যাওয়া হইল, সেইখানে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তাহারা নানারকম অমানুষিক পদ্ধতিতে চেষ্টা চালাইল। দুইটি লাঠির মধ্যে আমার পা দুইটি ঢুকাইয়া চাপ দেওয়া হইতেছিল এবং সেই সময় আমার চারি ধারে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল তাহারা বলিতেছিল যে, আমাকে "পাকিস্তানী ইনজেকশন" দেওয়া হইতেছে। এই নির্যাতন চলিবার সময় তাহারা একটি রুমাল দিয়া আমার মুখ বাঁধিয়া দিয়াছিল। জোর করিয়া আমাকে কিছু বলাইতে না পারিয়া তাহারা আমার চুলও উপড়াইয়া ফেলিয়াছিল। সিপাইরা আমাকে ধরাধরি করিয়া সেলে ফিরাইয়া লইয়া গেল, কারণ সেই নির্যাতনের পর আমার পক্ষে আর হাঁটা সম্ভব ছিল না। সেলের মধ্যে আবার এস,আই, সিপাইদিগকে চারটি গরম সিদ্ধ ডিম আনিবার হুকুম দিল এবং বলিল "এইবার সে কথা বলিবে।" তাহার পর চার-পাঁচজন সিপাই আমাকে জোরপূর্বক ধরিয়া চিৎ করিয়া শোয়াইয়া রাখিল এবং একজন আমার যৌন অঙ্গের মধ্যে একটি গরম সিদ্ধ ডিম ঢুকাইয়া দিল। আমার মনে হইতেছিল, আমি যেন আগুনে পুড়িয়া যাইতেছি ইহার পর আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি।

৯-১-৫০ তারিখের সকালে যখন আমার জ্ঞান হইল, তখন উপরোক্ত এস,আই, এবং কয়েকজন সিপাই আমার সেলে আসিয়া তাহাদের বুট দ্বারা আমার পেটে লাথি মারিতে শুরু করিল। ইহার পর আমার ডান পায়ের গোড়ালীতে পেরেক ফুটাইয়া দেওয়া হইল। সেই সময় আধা অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকিয়া আমি এস,আই,কে বিড় বিড় করিয়া বলিতে শুনিলাম, 'আমরা আবার রাত্রে আসিতেছি এবং তুমি যদি স্বীকার না করো তাহা হইলে

সিপাইরা একে একে তোমাকে ধর্ষণ করিবে।' গভীর রাত্রিতে এস,আই, এবং সিপাইরা ফিরিয়া আসিল এবং পুনরায় সেই হুমকি দিল। কিন্তু আমি যেহেতু তখনো কিছু বলিতে রাজী হইলাম না, তখন তিন-চারজন আমাকে ধরিয়া রাখিল এবং একজন সিপাই সত্যি সত্যি আমাকে ধর্ষণ করিতে শুরু করিল। ইহার অল্পক্ষণ পরই আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

পরদিন ১০-১-৫০ তারিখে যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন আমি দেখিলাম যে, আমার দেহ হইতে দারুণভাবে রক্ত ঝরিতেছে এবং আমার কাপড়-চোপড় রক্তে সম্পূর্ণ ভিজিয়া গিয়াছে। সেই অবস্থাতেই আমাকে নাচোল হইতে নবাবগঞ্জ লইয়া যাওয়া হইল। নবাবগঞ্জ জেলগেটের সিপাইরা জোরে ঘুষি মারিয়া আমাকে অভ্যর্থনা জানাইল।

সেই সময় আমি একেবারে শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলাম। কাজেই কোর্ট ইন্সপেক্টর এবং কয়েকজন সিপাই আমাকে একটি সেলের মধ্যে বহন করিয়া লইয়া গেল। তখনও আমার রক্তপাত হইতেছিল এবং বেশ জ্বর ছিল। সম্ভবতঃ নবাবগঞ্জ সরকারী হাসপাতালের একজন ডাক্তার সেই সময় জ্বর দেখিয়াছিলেন ১০৫ ডিগ্রী। যখন তিনি আমার কাছে আমার দারুণ রক্তপাতের কথা শুনিলেন, তখন তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন যে, একজন মহিলা নার্সের সাহায্যে আমার চিকিৎসা করা হইবে। আমাকে কিছু ঔষধ এবং কয়েক টুকরা কম্বল দেওয়া হইল।

১১-১-৫০ তারিখে সরকারী হাসপাতালে নার্স আমাকে পরীক্ষা করিলেন। তিনি আমার অবস্থা সম্পর্কে কি রিপোর্ট দিয়াছিলেন, সেইটি আমি জানি না। তিনি আসিবার পর আমার পরণে যে রক্তমাখা কাপড় ছিল তাহা পরিবর্তন করিয়া একটি পরিষ্কার কাপড় দেওয়া হইল। এই সময়টিতে আমি নবাবগঞ্জ জেলের একটি সেলে একজন ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলাম। আমার শরীরে খুব জ্বর ছিল। তখনো আমার দারুণ রক্তপাত হইতেছিল এবং মাঝে মাঝে আমি অজ্ঞান হইয়া যাইতেছিলাম।

১৬-১-৫০ তারিখে সন্ধ্যাবেলায় আমার সেলে একটি স্ট্রেচার লইয়া আসা হইল এবং আমাকে বলা হইল যে, পরীক্ষার জন্য আমাকে অন্য জায়গায় যাইতে হইবে। খুব বেশী শরীর খারাপ থাকিবার জনা আমার পক্ষে নড়াচড়া করা সম্ভব নয়, এই কথা বলায় লাঠি দিয়া আমাকে আঘাত করা হইল এবং স্ট্রেচারে উঠিতে আমি বাধ্য হইলাম। ইহার পর আমাকে অন্য এক বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল। আমি সেইখানে কিছুই বলি নাই, কিন্তু সিপাইরা জোর করিয়া একটি সাদা কাগজে আমার সই আদায় করিল। তখন আমি অর্ধচেতন অবস্থায় খুব বেশী জ্বরের মধ্যে ছিলাম। যেহেতু আমার অবস্থা ক্রমাগত খারাপের দিকে যাইতেছিল সেইজন্য পরদিন আমাকে নবাবগঞ্জ সরকারী হাসপাতালে পাঠানো হইল। ইহার পর যখন আমার শরীরের অবস্থা আরো সংকটাপন্ন হইল, তখন আমাকে ২১-১-৫০ তারিখে নবাবগঞ্জ হইতে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে আনিয়া সেইখানকার জেল হাসপাতালে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল।

কোন অবস্থাতেই আমি পুলিশকে কিছু বলি নাই এবং উপরে যাহা বলিয়াছি তাহার বেশী আমার আর বলিবার কিছু নাই।"

ইলা মিত্রের জবানবন্দী এখানেই শেষ। উল্লেখ্য যে, ৫ই জানুয়ারী (১৯৫০) সাঁওতাল চাষীরা জোরপূর্বক জোতদারদের জমির ধান কাটিতে গেলে স্থানীয় নাচোল থানার এ,এস,আই, তফিজুদ্দিন আহমদ কয়েকজন কনেস্টেবলসহ অকুস্থলে গমন করেন। সংঘর্ষের পরিণামে সাঁওতাল চাষীরা সশস্ত্র বিপ্লবের বিভিন্ন ধ্বনি দিতে দিতে এ,এস,আই, তফিজুদ্দিন ও তিনজন কনেষ্টবলকে আক্রমণ করে। সাঁওতাল চাষীরা রাইফেল কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে হত্যা করিয়া মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখে। ঘটনার পরই কমরেড ইলা মিত্রের স্বামী কমরেড হাবুল মিত্র সীমান্ত পার হইয়া পশ্চিমবঙ্গ পলায়ন করেন এবং ৭ই জানুয়ারী (১৯৫০) সাঁওতাল বেশে রোহনপুর রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় থাকাকালে কমরেড ইলা মিত্র গ্রেফতার হন।

উপরে বর্ণিত অত্যাচার ও নির্যাতন হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, তখনকার দিনে কমিউনিষ্ট পার্টি কর্মী বা সমর্থক হওয়া কত বড় ঝুঁকি ছিল। আগেই বলিয়াছি, ইহা ছিল নেতৃত্বের হঠকারী নীতির ফল। ইহার দরুন কমিউনিষ্ট পার্টি ক্রমশঃ দুর্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িল। ১৯৫১ সালে পার্টি পলিসি পরিবর্তিত হইলেও পাকিস্তানে কমিউনিষ্ট পার্টি পূর্বোদ্যমে প্রকাশ্য রাজনীতি ও সংগঠন কখনো করিতে পারে নাই। তবে ইহা অনস্বীকার্য যে, কমিউনিষ্ট পার্টি নেতৃবর্গ অতি সীমিত শক্তি সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রগতিশীল গণআন্দোলনে সক্রিয় অবদান রাখিয়াছেন এবং এই ধরনের প্রতিটি গণআন্দোলনে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিয়াছেন।

ইয়ার মোহাম্মদের অবদান

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ অফিস ৯৪ নং নবাবপুর রোডে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খানের বাড়ী ১৮নং কারকুন বাড়ী লেনেই নব গঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সদর দফতর ছিল। সংগঠনের প্রাণ ও সভাপতি মওলানা ভাসানী স্বয়ং ইয়ার মোহাম্মদ খান সাহেবের গৃহেই তাঁহার পরিবারের অন্যতম শ্রদ্ধাভাজন সদস্য হিসাবেই বসবাস করিতেন। ইয়ার ভাইয়ের স্ত্রীই বৃদ্ধ মওলানা ভাসানীর সর্বপ্রকার পরিচর্যা করিতেন। দ্বিতলে সর্বক্ষণ অগণিত নেতা, কর্মী ও দর্শকদের আসা-যাওয়ার ফলে ইয়ার ভাইয়ের পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। এইগুলি স্বচক্ষে দেখিয়াছি ও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছি; সেই যুগে ঢাকাবাসীদের পর্দানশীন অন্দরে পর-পুরুষের প্রবেশ কল্পনার অতীত। ইয়ার ভাই, তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানেরা সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করিয়া যে উচ্চমন ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, দেশ ও জাতি সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাদের সেই ঐতিহাসিক অবদানকে স্বীকার করিবে। যে সমাজ ও যে জাতি পূর্বসূরীদের দান বেমালুম ভূলিয়া যায়, বা তাহাদের অবদান সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দিতে পারে না, সেই জাতি সৌভাগ্য সোপানে আরোহণের উপযুক্ততাই হারাইয়া ফেলে এবং জাতি হিসাবেও বিশ্বসমাজে কখনও সম্মান পায় না। অতীতই অগ্রযাত্রার পথে উৎসাহ জাগায়। জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খান অর্থ বিত্তশালী রাজনীতিবিদ। আর্থিক শক্তির অভাবে অনেক সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক আন্দোলন দারুণভাবে ব্যাহত হয়। জনাব ইয়ার

মোহাম্মদ খান সাধ্যানুযায়ী আর্থিক সাহায্য দানে আওয়ামী লীগকে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রচুর সাহায্য ও সহায়তা করিয়াছেন।

ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা

তদানীন্তন দৈনিক পত্রিকাগুলি কদাচিৎ সরকার বিরোধী সংগঠনের সংবাদ প্রকাশ করিত। এমনকি জনগণের বিভিন্ন সমস্যাও দৈনিক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠায় স্থান পাইত না। তাই, মওলানা ভাসানী সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক' প্রকাশের অনুমতি নিলেন। জনাব আছগর হোসেন এম.এল.এ-এর ঢাকাস্থ ৭৭নং মালিটোলা বাসস্থানে অবস্থিত ছাপাখানা হইতে সাপ্তাহিক ইত্তেফাক ১৫ই আগস্ট (১৯৪৯) প্রকাশিত হয়। কিছুকাল পর ঢাকার কলতাবাজারে অবস্থিত করিম প্রিন্টিং প্রেস হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে কিন্তু সরকারী হামলার ভয়ে মুদ্রণালয়গুলি সাপ্তাহিক ইত্তেফাক ছাপাইতে অস্বীকার করিল। সুতরাং অনুমতি প্রার্থনাকালে মজলুম নেতা মওলানা ভাসানীর স্থলে জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খান অত্র সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের প্রকাশক ও মুদ্রাকর হইলেন। ৯নং হাটখোলা রোডে অবস্থিত প্যারামাউন্ট প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ৯৪নং নবাবপুর রোড হইতে তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হইতে থাকে। শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও ইয়ার মোহাম্মদ খান এই সরকার বিরোধী পত্রিকা ও আওয়ামী লীগ মুখপত্র সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের অর্থ যোগান দিতেন। সাপ্তাহিক বা দৈনিক ইত্তেফাকের আর্থিক সমস্যা মোকাবিলায় পূর্ব পাকিস্তান সরকারের তদানীন্তন সেক্রেটারী (সচিব) জনাব আজগর আলী শাহ (আই,সি,এস, বা ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস)-এর অবদান অপরিসীম। জনাব তফাজ্জল হোসেন কলিকাতা হইতে ঢাকা আগমন করিবার পর জনাব খয়রাত হোসেনকে সঙ্গে লইয়া ইয়ার মোহাম্মদ খানের সহিত দেখা করেন ও ইত্তেফাক পত্রিকার সমস্যাবলী সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। যেহেতু জনাব তফাজ্জল হোসেন পূর্বে কলিকাতার দৈনিক ইত্তেহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতাও তাঁহার আছে; তদুপরি তিনি ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের গোঁড়া সমর্থক; সেহেতু আলোচনায় স্থির হয় যে, অতঃপর জনাব তফাজ্জল হোসেন সাপ্তাহিক ইত্তেফাক সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খান লিখিতভাবেই জনাব তফাজ্জল হোসেনকে উক্ত ক্ষমতা দান করেন। মওলানা ভাসানী ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খান প্রকাশক ও মুদ্রাকর রহিয়া গেলেন। এইভাবে ১৯৫১ সালের ১৪ই আগস্ট জনাব তফাজ্জল হোসেন সাপ্তাহিক ইত্তেফাক সম্পাদনার সর্বময় ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। অতঃপর তাঁহার সুযোগ্য সম্পাদনায় ও পরিচালনায় এবং সর্বজনাব আবদুল ওয়াদুদ, আবদুল আউয়াল ও নূরুল ইসলামের সক্রিয় সহায়তায় সাপ্তাহিক ইত্তেফাক জনপ্রিয় পত্রিকায় পরিণত হয়। ১৯৫৪ সালের মার্চে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া এই জনপ্রিয় সাপ্তাহিকটি দৈনিক করিবার ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং সেই অনুযায়ী ১৯৫৩ সালের ২৪শে ডিসেম্বর ইত্তেফাক দৈনিক পত্রিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। মোজাম্মেল হক ও আবদুল কাদের দৈনিক ইত্তেফাকের জন্মলগ্ন হইতে তাহাদের অক্লান্ত শ্রমে ইহাকে দাড় করান। সে সময় প্যারামাউন্ট প্রেসের মালিক জনাব হাবিবুর রহমান তার নিজের কামড়া খানিও দৈনিক ইত্তেফাকের কাজের জন্য ছাড়িয়া দেন। উপরোক্ত ব্যবস্থাপনা অটুট থাকে। অর্থাৎ মওলানা ভাসানী ইহার প্রতিষ্ঠাতা, ইয়ার মোহাম্মদ খান ইহার

In the Court of Additional District Magistrate,
Dacca.

Paperdeclaration.

I, Yar Mohammad Khan aged 30... s/o Jalal Mohammad Khan of 10, Karkun Bari Lane at present residing at 18, Karkun Bari Lane, P.S. Sutrapur, do hereby declare on solemn affirmation as follows,:-

That I am the printer and publisher of the weekly Ittefaq which will be printed from the New Muslim Art Press at 7/1, ... Road, Dacca.

I do further declare that I will not publish anything prejudicial to the interest of the State and I shall abide by the rules and regulations of the press Act as adopted by the Pakistan Govt.

Yar mohamad Khan

Signature of the declarent.

Dated, Dacca,

The Nov' 49.

Identified by:-

Kamruddin Ahmad
Pleader

সাপ্তাহিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রকাশক ও মুদ্রাকর জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খানের এফিডেভিট।

Dated..................1953.

Declared before me this the ......15th...... August 1953.

In the Court of the Additional District Magistrate, Dacca.

Newspaper Declaration.

I, Yar Mohamed Khan, son of late Rahim Mahamed Khan of 18, Kapkon Bari Lane, Dacca, do hereby declare on solemn affirmation as follows:-

That I am the printer and publisher of the Daily Bengali Ittefaq printed and published from paramount Press situated at 9, Hathkhola Road, Dacca.

That I further declare that I shall not print or publish anything seditious or objectionable matter against the interest of the State of Pakistan and shall abide by the rules and regulations of the press act as adopted by the Government of Pakistan.

Signature of the declarant

The declarant is known to me & identify him before the addl. D.M.

Signature and designation.

দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশক ও মুদ্রাকর জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খানের এফিডেভিট।

নির্বাচনের অব্যবহিত পরই বোধহয় কোন কোন অবাঞ্ছিত মহলের প্ররোচনায় দৈনিক ইত্তেফাকের পৃষ্ঠায় 'প্রতিষ্ঠাতা' মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু হয়। জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খান এই অপতৎপরতার প্রতি সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মওলানা ভাসানীর সংগ্রামী বিবৃতি ও বক্তৃতা যুক্তফ্রন্টের অনেকেরই চক্ষুশূল ছিল। তাই স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্ররোচনায় পূর্ব পাকিস্তানের তদানীন্তন উজীরে আলা (এপ্রিল-মে ১৯৫৪) শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হকের নির্দেশে ঢাকা জিলার তদানীন্তন প্রশাসক সিলেট নিবাসী ইয়াহিয়া চৌধুরী ১৯৫৪ সালের ১৪ই মে গভীর রাত্রে অন্যায়ভাবে ইয়ার মোহাম্মদ খানের অজ্ঞাতসারেই সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনকেই ইত্তেফাকের প্রিন্টার ও পাবলিশার করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহার পর হইতেই দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনামায় মওলানা ভাসানী আর 'প্রতিষ্ঠাতা' রূপে নয় বরং 'পৃষ্ঠপোষক' হিসাবে স্থান পাইতে থাকেন। উল্লেখ্য যে, সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থেই মওলানা ভাসানী ও জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খান ইত্তেফাকের উপর নিজেদের মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। এইদিকে কালের কবালগ্রাসে দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম হইতে পৃষ্ঠপোষক মওলানা ভাসানীর নাম চিরতরে উধাও বা তিরোহিত হইয়া গেল। মওলানা ভাসানীর মত জনপ্রিয় দেশবরেণ্য নেতাকেই যখন নোংরা রাজনীতির চোরাগোপ্তা মারের নিকট হার মানিতে হয়, তখন দেশের সাধারণ মানুষ অর্থাৎ যারা ইত্তেফাকেরই 'লুব্ধকের' ভাষায় 'আকালু শেখ', তারা কোন ছার!

মওলানা ভাসানী, শামসুল হক এবং শেখ মুজিবের গ্রেফতার

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান (ভাসানী) ও প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হকের সুযোগ্য নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সরকারের দোষত্রুটি জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিবার কার্যে আত্মনিয়োগ করিল। খাদ্যাভাব দেখা দিলে, বাজারে খাদ্যদ্রব্যের চড়া দামের প্রতিবাদে ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকা আরমানিটোলা ময়দানে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান সেই সময় পূর্ব পাকিস্তান সফরে ঢাকা আসিয়াছিলেন এবং ঢাকা গভর্ণমেন্ট হাউসে অবস্থান করিতেছিলেন। লিয়াকত আলী খানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে সভা হইতে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল গভর্নমেন্ট হাউস অভিমুখে রওয়ানা হয়। মাগরিবের নামাজের সময় মিছিলটি ঢাকা (ফুলবাড়িয়া) রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী নাজিরাবাজার রেলওয়ে ক্রসিং-এর নিকটবর্তী হইলে পুলিশ বাহিনী বাধা দান করে এবং কাঁদানে গ্যাস ও লাঠি ব্যবহার করে। ঘটনাস্থলেই মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, জনাব শামসুল হক ও আরো অনেকেই গ্রেফতার হইয়া ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আবদ্ধ হন। পুলিশের লাঠিচার্জে জনাব ওয়াদুদ ও জগন্নাথ কলেজের ছাত্র মফিজুল্লাহ গুরুতরভাবে আহত হইয়া হাসপাতালে নীত হন। শেখ মুজিবুর রহমান ঘটনাস্থল হইতে পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া কাটিয়া পড়িলেন এবং গ্রেফতারী পরোয়ানা থাকায় আত্মগোপন করিলেন।

আত্মগোপনাবস্থায় সর্বজনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী, মোল্লা জালালউদ্দিন ও আমার সহিত মোল্লা সাহেবের খাজে দেওয়ানস্থ আস্তানায় তাঁহার রাজনৈতিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর জনাব সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশ গ্রহণের জন্য শেখ মুজিবর রহমান লাহোর পৌঁছান এবং তথায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক অবস্থা বয়ান করেন। উল্লেখ্য যে, লাহোর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমান আত্মগোপনাবস্থায় পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হন। তাঁহাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে আটক রাখা হয়।

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারে আতঙ্কিত হইয়া আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন ও সহ-সম্পাদক এ,কে,এম, রফিকুল হোসেন সংবাদপত্রে (দৈনিক আজাদে) বিবৃতি দিয়া আওয়ামী লীগ হইতে পদত্যাগ করেন। নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে অগ্রণী হইয়া আসা দূরে থাকুক বরং আওয়ামী মুসলিম লীগ সহ-সভাপতি আতাউর রহমান খান অধ্যয়নরত সন্তানদের দেখার অজুহাতে ঢাকা ত্যাগ করিয়া ভারতীয় আসাম প্রদেশের রাজধানী শিলং চলিয়া যান।

সাম্প্রদায়িক কলহ

ভারত বিভাগ হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক মনোভাব তিরোহিত করিতে ব্যর্থ হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরই উভয় পাঞ্জাবে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর পূর্ব পাঞ্জাব হইতে মুসলমান জনতা ও পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে হিন্দু জনতা স্ব-স্ব ভিটা-বাড়ী, জোতজমি, ব্যবসা-বাণিজ্য, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও মান-ইজ্জত হারাইয়া যথাক্রমে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানে হিজরত করে। অদ্রুপ পূর্ববঙ্গ হইতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু অধিবাসীও সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া পশ্চিম বঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে এবং বাস্তহারা পরিচয়ে পরিচিত হয়। তেমনি বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য হইতে হাজার হাজার মুসলমান স্বীয় বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। পাকিস্তানের হিজরতকারীরা মোহাজের নামে পরিচিত হয়।

১৯৫০ সালে কলিকাতায় ভারতীয় ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেলের আপত্তিকর ও উস্কানিমূলক বক্তৃতার পর পরই কলিকাতাসহ পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় পাইকারী হারে মুসলিম নিধনযজ্ঞ আরম্ভ হয়। ইহারই প্রতিক্রিয়ায় ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা ও অন্যান্য জায়গায় নারকীয় কান্ড-কারখানা শুরু হইয়া যায়। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, হিন্দু-দরদী সাজিয়া হিন্দুদের সোনা-গহনা হিরা-জহরত, খাট-পালংক, ড্রেসিং টেবিল ও অন্যান্য মূল্যবান অস্থাবর সম্পত্তি কিভাবে আত্মসাৎ করা হইয়াছে; কিভাবে স্থাবর সম্পত্তি জলের দরে বা ফাঁকির জালে একশ্রেণীর মানুষের করায়ত্ত হইয়াছে। এই শ্রেণীর মানুষের অনেকেই আবার 'প্রগতিশীল'। পক্ষান্তরে উভয় দেশের রাজনৈতিক দল, নেতা ও কর্মীরা এই নির্মম হত্যাকাণ্ড ও প্রতারণার জন্য দায়ী।

বিভাগোত্তর সংখ্যালঘু সমস্যা

আমরা স্বল্প সংখ্যক তরুণ সাম্প্রদায়িক হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করিবার প্রতিজ্ঞায় ১৯৫০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ার বাবু জে,সি, দাসের ৮নং র‍্যাংকিন স্ট্রীটস্থ বাসভবনের সম্মুখ চত্বরে মহৎপ্রাণ নাগরিকদের এক সভা আহবান করি। উক্ত সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ঢাকা শান্তি রিলিফ কমিটি গঠিত হয়ঃ

জনাব মোশাররফ হোসেন বি,সি,এস,	সভপতি
শ্রী জে,সি,দাস, সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার	সহ-সভাপতি
জনাব মীর্জা আব্বাস, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (সাবেক ক্যাপটেন, কলিকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং)	সহ-সভাপতি
জনাব হামিদুর রসুল, ট্যাক্সেশন কমিশনার	সহ-সভাপতি
জনাব অলি আহাদ	সাধারণ সম্পাদক

উক্ত সভাতেই এই কমিটির একটি এক্সিকিউটিভ বডিও গঠিত হয়- ইহার সদস্য ছিল ১৩ জন। আমরা পশ্চিমবঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তু পরীক্ষার্থী ছাত্রদের পরীক্ষার ব্যবস্থার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করি। কর্তৃপক্ষ আমাদের উপরোক্ত দাবীর যৌক্তিকতা মানিয়া নেন। সরেজমিনে অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে ভারত হইতে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ ও নিখিল ভারত কংগ্রেসের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদিকা মিস মৃদুলা সরাভাই এক শুভেচ্ছা মিশনে ঢাকা আগমন করেন। গুলিস্থানস্থ ঢাকা রেস্ট হাউসে আমরা ঢাকা শান্তি কমিটির তরফ হইতে তাঁহাদের সহিত এক সৌজন্য ও শুভেচ্ছা বৈঠকে মিলিত হই। মত বিনিময়কালে ডক্টর প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ আমাদের সান্ত্বনা ও উৎসাহ দানকল্পে বলেন "Determined minority rules the world".

আমার সংঘাত ও ঝঞ্ঝাজর্জরিত জীবনে তাঁহার এই মন্তব্যটি আজও প্রতিনিয়ত আমার মনে সাহস ও ভরসা যোগায়। ইহাই বোধহয় মহৎ ও সৎ চরিত্রের যাদুকরী শক্তি। ডক্টর প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কালোবাজারী, মুনাফাখোর, বণিক শ্রেণী ও দূর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সরকারী দন্ড কঠোরভাবে ব্যবহার করিবার অপরাধে ধনিক বণিক ও অসৎ রাজনীতিবিদদের চক্রান্তে তাঁহাকে ১৯৪৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী পদত্যাগ করিতে হয়। কায়েমী স্বার্থের যূপকাষ্ঠে সৎ শাসকদের যে কিভাবে বলী হইতে হয় ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বিচলিত লিয়াকত আলী খান সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠিয়া অর্থহীন মান-মর্যাদার প্রশ্ন ভুলিয়া স্বীয় উদ্যোগে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সহিত বৈঠকে মিলিত হইতে দিল্লী গমন করেন। বৈঠকে উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের রক্ষাকল্পে লিয়াকত-নেহরু প্যাক্ট স্বাক্ষরিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের স্বার্থে ও দিল্লীর মুসলমানদের জানমাল ইজ্জত বাঁচাইবার জন্য মহাত্মা গান্ধী ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত নেহরু সরকার ও হিন্দু দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে একটানা অনশন করিয়া স্বীয়

দাবী আদায় করেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বার্থে মহাত্মাজী ও লিয়াকত আলী খানের এই উদ্যোগ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। গান্ধীজীর মত মহৎ প্রাণ ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী প্রার্থনা সভায় ধর্মান্ধ আততায়ীর হস্তে গুলীবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। লিয়াকত আলী খানও নিহত হইয়াছিলেন ঘাতকের নিষ্ঠুর বুলেটে। এইভাবে যুগে যুগে বহু মহৎ প্রাণকে ধরাধাম ত্যাগ করিতে হইয়াছে।

১৯৪৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিস্কৃত হইবার পর হইতেই আমার অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয় আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য চাপ দিতেছিলেন। লন্ডনে "একচুয়ারী" পড়িতেও তাঁহারা পরামর্শ দিতেছিলেন। যে ভাই আমাকে রাজনীতি করিতে বাধা দিতেন না, সেই ভাই ডঃ এ, করিম তখন পি,এইচ,ডি করিতে বিদেশে অবস্থান করিতেছিলেন। ভাইদের পরামর্শ গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইল না। তাই অন্যায়ের প্রতিকার করিবার উদ্দেশ্যে রাজনীতি করিবার সংকল্প লইয়াই অবশেষে গৃহত্যাগ করি এবং অগ্রজসম তোয়াহা ভাইয়ের ঢাকার যোগীনগরস্থ বাসায় আশ্রয় লই। তোয়াহা সাহেবের স্ত্রী আমার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ও স্নেহপরায়ণা ছিলেন। তাঁহার স্নেহের ঋণ শোধ করা আমার পক্ষে কখনো সম্ভব হইবে না।

দারুণ আর্থিক সংকটে বি.কম পরীক্ষা

বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হইলে ১৯৫০ সালে আমি বি.কম. পরীক্ষা দিবার সিদ্ধান্ত নিলাম। লজ্জায় কাহাকেও আর্থিক অনটনের কথা বলিতে পারিনা। অবিভক্ত বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রগতিশীল গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা জনাব এম,এ, জলিল আমার পরীক্ষার ফী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দেন। মামুলী প্রশংসা স্তুতি বাক্য ব্যবহার করিয়া আজ তাঁহাকে আমি ছোট করিব না। ভারত বিভাগ পূর্ব বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের দার্শনিক বিপ্লবী নেতা আবুল হাশিম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও সুসাহিত্যিক কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস কর্তৃক সম্পাদিত সাপ্তাহিক মিল্লাত কলিকাতার ওয়েইলসলী ৩নং স্ট্রীটস্থ ইস্টার্ণ পাকিস্তান প্রিন্টিং প্রেস হইতে জনাব এম,এ,জলিল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত। মুসলিম লীগের বিপ্লবী প্রগতিশীল অংশের মুখপত্র ছিল সাপ্তাহিক মিল্লাত। সেইদিনকার মত সংকটাপন্ন সময়ে তাঁহার আর্থিক সাহায্য না পাইলে আমার বি.কম. পরীক্ষা বোধহয় দেওয়া সম্ভব হইত না। তিনি বলিতেন, রাজনৈতিক জীবনে পর্বত-প্রমাণ বাধা-বিপত্তি আসে। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই রাজনৈতিক জীবনে অগ্রযাত্রা সম্ভব। তিনি আমাকে সর্বদাই সান্ত্বনা দিতেন; বলিতেন, ইহা দান নহে, ইহার দ্বারা আমি আমার রাজনৈতিক দায়িত্বই পালন করিতেছি।

কিছুকালের মধ্যেই আরেক সমস্যা দেখা দিল। তোয়াহা ভাই ও ভাবী আমার পরীক্ষার মাত্র কিছুকাল আগে তাঁহাদের গ্রামের বাড়ীতে গেলেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে আমাকে অনেক দিন শুধু ছাতু ভিজাইয়া সেই ছাতুর নাড়ু খাইয়াই পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে হইয়াছে। পাশ্ববর্তী বাড়ীতেই আবুল হাসানাত ও আবুল বরকত ভ্রাতৃদ্বয় থাকিতেন। তাঁহারা আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু; কিন্তু তাঁহাদের নিকট ইহা প্রকাশ করা আমার চরিত্র বিরুদ্ধ। বোধহয় আবুল বরকত কিছুটা আঁচ করে এবং আমাকে তাঁহার সহিত আহার করিতে অনুরোধ

জানায়। আমি নানা কথার ফাঁকে তাহা এড়াইয়া যাই।

পরীক্ষার পড়াশুনায় ব্যাপৃত। এমনি সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক ত্যাগী নেতা এম,এ,ওয়াদুদ ও ইব্রাহীম তাহা বাংলা ভাষায় আরবী হরফ প্রচলনের সরকারী অপচেষ্টা বাধা দানকল্পে কর্মসূচী গ্রহণের জন্য আলোচনা করিতে আমার নিকট আসেন। আলোচনা মোতাবেক পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া মধুর ক্যান্টিনে চা পানকালে শুনিতে পাই যে, বি.কম. পরীক্ষার তারিখ পিছাইবার জন্য একদল আড্ডাবাজ পরীক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করিতেছে এবং কর্তৃপক্ষও তাহাদের চাপে নতি স্বীকারের মনোভাব দেখাইতে শুরু করিয়াছেন। আমি মধুর ক্যান্টিন হইতে তৎক্ষণাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জনাব আবদুল হাদী তালুকদারের সহিত সাক্ষাৎ করি এবং পূর্ব নির্ধারিত তারিখে পরীক্ষা গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাই। আমার যুক্তি ছিল; অধিকাংশ পরীক্ষার্থী ছাত্রকে গরীব বাপ-মায়ের অতি কষ্টে অর্জিত অর্থে পরীক্ষার কারণে ঢাকায় থাকিতে হয়। রেজিস্ট্রার হাদী সাহেব আমার মত সর্বক্ষণ আন্দোলনমুখী ছাত্রের এই অনুরোধ প্রথমে সহজভাবে নিতে পারেন নাই, অর্থাৎ বিশ্বাসই করেন নাই। যাহা হউক, আমার কয়েকটি যুক্তি শ্রবণ করিয়া তিনি গম্ভীর মুখে কঠোর ভাষায় বলিলেন, "যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহাকে কেন্দ্র করিয়া হট্টগোল হয়, তবে তাহার দায়িত্বও তোমাকেই বহন করিতে হইবে।"

পরদিন মধুর ক্যান্টিনে আড্ডাবাজ পরীক্ষার্থী ছাত্ররা আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। তাহারা আমার নিকট হইতে পরীক্ষার তারিখ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিলে আমি অতি সহজ কণ্ঠেই জবাব দিলাম, 'আন্দোলন করি, জেল খাটি, শিক্ষালয় হইতে বহিস্কৃত হই, ক্ষতিটা সর্বাংশে আমার হয়। অতএব পরীক্ষা পিছাইবার দাবী করাটা আমার পক্ষেই স্বাভাবিক। আমার মত অধিকাংশ পরীক্ষার্থী ছাত্রই পরীক্ষা নির্ধারিত তারিখে দিতে চায়। কারণ, প্রথমতঃ পরীক্ষা পিছাইবার কারণে গরীব ছাত্রদের বাপ-মায়ের স্বল্প আয়ের উপর বাড়তি বোঝা বর্তায়, দ্বিতীয়তঃ মেধাবী পরীক্ষার্থী ছাত্রদের সময়ের অপচয় হয়, তৃতীয়তঃ অনেকেই পরীক্ষার পর পরই পরিবারের প্রয়োজনে জীবিকার অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করে। তাহারা আমার উক্তি ও যুক্তি শুনিয়া অস্বস্তিবোধ করিতেছিল এবং নির্বাক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাইতেছিল। যাহা হউক, পরীক্ষা পূর্ব নির্ধারিত তারিখেই যথারীতি শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হইল। পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পর দেখিয়াছি মুজিবী শাসনামলে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার নামে কী জঘন্য ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। দুঃখের সাথেই অনুভব করিয়াছি, ভবিষ্যতে এইসব অশিক্ষিত ডিগ্রীধারী তৈরীর জন্য জাতিকে অকল্পনীয় খেসারত দিতে হইবে। ইহাই ভবিতব্য, ইহার ব্যতিক্রম কোন কারণেই ঘটিবে না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক আবুল ফজল সেই সময়ে বিবেককে বিক্রি না করিয়া দেশ ও জাতির স্বার্থে স্বীয় জীবনের ঝুঁকি লইয়াও শিক্ষাঙ্গনে শৃঙ্খলা ও শিক্ষার পরিবেশ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিক্ষাঙ্গনের সাধারণ একজন কর্ণধার হইয়াও সেই সময়ে মুজিব সরকারের সর্বনাশা মত ও নীতির বিরুদ্ধে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করিয়াছেন, জাতির অগ্রযাত্রায় তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে।

গ্রন্থকার এবং তাঁর সহধর্মীনী রাশিদা বেগম ও কন্যা রুমিন ফারহানা

বা থেকে ভ্রাতুষ্পুত্র হাসান জামান বি.এস.সি. (অনার্স) ও এম.এস.সি, (অর্থনীতি) লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস, অনুজ আমিরুজ্জামান সি.এস.পি, অলি আহাদ ও তাঁর সহধর্মিনী অধ্যক্ষা রাশিদা বেগম এম.এ.এম.এড (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), এম,এ (চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়) প্রাক্তন ডীন, চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সাবেক মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর; একমাত্র কন্যা রুমিন ফারহানা, বড় ভাই প্রয়াত বিজ্ঞানী প্রফেসর ও ডীন ডঃ এম.এ. করিম-এর স্ত্রী মিসেস সুফিয়া খাতুন।

১৯৫৬ সালে তদানীন্তন আবু হোসেন সরকার-এর বিরুদ্ধে ভূখা মিছিল। মিছিলের অগ্রভাগে বাম হইতে সর্বজনাব তাজউদ্দিন আহমদ, অলি আহাদ, ইয়ার মোহাম্মদ খান, জহিরুদ্দিন আহমদ। আতাউর রহমান খান, মহিউদ্দিন আহমদ ও মন্টু খান

৫৫ সালে মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে গ্রন্থকার। তৃতীয় সারির বাম দিক হতে দ্বিতীয়। দ্বিতীয় সারিতে ডান হতে তৃতীয় হচ্ছেন খান আবদুল গাফফার খান।
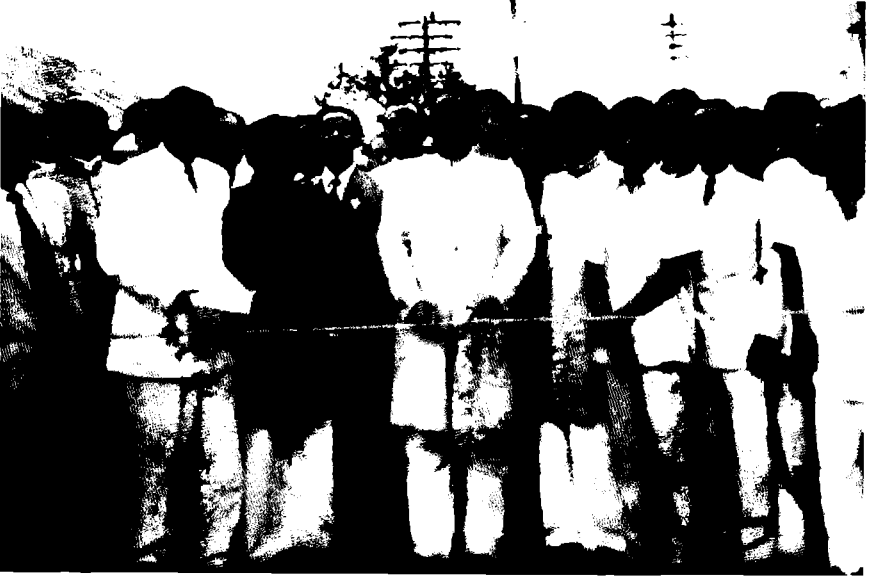
৫৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানের পাশে গ্রন্থকার।

১৯৫৫ সালে ঢাকা ফুলবাড়ীয়া রেলওয়েষ্টেশনে বাম হতে মওলানা ভাসানী, অলি আহাদ ও শেখ মুজিবর রহমান।

১৯৬৯ সালের ২০শে মে করাচীতে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভূট্টোর সাথে জনাব আতাউর রহমান খান ও অলি আহাদ।

১৯৬৯ সালে মে মাসে হায়দরাবাদে বিশেষ গুরত্বপূর্ণ আলোচনারত সিন্দুনেতা কে বি জাফর, আতাউর রহমান খান ও অলি আহাদ।

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেস্টা কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করছেন মহান নেতা মওলানা ভাসানী। পাশে উপবিষ্ট কমরেড মনি সিং, মনোরঞ্জন ধর, মনসুর আলী, তাজউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ছবি-সৌজন্যে শাহাবুদ্দীন আহমদ সরকার।
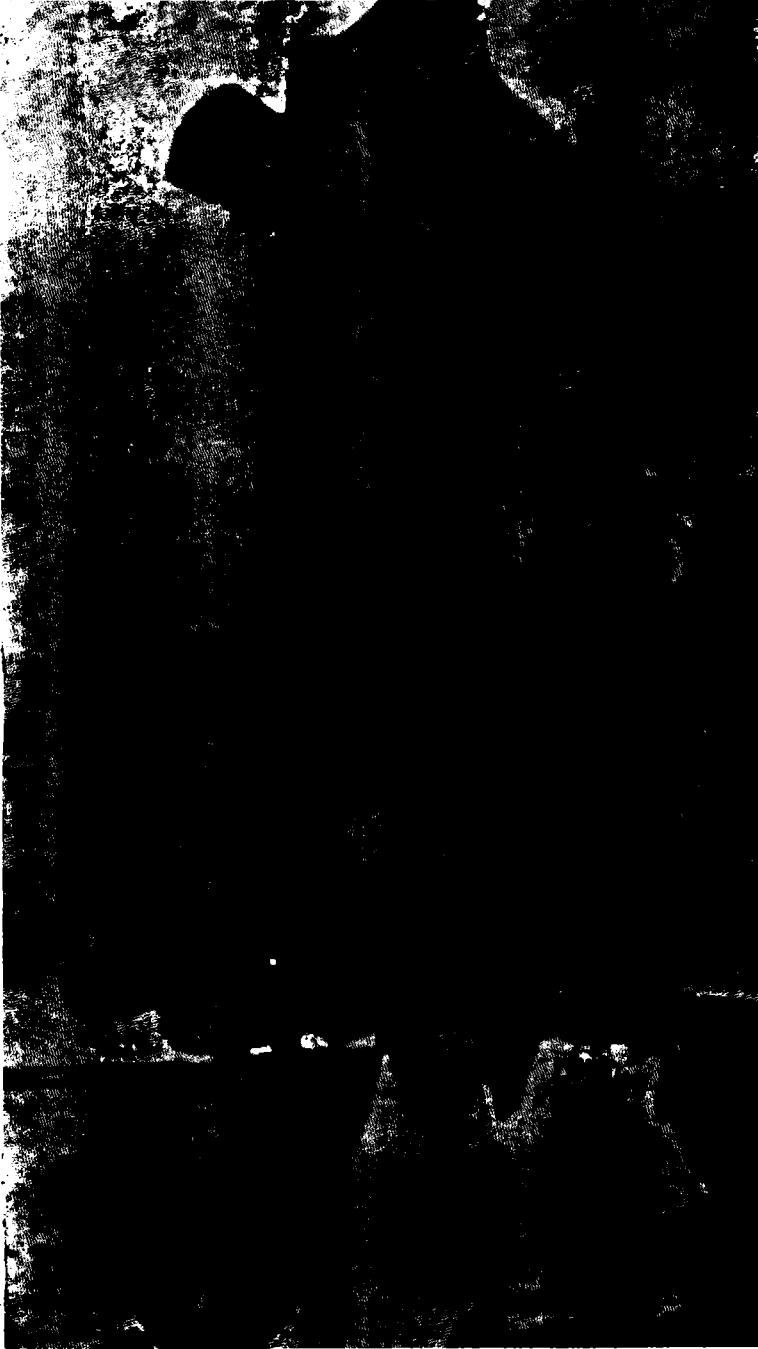
টিক্কাখানের সঙ্গে বৈঠকরত ১২ জন রাজনৈতিক নেতার সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধি দলের নেতা নুরুল আমিন ও গোলাম আযম।
ছবি ঃ দৈনিক পূর্বদেশ। ৬/৪/১৯৭১

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ঢাকা আগমনঃ ১৪৪ ধারা জারি

আগেই বলিয়াছি, ১৯৪৯ সালে আরমানিটোলা জনসভা হইতে মিছিল সহকারে অগ্রসর হইবার কালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হকসহ অন্যান্য কর্মীরা গ্রেফতার হন। ইহার পর কিছুকালের জন্য রাজনৈতিক তৎপরতা স্থিমিত হইয়া আসে। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ বিরোধী দলীয় নেতাদের সর্বদা অশালীন ভাষায় আক্রমণ অব্যাহত রাখায় সক্রিয় বিরোধী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিতে কেহই সাহস পাইতেছিল না। একমাত্র ভরসা সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের পৃষ্ঠা। অর্থমন্ত্রী জনাব হামিদুল হক চৌধুরী ও উজীরে আলা নূরুল আমিন সাহেবের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ১৯৪৯ সালে ১৮, ১৯ ও ২০শে জুন কার্জন হলে অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে উজীরে আলা নূরুল আমিনের বিরোধী গ্রুফ মাথাচাড়া দিয়া উঠে। ইহারই কারণে দুর্নীতির অভিযোগে, পাবলিক অফিস (Public office Disqualification ordinance) ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডিন্যান্স বলে পূর্ববঙ্গ মন্ত্রসভা হইতে অর্থমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরীর অপসারণ ঘটে। ১৯৫০ সালে মুকুল সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভায় হাতাহাতি ও মারামারির পর সংখ্যাগুরু নূরুল আমিন গ্রুপ জনাব হামিদুল হক চৌধুরী ও তাঁহার অন্ধভক্ত জনাব মহিউদ্দিন আহমদকে মুসলিম লীগ সংগঠন হইতে বহিষ্কার করিয়া দেয়। ইহারই ফলে জনাব হামিদুল হক চৌধুরীর ইংরেজী দৈনিক "পাকিস্তান অবজার্ভার" (বর্তমানে বাংলাদেশ অবজার্ভার) সরকার বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

জনাব মহিউদ্দিন আহমদকে গ্রেফতার করিয়া কারাগারে আটক করা হয় এবং আপত্তিকর সম্পাদকীয় লেখার অভিযোগে ১৯৫২ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী ইংরেজী দৈনিক পাকিস্তান অবজার্ভারের প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। বিরোধী রাজনীতিকদের দেশপ্রেমের প্রতি কটাক্ষ হানাই পাকিস্তানের সরকারী রাজনীতিকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। তাই ক্ষমতা হইতে অপসারিত হইবার পর ১৯৬৭ সালে জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোকে তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনের প্রকাশ্য মন্তব্য শুনিতে হইল যে, তিনি পাকিস্তানের নাগরিক নহেন। সরকারী দলের সৃষ্ট এই ধরনের ঘোলাটে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেই জনাব শামসুল হকের কারামুক্তি ঘটে। ফলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কর্মীদের মনে নব বলের সঞ্চার হয়।

নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে জনাব শামসুল হকের পক্ষে টাঙ্গাইল উপনির্বাচনের মামলা পরিচালনার জন্য জনাব সোহরাওয়ার্দী ১৯শে জুলাই (১৯৫০) ঢাকা আগমন করেন।বিমানবন্দর হইতে বিখ্যাত ব্যবসায়ী আরফান খানের তাঁতীবাজারের বাসভবনে পৌঁছিবার পরই মালপাত্র রাখিয়া কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা জনাব সোহরাওয়ার্দীর সমভিব্যাহারে ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে আয়োজিত জনসভায় যোগ দিতে উপস্থিত হই। এই সময়ে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ১৪৪ ধারা জারির আদেশ জনাব সোহরাওয়ার্দীকে দেখাইলেন। ফলে সমবেত লক্ষাধিক লোককে আশাহত হইয়া বাড়ী ফিরিতে হইল। জনাব সোহরাওয়ার্দী

জীপে আরমানিটোলা ময়দানে চতুর্দিকে ঘুরিয়া জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করিলেন এবং জনতাকে এই মর্মে আশ্বাস দিলেন যে, ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হইলে তিনি পুনরায় ঢাকা আসিবেন ও জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। সেই মর্মস্পর্শী দৃশ্য আমার চোখে আজও সজীব। চিন্তা করুন, তখনকার দিনে বিরোধী দলীয় রাজনীতি কত কঠিন ছিল। নূরুল আমিন সরকার জনাব সোহরাওয়ার্দীর উপর ১৯৫০ সালের ১৯শে জুলাই এই মর্মে নোটিশ জারি করিলেন যে, আইনপেশাগত কার্যের বহির্ভূত কোন রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে যেন তিনি অংশগ্রহণ না করেন এবং ২৮শে জুলাইয়ের মধ্যে নির্বাচনী মামলার কাজ শেষ হইবামাত্র তাঁহাকে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করিতে হইবে। তদানীন্তন লীগ শাহীর দাপটে জনাব সোহরাওয়ার্দীরই যখন এমনি অবস্থা, তখন অন্যদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

শিক্ষা সম্মেলন

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ছাত্রবেতন বৃদ্ধির পরিকল্পনা, ১৯৪১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী প্রতি দুই হাজার লোকের জন্য ১টি প্রাইমারী স্কুল, বিভিন্ন বিদ্যাভবন হইতে ছাত্র বহিস্কার, বাংলা ভাষায় আরবী হরফ চালু করার নিমিত্ত সরকারী উদ্যোগ ও খরচে সতেরটি কেন্দ্র চালু, পূর্ববঙ্গ সরকারের জয়েন্ট সেক্রেটারী মিজানুর রহমান কর্তৃক প্রবর্তিত উর্দু-বাংলা সংমিশ্রিত ভাষা সৃষ্টির উদ্ভট প্রচেষ্টা ইত্যাদির বিরুদ্ধে অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে বন্ধ্যা শিক্ষানীতির ব্যাপারে সরকারকে সচেতন করিবার মানসেই আমরা ১৯৫০ সালের ১৫ ও ১৬ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় নিখিল পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন আহবান করি। আত্মগোপনকারী পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, পাকিস্তান ছাত্র এসোসিয়েশন ও নিরপেক্ষ কর্মীরা এক বৈঠকে সম্মেলন উদযাপনের উদ্দেশ্যে আমাকে সভাপতি ও জনাব রুহুল আমিনকে সম্পাদক নির্বাচিত করিয়া একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করে। এমনকি নূরুল আমিন সরকারের সমর্থক নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ সভাপতি জনাব আবদুস সামাদও এই অভ্যর্থনা কমিটিতে যোগ দেন। শিক্ষা সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া ইংরেজী দৈনিক 'পাকিস্তান অবজার্ভার' সম্পাদক জনাব আবদুস সালাম, বাংলা দৈনিক 'ইনসাফ' সম্পাদক জনাব মহিউদ্দিন আহমদ, পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক সমিতির (East Pakistan Journalists Association) সম্পাদক জনাব জহুর হোসেন চৌধুরী, সাপ্তাহিক 'সৈনিক' সম্পাদক জনাব শাহেদ আলী ও দৈনিক পাকিস্তান অবজার্ভারের বার্তা সম্পাদক সৈয়দ নূরুদ্দিন আহমদ ১৯৫০ সালের ২৮শে আগস্ট এক যুক্ত বিবৃতি দেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ন বেলা ২টা ৫০ মিনিটে 'ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরী হলে' সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। জনাব কামরুদ্দিন আহমদ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সরকার সমর্থক কতিপয় ছাত্র সম্মেলনের উপর হামলা করে এবং পুলিশ বাহিনী নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। যাহা হউক, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে আমরা পরদিন সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় ফজলুল হক মুসলিম হল মিলনায়তনে পুনরারম্ভ করি। সম্মেলনে চারশত প্রতিনিধি যোগদান করেন। ১৬ই সেপ্টেম্বরের অধিবেশনে গৃহীত

প্রস্তাবাবলীর ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালনা করিবার নিমিত্ত এই সম্মেলনে গণশিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। এই গণশিক্ষা পরিষদ সেক্রেটারীয়েটের আহবায়ক নিযুক্ত করা হয় আমাকেই।

এম.কম. ক্লাসে ভর্তির আবেদন প্রত্যাখ্যান

বি.কম. পরীক্ষার ফল প্রকাশ হইবার পর আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.কম. ক্লাশে অধ্যয়নের অনুমতি চাহিলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমার অনুমতি প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করে। সমগ্র দেশের শিক্ষিত শ্রেণী ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হইয়া উঠেন। এমন কি প্রভাবশালী ইংরেজী দৈনিক 'পাকিস্তান অবজার্ভার' "ব্ল্যাক মেইল', (Blackmail) শিরোনামায় দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে,

"A Student who has taken a rather prominent part in battle of the scripts and also in the B.P.C. movement has been denied admission into the University. That is tantamount to denying the possibility of acquiring high academic distinction to this boy who stood first in the examination leading to his graduation."

অর্থাৎ "বর্ণমালার সংগ্রাম ও বি.পি.সি. আন্দোলনে যে শিক্ষার্থী বস্তুতঃ বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করিয়াছে তাহাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে দেওয়া হয় নাই। ইহা গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী পরীক্ষায় প্রথম স্থান দখল করিয়াছে, এমন একজন তরুণকে উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবারই শামিল "

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আওয়াজের' ৬ই পৌষ (১৩৫৭), ইংরেজী ২২শে ডিসেম্বর, (১৯৫০), সংখ্যায়, "প্রতিটি মানুষের শিক্ষার মৌলিক অধিকার আছে কি?" শিরোনামে যে প্রতিবাদ বাহির হয়, তাহার কিছু অংশ ছিল নিম্নরূপঃ

"বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা কোনদিন গাঁজাখোরের আড্ডার সঙ্গে তুলনা করতে রাজী নই। কিন্তু যখন দেখি যে, দেশকে যে ছেলে ভালবাসে, নিজের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে যে শ্রদ্ধা করে, অধ্যয়ন ও জ্ঞান চর্চার দ্বারা যে ছেলে মনীষার পরিচয় দেয়, তাকে বিশ্ববিদ্যালয় চেপে মারার আয়োজন করে, তখন একে গাঁজাখোরের আড্ডা বলতে ইতস্ততঃ করার কি আছে? বিগত ভাষা আন্দোলনের সময়ে এবং অধুনা জনাব অলি আহাদের ভর্তি নাকচ করার ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে ফ্যাসিস্ট নীতি অবলম্বন করেছে তার থেকে আমরা এ সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে, গণতন্ত্রকে ভালবাসলে, নিজের শিক্ষা-সংস্কৃতিকে বাঁচাবার চেষ্টা করলে এবং ভাল ছাত্র হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে চেপে দেয়। জাতির দুর্ভাগ্য এই যে, জ্ঞান সাধনার তীর্থভূমি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি এই।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির বিষয়ে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোস্ট ডঃ এম,ও, গণির সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি আমাকে দেশরক্ষা বিভাগে সৈন্য বাহিনীতে অফিসার পদে যোগ দিতে উপদেশ দেন এবং ইহার জন্য সরকারী তরফ হইতে মদদ দানের নিশ্চয়তা দিতে চান। তাঁহার প্রস্তাব আমি শ্রদ্ধার সাথে প্রত্যাখ্যান করি। ইহার পর অত্যল্পকালের মধ্যেই

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক চিঠিতে জানাইলেন, "Mr. Oli Ahad be not admitted into the University of Dacca," অর্থাৎ 'জনাব অলি আহাদকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হইবে না।" এইভাবেই আমার উচ্চডিগ্রী লাভের সকল আশা নির্মূল হইয়া গেল।

মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট

১৯৫০ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান ভবিষ্যতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ভিত্তি হিসাবে "মূলনীতি কমিটি" সুপারিশাবলী প্রকাশ করিলে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন রাজনৈতিক অংশ এমন কি খোদ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। আমরা মূলনীতি কমিটি রিপোর্টের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন করিবার নিমিত্ত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স সভাপতি এডভোকেট সাখাওয়াত হোসেনের গৃহে এক সভায় মিলিত হই এবং (১) আতাউর রহমান খান, (২) কামরুদ্দিন আহমদ (আহবায়ক), (৩) সাখাওয়াত হোসেন, (৪) পাকিস্তান অবজার্ভার সম্পাদক আবদুস সালাম, (৫) অলি আহাদ প্রমুখ ব্যক্তির সমন্বয়ে Committee of Action for Democratic Constitution গঠন করি।

উক্ত সংগ্রাম কমিটির আহবানে ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভায় আমরা মূলনীতি কমিটির সুপারিশাবলী বাতিল করিবার দাবী জানাই। সংগ্রাম পরিষদ ১৯৫০ সালের ৪ঠা ও ৫ই নভেম্বর ঢাকার বার লাইব্রেরী হলে মহাজাতীয় সম্মেলন (Grand National Convention) আহবান করে। জনাব আতাউর রহমান খান উক্ত মহাজাতীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। শেরেবাংলা এ,কে, ফজলুল হক মূলনীতি কমিটির সদস্য ছিলেন এবং তিনি মূলনীতি কমিটির সুপারিশাবলীর অন্যতম প্রণয়নকারী ও স্বাক্ষরকারী ছিলেন। সম্মেলনে তাঁহার উপস্থিতিকে তরুণ সমাজ খুব একটা উৎসাহের সহিত অভিনন্দন জানায় নাই। এক প্রশ্নোত্তরে শেরেবাংলা তরল হাস্যকৌতুকের মাধ্যমে উত্তর দেন যে, "আংগুর রস পান করাইয়া তাঁহার নিকট হইতে মূলনীতি কমিটির সুপারিশাবালীতে সহি নিয়াছে।" বাঙালী নেতারা যে করাচীর আবহাওয়ায় বাঙ্গালীর স্বার্থ হানিকর কাজ করিতে কোন দ্বিধাবোধ করেন না, তাহা বাঙালীদের বুঝা দায়। কিন্তু ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিলেই বাঙালীদের মনোভাবের প্রতিধ্বনি করিয়া ভিন্নরূপ ধারণ করিতেও তাঁহারা মোটেই কুণ্ঠিত হন না। যাহা হউক, দুইদিনব্যাপী অধিবেশনে একটি বিকল্প মূলনীতি রচনা করা হয় এবং এই বিকল্প মূলনীতির ভিত্তিতে 'সংবিধান রচনা আন্দোলন' পরিচালনা করিবার নিমিত্ত কাউন্সিল ফর ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন গঠন করা হয়। পর্ব পাকিস্তানবাসীর মনোভাব লক্ষ্য করিয়া পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগও মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট সংশোধন দাবী সম্বলিত কতিপয় সুপারিশ করে। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সংশোধনাবলী অত্যন্ত সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিয়া কাউন্সিল ফর ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন ১৯৫১ সালের ২০শে জানুয়ারীর সভায় নিম্নোক্ত প্রতিবাদ প্রস্তাব গ্রহণ করেঃ 'অত্র সভা মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের উপর পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ সাব কমিটির গৃহীত প্রস্তাবাবলীর যেমন দ্বি-কক্ষ আইন পরিষদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানী-রফতানী বিষয়াবলীতে প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে দান, "লাহোর প্রস্তাবানুযায়ী" পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা না করিয়া সামান্য প্রাদেশিক মর্যাদা দান, রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ না করাকে তীব্রভাবে নিন্দা করিতেছে।'

শান্তি কমিটি

১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে জাপানের হিরোশিমায় ও ৯ই আগস্ট নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত আণবিক বোমার ধ্বংসলীলায় পারমাণবিক অস্ত্রের মানব সভ্যতা বিধ্বংসী ভয়াবহ শক্তি সম্পর্কে সমগ্র বিশ্ববাসী আতংকগ্রস্ত হইয়া উঠে। সকল মহলে এই আশংকা বৃদ্ধি পায় যে, সভ্যতা ও সৃষ্টিবিধ্বংসী আণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা ও অন্যান্য মারাত্মক আণবিক অস্ত্রশস্ত্রই হইবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাতিয়ার। সমর উপকরণ উৎপাদনে উন্নত দেশগুলি হাজার হাজার কোটি ডলার খরচ করিতেছে অথচ অনুন্নত ও আজাদীপ্রাপ্ত দরিদ্র দেশগুলির মানবগোষ্ঠী অর্ধাহারে-অনাহারে রহিয়াছে। শোষক শ্রেণী বিশ্বব্যাপী শোষণের জাল বিস্তার করিয়া শোষণ অব্যাহত রাখিবার তাগিদে স্রষ্টার প্রিয় সৃষ্টিকেই ধ্বংস করিতে উদ্যত। ইহারই প্রতিক্রিয়ায় বিশ্ববিবেক জাতি-ধর্ম-স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষ সর্বনাশা মারণাস্ত্র উৎপাদন ও সমর প্রস্তুতির বিরুদ্ধে সকল মানুষকে এক কাতারবন্দী হইবার নৈতিক আহবান জানায়। পূর্ব পাকিস্তানকে শান্তি আন্দোলনের শক্তিশালী অংশীদার করিবার প্রয়াসে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৫০) ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে সমবেত হইবার জন্য ৯ই সেপ্টেম্বরের দৈনিক 'পাকিস্তান অবজার্ভারের' মাধ্যমে এক আবেদন জানানঃ সর্বজনাব আবদুস সালাম, সম্পাদক, 'পাকিস্তান অবজার্ভার', কাজী মোহাম্মদ ইদরিস, শাহাদত উল্লাহ সম্পাদক, 'প্রগ্রেসিভ রাইটার্স এসোসিয়েশন', মহিউদ্দিন আহমদ, সম্পাদক, দৈনিক 'ইনসাফ', মোস্তফা নূরুল ইসলাম, মাহবুব জামাল জাহেদী, আশরাফ সিদ্দিকী, বজলুল হক 'জিন্দেগী', নজরুল ইসলাম, সভাপতি, প্রগ্রেসিভ রাইটার্স এসোসিয়েশন, অলি আহাদ, সভাপতি, অভ্যর্থনা কমিটি, নিখিল পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন, এম,এ, আওয়াল, আহবায়ক, সিভিল লিবার্টি লীগ, কে,জি, মোস্তফা, দৈনিক ইনসাফ, আনিস চৌধুরী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ ইউসুফ হাসান, সাধারণ সম্পাদক উর্দু প্রগেসিভ রাইটার্স এসোসিয়েশন, মোহাম্মদ আলী, আবদুল হক দৈনিক আজাদ, সরলানন্দ সেন, দৈনিক আজাদ, এহতেশাম আহমদ, এডভোকেট মোহাম্মদ আলী, জহুর হোসেন চৌধুরী, জয়েন্ট এডিটর, ইংরেজী দৈনিক পাকিস্তান অবজার্ভার, মিসেস এফ, সামাদ, এডিটার 'মিনার'।

১০ই সেপ্টেম্বর ঢাকা বার লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত সভায় আমরা জনাব মোঃ তোয়াহাকে সম্পাদক করিয়া শান্তি কমিটি গঠন করি। পূর্ব পাকিস্তানের শান্তি আন্দোলন হইতেছে আত্ম-নিধন-ধর্মী-বিশ্বযজ্ঞ মহা-সমারোহের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। ১৯৫০ সালের মত ভয়াবহ দিনগুলিতে রাষ্ট্রদ্রোহী ও কমিউনিষ্ট আখ্যাকে অগ্রাহ্য করিয়া সাম্রাজ্যবাদী মহলের অনুচর মুসলিম লীগ সরকারের রক্তচক্ষুকে পরোয়া না করিয়া যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে শান্তি আন্দোলনের গোড়াপত্তন করিতে পারিয়া গর্ববোধ করিতেছি। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিবার অপরাধে কারাগারে আটক থাকাকালে মহা চীনের রাজধানী পিকিং-এ ২রা অক্টোবর এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক শান্তি সম্মেলন শুরু হয়। উক্ত সম্মেলনে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা মানকী শরীফের পীরের নেতৃত্বে সর্বজনাব আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান, মিঞা ইফতেখার

উদ্দিন, ইংরেজী দৈনিক 'পাকিস্তান টাইমস'-এর সম্পাদক মাজহার আলী ও তাঁহার স্ত্রী বেগম তাহেরা মাজহার ও খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস যোগদান করেন। সম্মেলনে ৩৭টি দেশের তিনশত সাতষট্টি জন প্রতিনিধি কর্তৃক ১২ই অক্টোবর নিম্নোক্ত ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়ঃ

"এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জনগণ যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে বদ্ধপরিকর। তাহারা এই মর্মেও দৃঢ়প্রত্যয়ী যে, শুভেচ্ছাপূর্ণ সকল লোকের সহিত সহযোগিতায় তাহারা সেই ভীতিপ্রদ শোচনীয় পরিণামকে নিবৃত করিতে, যুদ্ধের অন্ধকার মেঘকে দূরীভূত করিতে এবং সার্বজনীন বন্ধুত্বের মানব দিগন্তকে মেঘমুক্ত করিয়া স্থায়ী শান্তির অভ্যুদয় সম্ভব করিয়া তুলিতে সক্ষম হইবে।"

স্বার্থ-সংঘাত ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বিশ্বে পারমাণবিক যুদ্ধ আজ মানুষের দ্বারা উপস্থিত। নিম্নে বর্ণিত তথ্যাবলীই প্রমাণ করে যে, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মানবসভ্যতা বিধ্বংসী পারমাণবিক ও অপারমাণবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বের মনীষীবৃন্দের সোচ্চার কণ্ঠ এবং শান্তি আন্দোলনের যথার্থতা ও অপরিহার্যতা। যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণ সংস্থার (United States Arms Control & Disarmament Agency) এক সমীক্ষানুসার ১৯৭৩ সালে একশত ছত্রিশটি দেশ সামরিক নিরাপত্তা খাতে ২৫০০০ কোটি ডলার ব্যয় করিয়াছে, ইহার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে নর্থ-আটলান্টিক ট্রিটি অরগানাইজেশন (North Atlantic Treaty Organisation-NATO) ১১০০০ কোটি ডলার এবং সোভিয়েট রাশিয়ার নেতৃত্বে ওয়ারশ প্যাক্ট (Warsaw pact) ৯৪০০ কোটি ডলার ব্যয় করিয়াছে। শুধু ইহাই নয়, ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের মতে ১৯৭৪ সালে শিল্পোন্নত আমেরিকান ও ইউরোপীয় দেশসমূহ অনুন্নত দেশসমুহে ১৮০০ কোটি ডলারের মারণাস্ত্র সরবরাহ করে। ১৯৫০-১৯৭৪ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৮৬০০ কোটি ডলার মূল্যের ও সোভিয়েট রাশিয়া ৩৯০০ কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্র বিক্রয় করে। বৃহৎ শক্তিধারী দেশসমূহ নিজ নিজ প্রভাব বলয় সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিস্তারের স্বার্থে অস্ত্র উৎপাদন ও সমর সজ্জার সর্বনাশা প্রতিযোগিতায় সবিশেষ ব্যস্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার উস্কানি ও কূটনৈতিক চালের শিকার অনুন্নত দেশগুলি কিভাবে অলীক সংঘাতের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার অজুহাতে 'মার্চেন্টস অব ডেথস' বা অস্ত্র ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে সমরোপকরণ ক্রয় করিয়া আত্মনিধনের বিশ্বযজ্ঞে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে, উহার সরস বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্নার্ডশয়ের 'মেজর বারবারা' নাটকে। একশতটি উন্নয়নকামী দেশে ২০০ কোটি বাসিন্দার মধ্যে চরম দারিদ্র প্রপীড়িত ৮০ কোটি লোককে অর্ধাহারে-অনাহারে নিশ্চিত মৃত্যুকবল হইতে রক্ষাকল্পে ১৯৪৭ সালের শেষ ভাগ হইতে ১৯৭৫ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ১ কোটি টন খাদ্য সাহায্য জোগাইতে জাতিসংঘের মহাসচিব ডঃ কুর্ট ওয়েল্ডহেইম ও বিশ্বখাদ্য ও কৃষি সংস্থার মহাপরিচালক ডক্টর বোয়েরমাকে রীতিমত গলদঘর্ম হইতে হয়। বিশ্ব মনীষীরা তাই সমরাস্ত্র উৎপাদনের বিরুদ্ধে শান্তি তথা প্রগতির পক্ষে বিশ্বশান্তি আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেন এবং মানব সভ্যতা ও কৃষ্টি সংহারক যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী

দুর্জয় শান্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। উপরোল্লিখিত ঘটনাস্রোত হইতে অনুমিত হয় যে, বিশ্বের বুক হইতে শান্তি যেন ক্রমশঃই অপসৃয়মান, যদিও বৃহৎ শক্তিবর্গ বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, মহাচীন ইত্যাদি শক্তি দ্বিপক্ষীয় ও বহু পক্ষীয় চুক্তি মারফত পারস্পরিক সমঝোতায় পৌছানোর জন্য নিরন্তর প্রয়াসী। তাই, আক্ষেপের সহিত বলিতে হয় peace is the dream of wise and war is the history of man অর্থাৎ শান্তি মনীষীদের স্বপ্ন আর যুদ্ধ মানবের ইতিহাস।

যুব সম্মেলন

যাহা হউক, এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের যুব সম্প্রদায়কে সংগঠিত করিবার মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া নিখিল ভারত মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের সহ-সভাপতি মাহমুদ নূরুল হুদা ও বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের প্রাক্তন সম্পাদক আনোয়ার হোসেন এক প্রতিনিধিত্বমূলক যুব কর্মিসভায় যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হইয়া যুব সম্মেলন আহবানের উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করেন। যুব সম্মেলনকে সাফল্যমন্ডিত করিয়া তুলিবার প্রয়াসে আমরা প্রাণপণ পরিশ্রম করি। আমরা কায়েদে আযমের সহোদরা মাদারে মিল্লাত মিস ফাতেমা জিন্নাহ ও পাঞ্জাবের প্রগতিশীল জনপ্রিয় নেতা মিঞা ইফতেখার উদ্দিনকে ২৭ ও ২৮শে মার্চ (১৯৫১) ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য পাকিস্তান যুব সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ ও অনুরোধপত্র পাঠাই। ক্ষমতাসীন নূরুল আমিন সরকার যুব সম্মেলনকে নেকনজরে দেখেন নাই। তাই, সম্মেলনের তারিখ যতই নিকটবর্তী হইতে থাকে, গণবিরোধী সরকার ততই তৎপর হইয়া উঠিতে শুরু করে।

পাঞ্জাব আইন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কিছুকালের মধ্যেই মেজর জেনারেল আকবর খান এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খানের সরকারকে উচ্ছেদের প্রচেষ্টা নেন। কিন্তু ষড়যন্ত্র ফাঁস হইয়া পড়ায় মেজর জেনারেল আকবর খান ও তদীয় স্ত্রী, পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি সম্পাদক সাজ্জাদ জহীর, দৈনিক পাকিস্তান টাইমস সম্পাদক উর্দু কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, বিমান বাহিনীর কমোডর ঝানঝুয়া, মেজর ইসহাক ও আরো অনেকে গ্রেফতার হন। ইহা বিখ্যাত রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিতি লাভ করে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আইনজীবী হিসাবে ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থনের দায়িত্বভর গ্রহণ করেন। এমনিতেই ক্ষমতালোভী অসহিষ্ণু মুসলিম লীগ সরকার যত্রতত্র সর্বজনে রাষ্ট্রবিরোধী ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ আবিষ্কারে ঘর্মাক্ত কলেবর। তদুপরি প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান পাকিস্তনের মাটিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পদার্পণকে খুব একটা নেক নজরে দেখিতেছিলেন না। পাকিস্তানের মাটিতে পদার্পণ করিয়াই শহীদ সোহরাওয়ার্দী বিরোধী দলীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করেন; কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় বিরোধী দল নেতৃবর্গ ছিলেন, ("Dogs let loose by India")-বা "ভারতের লেলায়িত কুকুরসমূহ" মানকী শরীফের পীর, মাওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের নেতৃত্বে পরিচালিত বিরোধী দলীয় কর্মী বাহিনীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান হুমকির সুরে এই সতর্ক বাণীও উচ্চারণ করিতেন যে, "ছের কুচাল

দেংগে," অর্থাৎ "শিরশ্ছেদ করিব" এমনি হিটালারী-স্ট্যালিনী-মাও মেজাজে যখন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান অন্যের শিরশ্ছেদের কল্পনায় মশগুল, সেই মুহূর্তে খোদ সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান কার্যালয় রাওয়ালপিন্ডি সেনানিবাসে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র অনাবৃত হয়। এমনি ভয়াবহ অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে জাতির জনক কায়েদে আযমের ভগ্নি মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ ও পাঞ্জাবের আজাদ পাকিস্তান পার্টি প্রধান মিঞা ইফতেখার উদ্দিন আমাদের আহূত যুব সম্মেলনে যোগদানের অক্ষমতা তারযোগে আমাদিগকে জানাইয়া দেন। এতদসত্ত্বেও আমরা মনোবল হারাই নাই। নির্ধারিত তারিখে যুবসম্মেলন অনুষ্ঠানে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। পাকিস্তান অবজার্ভারের সহকারী সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র উদঘাটনের কারণে সৃষ্ট উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে যুব সম্মেলনে তারিখ পিছাইয়া দেওয়ার পরামর্শ দেন। আমরা সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি ত্যাগ না করিয়া অবস্থার উপর কড়া দৃষ্টি রাখিতে লাগিলাম। বাজারের জোর গুজব, যুব সম্মেলন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইবে, ঢাকা বার লাইব্রেরী হলসহ সমগ্র শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হইবে।

যাহা হউক, যে কোন প্রকার অস্বাভাবিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করিবার মত মনোবল আমাদের অটুট ছিল। তদানীন্তন পাকিস্তান অবজার্ভারের স্টাফ রিপোর্টার ও বিভাগপূর্ব আসাম মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের নেতা জনাব তসাদ্দক আহমদ চৌধুরীর সক্রিয় সাহায্য-সহায়তা ও সময়োপযোগী পরামর্শে ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে সম্মেলন অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুড়িগঙ্গা নদীর অপর তীরে ভাসমান গ্রীণবোটে যথারীতি যুব সম্মেলন অনুষ্ঠান করি। বুড়িগঙ্গা নদীর উপর ১৪৪ ধারা জারি করিয়া কোন নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন করা হয় নাই বলিয়াই আমরা এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলাম। সন্ধ্যা-রাত্রি হইতে হ্যাজাক লাইট জ্বালাইয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত সম্মেলন চলে। অবিভক্ত আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ আলী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে বিভিন্ন সমস্যা, সরকারী নির্যাতন, ঢাকা নগরে ১৪৪ ধারা জারি, পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়া ১৯৫২ সালের প্রথম দিকে নতুন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ গঠন করা হয়ঃ

সভাপতি	ঃ জনাব মাহমুদ আলী
সহ-সভাপতি	ঃ সর্বজনাব খাজা আহমদ, ইয়ার মোহাম্মদ খান, শামসুদ্দোহা (টাঙ্গাইল), আবদুল মজিদ এবং মিসেস দৌলতুন্নেসা
সাধারণ সম্পাদক	ঃ জনাব অলি আহাদ
যুগ্ম সম্পাদক	ঃ সর্বজনাব আবদুল মতিন ও রুহুল আমীন
কোষাধ্যক্ষ	ঃ জনাব তসাদ্দক আহমদ চৌধুরী
কার্যকরী সংসদ-সদস্যবর্গ	ঃ সর্বজনাব মাহমুদ নূরুল হুদা, মোঃ তোয়াহা, মতিউর রহমান (রংপুর), আবদুল হালিম (ঢাকা), আবদুস সামাদ (সিলেট), মকসুদ আহমদ, কে,জি, মোস্তফা, কবির

আহমদ (চট্টগ্রাম), এম,এ, ওয়াদুদ, আবদুল গাফফার চৌধুরী, প্রাণেশ সমাদ্দার, তাজউদ্দিন আহমদ, আকমল হোসেন, মোতাহার হোসেন, মিস রোকেয়া খাতুন।

২৮শে মার্চ (১৯৫১) সন্ধ্যাকালে তেজগাঁও স্টেশনের নিকটবর্তী জঙ্গলের ছায়াঘেরা পরিবেশে বিভিন্ন জেলা হইতে আগত কালচারাল গ্রুপ এক মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। তারুণ্যের বেপরোয়া মনোভাবের ইহাই বহিঃপ্রকাশ।

আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ১৯৪৯ সালের শেষার্ধে কারাবন্দী হইবার পর হইতে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক শূন্যতা বিরাজ করিতেছিল। উক্ত বিশেষ পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগকে জন্মলগ্ন হইতে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত হইতে হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সর্বক্ষণ কর্মী হিসাবে ত্বরিতগতিতে কাজ করিবার জন্য সহৃদয় রউফ ভাই আমাকে একটি বিদেশী নতুন 'সানবীম' সাইকেলের ব্যবস্থা করিয়া দেন। ফলে, কার্যক্ষমতা অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। রউফ ভাই তখন ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল মিলনায়তন ও বিভিন্ন আবাসিক হলের মিলনায়তনগুলি একমাত্র সরকারী মুসলিম লীগ ব্যতীত আর অন্য কোন সংগঠনকে ব্যবহার করিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিতেন না।১৮-৯-৫১ তারিখে ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কে মোহাজেরদের উপর পুলিশী লাঠিপেটা, লিয়াকত সরকার কর্তৃক মাদারে মিল্লাতের সেপ্টেম্বর (১৯৫১) এর বেতার ভাষণের কিয়দংশের মাঝখানে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা, অক্টোবর মাসে (১৯৫১) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বিরোধী দলীয় নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদির বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগকে সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ করিতে হইয়াছে। শুধু তাই নয়, লবণের মত অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য অত্যাধিক বৃদ্ধি পাইয়া ১৬ টাকা সের দরে বিক্রি হইতে থাকে। ইহার বিরুদ্ধে ৩রা নভেম্বর (১৯৫১) অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় আরমানিটোলা পার্কে সর্বজনাব আতাউর রহমান খান ও কামরুদ্দিন আহমদ পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের সক্রিয় সহায়তায় এক প্রতিবাদ সভার আহবান করেন। প্রসঙ্গত উল্ল্যেযোগ্য যে, বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালের শেষার্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের আমলেই এলাকাভেদে লবণ প্রতি সের ৪৮ টাকা হইতে উর্ধ্বে ৯৬ টাকায় বিক্রি হইয়াছে। কিন্তু লবণ কেলেংকারী হোতাদের কোন প্রকার শাস্তিভোগ করিতে হয় নাই বরং ঢাকা চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি খন্দকার আবদুস সাত্তার লবণের মূল্যের উর্ধ্বগতির কারণ সর্বসাধারণ্যে বিবৃতি মারফত প্রকাশ করিবার অপরাধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার হইয়া কারারুদ্ধ হন। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের বাল্যবন্ধু জনাব সাত্তারেরও সত্য উদঘাটন করিবার অধিকার সে সময় ছিল না। এইসব দেখিয়া-শুনিয়া স্বীকার করিতেই হয় যে, মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের শাসনামল ও প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে মূলতঃ কোন পার্থক্যই ছিল না।

পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের সাংগঠনিক কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশন ২৭ ও ২৮শে মে (১৯৫১) ঢাকা জিলার অন্তর্গত নরসিংদী বন্দরে অনুষ্ঠিত হয়। তথায় মুসলিম লীগ আমাদের উপর হামলা চালাইতে কোন প্রকার কসুর করে নাই। কিন্তু অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি

জনাব আবদুল মজিদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তির দরুন আমরা দুঃখজনক অঘটন এড়াইতে সক্ষম হই। ১৯৫১ সালের ৩০ ও ৩১শে ডিসেম্বর বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী সরকারের গণবিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে যুব সমাজকে সচেতন করাই ছিল আমাদের কর্তব্য। আমাদের বক্তব্য ছিল এই যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূলে যুব সমাজের দান অপরিসীম, সুতরাং যুব সমাজকেই দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। আমাদের আহবানে বিভিন্ন জেলায় যুবকর্মীরা যেইভাবে সাড়া দেয়, তাহাতে আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি। এই সময়ে এডভোকেট ইমাদুল্লাহ ও আমি ১৬ই নভেম্বর সিলেট পৌছি এবং ১৮ই নভেম্বর ফেঞ্চুগঞ্জে আহূত সিলেট জেলা ছাত্র সম্মেলনে যোগদান করি। ছাত্র সম্মেলন উদ্বোধনের দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়। এই সম্মেলনেই পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন নামে এক নূতন ছাত্র সমিতি গঠন করা হয়। উত্তরকালে ইহাই পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন সংগঠনে পরিণত হয়। ঐতিহাসিক সত্য লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজনেই ছাত্র ইউনিয়নের এই জন্ম ইতিকথা উল্লেখ করিলাম। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের পর ঐ একই সালের ২৬শে এপ্রিল সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল ছাত্র কর্মীরা উক্ত নামেই পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন গঠন করেন এবং ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে এই সংগঠনের নাম রাখা হয় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

যাহা হউক, অশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে যথাসময়ে অর্থাৎ ৩০ ও ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৫১) যুব সম্মেলনের দুই দিনব্যাপী বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ১৯৫২-৫৩ সালের জন্য নিম্নোক্ত কর্মকর্তা নির্বাচিত হনঃ

সভাপতি	ঃ জনাব মাহমুদ আলী
সহ-সভাপতি	ঃ মীর্জা গোলাম হাফিজ, খাজা আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, ইয়ার মোহাম্মদ খান, শামসুজ্জোহা
সাধারণ সম্পাদক	ঃ জনাব অলি আহাদ
যুগ্ম সম্পাদক	ঃ মোঃ সুলতান ও ইমাদুল্লাহ
কোষাধ্যক্ষ	ঃ মাহবুব জামাল জাহেদী
কার্যকরী সংসদ-সদস্যবর্গ	ঃ আবদুল হালিম, আবদুল মতিন, এ,বি,এম, মুসা, মাহমুদ নূরুল হুদা, আনোয়ার হোসেন, এস,এ, বারী এটি, সালাহউদ্দিন, আবদুল ওয়াদুদ, শফি খান, আলী আশরাফ, আবদুর রহমান সিদ্দিকী, মোতাহার হোসেন, নূরুর রহমান, জিয়াউল হক, মতিউর রহমান, মফিজুল ইসালম, তাজউদ্দিন আহমদ, দেওয়ান মাহবুব আলী, আবদুল কাদের ও প্রাণেশ সমাদ্দার।

আওয়ামী মুসলিম লীগের নব পর্যায়

১৯৫১ সালে কারামুক্তির পর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক দেশবাসীকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করিবার নিমিত্ত সমগ্র দেশব্যাপী অবিরাম কর্মিসভা, জনসভা ইত্যাদি করিয়া যাইতেছিলেন। মুসলিম লীগ ও মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন সরকার কোথাও ১৪৪ ধারা জারি করিয়া আবার কোথাও গুন্ডামীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আওয়ামী মুসলিম লীগের কর্মসূচী পালনে সর্বপ্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে থাকে। কিন্তু জনতা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে অবিচল আস্থা জ্ঞাপন করিয়া ক্রমশঃ আওয়ামী মুসলিম লীগের পতাকাতলে কাতারবন্দী হইতে শুরু করে। পরিতাপের বিষয়-এই সময়ে কোন কাগজী ও ভীতু নেতাকেই কোর্ট-কাছারী, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবার-পরিজন বেষ্টিত সুখী জীবন ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ মওলানা ভাসানীর সহিত সফরে যাইতে কখনও দেখা যায় নাই। শৌর্য, বীর্য ও ত্যাগের মূর্তপ্রতীক অক্লান্ত পরিশ্রমী মওলানা ভাসানী একাই আহার, নিদ্রা বিশ্রাম ও আরামকে হারাম জ্ঞান করিয়া উল্কার মত সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান সফর করিয়া বেড়াইয়াছেন। জনতাকে মুসলিম লীগের কুশাসনের বিরুদ্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের তরুণ ছাত্র কর্মীরাই ছিল অগ্রনায়ক মওলানা ভাসানীর সহচর। নামসর্বস্ব নেতারা দুইটি পয়সা দিয়াও সাহায্য করেন নাই। কোন কোন সময়ে অর্থের অভাবে বৃদ্ধ নেতাকে রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। এইভাবে তাঁহার একক পরিশ্রম ও ত্যাগে পূর্ব পাকিস্তানের ঘরে ঘরে আওয়ামী মুসলিম লীগের বাণী পৌঁছে। ইহাই ঐতিহাসিক সত্য এবং এই সত্যকে অস্বীকার করিবার অর্থই হইল মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ ও ঐতিহাসিক তথ্য বিকৃতির অপচেষ্টা। স্মর্তব্য যে, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী করাচী হইতে মাঝে মাঝে ঢাকায় বিভিন্ন মামলা পরিচালনায় আসিতেন ও ফি বাবদ অর্জিত অর্থ আওয়ামী মুসলিম লীগ সংগঠনের জন্য ব্যয় করিতেন।

এই সময়ে মুসলিম লীগ সরকারের অত্যাচার, নির্যাতন ও বিরোধী সমালোচকদের কণ্ঠরোধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার নিমিত্ত নাগরিক স্বাধীনতা লীগ (Civil Liberties League) গঠন করি। সিভিল লিবার্টিস লীগ ৫ই নভেম্বর (১৯৫১) ৩/১, জনসন রোডে অবস্থিত অবজার্ভার পত্রিকার অফিসে সম্পাদক জনাব আবদুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মুখ্যমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত এক প্রতিনিধি দল গঠন করে। এই প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন সবজনাব আবদুস সালাম, আতাউর রহমান খান, কফিলউদ্দিন আহামদ চৌধুরী, কামরুদ্দিন আহমদ, অলি আহাদ, মীর্জা গোলাম হাফিজ, তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), আবদুল বারী, আবদুল আওয়াল, আবদুল ওয়াদুদ, শামসুল হক চৌধুরী ও মীর্জা গোলাম কাদের।

সভার অন্য এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা মুসলিম লীগ দলভুক্ত আইন পরিষদের সদস্যবর্গকে কালাকানুন জননিরাপত্তা আইন (বিনা বিচারে আটক রাখার আইন) বাতিল করিবার জন্য অনুরোধ জানাই। ইতিপূর্বে জুন মাস (১৯৫১) হইতে লাহোর ও করাচীতে

সাংবাদিকদের গ্রেফতার, পশ্চিম পাকিস্তানে প্রগতিশীল লেখকদের গ্রেফতার, সিন্ধু প্রদেশে হারি কমিটির নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার, লাহোরে আজাদ পাকিস্তান পার্টি অফিসে পুলিশী তল্লাশী, সীমান্ত প্রদেশে জনপ্রিয় নেতৃবর্গের গ্রেফতার ও জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ আহবায়ক শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা প্রভৃতি ঘটনা ঘটিতেছিল। বলাই বাহুল্য যে, এইগুলি ছিল পাকিস্তানে গণতন্ত্রের মৃত্যুডঙ্কা বাজাইবার পূর্বাভাস মাত্র। পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ গণতন্ত্র কণ্ঠরোধের এই সরকারী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সদা সর্বদাই অত্যন্ত সজাগভাবে সংগ্রাম করিয়া গিয়াছে এবং প্রতিটি প্রতিরোধ প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে সহায়তা দিয়াছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আইন পরিষদের ৩৮টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ মাত্র ১৭টি আসন দখল করিতে সমর্থ হইয়াছিল, বাকী ২১টি আসন লাভ করিয়াছিল অখন্ড ভারত সমর্থক খান আবদুল গফফার খানের পার্টি। গফফ্যর খানের ভ্রাতা ডাঃ খান সাহেবের নেতৃত্বেরই সীমান্ত প্রদেশের সরকার গঠিত হইয়াছিল। হিন্দুস্তান-পাকিস্তানে যোগদান প্রশ্নে সীমান্ত প্রদেশে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় এবং মানকী শরীফের পীর ও জাকোরী শরীফের পীরের অক্লান্ত প্রচারণা ও প্রচেষ্টায় সীমান্ত প্রদেশবাসীর রায় পাকিস্তানের পক্ষে যায়। জনাব সোহরাওয়ার্দী লাহোর আগমনের পরই সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ ও পাঞ্জাব প্রদেশের নেতৃবর্গ তাঁহার নেতৃত্বে পাকিস্তানে বিরোধীদলের গোড়াপত্তন করিতে উৎসাহিত হইয়া উঠেন। ১১৯৫১ সালের মার্চ মাসে পাঞ্জাবের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে পাঞ্জাবের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী খান ইফতেখার হোসেন খান (মামদোতের নওয়াব, যিনি ইতিপূর্বে জিন্নাহ মুসলিম লীগ গঠন করেন) যৌথভাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হইবার ইচ্ছায় সোহরাওয়ার্দীর সহিত জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ পাঞ্জাবের সাধারণ নির্বাচনে ১৯৭টি আসনের মধ্যে ৩২টি আসন দখল করে। ১৯৫১ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে সীমান্ত প্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী খান আবদুল কাইয়ুম খানের অকথ্য নির্যাতন সত্ত্বেও বিরোধী দল ৯৭টি আসনের মধ্যে ৪টি আসন ও ১৯৫৩ সালে সিন্ধু প্রদেশের সাধারণ নির্বাচনে বিরোধী ঐক্যফ্রন্ট ৪০টি আসনের মধ্যে ৭টি আসন দখল করে। এইভাবে ধীরে ধীরে স্বৈরাচারী শাসকচক্রের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করিয়া সরকার বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনীতি প্রসার লাভ করে।

মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পরিচালিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, সীমান্ত প্রদেশে মানকী শরীফের পীরের নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী মুসলিম লীগ ও সোহরাওয়ার্দী-মামদোত পরিচালিত জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ সংগঠনগুলির বক্তব্য ও ম্যানিফেস্টোর মধ্যে মিলের চাইতে গরমিলই ছিল অত্যাধিক এবং কোন কোন বিষয় ছিল পরস্পর বিরোধী। জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ছিলেন আস্থাশীল। তিনি উপরে বর্ণিত সরকার বিরোধী রাজনৈতিক সহযাত্রীদলগুলির মধ্যে সক্রিয় যোগসূত্র ছিলেন।

১৯৫৩ সালে নিখিল পাকিস্তান সাংগঠনিক রূপদানের উদ্দেশ্যে লাহোরে জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের এক প্রতিনিধি দল সম্মেলনে যোগদান করে। নীতিগত প্রশ্নে মতভেদ প্রকট

আকার ধারণ করিলে জিন্নাহ মুসলিম লীগের সংগঠক পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মামদোতের নওয়াব ইফতেখার হোসেন খানকে বহিষ্কার করা হয় এবং জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের আহবায়ক নিযুক্ত হন।

১৯৫১ সালের মার্চ মাসে মেজর জেনারেল আকবর খান নিয়মতান্ত্রিক সরকার উৎখাতের যে বীজ বপণ করেন ও প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান ক্ষমতার দাপটে বিরোধী দলীয় নেতৃবর্গের প্রতি অসহিষ্ণুতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তাহাই ক্রমশঃ পল্লবিত হইয়া উঠে। জনসাধারণকে ক্ষমতা লাভের নিয়ামক শক্তি না ধরিয়া চক্রান্তের চোরাগোপ্তা গলি ও পন্থাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের একমাত্র অবলম্বনে পরিণত করে। ইহারই ফলশ্রুতি হইল ১৯৫১ সালের ১৬ই অক্টোবর সামরিক বাহিনীর সদর দফতর রাওয়ালপিন্ডি ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ভাষণদানকালে প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খানের প্রকাশ্য দিবালোকে আততায়ীর গুলীতে শাহাদৎ বরণ, অথচ পাকিস্তান রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া দুই টুকরা হওয়ার পরও এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের হোতাদের কোন প্রকার বিচার হয় নাই। ক্ষমতাসীন চক্রের এমন সততা ও সাহস ছিল না যে, লিয়াকত হত্যা তদন্ত রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করে। পর্দার অন্তরালে লুক্কায়িত নাটকের অভিনেতাদের বিচার কল্পনাই ছিল অলীক স্বপ্নবৎ। তাই বেগম রানা লিয়াকত আলীর পুনঃপুনঃ প্রকাশ্য দাবী সত্ত্বেও পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন চক্র উহার প্রতি কোনপ্রকার কর্ণপাতই করে নাই। অনেকের ধারণা, লিয়াকত আলী খানকে হত্যার অন্তরালে উচ্চাভিলাষী পাঞ্জাবী প্রাসাদ কুচক্রীদলই দায়ী। লিয়াকত হত্যার পর পাঞ্জাব নিবাসী আমলা প্রতিনিধি গোলাম মোহাম্মদ ও সরকারী চাকুরে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী যথাক্রমে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ও অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হন। পূর্ববঙ্গের খাজা নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হইলেন বটে, তবে তিনি পাঞ্জাবী চক্রের পুতুলবিশেষ ছিলেন। লিয়াকত হত্যার ষড়যন্ত্র এত নিখুঁত ছিল যে, আততায়ী আকবর খানকে অকুস্থলেই পরিকল্পনা মোতাবেক ধরাধাম হইতে বিদায় দেওয়া হয়। কারণ আততায়ীর স্বীকারোক্তিতে ষড়যন্ত্রকারীদের গর্হিত চেহারা জনসমক্ষে প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারিত। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, ইহা সামরিক বেসামরিক উচ্চ শাসকমহলের সংঘবদ্ধ জঘন্য চক্রান্তের ফল। অতঃপর প্রাসাদ চক্রান্তই ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতাচ্যুতির চাবিকাঠিতে পর্যবসিত হয় এবং জনগণ পরিণত হয় নেপথ্য শক্তিতে। সরকার পরিবর্তনে জনগণের সার্বভৌমত্ব কার্যতঃ অস্বীকৃত হওয়ায় যুবসমাজের প্রতিটি সরকারী অত্যাচার, নির্যাতন খাদ্য সংকট, লবণ সংকট, বেকার সমস্যা ইত্যাদির বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গড়িয়া তোলা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। সংগ্রামের সংকটময় মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের অধিকাংশ নেতার আন্দোলন বিরোধী মনোভাব সংগ্রামী যুব সমাজকে হতাশ ও নিরাশ করে। তাই নির্যাতন ও দুর্বল নেতৃত্বের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সংগ্রামী যুব কর্মীদিগকে ঐক্যবদ্ধ করিবার অপরিহার্য প্রয়োজনেই পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগকে ব্যাপকভাবে সংগঠিত করিতে হয়। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সংকটময় মুহূর্তে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের দুর্বলচেতা সদস্যরা যখন নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির দোহাই দিয়া সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণে পশ্চাদপসরণ করে, তখন পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের নেতা ও কর্মীরাই সরকারী হামলার বিরুদ্ধে জীবন বাজী

রাখিয়া সফল নেতৃত্ব দান করেন এবং সংগ্রামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজন করেন।

নাজিমুদ্দিনের বিশ্বাসঘাতকতা

১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারী অপরাহ্নে ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হইবে। তিনি আরো বলেন, পরীক্ষামূলক একুশটি কেন্দ্রে বাংলাভাষাকে আরবী হরফে লিখার প্রচেষ্টা সফল হইয়াছে ও জনগণ স্বীয় উদ্যোগে নতুন কেন্দ্র খুলিতেছে।

ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের নিকট নতি স্বীকার করিয়া ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ তদানীন্তন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তি বেমালুম ভুলিয়া গিয়া প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন জনসভায় উপরোক্ত উক্তি করেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে জিয়াইয়া রাখিবার কারণে ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের কতিপয় উৎসাহী সংগ্রামী ছাত্র এক কর্মীসভা আহবান করে। এই সভায় যুবলীগের প্রাক্তন যুগ্ম সম্পাদক জনাব আবদুল মতিনকে আহবায়ক নির্বাচিত করিয়া "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" বা "Dacca University State Language Committee of Action" গঠন করা হয়। সংগ্রামে যখন ভাটা পড়ে তখন এইভাবেই গুটিকয়েক সচেতন মন অগ্রগামীর ভূমিকা গ্রহণ করে। জনাব মতিন একটি ইংরেজী স্মারকলিপি তৈয়ার করেন এবং উক্ত স্মারকলিপি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনসহ পাকিস্তান গণপরিষদের সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করেন।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ১৯৫১ সালের ১১ই এপ্রিল এই স্মারকলিপিটি পাকিস্তান গণপরিষদের সকল সদস্যদের কাছে ও পাকিস্তানের সকল দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় পাঠাইয়াছিল।]

To ....

Member, Constituent Assembly
Karachi, Pakistan.

Sir,

We, the students of Dhaka University, who initiated the language movement in East Bengal three years ago, who are now more determined than ever to secure for Bengali the status of state language of Pakistan, will take this opportunity, while you are all assembled at Karachi, to press once more our legitimate claim.

The movement is going to be pretty old and it is unfortunate that while our whole energy should be harnessed in nation building activities, the Central Government in refusing to accept Bengali as a prospective

state language has created distrust and apprehension in the minds of the Majority of Pakistani People.

The apprehension is legitimate and until and unless it is removed it is sure to alienate a people without whose whole-hearted co-operation the dreams of unity and solidarity will never materialise.

Out of the Principle of self-determination came Pakistan and the young state is still struggling to achieve freedom in the real sense of the term. To be completely free, materially and intellectually, a long way is still to be traversed and as one of its first obstacls the formidable weight of English language is to be lifted to make room for languages of the people. No free people can afford to neglect its mother tongue which alone is efficient to help develop the intellectual faculties inherent in every man. The domination of an alien language is the worst kind of domination and most efficient to keep a people servile; and the British knew this when they ousted Persian and introduced English in the early part of the nineteenth century.

In the early months of independence the official circles in Karachi were talking of Urdu in terms of the future state language of Pakistan. People in this wing of Pakistan were scandalised when they found how completely the Centre forgot about Bengali. There rose an immediate uproar of protest from the nooks and corners of East Bengal in schools and colleges, in the Press and the University. The whole Province rose in protest against the highhanded decision. There were meetings; students paraded the streets and went to the jails. Every conceivable means was adopted by the Government to terrorise the youths of East Bengal and still the battle was half won when Khawja Nazimuddin, the then Chief Minister of the Province had to stop and assure the people that so far as the Province was concerned Bengali was to be the official language and the medium of instruction; and he also promised that his Governnment will put the case of Bengali in the Centre so that it may have its place side by side with Urdu.

The Central Government is still to declare its policy clearly and categorically. It will be committing the greatest mistake if, in selecting the state language, it goes against the principles of democracy.

When the state has only one language the problem is simple. When it has many, the question of preference arises. If the language spoken by the majority is also sufficiently developed and has a good literature it can without hesitation be accepted as the state language. If the linguistic, minorities are clamorous we have several state languages, as in Canada and Switzerland.

In the case of Pakistan the obvious choice is of course Bengali. It is the language of the majority (56%) of pakistan's population are Bengali speaking) and it is the richest language not only of Pakistan but of the whole of Indo pakistan sub-continent. It has a history over thousand years old and it has a wonderful vitality to develop and abserb foreign influence. In the last hundred years its development has been phenomenal and it draws its nourishment from the sap of the soil. Not only that, it has its intricate roots of connection with Sanskrit, Hindustani, Urdu and persian. It is also the language which has most completely absorbed the spirit of Western literature. Basically eastern in or in origin, it is of all the languages of the sub-continent the most modern and western in outlook.

Urdu, which is being favoured by Centre, perhaps because some of the important men in the Ministry and in the Secretariate happen to be Urdu speaking, offers a poor contrast to Bengali. It is not the mother tonque of any of the provinces of pakistan and is equally alien to Bengalee, Punjabi, Sindi, Baluch and Frontier men. Urdu is a symbol of dying culture. It has hardly any foothold and it is doubtful whether it could survive without princely patronages. Even Iqbal, the dreamer of Pakistan and the great Urdu poet of the century found it inadequate for his difficult thoughts. In writing his great philosophical poem "Asrar-i-Khudi" he had to discard Urdu in favour of Persian and he frankly admits.

Because of the loftiness of my thought
Persian alone is suitable to them.
(Secrets of the Self. P. 15. lines 183-184).

Such a language whose efficacy as the state language is very much doubted from political and linguistic points of view and which presents formidable obstacles in the way of printing cannot be the state language of Pakistan.

Several points are urged in favour of Urdu from interested quarters. It is claimed to be an Islamic language. We refuse to believe that any language under heaven can be Islamic or Christian or Heathen. If Urdu is Islamic, Benglai is equally so. Nay, it is more Islamic as a larger number of Muslims speak Bengali. Secondly, Urdu is urged to be the uniting factor between the different provinces of Pakistan. If this is to mean that Urdu can serve as the lingua franca between the multilingual provinces then nothing could be more absurd as it is equally foreign to all the parts of Pakistan. A lingua franca is always a natural historical growth; it is never the artificial creation of a government.

Thus neither as an Islamic language which is absurd nor as the lingua franca which is fictitious, can Urdu claim to be the state language of Pakistan.

In spite of all this if Urdu is accepted as the only state language, it is sure to give rise to serious problems. (1) It will create privileged class in the same way as English did because it will not be possible for the vast majority who do not speak Urdu to master it overnight. This will facilitate the way of exploitation of the many by the few. (2) It will nourish disaffection among Pakistanis in general and Bengalees in particular, and it will strike at the root of national integrity without which there is no future for our country. Third and lastly the material and intellectual development which all go to enrich the national culture will be jeopardised. A people must learn and think in its own language. To deny one one's natural language is to deny everything. And to rob a people of its language is to render freedom a myth.

Lastly, we have only to repeat what we have made clear time and again. If Pakistan is to have only one state language it must be Bengali, if more than one, Bengali must be one of them. We are at a loss how this simple logic fails to penetrate the brains of our leaders. There must be some thing worng somewhere. Otherwise this unjust and step motherly attitude of the Centre towards the Province of the golden fibre is difficult to explain.

The dreamers of Karachi deaf to the groan of the straving primary school teachers of East Bengal are squandering thousands of rupees over

Arabic Centres in the province. They are lending every possible support to Urdu with the fond hope that someday it will replace English and are playing the mischievous game of imposing Arabic script over Bengali. We the students of Dhaka University, claiming the immediate implementation of the provincial policy in the matter of language and demanding Bengali to be the state language of Pakistan have given a tough fight and are prepared to fight to the last. We shall never accept Urdu as the only state language. We are sworn to expose the great conspiracy which aims at reducing East Bengal to the state of a colony.

We remind them and the peoples representatives who are at the helm of the affairs that until and unless the claim of Bengali is fully established in the province as well as in the Centre, the students of Dhaka University shall not rest.

Sd./M.A. Matin

Date 11th April, 1951

Convernor, Dhaka University
State Language Committee of Action

স্মারকলিপির উত্তরেই বোধহয় প্রমানমন্ত্রী ঢাকার পল্টন ময়দানের সভায় উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের সংকল্প ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহাতে হিতে বিপরীত হইল। ইহার প্রতিবাদেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৩০শে জানুয়ারী ছাত্র ধর্মঘট ও সভা আহবান করে। ছাত্রসভায় ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরে ছাত্র ধর্মঘট, ছাত্রসভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৩০শে জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬টায় ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরীতে মজলুম নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অপর এক সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের সমবায়ে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়।

১। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ঃ সভাপতি, পুর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ
২। জনাব আবুল হাশিম ঃ খেলাফতে রাব্বানী পার্টি
৩। জনাব শামসুল হক ঃ সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ
৪। জনাব আবদুল গফুর ঃ সম্পাদক, সাপ্তাহিক সৈনিক
৫। অধ্যাপক আবুল কাসেম ঃ তমদ্দুন মজলিশ
৬। জনাব আতাউর রহমান খান ঃ আওয়ামী মুসলিম লীগ
৭। জনাব কামরুদ্দিন আহমদ ঃ সভাপতি, লেবার ফেডারেশন
৮। জনাব খয়রাত হোসেন ঃ সদস্য, পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ

৯। আনেয়ারা খাতুন ঃ সদস্য, পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ
১০। জনাব আলমাস আলী ঃ নারাণগঞ্জ আওয়ামী মুসলিম লীগ
১১। জনাব আবদুল আওয়াল ঃ নারাণগঞ্জ আওয়ামী মুসলিম লীগ
১২। সৈয়দ আবদুর রহিম ঃ সভাপতি, রিকশা ইউনিয়ন
১৩। জনাব মোঃ তোয়াহা ঃ সহ-সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ
১৪। জনাব অলি আহাদ ঃ সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ
১৫। জনাব শামসুল হক চৌধুরী ঃ ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ
১৬। জনাব খালেক নেওয়াজ খান ঃ সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ
১৭। জনাব কাজী গোলাম মাহবুব ঃ আহবায়ক, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ
১৮। জনাব মীর্জা গোলাম হাফিজ ঃ সিভিল লিবার্টি কমিটি
১৯। জনাব মজিবুল হক ঃ সহ-সভাপতি, সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদ
২০। জনাব হেদায়েত হোসেন চৌধুরীঃ সাধারণ সম্পাদক, সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদ
২১। জনাব শামসুল আলম ঃ সহ-সভাপতি, ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্র সংসদ
২২। জনাব আনোয়ারুল হক খান ঃ সাধারণ সম্পাদক, ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্র সংসদ
২৩। জনাব গোলাম মাওলা ঃ সহ-সভাপতি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদ
২৪। সৈয়দ নূরুল আলম ঃ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ
২৫। জনাব মোহাম্মদ নূরুল হুদা ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
২৬। জনাব শওকত আলী ঃ পূর্ববঙ্গ কর্মীশিবির, ১৫০ মোগলটুলী, ঢাকা
২৭। জনাব আবদুল মতিন ঃ আহবায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ
২৮। জনাব আখতার উদ্দিন আহমদঃ নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ

একুশে ফেব্রুয়ারী উদযাপনের সিদ্ধান্ত

বার লাইব্রেরীর এই সভাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা নগরে ছাত্র ধর্মঘট, সভা ও শোভাযাত্রার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান হয় এবং ২১শে ফেব্রুয়ারী পূর্ববঙ্গ আইন (ব্যবস্থাপক) পরিষদ অধিবেশন তারিখ বিধায় ২১শে ফেব্রুয়ারী সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী সাধারণ হরতাল, সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ কর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মোস্তফা রওশন আখতারের প্রস্তাবক্রমে যুবলীগ নেতা গাজীউল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়

কলা বিভাগ প্রাঙ্গনে এক বিরাট ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিদ্যায়তন হইতে ধর্মঘটী ছাত্ররা দলে দলে মিছিল সহকারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে জমায়েত হয়। উক্ত সভায় ২১ ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচী যথা হরতাল, সভা ও বিক্ষোভ-মিছিল সাফল্যমন্ডিত করিবার অঙ্গীকার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল কতিপয় রাজপথ পরিভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন ধ্বনিতে সংগ্রামের ডাক দেয় ও শপথ ঘোষণা করে।

৬ই ফেব্রুয়ারী পূর্ববঙ্গ কর্মীশিবির অফিস ১৫০ নং মোগলটুলীতে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনে ১১ ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরে পতাকা দিবস পালনের প্রস্তাব গ্রহণ করে ও জনসাধারণকে সাধ্যানুসারে অর্থ সাহায্য দ্বারা আন্দোলনের অগ্রযাত্রায় সহায়তা করিতে আহবান জানায়। সরকার যদি ১৪৪ ধারা ইত্যাদি নিষেধাজ্ঞা জারি করে, তাহা হইলে আইন ভঙ্গ করা হইবে কি হইবে না সভায় তাহাও আলোচিত হয়। বেশীর ভাগ উপস্থিত সদস্যই আইন ভঙ্গের বিরুদ্ধে মত জ্ঞাপন করেন। কিন্তু আমি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে দৃঢ় মত প্রকাশ করি।

বৃদ্ধ মওলানা ভাসানী সভাপতির আসন হইতে আমার বক্তব্যের সমর্থনে জোরালো ভাষায় ঘোষণা করিয়া বলেন, 'যেই সরকার আমাদের নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ গণ-আন্দোলনকে ইচ্ছাকৃতভাবে বানচাল করিবার জন্য অন্যায়ভাবে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই সরকার কর্তৃক জারিকৃত নিষেধাজ্ঞাকে মাথা নত করিয়া গ্রহণ করিবার অর্থ স্বৈরাচারের নিকট আত্মসমর্পণ।' যাহা হউক, কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ব্যতীতই সেই দিনকার মত সভা মূলতবী হইয়া যায়।

সরকার ২১শে ফেব্রুয়ারী পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন আহবান করিয়াছিল। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, আহূত বাজেট অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের তরফ হইতে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক এবং এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে যথাযথ চাপ সৃষ্টি করুক।

সরকারী ত্রাস ও সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক

এইভাবে ৩০শে জানুয়ারী, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী এবং ১১ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠান ও মিছিলের ফলে ঢাকার সাধারণ গণমানস সজাগ ও সচেতন হইয়া উঠে। অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছিল যে, বিভিন্ন মহল প্রতিরোধের সক্রিয় কর্মসূচীই সংগ্রাম কমিটির নিকট হইতে আশা করিতেছিল। জনমনে ত্রাস ও ভীতি সৃষ্টি করিবার চিরাচরিত পন্থাই সরকার গ্রহণ করিল। ২০শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে নূরুল আমিন সরকার ঢাকা শহরে এক মাস মেয়াদী ১৪৪ ধারা জারি করিয়া সভা ও শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ঐ তারিখেই সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের ৯৪নং নবাবপুর রোডস্থ অফিসে এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হয়। ইতিমধ্যে সরকারী ঘোষণায় বিভিন্ন হলের ছাত্রবৃন্দ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সলিমুল্লাহ

মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র এস,এ, বারী এটি নিজস্ব উদ্যোগে আহূত সলিমুল্লাহ মুসলিম হল বাসিন্দা ছাত্রদের এক বৈঠকে সরকার কর্তৃক ঘোষিত ১৪৪ ধারা জনিত নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অনুরূপ ভাবে ফজলুল হক মুসলিম হল ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সভাও ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে রায় প্রদান করে।

প্রসঙ্গতঃ এইস্থলে অগ্রজ প্রতীম জহুর হোসেন চৌধুরীর কয়েকটি সতর্কবাণী উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। জহুর ভাই আমার রাজনৈতিক জীবনকে বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্নভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছেন। সার্বক্ষণিক রাজনৈতিক কর্মীরাও রক্ত-মাংসের মানুষ। শত অভাব, অনটন, মিথ্যা, নিন্দা ও অপবাদের উর্ধ্বে উঠা তাহাদের পক্ষে সবসময় সম্ভব হয় না, হইলেও হৃদয়মন থাকে বেদনার্ত ও রক্তাপ্লুত। জহুর ভাই স্নেহাবিষ্ট পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া অগ্রযাত্রায় আমাকে সবসময় উৎসাহিত করিতেন বটে কিন্তু তাই বলিয়া নীতির প্রশ্নে তিনি নির্মম কঠোর ভাষা ব্যবহার করিতেও সামানতম দ্বিধা করিতেন না। যেহেতু তিনি মুসলিম লীগ সরকারের বাংলা মুখপত্র দৈনিক সংবাদের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন, সেহেতু সরকারী উচ্চ মহলে তাহার আনাগোনা ও উঠাবসা ছিল অবাধ। এই সুবাদেই ২১শে ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচীর প্রতি সরকারী মহলের কঠোর মনোভাব তিনি অবগত ছিলেন। ২১শে ফেব্রুয়ারী যতই নিকটবর্তী হইতেছিল, জহুর ভাই ততই আমাকে আইন ভঙ্গ করিবার চিন্তা পরিহার করিবার জন্য চাপ দিতেছিলেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী তাঁহার বাসভবনে আলোচনাকালে তিনি আমাকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলেন যে, তাঁহার খবর অনুযায়ী আন্দোলন দমন করিতে সরকার প্রয়োজনবোধে সৈন্য বাহিনী তলব ও ট্যাঙ্ক ব্যবহার করিতে পারে। আমি তাঁহাকে বিনয়ের সহিত উত্তর দিয়াছিলাম Better dead than slave অর্থাৎ 'দাসত্বের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়।' কেননা নিরস্ত্র সংঘবদ্ধ গণশক্তির বিরুদ্ধে সরকারী দমনমূলক ব্যবস্থা পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। ইহাই ইতিহাস। উল্লেখ্য যে, জহুর ভাই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। তাঁহার আশংকা ছিল যে, ২১শে ফেব্রুয়ারী আন্দোলন দমনের উছিলায় সরকারী নিমর্ম আঘাত হয়তো গণতান্ত্রিক শক্তিকেই নির্মুল করিয়া ফেলিবে এবং অদূর ভবিষ্যতে আর কোন সরকার বিরোধী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে পারিবে না।

উল্লিখিত সম্ভাব্য সংঘর্ষের পটভূমিকায় ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ সদর দফতরে (৯৪ নবাবপুর রোড) সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক বসে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব আবুল হাশিম। বৈঠকে মওলানা ভাসানীর উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরী ছিল। পূর্বাহ্নে আমি তাঁহাকে ২০ ও ২১শে ফেব্রুয়ারীর মফঃস্বল সফরসূচী বাতিল করিতে অনুরোধ করি এবং সম্ভাব্য জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করিবার জন্য তাহার ঢাকা উপস্থিতি অপরিহার্য বলিয়া জানাই। কিন্তু মওলানা ভাসানী তাহার সফরসূচী বাতিল না করায় এবং জনাব আতাউর রহমান খান আইন ব্যবসার প্রয়োজনে ময়মনসিংহ কোর্টে মক্কেলের মামলা পরিচালনায় ব্যাপৃত থাকায় উভয়ই ২০ ও ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় অনুপস্থিত ছিলেন।

যাহা হউক, উক্ত সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তাহাদের সহযোগী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, খেলাফতে রব্বানী পার্টি, পাকিস্তান

তমদ্দুন মজলিস, সরকার সমর্থক বিভিন্ন হল ছাত্র সংসদের প্রতিনিধিবর্গ প্রায় সবাই ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেন। সভায় তাহাদের পক্ষ হইতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হক নিম্নোক্ত যুক্তির অবতারণা করেনঃ

প্রথমঃ আওয়ামী মুসলিম লীগ নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করে, দ্বিতীয়তঃ গোলযোগের সুযোগ গ্রহণ করিয়া সরকার প্রস্তাবিত সাধারণ নির্বাচন অনিশ্চয়তার গর্ভে নিক্ষেপ করিবে, এবং তৃতীয়তঃ রাষ্ট্র বিরোধী ও ধ্বংসাত্মক শক্তি মাথাচাড়া দিয়া উঠিবে।

সভাপতির অনুমতিক্রমে আমি আমার বক্তব্য পেশ করিতে উঠি। বক্তৃতাকালে জনাব শামসুল হকের বর্ণিত যুক্তিগুলির প্রয়োজনীয় অংশের উত্তর দানের পর বলিলাম, "১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে জনাব শামসুল হককে সদস্য হিসেবে কর্তব্য পালনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। তাঁহার সদস্যপদ চক্রান্ত করিয়া খারিজ ঘোষণা করা হইয়াছে। এমন কি টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে পরাজিত হইবার পর মুসলিলীগ সরকার অদ্যাবধি আর কোন উপনির্বাচন দেয় নাই। শুধু তাই নয়, বিনা অজুহাতে আমাদের পুনঃপুনঃ ঘোষিত শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে বানচাল করিবার অসুদুদ্দেশ্যেই সরকার ১৪৪ ধারা জারি করিয়াছে। অতএব ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া সরকারকে সমুচিত জবাব দিব। Come what may যাহা হয় হইবে। ইহাতে দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ নাই। এইবার যদি সরকারের জালিম ও হটকারী মনোভাব রুখিতে না পারি, তবে ভবিষ্যতে সামান্যতম প্রতিবাদও করিতে পারিব না। গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৫১ সালের মার্চ মাসেও সরকার ১৪৪ ধারা জারি করিয়া ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরী হলে যুব সম্মেলনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছিল। এই মুহূর্তে সম্মিলিত গণশক্তি যদি সরকারের অন্যায় আদেশ প্রতিরোধ করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে আর কখনো প্রতিরোধ করিতে পারিবে না সুতরাং "Now or Never".

উল্লেখ্য যে, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা স্বীয় মত জ্ঞাপনকালে আমার মতের প্রতিধ্বনি না করিয়া ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। রাত প্রায় ১টা ৩০ মিনিটে জনাব শামসুল হক সংগ্রাম পরিষদের এই সভায় বিবেচনার জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাব পেশ করেনঃ

"Resolved that in view of the promulgation of the section 144 cr, p.c. the programmes of the 21st February are with drawn & if any member of the all party committee of Action for State Language defies the decision, the committee will ipso facto stand dissolved.

উপরোক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আমি তৎক্ষণাৎ উচ্চস্বরে 'No', 'No' অর্থাৎ 'না' 'না' বলিয়া প্রতিবাদ করিলাম। প্রস্তাবের পক্ষে বিপক্ষে ভোট গ্রহণ করা হইলে আমার সহিত সর্বজনাব শামসুল আলম, সহ-সভাপতি, ফজলুল হক মুসলিম হল, আবদুল মতিন, আহবায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ, গোলাম মাওলা, সহ-সভাপতি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদ প্রস্তাবের বিপক্ষে অর্থাৎ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে ভোট দান করেন।

ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

পূর্বাহ্নে বর্ণিত ফজলুল হক হল ছাত্রসভা, সলিমুল্লাহ হল ছাত্রসভা ও মেডিকেল কলেজ ছাত্র সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে গৃহীত সিদ্ধান্ত ফজলুল হক হলের ছাত্র আবদুল মমিন ও মেডিকেল কলেজের ছাত্র জনাব এম,এ, আজমল আমাকে সভা চলাকালেই সভাকক্ষের বাহিরে ডাকিয়া জ্ঞাত করান এবং আমি বিশ্বস্ততার সহিত তাহাদের দেয় বার্তা সভার সদস্যবৃন্দের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করি। মেডিকেল কলেজের ছাত্র জনাব আজমল হোসেনই ২১শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ হইতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত প্রথম দলটির নেতৃত্ব দান করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় সদর দরজা সংলগ্ন পূর্বদিকস্থ রাজপথে অপেক্ষমান পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হন। এইভাবে জনাব আজমল হোসেন ২১শে ফেব্রুয়ারীর অবিস্মরণীয় ইতিহাস রচনার প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ সভায় মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের বিদ্রোহাত্মক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্তর্নিহিত গুরুদায়িত্বের প্রতি স্বীয় সচেতনতা, পরিচ্ছন্ন আন্তরিকতা ও সততার স্বাক্ষর রাখেন। ভুল ও মিথ্যা ইতিহাস বর্ণনার ফাঁদে তিনি আজ হারাইয়া গিয়াছেন, যদিও বাস্তবে একুশের ইতিহাস রচনাকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। এই রূঢ় সত্য একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী ও আন্দোলনে সর্বক্ষণ প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীর পক্ষেই লিপিবদ্ধ করা সম্ভব। অপরের জবানী বা বয়ান হইতে শুনিয়া এবং অনুমানকে অবলম্বন করিয়া ইতিহাস রচনার প্রয়াস অন্ধের হস্তী দর্শনের ন্যায়।

যাহা হউক, সভশেষে সভাকক্ষ হইতে বিমর্ষ মনে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই নবাবপুর রোডে জগন্নাথ কলেজের ছাত্র ও যুবলীগ কর্মী নিয়ামুল বশীরের সহিত সাক্ষাত হয়। নিয়ামুল ও তাহার সংগীগণ আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদিগকে খুবই সুশৃঙ্খলভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারী ভোর বেলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগ প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইতে নিদের্শ দিলাম। গভীর রাত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক ও অনাবাসিক যুবলীগ কর্মীবৃন্দ সদর দফতর ৪৩/১, যোগীনগরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইতিমধ্যে ঢাকার বিভিন্ন এলাকার নির্ভীক স্থির-প্রতিজ্ঞ দৃঢ়চেতা তরুণ যুবলীগ কর্মীবৃন্দ আলোচনায় যোগ দেন। তাঁহারা আসিয়াছেন, যুবলীগের নির্দেশ জানিতে, তাঁহারা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্তে মর্মাহত ও বিক্ষুব্ধ। তাঁহাদের সহিত আলোচনায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী গ্রহণ করি। বস্তুতঃই সাহসী, অকুতোভয়, সরলপ্রাণ যুবলীগ কর্মীরাই ২১শে ফেব্রুয়ারীর অগ্নিপরীক্ষায় স্বীয় জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ১৪৪ ধারা জনিত নিষেধাজ্ঞাকে ভঙ্গ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সেই দিনকার চরম সন্ধিক্ষণে যুবলীগ কর্মীদের এই নিঃস্বার্থ কর্মধারা ও নির্ভুল নেতৃত্বই পূর্ব পাকিস্তান তথা পাকিস্তানের রাজনীতির আমুল পরিবর্তনের সূচনা করে। ইহাই ছিল পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এবং দৃঢ় ভিত্তিপ্রস্তর।

শেখ মুজিবর রহমান ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক ছিলেন। চিকিৎসার কারণে সরকার তাঁহাকে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা মেডিকেল

কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। প্রহরী পুলিশের ইচ্ছাকৃত নির্লিপ্ততার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমরা তাঁহার সহিত হাসপাতালেই কয়েক দফা দেখা করি। তিনি ও নিরাপত্তা বন্দী মহিউদ্দিন আহমদ ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে মুক্তির দাবীতে অনশন ধর্মঘট করিবেন, সেই কথা শেখ সাহেবই আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন। উল্লেখ্য যে, বরিশাল জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক জনাব মহিউদ্দিন আহমদ পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগ নেতা হামিদুল হক চৌধুরী সাহেবের গ্রুপভুক্ত ছিলেন। তাহা ছাড়াও ছিলেন ১৯৫০ সালে বরিশালে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অন্যতম প্রধান অংশগ্রহণকারী বলিয়া পরিচিত। এই কারণে আমি তাঁহার প্রতি কোন প্রকার সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছিলাম। তবে আমরা নীতিগতভাবে যে কাহাকেও বিনা বিচারে আটক রাখার বিরোধী ছিলাম। তাই জনাব মহিউদ্দিনের মুক্তি দাবী জানাইতে আমরা সম্মত হই। ১৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার হইতে শেখ মুজিবর রহমানকে ফরিদপুর জেলা কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এই ১৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার হইতে ফরিদপুর যাওয়ার পথে নারায়ণগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে নারায়ণগঞ্জ নেতৃবৃন্দের সহিত শেখ মুজিবুর রহমানের সাক্ষাৎ ঘটে। কথোপকথনকালে তিনি যুবলীগ নেতৃদ্বয় জনাব শামসুজ্জোহা ও শফি হোসেন খানকে জানান যে, পথিমধ্যে স্টীমারেই ১৫ই ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত ১২টার পর নিজ মুক্তির দাবীতে তিনি আমরণ অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করিবেন। এই অনশন ধর্মঘট এবং আমাদের আন্দোলনের ফলেই সরকার ১৯শে ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবর রহমানকে কারামুক্তি দেয়। উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে ফরিদপুর কারাগার হইতে তাঁহাকে গোপালগঞ্জ জেলে স্থানান্তরিত করা হয় এবং ২৬শে ফেব্রুয়ারী '৫২ কারামুক্তির পর তিনি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়াতেই অবস্থান করিতেছিলেন।

২১শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনা

২১শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৯টার মধ্যে আমি বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন প্রাঙ্গনে যাই। আমার উপস্থিতিতে বিক্ষুব্ধ সাধারণ ছাত্র কর্মীবৃন্দ বিশেষতঃ যুবলীগ নেতা ও কর্মীরা দ্বিগুণ উদ্যমে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ফজলুল হক হলের পুকুর পাড়ে অনুষ্ঠিত ২০ তারিখ রাত্রির বৈঠকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল এম,আর, অতাখতার মুকুল সেইকথা আমাকে জানান। এই সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা হইলেনঃ ১। গাজীউল হক (বিশিষ্ট আইনজীবী), ২। হাবিবুর রহমান শেলী (বিচারপতি) ৩। মোহাম্মদ সুলতান (বামপন্থী নেতা, মরহুম) ৪। এম, আর, আখতার মুকুল (লেখক), ৫। জিল্লুর রহমান (আওয়ামী লীগ নেতা), ৬। আবদুল মোমিন (আওয়ামী লীগ সরকারের খাদ্যমন্ত্রী), ৭। এস,এ, বারী এ টি (বিএনপি সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী, মরহুম), ৮। সৈয়দ কমরুদ্দীন শহুদ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক), ৯। আনোয়ারুল হক খান (মুজিব নগর সরকারের তথ্য সচিব), ১০। মঞ্জুর হোসেন (ডাক্তার, মরহুম), ১১। আনোয়ার হোসেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা কাজী গোলাম মাহবুব এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে প্রবল ছাত্রমত

তাঁহাদিগকে হতাশাগ্রস্ত করিয়া ফেলে। পরিষদের আহবায়ক কাজী গোলাম মাহবুব ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিব কিনা, আমার নিকট জানিতে চাহিলে আমি বলিলাম, "উহা সাধারণ ছাত্রসভায় স্থির হইবে।" এই কথা বলিবার পর তাহাকে কোনপ্রকার বচসা বা বাক-বিতন্ডার সুযোগ না দিয়াই আমি দ্রুত অন্যদিকে চলিয়া যাই। কারণ, ২০শে ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত্রির সংগ্রাম পরিষদ সভায় কাজী গোলাম মাহবুব ও আমি পরস্পর বিরোধী বক্তব্য রাখিয়াছিলাম। অর্থাৎ কাজী গোলাম মাহবুব ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে দৃঢ়মত প্রকাশ করিয়াছিলেন আর আমি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে স্পষ্ট বক্তব্য পেশ করি।

ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, আর্টস ফ্যাকালটির ডীন ডঃ জুবেরী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ নিউম্যানকে লইয়া ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আগমন করিলে ছাত্ররা ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবকে ছাত্রসভায় সভাপতিত্ব করিতে অনুরোধ জানায়। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিবে না শর্তে তিনি সভাপতিত্ব করিতে সম্মত আছেন বলিয়া জানান। সাধারণ ছাত্রবৃন্দ বিনয়ের সহিত তাঁহার শর্ত গ্রহণ করিতে অসম্মতি জানায়।

যুবলীগ নেতা এম, আর আখতার (মুকুল) এর প্রস্তাবক্রমে ও যুবলীগ কর্মী কমরউদ্দীন শহুদের সমর্থনে যুবলীগ নেতা জনাব গাজীউল হকের সভাপতিত্বে বেলা ১২টার দিকে সাধারণ ছাত্রসভা শুরু হয়। পরিতাপের বিষয়, ২১শে ফেব্রুয়ারীর পর আন্দোলনের দুর্যোগময় দিনগুলিতে এম,আর, আখতার মুকুল গা ঢাকা দিয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, ২৭শে ফেব্রুয়ারী তিনি কলিকাতায় পাড়ি জমান। যাহা হউক, সভা চলাকালীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হক সভায় উপস্থিত হন। তিনি এবং জনাব মোঃ তোয়াহা উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অর্থাৎ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করিতে ছাত্র সাধারণের প্রতি আহবান জানান। সংগ্রাম পরিষষদের আহবায়ক কাজী গোলাম মাহবুব ও ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক খালেক নেওয়াজ খানও বক্তৃতায় অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেন। এই সময়ে আমি সভা হইতে কয়েক গজ দূরে অবস্থিত মধুর ক্যান্টিনে বসা ছিলাম। সংগ্রামী কর্মীরা বক্তৃতা করিয়া পাল্টা শক্ত জবাব দিবার অনুরোধ জানাইলে আমি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলি যে, আমি ১৪৪ ধারা ভাঙ্গিতে চাই। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও চাই যে, সংগ্রাম পরিষদ অটুট থাকুক। এই মুহূর্তে আমি কোন বিতন্ডা চাই না। তাহাছাড়া আগামী দিনের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনার স্বার্থেই আমার পক্ষে প্রকাশ্য সভায় সংগ্রাম কমিটির প্রতি কোন প্রকার প্রকাশ্য অনাস্থা দেখানো ভুল হইবে। পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমান করে যে, আমার এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল ছিল। উল্লেখ্য যে, এই সভাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক আবদুল মতিন প্রত্যয়ব্যঞ্জক দৃঢ়তার সহিত তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "জালেম সরকারের নিষেধাজ্ঞা ১৪৪ ধারাকে প্রতিরোধ করা না হইলে, অনাগত দিনে ন্যুনতম গণতান্ত্রিক অধিকারও অবশিষ্ট থাকিবে না।" সভায় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সীদ্ধান্তের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করিয়া সংগ্রাম পরিষদকে লুপ্ত ঘোষণা পূর্বক ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অতঃপর ৬জন, ৮জন ও ১০ জনের ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠা করিবার দৃঢ় সংকল্পে স্বেচ্ছায়

রাজপথে অপেক্ষমান পুলিশ বাহিনীর হস্তে গ্রেফতার হইবার জন্য ভীতিহীনচিত্তে অগ্রসর হইতে থাকে। আত্মপ্রত্যয় উজ্জীবিত যুব সমাজের শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল আইন ভঙ্গ আন্দোলনে পুলিশ বাহিনী হতচকিত হইয়া পড়ে। কিন্তু তাই বলিয়া সরকারী গোয়েন্দা বিভাগ কর্তৃক নিয়োজিত নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী উস্কানিদাতাদের উপস্থিতি যে ছিল না, তাহা নহে। শান্তিপূর্ণ মিছিলকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিবার অপপ্রয়াসে এই উস্কানিদাতাদল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন হইতে পুলিশ বাহিনীর উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করিতে শুরু করিয়া দেয়। জবাবে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জমায়েত ছাত্রদের উপর কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অল্পক্ষণের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের শান্ত-সুশৃঙ্খল আবহাওয়া উত্তপ্ত হইয়া উঠে। স্বাভাবিক কারণেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে ছাত্র সাধারণের ধমনীতে। উত্তেজনার এই মুহূর্তেই রাওলাট এ্যাক্টের (১৯১৯) বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত সর্বভারতীয় অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের বিভিন্ন লোমহর্ষক ও রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী আমার মনের দিগন্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দেহ মনে এক অপূর্ব নৈতিক সাহস ও আত্মপ্রত্যয় সঞ্চারিত হইল। কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেন ন্যায় ও সত্যের এই লড়াইয়ের দুর্গম ও বন্ধুর পথে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখিবার উৎসাহ ও উদ্যম জোগাইল। উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনিবার অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতেই অবশেষে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রবেশ করে। পুলিশী হামলার মুখে ছাত্র সাধারণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল হোস্টেলের প্রধান ফটকের নিকট আবার জমায়েত হই এবং সেখান হইতেই পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ ভবনগামী পরিষদ সদস্যদের উদ্দেশ্যে আমাদের দাবী পেশ করিতে থাকি। ইহা ছিল ১৪৪ ধারা জনিত নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আমাদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের অংশ। উল্লেখ্য যে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল তখনকার পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ ভবনের (জগন্নাথ হল মিলনায়তন) অতি সন্নিকটে বর্তমান শহীদ মিনার সংলগ্ন পিছনের বিস্তৃত এলাকায় অবস্থিত ছিল। মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের প্রধান ফটকে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে একজন ছাত্রকর্মীর মারফত জানিলাম যে, ছাত্রসভার সভাপতি জনাব গাজীউল হক কলা ভবনের দ্বিতলে হঠাৎ করিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাকে দেখিতে যাওয়া প্রয়োজন। আমি কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। তাঁহাকে সাহস হারাইতে মানা করিলাম। বলিলাম, আপনি এখন সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়া মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে আসুন। এই বলিয়া আমি মেডিকেল কলেজ হোস্টেল চলিয়া আসি। সেই চরম সংকটাপন্ন সময়ে তাঁহার অনুপস্থিতি আমাকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার উপস্থিতি সংগ্রামের মুহূর্তে এত কাম্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি আন্দোলনে স্নায়ুকেন্দ্র মেডিকেল কলেজ হোস্টেল এলাকায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এমনকি, ৭ই মার্চ আমার গ্রেফতার হওয়া অবধি জনাব গাজীউল হকের সহিত আমাদের আর দেখা হয় নাই। হয়ত বা গোয়েন্দা পুলিশ বাহিনীর চোখে ধুলা দিয়া, পর্বতপ্রমাণ দুর্লংঘনীয় বাধা অতিক্রম করিয়া আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রে পৌছিবার সকল প্রচেষ্টাই তাঁহার ব্যর্থ হইয়াছিল।

এইদিকে পরিস্থিতির অবনতি ঘটিতে থাকে। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ও সংগ্রামী ছাত্র

বিক্ষোভকারীদের পারস্পরিক ইট-পাটকেল বর্ষণের ফলে অবস্থা ক্রমশঃ আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া যায়। এমনি ঘোলাটে পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় ধৈর্ষ, সহনশীলতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় না দিয়া জেলা প্রশাসক কোরাইশী গুলী চালাইবার নির্দেশ দেন। হোস্টেল গেট সংলগ্ন ১১নং ব্যারাকের পার্শ্বে অবস্থানরত রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের এম, এ, ক্লাসের ছাত্র আবুল বরকত বুলেটবিদ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হন। গুলীর আওয়াজে হতচকিত বিক্ষোভকারীরা সম্বিত ফিরিয়া পাইতে না পাইতেই আমরা সাদাশার্ট ও পায়জামা পরিহিত আবুল বরকতকে রক্তাপ্লুত ও ভুলুণ্ঠিত অবস্থায় দেখিতে পাই। তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া হাসপাতালের উত্তরদিকস্থ প্রবেশদ্বার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া হোস্টেল অভিমুখে রওয়ানা দিতেই দেখিতে পাই যে, সংগ্রামী বন্ধুরা আর একটি লাশ পাঁজাকোল করিয়া আনিতেছে। নিকটবর্তী হইয়া মাথার দিকের কাপড় তুলিতেই দেখিতে পাইলাম ছাত্র বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম,এ, ক্লাসের ছাত্র সালাহউদ্দীনের মাথার খুলি নাই। কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য! কেবলমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীর পক্ষেই এই দৃশ্য অনুভব করা সম্ভব। ইহার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আমার দুর্বল লেখনীর সাধ্যাতীত।

প্রতিক্রিয়া

পুলিশের গুলী শুরু হয় আনুমানিক তিন ঘটিকার পর। নিহত হন আবুল বরকত, সালাহউদ্দীন, জব্বার, শফিউর রহমান ও নাম না জানা আরও কয়েকজন। ছাত্র হত্যার খবর দাবানলের মত ছাড়াইয়া পড়ে। ঢাকা শহরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অফিস-আদালত এবং যানবাহন ধর্মঘটে নামিয়া আসে। পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সদস্য মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ মুলতবী প্রস্তাব আনয়ন করেন এবং জনাব খয়রাত হোসেন ও বেগম আনোয়ারা খাতুন উক্ত প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানান। গুলী চালনার স্বপক্ষে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন কর্তৃক সাফাই গাহিবার প্রতিবাদে মাওলানা তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, দৈনিক আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন, বেগম আনোয়ারা খাতুন ও কংগ্রেস দলীয় সদস্যবৃন্দ আইন পরিষদ অধিবেশন হইতে ওয়াক আউট করেন। মাওলানা তর্কবাগীশ পার্লামেন্টারী পার্টি হইতে পদত্যাগ করিয়া লীগ সদস্যদের মধ্যে প্রথম বিরোধী দল গঠন করেন, আজাদ সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন প্রথমতঃ পার্লামেন্টারী পার্টি হইতে ও পর দিবস অর্থাৎ ২২শে ফেব্রুয়ারী পরিষদ সদস্য পদ হইতে ইস্তফা দেন।

পূর্ববঙ্গ গভর্নর ও পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ স্পীকার বরাবর লিখিত ইস্তফা পত্রটি ছিল নিম্নরূপঃ "বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করায় ছাত্রদের উপর পুলিশ যে বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে তাহার প্রতিবাদে আমি পরিষদের আমার সদস্য পদ হইতে পদত্যাগ করিতেছি। যে নূরুল আমিন সরকারের আমিও একজন সমর্থক, এই ব্যাপারে তাহাদের ভূমিকা এতদূর লজ্জাজনক যে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে এবং পরিষদের সদস্য হিসাবে বহাল থাকিতে আমি লজ্জাবোধ করিতেছি।"

ছাত্র হত্যার প্রেক্ষিতে মুহূর্তের মধ্যে ছাত্র আন্দোলন গণ-আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করায় সরকার ভীত, সন্ত্রস্ত ও দিশাহারা হইয়া কান্ডজ্ঞানহীন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ২১শে

ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা নাগাদ ঢাকা শহরে সান্ধ্য আইন জারি ও সেনাবাহিনী তলব করা হয়। গভীর রাত্রিতে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ঘেরাও করে ও মর্গ হইতে নিহত ছাত্রদের লাশ অন্যত্র অপসারিত করে। তাই, নিহতের মোট সংখ্যা সম্পর্কে দেশবাসীর মনে অনন্তকাল ধরিয়া একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন জাগিয়া থাকিবে।সরকারী তথ্য অনুযায়ী নিহতের সংখ্যা মাত্র চারজন, প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে প্রচুর সংশয় রহিয়াছে। হাসপাতালে ভর্তিকৃত ২০ জন আহতের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত ও আবদুল জব্বার এবং বাদামতলী কমার্শিয়াল প্রেসের মালিকের পুত্র রফিকউদ্দীন আহমদ (২৭) প্রাণ ত্যাগ করেন। বাকী ১৭ জনের অবস্থাই আশংকাজনক ছিল।

শামসুল হকের আগমন

গুলির কিছুক্ষণ পর আনুমানিক অপরাহ্ন চার ঘটিকার দিকে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হক খবর পাঠাইলে আমি সেই শোকাভিভুত মুহূর্তে মেডিকেল কলেজের হোস্টেল হইতে হাসপাতাল ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডের গেটের সম্মুখের চত্বরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। সদ্য সংঘটিত মর্মান্তিক ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডে আমরা উভয়েই মর্মাহত। হৃদয়বিদারক পরিস্থিতি আমাদের উভয়েরই বাকশক্তি যেন হরণ করিয়া নিয়াছিল। প্রকৃতিস্থ হইবার পর অত্যন্ত ধীর ও শান্তকণ্ঠে উদ্ভূত পরিস্থিতির মূল্যায়নে নিবিষ্ট হইলাম। জনাব শামসুল হকের প্রশ্নোত্তরে আমি নিবেদন করিলাম যে, সর্বপ্রকার মতবিরোধ ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব পরিহার করিয়া এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা সঠিক হইয়াছে কি না, সেই অবান্তর প্রসঙ্গ উথাপন না করিয়া পরবর্তী কর্মসূচী গ্রহণপূর্বক ঐক্যবদ্ধভাবে হত্যাকারী জালেম সরকারের সমুচিত জওয়াব দিতে হইবে। আমি আরও বলিলাম যে, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে হইবে। অবশ্য জনাব হকের বক্তব্য ছিল যে, ২০শে ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত্রির বৈঠকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনে গৃহীত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করিবার সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করিবার ফলে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের বিলুপ্তি ঘটিয়াছে। উদ্ভূত পরিস্থিতির পটভূমিকায় আমি তাহার সহিত দ্বিমত ব্যক্ত করিলাম এবং তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে বলিলাম যে, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করাকে অপরাধ বিবেচনা না করিয়া আমাদের আশু কর্তব্য ও নৈতিক দায়িত্ব হইতেছে, সংগ্রাম কমিটির নামে সঠিক ও বীরোচিত নেতৃত্ব দান। তদুত্তরে জনাব শামসুল হক দোষারোপ করিয়া মন্তব্য করিলেন, "তুমি ও তোমার পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ কর্মীরাই ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী"। তাঁহার সহিত আলোচনা বৃথা বুঝিতে পারিয়া অযথা কালক্ষেপন না করিয়া তাঁহাকে মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসে আসিবার অনুরোধ জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করি। তিনি আমার অনুরোধের কোন জওয়াব না দিয়া কাজী গোলাম মাহবুব ও মোঃ তোয়াহার অবস্থিতি সম্পর্কে জানিতে চাহেন। তাঁহাকে জানাই যে, গোলাম মাহবুব ও মোঃ তোয়াহা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে তখনও আসেন নাই। আমি আরও বলি যে, হয়ত সময় এবং সুযোগমত তাঁহারা আসিবেন। মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় সবার সহিত দেখা হইবে এই আশা প্রকাশ করিয়া আমি ছাত্রাবাস অভিমুখে প্রস্থান করি।

পরবর্তী কর্মসূচী

ছাত্র হত্যাজনিত বিশেষ পরিস্থিতিতে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলটি আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের উত্তরদিকস্থ বটবৃক্ষে মাইকের হর্ণ বাঁধিয়া ২০ নং ব্যারাক হইতে আন্দোলন সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘোষণা ও আহবান জনতার উদ্দেশ্যে অবিরাম প্রচার করা হইতেছিল। মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং যুবলীগের নেতৃস্থানীয় সক্রিয় ব্যক্তিবর্গের যৌথ সভায় আমরা নিম্নলিখিত কর্মসূচী ঘোষণা করিঃ

(ক) ২২শে ফেব্রুয়ারী ভোর ৭টায় মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাস প্রাঙ্গণে গণ-গায়েবী জানাযা এবং (খ) গায়েবী জানাযা সমাপনের পর জনসভা ও জঙ্গী মিছিল। মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের কন্ট্রোল রুম হইতে জনতার জ্ঞাতার্থে কর্মসূচী মাইকে বারবার ঘোষণা করা হইল।

নেতৃবর্গের ভূমিকা

এইদিকে পরিস্থিতি মোকাবিলার তাগিদে আমাকেই উদ্যোগ গ্রহণ করিয়া ২১শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি ৯ ঘটিকায় মেডিকেল কলেজ হোস্টেলস্থ ৪ নং ব্যারাকের ৩ নং রুমে সাহসী ও উৎসাহী কর্মীদের এক সভা আহবান করিতে হয়। উক্ত বৈঠকে মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ও সবদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য জনাব গোলাম মাওলাকে অন্তর্বর্তীকালের জন্য অস্থায়ী আহবায়ক নিযুক্ত করিয়া আন্দোলনকে সঠিক নেতৃত্বদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অন্যান্য সদস্যের অনুপস্থিতিতে আমাকে ও জনাব গোলাম মাওলাকে উক্ত বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। সর্বজনাব শামসুল হক, মোঃ তোয়াহা, আবদুল মতিন, আবুল হাশিম, আবুল কাসেম, খয়রাত হোসেন, শামসুল আলম (ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি), মুজিবুল হক (সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি) হেদায়েত হোসেন চৌধুরী (সাধারণ সম্পাদক, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল) ও অন্যান্য সবাই গা ঢাকা দিয়াছিলেন। ফলে ২১শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যার পর আন্দোলনের দারুণ সংকটময় ও বিপজ্জনক মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ নেতৃবর্গ ও সাধারণ কর্মীদের উপর আন্দোলন পরিচালনার সমগ্র গুরুদায়িত্ব বর্তাইয়াছিল। বলাই বাহুল্য যে, এই আন্দোলনে জনতা ও নিঃস্বার্থ কর্মীরা অপূর্ব সংগ্রামী চেতনার পরিচয় দিয়াছিলেন। ২১শে ফেব্রুয়ারী সম্পর্কে ইহাই ছিল প্রকৃত পরিস্থিতি। বিভিন্ন মহল বিভিন্ন সময়ে ২১শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাবলীকে এবং উহার সত্যকে বার বার বিকৃত করিয়াছে। এই প্রবণতা এখনও অব্যাহত আছে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, ও তাহাদের খয়েরখাঁগণ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসকে চরমভাবে বিকৃত করিয়া সুবিধামত ব্যবহার করিয়াছে।

২২শে ফেব্রুয়ারী ঘটনা

২২শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৮ ঘটিকায় মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাস প্রাঙ্গণে শহীদদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত গায়েবী জানাযায় লক্ষাধিক লোক যোগদান করেন। শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করিয়া আল্লাহর দরবারে মোনাজাত সমাপনের পর পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদক এডভোকেট ইমাদুল্লাহর সভাপতিত্বে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আহবানে আমাকে ২১শে'র সংগ্রামের তাৎপর্য ও শহীদদের আত্মত্যাগের মহিমার উপর বক্তৃতা করিতে হয়। উল্লেখ্য যে, আন্দোলনের এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সেইদিন একা আমাকে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। উক্ত বক্তৃতায় আত্মপ্রত্যয়ী, দৃঢ়প্রত্যয়ী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রামী জনতাকে বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানাইয়া এক পর্যায়ে বলিয়াছিলাম, "শহীদদের জন্য ক্রন্দন করিব না, বরং ইস্পাত কঠিন শপথ গ্রহণ করিব। সাদ্দাদ, নমরুদ ও ফেরাউনের পদাংক অনুসরণকারী খুনী উজীরে আলা নূরুল আমিন সরকারের হত্যার জবাব দিব ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মারফত, মাতৃভাষা বাংলাকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার দ্বারা। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্যবৃন্দের যাঁহারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরোধিতা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি নিবেদন, "ছাত্রহত্যার পর আন্দোলনে নূতন অধ্যায় সূচিত হইয়াছে; সর্বপ্রকার মতভেদ পরিহার করিয়া চলুন, ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন পরিচালনা করি এবং খুনীকে সমুচিত জবাব দিই। হিম্মতে মর্দান মদদে খোদা।" আমার বক্তৃতার পর সভাপতি জনাব ইমাদুল্লাহ তাঁহার ভাষণে দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার আহবান জানান।

এখানে উল্লেখ্য যে, জনাব ইমাদুল্লাহ পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন; কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, দূরারোগ্য বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি ১৯৫৬ সালের ৬ই এপ্রিল ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন বাংলার রাজনৈতিক গগনের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে এ দেশের যুব আন্দোলন সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

জঙ্গী মিছিল

যাহা হউক, পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী আমরা লক্ষাধিক জনতার জঙ্গী মিছিল সহ রাজপথে বাহির হইয়া পড়ি। এই বিপ্লবী জনতার বিদ্রোহী কাফেলার পদভারে রাজধানীর রাজপথ প্রকম্পিত হয়। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। অবর্ণনীয়! শুধু হৃদয়ংগম করা যায়; অভিজ্ঞতার কোটরে রাখা যায়, কিন্তু ভাষায় রূপ দেওয়া যায় না।

"নারায়ে তাকবীর-আল্লাহু আকবর", "রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই", "উর্দু-বাংলায় বিরোধ নাই" "খুনী নূরুল আমিনের বিচার চাই" "খুনের বদলা খুন চাই" ইত্যাদি গগনবিদারী ধ্বনি দিতে দিতে দৃপ্ত পদক্ষেপে মিছিল হাইকোর্ট ও কার্জন হল মধ্যস্থিত রাজপথ বাহিয়া আবদুল গণি রোডের দিকে মোড় নেয়। সেক্রেটারিয়েট-ইডেন বিল্ডিং আক্রমণ হওয়ার অহেতুক সংশয়ে ভীত পুলিশ বাহিনী মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করিবার প্রয়াসে লাঠিচার্জ শুরু করে ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। এই অবস্থায় মিছিলের একটি অংশ কার্জন হল, ফজলুল হক হল ও ঢাকা হল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। আমরা আপ্রাণ প্রচেষ্টায় তাহাদিগকে পুনঃসংগঠিত করি।

আপোষহীন শপথের স্বাক্ষর বহনকারী ৬০/৭০ হাজার লোকের এই জঙ্গী মিছিলটি অতঃপর ঢাকা হলের পশ্চিম দিকস্থ গেট দিয়া ধীর পদক্ষেপে নাজিমুদ্দিন রোড, চকবাজার, মোগলটুলী, ইসলামপুর ও পাটুয়াটুলীর উপর দিয়া সদরঘাট অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। সশস্ত্র সামরিক বাহিনী ভর্তি অসংখ্য ট্রাক পুরান ঢাকা শহরের রাজপথগুলিতে অবিরত টহল দিতেছিল। সুদীর্ঘ পথ অতিক্রমকালে রাস্তার উভয় পার্শ্বে অবস্থিত বাড়ীর ছাদ, দ্বিতল ত্রিতল বারান্দা হইতে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, কিশোর-কিশোরী ও পুরবাসিনী সজল নয়নে কোথাও হাত নাড়িয়া, কোথাও পুষ্প বর্ষণ করিয়া, কোথাওবা দেশাত্মবোধক শ্লোগান দ্বারা আমাদিগকে অভিনন্দন জানাইতে ও উৎসাহ দিতে থাকে। যাহা হউক, মিছিলটি সদরঘাট মোড় হইতে ভিক্টোরিয়া পার্ক (বর্তমানে বাহাদুর শাহ পার্ক) অভিমুখে রওয়ানা হইয়া জগন্নাথ কলেজের পুর্ব দিকস্থ গেটের নিকটবর্তী হইতেই পুলিশ বাধা প্রদান করে। কর্ডন ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতেই পুলিশ মিছিলকারীদের বেদম প্রহার শুরু করে ও বেপরোয়া কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করিতে থাকে। অবিরাম লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপে টিকিতে না পারিয়া আমাদের মিছিল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। আমি প্রথমে ড্রেনের ঢাকনীর নিচে ও পরে জগন্নাথ কলেজ অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করি। জগন্নাথ কলেজের দারোয়ানের নিকট হইতে অবগত হই যে, পূর্বাহ্নে সদরঘাট এলাকা হইতে সংগঠিত একটি মিছিল ইংরেজী দৈনিক মর্নিং নিউজ অফিসে অগ্নি সংযোগ করে। তাই পুলিশ কোন মিছিলকে অগ্রসর হইতে দিতেছে না।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ভারতীয় চর ও হিন্দু দ্বারা পরিচালিত মর্নিং নিউজ এই নামে এক মিথ্যা, বানোয়াট ও অমর্যাদাকর সংবাদ পরিবেশন করায় অত্র এলাকার ছাত্র জনতা ক্রোধান্বিত হইয়া বাঙালী-বিদ্বেষী পত্রিকাটির জুবিলী প্রেস অগ্নিদগ্ধ করে। জগন্নাথ কলেজের পার্শ্ববর্তী বাড়ীর মালিকের অনুমতি গ্রহণপূর্বক সহকর্মী বন্ধুরা আমাকে কিছুক্ষণ ঐ বাড়ীতে লুকাইয়া রাখে। অবস্থা কিছুটা শান্তভাব ধারণ করিলে দৃঢ়চিত্ত, সদা সচেতন ও জাগ্রত সহকর্মী বন্ধুদের কড়া পাহারাবেষ্টিত হইয়া চোরা রাস্তা ও অলিগলি বাহিয়া অতি সন্তর্পণে ও সাবধানতার সহিত আন্দোলন পরিচালনা কেন্দ্র মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের পথে রওয়ানা দেই। সহকর্মী বন্ধুদের সতর্কতা অবলম্বনের কারণ এই ছিল যে, পাছে গোয়েন্দা বাহিনী কিংবা মুসলিম লীগ দালালদের কবলে পড়ি। তাহাদের এই অকৃত্রিম ভালবাসা, দরদ ও স্নেহ আমার স্মৃতিপটে অমূল্যনিধি হিসেবে আমৃত্যু বিরাজ করিবে। যাহা হউক, এই সন্তর্পণ প্রস্থানের পথেই কায়েৎটুলী মোড়ে রেলওয়ে ক্রসিং অর্থাৎ ঢাকা মিউজিয়ামের দক্ষিণ দিকস্থ রাজপথের দক্ষিণ দিকের রাস্তায় পৌছিলে সাইকেলে গমনরত বন্ধুবর জনাব তাজুদ্দিন আহমদের সাক্ষাৎ ঘটে। সে আমাকে অনুযোগ ও ধমকের সুরে শীঘ্র সাইকেলে উঠিবার নির্দেশ দিয়া বলে "এই ভাবে চলিলে যে কোন মুহূর্তে গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেফতার করিয়া লইয়া যাইবে।" আমি কোন বাক্যব্যয় না করিয়া তাহার সাইকেলের সিট ও হ্যান্ডেলবারের মধ্যবর্তী ডান্ডায় বসিয়া পড়ি। তাজুদ্দিন মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে আমাকে নামাইয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে আমি তাহাকে সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে যোগ দিতে বলি। প্রত্যুত্তরে কিছু না বলিয়া সে মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্ধান হইয়া যায়। কোন সংকটজনক পরিস্থিতিতে পড়িলে কোন প্রকার উচ্চবাচ্য না করিয়া হাসিয়া অন্য প্রশ্নের

অবতারণা করা ছিল তাহার স্বভাব। সরকার ও সরকার বিরোধী তথা কর্তৃপক্ষ ও কর্তৃপক্ষ বিরোধী শক্তিদ্বয়ের সংঘাতে ছাত্রজীবনে সবসময় সে গা বাঁচাইয়া চলিত। তাই ছাত্রজীবনে তাহার গায়ে কর্তৃপক্ষের সামান্যতম আঁচড়ও লাগে নাই।

ভাষা আন্দোলনের না বলা কিছু ঘটনা

গান্দারে কওম খাকছার পার্টির নেতা আল্লামা মাশরেকী, মাওলানা মওদুদী, দেওবন্দী হোসেন আহমদ মাদানী, মাওলানা আজাদ গোষ্ঠীর মোল্লারা যথা গান্ধী মহারাজের চেলারা যেমনি হিন্দুস্থানে মুসলিম আবাসভূমির প্রবক্তা 'কায়েদে আজমকে' 'কাফেরে আজম' বলতো, তারা আদাজল খেয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লেগেছিল। আল্লামা মাশরেকী কায়েদে আজমকে হত্যা করার জন্য তাঁর বোম্বের মালাবারহিল বাসভবনে এক খাকছার-কে পাঠায়, সেই খাকছারই ছুরিকাঘাতে কায়েদে আজমকে আহত করে। তেমনি ১৯৫২ সালে বিদ্রোহী '২১শে ফেব্রুয়ারি' ও ২১শে ফেব্রুয়ারি উত্তর ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রাজপথ কাঁপানো রক্তাক্ত সংগ্রামেরও বিরুদ্ধে ছিল। মুলত উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ছিল তাদের অবস্থান। কৌশলে বলত 'আরবী হরফে বাংলা লিখতে চাই'। একইভাবে বাংলার রক্তক্ষয়ী আজাদী সংগ্রামে তারা ছিল মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী "আলবদর" "আল-সামস" রাজাকার ও খুনী বাহিনীর সংগঠক।

রক্তস্নাত বিদ্রোহী '২১শে ফেব্রুয়ারির পূর্বদিন ২০শে ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে খুনী নূরুল আমিন সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। জারিকৃত ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে ধনুর্ভঙ্গ পণে, কমরেড মনি সিংহের নেতৃত্বাধীন কমিউনিষ্ট পার্টি, আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতৃত্ব (মজলুম নেতা মওলানা ভাসানী ঢাকার বাহিরে নরসিংদীর গ্রামাঞ্চলে জনসভায় ছিলেন) যথা আতাউর রহমান খান, জেনারেল সেক্রেটারী শামসুল হক, তদানীন্তন সাপ্তাহিক ইত্তেফাক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, সহ-সভাপতি খয়রাত হোসেন এম, এল, এ, মিসেস আনোয়ারা খাতুন এম, এল, এ, তমদ্দুন মজলিশ নেতা অধ্যাপক আবুল কাসেম সহ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শামসুল হক চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক খালেক নেওয়াজ খাঁন, তাদের সহনেতা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কনভেনর কাজী গোলাম মাহবুব ও পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের সহ-সভাপতি মোঃ তোয়াহা প্রমুখ অনেকেই জনাব আবুল হাশিম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় ২১শে ফেব্রুয়ারিতে জারিকৃত ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী ছিল। অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ, ঢাকা ইউনিভার্সিটি কমিটি অব একশন কনভেনর আবদুল মতিন, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন সহ-সভাপতি গোলাম মাওলা, ফজলুল হক হলের সহ-সভাপতি শামসুল আলম ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে ভোট দেন। অর্থাৎ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে ৪ ভোট এবং বিপক্ষে ১১ ভোট পড়ে। ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার পক্ষে তাদের যুক্তি ছিল সামনে নির্বাচন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত হবে হটকারী। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের আন্দোলনে গেলে আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাব। নির্বাচনে অংশগ্রহণ কঠিন

হয়ে যাবে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে নূরুল আমিনের মুখ্য মন্ত্রিত্বকালে সাধারণ নির্বাচন হয় এবং বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ বিরোধীরাই যুক্তফ্রন্টের পতাকা তলে নির্বাচিত হয় ও মন্ত্রী মেম্বার-প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হয়-বাড়ি গাড়ি অবৈধ অর্থের কুমীর হয়। মওলানা ভাসানী বা ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী কেউই মন্ত্রী-মেম্বার হয় নাই বা অবৈধ বাড়ি-গাড়ির মালিকও হয় নাই- ইহাই ইতিহাস কেউ মানোক আর না মানোক। মোঃ সুলতান ১৪৪ ধারা ভংগকারীদের একজন। ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮৩ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বারান্দায় বিনা চিকিৎসায় তাকে মরতে হয়েছে। বেতের টুপি আর লুঙ্গীওয়ালা মওলানা ভাসানীর ইত্তেফাক পত্রিকা অন্যায়ভাবে তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) স্বীয় নামে সরকারী প্রভাবে হস্তান্তর করে নেয়। সর্বজন বরেণ্য মওলানা ভাসানীর মত নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিকের ইহাই যদি অদৃষ্ট হয়, তাহলে সৎ নিষ্ঠ সাধারণ রাজনৈতিক কর্মীদের ভাগ্য হবে রাস্তাঘাটে দিন গুজরান।

সূফিয়া খান এশিয়ার প্রাচীনতম মহিলা কলেজ Lady Hardings college for women হতে বি,এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী নিবাস চামেলী-হাউসে রেসিডেন্ট ছাত্রী হিসেবে এম,এ ক্লাশে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অত্যন্ত বিদ্রোহী ছাত্রী নেত্রী হিসেবে আত্ম প্রকাশ করেন। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনা লগ্নে যেমনি, ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের নিম্নবেতনভূক কর্মচারী আন্দোলনে ও ১৯৫২ সালের ২০ শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত মারমুখী। ১৯৫১ সালে পূর্ব পাক যুবলীগ গঠনের সম্মেলনে তিনি একজন উৎসাহী সংগঠক ছিলেন। পরিতাপের বিষয় '৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী দিন থেকে রক্তক্ষরা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় প্রাঙ্গন কিংবা ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গন কোথাও তিনি আমার নজরে পড়েন নাই।

একুশে ফেব্রুয়ারির আমতলার সভায় টিয়ার গ্যাস সেলে জ্ঞান হারানোর দাবিদার গাজীউল হক জ্ঞান ফিরে পাবার পর রাতেই নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ট্রেনে করে ২২শে ফেব্রুয়ারি সকালে তিনি ময়মনসিংহে নেমে ডঃ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর শ্বশুর অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও অবিভক্ত বাংলার শেরে বাংলার নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচিত বেঙ্গল লেজেসলিটিভ এসেম্বলীর সাবেক সদস্য (এম,এল,এ) জনাব আবদুল মজিদ সাহেবের বাড়িতে হাজির হলে ডঃ সিদ্দিকী হতভম্ব হয়ে গেলেন। আর পূর্ব প্রচারিত গাজীউল হকের মৃত দেহের পরিবর্তে জীবিত গাজীউল হককে সশরীরে বগুড়ায় দেখে স্তম্ভিত ও হতবাক বগুড়া রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন কমিটির আহবায়ক ও বগুড়া যুবলীগ সম্পাদক জনাব মহিউদ্দিন আহম্মদ।

আরেকজন জনাব এম. আর. আখতার মুকুল ঐতিহাসিক রক্তস্নাত ২১শে ফেব্রুয়ারী আমতলার ছাত্র জনসভার পর পরই ঢাকা হতে উধাও হন এবং কোলকাতা নগরীতে নিরাপদ আশ্রয়ে কাল কাটান। জনাব শহীদুল্লাহ কায়সারও তার দল কমিউনিষ্ট পার্টির নির্দেশে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন কমরেড শহিদুল্লাহ কায়সার কলিকাতা

হতে প্রকাশিত কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'দৈনিক স্বাধীনতা' বিক্রি করতে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল আসেন। তাতে ঢাকার পুলিশের গুলির খবর ছিল। আমি তাঁকে পত্রিকাগুলিসহ মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণ হতে বিদায় করেছিলাম। উল্লেখ্য, ভারতীয় পত্রিকা 'স্বাধীনতা' এদেশে সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি ও বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে- মুসলিম লীগের তরফ থেকে এ ধরনের প্রচারণা ছিল তখন এন্তার। একমাত্র মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি গোলাম মাওলা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলেই অবস্থান করেন এবং আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন। কমিউনিষ্ট পার্টির নির্দেশেই বোধ হয় ঢাকার উত্তপ্ত রাজপথে ২১শে ফেব্রুয়ারির রাত হতে জনাব মোঃ তোয়াহা ও আবদুল মতিনকে দেখা যায় নাই। ৭ মার্চ "গ্রেফতার দিবস" সন্ধ্যা রাতে জনাব তোয়াহা ও আবদুল মতিন আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন এবং সেই সভাতেই সর্বজনাব সাদেক খান, হেদায়েত হোসেন চৌধুরী, মুজিবল হক ও মীর্জা গোলাম হাফিজের সাথে আমি গ্রেফতার হই। স্বীয় বুদ্ধিমত্তার কারণেই জনাব কাজী গোলাম মাহবুব সভায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি কারামুক্তি পেলেন। কিন্তু ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ আন্দোলনের অগ্নিঝরা দিনগুলোতে ঢাকায় এলেন না নেতৃত্বে দিতে। বিদ্রোহের অনলেও ঝাপ দিলেন না। এমন কি খুনী শাসক নূরুল আমীনের বিরুদ্ধে ৫ই মার্চ দেশব্যাপী যে হরতালের ডাক দেওয়া হয় শেখ মুজিব তাতে অংশগ্রহণ করে মারমুখো জনতাকে নেতৃত্ব দিতে ঢাকায় আসেন নাই। তারপরও মুখপোড়া আওয়ামী লীগ ও ভারতীয় দালাল চামচারা বলে ১৯৫২ সালে শেখ মুজিবর নাকি ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে। ধিক তাদেরকে।

ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের রক্তস্নাত ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিকে প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলনে যারা জীবন বাজী রেখে রক্তঝরা দিনগুলোতে সর্বক্ষণ রাজপথ দখল করে রাখে, উত্তপ্ত রাখে এবং আন্দোলন মুখর লাখো সংগ্রামী জনতাকে নেতৃত্ব দেয় জাতির সাচ্চা সন্তান হিসাবে তারা হলেন মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র আজমল, আবদুস সালাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মোঃ সুলতান, পূর্ব-পাকিস্তান যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদক এডভোকেট মোঃ ইমদাদুল্লাহ, সাহিত্যিক, কবি হাসান হাফিজুর রহমান, প্রফেসর কাজী আজিজুর রহমান, আনিসুজ্জামান, নিয়ামুল বশির, ডাঃ মঞ্জুর হোসেন, আমীর আলী প্রমুখ যুবলীগের শত শত নেতাকর্মী। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সেদিনের ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের আন্দোলন উত্তালমুখর দিনগুলোতে আন্দোলন যারা গড়ে তুলেছিলেন তাদের অনেকের মধ্যে যাদের নাম মনে পড়ে তারা হলেন নারায়ণগঞ্জ মর্গান গার্লস স্কুলের হেড মিস্ট্রেস অকোতভয় অগ্নিকন্যা মমতাজ বেগম, পূর্ব পাক যুবলীগ সহ-সভাপতি সামসুজ্জোহা, পূর্ব পাক যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সফি হোসেন খাঁন ছাড়াও ডাঃ মুজিবুর রহমান, যুবলীগ নেতা কর্মীবৃন্দ সর্বজনাব মোস্তফা সরওয়ার, জামির, আলহাজ আজগর হোসান ভূঁইয়া, ৯ বৎসরের বালক মোসলেউদ্দিন, গোলাম মোর্শেদ, আলহাজ

জানে আলম, মফিজ আহমেদ, বজলুর রহমান, সুলতান মাহমুদ মল্লিক, জালাল উদ্দিন আহমেদ, বিচারপতি বদরুদ্দোজা, রহিছ উদ্দিন, মশিউর রহমান, মজিবুর রহমান, নাজির মুক্তার, নাসির উল্লাহ, মোতালেব, হাবিবুর রহমান, নূরুল ইসলাম মল্লিক, ওয়াকিল মিয়া, খাজা জহিরুল হক, বশির উদ্দিন আহম্মেদ, নাসির উদ্দিন আহম্মেদ, আমীর আলী মিয়া, মোস্তফা মনোয়ার, সাহাবুদ্দিন, নিখিল ও শামসুর রহমান প্রমুখ।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলীম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী দার্শনিক বিপ্লবী আবুল হাশেম কর্তৃক সম্পাদিত ৩নং ওয়েলেশলী ষ্ট্রীষ্ট হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক মিল্লাত পত্রিকায় ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক উপন্যাসিক জনাব কাজী মোহাম্মদ ইদ্রীস। বঙ্গীয় মুসলীম ছাত্রলীগের কর্মী হিসাবে কার্য্যব্যপোদেশে কলিকাতা গমন করিলে ৩নং ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটে অবস্থান করিতাম। তথায় জনাব কাজী মোহাম্মদ ইদ্রীসের সাথে দেখা ও পরিচয় হয়। ১৯৫০ সালে সাম্প্রদায়ীক দাঙ্গার কারণে তিনি ঢাকা চলে আসেন। ১৯৫১ সালে ওজিরে আলা নুরুল আমীনের মালিকানায় দৈনিক সংবাদ প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন নুরুল আমীনের আত্মীয় খায়রুল কবির ও সহ সম্পাদক ছিলেন জহুর হোসেন চৌধুরী। ইদ্রীস ভাই দৈনিক সংবাদে সম্পাদকীয় লিখতেন। ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারী পুলিশের গুলিতে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ইদ্রীস ভাই ২২শে ফেব্রুয়ারী দৈনিক সংবাদ বন্ধ রাখার প্রস্তাব দিলেন কিন্তু সম্পাদক জনাব খায়রুল কবির ও সহ-সম্পাদক জনাব জহুর হুসেন চৌধুরী প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন ফলে তিনি সংবাদ অফিস ছেড়ে চলে গেলেন। আদর্শ পুরুষেরা এরূপই করে- বিবেকের তাড়নায়- আত্মসম্পর্কে অগ্রাধিকার দেয় না- আজকাল সংবাদপত্র জগতে এটা দেখা যায় না।

নিহতদের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে

ইতিপূর্বে লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসে আক্রান্ত মিছিলের অপর অংশ কার্জন হল, ফজলুল হক হল সংলগ্ন পূর্বদিকস্থ রাজপথ দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। মিছিলটি অতঃপর রেলওয়ে হাসপাতালের দক্ষিণ দিকস্থ রাজপথ বাহিয়া নওয়াবপুর রোড দিয়া সদরঘাট অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। পথে বংশাল রোডে অবস্থিত মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের বাংলা 'দৈনিক সংবাদ' অফিস আক্রমণ করে। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী প্রথমে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে এবং অবশেষে গুলী চালায়। গুলীতে অকুস্থলেই আবদুস সালাম নামক একজন রিক্সাচালক প্রাণত্যাগ করে। মেহনতি জনতার প্রতিভূ আবদুস সালাম এইভাবে মাতৃভাষার বিরুদ্ধাচারণকারী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রাণ বির্সজন দিয়া এবং স্বীয় পরিবার-পরিজনকে অভাব-অনটনের অকূল সাগরে ভাসাইয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রাম কেবলমাত্র ছাত্রদের সংগ্রাম নহে, বরং এই সংগ্রাম মেহনতি আপামর বাংলা ভাষাভাষী সকলের। তাঁহার এই আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত দেশবাসীর স্মৃতিতে চিরকাল দেদীপ্যমান থাকিবে। ছত্রভঙ্গ শোভাযাত্রীরা পুনরায় সদরঘাটের পথে রওয়ানা দিলে নওয়াবপুর রোডে অবস্থিত অধুনালুপ্ত 'খোশমহল রেস্টুরেন্টের' সন্নিকটে

পুনরায় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সহিত তাহাদের সংঘর্ষ ঘটে। এই সংঘর্ষেই হাইকোর্ট কর্মচারী শফিউর রহমান পুলিশের গুলীতে গুরুতরভাবে আহত হন এবং পরবর্তীকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাতৃভাষার মান রক্ষার সংগ্রামে অকাতরে প্রাণ দেওয়ার মত চরম ত্যাগের আহবান রাখিয়া যান। ২২শে ফেব্রুয়ারী ভিক্টোরিয়া পার্কের পার্শবর্তী এলাকায় এবং নওয়াবপুর রোড ও বংশাল রোডে সংগ্রামী জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণের ফলে কতজন শাহাদৎ বরণ করিয়াছেন তাহা আমাদের কেহই সঠিকভাবে বলিতে পারি না। অবশ্য 'দৈনিক আজাদ' ২৩শে ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় ২২শে ফেব্রুয়ারী গুলীবর্ষণে চারজন নিহত ও শতাধিক আহত হওয়ার সংবাদ পরিবেশন করিয়াছিল। নিহতের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার অন্যতম কারণ হইতেছে এই যে, জালেম সরকার শহীদদের লাশ গুম করিয়া ফেলিত। তদুপরি ছিল আমাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা। ইহার কারণে সঠিক খবর আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে পৌছায় নাই। আমি যতটুকু জানি, ততটুকুই লিপিবদ্ধ করিতেছি। তবে হাইকোর্টের সম্মুখস্থ রাজপথে মিছিলকারীদের উপর কোন গুলী চালনা করা হয় নাই। অতএব সেইখানে হাইকোর্টের কর্মচারী শফিউর রহমানের নিহত হওয়ার যে দাবী তাহা সঠিক নহে। আমি স্বয়ং উক্ত মিছিল পরিচালনা করিতেছিলাম। শফিউর রহমান নিহত হন নওয়াবপুর রোডের গুলীবর্ষণে। প্রসঙ্গতঃ আরও উল্লেখ্য যে, শেরেবাংলা এ,কে, ফজলুল হক গায়েবী জানাযায় যোগ দেন নাই এবং জানাযার পর মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণ হইতে বহির্গত মিছিলের কোন পর্যায়েই তিনি অংশগ্রহণ করেন নাই। যুবলীগ নেতৃবর্গ এবং সাধারণ ছাত্র কর্মীরাই সেইদিনকার সেই দুঃসাহসিক জঙ্গী মিছিল পরিচালনা করিয়াছিলেন। অনা কোন নেতারই সাক্ষাৎ সেইদিন মিলে নাই; বরং কোন কোন স্বনামধন্য ব্যক্তি নাগরিক কমিটির নামে আন্দোলনকে পিছন হইতে ছুরিকাঘাত করিয়া সরকারী আনুকূল্য কুড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন। শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হক, কামরুদ্দিন আহমদ প্রমুখ উক্ত নাগরিক কমিটির অনাতম উদ্যোক্তা ছিলেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারী ধর্মঘট

ঐদিনই অর্থাৎ ২২শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে আমি মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে আন্দোলনের চরম মুহূর্তের সহযোগী সর্বজনাব গোলাম মাওলা, মোঃ সুলতান (যুগ্ম সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ) জনাব মোঃ ইমাদুল্লাহ ও অন্যান্য নিঃস্বার্থ সক্রিয় কর্মীবৃন্দের সহিত এক সভায় মিলিত হই। সেই সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২৩শে ফেব্রুয়ারী দেশব্যাপী সাধারণ হরতাল পালনের আহবান জানাই। ইতিমধ্যে সংগ্রামী ছাত্রদের উদ্যোগে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ও ফজলুল হক হলে আন্দোলনের স্বার্থে কন্ট্রোল রুম স্থাপিত হয় এবং এই কন্ট্রোল রুমগুলি হইতে মাইকযোগে প্রচারকার্য অব্যাহত থাকে। আমাদের গৃহীত সাধারণ হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত উপরে বর্ণিত হলগুলির কন্ট্রোল রুম ও মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের কন্ট্রোল রুম হইতে প্রচারিত হইতে থাকে। এইভাবেই ছাত্রদের সীমাবদ্ধ আন্দোলন দেশব্যাপী ব্যাপক গণ-আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।

শহীদ মিনার

সেই দিনই অর্থাৎ ২২শে ফেব্রুয়ারী সূর্যাস্তের সময় মোঃ সুলতান কয়েকজন যুবলীগ কর্মীসহ আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং যেইখানে পূর্ববর্তী দিবসে (২১শে ফেব্রুয়ারী) প্রথম গুলী চালনা করা হইয়াছে সেইখানে শহীদ মিনার নির্মাণের প্রস্তাব রাখেন। নিহত সহযোগী ভাইদের প্রতি প্রাণচঞ্চল কর্মীদের অকৃত্রিম মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি আমাকে অভিভূত করে। ভাষা আন্দোলনের ঘটনাবলী সম্পর্কে আজ যাহারা দলীয় বা ব্যক্তি স্বার্থে অসত্য বক্তব্য রাখিতেছেন, তাহাদের কেহই সেই আন্দোলনে কিংবা আবেগঘন ঐতিহাসিক লগ্নে উপস্থিত ছিলেন না। সরল ও সর্বস্বত্যাগে প্রস্তুত দুঃসাহসী কর্মীদের হৃদয়ের অনুভূতি তাহারা বুঝিবেন না। মিথ্যার ফুলঝুরি রচনায় তাই তাহাদের বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা জাগে না। মাতৃভাষা ও দেশমাতৃকার জন্য প্রথম আত্মোৎসর্গকে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার প্রস্তাবে আমি সানন্দে সম্মতি দিলাম। কোথা হইতে ইট, সুরকী, সিমেন্ট ও অন্যান্য মালমশলা যোগাড় হইল জানি না। তবে এই প্রাণচঞ্চল তরুণরাই সারারাত ধরিয়া অমানুষিক পরিশ্রমে মেডিকেল কলেজের সিনিয়র ছাত্র বদিউল আলম কর্তৃক অংকিত নকশা মোতাবেক প্রথম শহীদ মিনার নির্মাণের কাজটি সম্পন্ন করেন। ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে যিনি পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্যপদ হইতে ইস্তফা দিয়াছিলেন, 'দৈনিক আজাদ' সম্পাদক সেই আবুল কালাম শামসুদ্দিন ২৩শে ফেব্রুয়ারী শহীদ স্মৃতিস্তম্ভটি উদ্বোধন করিয়া একদিকে যুব ছাত্র জনতার কৃতজ্ঞতাভাজন ও অন্যদিকে জালেম সরকারের চক্ষুশূলে পরিণত হন। রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় প্রশ্নে তাঁহার সহিত আমাদের মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্বীকার করিতেই হয় যে, তাঁহার সাহিত্যিক মন সঠিক মুহূর্তেই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল এবং সর্বপ্রকার আত্মস্বার্থের উর্ধ্বে উঠিয়া তিনি এই সংগ্রামী চেতনার সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছিলেন। সত্যাশ্রয়ী ও হৃদয়বান মানুষেরা এইভাবেই ইতিহাসের অগ্রযাত্রায় নিজেদের অবদান রাখেন।

২১শে ফেব্রুয়ারীর শোকাহত ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তৎকালীন ঢাকা কলেজের ছাত্র বর্তমানের প্রথিতযশা সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী "আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী" এই কালজয়ী কবিতাটি লিখেন। প্রথমে এর সুরারোপ করেন আবদুল লতিফ পরে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আলতাফ মাহমুদ সুরারোপ করেন। বর্তমানে যে সুরে গানটি গাওয়া হয় এবং যে সুরে এই কবিতাটির পক্তিমালা এদেশের মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে আসছে সেটি আলতাফ মাহমুদেরই করা সুর।

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্ত রাঙানো ফেব্রুয়ারী

আমি কি ভুলিতে পারি॥

জাগো নাগিনীরা জাগো জাগো কালবোশেখীরা
শিশু হত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা,

আমার দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবী
দিন বদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি?
না, না, না, না খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী

সেদিনো এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষে
রাত জাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে;
পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা অলকানন্দা যেনো,
এমন সময় ঝড় এলো এক, ঝড় এলো ক্ষ্যাপা বুনো।
সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা,
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের, ভায়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবীকে রোখে

ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই বাংলার বুকে
ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেব্রুয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী॥

তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারী
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী
আমার শহীদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাঁকে
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালবো ফেব্রুয়ারী
একুশে ফেব্রুয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী।

এই খানে উল্লখ্যে যে, ২৩শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে পুলিশ শহীদ স্মৃতিস্তম্ভটি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়। এই প্রথম শহীদ মিনার ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অনার্স ক্লাসের ছাত্র আলাউদ্দিন আল আজাদ ইকবাল হলে বসিয়া নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেনঃ

স্মৃতির মিনার ভেঙ্গেছে তোমার ? ভয় কি বন্ধু আমরা এখনো
চার কোটি পরিবার
খাড়া রয়েছিতো যে ভিৎ কখনো রাজন্য

পারেনি ভাঙ্গতে
হীরার মুকুট নীল পরোয়ানা, খোলা তলোয়ার
খুরের ঝটিকায় ধুলার চূর্ণ যে পদপ্রান্তে
যারা বুনি ধান
গুন টানি আর তুলি হাতিয়ার হাপর চালাই
সরল নায়ক আমরা জনতা সেই অনন্য।
ইটের মিনার
ভেঙ্গেছে ভাঙ্গুক। ভয় কি বন্ধু দেখ একবার আমরা জাগরী
চার কোটি পরিবার।
এ কোন মৃত্যু? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন,
শিয়রে যাহার ওঠে না কান্না, ঝরে না অশ্রু?
হিমালয় থেকে সাগর অবধি সহসা বরং
সকল বেদনা হয়ে উঠে এক পতাকার রং;
এ কোন মৃত্যু? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন,
বিরহে যেখানে নেই হাহাকার? কেবল সে তার
হ'য় প্রপাতের মোহনীয় ধারা, অনেক কথার
পদাতিক ঋতু কলমের দেয় কবিতার কাল?
ইটের মিনার ভেঙ্গেছে ভাঙ্গুক। একটি মিনার গড়েছি আমরা
চার কোটি কারিগর
বেহালার সুরে রাঙ্গা হৃদয়ের বর্ণ লেখায়
পলাশের আর
রামধনুকের গভীর চোখের তারায় তারায়
দ্বীপ হয়ে ভাসে যাদের জীবন, যুগে যুগে সেই
শহীদের নাম
এঁকেছি প্রেমের ফেনিল শিলায়, তোমাদের নামে।
তাই আমাদের
হাজার মুঠির বজ্র শিখরে সূর্যের মতো জ্বলে শুধু এক
শপথের ভাস্কর॥

যাহা হউক, ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে এককভাবে বিজয়ী যুক্তফ্রন্ট কর্তৃক প্রণীত নির্বাচনী ওয়াদায় ২১শে ফেব্রুয়ারীর আন্দোলনে শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের ওয়াদা ছিল। ১৯৫৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তানের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকার শহীদ মিনারের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯৫৬ সালে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার পর জনাব আতাউর রহমান খান শহীদ মিনারের ব্লু প্রিন্ট ও ডিজাইন তৈরীর জন্য প্রখ্যাত স্থপতি হামিদুর রহমানকে নিযুক্ত করেন। শহীদ

মিনারের অঙ্গশোভা পরিকল্পনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন ও শিল্পী কামরুল হাসান। স্থপতি হামিদুর রহমানের মূল নকশা ছিল নিম্নরূপঃ

১। স্তম্ভগুলির সামনের চত্বরের মধ্যস্থলে একটি সরোবর।

২। সরোবরে রক্তকমল শাপলা।

৩। স্তম্ভগুলির অবনত মাথার ছায়া।

৪। স্তম্ভগুলির মধ্যবর্তী ফাঁকে ফাঁকে শিক।

৫। মূল শহীদবেদীর দুই পার্শ্বে দুইটি সবুজ কামরা। একটি পাঠাগার, অন্যটি যাদুঘর।

৬। মূল চত্বরের বাহিরে একটি বেদী। উঁচুবেদী হইবে সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের স্থান।

স্থপতির ব্যাখ্যাঃ

১। মূল বেদীঃ জন্মভূমি

২। অবনত মাথা, স্তম্ভগুলি ও পাশের স্তম্ভগুলিঃ জনতা।

৩। স্বচ্ছজলঃ শহীদের আত্মা।

৪। রক্তকমল শাপলাঃ আত্মদানের প্রতীক।

৫। সরোবরে অবনত শিরের ছায়াঃ শহীদদের আত্মদানের প্রতি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা।

আতাউর রহমান খানের সরকার পরিকল্পনা প্রণয়ণে দক্ষতার পরিচয় দিলেও দুই বৎসরাধিক ক্ষমতাসীন থাকা সত্ত্বেও স্থপতির ঐকান্তিক চেষ্টায় অঙ্কিত নকশা মোতাবেক শহীদ মিনার নির্মাণে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আইউব খানের সামরিক শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানের তদানীন্তন উর্দুভাষী গভর্নর লেঃ জেঃ আযম খান বর্তমান শহীদ মিনারটি নির্মাণের ব্যবস্থা করেন এবং ১৯৬৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ বরকতের মা উক্ত মিনারটির উদ্বোধন করেন। বলাই বাহুল্য যে, লেঃ জেঃ আযম খান নির্মিত শহীদ মিনারটি স্থপতি হামিদুর রহমান কর্তৃক অঙ্কিত নকশার আংশিক বাস্তবায়ন মাত্র।

নূরুল আমিনের ঘোষণাঃ দেন-দরবার

২২শে ফেব্রুয়ারী ভীতসন্ত্রস্ত নূরুল আমিন সরকার কর্তৃক বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার প্রস্তাবক্রমে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট উক্ত মর্মে সুপারিশ করে। আন্দোলনের ভয়াবহরূপ অবলোকন করিয়া ২৪শে ফেব্রুয়ারী সরকার পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ বাজেট অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মূলতবী ঘোষণা করে। এইদিকে আন্দোলনের বৈপ্লবিক রূপদৃষ্টে আরাম কেদারার রাজনীতিবিদ ও বৈঠক খানার বৈঠকী রাজনীতিবিদদের আঁতে ঘা লাগে। তাঁহারা Citizens Committee বা নাগরিক পরিষদ গঠন করেন এবং ঐ কমিটির তরফ হইতে জনাব কামরুদ্দিন আহমদ সমঝোতা আনয়নের জন্য আমাদের ও মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন সরকারের মধ্যে বৈঠকের প্রস্তাব দেন। বৈঠকের এই প্রস্তাবাবলী মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে আমাদের নিকট পাঠান হয়। আমরা নাগরিক পরিষদের নেতৃবর্গের প্রতি যথারীতি শ্রদ্ধার সহিত নিবেদন করি, ঢাকার রাজপথে মিছিলে

নেতৃত্ব দিন ও জনতার কাতারে শামিল হউন। ইহার বিকল্প যে কোন প্রচেষ্টাকে দেশবাসী বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া চিহ্নিত করিবে।

এই সময়ে শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হক মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সদর দরজায় উপস্থিত হইয়া ৫০০/ (পাঁচশত টাকা) চাঁদা দিতে চাহেন এবং আমাকে তাঁহার সহিত দেখা করিতে খবর পাঠান। সর্বজনমান্য শেরে বাংলা উপরোল্লিখিত নাগরিক কমিটির (Citizens Committee) অন্যতম নেতা এবং তিনি তখনও ঢাকা হাইকোর্টে নূরুল আমিন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সরকারী বেতনভুক্ত এডভোকেট জেনারেল। তাই তাঁহার সহিত আন্দোলনের এই সংকটময় মুহূর্তে দেখা না করাই শ্রেয় মনে করি।

রেলওয়ে ধর্মঘট

ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদক মোঃ সুলতান, কাজী আজিজুর রহমান এবং কতিপয় উৎসাহী ও সাহসী যুবলীগ কর্মীসহ আমার নিকট রেলওয়ে ধর্মঘট তথা রেলের চাকা বন্ধ করিবার প্রস্তাব নিয়া আসে এবং এই ব্যাপারে আমার মতামত জানিতে চায়। আমি সর্বাত্মক ধর্মঘটের পক্ষে আছি এবং ইহা ছাড়া সরকারকে নতজানু করা সম্ভব হইবে না বলিয়া তাঁহাদের জানাই। তাঁহারা নানা কৌশলে রেলের চাকা কার্যতঃ বন্ধ করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু ইহার ফলে নাজিরাবাজার ও ঢাকা ফুলবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনে পুলিশ লাঠিচার্জ করে।

২৩শে ফেব্রুয়ারীর বৈঠক

কতিপয় সৎ, সাহসী ও উদ্যোগী কর্মীর প্রচেষ্টায় ২৩শে ফেব্রুয়ারী শনিবার বিকাল তিনটায় সেই সময়ে কারারুদ্ধ কর্মী আজমল হোসেনের মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের কামরায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের এক বৈঠক হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জনাব আবুল হাশিম। সভাপতির আসন হইতে জনাব আবুল হাশিম আমাকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করেন, "অলি আহাদ, আন্দোলনকে আর কত দূর নিতে চাও এবং আর সামনে নেওয়া সম্ভব কিনা?" সভাপতির প্রশ্নের জবাবে আমি বলি যে, "স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন সম্ভাব্য চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে এবং আন্দোলনে ভাটার চিহ্ন দেখা দিয়াছে। তদুপরি অবিরাম আন্দোলন চালাইয়া যাওয়ার মত সাংগঠনিক শক্তি এই পর্যায়ে আমাদের নাই। সুতরাং honourable retreat বা সম্মানজনক পশ্চাদপসরণই আমার দৃঢ় মত।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কেহ কেহ এই বৈঠকের আহবায়করূপে কাজী গোলাম মাহবুবের স্থলে জনাব আতাউর রহমান খানের নাম উল্লেখ করেন। ইহা সর্বৈব ভুল। ৭ই মার্চ রাত্রে আমরা গ্রেফতার হওয়ায় আন্দোলন প্রশমিত হইয়া পরিস্থিতি শান্তভাব ধারণ করিলে পরবর্তী সময়ে আতাউর রহমান খানকে কর্মপরিষদের আহবায়ক করা হয়। ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবিবার বিধায় সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হইতে আমরা ২৫শে ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ সোমবার ঢাকায় সাধারণ ধর্মঘট ও ৫ই মার্চ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী হরতাল ঘোষণা করি।

সরকারী জুলুমের আরেক পর্যায়ে

২৩ শে ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত্রিতে জনাব আবুল হাশিম, পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ সদস্য মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ এবং জনাব খয়রাত হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক অজিত গুহকে নিরাপত্তা আইনে কারারুদ্ধ করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল ও অন্যান্য ছাত্রাবাসের কন্ট্রোল রুম হইতে সরকারের সশস্ত্র বাহিনী মাইক ছিনাইয়া লইয়া যায় এবং নবনির্মিত স্মৃতিস্তম্ভটি চুরমান করিয়া দেয়। সরকার শুধু ইহাতেই ক্ষান্ত হয় নাই।

অবস্থা আয়ত্বাধীন নহে অজুহাতে এবং শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট, সভা শোভাযাত্রাকে বলপ্রয়োগে দমাইয়া দেওয়ার অশুভ চিন্তা হইতেই সরকার আকস্মিকভাবে ২৪শে ফেব্রুয়ারী পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের বাজেট সেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মূলতবী ঘোষণা করেন। জ্ঞানতাপস ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সরকারের চন্ডনীতির বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিলে আকস্মিকভাবেই ২৫শে ফেব্রুয়ারী অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় এবং আবাসিক ছাত্রদিগকে ছাত্রাবাস ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। পুলিশ বাহিনী দুইঘন্টাকালব্যাপী সলিমুল্লাহ হলে তল্লাশি চালায়। একই সঙ্গে হলের হাউস টিউটর অধ্যাপক ডঃ মফিজুদ্দিনকে আটক এবং তাঁহার সহিত ৩৯ জন ছাত্রকেও গ্রেফতার করে।

কিন্তু সরকারের শত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন সত্ত্বেও ২৫শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উল্লেখ্য যে, ঢাকার কোন প্রেস নগদ পয়সাতেও ২৫শে'র হরতাল পালন সংক্রান্ত ইশতেহার ছাপাইতে স্বীকৃত না হওয়ায় যুবলীগ যুগ্ম সম্পাদক জনাব মোঃ সুলতান ও কাজী আজিজুর রহমান নরসিংদী বা ভৈরব হইতে বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া আনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। যদিও সেই মুহূর্তে ঢাকা শহরে সামরিক বাহিনী, সশস্ত্র ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ই,পি,আর), সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী, গোয়েন্দা বাহিনী এক বিভীষিকার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তথাপি ২৪শে ফেব্রুয়ারী দ্বিপ্রহরের মধ্যে বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া বিলি করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ কর্মীদের অকৃত্রিম দেশপ্রেম, ত্যাগী চরিত্র, সুনিপুণ কর্মকৌশল, কঠোর পরিশ্রম, অদম্য সাহস ও উদ্যোগ, কর্তব্যনিষ্ঠা, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, সর্বোপরি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার দৃঢ়চিত্ততা ছিল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও অন্যান্য ভীরু ও সুবিধাবাদী গোষ্ঠির আন্দোলন পরিচালনায় আপোষমূলক নিন্দনীয় ভূমিকার বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য ভরসাস্থল। পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ ২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র রক্তক্ষরণের পর ভাষা আন্দোলনের মূল সাংগঠনিক শক্তিতে পরিণত হয় এবং সাধারণ ছাত্রকর্মীরা সহায়ক শক্তিরূপে নজীরবিহীন আত্মসচেতনতার সাক্ষ্য বহন করে। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমর ভবিষ্যদ্বাণী 'মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ গর্বের সহিত বলেন যে, উর্দুই বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা কিন্তু আমার প্রত্যয় যে, একদিন বাঙ্গালীর সহজ শুভবুদ্ধি প্রমাণ করিবে যে, বাংলা হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই মাতৃভাষা।' কবি রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টি কত নিখুঁত ছিল, ২১শে ফেব্রুয়ারীই উহার রক্ত স্বাক্ষর।

নারায়ণগঞ্জে আন্দোলন

২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র হত্যার পর বিদ্রোহবহ্নি দাবানলের ন্যায় সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। রাজপথে, জনপদে, নগরে, গঞ্জে, গ্রামে, কোটি কোটি বাঙ্গালীর শিরায়-উপশিরায়, ধমনীতে, রক্তকণায় প্রজ্বলিত হয় মুক্তির প্রদীপ্ত মশাল, যার চরম সীমাপ্রাপ্তি ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর, পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে।

যাহা হউক, পুর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী মোতাবেক নারায়ণগঞ্জ রহমতুল্লাহ ইনস্টিটিউশনে আহূত জনসভায় যোগদানের জন্য জনাব আবুল হাশিম নারায়ণগঞ্জ গমন করেন। সভায় বিভিন্ন বক্তা পুলিশের গুলীতে ঢাকার ছাত্রহত্যার বিস্তৃত বিবরণ পেশ করেন। সভাশেষে বিরাট মিছিল পুলিশের গুলীর প্রতিবাদে সমগ্র শহর প্রদক্ষিণ করে। ২২শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা নগরে জালেম সরকারের ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে খন্ড খন্ড মিছিলে ২৩শে ফেব্রুয়ারী সাধারণ হরতাল পালনের আহবান জানান হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারী সমগ্র নারায়ণগঞ্জ শহর ও শিল্প এলাকায় পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ সহ-সভাপতি শামসুজ্জোহা, নারায়গণগঞ্জ যুবলীগ নেতা সফী হোসেন খান, ডাঃ মজিবর রহমান ও অন্যান্য যুবলীগ নেতা আন্দোলন বিমুখ আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা আলমাস আলী ও আবদুল আওয়ালের শত বাধাকে উপেক্ষা করিয়া পূর্ণ হরতাল পালনে নেতৃত্ব দেন। হরতাল শেষে ইস্ট পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবারের সভাপতি জনাব ফয়েজ আহমদের সভাপতিত্বে তুলারাম কলেজ প্রাঙ্গণে এক বিরট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। করাচীর ইংরেজী দৈনিক সম্পাদক জেড, এইচ, সুলেরী এই সভায় বক্তৃতা করেন এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। উল্লেখ্য, ২২শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অব্যাহত আন্দোলনে নারায়ণগঞ্জ মহকুমার বিচক্ষণ এস,ডি,ও, অবাঙ্গালী জনাব ইমতিয়াজীর প্রশাসন কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা বা হস্তক্ষেপ করে নাই।

নারায়ণগঞ্জ মর্গান হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মমতাজ বেগম ছিলেন নারায়ণগঞ্জ ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী। সরকার ও সমাজের সর্বপ্রকার রক্তচক্ষুকে অবজ্ঞার সহিত উপেক্ষা করিয়া এই অপ্রতিরোধ্য তেজস্বিনী নেত্রী যুবলীগ নেতা শামসুজ্জোহা, সফি হোসেন খান ও ডাঃ মুজিবর রহমানের সহিত হাতে হাত ও কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া শহীদদের রক্ত-শপথে নারায়ণগঞ্জবাসীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে উজ্জীবিত করেন। অধুনা পথে-ঘাটে অগ্নিকন্যা দাবীভূষিত বহুনেত্রীর নাম শুনা যায়; কিন্তু তাঁহারা কেহ কি মিসেস মোমতাজ বেগমের ন্যায় অগ্নি অতিক্রম করিয়া জনতার চেতনায় স্বীয় ত্যাগ ও কর্মোদ্যম দ্বারা এবং জানমাল ইজ্জতের পূর্ণ ঝুঁকি নিয়া আন্দোলনের আগুন ছড়াইতে কখনও সক্ষম হইয়াছেন? সরকার মমতাজ বেগমের এই সাংগঠনিক শক্তি ও সাহস লক্ষ্য করিয়াছিল। তাই ২৯শে ফেব্রুয়ারী, মর্গান স্কুল হইতে যুবলীগ নেতা শাসুজ্জোহার বাড়ী 'হীরামহল' গমনকালে পথিমধ্যে পঁচিশ হাজার টাকা তহবিল তসরুফের মিথ্যা বানোয়াট অভিযোগে পুলিশ বাহিনী মিসেস মোমতাজ বেগমকে গ্রেফতার করে। তাঁহাকে নারায়ণগঞ্জ কোর্টে লইয়া যাওয়া হয় ও তাঁহার পক্ষে জামিন প্রার্থনা করা হইলে, উহা না-মঞ্জুর হয়। এমনকি ভাষা আন্দোলন সমর্থক কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি নগদ দশ হাজার টাকা, মহামান্য আদালতের নিকট জামিন হিসাবে তৎক্ষণাৎ জমা দিতে

যাওয়া সত্ত্বেও মিসেস মোমতাজ বেগমকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয় নাই। ইতিমধ্যে তাঁহার গ্রেফতারে উৎকণ্ঠিত ও উত্তেজিত হাজার হাজার জনতা কোর্ট ঘেরাও করিয়া ফেলে এবং মোমতাজ বেগমকে লইয়া পুলিশ বাহিনী ঢাকার পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলে ক্ষুব্ধ জনতা সরকারী কারসাজির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়া রুখিয়া দাঁড়ায়। বিদ্রোহী জনসমুদ্রের অটল অবিচল দৃঢ়তা উপেক্ষা করিয়া পুলিশ ভ্যান জনতার উপর দিয়া অগ্রসর হইতে ব্যর্থ হয়। ক্রোধান্বিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ অবশেষে পশুশক্তি প্রয়োগের আদেশ দেয়। পুলিশ জনতাকে বেদম প্রহার শুরু করিলে জনতা সাময়িকভাবে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে; এবং সেই সুযোগে বন্দী মোমতাজ বেগমকে নিয়া পুলিশ ভ্যান ঢাকা অভিমুখে রওয়ানা হয়। কিন্তু চাষাড়া রেলওয়ে ক্রসিং-এ বিক্ষুব্ধ জনতা রেলওয়ে গেট ফেলিয়া দিয়া পুলিশ ভ্যানের গতিরোধ করে। এইস্থলে জনতা ও পুলিশে আরেক দফা সংঘর্ষ বাঁধে। জজকোর্টে মোমতাজ বেগমের জামিনের জন্য জনাব শামসুজ্জোহা ও ডাঃ মুজিবর রহমান ঢাকায় চলিয়া আসায় যুবলীগ নেতা সফি হোসেন খানকেই সেইদিনকার সেই সংকটময় মুহূর্তে নেতৃত্ব দিতে হয়। পুলিশের আক্রমণে নিরস্ত্র বিদ্রোহী জনতা এক পর্যায়ে রেলওয়ে রাস্তার পাথর খন্ডগুলিকে পুলিশের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার শুরু করে। পুলিশ-জনতা সংঘর্ষে নারায়ণগঞ্জ মহকুমা পুলিশ অফিসার জনাব দেলওয়ার হোসেন আহত হন। ইতিমধ্যে নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা রাজপথের উভয় পার্শ্বস্থ গ্রামগুলি হইতে হাজার হাজার জনতা আন্দোলনে শরীক হয়। তাহারা চাষাড়া হইতে পাগলা পর্যন্ত দীর্ঘ ৬ মাইল রাস্তায় একশত ষাটটি বটগাছ কাটিয়া ঢাকামুখী পথকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে। বেগতিক অবস্থাকে আয়ত্তে আনিবার নিমিত্ত কর্তৃপক্ষ শেষমেষ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসকে তলব করে। পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ সদস্য খান সাহেব ওসমান আলীর বাসস্থান 'বায়তুল আমান' খানা তল্লাশি করা হয়। খানা তল্লাশীকালে 'বায়তুল আমানের' বহু টাকা-পয়সা ও সোনাগহনা লুট হয়, বাড়ী ঘরেরও বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় এবং শুধু খান সাহেব ওসমান আলীকেই নহে, পুলিশ তাঁহার পুত্র মোস্তফা সারওয়ারকেও গ্রেফতার করে। সেই আন্দোলনের মূল কর্ণধার যুবলীগ নেতা সফি হোসেন খান, মিস্ত্রী ইলা বকশী ও ছাত্রী বেলুও গ্রেফতার হন। গ্রেফতারকৃত অপর বন্দী কমরুদ্দীন দবিরকে পুলিশ বেদম প্রহার করে। দিন কয়েকের মধ্যেই শামসুজ্জোহা, জামিল, লুৎফর রহমান এবং সাত বৎসর বয়স্ক বালক মেসবাহউদ্দীন কারারুদ্ধ হন। ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঢাকা কোতওয়ালী থানায় জিজ্ঞাসাবাদের পর ১লা মার্চ বন্দীদিগকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে চালান দেওয়া হয়। অপরিণামদর্শী নূরুল আমিন সরকার ক্ষিপ্ত হইয়া পাঁচজন আইন পরিষদ সদস্য যথা মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, খান সাহেব ওসমান আলী, গোবিন্দ লাল ব্যানার্জী ও মাদার বক্সকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিবার কারণে অনেককেই গুরুতর মাশুল দিতে হইয়াছে। কারাগার হইতে বন্ড সহি করিয়া মুক্তি ক্রয় করিতে অস্বীকার করিলে মিসেস মোমতাজ বেগমকে তাঁহার স্বামী তালাক দেন। এইভাবেই মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে যোগ দিবার অপরাধে নারায়ণগঞ্জ মর্গান গার্লস হাইস্কুলের

হেড মিসট্রেস মোমতাজ বেগমের সংসার তছনছ হইয়া যায়। তাঁহার এই ত্যাগ আমরা মূল্যায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছি কি? এবং সেই অনুযায়ী জাতির কর্ণধারগণ তাঁহাকে যথোপযুক্ত সম্মান দেখাইয়াছেন কি?

চট্টগ্রাম বন্দর নগরীতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন স্তরের সংবেদনশীল ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন দলের সমবায়ে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। চট্টগ্রাম জেলা যুবলীগ আহবায়ক এবং মুক্ত হাওয়ায় মুক্ত চিন্তার বাহন 'সীমান্ত' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক জনাব মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক নির্বাচিত হন। ঢাকায় পুলিশের গুলীতে আহত নিহতদের খবর পাওয়ার পর সন্ধ্যা ৭টায় রোগশয্যা হইতে এই বিদগ্ধ কবি "কাদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি" কবিতাটি রচনা করেন জনাব মাহবুল-উল-আলম চৌধুরী রচিত কবিতাটি নিম্নে দেওয়া হইলঃ

কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি

মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী

ওরা চল্লিশজন কিংবা আরো বেশী
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে রমনার রৌদ্রদগ্ধ
কৃষ্ণচূড়ার গাছের তলায়
ভাষার জন্য, মাতৃভাষার জন্য বাংলার জন্য
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে
একটি দেশের সংস্কৃতির মর্যাদার জন্য
আলাওলের ঐতিহ্য
রবীন্দ্রনাথ, কায়কোবাদ, নজরুলের
সাহিত্য ও কবিতার জন্য।
যারা প্রাণ দিয়েছে
ভাটিয়ালী, বাউল, কীর্তন, গজল
নজরুলের "খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি
আমার দেশের মাটি"
এই দুইটি লাইনের জন্য।
রমনার মাঠের সেই মাটিতে
কৃষ্ণচূড়ার ঝরা পাঁপড়ির মতো
চল্লিশটি তাজা প্রাণ আর
অঙ্কুরিত বীজের খোসার মধ্যে
আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের অসংখ্য বুকের রক্ত
রামেশ্বর, আবদুস সালামের কচি বুকের রক্ত

বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সেরা কোন
ছেলের বুকের রক্ত।
আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের প্রতিটি রক্তকনা
রমনার সবুজ ঘাসের উপর
আগুনের মতো জ্বলছে, জ্বলছে আর জ্বলছে
এক একটি জীবের টুকুরোর মত
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছেলে চল্লিশটি রত্ন
বেঁচে থাকলে যারা হতো
পাকিস্তানের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ
যাদের মধ্যে লিংকন রল্যা
আরার্গ, আইনস্টাইন আশ্রয় পেয়েছিল
যাদের মধ্যে আশ্রয় পেয়েছিল
শতাব্দীর সভ্যতার
সবচেয়ে প্রগতিশীল কয়েকটি মতবাদ
সেই চল্লিশটি রত্ন যেখানে প্রাণ দিয়েছে
আমরা সেখানে কাঁদতে আসিনি
যারা গুলী ভরতি রাইফেল নিয়ে এসেছিল ওখানে
যারা এসেছিল নির্দয়ভাবে হত্যা করার আদেশ নিয়ে
আমরা তাদের কাছে
ভাষার জন্য আবেদন জানাতেও আসিনি আজ
আমরা এসেছি খুনী জালিমের ফাঁসির দাবী নিয়ে
আমরা জানি তাদের হত্যা করা হয়েছে
নির্দয়ভাবে তাদের গুলী করা হয়েছে
ওদের কারো নাম তোমারী মত 'ওসমান'
কারো বাবা তোমারই বাবার মতো
হয়তো কেরানী, কিংবা পূর্ববাংলার
নিভৃত কোন গাঁয়ে কারো বাবা
মাটির বুক থেকে সোনা ফলায়
হয়তো কারো বাবা কোন
সরকারী চাকুরে।
তোমারই আমারই মতো
যারা হয়তো আজকেও বেঁচে থাকতে পারতো
আমারই মতো তাদের কোন একজনের
হয়তো বিয়ের দিন পর্যন্ত ধার্য হয়েছিল

তোমারই মতো তাদের কোন একজনের হয়তো
মায়ের সদ্যপ্রাপ্ত চিঠিখানা এসে পড়ার আশায়
টেবিলে রেখে মিছিলে যোগ দিতে গিয়েছিল
এমন এক একটি মূর্তিমান স্বপ্নকে বুকে চেপে
জালিমের গুলীতে প্রাণ দিল
সেইসব মৃত্যুর নামে
আমি ফাঁসির দাবী করছি
যারা আমার মাতৃভাষাকে নির্বাসন দিতে
চেয়েছে তাদের জন্য
আমি ফাঁসির দাবী করছি
যাদের আদেশে এই দুর্ঘটানা ঘটেছে তাদের জন্য
ফাঁসি দাবী করছি
যারা এই মৃতদেহের উপর দিয়ে
ক্ষমতার আসনে আরোহণ করেছে
সেই বিশ্বাসঘাতকদের জন্য
আমি ওদের বিচার দেখতে চাই
খোলা ময়দানে সেই নির্দিষ্ট জায়গাতে
শাস্তি প্রাপ্তদের গুলীবিদ্ধ অবস্থায়
আমার দেশের মানুষ দেখতে চায়।
পাকিস্তানের প্রথম শহীদ
সেই চল্লিশটি রত্ন
দেশের চল্লিশজন সেরা ছেলে
মা, বাবা, বৌ আর ছেলে নিয়ে
এই পৃথিবীর কোলে এক একটি
সংসার গড়া যাদের
স্বপ্ন ছিল
যাদের স্বপ্ন ছিল আইনস্টাইন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে
আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার
যাদের স্বপ্ন ছিল রবীন্দ্রনাথের
কিভাবে মানুষের কাজে লাগানো যায়
তার সাধনা করার
'বাঁশীওয়ালার' চেয়েও সুন্দর
একটি কবিতা রচনা করার।
সেই সব শহীদ ভাইয়েরা আমার

যেখানে তোমরা প্রাণ দিয়াছ
যেখানে হাজার বছর পরেও
সেই মাটি থেকে তোমাদের রক্তাক্ত চিহ্ন
মুছে দিতে পারবে না সভ্যতার কোন পদক্ষেপ
যদিও অসংখ্য মিছিল অস্পষ্ট নিস্তব্ধভাবকে ভঙ্গ করছে
তবুও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ঘন্টাধ্বনি
প্রতিদিন তোমাদের মৃত্যুক্ষণ
ঘোষণা করবে
যদিও আগামীতে কোন ঝঞ্ঝা ঝড় বিশ্ববিদ্যালয়ের
ভিত্তি পর্যন্ত নড়িয়ে দিতে পারে
তবুও তোমাদের শহীদ নামের উজ্জ্বল্য
কিছুতেই মুছে যাবে না।
খুনী জালিমের নিপীড়নকারীর কঠিন হাত
কোনদিনও চেপে দিতে পারবেনা
তোমাদের সেই লক্ষ দিনের আশাকে
যেদিন আমরা লড়াই করে জিতে নেব
ন্যায়-নীতির দিন
হে আমার মৃত ভায়েরা
সেই নিস্তব্ধতার মধ্য থেকে
তোমাদের কণ্ঠস্বর
স্বাধীনতার বলিষ্ঠ চিৎকার
ভেসে আসবে
সেইদিন আমাদের দেশের জনতা
খুনী জালিমকে ফাঁসির কাষ্ঠে
ঝুলাবেই ঝুলাবে
তোমাদের আশা অগ্নিশিখার মতো জ্বলবে
প্রতিশোধ এবং বিজয়ের আনন্দে।

(চট্টগ্রাম। ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২, রাত ৭টা
মুল কবিতার প্রথমাংশ)।

জনাব মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী রোগশয্যায় পুলিশ প্রহরাধীন থাকিবার কারণে চট্টগ্রাম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহবায়কের দায়িত্ব বর্তায় চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আওয়াজ' সম্পাদক বিপ্লবী জননেতা চৌধুরী হারুন-উর-রশীদের স্কন্ধে। আন্দোলনের সক্রিয় নেতৃত্ব দানের কারণে তিনি পুর্বপাক জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হইয়া বিনাবিচারে

রাজবন্দী জীবন-যাপন করেন।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পরিচালনার তাগিদে নিম্নলিখিত ১৭ সদস্যবিশিষ্ট বগুড়া জেলা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। পরিষদ সদস্যবৃন্দরা হইলেনঃ

বগুড়া যুব লীগ সম্পাদক জনাব ছমিরুদ্দিন মন্ডল, যুগ্ম সম্পাদক জনাব গোলাম মহিউদ্দিন ও শেখ হারুনুর রশীদ, জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মজিরুদ্দিন আহমদ, জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক এ.কে. মুজিবর রহমান, কবিরাজ শেখ আবদুল আজিজ, সিরাজুল ইসলাম, বগুড়া ছাত্রলীগ নেতা আবদুস শহীদ, নূরুল হোসেন মোল্লা, মোটর শ্রমিক নেতা কমরেড সুবোধ লাহিড়ী, বিড়ি শ্রমিক নেতা শাহ আহমদ হোসেন, রিকশা শ্রমিক নেতা মোখলেসুর রহমান, কৃষক নেতা ফজলুর রহমান, তমদ্দুন মজলিস নেতা খন্দকার রুস্তম আলী ও লুৎফর রহমান, কৃষক প্রজা পার্টির কবিরাজ মোফাজ্জল বারী। আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মজিরুদ্দিন আহমদ ও যুবলীগ নেতা জনাব গেলাম মহিউদ্দিনকে যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও কনভেনর নির্বাচিত করা হয়।

আন্দোলন স্তিমিত হওয়ার লক্ষণ দেখা দিলে ২৯শে ফেব্রুয়ারী সর্বজনাব গোলাম মহিউদ্দিন, শেখ হারুনুর রশীদ, ছমিরুদ্দিন মন্ডল, নূরুল হোসেন মোল্লা, আবদুল মতিন ও বাবু সুবোধ লাহিড়ীকে পূর্বপাক নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে ও বগুড়া জেলা কারাগারে বিনাবিচারে আটক রাখে।

ভাষা আন্দোলনে চুয়াডাঙ্গার ভূমিকা

অন্যান্য জাতীয় আন্দোলনের মত ভাষা আন্দোলনেও চুয়াডাঙ্গা পিছিয়ে থাকেনি, বরং অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে চুয়াডাঙ্গায় প্রথম ঘটনা ঘটে ১৯৪৮ সালের ১৫ই আগস্ট। তরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা "আজি হতে শত বর্ষ পরে" নাটকটি স্থানীয় শ্রীমন্ত টাউন হলে মঞ্চস্থ হয়। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত এই নাটকে অভিনয় করেন-মির্জা সুলতান রাজা, আবদুল কাদির, মোহাম্মদ শাহজাহান প্রমুখ।

২১ ফেব্রুয়ারী '৫২ তারিখে ঢাকায় গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারী সকাল দশটায় চুয়াডাঙ্গার নীলমনিগঞ্জের পরিমল বোসের বাড়িতে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রীয় মনোগ্রাম প্রণেতা এন এন সাহা। বক্তব্য রাখেন পরিমল বোস, হাবু ঘোষ, তারাপদ মৈত্র, অমূল্য ঘোষ, জব্বার খান, সৈয়দ আলী, আতিয়ার রহমান ও অমৃত লাহিড়ী প্রমুখ। সভায় গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা জানিয়ে আন্দোলন বেগবান করার শপথ নেয়া হয়। সভা শেষে এক মিছিল বের হয়। কিন্তু সভার কথা ফাঁস হয়ে পড়ে। ফলে ঐ রাতেই পুলিশ প্রত্যেকের বাড়ি হানা দেয়। ঐ রাতেই পরিমল বোস প্রথম গ্রেফতার হন। অন্যরা আন্দোলনের স্বার্থে গা ঢাকা দেন।

এন এন সাহা ঐ রাতেই গোপনে পরিমল বোসের গ্রেফতারের সংবাদ চুয়াড়াঙ্গাতে পৌছান। নেতৃবৃন্দ পরদিন ২৩ ফেব্রুয়ারী '৫২ তারিখে বেলা এগারোটায় চুয়াডাঙ্গা ভি জে স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় পরিমল বোসের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শেখ রহিম বক্স। বক্তব্য রাখেন ডাঃ আশাবুল হক, ওবায়দুর রহমান,

ওহিদ হোসেন, মজিবর রহমান ও রফাতুল্লাহ। তুখোড় ছাত্রনেতা ওহিদ হোসেনকে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক নির্বাচন করা হয়। এছাড়া উপস্থিত সবাইকে সদস্য অন্তর্ভূক্তি করা হয়।

২৪ ফেব্রুয়ারী'৫২ তারিখে চুয়াডাঙ্গা জেলায় ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়। ছাত্রছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আহবানে সাড়া দেয়। প্রখ্যাত ছাত্রনেতা মোহাম্মদ শাহজাহানের যোগ্য নেতৃত্বে বিশাল মিছিল বের হয়। মিছিল শেষে আলী হোসেন মিয়ার আমবাগানে সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন এডভোকেট আবুল হাশেম। বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ শাহজাহান, উষা চ্যাটার্জী, ইলা হক, শশধর চট্টোপাধ্যায়, বেলা ও সুধীন সরকার।

মিছিল-মিটিং এ তৎকালীন সরকার ব্যাপক তৎপর হয়ে ওঠে এবং আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি ও সমস্ত শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ফলে নেতারা আত্মগোপন করেন।

১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য চুয়াডাঙ্গা শহরে এ্যাডভোকেট তৈয়বুর রহমান ও এ্যাডভোকেট আজগার আলীর নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে এ্যাডভোকেট আজগার আলী প্রথম গুলিবিদ্ধ হন। তারিখটা ছিল ২৫ ফেব্রুয়ারী'৫২।

২৬ ফেব্রুয়ারী '৫২ তারিখে বেলা ১২টায় কুষ্টিয়া পুলিশ সুপার এম এল হক চুয়াডাঙ্গার শীর্ষস্থানীয় নেতাদের তার সম্মেলন কক্ষে ডাকেন। পুলিশ সুপার অভিযোগ করে বলেন, "হিন্দুস্থানের হিন্দুরা এদেশে ভাষা আন্দোলনের নামে উস্কানি দিয়ে পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চায়।" এডভোকেট ইউনুছ আলী সাথে সাথে এর প্রতিবাদ জানান। এক পর্যায়ে চরম কথা কাটাকাটির ফলে সভা ভুন্ডল হয়ে যায়।

৫২-এর ভাষা আন্দোলনে নোয়াখালী

৫২'র ২১শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষার দাবীতে ঢাকার আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের গুলি বর্ষনে হতাহতের খবরে বৃহত্তর নোয়াখালীর সর্বস্তরের মানুষ প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তৎকালীন নোয়াখালী জেলা যুবলীগের সভাপতি খাজা আহমদ (পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ এম সি এ) সাধারণ সম্পাদক বজলুর রহমান, নোয়াখালী সদর মহকুমা যুব লীগের বজলুর রহমান, নোয়াখালী সদর মহকুমা যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক রইস উদ্দীন আহমদ এর নেতৃত্বে নোয়াখালীতে ভাষার দাবীতে প্রচন্ড আন্দোলন সৃষ্টি হয়। এ সময় তাদের সাথে এ আন্দোলনে যে তিন জন ছাত্র নেতা সক্রিয় অংশ নেন তারা হলেন নুরুল হক চৌধুরী (কমরেড মেহেদী) কাজী মেজবাহ উদ্দীন ও নিখিল দাশ গুপ্ত।

সেসময় সেখানে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সিরাজ উদ্দীন যে নাকি মুসলীম লীগ সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কর্মী। ঢাকায় গুলি বর্ষনে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে যখন এলাকার মানুষ চরমক্ষুব্ধ তখন তিনি তাদের মাঝে একাত্ম হয়ে আন্দোলনে যোগ দেন এবং স্কুল সমূহে ছাত্র ধর্মঘট সফল করতে বিরাট ভূমিকা রাখেন।

ভাষা আন্দোলনের সেই অগ্নিঝরা দিনগুলোতে আন্দোলন সংগ্রাম করতে গিয়ে ফেনী হতে খাজা আহমদ, শামসুল হুদা, স্কুল ছাত্র কাজী মেসবাহ উদ্দীন, নিখিল কান্তি দাশ গুপ্ত.

মাইজদীতে আবুল কাসেম, চৌমুহোনীতে গ্রেফতার হন রইস উদ্দীন আহমদ, ফজলুল করিম, ডাঃ রাস বিহারী দাস , চিত্তরঞ্জন শাহ (পুঁথিঘর) ও নুরুল হক। নুরুল হক চৌধুরীর (কমরেড মেহেদী) বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী হলেও পুলিশ তাঁকে ধরতে পারেনি। সেসময় মাইজদী শহরে জননেতা চনুমিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে তৎকালীন এম এল এ জনাব মজিবর রহমান এম,এল, এ পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। পরবর্তীতে অবশ্য তিনি পদত্যাগ করেননি।

সরকারী অপপ্রচার

সরকার আন্দোলন পরিচালনাকারীদিগকে ভারতীয় অর্থে পুষ্ট ভারতীয় অনুচর বলিয়া অপবাদ দিতে সামান্যতম কসুর করে নাই। নারায়ণগঞ্জ-কালীবাজারে আততায়ীর গুলীতে নিহত প্রহরারত কনস্টেবল সৈয়দ জোবায়েদ ও আহত আনসার খলিল আহমদের পরিবারদ্বয়কে যথাক্রমে ১০ হাজার টাকা ও ২ হাজার টাকা এককালীন ক্ষতিপূরণ দান করা হয়। জনমন বিষাইয়া তোলার উদ্দেশ্যেই উক্ত ক্ষতিপূরণ দানের সিদ্ধান্ত ঘোষণাকালে ২রা মার্চ মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন বলেন যে, ভারতীয় অনুচরেরাই উক্ত নির্মম হত্যাকান্ডের সহিত জড়িত। কিন্তু আপামর দেশবাসী নূরুল আমিন সরকারের এই অভিযোগকে অবজ্ঞার সহিত উপেক্ষা করে। শুধু তাই নয়, শহীদ মিনার বা স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হইলে কেবল নগদ অর্থই নহে, বহু লোকই উক্ত স্মৃতিস্তম্ভ বেদীতে সোনা-দানা দিয়া তাহাদের ব্যথিত হৃদয়ের অর্ঘ্য রাখিয়া গিয়াছেন। কোন কোন মহিলা নিজ গলার পরিহিত সোনার হার স্বীয় হস্তে স্মৃতিস্তম্ভ বেদীতে অর্পণ করিয়াছেন। এই সমস্ত অমূল্যদান আমি মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদকের নিকট জমা রাখিতে বলি এবং আমরা সমবেতভাবে এই মর্মে সিদ্ধান্ত লই যে, আন্দোলনের বিভিন্ন খরচা তথা হইতে নির্বাহ করা হইবে।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হল কেন্দ্রে সংগৃহীত অর্থ জনাব আখতার উদ্দিন আহমদের নিকট জমা ছিল। সুতরাং সরকারী অভিযোগ বা কুৎসা অনুযায়ী বিদেশী অর্থের কোন খবর অন্ততঃ আমরা যাহারা চরম সংকটময় মুহূর্তে আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছি, জানিতাম না। সরকার হীন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই আমাদিগকে অনর্থক হিন্দুস্থানের দালাল বলিয়া দেশে বিদেশে প্রচার করিয়াছে।

আন্দোলনে ভাটা

স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন স্বাভাবিক নিয়মেই গতিশীলতা হারাইয়া ফেলে। আন্দোলনে ভাটা দেখা দেয়। সাংগঠনিক শক্তির অভাবে এই ভাষা আন্দোলনকে বৈপ্লবিক কোন আন্দোলনে রুপান্তরিত করা তখনকার দিনে সম্ভব ছিল না। তদুপরি সরকারী তৎপরতা ও দমননীতির দরুন আন্দোলনের অভ্যন্তরেও বিশ্বাসঘাতকতা মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে শুরু করিয়াছিল। অতি বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিও অর্থ প্রলোভনে পড়িয়া বা কারা নির্যাতনের ভয়ে আমাদের আশেপাশে অবস্থান করিয়াই আমাদের কর্মতৎপরতা ও অবস্থান সম্পর্কে সরকারী গোয়েন্দা বিভাগে নিয়মিত রিপোর্ট করিতে থাকে। সেই অগ্নিক্ষরা দিনগুলিতে আন্দোলনের

স্বার্থেই আমাকে আন্দোলনের স্নায়ুকেন্দ্র মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের ৭ নম্বর ব্যারাকের ৫ নম্বর রুমে আমার বাল্যবন্ধু আলী আজগর, নজরুল ইসলাম ও কাসেদুল হক থাকিত। আমি তাহাদের সহিত রাত্রি যাপন করিতাম এবং আমার সবকিছুই তাহারা অত্যন্ত দরদের সহিত দেখাশুনা করিত। আমার নিরাপত্তার প্রতিও তাহারা সজাগ ছিল। ইহা কেবলমাত্র বন্ধুত্বের নিদর্শন নহে; ইহা অকৃত্রিম দেশপ্রেমের অকাট্য প্রমাণও বটে

হোম (স্পেশাল) ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র (বিশেষ) বিভাগ কর্তৃক ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রকাশিত ঢাকা গেজেটে (এক্সট্রা অর্ডিনারী) গভর্ণর নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৩০ দিনের মধ্যে স্ব-স্ব জিলা প্রশাসকের নিকট হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন।

কাজী গোলাম মাহবুব, আহবায়ক, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ, বরিশাল; খালেক নেওয়াজ খান, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, ময়মনসিংহ; শামসুল হক, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, ময়মনসিংহ; অলি আহাদ, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ, ত্রিপুরা; আবদুল মতিন, আহবায়ক, বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ, পাবনা; সৈয়দ এম, নূরুল আলম, পাবনা; আজিজ আহমদ নোয়াখালী; আবদুল আওয়াল, ত্রিপুরা; মোঃ তোয়াহা, সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান শান্তি কমিটি, নোয়াখালী।

২৯শে ফেব্রুয়ারী নারায়ণগঞ্জ মর্গান গার্লস হাইস্কুলের হেড মিস্ট্রেস মিসেস মোমতাজ বেগমকে গ্রেফতারের ফলে নারায়ণগঞ্জে যে গণঅভ্যুত্থান দেখা দিয়াছিল এবং তাহা দমাইতে সরকার যে কি পাশবিক শক্তি ব্যবহার করিয়াছিল, সেই নজীরবিহীন ঘটনার উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি। সেই সময়ে নারায়ণগঞ্জ শহরে যে কারফিউ বা সান্ধ্য আইন জারি করা হইয়াছিল, সেই সান্ধ্য আইন ৭ই মার্চ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। এই সময়ের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ হইতে দুইজন ছাত্রীসহ মোট একশত পনেরজনকে গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ করা হয়। আমি আত্মগোপন অবস্থায় নারায়ণগঞ্জ অভ্যুত্থানের নায়কদের অন্যতম পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ সহ-সভাপতি শামসুজ্জোহা ও ডাঃ মুজিবর রহমানের সহিত ঢাকাস্থ মদনমোহন বসাক রোডের (বর্তমান টিপু সুলতান রোড) জনাব আবদুল জলিলের বাসভবন STEP-IN এ সাক্ষাৎ করিতাম এবং আন্দোলনের বিভিন্ন করণীয় দিক নিয়া বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা ও পর্যালোচনা করিতাম।

গ্রেফতার

৫ই মার্চ আহূত সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী সাধারণ হরতাল, মিছিল ও সভা সরকারী কঠোর দমননীতির জন্য আশানুরূপভাবে সফল হইতে পারে নাই। এমতাবস্থায় কর্তব্য নির্ধারণকল্পে ৭ই মার্চ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় ৮২ নং শান্তিনগরে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এক সভা আহবান করা হয়। ৮২ নং শান্তিনগর যাওয়ার পথে জগন্নাথ কলেজের ছাত্র যুবলীগ কর্মী আনিসুজ্জামান আমার পথ প্রদর্শক ছিলেন। সভায় আমি ব্যতীত কাজী গোলাম মাহবুব, জনাব আবদুল মতিন, মীর্জা গোলাম হাফিজ, জনাব মুজিবুল হক (সহ-

সভাপতি, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদ), হেদায়েত হোসেন চৌধুরী (সাধারর সম্পাদক, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদ) এবং মোঃ তোয়াহা উপস্থিত ছিলেন। ইহা ব্যতীত মোঃ সাদেক খান ও আবদুল লতিফ, হাসান পারভেজ ও আনিসুজ্জামানও উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আমাদের সভা সমাপ্ত প্রায়, এমন সময়ে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ৮২ নং শান্তিনগর ঘেরাও করে। অংশগ্রহণকারী সদস্যদের পুনঃপুনঃ সতর্কবাণী সত্ত্বেও জনাব মোঃ তোয়াহার অতিরিক্ত বক্তব্য ও একই বক্তব্য বারবার বলার প্রচেষ্টায় সভার কাজে অনর্থক কালক্ষেপণ হইতেছিল। জনাব তোয়াহার অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘায়িত বক্তব্যই এই দুর্ঘটনার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। পুলিশের পদধ্বনি পাওয়ামাত্র তাকাইয়া দেখি আমরা পুলিশ পরিবেষ্টিত। তথাপি পুলিশের গ্রেফতারী এড়াইবার চেষ্টায় কেহ চাকর সাজিয়া কেহ বা ঘরের কোণায় গৃহবাসী হইয়া পুলিশকে ফাঁকি দিতে চাই। কিন্তু কিছুই হয় নাই। তবে কাজী গোলাম মাহবুব ঘরের বাঁশের মাচার উপর এমনভাবে শয়ন করিয়াছিলেন যে, পুলিশের শ্যেনদৃষ্টিও তাঁহাকে আবিষ্কার করিতে পারে নাই; যদিও সংবাদদাতার তালিকায় কাজী গোলাম মাহবুবের নাম ছিল। হাসান পারভেজ ও আনিসুজ্জামান (পরবর্তীকালে ডক্টরেট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) গ্রেফতার হয় নাই। আমাদের বৈঠকের স্থানের সামনে দিয়া লম্বা ছিপছিপে একটি লোক সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করিতেছিল। গলা হইতে মুখমন্ডলের দুই পাশের দুই কানসহ মাথার উপর দিয়া গরম কমফার্টার বাঁধা থাকায় তাহাকে চেনা দুষ্কর ছিল। হয়তো বা গোয়েন্দা বিভাগের সহিত সম্পর্কিত লোকও হইতে পারে।

যাহা হউক, গ্রেফতারকৃত সবাইকে নিয়া কোতোয়ালী থানা হাজতে আটক রাখা হয়। খবর পাওয়ামাত্র ঢাকা সিটি পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট জনাব মাসুদ মাহমুদ হন্তদন্ত হইয়া আমাদিগকে দেখিতে আসিলেন। এক নজর আমাদের দিকে তাকাইয়া তিনি থানা অফিসারকে জিজ্ঞাসা করিলেন "Have you linched them" "অর্থাৎ বেত্রাঘাত করিয়াছ কি?" তাহার প্রশ্নে আমরা ক্ষোভে, অপমানে ও ক্রোধে গড়গড় করিতেছিলাম।

ঢাকা ওয়াইজঘাটে অবস্থিত গোয়েন্দা বিভাগের সদর দফতরে আমাকে ও আবদুল মতিনকে স্থানান্তরিত করা হয়। ৮ই মার্চ সকাল নয়টায় গোয়েন্দা বিভাগের সদর দফতরে তদানীন্তন আই,জি,পি, জাকির হোসেন, ডি,আই,জি, ওবায়দুল্লাহ, গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান ডি,আই,জি, হাফিজুদ্দিন ও গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান সুপারিন্টেডেন্ট তসলিম আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আমার দিকে চাহিয়া মজার প্রশ্ন করেন আই,জি,পি, জাকির হোসেন, "এই নাকি প্রধানমন্ত্রী?" উক্ত মন্তব্যের নিগূঢ় অর্থ অনুধাবন করিতে ব্যর্থ হইয়া হতচকিতভাবে তাঁহার দিকে তাকাইলাম। পরবর্তীকালে অবগত হই যে, আমরা নাকি সুইসাইড স্কোয়াড করিয়াছি এবং আমার নেতৃত্বে নাকি অস্থায়ী বিকল্প সরকারও গঠিত হইয়াছে। বাহবা দিতে হয় সংবাদদাতাগণকে। গোয়েন্দা বিভাগ যে কাল্পনিক তথ্য সংগ্রহে কত পারদর্শী, উপরে বর্ণিত তথ্যাবলী হইতেই উহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

গোয়েন্দা বিভাগ সদর দফতরে পাঁচদিন পাঁচ রাত্রি আমাকে অবিরাম জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদকালে তাহাদের প্রশ্নের উত্তর বড় একটা দিতাম না। ইহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া

তাহারা নানারকম ভয়ভীত দেখাইত, অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করিত ও সময়ে সময়ে প্রহার করিত। তাহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এই যে, আমরা ভারতীয় অর্থ ও কারসাজিতেই এই ভয়াবহ গণআন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছি। অথচ তাহাদের এই অভিযোগ আদৌ সত্য নহে। ইহা মিথ্যা ও বানোয়াট। ইহা আমরা স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই। সুতরাং আমার জবানীতে মিথ্যা স্বীকারোক্তি কেন করিতে যাইব? ১২ই মার্চ সন্ধ্যা রাতে এক হাওয়ালদার আমাকে ক্যান্টনমেন্টে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি লইতে খবর দিয়া গেল। উদ্দেশ্য ফৌজি ছাউনিতে দৈহিক নির্যাতন চালান। তাহা হইলেই সকল গোপনীয় খবর প্রকাশ করিয়া দিব। আমি মনে মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালাকে স্মরণ করিয়া মানসিক প্রস্তুতি নিলাম। দৈহিক নির্যাতন যতই হউক মিথ্যা স্বীকারোক্তি করিব না। যে ষড়যন্ত্রের বিন্দুবিসর্গও জানি না, তাহার খবর বলিব কোথা হইতে? যাহা হউক, পুলিশ রাত্রিভর জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহারা আমাকে ক্যান্টনমেন্টে লইয়া যায় নাই। পথ হইতেই ফিরাইয়া আনিয়াছিল। ক্যান্টনমেন্টে যাওয়ার পথে কেবল "ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল গান" রচনাকারী জুলিয়াস ফুঁচিকের অকথ্য পাশবিক অত্যাচার সহ্য করিবার কাহিনীই আমার মনে সাহস ও মনোবল যোগাইত।

১৩ই মার্চ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠাইবার পূর্বক্ষণে গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান ডি,আই,জি, হাফিজুদ্দিন আহমদের সহিত আমার পুনঃপুনঃ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। কারাগারের দেওয়ানী ওয়ার্ডে আমাকে পাঠানো হয়। দেওয়ানী ওয়ার্ডে খন্দকার মোশতাক আহমদ, মীর্জা গোলাম হাফিজ, মোঃ তোয়াহা, দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার সম্পাদক আবদুস সালাম পূর্ব হইতেই ছিলেন। উল্লেখ্য, "দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার" ১২ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় CRYPTO FASCISM শিরোনামে এক সম্পাদকীয় লিখার কারণে ১৩ই ফেব্রুয়ারী এক সরকারী আদেশে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহারা সবাই ভাষা আন্দোলনের শিকার। কিছুদিনের মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল বিভাগ প্রধান ও রীডার ডঃ পি,সি, চক্রবর্তী আমাদের সহিত যোগ দেন। ডঃ চক্রবর্তীকে সঙ্গদান প্রয়োজনে দেওয়ানী ওয়ার্ডে বেশীর ভাগ সময় তাস (ব্রীজ) খেলিতে হইত। কারণ, শ্রদ্ধেয় ডঃ চক্রবর্তীকে প্রফুল্লচিত্ত রাখার মিত্ত সঙ্গদান আমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য ছিল। কয়েকদিনের মধ্যে মুচলেকা সহি করিয়া, রাজনীতি করিব না অঙ্গীকার করিয়া মীর্জা গোলাম হাফিজ কয়েদখানা হইতে মুক্তি ক্রয় করিলেন।

ইতিমধ্যে সর্বজনাব শামসুল হক, কাজী গোলাম মাহবুব, সৈয়দ নূরুল আলম ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী জেলা প্রশাসকের নিকট হাজিরা দিয়া নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির জয়ধ্বনি করিয়া স্বেচ্ছায় কারান্তরালে প্রবেশ করিলেন। জেলা কর্তৃপক্ষ আমাদিগকে দেওয়ানী ওয়ার্ড হইতে ৫ নং ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করিল। ৫ নং ওয়ার্ডে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আবুল হাশিম, শামসুল হক, মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, খান সাহেব ওসমান আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক অজিত গুহ, কাজী গোলাম মাহবুব, খালেক নেওয়াজ খান, আজিজ

আহমদ, মোঃ তোয়াহা, শওকত আলী, হাশিমুদ্দিন আহমদ, আবদুল মতিন, ফজলুল করিম ও আমি একত্রে বাস করিতাম। সর্বপ্রকার আশা-নিরাশার আলো ছায়া খেলায় বৃদ্ধ মওলানা ভাসানী সকলের নিকট পিত্রসুলভ স্নেহ, মায়া, মমতা এবং সাহস, উৎসাহ ও দৃঢ়তার মূর্তপ্রতীক ছিলেন। আমাদের খাওয়া-দাওয়া ও ওষুধ-পত্রে যাহাতে অসুবিধা না হয় তাহার জন্য তিনি জেল কর্তৃপক্ষকে সুকৌশলে জয় করিয়া রাখিতেন। মোদ্দাকথা, তাঁহার অপত্য স্নেহ ও নির্ভীক মন সেই সময় দুর্লভ প্রেরণার উৎস ছিল।

ভীরু নেতারা মন্ত্রী, মেম্বার, সমাজে গণ্যমান্য হইবার খায়েশ রাখেন কিন্তু সরকারী লাঠিপেটা খাইতে প্রস্তুত নহেন। ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগ সম্পাদক জনাব হাশিমুদ্দিন আহমদ ময়মনসিংহ জেলা কারাগার হইতে স্থানান্তরিত হইয়া ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আসেন। জনাব আবুল মনসুর আহমদ ময়মনসিংহ হইতে এক চিঠিতে হাশিমুদ্দিন সাহেবকে বন্ড সহি করিয়া মুক্তি ক্রয় করিতে উপদেশ দিয়া পাঠান। কত সামান্যের জন্যই না আমাদের বিবেক বিক্রয় হইতে প্রস্তুত! আর নেতার চরিত্রই যখন এইরূপ, তখন অনুসারীদের চরিত্র উচ্চমানের হওয়ার সুযোগ কোথায়? বোধহয় নেত্রবৃন্দের মেরুদন্ডহীন চরিত্রের কারণেই গণতান্ত্রিক রাজনীতি একনায়কতন্ত্রবাদী দর্শনে বিশ্বাসী রাজনীতির নিকট ক্রমশঃ পরাজয়বরণ করিতেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অমান্য করিয়া ১৪৪ ধারা ভঙ্গকে Immoral বা নীতি বিহর্গিত বলিয়া আমার নিন্দা করিতেন; কিন্তু অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও অধ্যাপক অজিত গুহ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্তের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের যাহারা বিরোধী তাহাদের কাহাকেও গ্রেফতার করা ন্যায়তঃ সঠিক হয় নাই, তবে নির্যাতনই যে সরকারের অস্তিত্বের ভিত্তি, তাহাদের পক্ষে শাসনদন্ডের বিবেকপ্রসূত ও নীতিগত ব্যবহার নহে বরং বিদ্বেষমূলক ব্যবহারই স্বাভাবিক, কেননা মূল প্রতিপাদ্য লক্ষ্যই হইল সর্বপ্রকার বিরোধী কণ্ঠকে স্তব্ধ করিয়া দেওয়া।

ইতিমধ্যে জাষ্টিস এলিস-এর নেতৃত্বে ২১শে ফেব্রুয়ারী পুলিশ কর্তৃক গুলী চালনার যথার্থতা বিবেচনার জন্য প্রকাশ্য তদন্ত শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৃত্তিকা বিভাগের প্রধান ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোস্ট ডঃ এম, ও গণি তদন্ত কমিশন সমীপে সাক্ষ্য দানকালে বলেন যে, তিনি ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত ছাত্র সভায় মাত্র দুইজন অছাত্র জনাব শামসুল হক (সাধারণ সম্পাদক, পূব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ) ও অলি আহাদকে দেখিয়াছেন। ডঃ গনির এই সাক্ষ্যদানে আমার নামোল্লেখ দেখিয়া মোশতাক ভাই বলিতেন যে, উস্কানিদাতা হিসাবে আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হইতে পারে। কেননা জনাব শামসুল হক ও জনাব তোয়াহাও ছাত্র ছিলেন না। কিন্তু তাঁহারা যেহেতু ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন সেইহেতু তাঁহাদের নাম উল্লেখ হউক বা না হউক তাহাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের মামলার প্রশ্নই উঠে না।

আমাদের গ্রেফতারের কিছুদিনের মধ্যেই জনাব আতাউর রহমান খানকে আহবায়ক নির্বাচিত করিয়া সর্বদলীয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' পুনর্গঠিত করা হয়। ইহারই ফলশ্রুতি

১৯৫২ সালের ২৭শে এপ্রিল ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে সমগ্র দেশ হইতে আগত ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ৫০০ শত সংগ্রামী সৈনিক এক সম্মেলনে সমবেত হন। জনাব আতাউর রহমান খান সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সম্মেলনে মফস্বল জেলাসমূহের প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে একজন করিয়া বক্তৃতা দেন। যাহারা বক্তৃতা দেন তাহারা হলেনঃ

সর্বজনাব শামসুল হক (রাজশাহী), আবদুল গফুর (খুলনা), আবুল হোসেন (ফরিদপুর), আবুল হাশেম (বরিশাল), আজিজুর রহমান (চট্টগ্রাম), হাতেম আলী তালুকদার (ময়মনসিংহ), হাবিবুর রহমান (সিলেট), শফিকুল হক (কুমিল্লা), এস হোসেন (রংপুর), আবদুস সাত্তার বি.এল (বগুড়া), আবদুল বারী বি.এল. (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মোহাম্মদ আলী (দিনাজপুর), আবদুল মোনেম (পাবনা), সাইদুর রহমান (কুষ্টিয়া), আলমগীর সিদ্দীকী (যশোহর), আনিসুর রহমান (নোয়াখালী)। তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ হইতে মিঃ ফকরুজ্জামান খান, ইসলামিক ভ্রাতৃসংঘের পক্ষ হইতে জনাব ইব্রাহীম তাহা, উর্দু লেখক সংঘের পক্ষে জনাব হাসান পারভেজ, পূর্ব পাক যুবলীগের সভাপতি জনাব মাহমুদ আলী, পূর্বপাক ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান, ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের পক্ষে জনাব ওবায়দুল্লাহ, মেয়েদের পক্ষ হইতে মিস হালিমা খাতুন (মেডিকেল স্কুল ২য় বর্ষ) মিস হালিমা খাতুন (মেডিকেল স্কুল ৪র্থ বর্ষ), জগন্নাথ কলেজের জনাব আজহারুল ইসলাম, পূর্বপাক আওয়ামী মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমানও বক্তৃতা করেন। উল্লেখ্য যে, শেখ মুজিবুর রহমান ২৬শে ফেব্রুয়ারী কারামুক্তি পান। প্রত্যাশা ছিল ঢাকা আসবেন, আন্দোলনকে জোরদার করবেন। তিনি তাহা করলেন না। ইহা অদ্যাবধি রহস্যাবৃত। সম্মেলনে গৃহীত নিম্নোক্ত প্রস্তাবাবলী সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের ৫ই মে (১৯৫২) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ঃ

১। কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিবৃন্দের এই সম্মেলন যে সকল শহীদ বুলেট, অমানুষিক অত্যাচার, দমননীতি এবং বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবীকে দমাইয়া রাখিবার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মুখে চরম ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতির প্রতি গভীর সম্মান প্রদর্শন করিতেছে।

এই সম্মেলন জনসাধারণকে এই মর্মে আশ্বাস দান করিতেছে যে, শহীদদের লহু বৃথাই প্রবাহিত হয় নাই এবং যতদিন পর্যন্ত না বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষারূপে তাহার ন্যায় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত দেশের কোন প্রকৃত দেশভক্ত লোকই নিশ্চেষ্ট হইবে না।

২। গণপরিষদের কতিপয় ভুয়া যুক্তি সৃষ্টি করিয়া রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখিবার বিষয় বিবেচনা করিয়া সম্মেলন এই মত পোষণ করিতেছে যে, ইহা গড়িমসি নীতির দ্বারা জনগণের দাবীকে পাশ কাটাইয়া যাইবার জন্য গদিতে আসীন দলের আর একটি প্রচেষ্টা মাত্র।

ভাষার দাবীতে সমগ্র জনমত জাগরিক হওয়ার এবং কতিপয় যুবক শাহাদৎ বরণ করিবার পরও রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে তাড়াহুড়া করিবার কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া সরকার যে

হাস্যকর যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, এই সম্মেলন তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে।

৩। সকল বাস্তব প্রয়োজনের জন্যই ইংরেজী অন্ততঃ আরও ২০ বৎসর পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার আসনে আসীন থাকিবে বলিয়া মুসলিম লীগ নেতৃবর্গ এবং তাঁহাদের সরকার যে মন্তব্য করিয়াছেন, এই সম্মেলন তাহাতে গভীর আশংকা প্রকাশ করিতেছে। এই সম্মেলন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেছে যে, রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে পাশ কাটাইয়া যাইবার জন্য ইহা আর একটি অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচেষ্টা।

৪। এই সম্মেলন মনে করে যে, গত ৫ বৎসর কালের মধ্যে গণপরিষদ যে কেবলমাত্র একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নেই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা নহে, বরঞ্চ জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর একটিরও সমাধান করিতে তাঁহারা সক্ষম হন নাই। কাজেই এই সম্মেলন অবিলম্বে গণপরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহার স্থলে বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের দ্বারা নূতন একটি পরিষদ গঠনের দাবী জানাইতেছে।

৫। ভাষা আন্দোলনের বহু কর্মী ও নেতাকে আটক রাখিবার জন্য এই সম্মেলন পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকারের মনোভাবের তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং অবিলম্বে তাঁহাদের বিনা শর্তে মুক্তি দাবী করিতেছে।

৬। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকারসমূহ যেইভাবে 'নিরাপত্তা' ও 'সিকিউরিটি' আইনের বলে শাসনকার্য চালাইতেছে এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ পদদলিত করিতেছে, তাহাতে উদ্বেগ ও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া এই সম্মেলন সকল অগণতান্ত্রিক, অমানুষিক ও গণবিরোধী আইনসমূহের অবিলম্বে প্রত্যাহার দাবী করিতেছে এবং এই সকল "কালা-কানুনে" ধৃত সকল বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করিতেছে।

৭। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও এই আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দলের নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ ও তাহার সরকার অবিরাম যে সকল হীন প্রচারণা চালাইয়া যাইতেছে, এই সম্মেলন তাহাতে ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে।

৮। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্টদের উপর পুলিশী গুলীবর্ষণ এবং অন্যান্য জুলুমের ফলে শহীদদের পরিবারবর্গ ও আহতদের যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দানের জন্য এই সম্মেলন সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে।

৯। এই সম্মেলন সকল নিরাপত্তা বন্দীর পরিবারবর্গের ভাতা দানের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে এবং অন্যান্য সভ্যদেশের রাজনৈতিক বন্দীদের ন্যায় এই সকল রাজনৈতিক বন্দীদিগকে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দান করিয়া প্রথম শ্রেণীভুক্ত বন্দী করিবার দাবী জানাইতেছে।

১০। এই সম্মেলন নারায়ণগঞ্জে রাইফেলের গুলীতে নিহত কনস্টেবলের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে যে, গুলীর আঘাতে সংশ্লিষ্ট ঘটনা রহস্যাবৃত থাকিয়া যাওয়ায় দুইজন হাইকোর্টের বিচারপতি এবং একজন জনপ্রতিনিধি কর্তৃক উক্ত ঘটনার বিস্তৃত ও প্রকাশ্য তদন্ত করা হউক।

১১। এই সম্মেলন মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক সংবাদপত্রসমূহের স্বাধীনতা হরণের

তীব্র নিন্দা করিতেছে।

১২। এই সম্মেলন পাক প্রধানমন্ত্রীর নিকট আত্মীয়ের সংবাদপত্র মর্নিং নিউজের জনস্বার্থবিরোধী, ভিত্তিহীন, মিথ্যা, ঘৃণ্য দূরভিসন্ধি ও উদ্দেশ্যমূলক ভূমিকার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করিতেছে।

১৩। কোন প্রমাণ্য যুক্তি ব্যতিরেকেই এবং সকল প্রকার গণতান্ত্রিক নীতির খেলাফ করিয়া সরকার পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন, এই সম্মেলন তাহার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করিতেছে। কোন স্বার্থ প্রণোদিত গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সাধন এবং বিরোধী দলের ও জনসাধারণের কণ্ঠরোধের জন্যই উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছে বলিয়া এই সম্মেলন মনে করে এবং অনতিবিলম্বে উক্ত পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী জানাইতেছে।

১৪। এই সম্মেলন পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্যভাব স্থাপনের উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের স্কুলসমূহে বাংলাকে বাধ্যতামূলক ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের সরকারসমূহকে অনুরোধ জানাইতেছে এবং যতদিন এই পন্থা অবলম্বন করা না হয় ততদিন উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের স্কুলসমূহের স্বেচ্ছাধীন ভাষা হিসাবে রাখিবার জন্য পূর্ব পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছে।

১৫। এই সম্মেলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করিতে এবং বিভিন্ন ভাষার লিখিত পুস্তকাবলী বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিতে একটি "ব্যুরো" স্থাপন করিবার জন্য এবং তজ্জন্য অন্ততঃ সাড়ে চারি লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিতেছে।

আন্দোলন যখন সার্বজনীন রূপ ধারণ করে সংগ্রামী জনতা তখন মাঠে হোমরা-চোমরা নেতাদের মুখ-নিঃসৃত বাক্যের অপেক্ষায় থাকে না। আন্দোলনের আগে বহুনেতা, উপনেতা, তাত্ত্বিক, দার্শনিক ও মেকী দেশসেবক আসর জমাইবার সার্বিক প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। উদ্দেশ্য কিছু ফায়দা লুটা যায় কি না; অথবা ফটকাবাজারীতে ফাঁকতালে জনতার নেতা হওয়া যায় কিনা। আন্দোলন যতই ভয়ালরূপ ধারণ করে, অগ্নি পরীক্ষা ততই নিকটবর্তী হয়- মোনাফেক, কাপুরুষ, স্বার্থান্বেষী নেতৃবৃন্দ জনতাকে অসহায় অবস্থায় আগ্নেয়গিরি উদগারিত উত্তপ্ত লাভার উত্তাল তরঙ্গে ফেলিয়া দিয়া স্বীয় প্রাণ লইয়া দৃশ্যপট হইতে হাওয়া হইয়া যায়। আন্দোলন যখন সফলতা অর্জন করে ও আন্দোলনকাল উত্তীর্ণ হইয়া পরিস্থিতি শান্তভাব ধারণ করে, তখনই ঐ সকল বিশ্বাসঘাতক, সুযোগসন্ধানী, অতি চতুর ব্যক্তি সময়োপযোগী মুখোশ পরিধান করিয়া সংগ্রামী, জনদরদী ও দেশদরদীর লেবাসে সর্বত্র বুক ফুলাইয়া পাঁয়তারা করিতে থাকে। বর্ণিত বক্তব্য তিক্ত বটে কিন্তু নিরেট সত্য ও আমার নির্মম অভিজ্ঞতাপ্রসূত। কেহ কেহ আন্দোলন সম্পর্কিত বই লিখেন, খবরের কাগজে প্রবন্ধ ছাপেন, রেডিও-টেলিভিশনে আন্দোলনের কাহিনী বিবৃত করেন, অথচ আন্দোলনের অগ্নিক্ষরা সন্ধিক্ষণ মুহূর্তে তাঁহাদের অনেকের টিকিটি পর্যন্ত দেখা যায় নাই। কেহ কেহ আবার আন্দোলনে

স্বীয় ন্যক্কারজনক ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়া নিজ নিজ বিবেকের নিকট লজ্জাবোধ করা দূরে থাকুক, বেমালুম প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী বলিয়া দাবী করিয়া বিকৃত ইতিহাস বয়ান করিতে থাকেন। ইহাদের পক্ষে প্রকাশ্যে কিছু বয়ান করিবার পূর্বে আয়নায় স্বীয় চেহারাটা দেখা বোধহয় দোষের হইবে না। যাহা হউক, কারাগারের কথা বলিতেছিলাম। বিভিন্ন ওয়ার্ডে বন্দীদের মেলামেশা করিবার কোন নিয়ম নাই। তবুও কর্তৃপক্ষের হাজার সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়াই বিভিন্ন পন্থায় যোগাযোগ করা হয়, যেমন-জুম্মার নামাজের দিন মসজিদে আমাদের পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ হইত ও সেখানেই আমরা প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সংলাপ সম্পন্ন করিয়া লইতাম। অথবা চিকিৎসার অজুহাতে হাসপাতালে গমন করিলেই পূর্ব খবরাখবর মোতাবেক নির্দিষ্ট ব্যক্তির সহিত দেখা হইত ও পূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনা হইত। শেখ মুজিবুর রহমান এই দুইটি পন্থার কথাই অবহিত ছিলেন। তাই বোধহয় ক্ষমতাসীন হইবার পর ১৯৭২ সাল হইতে কয়েদখানায় জুম্মার নামাজ আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট মসজিদটি তুলিয়া দিয়াছিলেন এবং কারাগারে জুম্মার নামাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৯৭৪-৭৫ সালে শেখ মুজিবর রহমানের শাসনামলে কারান্তরালে থাকাকালেই দুঃখের সহিত আওয়ামী লীগ সরকারের এই মর্মান্তিক সিদ্ধান্তটি অবগত হই।

আন্দোলন পরবর্তী ঘটনাবলী

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারীর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অব্যবহিত পরই পাকিস্তান সরকারের প্রস্তাবক্রমে পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে অবাধ যাতায়াত নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে পাসপোর্ট-ভিসা প্রথা প্রবর্তন করা হয়। পাসপোর্ট-ভিসা প্রবর্তনের পূর্ব মুহূর্তে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে কমিউনিস্ট রাজবন্দীদের নিকট সরকারের তরফ হইতে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, যাঁহারা পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া ভারত গমনে প্রস্তুত তাঁহাদের কারা মুক্তির প্রশ্ন সরকার গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করিবেন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার হইতে কমরেড অমর চক্রবর্তী, বেনু ধর, শিবানী আচার্য, সুশীল সেন, রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার হইতে কমরেড মনসুর হাবিব, সুবোধ রায়, কৃষ্ণ বিনোদ রায় ও অন্য কয়েকজন বন্দী মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া নিরাপত্তার অন্বেষণে ভারতভূমি মুখে পাড়ি দিলেন। এইভাবেই প্রায় পনর হাজার কমিউনিস্ট পার্টি নেতা ও কর্মী দেশ বিভাগের পর মাতৃভূমি ত্যাগ করে।

রমজান মাসে দ্বিপ্রহরে রান্না করা ভাত-তরকারী আগরাত ও সেহরীর জন্য একই সঙ্গে অপরাহ্ন ৪টা হইতে কারা নিবাসীদের সরবরাহ করা হইত। ভোর রাত ৪টার দিকে ঐ ভাত-তরকারী গরমের কারণে পঁচিয়া অখাদ্যে পরিণত হয়। ইংরেজ আমল হইতে প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতিবাদে মজলুম নেতা মওলানা ভাসানী আমরাসহ বন্দীদের নিয়া ২৭শে মে (১৯৫২) সন্ধ্যা হইতে না খাইয়া রোজা পালন আরম্ভ করেন। এই প্রতিবাদের ফলেই উত্তরকালে কারাবন্দীরা সেহরীর সময় গরম ভাত-তরকারী খাওয়ার সুব্যবস্থা ভোগ করিয়াছেন।

রাজবন্দীর মুক্তি ও অন্যান্য দাবীতে মওলানা ভাসানী লেবুরস পানে রোজা রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আমরা বন্দীমুক্তি ও কতিপয় দাবীর ভিত্তিতে পূর্ণ অনশন ধর্মঘটের পরিবর্তে ২৭শে

মার্চ (১৯৫৩) মওলানা ভাসানীর পরামর্শ মত ৩৫ দিন অনুরূপ রোজা রাখি।

মজলুম নেতার রোজা আন্দোলনে অংশগ্রহণকল্পে আমি পূর্বপাক সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নিকট নিম্নোক্ত পত্র প্রেরণ করিঃ

To
The Premier
Govt. of East Bengal, Dacca
Sir,

In sympathy with Maulana Abdul Hamid Khan (Bhasani) now detained in the Dacca Central Jail we too are on fast since the 27th of March 1953 on the following demands:

(a) Immediate Release of All political prisoners
(b) Abolition of East Bengal Public Safety Act
(c) Recognition of Bengali as one of the State Languages of Pakistan

Yours faithfully
Sd/-Oli Ahad

বঙ্গানুবাদ

বরাবর,
প্রধানমন্ত্রী
পূর্ববঙ্গ সরকার
ঢাকা,

জনাব

বর্তমানে ঢাকা কারাগারে আটক মওলানা হামিদ খান (ভাসানী)-এর সহিত সমমর্মিতা প্রদর্শন করিয়া আমরাও নিম্নোক্ত দাবীসমূহের ভিত্তিতে ২৭শে মার্চ (১৯৫৩) হইতে রোজা পালন করিয়া আসিতেছি ঃ

১। অবিলম্বে সকল রাজবন্দীর মুক্তি দান।
২। পূর্ববঙ্গ জননিরাপত্তা আইন বাতিল করা
৩। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতিদান

আপনারই বিশস্ত
স্বাঃ অলি আহাদ

কারাগারে রোজাব্রত পালনকালে মজলুম নেতাকে জেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। জেল হাসপাতাল হইতে তিনি আমাকে একটি চিঠি লেখেন। আমি কারাগারের ৫ নং

এসোসিয়েশন ওয়ার্ডে অবস্থানকালে বাহিরের ঘটমান পরিস্থিতিতে তাঁহার মন কতটা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল চিঠিটিতে তাহার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। চিঠিটি নীচে দেওয়া হইলঃ

প্রিয় অলি আহাদ

আমি তোমাদের কথায় মোটেই রাগ করি নাই এবং তোমাদের কথা বহুলাংশে সত্য তাহাও চিন্তা করিয়াছি। কিন্তু কয়েকদিন যাবৎ বাহিরে থাকা হইতেছে তাহাতে মনে বিশেষ দুঃখ পাইয়াছি। নিজের জীবন তুচ্ছ মনে হইতেছে। আমার সঙ্গে কথা ছিল বন্দীমুক্তি ও রাষ্ট্রভাষার দাবী আদায় করিতে বিরোধী দল যে মত বা পথেরই হউক না কেন, সকলে একত্র হইয়া আন্দোলন চালাইয়া যাইবে। কোনপ্রকার দলাদলি করিলে আত্মহত্যার তুল্য হইবে। সকলেই আমার নিকট পাক্কা ওয়াদা দিয়াছিল কিন্তু এখন দেখিতেছি মূল আদর্শ হইতে দূরে গিয়া আগামী নির্বাচনকেই মূল আদর্শ গ্রহণ করিতে নেতৃত্বের কোন্দল আরম্ভ করিয়াছে। এমতাবস্থায় আমার একমাত্র সম্বল জীবন দেওয়া ছাড়া আর কি উপায় আছে, আমার মুক্তির সময় নাকি শীঘ্রই আসিতেছে। তাহাতে মন আরও বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে। আদর্শহারা অবস্থায় আর কেনা-বেচার কাজ করিবার প্রবৃত্তি নাই। তুমি ভালভাবে চিন্তা করিয়া যাহা দেশের ও জাতির জন্য কল্যাণ মনে কর তাহাই জানাইও। তোমরা যে সিদ্ধান্ত করিবে সে সমস্ত দাবী আদায় করিতে যখন যাহা সঙ্গত মনে কর তাহাই গ্রহণ করিতে আমার কোন আপত্তি থাকিবে না। যদি তারিখ পরিবর্তন করিয়া পরে করা যুক্তিসঙ্গত মনে কর তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। রোগে ও বাহিরের স্বার্থপরতার তাড়নায় মাথা ঠিক নাই।

মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী

ইতিপূর্বে আমরা কারারুদ্ধ থাকাকালে রাজনৈতিক আকাশে কিছু শুভ ও কিছু অশুভ ঘটনা ঘটে। মাটির সন্তানকে কেন্দ্র করিয়া ও সাম্প্রদায়িকতা সযত্নে পরিহার করতঃ রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই দারুণভাবে অনুভব করিতেছিলাম। ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে জনাব মাহমুদ আলীর প্রচেষ্টায় 'পাকিস্তান গণতন্ত্রীদল' গঠিত হয়। গণতন্ত্রীদল গঠনকালে আহূত সম্মেলনে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আজাদ পাকিস্তান পার্টির দুই নেতা মিঞা ইফতেখার উদ্দিন ও শওকত হায়াত খান যোগদান করেন। এই সম্মেলনেই হাজী মোঃ দানেশকে সভাপতি ও জনাব মাহমুদ আলীকে সাধারণ সম্পাদক (সেক্রেটারী জেনারেল) নির্বাচিত করিয়া 'পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল' গঠন করা হয়।

কায়েদে আযমের তিরোধানের পর হইতেই পাকিস্তানে ক্ষমতার লড়াই প্রকটভাবে দেখা দিয়াছিল। সে সময়ে ক্ষমতায় আসীন থাকিবার জন্য কায়েমী স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য যে কেহ যে কোন নোংরা কৌশল অবলম্বন করিতে কখনও দ্বিধাবোধ করে নাই। 'খাতামুন্নবীর' অর্থ ও ব্যাখ্যার প্রশ্নে ধর্মান্ধ ও অসহিষ্ণু ভাবধারার ধারক ও বাহক মোল্লা সম্প্রদায়ের পৈশাচিক ভ্রাতৃহত্যা, ধনসম্পদ লুণ্ঠন অগ্নি সংযোগ, অবাধ নারী ধর্ষণকে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মমতাজ মোহাম্মদ খান দওলাতানা পরোক্ষভাবে প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। বাধ্য হইয়াই

কেন্দ্রীয় সরকারকে পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করিতে হইয়াছিল। সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ আযম খান অত্যন্ত কঠোর হস্তে এই দাঙ্গা দমন করেন। উক্ত দাঙ্গার হোতা অখণ্ড ভারত সমর্থক মওলানা মওদুদীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ তাঁহাকে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করেন। প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন মমতাজ দওলাতানাকে বরখাস্ত করিয়া পাঞ্জাবে গর্ভনরী শাসন প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে পুর্ববঙ্গের গভর্নর মালিক ফিরোজ খান নূনকে মমতাজ দওলাতানার স্থলে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। পূর্ব বঙ্গের গভর্নর থাকাকালে ফিরোজ খান নূন এই মর্মে এক অসত্য ও অশোভন মন্তব্য করেন যে, 'বাংগালী মুসলমানের খৎনা করায় না।' এক শ্রেণীর নেতার এই ধরনের বানোয়াট হীন-উদ্দেশ্য প্রণোদিত বাংগালী-বিদ্বেষী মন্তব্য-বক্তব্য ও আচার-আচরণের জন্যই শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানকে চরম মূল্য দিতে হইয়াছে।

কারান্তরালে থাকাকালে ৬ই মার্চের পত্রিকায় জানিতে পারি যে, বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়ার ডিকটেটর জোসেফ স্টালিন দীর্ঘ তিরিশ বৎসরকাল অত্যাচারের প্রতীক হিসাবে শাসনভার পরিচালনার পর (১৯৫৩ সালের ৫ই মার্চ) প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বিশ্বব্যাপী কিমিউনিস্ট আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। বিশেষ করিয়া কমিউনিস্ট বিশ্বের উপর সোভিয়েট রাশিয়ার একাধিপত্যের দ্রুত অবসান ঘটে এবং কমিউনিষ্ট আন্দোলনের Mono Centrism বা এককেন্দ্রীকতার স্থলে Poly-Centrism অর্থাৎ বহু কেন্দ্রীকতার সূচনা হয়।

প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের অভ্যুদয়

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান রাওয়ালপিণ্ডির সামরিক ছাউনিতে বক্তৃতারত অবস্থায় আততায়ীর গুলীতে নিহত হইলে গভর্নর জেনারেল খাজা ন্যাজিমুদ্দিন তড়িঘড়ি প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু কালের গতিতে সেই উন্মুক্ত সদর দরজা পথেই প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের এই বরপুত্রকে ক্ষমতার আসন হইতে বিদায় লইতে হয়। ষড়যন্ত্রের এই বীজ কালক্রমে বিষবৃক্ষে পরিণত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে খাদ্য সংকট মোকাবেলা করিবার নিমিত্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে সাত লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী চূড়ান্ত করিবার অজুহাতে রাষ্ট্রদূত বগুড়া নিবাসী মোহাম্মদ আলী রাজধানী করাচীতে আগমন করেন। প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন ছিলেন বৃটিশ ঘেষা। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীয় বশংবদ মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসাইবার প্রয়াস পাইতেছিল। খাদ্য সংকটের মোক্ষম সুযোগ সদ্ব্যবহার করিয়া গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ও প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইউব খান সামরিক বেসামরিক অফিসার চক্রের সহায়তায় এক অবৈধ আদেশ জারি করিয়া ১৯৫৩ সালের ১৭ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীকে গদিচ্যুত করেন। এইভাবেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত পাকিস্তানে ক্ষমতা দখলের নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হয় এবং জনগণ নেপথ্য শক্তিতে পর্যবসিত হয়। ১৯৪৭ সালে ইংরেজ কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরকালে প্রণীত ভারত-পাকিস্তান স্বাধীনতা আইন মোতাবেক প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করিবার এক্তিয়ার বা ক্ষমতা বা অধিকার গভর্নর জেনারেলের ছিল না। বরং মন্ত্রীসভাই ছিল গভর্নর জেনারেল

নিয়োগ বা অপসারণ করিবার একমাত্র আইনগত সংস্থা। কিন্তু ষড়যন্ত্রের বিচিত্র গতির মারপ্যাঁচে পড়িয়া উপরোক্ত বিধান সম্পূর্ণ অর্থহীন হইয়া পড়ে। ১৯৪৭ সাল হইতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত যেই দেশের সরকার সংবিধান রচনা করিতে চরমভাবে ব্যর্থ হইয়াছে, গণরায়ে ক্ষমতাসীন হইয়াও পুনরায় গণরায়ের জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিমুখ রহিয়াছে, সেই দেশে অনিয়মই যে নিয়ম হইবে এবং ষড়যন্ত্রই যে মুখ্য নিয়ামক শক্তি হইবে, ইহা বিস্ময়কর কিছু নহে। ১৭ই এপ্রিল (১৯৫৩) ঢাকার পল্টন ময়দানে আওয়ামী মুসলিম লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় শহীদ সোহরাওয়ার্দী গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক খাজা নাজিমুদ্দিনের এই অন্যায় ও অবৈধ পদচ্যুতির আদেশকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। পক্ষান্তরে সদ্য কারামুক্ত মজলুম নেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী খাজা নাজিমদ্দিনের এই পদচ্যুতির জন্য গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন এবং এই আদেশকে সম্পূর্ণ বেআইনী ও অবৈধ বলিয়া রায় দেন। একজন আইনজ্ঞ রাজনীতিক, আর অন্যজন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়ার রাজনৈতিক মঞ্চের ভাষায় 'লুংগি সর্বস্ব মাওলানা' রাজনীতির এই দুই দিকপালের মধ্যে কাহার বক্তব্যে ভবিষ্যৎ মঙ্গল নিহিত ছিল, পরবর্তী ঘটনারাজিই ইহার নির্ভুল উত্তর দিয়াছে। পদলোভী ও ভীরু খাজা নাজিমুদ্দিন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের এই বেআইনী ও অবৈধ পদচ্যুতি বেমালুম হজম করিয়া দেশ ও জাতির মহাসর্বনাশ সাধন করিয়া গিয়াছেন। জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন দুর্নীতিবাজ ও মেরুদণ্ডহীন মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ সাহস করিয়া গভর্নর জেনারেলের আদেশের বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রতিবাদও উচ্চারণ করেন নাই। জনভিত্তি হারাইয়া ফেলিলে এমনি অবস্থাই হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের মর্মান্তিক বিয়োগান্তক নাটকের খবরে আপামর জনগণ উল্লাসে যে কিরূপ আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা কাহারও অজানা নাই।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে মার্কিনী প্রভাব

পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমিন ২০শে ও ২১শে এপ্রিল সর্বজনাব মসিউর রহমান, ইমরান আলী, শাহ আজিজুর রহমান, এ,টি,এম, মোস্তফা, আজিজুর রহমান (কুমিল্লা), ফজলুল বারী (বগুড়া), গাজী লতিফ (যশোহর), কামাল আহমদ (চট্টগ্রাম)-এর নিকট মোহাম্মদ আলীর প্রধানমন্ত্রীত্বকে সমর্থন না করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। কিন্তু গদির নিরাপত্তার আশ্বাস পাওয়ামাত্র তিনি প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীকে সমর্থন দানের জন্য ওয়াদাবদ্ধ হইয়া ২৪শে এপ্রিল (১৯৫৩) ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন এবং ৯ই মে কার্জন হলে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ কাউন্সিল সভায় অবৈধ পন্থায় অধিষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী সরকারকে সমর্থন দান করেন। এইভাবেই পাকিস্তান সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বশংবদের শিরোপা লাভ করে এবং ইহার পর হইতে দেশ ও জাতি ক্রমশঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯৫৪ সালের মে মাসের ১৯ তারিখে করাচীতে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাফরুল্লাহ খান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স কেনেথ ইমারসন

পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া দেশবাসীর উপর দাসত্ব-শৃঙ্খল চাপাইয়া দেয়। পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন ঘোষণার পর নির্বাচন প্রস্তুতিকল্পে ১৯৫৩ সালের ১৪ই ও ১৫ই নভেম্বর ময়মনসিংহে আহূত কাউন্সিল সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিল এবং একই সঙ্গে মোহাম্মদ আলী সরকারকে আমেরিকার সহিত কোন সামরিক চুক্তি সম্পাদন না করিতে আহ্বান জানাইয়াছিল। এই পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির প্রথম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছিল' "যে উদ্দেশ্যে এই সাহায্য দেওয়া হইতেছে, পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত পূর্বাহ্নে চুক্তিবদ্ধ না হইয়া অপর কোন উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করিতে পারিবে না।" প্রসঙ্গতঃ বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অপ্রকাশিত ধারা অনুসারে পাক সৈন্য বাহিনীর চল্লিশ হাজার সৈন্যের যাবতীয় ব্যয়ভার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহন করিত এবং ইহার পরিবর্তে পেশওয়ারের সন্নিকটে যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। ইহারই ব্যাখ্যা দিতে গিয়া ১৯৫৪ সালে পাক-ভারত সফর সময়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ফষ্টার ডালেস স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তান মার্কিন প্রদত্ত অস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারিবে না অর্থাৎ পাকিস্তান মার্কিন অস্ত্র গুদামজাত করিয়া রাখিবে কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রয়োজনেও মার্কিন অনুমোদন ব্যতীত ইহা ব্যবহার করিতে পারিবে না।

পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছিল, "পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিকট হইতে যে সব কর্মচারী পাইবেন, তাঁহারা চুক্তি অনুসারে পাকিস্তানে থাকিয়া যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দায়িত্ব পালন করিবেন এবং চুক্তি অনুযায়ী প্রদত্ত সাহায্য কিভাবে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা পর্যবেক্ষণ করিবার কর্তৃত্ব ও প্রযোজনীয় সুযোগ-সুবিধা পাইবেন।" এই চুক্তি অনুযায়ী কর্মচারীরূপে পাকিস্তানে আগত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ পাকিস্তান সরকারের সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসেরই অংশ বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং তাহারা কূটনৈতিক মিশনের ডিরেক্টরের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নির্দেশে পাকিস্তান সরকার উচ্চপদস্থ মার্কিন নৌ,বিমান ও স্থলবাহিনীর উপদেষ্টাদিগকে কূটনৈতিক মর্যাদা দান করিবে। ইহার নির্গলিতার্থ একটাইঃ বিদেশী সামরিক অফিসারগণ কূটনৈতিক মর্যাদা ভোগ করিবে বিধায় আমাদের সেনাবাহিনীর উপর বিদেশী প্রভাব বিস্তারিত হইবে।

পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির পঞ্চম পরিচ্ছেদের ২(ক) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছিল "পারস্পরিক সাহায্যের নীতি অনুসারে পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনে এমন সব কাঁচা মাল বা আংশিকভাবে নির্মিত দ্রব্যাদির উৎপাদন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি বা যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তর করিবে যাহা পাকিস্তানে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন সম্ভব।" ইহার পরিস্কার অর্থ হইলঃ পাকিস্তানের স্বীয় অর্থনীতির স্বাধীনতা নস্যাৎ হওয়া এবং এই দেশের অর্থনীতির উপর যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য কায়েম।

পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছিল, "পারস্পরিক নিরাপত্তার

প্রয়োজনে বিশ্ব-শান্তির পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ এমন সব রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতা করিবে।" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষিত নীতি অনুসারে চীন ও রাশিয়ার বলয়ভুক্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিই বিশ্ব শান্তির পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ। অতএব বিশ্বের এক অতি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সহিত গরীব পাকিস্তান রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি ব্যতীত কোন প্রকার বাণিজ্যিক লেনদেন করিতে পারিবে না।

পরবর্তীকালে পাকিস্তান বাগদাদ ও সিয়াটো চুক্তিভুক্ত হয়। শর্ত মোতাবেক চুক্তিভুক্ত কোন দেশ যদি "আভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক কার্যাবলীর" দ্বারা বিপদাপন্ন হয়, তবে চুক্তিভুক্ত অন্যান্য দেশ বিপদাপন্ন মিত্রদেশে পুলিশ ও ফৌজ পাঠাইয়া সাহায্য করিবে। এই চুক্তিভুক্ত দেশগুলির অন্যতম ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ও ফ্রান্স। আভ্যন্তরীণ সরকার যতই গণবিরোধী, জালেম, শোষক ও একনায়কত্ববাদীই হউক না কেন, জনসাধারণ স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে কোন প্রকার প্রতিবাদ করিতে পারিবে না। তাই দেখা যায়, ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসের প্রথমার্ধে পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা ৩রা এপ্রিল শেরেবাংলা এ,কে, ফজলুল হকের নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হইয়াছিল কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত মোহাম্মদ আলী সরকার ৩০শে মে মামুলী এক অজুহাতে কলমের এক খোঁচায় উঁহাকে নাকচ করে ও গভর্ণরী শাসন কায়েম করে। শুধু তাই নয়, ইহার বিরুদ্ধে জনসমষ্টির প্রতিবাদকেও আভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী বলিয়াই আখ্যা দেওয়া হয়।

আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়া

১৯৫৫ সালের ২১, ২২ ও ২৩শে অক্টোবর তারিখে ঢাকা রূপমহল সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের প্রস্তাবে বলা হয়, "এই কাউন্সিল অধিবেশনের বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, পাকিস্তান সরকার গত কয়েক বৎসর পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, বাগদাদ চুক্তি, সিয়াটো চুক্তি প্রভৃতি এমনসব চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে, যে সকল চুক্তির দ্বারা দেশের সার্বভৌমত্ব এবং দেশের অর্থনৈতিক, ব্যবসাগত ও বাণিজ্যিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হইয়াছে।" ১৯৫৬ সালের ১৯ ও ২০শে মে ঢাকা নগরীতে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের প্রস্তাবে পুনর্বার সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়, "কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের লেজুড় হিসাবে না থাকিয়া আমাদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নীতির অনুসারী হইতে হইবে এবং আমরা বিশ্বাস করি, কেবলমাত্র এই নীতিই পাকিস্তানকে পৃথিবীর বুকে সমৃদ্ধশালী ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তুলিতে পারে।" উক্ত ঘোষণায় আরো বলা হয়, "বিভিন্ন সামরিক চুক্তি বিশেষতঃ বাগদাদ চুক্তিতে অংশগ্রহণ করিয়া পাকিস্তান মুসলিম জাহানের অধিকাংশ রাষ্ট্রের সহানুভূতি হারাইয়াছে। অতএব কাউন্সিল এই প্রকারের সকল সামরিক চুক্তির নিন্দা ও বিরোধীতা করিতেছে।" ১৯৫৪ সালের নির্বাচনোত্তরকালের সর্বজনাব আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান, মাহমুদ আলী, হাজী মোঃ দানেশ, ইয়ার মোহাম্মদ খান প্রমুখ ১৬৭ জন সদস্য নির্বাচিত পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদ সদস্য ২১ এপ্রিল (১৯৫৪) এক যুক্ত বিবৃতিত্বে কঠোর ভাষায় পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তিকে নিন্দা করেন ও উহা বাতিলের

দাবী জানান অথচ ১৯৫৬ সালে ক্ষমতাসীন হইবার পর গদির মোহে পড়িয়া জনাব আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি সদস্যই প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশিত পথে সংগঠনের বৈদেশিক নীতির বরখেলাফে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, বাগদাদ চুক্তি ও সিয়াটো চুক্তির গোঁড়া সমর্থকে পরিণত হন। ইহার প্রমাণ ১৯৫৭ সালের ৭ ও ৮ই ফেব্রুয়ারী কাগমারীতে (টাঙ্গাইল জেলা) অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন। এই অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ও তাঁহার মন্ত্রীবর্গ, পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান ও তাঁহার মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ, আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পার্লামেন্টারী পার্টির সদস্যরা সংগঠনের ঘোষিত নীতির বিরুদ্ধাচরণ করেন। সামরিক চুক্তি ও সামরিক জোট বিরোধী নীতির প্রতি তাঁহাদের এই বিরোধীতা ও অশ্রদ্ধা আমাদের চরমভাবে মর্মাহত করে। ১৯৫৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সভায় পাক প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রকাশ্যভাবে সামরিক চুক্তি ও সামরিক জোটের পক্ষে ওকালতি করিয়াছিলেন। তবে ইহা অনস্বীকার্য যে, জনাব সোহরাওয়ার্দী আগাগোড়াই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক নীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন।

পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির প্রধান সমর্থক এই শেখ মুজিবুর রহমানই আবার বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। একচ্ছত্র নেতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি ১৯৭২ সালের ১৯শে মার্চ রাজধানী ঢাকায় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সহিত শান্তি ও মৈত্রীর নামে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তি নামক পঁচিশ বৎসর মেয়াদী এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। শুধু তাহাই নয়, তিনিই অবাধ সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি ও আওয়ামী নেতৃবৃন্দের ভারত অবস্থানকালে অপ্রকাশ্যে গোপন চুক্তির অনুমোদন দান করিয়া বাংলাদেশকে ভারতের আশ্রিত রাষ্ট্রে পরিণত করেন। ইহা ছিল শেখ সাহেবের ১৯৫৬-৫৭-৫৮ সালের ন্যাক্কারজনক ভূমিকারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। বস্তুতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাঁটি অনুচর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একই পদার্থের তৈরি। ক্ষমতার লোভে দেশ ও জাতিকে বিকাইয়া দিতে তাঁহারা উভয়ই বিবেকের সামান্যতম দংশনও বোধ করেন নাই।

ভারত বিভাগের মূল বাস্তবতা অস্বীকার করতঃ শেখ আবদুল্লাহ কাশ্মীরবাসীদের স্বাধীন মতামত দানের সুযোগ না দিয়াই কাশ্মীরকে ভারতীয় রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করিয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তবে কিছুকালের মধ্যে তাঁহার মোহ ভঙ্গ হইলে স্বাভাবিক কারণেই দিল্লী সরকার ও শ্রীনগর সরকারের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়। ১৯৫৩ সালে শেখ আবদুল্লাহ কেবল পদচ্যুতই হন নাই, কারাগারেও নিক্ষিপ্ত হন। বস্তুতঃ হায়দরাবাদ, জুনাগড় ও মানভাদর দখল করিয়া পাক-ভারত ক্ষমতা হস্তান্তর বিধিকে লংঘন করিতে ভারত মোটেও কুণ্ঠাবোধ করে নাই। তাই, উপরে বর্ণিত নীতির সূত্র ধরিয়াই নেহরুজীর সুযোগ্যা কন্যা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী পররাজ্য গ্রাস লালসায় ১৯৭৪ সালে সিকিম রাজ্যের স্বাধীনতা নির্লজ্জের মত অত্যন্ত সুচারুরূপে হরণ করিয়া ভারতীয় রাষ্ট্রীয়ভুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন।

তবে নেপোলের উপরেও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের লোভাতুর দৃষ্টি পুনঃপুনঃ পতিত হইতেছিল। বাংলাদেশের প্রশ্নে ভারতীয়দের সুচতুর খেলা কাহারও দৃষ্টি এড়াইবার নহে। তবে বাংলার জনগণ আজ সম্পূর্ণ সজাগ ও ঐক্যবদ্ধ।

কারামুক্তি ও অন্তরীণাদেশ

১৯৫৩ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর আমি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার হইতে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরিত হই। কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে অধ্যাপক সর্দার ফজলুল করিমের সাহচর্য লাভ করি। তিনি একজন রাজনৈতিক কর্মী ও অমায়িক পুরুষ। সরকারী বহু প্রলোভনকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ১৯৫৫ সালে তিনি পাকিস্তানের গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে তিনি পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টিতে যোগদান করেন। কিন্তু আজীবন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের পুরোভাগে থাকা সত্ত্বেও রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচে পড়িয়া প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর মার্কিন ঘেষা বৈদেশিক নীতি এবং সামরিক চুক্তি ও জোট সমর্থনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের আওয়ামী লীগ সদস্যদের সহিত একত্রে ভোট দেন। তাহার মত ত্যাগী রাজনৈতিক চিন্তাবিদের উপরোক্ত ভূমিকা আমাদিগকে বিস্মিত ও মর্মাহত করিয়াছে।

৩০শে সেপ্টেম্বর কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার হইতে আমাকে মুক্তির আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু সেই সাথে আমার নিজ গ্রাম ইসলামপুরে অন্তরীণ থাকিবার এক বৎসর মেয়াদী আদেশও জারি করা হয়। উক্ত আদেশে ইহাও বলা হয় যে, আমাকে প্রতি সপ্তাহে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানায় সশরীরে হাজিরা দিতে হইবে। আমাকে এই আদেশপত্রটি স্বাক্ষর করিতে দিলে আমি ঘৃণাভরে সরকারী কর্মচারীর আবদার প্রত্যাখ্যান করি। উপায়ন্তর না দেখিয়া পুলিশ অফিসার কেন্দ্রীয় কারাগারের গেটে আদেশনামাটি টাঙ্গাইয়া দিয়া আমার উপর প্রকাশ্য নোটিশ জারি করেন। ইংরেজ শাসনামলে কোন রাজবন্দীকে গৃহান্তরীণ করিলে ভরণ-পোষণের নিমিত্ত সরকার হইতে প্রয়োজনীয় মাসিক ভাতা দেয়া হইত। ইংরেজ বিদেশী শাসক কিন্তু জাতি হিসাবে সুসভ্য ছিল। যাহা হউক, স্বাধীন দেশের অঙ্গরাজ্য পূর্ব পাকিস্তানের সরকার অন্তরীণাবদ্ধ রাজবন্দীকে কোন ভরণ-পোষণ কিংবা কোন ভাতা দিতেন না। ফলে কেবল আমার ভরণ-পোষণই নহে, প্রতি সপ্তাহে আমার ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাতায়াতের পূর্ণ রাহাখরচও চাকুরী হইতে অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ পিতাকেই বহন করিতে হইত। অর্থাৎ বোঝার উপর শাকের আঁটি আর কি! কারাগারে থাকিবার সময় বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করিবার যে সুযোগ পাইয়াছিলাম, তাহা আমি পূর্ণ ব্যবহার করি এবং কয়েকটি খাতায় নোট গ্রহণ করি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীরা কারাগার অফিস হইতে আমার ঐ খাতাগুলিও নিয়া যান। ভাবখানা যেন এই যে, পাকিস্তান ধ্বংসের সকল খুঁটিনাটি পরিকল্পানা ঐ খাতাগুলিতে লিপিবদ্ধ ছিল। যাহা হউক, কারামুক্তির দিনে কারাগার সদর গেটের বাহিরে জনাব ফয়জুল্লাহ ও জালালউদ্দিন আহমদের (শানু) নেতৃত্বে কুমিল্লা যুবলীগ কর্মীবৃন্দ ও সাধারণ জনতা আমাকে তাহাদের আন্তরিক শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ বিপুলভাবে মাল্যভূষিত

করে ও শোভাযাত্রাসহ সমগ্র শহর প্রদক্ষিণ করে। শোভাযাত্রার পর কুমিল্লা টাউন হলের উন্মুক্ত ময়দানে সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া রওয়ানা হইবার আগে কুমিল্লায় দুইদিন অবস্থানের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া জেলা প্রশাসক মেজর নাসেরকে টেলিফোন করি কিন্তু তিনি সম্মত হইলেন না। একে মেজর, তারপর আবার শাসক সম্প্রদায়ভুক্ত উর্দুভাষী। পাকিস্তান রক্ষার দায়িত্ব যেন তারই। তাঁহাদের ভাষায়, আমরা ভারতের চর ছাড়া কিছুই নই।

যদিও ব্রাহ্মণবাড়িয়া আমার থানা ও মহকুমা সদর, তথাপি এই শহরের সহিত কি ছাত্রজীবনে, কি কর্মজীবনে অথবা কি রাজনৈতিক জীবনে আমার যোগাযোগ ছিল খুবই ক্ষীণ। প্রথম যে দুই ব্যক্তি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাটিতে আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানান, তাহারা হইলেন আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবদুল মালেক ও রইস মিয়া।

আব্বা ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত ডিস্ট্রিকট রেজিস্ট্রার। গৃহ-অন্তরীণ আদেশের ফলে বাপ-মায়ের স্নেহ-নীড়ে যেন পুনর্বার আশ্রয় পাইলাম। আব্বার একান্ত কামনা ছিল, জীবদ্দশায় আমাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া যাওয়া। দেশসেবার প্রবল আকর্ষণে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারি নাই। রাজনীতিজনিত কারাবাস আব্বার স্নেহাপ্লুত হৃদয় ও মনকে দারুণ ব্যথা দিত। আমি মর্মে মর্মে তাঁহার ব্যথায় ব্যথিত হইতাম, কিন্তু আমার যে উপায় ছিল না! যে পথের যাত্রী আমি, তাহাতে আমার পিছপা হওয়া সম্ভব নয়। গৃহান্তরীণ থাকাকালে সিলেট জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগ সম্পাদক জনাব নূরুর রহমান, গণতন্ত্রী দলনেতা দেওয়ান মাহবুব আলী, কৃষক নেতা জনাব ইয়াকুব মিঞা, বাল্যবন্ধু মফিজুল ইসলাম প্রমুখ আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। বন্ধুবর মফিজুল ইসলাম আমার কারান্তরালে থাকাকালেই দেশের সমগ্র রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ দিয়া এক নাতিদীর্ঘ চিঠি চোরাইপথে আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। চিঠিতে তাঁহার ভিন্নধর্মী নিজস্ব রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কথা জানিতে পারিয়া বড়ই ব্যথিত হইয়াছিলাম। সেই ভুল সিদ্ধান্তের খেসারত তাঁহাকে জীবনভর দিতে হইয়াছে।

আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান ও যুক্তফ্রন্ট

খুব সম্ভব ২১শে অক্টোবর (১৯৫৩) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান ও আবদুল হামিদ চৌধুরী ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমার সহিত দেখা করেন এবং পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক আলোচনার পর আমরা একই সংগঠনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করিবার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছি। অন্য কথায়, আমি একমাত্র সংগঠিত রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করি। ১৯৫৪ সালের মার্চে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে ১৯৫৩ সালের ২৭শে জুলাই শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হকের নেতৃত্বে পাকিস্তান কৃষক শ্রমিক পার্টি গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রধান মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রধান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও পাকিস্তান কৃষক শ্রমিক পার্টি প্রধান শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হক ১৯৫৩ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর সম্মিলিতভাবে পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টি,

পাকিস্তান গণতন্ত্রীদল, পাকিস্তান খেলাফতে রাব্বানী পার্টির সহযোগিতায় "যুক্তফ্রন্ট" গঠন করেন। ঐক্যবদ্ধভাবে আসন্ন নির্বাচনে মোকাবেলা করাই ছিল এই ফ্রন্ট গঠনের উদ্দেশ্য। যাহা হউক, ইতিপূর্বে মজুলম নেতা মাওলানা ভাসানীর সহিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনার উদ্দেশ্যে আমি পুলিশের কড়া নজর ফাঁকি দিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে নারায়ণগঞ্জে গমন করি এবং আমার আশৈশবের রাজনৈতিক সাথী জনাব শামসুজ্জোহার "হীরামহল" বাসভবনে আতিথ্য গ্রহণ করি। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের সহকর্মী বন্ধুদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনার পর আমার অগ্রজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল করিমের (এম.এস.সি; পি.এইচ.ডি) ২১/১, কৃষ্ণমোহন দাস লেন, টিকাটুলীস্থ বাসস্থানে মজলুম নেতার সহিত বৈঠকে মিলিত হই। আমি 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করিবার বিরুদ্ধে আমার দৃঢ়মত প্রকাশ করি। আমার মত ছিল যে, চরিত্রহীন, অলস, লুটপাট সমিতির সদস্য ও দুর্নীতিবাজরা যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন লাভের জন্য সর্ব-কলাকৌশল প্রয়োগ করিবে এবং সৎ, চরিত্রবান, গণতন্ত্রমনা, দেশপ্রেমিক বন্ধুরা আইন সভার মারফত দেশসেবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবে। আলোচনাকালে মজলুম জননেতা আমার সহিত একমত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। বিভিন্ন রাজনৈতিক চাপের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াই তাহাকে ২১ দফার ভিত্তিতে শেরে বাংলার সহিত যুক্তফ্রন্ট গঠন করিতে হয়।

যুক্তফ্রন্টের বহুল আলোচিত ২১ দফা ছিল নিম্নরূপঃ

নীতিঃ কোরান ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাফ কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।

১। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।

২। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে। উচ্চহারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেটযোগে আদায়ের প্রথা রহিত করা হইবে।

৩। পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করতঃ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাট চাষীদের পাটের ন্যায্য মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা আমলের পাট কেলেঙ্কারী তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৪। কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইবে এবং সরকারী সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হইবে।

৫। পূর্ব পাকিস্তানকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির শিল্পের ও বৃহৎ শিল্পের লবণ তৈরির কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং লবণ কেলেঙ্কারীর জন্য দায়ী মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার সদস্যদের শাস্তির বাবস্থা করা হইবে ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৬। খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের হাত হইতে রক্ষা করা হইবে।

৭। পূর্ব পাকিস্তানকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া শিল্প ও খাদ্যে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

৮। শিল্পী ও কারিগর মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করা হইবে।

৯। দেশে একযোগে প্রাথমিক, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১০। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক ও কার্যকরী করিয়া কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং বেসরকারী স্কুলসমূহের বর্তমান প্রভেদ দূর করিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল স্কুলকে সরকারী সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের জন্য উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১১। 'ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন' প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কালাকানুন বাতিল ও রহিতপূর্বক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া শিক্ষাকে সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসে অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা হইবে।

১২। শাসনব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগী সমস্ত সরকারী কর্মচারীর বেতন কমাইয়া ও নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীদের বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সুসংগত সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীরা এক হাজার টাকার বেশি বেতন গ্রহণ করিতে পারিবে না।

১৩। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ঘুষ-রিসাওয়াত বন্ধ করিবার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী পদাধিকারী ও ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত মুদ্দতের আয়-বায়ের হিসাব নিকাশ নেওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১৪। জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন বাতিল ও রহিত করতঃ বিনাবিচারে আটক সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচারের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা সমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ করা হইবে।

১৫। বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগকে পৃথক করা হইবে।

১৬। যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্দ্ধমান হাউসের বদলে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়ীতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্দ্ধমান হাউসকে আপাততঃ ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে।

১৭। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবীতে যাঁহারা মুসলিম লীগ সরকারের গুলীতে শহীদ হইয়াছেন, তাহাদের পবিত্র স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হইবে এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে।

১৮। ২১শে ফেব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া দিনটিকে সরকারী ছুটির দিন

ঘোষণা করা হইবে।

১৯। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বশাসিত ও 'সভেরন' করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয় অবশিষ্টাত্মক (Residuary Power) ক্ষমতাসহ পূর্ব পাকিস্তানে নৌ-বাহিনীর হেড কোয়ার্টার স্থাপন এবং অস্ত্র তৈরীর কারখানা নির্মাণ করতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হইবে।

২০। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা কোন অজুহাতেই আইন পরিষদের মেয়াদ বাড়াইবে না। আইন পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার ছয় মাস পূর্বে মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশন মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবে।

২১। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার আমলে পরিষদের কোন সদস্যপদ খালি হইলে তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করিবে এবং পর পর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রীসভা স্বেচ্ছা পদত্যাগ করিবে।

নির্বাচনী ফলাফল

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণার 'অপরাধে' আমাকে ২৫শে ফেব্রুয়ারী পূর্ববঙ্গ জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়। ৮ই হইতে ১২ই মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয়ের পর সরকার ১৯শে মার্চ আমাকে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার হইতে মুক্তিদান করেন। উল্লেখ্য যে, পুলিশ যে ট্রেনে আমাকে বাড়ী হইতে কুমিল্লায় লইয়া যাইতেছিল, জনতা সেই ট্রেনকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পথে বাধা দেয়। আমার করজোড় অনুরোধের ফলে জনতা শেষ পর্যন্ত রেল ইঞ্জিনের অগ্রভাগের পিকেটিং প্রত্যাহার করে। ফলে এক সম্ভাব্য রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

১৯৫৪-এর নির্বাচন স্বতন্ত্র নির্বাচনী প্রথায় অনুষ্ঠিত হওয়ায় যুক্তফ্রন্ট দুইশত সাইত্রিশটি মুসলিম নির্বাচনী কেন্দ্র দুইশত তেইশটি আসন লাভ করে। মুসলিম লীগ পায় মাত্র নয়টি আসন। বাকী পাঁচটি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। বাহাত্তরটি সাধারণ নির্বাচনী কেন্দ্র অর্থাৎ অমুসলিম আসনের মধ্যে পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস পঁচিশটি, সিডিউল কাষ্ট ফেডারেশন সাতাশটি সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট তেরটি, কমিউনিস্ট পার্টি চারটি ও গণতন্ত্রী দল তিনটি আসনে জয়লাভ করে।

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল 'নৌকা'। প্রতীকটি হক-ভাসানীর প্রতীক হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। ফলে 'নৌকা' প্রতীক প্রাপ্তির বদৌলতে যুক্তফ্রন্ট কর্তৃক মনোনীত প্রার্থী না হওয়া সত্ত্বেও গণতন্ত্রীদল সদস্য দেওয়ান মাহবুব আলী ও আওয়ামী মুসলিম লীগ দলীয় এ,কে, রফিকুল হোসেন বিপুল ভোটাধিক্যে যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করনে। এই কেন্দ্র দুইটি ছিল যথাক্রমে সরাইল নাছিরনগর এবং নবীনগর বাঞ্ছারামপুর। উল্লেখ্য যে, যুক্তফ্রন্ট মনোনয়ন, বাছাই ও প্রত্যাহারের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর মাওলানা তাজুল ইসলাম ও মাওলানা মোসলেমউদ্দিন আহমদকে এই দুটি

কেন্দ্র হইতে প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করায়। ফলে তাহাদের ভাগ্যে এই পরাজয় অনিবার্য হইয়া দেখা দেয়।

নির্বাচিত পাঁচজন স্বতন্ত্র সদস্য যুক্তফ্রন্টের প্রতি আনুগত্য জানাইয়া প্রকাশ্য বিবৃতি দেন। কিন্তু তাঁহারা এই মর্মে পূর্বে অংগীকারপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন যে, যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন না পাইলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন না অথচ ইহারাই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট মনোনীতি প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন, স্বীয় অংগীকারের বরখেলাফ করিয়াছেন, আবার নির্বাচিত হইয়াই যুক্তফ্রন্টের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপনেও কুণ্ঠিত হন নাই। দুইমুখি নীতি আর কাহাকে বলে! নীতির রাজনীতি নয়, এই দেশে বস্তুতঃ রাজনীতি ক্ষেত্রে এই দুইমুখি নীতিরই প্রবর্তন ঘটিয়াছে এবং অদ্যাবধি দুইমুখি নীতিই জাতির রাজনৈতিক জীবনের অভিশাপ হিসাবে প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিতেছে। আর ইহাই জাতীয় জীবনকে করিয়া তুলিয়াছে বিষাক্ত

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত দুইশত আটাশ জন সদস্যদের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট অংগ দল যথা-পূর্ব পাকিস্তান আওয়ালী মুসলিম লীগ, পাকিস্তান কৃষক শ্রমিক পার্টি, পাকিস্তান নেজামে ইসলামী পার্টি, পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল, পাকিস্তান খেলাফতে রাব্বানী পার্টি হইতে যথাক্রমে একশত তেতাল্লিশ, আটচল্লিশ, বাইশ, তের ও দুইজন সদস্য নির্বাচিত হন।

জনাব সোহরাওয়ার্দীর সাংগঠনিক ক্ষমতা ও একাগ্র প্রচেষ্টা এবং শেরে বাংলা ও মাওলানা ভাসানীর বিপুল জনপ্রিয়তার ফসল যুক্তফ্রন্টের এই অপূর্ব রাজনৈতিক ও নির্বাচনী সাফল্য। জনাব সোহরাওয়ার্দী সম্যকভাবেই সচেতন ছিলেন যে, যে কোন রাজনৈতিক অভিযানের সাফল্য পরিশ্রমী ও সৎ কর্মী বাহিনীর উপর নির্ভরশীল এবং তিনি নির্দ্বিধায় সৎ কর্মীদের দেয় অভিমত ও রিপোর্ট বিশ্বাস করিতেন। আমার প্রেরিত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি কুমিল্লা-সিলেট মহিলা আসনের জন্য পূর্বাহ্নে যুক্তফ্রন্ট কর্তৃক মনোনীত প্রার্থী মিসেস রাজিয়া বেগমের মনোনয়ন বাতিল করিয়া এক অজানা, অপরিচিতা মিসেস আমেনা বেগমকে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন দান করেন। ঘটনার আকস্মিকতা ও নাটকীয় মোড়ে অভিভূতা মিসেস আমেনা বেগম একটি পোস্টকার্ডের কয়েকটি ছত্রে স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিয়া আমাকে লিখিয়াছিলেন, "আপনার চিঠি মন্ত্রমুগ্ধের মত কাজ করিয়াছে। শহীদ সাহেব পত্রপাঠ মাত্র আমাকে মনোনয়ন দিয়াছেন।" কিন্তু ১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত ও অনুসৃত সাম্রাজ্যবাদী সামরিক চুক্তি বাতিল নীতির স্বপক্ষে দৃঢ়মত পোষণের অপরাধে ওয়ার্কিং কমিটির ৩০শে মার্চ (১৯৫৭) তারিখের সভায় আমাকে যখন সাংগঠনিক সম্পাদকের পদ হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়, তখন এই মিসেস আমেনা বেগমই আমার বহিস্কারের পক্ষে ছিলেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৬৯ সালে এই আমেনা বেগমকেই আবার শেখ মুজিব কর্তৃক দল হইতে অপমানিত অবস্থায় বিদায় হইতে হইয়াছিল।

জনাব সোহরাওয়ার্দী ছিলেন অপর দুই শীর্ষ নেতা শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক ও মজলুম নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মধ্যে সেতুবন্ধন। মান-অপমান জ্ঞান তুচ্ছ করিয়া সোহরাওয়ার্দী সাহেব যদি যুক্তফ্রন্টের ৫৬ নং সিম্পসন রোডস্থ দ্বিতল অফিসে

বসিয়া রাতদিন পরিশ্রম না করিতেন, তাহা হইলে আঁতুড় ঘরেই যুক্তফ্রন্টের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত।

মুসলিমলীগের পরাজয়ের কারণ

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয়ের মূল কারণ খোলাফায়ে রাশেদীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ইসলামী অনুশাসন মোতাবেক রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রকে রূপায়িত করিবার ওয়াদার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা। মুসলিম লীগ সরকার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের যোগসাজশে সমগ্র দেশকে বিভিন্ন পন্থায় দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অবিচার মোনাফেকী ও চরিত্রহীনতার অতল পঙ্কে নিমজ্জিত করেন। বৃটিশ ভারতে ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের প্রক্কালে ১২ই জানুয়ারী তদানীন্তন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খানের সভাপতিত্বে গফরগাঁয়ে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ সম্মেলনের লক্ষাধিক লোকের প্রকাশ্য সভায় সুসাহিত্যিক ও এককালের প্রজা আন্দোলনের প্রাণ আবুল মনসুর আহমদ "বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদের" প্রস্তাব করিলে উহা বিপুল করতালি ও উৎসাহের সহিত গৃহীত হয়। ক্ষমতায় আসীন হইবার পর প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন গফরগাঁয়ে গৃহীত প্রস্তাব বেমালুম হজম করিয়া "বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদের" প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে ইসলামের নামে জেহাদ ঘোষণা করিলেন। ইহাই নেতৃচরিত্র। তাঁহাদের নিকট ইসলাম ছিল ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার ও জমিদারী রক্ষা ছিল শ্রেণী স্বার্থ। মুসলিম লীগ শাসকগোষ্ঠী ও নেতৃত্বের চারিত্রিক দুর্বলতার সুযোগে দুই-একজন সম্মানজনক ব্যতিক্রম ব্যতীত সরকারী কর্মচারীরা অবাধ লুটপাট আরম্ভ করে। ফলে এই সকল স্বল্প সংখ্যক চরিত্রহীন সুবিধাভোগী শ্রেণী ব্যতীত ভাগ্যহত সাধারণ লোক হতবাক ও বিভ্রান্ত না হইয়া পারে নাই। এই কারণেই ক্রমে ক্রমে চাপা অসন্তোষ সর্বত্র পুঞ্জীভূত হইতে শুরু করে। ইহারই বহিঃপ্রকাশ ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ শাসকগোষ্ঠীর ভরাডুবি।

অবস্থা মোকাবেলার প্রয়াসে Public and Representative office Disqualification ordinance জারি করা হইলেও এই অস্ত্র সমাজদেহ বা রাজনৈতিক জীবন হইতে দুর্নীতি দূর করিবার জন্য জারি করা হয় নাই বরং ইহার যথেচ্ছ প্রয়োগ হইয়াছে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল প্রচেষ্টায়। আদর্শ ও নীতির বুলি-কপচানো অতি সহজ কিন্তু আদর্শ ও নীতি বাস্তব জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে রূপায়িত করিতে হইলে নেতৃত্বে আসীন ব্যক্তিচরিত্র প্রথম ও সর্বপ্রধান উপাদান। চরিত্র হইতে হইবে নিষ্কলুষ, নির্লোভ, পক্ষপাতিত্বহীন, হিংসাদ্বেষের উর্ধ্বে, মানব দরদী, সত্যাশ্রয়ী ও নীতিনিষ্ঠ। ইহার ব্যতিক্রমের অর্থ অবধারিতভাবেই জনগণের ভাগ্যাকাশে প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের কশাঘাত ও ভাগ্যাহত জনগণের জীবনে অসহনীয় দুর্ভোগের অমানিশা।

পাকিস্তান ও ভারত চব্বিশ ঘন্টার ব্যবধানে স্বাধীনতা অর্জন করিলেও ভারত স্বীয় সংবিধান রচনা করিয়া সংবিধানের প্রাসঙ্গিক বিধান অনুসারে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে এবং সাংবিধানিক সরকার আইন সভা প্রতিষ্ঠা করে।

অথচ পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় গণপরিষদে একচ্ছত্র আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ সরকার দেশকে সংবিধান দিতে ব্যর্থ হয়। তদুপরি গণপরিষদকে ব্যবহার করিয়া সকল প্রকার অপকর্ম অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বিধি-বিধানকে নির্বাসন দিতে আরম্ভ করেন। যেমন ১৯৪৮ সালে পূর্ব বংগের অর্থমন্ত্রী জনাব হামিদুল হক চৌধুরী আইন অনুসারে ছয় মাসের মধ্যে আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হইতে ব্যর্থ হইলে ছয় মাসের মেয়াদকে দশ মাসে বৃদ্ধি করা হয়। কেহ কেহ যেমন, গণপরিষদে মুসলিম লীগ ব্যতীত অন্যান্য রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করিবার দাবী জানান। অন্যদিকে জনাব সোহরাওয়ার্দীর গণপরিষদ সদস্যপদ বাতিল ঘোষণা করিয়া সম্ভাব্য নিয়মতান্ত্রিক বিরোধীতার দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানে তেত্রিশটি উপনির্বাচন অনুষ্ঠান না করিবার মত অগণতান্ত্রিক বিধান ও রীতিনীতিও গণপরিষদ বেমালুম অনুমোদন দেয়। ফলে সমগ্র দেশে ন্যায় বিচার ও আইনের শাসন প্রবর্তিত না হওয়ার আশঙ্কায় শিক্ষিত সম্প্রদায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। অবস্থার এই পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়বরণ আশ্চর্যের কিছুই ছিল না।

ঢাকা আগমন

কারামুক্তির পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে আমার কর্মস্থল রাজধানী ঢাকায় আগমন করিয়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করি। ১লা এপ্রিল ১৮ নং কারকুন বাড়ী লেনে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কার্যকরী সংসদের সভায় শৃঙ্খলা ভংগের দায়ে বহিস্কৃত প্রচার সম্পাদক আবদুর রহমানের স্থলে সভাপতির প্রস্তাবানুযায়ী আমাকে নির্বাচিত করা হয়।

এপ্রিল মাসেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সদর দফতর ৫৬ নং সিম্পসন রোডস্থ অট্টালিকার দ্বিতলে স্থানান্তরিত হইল। ১৪ই এপ্রিল (১৯৫৪) ঢাকার লায়ন সিনেমা হলে যুক্তফ্রন্টের মহা বিজয়ের পর ফ্রন্টের কর্মী শিবিরের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা ভাসানী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তাঁহার বক্তব্যের মূল সুর ছিল স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হানিকর সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে। তিনি যে কোন ধরনের সামরিক চুক্তিবদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন এবং সাম্রাজ্যবাদের মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানের সহিত সামরিক চুক্তি করিবার ঘৃণ্য প্রয়াসের বিরুদ্ধে কর্মী বাহিনীকে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জেহাদে অবতীর্ণ হইবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

কর্মীসম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণদানকালে সামরিক চুক্তি সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলে জনাব সোহরাওয়ার্দী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মন্তব্য করেন যে, তিনি পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি সম্পর্কে কিছুই জানেন না। বৈদেশিক সম্পর্ক গদিনশীন সরকারই নির্ধারণ করেন। ক্ষমতাসীন সরকারই সম্যক অবগত যে, কি কি কারণে বিভিন্ন দেশের সহিত তাঁহারা কি কি চুক্তি করিবেন। এই সকল চুক্তি দেশের সার্বিক স্বার্থে সম্পাদিত হয়। ইহার অধিক কোন প্রকার মন্তব্য করিতে তিনি অস্বীকৃতি জানান।

জনাব সোহরাওয়ার্দীর স্পষ্ট উক্তিতে কর্মীমহল নিশ্চুপ হইয়া গেল বটে তবে সন্তুষ্ট হয় নাই। যদিও পরবর্তী বৎসরগুলিতে আওয়ামী লীগ সংগঠনগতভাবে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা ও মধ্যপ্রাচ্যের বাগদাদ চুক্তি সংস্থার সদস্যপদ প্রত্যাহার পুনঃ পুনঃ দাবী করিতেছিল, কিন্তু সোহরাওয়ার্দী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্তের সহিত কখনও একমত ছিলেন না এবং সংগঠনের সহিত বরাবর অনমনীয় ভিন্ন মত প্রকাশ করিতেন। ইহা তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তার একটি দিক। সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য তিনি কখনও গা ভাসাইয়া দিতেন না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ১৯৪৮ সালে মার্কিন সরকার ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে আমেরিকা সফরে আমন্ত্রণ জানায় এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খানকে আমন্ত্রণ জানায় সোভিয়েট রাশিয়া। পরিতাপের বিষয়, প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান সোভিয়েট রাশিয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় সফরে সোভিয়েট রাশিয়া যান নাই। পরন্তু পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আমন্ত্রণ পাওয়ামাত্র নেহরু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। বিশ্বের অপর শক্তিকেন্দ্র সোভিয়েট রাশিয়ার আমন্ত্রণ অনুসারে রাষ্ট্রীয় সফরে না যাওয়াই ছিল অবিবেচনা প্রসূত। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও কূটনীতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খানের সীমিত জ্ঞানই তাঁহার এই দায়িত্বহীন আচরণের কারণ। তৎপরবর্তীকালে ঘটনার বিবর্তনে পাকিস্তান কিভাবে যে বৃহৎ শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খেলার পুতুলে পরিণত হয় তাহা সকলের জানা আছে।

১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের একতরফা জয়ে হতভম্ব কেন্দ্রীয় সরকার ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহল প্রমাদ গণিল। তাই পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্টকে সরকার গঠনে আমন্ত্রণ জানাইতে বেশ কিছু টালবাহানা করা হইল। পরিশেষে ২৫শে মার্চ কেন্দ্রীয় সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরকার গঠনের অধিকার স্বীকার করিয়া নিলেন। তবে, অতীব পরিতাপের বিষয় যে, ইহার আগেই কায়েমী স্বার্থপুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল চক্র পূর্ববংগে অরাজকতা সৃষ্টি দ্বারা ফায়দা লুটিবার জন্য ২৩শে মার্চ চন্দ্রঘোনায় কর্ণফুলী পেপার মিলে বাংগালী-অবাংগালী মেহনতি শ্রমিকদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী দাংগা সংগঠিত করে। ইহার ফল পাকিস্তানের জন্য শুভ হয় নাই।

ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে ২রা এপ্রিল (১৯৫৪) পূর্ব বংগ আইন পরিষদে নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সদস্যদের পার্লামেন্টারী সভায় শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হককে আনুষ্ঠানিকভাবে নেতা নির্বাচন করা হয়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সভায় সভাপতিত্ব করেন। ৩রা এপ্রিল শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। শেরে বাংলার সহিত জনাব আবু হোসেন সরকার, জনাব আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী ও শেরে বাংলার ভাগিনা সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া শপথ গ্রহণ করেন। স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে নির্বাচন যুদ্ধে সোচ্চার থাকা সত্ত্বেও সরকার গঠনের প্রথম পদক্ষেপেই ভাগিনা সৈয়দ আজিজুল হককে মন্ত্রীসভার সদস্য করিয়া শেরে বাংলা ২১ দফা ওয়াদার প্রতি বৃদ্ধাংগুলী প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয়তঃ সর্ববৃহৎ অংগদল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ

হইতে কাহাকেও মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করেন নাই। ফলে অনৈক্য সৃষ্টি হইল। কেন্দ্রীয় শাসকচক্র ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহল অতি সন্তর্পণে ইহারই অপেক্ষায় ওঁৎ পাতিয়াছিল। মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলার উল্লিখিত কার্যক্রম দুইটি ছিল যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের প্রতি ভাগ্যাহত জনগণের উচ্চাশা ও অবিচল আস্থার উপর অপ্রত্যাশিত ও নির্মম কশাঘাত। নেতার অদূরদর্শিতাপূর্ণ কার্যাবলী এইভাবেই দেশ ও জাতিকে বিভ্রান্ত করে। শেরে বাংলার আচরণে বিক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ শেরে বাংলার সরকারকে বেকায়দায় ফেলিবার সুযোগ অন্বেষণে সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি করে। মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হক কলিকাতা সফরকালে ৩০শে এপ্রিল এক সম্বর্ধনা সভায় ভাষণ দানকালে আবেগপ্রসূত মুহূর্তে বলেন, "রাজনৈতিক কারণে বাংলাকে বিভক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু বাংগালীর শিক্ষা, সংস্কৃতি আর বাংগালীত্বকে কোন শক্তিই কোনদিন ভাগ করিতে পারিবে না। দুই বাংলার বাংগালী চিরকাল বাংগালীই থাকিবে।" শেরে বাংলার উক্তিতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি অগ্নিশর্মা হইয়া উঠে। আওয়ামী মুসলিম লীগ শেরে বাংলার উক্তির কদর্থ করিয়া রাজনৈতিক অংগনে তাঁহাকে ঘায়েল করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। এই দিকে ২রা মে (১৯৫৪) বা ১লা রমজান অপরাহ্নে এক অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রধান ফটকের সম্মুখে সশস্ত্র পুলিশের গুলীতে ৬/৭ বৎসরের এক কিশোর বালক প্রাণ হারায়। ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপঃ

চকবাজারের এক পানের দোকানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের এক কারারক্ষী (Jail Warder) মকবুল হোসেন 'বাকী' খরিদ বাবদ বার আনা বা পঁচাত্তর পয়সা ঋণী ছিল। মকবুল হোসেন পুনরায় বাকী খরিদ করিতে চাহিলে দোকানী বাকী বিক্রি করিতে অস্বীকৃতি জানায় ও পূর্বেকার বাকী পঁচাত্তর পয়সা পরিশোধ করিতে বলে। ইহা লইয়া উভয়ের মধ্যে বচসার সূত্রপাত হয় ও ঘটনা ক্রমান্বয়ে হাতাহাতি ও মারামারির রূপ গ্রহণ করে। এই তুচ্ছ ঘটনাটিই অচিরে জনতা ও কারারক্ষীদের মধ্যে সংঘর্ষের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। রাজনৈতিক ফায়দা লুটার মতলবে খবর পাওয়ামাত্র পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ সাধারণ সম্পাদক ও পূর্ববংগ আইন পরিষদের সদ্য নির্বাচিত সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান এক উচ্ছৃঙ্খল জনতার কাফেলাকে নেতৃত্ব দিয়া জেল গেট আক্রমণ করেন। উচ্ছৃঙ্খল জনতা জেল গেট সন্নিকটবর্তী সশস্ত্র পুলিশদের অস্ত্রাগার লুন্ঠনে অগ্রসর হইলে, আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তার অপরিহার্য কারণেই জেল গেটে প্রহরারত সশস্ত্র পুলিশ গুলীবর্ষণ করিতে বাধ্য হয়। আই, জি, পি, শামসুদ্দোহা সশরীরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ও আক্রমণকারী জনতাকে ছত্রভংগ করিবার প্রচেষ্টায় শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করেন কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ঘটনা অতি সামান্য, অতি তুচ্ছ এবং অনুল্লেখযোগ্য অথচ ইহার ফলশ্রুতিতে একটি নির্দোষ নিষ্পাপ কিশোরকে পুলিশের গুলিতে আত্মাহুতি দিতে হইল। অকারণেই খালি হইল মায়ের বুক। সস্তা জনপ্রিয়তাকামী শেখ মুজিবর রহমানের নিকট ঘটনার যথার্থতা বা গুণাগুণ বিচার অবান্তর। উল্লেখ্য যে, আমাদের অনুরোধে নেহায়েত অনিচ্ছাকৃতভাবেই জনাব সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবুর রহমানকে মন্ত্রীসভায় গ্রহণের জন্য

শেরে বাংলাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু শেরে বাংলা শেখ সাহেবকে মন্ত্রীসভায় নিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃতি জানান। ফলে গোটা আওয়ামী লীগের আর কাহাকেও মন্ত্রীসভায় নেওয়া হয় নাই। ইহাই ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণ আর ইহারই পরিণাম ফল সদ্য গঠিত ফজলুল হক সরকারের বিরুদ্ধে তাঁহার এই অভিযান।

এইদিকে বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা আওয়ামী মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠানের তৎপরতা চলিল। আমি মজলুম নেতা মওলানা ভাসানীর সহিত সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরিয়া এইসব কর্মীসম্মেলন ও জনসভায় যোগ দিতেছিলাম। এইসব সভায় অবিলম্বে নব নির্বাচিত পূর্বপাকিস্তান আইন পরিষদের অধিবেশন ডাকার দাবী উত্থাপন করিয়া আমারা মুখ্যমন্ত্রী হক সাহেবের উপর চাপ সৃষ্টি করিতে শুরু করিলাম।

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান ও আমি আওয়ামী মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনে যোগদানের জন্য ঢাকা হইতে ৮ই এপ্রিল টাংগাইল পৌঁছি। ৯ই এপ্রিল সকাল বেলায় প্রথম অধিবেশনে যোগদানের পর টাংগাইল জেনারেল ট্রান্সপোর্ট অফিসের দ্বিতলে বিশ্রাম নিতেছিলাম। এই সময়ে ঢাকা হইতে শেরে বাংলার ভাগিনা ব্যারিষ্টার মাহবুব মোর্শেদসহ জনাব আতাউর রহমান খান সেখানে উপস্থিত হন। তাঁহারা জানাইলেন, মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা আওয়ামী লীগসহ অন্য অংশ দলগুলি হইতে সদস্য গ্রহণ করিয়া মন্ত্রীসভা সম্প্রসারণ করিতে খুবই আগ্রহী। শেরে বাংলার প্রেরিত প্রস্তাবে মওলানা ভাসানীর সম্মতি লাভের পর ব্যারিষ্টার মাহবুব মোর্শেদ ঢাকা ফেরত আসিলেন।

১০ই মে আওয়ামী লীগ আহূত পল্টনের বিরাট জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা অকস্মাৎ বিনা আমন্ত্রণে হাজির হইলেন। পল্টন সভামঞ্চে যুক্তফ্রন্টের দুই কর্ণধার মওলানা ভাসানী ও শেরে বাংলার একসংগে উপস্থিতি জনসমুদ্রে এক নব আশা ও আস্থার সঞ্চার করিল। সভায় শেরে বাংলা আবেগপ্রবণ ভাষায় ঘোষণা করিলেন যে, তিনি মাওলানা ভাসানীর নির্দেশেই দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন। এইভাবেই করাচী শাসকচক্রের প্ররোচনায় যুক্তফ্রন্টে যে অনৈক্যের বীজ বপনের চেষ্টা চলিতেছিল, কুচক্রীদের সেই প্রচেষ্টা আপাততঃ ব্যর্থ হইল। ১৫ই মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা সম্প্রসারিত হইল। আওয়ামী লীগের তরফ হইতে আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, আবদুস সালাম খান, শেখ মুজিবুর রহমান, হাশিমুদ্দিন আহমদ মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন। সম্প্রসারিত মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণকালেই আদমজী পাটকলে বাংগালী-অবাংগালী শ্রমিকে শ্রমিকে ভয়াবহ দাংগা সংগঠিত হয়। দাংগায় পনের শত আদম সন্তান বিনা কারণে প্রাণ হারায়। যুক্তফ্রন্টের বিজয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নেক নজরে দেখে নাই। তাই তাল সামলাইতে না পারিয়া বেসামাল মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিলড্রেথ খুবই অযাচিতভাবে ও সর্বপ্রকার কূটনৈতিক শালীনতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া মন্তব্য করিলেন যে, "পূর্ববংগের নির্বাচনের ফলাফলের দরুন কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির কোন পরিবর্তন হইবে না।" ইতিপূর্বে ২৩শে মার্চ কর্ণফুলী পেপার মিলে বাংগালী-অবাংগালী শ্রমিকের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী দাংগা হয় তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটে ১৫ই মে আদমজী পাটকলে। নিউইয়র্ক টাইমস সংবাদদাতা কালাহান মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলার সহিত সাক্ষাৎকারের বিবরণীতে বিচ্ছিন্নতাবাদের

আভাষ দান করেন। মিঃ কালাহানের এক প্রশ্নোত্তরে শেরে বাংলা নাকি বলিয়াছিলেন, "পূর্ববংগ স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে।" কেন্দ্রীয় শাসকচক্র ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহল এবং সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন বশংবদ গোষ্ঠীর মধ্যে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। তাহাদের মহলে দাবী উঠিল, দেশদ্রোহী শেরে বাংলাকে পদচ্যুত করিয়া পূর্ববংগে কেন্দ্রীয় শাসন চালু কর। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের সহিত বোঝাপড়া করিবার উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা করাচী গেলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অশুভ মতিগতিতে আতঙ্কিত হইয়া করাচীতে অবস্থানরত জনাব সোহরাওয়ার্দী ঢাকা হইতে কতিপয় মন্ত্রীকেও ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না।

৯২-ক ধারা

৩০শে মে গভর্নর জেনারেলের ভাষায় 'কমিউনিস্ট বিশৃঙ্খলা দমনে' ব্যর্থ শেরে বাংলার মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করা হয় অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে ৯২-ক ধারা প্রবর্তন করিয়া জারি করা হয় কেন্দ্রীয় শাসন। গভর্ণর চৌধুরী খালেকুজ্জামানের স্থলে দেশরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জাকে গভর্ণর পদে ও জনাব এম, এ, ইসহাকের স্থলে জনাব এন,এম, খানকে চীফ সেক্রেটারী পদে নিয়োগ করা হয়। একই সঙ্গে পূর্ব বাংলা সংবাদপত্রের উপর সেন্সরশীপ আদেশ জারি এবং যুক্তফ্রন্ট কর্মীদেরকে গ্রেফতারের হুকুম জারি করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানসহ পঁয়ত্রিশজন পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ সদস্যসহ প্রায় হাজারের উপর লোক গ্রেফতার হন। আমরা আত্মগোপন করিলাম।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন আচরণে প্রথম হইতেই গভর্ণরী শাসন প্রবর্তন হওয়ার আশংকা আমাদের মনের কোণে নানাভাবে উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছিল। এইরূপ অস্বস্তিকর রাজনৈতিক পরিবেশেই কমিউনিস্ট বন্ধুদের প্ররোচনায় মওলানা ভাসানী বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য বার্লিনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছিলেন। আমাদের কোন আপত্তি, কোন যুক্তি, কোন বাধা মওলানা ভাসানীর বিদেশ গমনের সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করিতে পারে নাই। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আসন্ন নিশ্চিত হামলার সুস্পষ্ট ও অর্থবহ ইঙ্গিত উপেক্ষা করিয়া মজলুম নেতার এই দেশ ত্যাগ পরোক্ষ ও তাঁহার অলক্ষ্যে স্বৈরাচারী কেন্দ্রীয় সরকারের হাতকেই শক্তিশালী করিয়াছিল। তাই ইস্কান্দার মীর্জা দম্ভোক্তি করিয়া হুঙ্কার ছাড়িতে পারিয়াছিলেন, "মাওলানা ভাসানীর মত রাষ্ট্রদ্রোহী প্রত্যাবর্তন করিলে, তাঁহাকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইবে।" প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী ১৫ই জুন বেতার ভাষণে দাবী করেন, শেরে বাংলা নাকি নিজেই তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত 'রাষ্ট্রোদ্রোহী' অভিযোগের 'স্বীকারোক্তি' দিয়াছেন। নবগঠিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার বরখাস্ত ও ৯২-ক ধারা প্রবর্তনজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিবার নিমিত্ত ১লা জুন (১৯৫৪) অপরাহ্ন দুই ঘটিকায় সদরঘাটস্থ ৫৬ নং সিম্পসন রোডে যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারী পার্টির এক সভা আহবান করা হয়। কিন্তু নূতন গভর্ণরের নির্দেশে পুলিশ পূর্বাহ্নেই ৫৬ নং সিম্পসন রোডস্থ দ্বিতল তালাবদ্ধ করিয়া দেয়। শেষ পর্যন্ত অর্থমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকারের সরকারী বাসভবনে নেজামে ইসলামী পার্টির নেতা

আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শেরে বাংলা মন্ত্রীসভার সকল সদস্য ও যুক্তফ্রন্টভুক্ত আইন পরিষদ সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সভা ৯২-ক ধারা প্রবর্তনের বিরোধিতা ও নিন্দা করিয়া, শেরেবাংলাকে নজরবন্দী ও শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতারের প্রতিবাদ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং সদস্যবৃন্দ প্রয়োজনবোধে কারাবরণ করিবার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কারাবরণ তো দূরের কথা এই বীর পুরুষগণ পুলিশের ছায়া দেখিয়াই সভাস্থল হইতে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করিতে করিতে রণে ভঙ্গ দেন; এবং খুব সম্ভব ভালোয় ভালোয় ঘরের ছেলে ঘরে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিয়া আল্লাহ তায়ালার দরবারে শোকরানা নামাজ আদায় করেন। ভাবখানা যেন এই যে, তাঁহারা আইন পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন মান, মর্যাদা, প্রতিপত্তি, মন্ত্রীত্ব ইত্যাদির খাতিরে, জনগণের সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লিপ্ত হইবার কারণে জেল জুলুম ভোগ করিবার এবং স্ত্রী-পুত্র কন্যাকে অশেষ বেকায়দায় ফেলার জন্য নয়। সংগ্রাম করিবে, আইন অমান্য করিবে, কারাবরণ করিবে, পুলিশী অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করিবে যুক্তফ্রন্ট কর্মীরা ও জনগণ। নেতারা আরাম আয়েসে টু পাইস কামাই করিবেন, কর্মীরা জিন্দাবাদ দিবে সময়কালে-- ইহাই ছিল তাঁহাদের মনোভাব।

এইদিকে গভর্ণর ইস্কান্দার মীর্জার আধা সামরিক শাসনে যে নাভিশ্বাস দেখা দেয়, তন্মুহূর্তে যুক্তফ্রন্টের ত্রিপ্রধান নেতার অনুপস্থিতি পরিস্থিতিকে আরো শূন্যতার গর্ভে নিক্ষেপ করে। শেরে বাংলা অন্তরীণ অবস্থায় ২৩শে জুলাই (১৯৫৪) রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া প্রকাশ্য বিবৃতি দিলেন। মওলানা ভাসানী লন্ডনে দিন গুজরান করিতেছিলেন এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী পেটের ফোড়া অপারেশনকল্পে সুইজারল্যান্ডের জুরিখ হাসপাতালে ভর্তি হইলেন। অথচ এই তিন প্রধান ঢাকার মাটিতে দাঁড়াইয়া কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক জারিকৃত গভর্ণরী শাসন প্রবর্তনের বিরুদ্ধে ডাক দিলে পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে পুনর্বহাল করা ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য কোন উপায় থাকিত না। নেতৃত্বের দুর্বলতা জনতার প্রতিরোধ চেতনা ও শক্তিকে যে কিভাবে স্তিমিত করিয়া ফেলে, ইহা তাহারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

উল্লেখ্য যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ও শেরে বাংলা মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান নিজ গ্রেফতারের পূর্বে ৩০শে মে করাচী হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়াই অপরাহ্নে তাঁহার সরকারী বাসভবনে আমাদের (অর্থাৎ আবদুল হামিদ চৌধুরী, মোল্লা জালাল উদ্দিন, হাতেম আলী তালুকদার ও আমি) সহিত এক বৈঠকে মিলিত হইয়া প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। আমি তদুত্তরে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, প্রতিরোধ আন্দোলন করিবার প্রয়োজনেই শেখ সাহেবকে আত্মগোপন করিতে হইবে এবং তাঁহার গ্রেফতার বরণ করা সমীচীন হইবে না। কিন্তু আমাদের পরামর্শের প্রতি বৃদ্ধাংগুলী দেখাইয়া শেখ সাহেব সরকারী বাস ভবনেই রাত্রি যাপন করিলেন এবং তথা হইতেই গ্রেফতার হইলেন ও নির্ঝঞ্ঝাটে কালযাপনের জন্য ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আশ্রয় হইলেন।

আমি অত্যন্ত হতোদ্যম হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং প্রায় দুই মাস কাল আত্মগোপন করিয়া থাকিবার পর মেডিকেল কলেজের ছাত্র বন্ধুবর আলী আসগর, নজরুল ইসলাম ও কাসেদুল হকের সহায়তায় নৌকাযোগে দাউদকান্দি গমন করি এবং আলী আসগরের শ্রদ্ধেয় পিতা লাল মিঞা সরকার সাহেবের গাড়ীতেই কুমিল্লা গিয়া বন্ধুবর মফিজুল ইসলামের বাসভবনে সাময়িক আশ্রয় গ্রহণ করি। কুমিল্লায় আমি আমার শ্রদ্ধেয় মামা কাজী সুলতান মাহমুদের ও আমার অগ্রজ আজিজুর রহমান সাহেবের শ্বশুর বাড়ীতে বেশ কিছুকাল আত্মগোপনে কাটাই। কিন্তু আমার কুমিল্লা অবস্থান গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীদের গোচরীভূত হয়। তাই আমি কালবিলম্ব না করিয়া কমিউনিস্ট পার্টি কর্মীদের সহায়তায় আগরতলা গমন করি। আগরতলায় বাবু সত্য রায়, নরেশ রায় ও ঠাকুর ভাই-এর বাস্তব সাহায্য ও সহায়তা ভুলিবার নয়। বিদেশ বিরাজ্য আগরতলায় তাঁহারাই ছিলেন আমার স্বজন ও আশ্রয়দাতা। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিস্কৃত হওয়ার পর আমি আগরতলা কলেজে ভর্তি হইতে গিয়াছিলাম; কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে তিষ্টিতে না পারিয়া ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আবার ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাক বাহিনীর হামলার মুখে বাধ্য হইয়া আমাকে আগরতলায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

৯২-ক ধারা বলবৎ থাকাকালে পাকিস্তান সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভুমন্ডলীয় স্বার্থে কমিউনিস্ট বিরোধী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা (South East Asia Treaty Organization) ও বাগদাদ চুক্তি (Baghdad Pact) সংস্থার সদস্য পদ গ্রহণ করে। মে মাস হইতে স্বল্প কয়েক মাসের মধ্যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশবাদী চক্রের সহিত দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সামরিক চুক্তির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী সরকার পাকিস্তানকে পশ্চিমা শক্তিজোটের লেজুড়ে পরিণত করেন। ১৯৫৪ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় এক সভায় পাকিস্তান, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও নিউজিল্যান্ড দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা (SEATO) গঠন করে; আর ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই পাকিস্তান, ইরাক, তুরস্ক, ইরান ও গ্রেট ব্রিটেন বাগদাদ চুক্তি সংস্থা গঠন করে। ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে ব্রিগেডিয়ার করিম কাসেমের নেতৃত্বে এক সামরিক অভ্যুত্থানে ইরাকের সরকার পরিবর্তন হয় ও সাম্রাজ্যবাদী চুক্তি সদস্যপদ প্রত্যাহার করায় বাগদাদ চুক্তি সংস্থার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ CENTO-CENTRAL TREATY ORGANISATION নামে নূতন নামকরণ করিয়া তুরস্কের আনকারায় সদর দফতর স্থানান্তরিত করে। পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা আয়ত্বাধীন হইবার পর ২০, ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর (১৯৫৪) পাকিস্তান গণপরিষদ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ১০ ধারা বিলুপ্ত করিয়া গভর্ণর জেনারেল ক্ষমতা হ্রাস করে ও ১৯৪৯ সালের পাবলিক এন্ড রিপ্রেজেনটেটিভ অফিস ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডিন্যান্স বাতিল করিয়া সংবিধানের মূলনীতি কমিটি রিপোর্ট গ্রহর করে। প্রণীত শাসনতন্ত্র বিল চূড়ান্ত বিবেচনার্থে গণপরিষদে উপস্থাপিত করিয়া দিয়া প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী রাষ্ট্রীয় সফরে যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। প্রধানমন্ত্রীর এই অনুপস্থিতির সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া গভর্ণর জেনারেল

গোলাম মোহাম্মদ সশস্ত্র বাহিনী প্রধান জেনারেল আইউব খানের সহায়তায় গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা হরণের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ সংকল্পে ২৩শে অক্টোবর (১৯৫৪) পাকিস্তান গণপরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন ও সমগ্র দেশে জরুরী অবস্থা জারি করিয়া গণপরিষদের সংবিধান রচনার উপর এক চরম প্রত্যাঘাত হানেন। সফররত প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী গভর্ণর জেনারেলের জরুরী বার্তা পাইয়া যুক্তরাষ্ট্র সফর সংক্ষিপ্ত করিয়া ২৪শে অক্টোবর মধ্যরাত্রে করাচী বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। বিমান বন্দর হইতেই সরাসরি তাঁহাকে গভর্ণর জেনারেলের বাসভবনে যাইতে হয়। গভর্ণর জেনারেলের নির্দেশ মত তাঁকেই পুনঃমন্ত্রীসভা গঠন করিতে হয়। মোহাম্মদ আলীর ভাষায় এই সভা হইল 'মিনিস্ট্রি অব ট্যালেন্ট'। ইহার সদস্যরা হইলেন সেনাধ্যক্ষ জেনারেল মোহাম্মদ আইউব খান, প্রাক্তন দেশরক্ষা সচিব ও পূর্ববঙ্গের গভর্ণর মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা, ডা খান সাহেব, এম, এইস, ইস্পাহানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবু হোসেন সরকার, মোঃ শোয়েব, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, মীর গোলাম আলী তালপুর।

পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক ওসমানী করাচী হইতে ও জনাব আতাউর রহমান খান ঢাকা হইতে প্রকাশ্য বিবৃতি দ্বারা এবং জনাব শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা সেন্ট্রাল জেল হইতে গোলাম মোহাম্মদকে টেলিগ্রাম যোগে ফরমান বলে পাকিস্তান গণপরিষদের অন্যায় ও অবৈধ বিলুপ্তিকে স্বাগত জানান। এমনকি গোলাম মোহাম্মদের এই বিধি-বহির্ভুত অন্যায় ফরমানের পক্ষে সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে করাচী হইতে মাহমুদুল হক ওসমানী এবং ঢাকা হইতে আতাউর রহমান খান বিদেশে চিকিৎসারত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও লন্ডনে অবস্থানরত স্বেচ্ছা নির্বাসন জীবনযাপনকারী মওলানা ভাসানীর সমীপে গমন করেন। গণপরিষদের বিলুপ্তি ঘোষণার মধ্য দিয়া পাকিস্তানের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজনীয় সংবিধান হাওয়া হইয়া গেল। ক্ষমতালোভী নেতাদের যেন আর তর সহিল না। তাঁহারা প্রায় সবাই স্বৈরাচারী গোলাম মোহাম্মদের গণতন্ত্র বিরোধী জঘন্য কারসাজির দোসর বনিয়া গেলেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত মুখ্যমন্ত্রী জনাব নূরুল আমিন পর্যন্ত গণপরিষদের সদস্যপদ হইতে ইস্তফা দানের প্রস্তাব দিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গের নব নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হক স্বীয় গণপরিষদ সদস্যপদ ত্যাগ করিবার কোন উদ্যোগই গ্রহণ করেন নাই অথবা নূতন গণপরিষদ গঠনের কোন দাবীও জানান নাই।

১৪ই নভেম্বর গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের ঢাকা আগমন উপলক্ষে পদচ্যুত মুখ্যমন্ত্রী ও রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণের সুস্পষ্ট ঘোষণাকারী শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হক পুনরায় কর্মচঞ্চল হইয়া উঠিলেন। মন্ত্রীত্বের টোপের যাদুকরী প্রভাবেই শেরে বাংলা ও আতাউর রহমান খান ঢাকা বিমান বন্দরে স্বৈরাচারী গভর্ণর জেনারেলকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইলেন। বিমান বন্দরে কে তাঁহাকে প্রথমে মাল্যভুষিত করিবেন এই সমস্যায় জর্জরিত দুই নেতাকে উদ্ধার করিলেন গভর্ণর জেনারেল স্বয়ং। অর্থাৎ তিনি শেরে বাংলা ও আতাউর রহমান খানের দুই হাত একত্রিত করিয়া যুগপৎ মাল্যদানের

সুযোগ করিয়া দিয়া উভয়েরই ধন্যবাদার্হ হইলেন, জনপ্রতিনিধিদের এই কর্মকান্ডে অবাক গোলাম মোহাম্মদ নিশ্চয়ই তাঁহাদের অলক্ষ্যে ক্রুর হাসি হাসিলেন এবং মনে মনে বোধ হয় আওড়াইয়াছিলেন, "আসিলাম, দেখিলাম এবং জয় করিলাম।" ৯২-ক ধারার গভর্ণরী শাসনের যাঁতাকলে পূর্ব বঙ্গবাসীর যখন নাভিশ্বাস উঠিতেছিল, তখনই তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এই ন্যাক্কারজনক কুৎসিৎ চেহারা ও ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট ভোগের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা দেশবাসীকে স্তম্ভিত না করিয়া পারে নাই।

রোগমুক্তির পর জুরিখ হাসপাতাল ত্যাগ করিয়া লন্ডন আগমন করিলে সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে জনাব সোহরাওয়ার্দী মন্তব্য করেন যে, পাকিস্তানের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মন্ত্রীসভায় যোগদানের বিষয়ে মনস্থির করিতে সময় লাগিবে। তাঁহার এই মন্তব্যের ব্যাপারে সাংবাদিকদের এক দৃষ্টি আকর্ষণকারী প্রশ্নের জওয়াবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইস্কান্দার মীর্জা গর্বভরে বলিয়াছিলেন, "পাকিস্তান প্রত্যাবর্তনের পর দশ দিনের অধিক সময় লাগিবে না।" জনাব সোহরাওয়ার্দী ১১ই ডিসেম্বর (১৯৫৪) করাচী প্রত্যাবর্তন করিলেন ও তাঁহার করাচী রোডস্থ বাসভবনে পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতৃবর্গের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হইলেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের ঘোর বিরোধিতা সত্ত্বেও জনাব সোহরাওয়ার্দী ২০শে ডিসেম্বর মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রীসভায় আইনমন্ত্রী পদে যোগদান করিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইস্কান্দার মীর্জার দম্ভোক্তিই সত্য হইল। রাজনীতির অপার মহিমায় কি না হয়! ১৯৪৬ সালে সোহরাওয়ার্দীর বঙ্গীয় মন্ত্রীসভায় যে মোহাম্মদ আলী অর্থমন্ত্রী ছিলেন, ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানে সেই মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রীসভায় জনাব সোহরাওয়ার্দী হইলেন আইনমন্ত্রী। আবার অঘটন ঘটন পটিয়সী রাজনীতির বদৌলতে যে শেরে বাংলাই পাঞ্জাবী চক্রের হোতা চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রীসভায় যোগদান করিয়া সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। যে ফজলুল হক ১৯৫৪ সালের মে-জুন মাস পাক সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যায় ভূষিত হইয়াছিলেন, সেই ফজলুল হকই ১৯৫৫-৫৬ সালে পাকিস্তানের নিরাপত্তা মন্ত্রীপদ অলঙ্কৃত করেন। এই নীতিজ্ঞানহীন রাজনীতিই ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। ইহারই বিষবাষ্প অচিরেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অঙ্গচ্ছেদের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অতি চালাকী ও অতি লোভ যে জাতীয় ঐক্যকে রক্ষা করিতে পারে না, ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয়।

ইতিমধ্যে শহীদ সাহেবের প্রচেষ্টায় শেখ মুজিবর রহমান ১৮ই ডিসেম্বর (১৯৫৪) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করেন। গোলাম মোহাম্মদ শেরে বাংলার মনোনীত জনাব আবু হোসেন সরকারকে ৪ঠা জানুয়ারী (১৯৫৫) মন্ত্রীসভার সদস্য করিলেন। শহীদ সাহেব গোলাম মোহাম্মদ চক্রের গোলক ধাঁধাঁয় এতই দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, মন্ত্রীত্ব বনাম সাংগঠনিক মতবিরোধ সম্পর্কে জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের জওয়াবে মন্তব্য করেন, "আওয়ামী লীগ আবার কি? আমিই আওয়ামী লীগ"। অন্য এক প্রশ্নের জওয়াবে তিনি বিস্ময়করভাবে অবলীলাক্রমে বলেন, "আমিই আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্ট।" বলাই বাহুল্য যে, গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলিয়া খ্যাত বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ শহীদ সাহেবের এইসব উক্তি আওয়ামী লীগের অসংখ্য নির্যাতিত, ত্যাগী, নীতিনিষ্ঠ ও নিবেদিত প্রাণ কর্মীকে হতাশ

ও নিরাশ করে। তদবধি ব্যক্তিপূজার রাজনীতি আওয়ামী লীগে ক্রমশঃ প্রাধান্য বিস্তার করিতে থাকে এবং ইহা দেশ ও জাতির অচিন্তনীয় ক্ষতি সাধন করে। শহীদ সাহেবের অন্য এক উক্তি "যুক্তফ্রন্ট কতকগুলি দলের স্তুপ বা সংগ্রহ মাত্র"- যুক্তফ্রন্টের জীবনীশক্তি অবক্ষয়ের প্রধান কারণ হইয়া দেখা দেয়। এই উক্তি আওয়ামী লীগ মহলকে চরমভাবে বিভ্রান্ত করে। শহীদ সাহেবের এইসব উক্তি ও বিভিন্ন কার্যক্রমের ব্যাপারে গণতন্ত্রপ্রিয় জনমনে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া গোলাম মোহম্মদ চক্রের শ্যেনদৃষ্টি এড়ায় নাই। তাই শহীদ সাহেব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ প্রধান মজলুম নেতা মওলানা ভাসানীকে লন্ডনে নির্বাসন জীবনযাপন করিতে হইতেছিল। যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগের বহু সংখ্যক নেতা ও কর্মী কারান্তরালে ধুঁকিতেছিলেন। তাহাদের অনেকেই গ্রেফতারী পরোয়ানা বা হুলিয়ার দাপটে বনে-জঙ্গলে কাল কাটাইতেছিলেন; এমনকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইস্কান্দার মীর্জা সর্বজন শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ মওলানা ভাসানীর জীবননাশের (গুলী করিয়া হত্যা) হুমকি পর্যন্ত দিয়াছিলেন। এইভাবে চক্রান্তের রাজনীতি স্বাভাবিক পথেই পল্লবিত হইতেছিল। শেরে বাংলার মনোনীত প্রতিনিধি হিসাবে জনাব আবু হোসেন সরকারের কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদান ছিল বর্ণিত চক্রান্তেরই অন্যতম পরিণতি।

ঢাকা প্রত্যাবর্তন

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আগরতলা হইতে দেশের মাটিতে আমার প্রত্যাবর্তন অতি তীব্রভাবে অনুভব করিতেছিলাম। তাই আত্মগোপন অবস্থায়ই ঢাকা প্রত্যাবর্তন করি এবং ২রা নভেম্বর (১৯৫৪) দৈনিক পাকিস্তান অবজারভারে প্রকাশিত বিবৃতি মারফত্ দৈনিক ইত্তেফাকের উপর হইতে আরোপতি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য সরকারকে অভিনন্দন জানাই; শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য রাজবন্দীর মুক্তি ও রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে জারিকৃত হুলিয়া প্রত্যাহার এবং সার্বজনীন ভোটে অবিলম্বে নূতন গণপরিষদ গঠনের দাবী উত্থাপন করি।

১৮ই ডিসেম্বর কারামুক্তির অব্যহিত পরই শেখ মুজিবুর রহমান বিভেদের রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন এবং যুক্তফ্রন্ট নেতা শেরে বাংলার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়নের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহবান করেন। ওয়ার্কিং কমিটি শেরে বাংলার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব সমর্থনের জন্য আওয়ামী লীগভুক্ত পরিষদ সদস্যদের উপর নির্দেশ জারি করে। আমার উপরে তখনও গ্রেফতারী পরওয়ানা ছিল বিধায় আমি আওয়ামী লীগ সদর দফতর ৫৬ নং সিম্পসন রোডের উক্ত সভায় যোগ দিতে পারি নাই।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া অন্ধকার ঘনীভূত হইলেই আমি সাইকেলযোগে আওয়ামী লীগ অফিসের গাড়ী বারান্দায় পৌছানো মাত্রই শেখ সাহেব ও অন্যদের সহিত দেখা হয়। শেখ সাহেব আমাকে সভার কার্যবিবরণী জানান এবং কার্যবিবরণী খাতায় আমার সহি গ্রহণ করিয়া সভার কোরাম আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ণ করেন। দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন ও আওয়ামী লীগের অন্যতম সহ-সভাপতি সুসাহিত্যিক ও প্রখ্যাত লেখক আবুল মনসুর আহমদের ঘোর বিরোধিতা ও আপত্তি এবং মজলুম নেতা মওলানা ভাসানীর লন্ডন

হইতে যুক্তফ্রন্ট ভঙ্গের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমান, মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও আতাউর রহমান খান ১৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৫) শেরে বাংলাকে নেতৃত্ব হইতে অপসারণকল্পে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন ও নূতন নেতা নির্বাচনের কর্মসূচী বাস্তবায়নে সর্বক্ষণ ব্যাপৃত রহিলেন। অনাস্থা প্রস্তাব সভায় শেরে বাংলা ১১৯ ও আতাউর রহমান ১০৫ সদস্যের সমর্থন পান। শেরে বাংলা ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন উক্তি এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক যুক্তফ্রন্টকে কতকগুলি দলের জগাখিচুড়ি (Conglomeration of parties) আখ্যাদানের মধ্যেই নিহিত ছিল শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যদের অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের মূল মানসিক শক্তি। যুক্তফ্রন্টে ভাঙ্গন সৃষ্টির এই প্রয়াসে ইন্ধন জোগাইয়াছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুচর করাচী প্রাসাদ চক্রের অন্যতম অনুগত সহচর পূর্ব পাকিস্তান সরকারের চীফ সেক্রেটারী নিয়াজ মোহাম্মদ খান। অনাস্থা প্রস্তাব সম্পর্কিত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীই একমাত্র শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন, যাঁহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় যুক্তফ্রন্টভুক্ত বিভিন্ন অঙ্গদল ঐক্যবদ্ধ রাখা সম্ভব ছিল। জনাব সোহরাওয়ার্দী অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যে যুক্তফ্রন্টের বিজয় সুনিশ্চিত করিয়াছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অনুচরদের প্ররোচনায়, বুদ্ধিনাশা অবস্থায় তিনিই স্বয়ং জনগণের ঐক্যের এই হাতিয়ার যুক্তফ্রন্টের মূলে কুঠারাঘাত করলেন। উপরোল্লিখিত ঘটনারাজির ধারায় জনগণের অলক্ষ্যে ও নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই ব্যক্তিসর্বস্ব, ব্যক্তি প্রাধান্য ও ব্যক্তিপূজা আশ্রয়ী রাজনীতির ক্রমবিকাশ ঘটে এবং নীতি, আদর্শ, লক্ষ্য ও কর্মসূচীভ্রষ্ট রাজনীতির অভিশাপ দেশবাসীর ঘাড়ে চাপিয়া বসে। যাহা হউক, এইভাবেই যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গিয়া গেল এবং এইদিকে শেরে বাংলা ফজলুল হকের নেতৃত্বে রহিল কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি ও গণতন্ত্রী দল, জনাব আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একাংশ (২০জন) যুক্তফ্রন্টভুক্ত রহিল এবং জনাব আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বৃহত্তর অংশ সংগঠিত হইল। লক্ষণীয় যে, আওয়ামী লীগের ১৯জন পরিষদ সদস্য এই অবস্থায় শেরে বাংলার কৃষক শ্রমিক পার্টিতে যোগদান করেন।

১৯৫৫ সালের ২৭শে জানুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমানের প্রচেষ্টায় সরকার কর্তৃক আমার বিরুদ্ধে জারিকৃত গ্রেফতারী পরওয়ানা প্রত্যাহার করা হয়।

গণপরিষদের সভাপতি জনাব তমিজুদ্দিন খান গভর্ণর জেনারেলের গণপরিষদ বিলুপ্তি আদেশের বিরুদ্ধে সিন্ধুর চীফ কোর্টে মামলা দায়ের করেন। ১৯৫৪ সালের ৭ই নভেম্বর সিন্ধু চীফ কোর্ট গণপরিষদ বিপুপ্তি আদেশকে অবৈধ ও এক্তিয়ার বহির্ভুত বলিয়া রায় দেন। ১৯৫৪ সালের ১০ই নভেম্বর গভর্নর জেনারেল সিন্ধু চীফ কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আবেদন জানান। ১০ই মার্চ কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত কৌসুলি মিঃ ডিপলক সরকারের নির্দেশ মোতাবেক আদালতের নিকট নিবেদন করেন যে, গভর্নর জেনারেল বর্তমান প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলির মাধ্যমে নির্বাচনের সাহায্যে একটি নূতন গণপরিষদ গঠন করিতে ইচ্ছুক রহিয়াছেন। ২১শে মার্চ (১৯৫৫) সুপ্রীম কোর্ট সিন্ধু চীফ কোর্টের রায়কে নাকচ করিয়া গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক গণপরিষদ বিলুপ্তির আদেশকে বৈধ বলিয়া ঘোষণা করেন বটে তবে অবিলম্বে

একটি সংবিধান প্রণয়ন সংস্থা গঠনের আদেশ দেন। তদানুযায়ী গভর্ণর জেনারেল ১৫ই এপ্রিল (১৯৫৫) Constitution Convention Order অর্থাৎ সংবিধান কনভেনশন আদেশ জারি করেন।

এবম্বিধ অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে মজলুম নেতা মওলানা ভাসানী কলিকাতার পথে লন্ডন হইতে ৫ই জানুয়ারী (১৯৫৫) বোম্বাই পৌছেন। ২৮শে মার্চ (১৯৫৫) আমাকে নিম্ন পত্রটি লিখেনঃ

প্রিয় অলি আহাদ,

আশা করি ভাল আছে। পাসপোর্ট সংগ্রহ করিতে পারিলে সত্বর আসিবে। পূর্ব পাকিস্তান হইতে আসাম, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে লোক আসিতেছে, তাহাতে আমরা সত্বরই সংখ্যালঘু হইয়া পড়িব এবং উহার দরুন হিন্দুস্থানের সংখ্যালঘুদের মনেও আতংক বৃদ্ধি পাইবে। আশা করি, আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে প্রত্যেক জেলায় বিজ্ঞাপন বিতরণ ও সভা সমিতি করিয়া যাহাতে লোক আসা বন্ধ হয়, তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে। আমার দোয়া-সালাম সকলকে জানাইও। উভয় পাকিস্তানের মিলন আওয়ামী লীগের সংগঠনের দ্বারাই হইবে।

গণ আন্দোলন ভালভাবে করিতে চেষ্টা করিবে।

স্বাক্ষরঃ মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী
২৮-৩-৫৫

সোহরাওয়ার্দীর প্রতিশ্রুতি

৩০শে মার্চ (১৯৫৫) রোজ বুধবার সকালের দিকে কলিকাতার টাওয়ার হোটেলে অবস্থানরত মজলুম নেতা মওলানা ভাসানীর সহিত টেলিফোনযোগে সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে আমার আলোচনা হয়। মজলুম নেতা আমাকে কলিকাতায় দেখা করিতে আদেশ দেন; কিন্তু সরকার পাসপোর্ট দিতে অস্বীকার করিলে শেখ মুজিবুর রহমানকে কলিকাতায় যাইতে আমি অনুরোধ জানাই। মজলুম নেতার উপর আরোপিত বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার, ৯২-ক ধারা প্রত্যাহার ও রাজবন্দী মুক্তি দাবীতে ১৫ই এপ্রিল (১৯৫৫) আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পল্টন ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব সোহরাওয়ার্দী ও ইস্কান্দার মীর্জা আওয়ামী লীগ ও ফজলুল হকের নেতৃত্বে পরিচালিত যুক্তফ্রন্টকে সংবিধান কনভেনশনে গ্রহণ করাইবার উদ্দেশ্যে ঢাকা আগমন করেন। জনাব সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশে ২০শে এপ্রিল সকাল নয় ঘটিকায় গভর্ণমেন্ট হাউসে (বর্তমান বঙ্গভবন) আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ও আওয়ামী লীগ দলীয় আইন পরিষদ সদস্যবৃন্দের এক যৌথ বৈঠকে সংবিধান কনভেনশনে যোগদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পূব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে প্রবর্তিত সংখ্যাসাম্য নীতি এবং পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও খয়েরপুর সমবায়ে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট গঠন পরিকল্পনার আমি তীব্র বিরোধিতা করি। কিন্তু আমার বিরোধিতা অরণ্যরোদনে পর্যবসিত হয়। কেননা তখন সকলকেই মন্ত্রীত্বের লোভ ও ক্ষমতার লোভে পাইয়া বসিয়াছিল। এইদিকে

শেরে বাংলার নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সংবিধান কনভেনশন আদেশ প্রত্যাখান করে। জনাব সোহরাওয়ার্দীর প্রচেষ্টায় পাকিস্তান সরকার মওলানা ভাসানীর উপর হইতে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করিবার পর মওলানা ভাসানী ২৫শে এপ্রিল (১৯৫৫) রোজ সোমবার অপরাহ্নে কলিকাতা হইতে ঢাকা আগমন করেন। ২৬শে এপ্রিল আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সংবিধান কনভেনশন গৃহীত হয়। তবে, জনাব সোহরাওয়ার্দী নিম্নে বর্ণিত লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরই মওলানা ভাসানী ওয়ার্কিং কমিটিকে Constitution Convention-এ যোগদানের সিদ্ধান্তে সম্মতি দিয়াছিলেনঃ "I hereby declar that I shall try my utmost to get the 21-point programmes and joint electorate by the Constitution Convention so far as the proposal affects the constitution. On failure to do so I shall resign from the Ministry".

Sd-H.S.Suharwardy
26.4.55

অর্থাৎঃ "আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, ২১ দফা ও যুক্ত নির্বাচন প্রস্তাবাবলী কনস্টিটিউশন কনভেনশন কর্তৃক গ্রহণ করাইবার লক্ষ্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব- যতদূর পর্যন্ত প্রস্তাবগুলি সংবিধানের সহিত সম্পর্কিত। ব্যর্থ হইলে মন্ত্রীসভা হইতে পদত্যাগ করিব।"

স্বাঃ এইচ,এস, সোহরাওয়ার্দী
২৬-৪-৫৫

২৭শে এপ্রিল সর্বজনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মজলুম নেতা মওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান, তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), ইয়ার মোহাম্মদ খান ও আমি মনোনয়নপত্র দাখিল করি। মুসলিম আসনের জন্য মোট পঞ্চাশটি মনোনয়নপত্র ও সংখ্যালঘু আসনের জন্য মোট আটটি মনোনয়নপত্র দাখিল হয়। পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে জনাব সোহরাওয়ার্দীর নিকট হইতে লিখিত প্রতিশ্রুতিপত্র পাওয়ার পরই কনস্টিটিউশন কনভেনশনের বিরুদ্ধে সোচ্চার মওলানা ভাসানী কনস্টিটিউশন কনভেনশন গ্রহণ করেন। দুঃখের সহিত উল্লেখ করিতে হয় যে, গণতন্ত্রের মানসপুত্র আখ্যায়িত জনাব সোহরাওয়ার্দীর এই সময়কার ভূমিকা দেশকে এক সর্বনাশা ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলিয়া দিতেছিল।

সংখ্যাসাম্য, এক ইউনিট ও কনস্টিটিউশন কনভেনশনের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় বিচলিত আইনমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর উপরে বর্ণিত পদক্ষেপগুলি দেশবাসী গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলে বিকল্প পন্থায় যথা প্রয়োজনবোধে সামরিক বিধানের মাধ্যমে দেশের সংবিধান জারি করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করেন। সোহরাওয়ার্দীর উক্ত অবাঞ্ছিত উক্তি পূর্ববঙ্গের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক মহলকে চরমভাবে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে।

১৯৫৫ সালের ৩রা এপ্রিল ফেডারেল কোর্ট রায় দেয় যে, অর্ডিন্যান্স বলে সংবিধান (constitution) জারি করা যাইবে না, গণপরিষদই কেবল সংবিধান রচনার এক্তিয়ার রাখে।

১৯৫৫ সালের ১৫ই এপ্রিল এক আদেশ বলে গভর্ণর জেনারেল কনস্টিটউশন কনভেনশন (constitution convention) গঠন করার ও ১০মে (১৯৫৫)-এ কনভেনশন বসার ঘোষণা প্রদান করেন। ১০ই মে (১৯৫৫) প্যাটেলের মামলার রায় দানকালে ফেডারেল কোর্ট কনস্টিটিউশন কনভেনশন নয় বরং কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলী অর্থাৎ গণপরিষদ গঠনের নির্দেশ দেন। তদানুযায়ী গভর্ণর জেনারেল ২৮শে মে (১৯৫৫) আশিজন সদস্যবিশিষ্ট গণপরিষদ গঠনের আদেশ জারি করেন। তন্মধ্যে চল্লিশজন পূর্ব পাকিস্তান ও চল্লিশজন পশ্চিম পাকিস্তান হইতে নির্বাচিত হইবেন। স্বতন্ত্র নির্বাচন বিধায় পূর্ব পাকিস্তান হইতে সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হয় একত্রিশজন মুসলমান ও নয়জন অমুসলমান।

দৈনিক সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী জনাব সোহরাওয়ার্দীর প্রতিটি পদক্ষেপকে প্রাসাদ চক্রান্তপ্রসূত মনে করিতেন ও তিনি দেশী-বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী চক্রের বিরুদ্ধে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় আমাদিগকে সজাগ রাখিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। তাঁহার ও আমার মধ্যকার মতভেদ কখনও কখনও মতান্তরে গড়াইত। মাঝে মাঝে তাঁহার ব্যথাবিধুর মুখপানে চাহিয়া আমি নিজেই অপ্রস্তুত হইয়া পড়িতাম। তাঁহার মানসিক যাতনার কারণ ছিল এই যে, পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্য অনুধাবন করিতে আমি ব্যর্থ হই কেন? ১৯৫৪ সালের ৩০শে মে ৯২-ক ধারা জারির অব্যবহিত পূর্বে বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগদানকল্পে মওলানা ভাসানীর দেশত্যাগকে আমি সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারি নাই। বিশেষ কোন গোষ্ঠীর প্ররোচনায় জনগণকে হায়নার খপ্পরে ফেলিয়া সংকটমুহূর্তে বিদেশ গমন তাঁহার বিদেশ অবস্থান ও বিদেশে তাঁহার বিভিন্ন কার্যাবলী আমার নিকট বাস্তব-বিবর্জিত ও জাতীয়স্বার্থ হানিকর বলিয়া প্রতীয়মান হইত। যুক্তফ্রন্ট শীর্ষ নেতৃবৃন্দ শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনৈক্য জনগণের সার্বভৌমত্ব হরণকারী, গণতন্ত্র বিরোধী, সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন, সামন্তবাদ, উঠতি পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকেই শুধু উস্কাইয়া দেয় নাই- এই সবের যারা দোসর সেই প্রাসাদ রাজনীতির শিরকুলমণিদের ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতিকেও দেশের মাটিতে মূল বিস্তার করিতে ও জীবনরস আহরণ করিতে বিপুলভাবে সহায়তা করিয়াছে।

গভর্ণর জেনারেলের ২৮শে মে'র (১৯৫৫) গণপরিষদ আদেশ মোতাবেক পূর্ববঙ্গ হইতে নির্বাচিতব্য একত্রিশজন মুসলিম সদস্যের মধ্যে ছিলেন যুক্তফ্রন্ট হইতে ষোলজন, আওয়ামী লীগ হইতে বারজন, মুসলিম লীগ হইতে একজন এবং স্বতন্ত্র একজন। পক্ষান্তরে নয়জন হিন্দু সদস্য যথাক্রমে পাকিস্তান কংগ্রেস, ইউনাইটেড পিপলস পার্টি ও সিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশনভুক্ত ছিলেন। প্রথম পাক গণপরিষদের বাহাত্তরজন সদস্যের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান হইতে নির্বাচিতদের সংখ্যা ছিল চুয়াল্লিশ জন। তন্মধ্যে ছয়জন সদস্য ছিলেন অবাঙ্গালী। স্বাধীনতার পর ভারত হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে আশি লক্ষ মোহাজের স্থায়ীভাবে

বসবাস করিতে আসে। গণপরিষদে তাহাদের প্রতিনিধিত্ব দান করা হয় এবং তদানুযায়ী সাতজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ফলে গণপরিষদের সর্বমোট সদস্য সংখ্যা বাহাত্তর হইতে বৃদ্ধি পাইয়া উনাশিতে উপনীত হয়।

৯২-ক ধারা প্রত্যাহার

অসুস্থ গভর্ণর জেনারেল চিকিৎসার কারণে সুইজারল্যান্ড অবস্থানকালে আইনমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কতিপয় সাংবিধানিক বিষয় আলোচনার প্রয়োজনে তাঁহার নিকট গমন করেন। তাঁহাদের উভয়ের অনুপস্থিতির সুযোগে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী শেরে বাংলার সহিত আঁতাত করেন ও শেরে বাংলার পরামর্শে ৩রা জুন পূর্ববঙ্গে আরোপিত ৯২-ক ধারা প্রত্যাহার করেন এবং ৬ই জুন (১৯৫৫) যুক্তফ্রন্ট সদস্য ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে গঠিত পূর্ববঙ্গ মন্ত্রীসভার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। অবশ্য পূর্ববঙ্গে গভর্ণরী শাসন প্রত্যাহার করিয়া জনপ্রতিনিধিদের সরকার গঠনের দাবীতে আওয়ামী লীগের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সর্বত্র জনসভা অনুষ্ঠান করিতেছিল। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সরকার গঠনের অপ্রতিরোধ্য গণদাবীও ছিল ৯২-ক ধারা প্রত্যাহারের অন্যতম কারণ।

১৭ই জুন অপরাহ্নে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ও মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় ২১ দফা মোতাবেক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্বলিত সংবিধান রচনার দাবী জানানো হয়। জনাব আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির ২৩শে জনের সভায় পূর্ববঙ্গের জন্য 'আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন' আদায় করিতে ব্যর্থ হইলে আওয়ামী লীগ দলীয় গণপরিষদ সদস্যবর্গকে পদত্যাগ করিতে বলা হয়। যদিও ১৯৫৬ সালের সংবিধানে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন গৃহীত হয় নাই; তথাপি ১৯৫৬ সালেই আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে ও পূর্ব পাকিস্তানে সরকার গঠন করে এবং ১৯৫৭ সালের ১৪ই জুন ঢাকার পল্টনে অনুষ্ঠিত জনসভায় আওয়ামী লীগ নেতা কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, ১৯৫৬ সালের সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানকে ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইয়াছে। জনাব সোহরাওয়ার্দীর গোঁড়া সমর্থক পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর খান ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান লজ্জার মাথা খাইয়া সোহরাওয়ার্দীর এই উক্তিকে সহাস্যবদনে গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তাঁহারাই আবার স্বায়ত্তশাসনের সব চাইতে বড় দাবীদার বনিয়াছিলেন। যাহা হউক, ৭ই জুলাই (১৯৫৫) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি ও স্বাস্থ্যশৈল নিবাস মারীতে দ্বিতীয় গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মুশতাক আহমদ গুরমানী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। স্বল্পকালীন অধিবেশনের পর গণপরিষদ অধিবেশন মূলতবী ঘোষণা করা হয়। গণপরিষদের পরবর্তী অধিবেশন ৮ই আগস্ট (১৯৫৫) হইতে সংবিধান রচনা পর্যন্ত করাচীতে অনুষ্ঠিত হয়। ১২ই আগস্ট বরিশালের জনাব আবদুল ওয়াহাব পাকিস্তান গণপরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন।

অসুস্থতার কারণে ৫ই আগস্ট (১৯৫৫) গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ছুটি গ্রহণ করিলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইস্কান্দার মীর্জাই স্থায়ী গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন এবং গোলাম মোহাম্মদের মৃত্যুর পর ইস্কান্দার মীর্জা ভারপ্রাপ্ত গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন।

১০ই আগস্ট কেন্দ্রে মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ-যুক্তফ্রন্ট কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হক যদিও এককালে প্রাসাদ রাজনীতির নায়কদের দ্বারা রাষ্ট্রদ্রোহী অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন, তবু ষড়যন্ত্রকারী ক্ষমতাসীনদের প্রয়োজনের তাগিদে তাহাদের দ্বারা তিনিই আবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হইয়া পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করিলেন। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে কি না হয়? সেনাধ্যক্ষ জেনারেল আইউব খান পুনরায় ব্যারাকে প্রত্যাবর্তন করিলেন। জনাব সোহরাওয়ার্দী বিরোধী দলীয় নেতা হিসাবে সরকারী মর্যাদা পাইলেন। ইহাই ছিল পাকিস্তানের রাজনীতিতে আইন পরিষদে বিরোধী দলের প্রথম সরকারী মর্যাদা। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রদুতের পদে নিযুক্ত হইলেন।

মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রীত্বকালে কতিপয় দাবীর ভিত্তিতে পুলিশ ধর্মঘট হয়। পুলিশ ধর্মঘটের সহিত জড়িত থাকার সন্দেহে কতিপয় রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে কারারুদ্ধ করা হয়। বিনাবিচারে আটক নেতাদের মুক্তির দাবীতে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আগত পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক ওসমানী, সিন্ধু আওয়ামী মোহাজের নেতা জি, এম, সৈয়দ, লায়ালপুর আওয়ামী লীগ নেতা জামালউদ্দিন কাটাও, ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগ সম্পাদক গাজী গোলাম মোস্তফা, ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি আবদুর রশীদ সরকার ও আমি ১২ই ডিসেম্বর (১৯৫৫) রোজ সোমবার মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারের সহিত সাক্ষাৎ করি। কথোপকথনে প্রতীয়মান হইতেছিল যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নয়, আমলারাই স্বরাষ্ট্র বিভাগ পরিচালনা করেন। জনপ্রতিনিধিদের শক্তি জনতা। জনতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেই আমলাদের হাতের পুতুল হইতে হয়। ক্ষমতালাভ এইভাবে জনপ্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও আইন পরিষদ সদস্যগণকে আমলাদের দয়ার পাত্রে পরিণত করে।

আওয়ামী মুসলিম লীগের অসাম্প্রদায়িকীকরণ

১৯৫৫ সালের ২১, ২২ ও ২৩শে অক্টোবর ঢাকার সদরঘাটে অবস্থিত 'রূপমহল' সিনেমা হলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের তিন দিবসব্যাপী দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনের সুদূর প্রসারী গুরুত্বপূর্ণ অবদান হইল, সংগঠনের দ্বার জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্যই উন্মুক্ত করা। পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রধান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী অসাম্প্রদায়িকীকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। পক্ষান্তরে সংগঠনের সাম্প্রদায়িক চরিত্র পরিবর্তনের প্রবক্তা ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান জনাব সোহরাওয়ার্দীর অন্ধ সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও মওলানা ভাসানী ও রাজনীতি সচেতন

কর্মী সমাজের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচারণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। সংগঠনের কাউন্সিল অধিবেশনের পূর্বে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় শেখ সাহেবের অবস্থা ছিল শ্যাম রাখি না কুল রাখি। যাহা হউক, ২২শে অক্টোবর রাত্রি প্রায় ৪টার দিকে জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁহার আপত্তি প্রত্যাহার করিলে প্রতিষ্ঠানকে অসাম্প্রদায়িক করিবার স্থির হয়। উক্ত সুদূরপ্রসারী ও গভীর সম্ভাবনাময় সিদ্ধান্তের ফলে অনাগত ভবিষ্যতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক শুভ মৌলিক গণতান্ত্রিক সৌভ্রাতৃমূলক পরিবেশ সৃষ্টির গোড়াপত্তন ঘটে।

ইহা অনস্বীকার্য যে, কোন রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান প্রয়াসে ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী মতান্তর ও মনান্তর নিরসনে শেখ মুজিবুর রহমানই ছিলেন একমাত্র সেতুবন্ধন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনতন্ত্রে সন্নিবেশিত অন্যতম ধারা ছিল, "এই প্রতিষ্ঠান ইহার গঠনতন্ত্র ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের পূর্ব পাকিস্তান আঞ্চলিক শাখা হিসাবে গণ্য হইবে।" তাই কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ প্রধান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বারেবারেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ সুস্পষ্ট বক্তব্যকে হজম করিতে হইয়াছে। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর যৌথ নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বই ছিল সংগঠনের গণভিত্তি ও সাংগঠনিক শক্তির মূল কারণ। কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যকে উপেক্ষা করিয়াই সাধারণ কর্মীবাহিনী ও নেতৃবর্গ তাঁহাদের যৌথ নেতৃত্বের আকাঙ্খী ছিলেন।

১৯৫৩ সালে ঢাকা 'মুকুল' সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কাউন্সিল সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ নির্বাচিত হইয়াছিলেনঃ

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী	সভাপতি
আতাউর রহমান খান	সহ-সভাপতি
আবুল মনসুর আহমদ	" "
আবদুস সালাম খান	" "
খয়রাত হোসেন	" "
শেখ মুজিবুর রহমান	সাধারণ সম্পাদক
কোরবান আলী	সাংগঠনিক সম্পাদক
আবদুর রহমান	প্রচার সম্পাদক
মোহাম্মদ উল্লাহ	অফিস সম্পাদক
ইয়ার মোহাম্মদ খান	কোষাধ্যক্ষ

১৯৫৪ সালের ১লা এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সংগঠন হইতে বহিষ্কৃত জনাব আবদুর রহমানের স্থলে আমি প্রচার সম্পাদক নির্বাচিত হই।

১৯৫৩ সালে সভাপতি মওলানা ভাসানী কর্তৃক মনোনীত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দ ছিলেনঃ

১। মুজিবর রহমান, রাজশাহী, ২। শামসুল হক, রাজশাহী, ৩। মশিউর রহমান, যশোহর, ৪। আবদুল খালেক, যশোহর, ৫। ডাঃ মজহার উদ্দিন আহমদ, রংপুর, ৬। রহিমুদ্দিন আহমদ, দিনাজপুর, ৭। মজিবর রহমান, বগুড়া, ৮। ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, পাবনা, ৯। সৈয়দ আকবর আলী, পাবনা, ১০। জহুর আহমদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম, ১১। আবদুল আজিজ, চট্টগ্রাম, ১২। আবদুর রহমান খান, কুমিল্লা, ১৩। আবদুল বারী, কুমিল্লা, ১৪। জসিমউদ্দিন আহমদ, সিলেট, ১৫। সিরাজুদ্দিন আহমদ, নোয়াখালী, ১৬। এ,ডব্লিউ লকিউতুল্লাহ, বরিশাল, ১৭। আবদুল মালেক, বরিশাল, ১৮। আবদুল হামিদ, ময়মনসিংহ, ১৯। আছমত আলী খান, ফরিদপুর, ২০। খোদাবক্স, টাঙ্গাইল, ২১। আকবর হোসেন আখন্দ, বগুড়া ২২। আবদুল হাই, যশোহর, ২৩। শেখ আবদুল আজিজ, খুলনা।

১৯৫৫ সালের ২১, ২২ ও ২৩শে অক্টোবর দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণ নির্বাচিত হনঃ

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী	সভাপতি
আতাউর রহমান খান	সহ-সভাপতি
আবুল মনসুর আহমদ	" "
খয়রাত হোসেন	" "
শেখ মুজিবুর রহমান	সাধারণ সম্পাদক
অলি আহাদ	সাংগঠনিক সম্পাদক
অধ্যাপক আবদুল হাই	প্রচার সম্পাদক
আবদুস সামাদ	শ্রম সম্পাদক
তাজউদ্দিন আহমদ	সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক
মিসেস সেলিনা বানু	মহিলা সম্পাদিকা
মোহাম্মদ উল্লাহ	অফিস সম্পাদক
ইয়ার মোহাম্মদ খান	কোষাধ্যক্ষ

সভাপতি মওলানা ভাসানী নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরূপে মনোনয়ন দান করেনঃ

১। জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম ২। জনাব আবদুল আজিজ, চট্টগ্রাম ৩। অধ্যাপক আহসাব উদ্দিন আহমদ, চট্টগ্রাম ৪। জনাব আবদুল জব্বার খদ্দর, নোয়াখালী ৫। জনাব আবদুল বারী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৬। রফিকউদ্দিন ভুঁইয়া, ময়মনসিংহ ৭। হাতেম আলী খান, টাঙ্গাইল ৮। আবদুল হামিদ চৌধুরী, ফরিদপুর ৯। সৈয়দ আকবর আলী, সিরাজগঞ্জ ১০। শেখ আবদুল আজিজ, খুলনা ১১। মোমিনউদ্দিন আহমদ খুলনা ১২। মশিউর রহমান, যশোর ১৩। সাদ আহমদ, কুষ্টিয়া ১৪। তহুর আহমদ, চৌধুরী, রাজশাহী ১৫। কাজী গোলাম মাহবুব, বরিশাল ১৬। ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, পাবনা ১৭। আমজাদ হোসেন, পাবনা ১৮। ডাঃ মজহার উদ্দিন আহমদ, রংপুর ১৯। মাওলানা আলতাফ হোসেন, ময়মনসিংহ

২০। রহিমউদ্দিন আহমদ, দিনাজপুর ২১। আমিনুল হক চৌধুরী, বরিশাল ২২। আকবর হোসেন আখন্দ, বগুড়া ২৩। দবিরউদ্দিন আহমদ, নীলফামারী ২৪। পীর হাবিবুর রহমান, সিলেট ২৫। কামরুদ্দিন আহমদ, ঢাকা।

সর্বদলীয় কর্মপরিষদ গঠন

পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধান প্রণয়নকল্পে প্রচারিত খসড়া পূর্ববঙ্গের জনমতকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত হইয়া উঠে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান গণতন্ত্রীদল, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রী সংসদ সমবায়ে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় প্রতিনিধি সভায় মওলানা ভাসানী ও আমাকে যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী নির্বাচিত করিয়া সর্বদলীয় কর্মপরিষদ গঠন করা হয় এবং ২৯শে জানুয়ারী (১৯৫৬) সমগ্র দেশব্যাপী 'প্রতিরোধ দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ধর্মঘট, মিছিল ও জনসভার মাধ্যমে দেশবাসী ২৯শে জানুয়ারী প্রতিরোধ দিবসে অভূতপূর্ব সাড়া দেয়। কর্মপরিষদের ৩রা ফেব্রুয়ারী বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারকে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ আহবান করিয়া সংবিধান প্রশ্নে সুস্পষ্ট মতামত জ্ঞাপন করিতে আহবান জানানো হয় এবং মিসেস আমেনা বেগম, প্রাণেশ সমাদ্দার, মোহাম্মদ সুলতান, আবদুল আওয়াল, আবদুস সাত্তার ও আমি কর্মপরিষদের পক্ষ হইতে মুখ্যমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ আহবানের অনুরোধ জ্ঞাপন করি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার আইন পরিষদ বৈঠক ডাকিতে অস্বীকৃতি জানান। তাঁহার এই অস্বীকৃতির প্রতিবাদে সর্বদলীয় কর্মপরিষদ ১২ই ফেব্রুয়ারী সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে 'পরিষদ আহবান দিবস'পালন করে। এতদুপলক্ষে ঢাকার পল্টন ময়দানে আমার সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বলিতে ভুলিয়াছি, ইতিপূর্বেই ৮ হইতে ১৪ই ফেব্রুয়ারী প্রস্তাবিত সংবিধানের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশে প্রতিরোধ সপ্তাহ ঘোষিত হইয়াছিল।

ক্লার্ক রিপোর্ট

প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর অংশীদার হিসাবে শেরে বাংলার নেতৃত্বে আস্থাশীল যুক্তফ্রন্ট সংবিধান রচনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। ২১ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সহায়তা দানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মুজাফফর আহমদ চৌধুরী ও অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাককে পাকিস্তান গণপরিষদের উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাকালে জনৈক বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রণীত রিপোর্ট তাঁহাদের নজরে পড়ে। অর্থনীতিবিদ কলিন ক্লার্ক ১৯৫২ সালে তাঁহার রিপোর্টে বিস্তীর্ণ ভূমি এলাকা পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষির উপর এবং ঘনবসতিপূর্ণ স্বল্পভূমির এলাকা পূর্ব পাকিস্তানে কলকারখানা স্থাপনের উপর জোর দিবার সুপারিশ করেন।

নিম্নে প্রাসঙ্গিক অংশটি উদ্ধৃত হইলঃ

"For some years at least West Pakistan will get richer as East Pakistan

gets poorer until it becomes possible to make a Further construction of industry in East Pakistan or else for some of the population to migrate elsewhere."

অর্থাৎ "যতদিন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িত না হইবে কিংবা এর অধিবাসীদের এক অংশের অন্য কোথাও চলিয়া যাওয়া সম্ভব না হয়, ততদিন পর্যন্ত কয়েক বৎসর পশ্চিম পাকিস্তান সম্পদশালী হইতে থাকিবে।" কলিন ক্লার্কের উপরোক্ত মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাই ১৯৫৫ সালে আমি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের যৌক্তিকতা দেশবাসীর সামনে তুলিয়া ধরিবার উদ্দেশ্যে 'পূর্ববঙ্গ শ্মাশান কেন?" পুস্তিকাটি রচনা করি। উল্লেখ্য যে, পুস্তিকাটি বহুলভাবে প্রচারিত হইয়াছিল।

অর্থনীতিবিদ কলিন ক্লার্কের সুপারিশ মোতাবেক পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা দূরে থাকুক, এমনকি ১৯৫৭ সালে মার্কিন সাহায্য আই,সি, এ, (International co-operation Administration) ১ কোটি ডলার পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প সম্প্রারণ ও আধুনিকরণের মানসে সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক বরাদ্দকরণ, পূর্ব পাকিস্তান দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় ২৮লক্ষ টন খাদ্য ক্রয়ে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থাকরণ, বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চলের মধ্যে সমবন্টন নীতি গ্রহণ এবং পূর্ব পাকিস্তান ও অন্যান্য অনুন্নত প্রদেশে নূতন আমদানীকারক নীতি নির্ধারণের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও বণিক শ্রেণী অত্যন্ত বেসামাল হইয়া উঠে। তাই তাহারা প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার অপচেষ্টায় সর্বপ্রকার চক্রান্ত প্রচারণায় লিপ্ত হইল। ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সভাপতি বার্ষিক ভোজসভায় প্রধান অতিথী রাষ্ট্র প্রধান ইস্কান্দার মীর্জাকে অভিনন্দনপত্রে সোহরাওয়ার্দী সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগারকালে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেনঃ

"Parity in political sphere may be a workable compromise but its application to economic planing without considering other important economic facts may lead us into blind alleys from where there may be no way out."

অর্থাৎ "রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্য কাজ চালানো গোছের অনেক মীমাংসা দিতে পারে, কিন্তু অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক যথার্থতা বিবেচনা না করিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় সমবন্টন বা সংখ্যাসাম্য প্রয়োগ আমাদিগকে এমন এক কানাগলিতে নিয়া যাইবে, যেখান হইতে নিষ্ক্রমনের কোন পথই থাকিবে না।" ইহার ফলশ্রুতিতে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী মাত্র তের মাস সরকার পরিচালনার পর ১৬ই অক্টোবর (১৯৫৭) পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অর্থনীতিবিদ কলিন ক্লার্কের সুপারিশানুযায়ী সর্বাত্মক শিল্পায়নে বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ করা দূরে থাকুক, কেবলমাত্র সমান সমান বৈদেশিক মুদ্রার বরাদ্দনীতি পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থ ও করাচীর অবাঙ্গালী শাসকরা সহ্য করিতে পারেন নাই।

দাবী দিবস

এমনিতর মানসিক পটভূমিকায় পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচিত হইতেছিল। শাসনতন্ত্রে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও যুক্ত নির্বাচন সন্নিবেশিত করিবার দাবীতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান করাচী হইতে তারযোগে আমাকে ১৬ই মার্চ 'দাবী দিবস' ঘোষণা করিবার নির্দেশ দেন। তাঁহার করাচী অবস্থানকালে আমি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিতাম। ১৬ই মার্চ 'দাবী দিবস' উপলক্ষে পল্টন ময়দানে জনসভা আহবান করি। মোহাজের নেতা মাওলানা রাগিব হাসানও ১৬ই মার্চ (১৯৫৬) অপরাহ্নে পল্টন ময়দানে জনসভা আহবান করেন। অনিবার্য সংঘর্ষ এড়াইবার উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ও আমি মাওলানা রাগিব হাসানের সহিত তাঁহার বাসস্থানে দেখা করি। আমরা আলোচনায় ঐকমত্যে পৌছি যে, অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা পর্যন্ত মাওলানা রাগিব হাসান সভা পরিচালনা করিবেন এবং উহার পর আমরা সভার কাজ আরম্ভ করিব। অতীব পরিতাপের বিষয়, অপরাহ্ন ৪-৩০ মিনিট উত্তীর্ণ হইলেও এবং পুনঃপুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও সভার সভাপতি মাওলানা রাগিব হাসান কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণার কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত ইতেছিল না। আমাদের অনুরোধে কর্ণপাত না করায় আওয়ামী লীগ কর্মী ও জনগণের ধৈর্যচ্যুতি দেখা দিল। সভামঞ্চে দাঁড়াইয়া আমাদের একনিষ্ঠ তরুণ কমী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম "মাইক্রোফোন টেস্টিং" বলা মাত্র মোহাজের সমাবেশের একাংশ ক্ষিপ্ত হইয়া আমাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে ও সভামঞ্চ তছনছ করিয়া ফেলে। লঙ্কাকান্ড ঘটিয়া যাইবার কিছুক্ষণের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াই হতভম্ব হইয়া পড়িলেন বটে, তবে, ক্ষণিকের মধ্যেই স্বীয় কর্তব্য স্থির করিয়া নিজ হাতে একটি লাঠি ও আমার হাতে একটি লাঠি দিয়া রণক্ষেত্রের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে রওয়ানা হইলেন। আমাদের সহকর্মীরা তখনও এদিক-ওদিক অর্থাৎ নিরাপদ দূরত্ব হইতে উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছিলেন। সভাস্থলে আমাদের পদার্পণ মাত্র জনতা চতুর্দিক হইতে সভামঞ্চের দিকে ধাবিত হইল এবং নিমিষের মধ্যে নিজেদের উদ্যোগে সভামঞ্চ পুনরায় নির্মাণ করিয়া ফেলিল। মাওলানা রাগিব হাসান আমাদের উভয়েরই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। কারণ, তিনি ছিলেন ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডে হাশিম-সোহরাওয়ার্দী গ্রুপভুক্ত অন্যতম নির্বাচিত সদস্য। স্বাধীনতার পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানে হিজরত করেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে মুল রাজনীতির ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন এবং করাচীস্থ অবাঙ্গালী শাসকদের ক্রীড়নকে পরিণত হন। ঐদিন অপরাহ্নে জনতার ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রচণ্ডতা ও কার্যকারিতা আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সম্যক উপলব্ধি করি। পরিতাপের বিষয়, কায়েমী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট চক্র সর্বহারা মোহাজের শ্রেণীকে পূর্ব বাংলার গণদাবীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করিয়া স্থানীয় বাংলা ভাষাভাষী ও উর্দু ভাষাভাষীদের মধ্যে বিদ্যমান স্বাভাবিক হৃদতাপূর্ণ বন্ধন ছিন্ন করিবার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। সত্য বলিতে কি, ইহাদের চক্রান্তেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততার বীজ বপিত হয়। কালের অমোঘ গতিতে উর্দু ভাষাভাষী প্রভুত্বকামী সামরিক বেসামরিক প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের সর্বনাশা আত্মঘাতী প্রচেষ্টাই বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী তিক্ততার বীজ হইতে উত্থিত

কচি চারাকে সযত্নে মহীরূহে পরিণত করে। ভারত হইতে আগত উর্দু ভাষী মোহাজের সম্প্রদায় স্থানীয় বঙ্গ ভাষাভাষী সমাজে অঙ্গীভূত, একাত্ম ও একাকার হইয়া বাংলার মাটিকে মহামানবের মিলন ক্ষেত্রে পরিণত করিতে ব্যর্থ হয়। তাঁহাদের দৃষ্টিতে সুদূর করাচী, লাহোর, পিন্ডির উর্দু ভাষীরাই প্রতিবেশী বঙ্গ ভাষাভাষীদের চাইতে বহুগুণে ও সর্বদিক হইতে পরমাত্মীয়জন। তাঁহাদের মানসিক জগতে প্রতিবেশী বাঙ্গালীরা বহুযোজন দূরবর্তী, অনাত্মীয়, বিদেশী। পরাধীন ভারতে বসবাসকারী Anglo Indian সন্তানগণ কি আমলা কি ব্যবসায়ী সবাই যেমন প্রতিবেশী ভারতবাসী হইতে সুদূর ইংল্যান্ডে বসবাসকারী ইংরেজদিগকে নিজেদের সুখ-দুঃখের সমভাগী মনে করিত, তেমনি পূর্ববঙ্গে বসবাসকারী উর্দু ভাষী মোহাজেরগণও পশ্চিম পাকিস্তানীদেরকে তদ্রুপ জ্ঞান করিত। গণবিরোধী শাসক-শোষক শ্রেণীর প্ররোচনায় উর্দু ভাষী মোহাজেরদের মধ্যে প্রভুসুলভ ও অনাত্মীয় এই মানসিকতা ক্রমশঃ মারাত্মক ব্যাধির ন্যায় প্রসার লাভ করে। উত্তরকালে ইহার অশুভ পরিণতি যে সর্বনাশা অভিশপ্ত পরিস্থিতির জন্ম দিয়াছিল, তাহারই হুতাশনযজ্ঞে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ প্রাণকে আত্মাহুতি দিতে হইয়াছিল, লক্ষ পরিবারকে ভিক্ষার ঝুলি হস্তে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছিল, লক্ষ লক্ষ নারীকে হারাইতে হইয়াছিল অমূল্য রত্ন সতীত্ব।

সংবিধান রচনা

পূর্ববংগের প্রতিবাদের ঝড়কে উপেক্ষা করিয়া ভোটাধিক্যের জোরে গণ পরিষদের সংবিধান গৃহীত হয়। প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে পাকিস্তান মুসলিম লীগ, শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হকের নেতৃত্বে পরিচালিত যুক্তফ্রন্টভুক্ত কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (আবদুস সালাম খান পরিচালিত), সিডিউল কাষ্ট ফেডারেশন, পাকিস্তান কংগ্রেস, ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ পার্টি ও গণতন্ত্রী দলভুক্ত সদস্যবৃন্দের সমবেত ভোটে সংবিধান গৃহীত হয়। কিন্তু জনাব সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পরিচালিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সদস্যবৃন্দ প্রতিবাদে গণপরিষদ হল হইতে "ওয়াক আউট" ও চূড়ান্তভাবে গৃহীত শাসনতন্ত্রে স্বাক্ষরদানে বিরত থাকে। পরবর্তীকালে জনাব সোহরাওয়ার্দী সংবিধানে স্বাক্ষর দান করেন বটে, তবে আওয়ামী লীগ সদস্যবৃন্দ তাঁহার অনুসৃত পথ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রশ্নে নেতা ও অনুসারীদের কার্যে এহেন প্রকাশ্য গরমিল দায়িত্বশীল ও সুশৃংখল দল গঠনের স্পষ্ট অন্তরায়। এই ধরনের অবস্থা রাজনীতির অসুস্থতারই স্বাক্ষর বহন করে।

প্রজাতন্ত্র দিবস

সংবিধান রচিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর সরকার ২৩শে মার্চকে প্রজাতন্ত্র দিবস ঘোষণা করেন এবং এই ২৩শে মার্চ হইতে শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৭ই মার্চ (১৯৫৬) ৫৬, সিম্পসন রোডে সর্বদলীয় গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র কর্মপরিষদের সভায় প্রজাতন্ত্র দিবসে সরকার কর্তৃক আয়োজিত আনন্দোৎসবে যোগদান না করিবার আহবান জানানো হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ উপরোক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক

প্রজাতন্ত্র দিবসের আনন্দোৎসবে অংশগ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানায়। আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্তে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বিচলিত হইয়া মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান ও আমাকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য এক জরুরী তারবার্তা পাঠান। জনাব সোহরাওয়ার্দী ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিবিদ ও সুদক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান। দেশের সংবিধানের কতিপয় ধারার সহিত দ্বিমত থাকিতে পারে, কিন্তু সংবিধান সংশোধনের বিধানও শাসনতন্ত্রের আছে। সুতরাং সংবিধান প্রবর্তনে বাধা সৃষ্টির অর্থ ব্যক্তি বিশেষের খেয়ালখুশীকে শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা দানের শামিল। তাই বিজ্ঞ সোহরাওয়ার্দীর ভবিষ্যৎ পরিণতি তাঁহার দিব্যচক্ষে অবলোকন করিয়াই নিম্নোক্ত জরুরী তারবার্তা প্রেরণ করেনঃ

Oli Ahad

12/1, K.M. Das Lane, Dhaka

"I am deeply grieved and astounded at resolution not to participate on Republic Day which is Pakistan Day (stop) Resentment against constitution should not be carried to extent of dissociation from Pakistan Day. These two matters quite independent. (Stop) Pakistan Republic Day will be observed throughout world, special delegations from over forty countries arriving here to participate (stop) East Pakistan dissociation will damage Pakistan cause your resolution will seriously damage cause of party. Don't damage permanent cause for temporary advance (stop). Power is not Pakistan it is temporary agent (Stop) Repulbic Day is state and National function and not party function, your dissociation is creating grave misunderstanding and being construed as opposition to Republic inspite of words to the contrary as action more important than words, constitution can be ammended (stop) Republic Day is National Day and will be observed every year. Unilateral decision on such important matter most unfortunate. I appeal to you as true patriots to observe Republic Day as Birthday of Republic of Pakistan. (Stop) Earnestly request you to reconsider and issue directives to participate in celebrations where you can stress your resentment against constitution (Stop) Everything at Stake on this issue.

Republic Day celebrations are state functions and not party functions. This a good ground for reversing decision."

Karachi Sadar Night Post 17.3.56 Oli Ahad,

Awami League, Simpson Rd.

"Suhrawardy"

অলি আহাদ
১২/১, কে,এম, দাস লেন, ঢাকা।

"প্রজাতন্ত্র দিবস যাহা নাকি পাকিস্তান দিবস তাহাতে অংশ গ্রহণ না করার প্রস্তাবে আমি মর্মাহত ও বিস্মিত। সংবিধানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকে পাকিস্তান দিবসে অংশ গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকার পর্যায়ে পর্যন্ত টানিয়া নেওয়া সমীচীন নয়। এই দুইটি ব্যাপার সম্পূর্ণ আলাদা। পাকিস্তান দিবস সারা বিশ্বেই পালিত হইবে। চল্লিশটিরও অধিক সংখ্যক দেশ হইতে এই দিবসে অংশ গ্রহণের জন্য প্রতিনিধিবর্গ এখানে আসিতেছেন। এই অনুষ্ঠান হইতে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা পাকিস্তানের আদর্শকে বিপর্যস্ত করিবে। তোমাদের প্রস্তাব পার্টির লক্ষ্যকেও বিপর্যস্ত করিবে। সাময়িক সুবিধার জন্য স্থায়ী আদর্শকে বিনষ্ট করিও না। ক্ষমতাই পাকিস্তান নয়, ইহা সাময়িক ব্যাপার। প্রজাতন্ত্র দিবস হইতেছে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় অনুষ্ঠান-পার্টির অনুষ্ঠান নয়। এই অনুষ্ঠান হইতে তোমাদের বিরত থাকাটা মারাত্মক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করিতেছে এবং ইহাকে প্রজাতন্ত্রের বিরোধিতা হিসাবে চিহ্নিত করা হইতেছে যদিও প্রকৃতক্ষেত্রে কথার চাইতে কাজই বড়। সংবিধানের সংশোধন করা যাইতে পারে। প্রজাতন্ত্র দিবস একটি জাতীয় দিবস যা প্রতি বৎসরই উদযাপিত হইবে। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ দুঃখজনক। প্রজাতন্ত্র দিবসকে এই প্রজাতন্ত্রের জন্মদিবস হিসাবে পালন করার জন্য সত্যিকার দেশপ্রেমিক হিসাবে তোমাদের প্রতি আমার আবেদন রইল। বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য এবং এই দিবস উদযাপনে নির্দেশ জারি করার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানাই- উদযাপনকালে সংবিধানের বিরুদ্ধে তোমাদের বিক্ষোভ জোরের সাথে প্রকাশ করিতে পার। এই বিষয়ে সবকিছুই এখন ঝুঁকির মুখে।

প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন হইতেছে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান-দলীয় অনুষ্ঠান নয়। সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য ইহা এক উত্তম যুক্তি হইতে পারে।"

করাচী সদর নাইট পোস্ট ১৭-৩-৫৬, অলি আহাদ,
আওয়ামী লীগ, সিম্পসন রোড।

"সোহরাওয়ার্দী"

অম্লান বদনে স্বীকার করিতে হইবে, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মাত্র ৬ মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণীত ও গৃহীত হইয়াছিল এবং ১০ বৎসরে দেশ সর্বপ্রথম সংবিধান পাইয়াছিল। সংবিধান মোতাবেক গণপরিষদ অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় পরিষদে রূপান্তরিত হয়। শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক এক বিবৃতিতে গভর্ণর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জাকে "খাঁটি বাঙালী" সার্টিফিকেট দিয়া পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত করেন ও বিনিময়ে তিনি উর্দু ভাষী রাষ্ট্রপ্রধান ইস্কান্দার মীর্জা কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত হন। অথচ ইহা কাহার অজানা যে, শেরে বাংলার মত বিশাল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের জন্য গভর্ণর পদ ছিল তুচ্ছ।

পূর্ব পাকিস্তানের খাদ্য সংকট

পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্যাভাবজনিত দুর্ভিক্ষ রোধকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ৫০ কোটি টাকা আদায়ের দাবীতে মওলানা ভাসানী ৭ই মে (১৯৫৬) হইতে অনশন ধর্মঘট

আরম্ভ করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বসন্ত কুমার দাস ৭ই মে (১৯৫৬) নিম্নোক্ত লিপিতে মওলানা ভাসানীকে অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহারের অনুরোধ জানানঃ

বসন্ত কুমার দাস এম,এল,এ, এম,পি
এডভোকেট, সুপ্রীমকোর্ট অব পাকিস্তান,
ঢাকা হাইকোর্ট

ঢাকা-৭/৫/৫৬ ইং।

আদাব পর নিবেদন এই,

মৌলানা সাহেব, আপনি অনশনব্রত গ্রহণ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া খুবই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছি। আপনি যে মহান উদ্দেশ্য নিয়া এই কঠিন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তৎপ্রতি আমার সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও আমি মনে করি যে, জাতির এই সংকট মুহূর্তে আপনার এই মূল্যবান জীবনকে এইভাবে বিপন্ন করিয়া জাতির ভবিষ্যতকেই বিপন্ন করিতেছেন। সেই জন্য আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি এই অনশন হইতে বিরত হউন। আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, আমাকে আগামীকাল সকালেই অন্যত্র যাইতে হইতেছে। নতুবা আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাকে এই ঐকান্তিক অনুরোধ জ্ঞাপন করিতাম।

ইতিঃ
নিবেদক
মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। বসন্ত কুমার দাস।

পূর্ব পাকিস্তানের খাদ্য সংকট ক্রমশঃই দুর্ভিক্ষের রূপ ধারণ করিতে থাকে। চতুর্দিকে ভুখা মিছিল। এমনি অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ১৯ ও ২০শে মে (১৯৫৬) ঢাকার মুকুল সিনেমা হলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমবায়ে ঐক্যবদ্ধ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত করিবার প্রস্তাবের প্রশ্নে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত আমার প্রত্যক্ষ মতভেদ দেখা দেয় এবং শেখ সাহেবের তীব্র বিরোধিতার কারণে সর্বদলীয় খাদ্য আন্দোলন প্রস্তাবটি কাউন্সিল কর্তৃক বাতিল হইয়া যায়। অবশ্য পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা ও বাগদাদ চুক্তি সংস্থা হইতে সদস্যপদ প্রত্যাহারের দাবীতে পেশকৃত আমার প্রস্তাব কাউন্সিল গ্রহণ করে। নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং আমাকে তলব করিয়া আমার নিকট হইতে কৈফিয়ৎ চান। আমি তাঁহার নিকট সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তজাত সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের ১৯৫৩ সালের ময়মনসিংহ কাউন্সিল অধিবেশন হইতে পূর্বাপর ধারাবাহিক বিরোধী ভূমিকা উল্লেখ করিয়া নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। সোহরাওয়ার্দী সাহেব বিদগ্ধ ব্যক্তি, আমার গুরুজন। সুতরাং তাঁহার কটু মন্তব্য হজম করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

সাংবিধানিক বিধান মোতাবেক মার্চ-এপ্রিল-এর স্থলে আর্থিক বৎসর জুন-জুলাই হইতে প্রবর্তিত হয়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে গভর্ণরের সার্টিফিকেটক্রমে মুখ্যমন্ত্রী আবু

হোসেন সরকারই বাজেট বরাদ্দ পাস করাইয়া আর্থিক দায়-দায়িত্ব সমাধা করিতেছিলেন। অবশেষে রাষ্ট্রপ্রধান ইস্কান্দার মীর্জা ও প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী গভর্ণর শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হককে ৩০শে আগস্টের মধ্যে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন আহবানের নির্দেশ দান করেন। বিরোধীদলের অনাস্থা প্রস্তাব ভয়ে ভীত ও শংকিত মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার ৩০শে আগস্ট (১৯৫৬) গভর্ণর সমীপে তাঁহার ও তাঁহার মন্ত্রিসভার পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। ইতিপূর্বে আওয়ামী লীগের প্রচেষ্টায় প্রতিরোজই ভুখা মিছিল চলিতেছিল। জনতা দিন দিন হইয়া উঠিতেছিল মারমুখি। বিস্ফোরণোন্মুখ এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ৪ঠা আগস্ট জিনজিরা এলাকা হইতে আগত এক বিরাট ভুখা মিছিল নদী অতিক্রম করিয়া ঢাকার চকবাজারে প্রবেশ করিলে, পুলিশ ভুখা জনতার উপর গুলী চালনা করে এবং পুলিশের গুলীতে অকুস্থলেই তিনজন নিহত হয়। বাজেট পেশ করিবার জন্য আহূত ১৩ই আগস্টের পরিষদের অধিবেশন গভর্ণর শেরে বাংলা অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে বন্ধ ঘোষণা করেন। শেরে বাংলা তদীয় দল কৃষক শ্রমিক পার্টি নেতা আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রীসভাকে বিরোধী দল আওয়ামী লীগের অনাস্থা প্রস্তাবের মুখে অবধারিত পরাজয় হইতে রক্ষা করিবার জন্যই যে এই অন্যায় পদক্ষেপটি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা না বলিলেও চলে। ইহার দরুনই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৭ই আগস্ট ঢাকা অবস্থানকালে শাসক মহলের উদ্দেশে এই মর্মে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন যে, "History records that it is an axiom that unconstitutional conduct on the part of the rulers breeds unconstitutional reaction on the part of the people, If for the rulers there is dictatorship, for the people there is civil disobediencc." অর্থাৎ "ইতিহাসের সাক্ষ্য, ইহা একটি স্বতঃপ্রতীয়মান সত্য যে, শাসক মহলের অনিয়মতান্ত্রিক আচরণই জনতা কর্তৃক অনিয়মতান্ত্রিক পথে প্রতিহিংসা গ্রহণের কারণ। শাসক মহলের মন্ত্র একনায়কত্ববাদ হইলে, তদুত্তরে জনতার মন্ত্র হইবে আইন অমান্য।" সোহরাওয়ার্দীর উচ্চারিত সতর্কবাণীর অব্যবহিত পর পরই ২২শে আগস্ট রাষ্ট্রপ্রধান কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রীকে ৩০শে আগস্টের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন ডাকার নির্দেশ দেন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর গভর্ণর শেরে বাংলার সরকার ভুখা মিছিলের উপর গুলীবর্ষণ করে এবং পুলিশের গুলীতে চারজনকে প্রাণ দিতে হয়। বিচলিত গভর্ণর শেরে বাংলা বাধ্য হইয়া প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দল আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খানকে সরকার গঠনে আহবান করেন। নিহতদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের জনা ও গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে মওল্যানা ভাসানীর নেতৃত্বে ৫ই সেপ্টেম্বর এক বিরাট জঙ্গী মিছিল সমগ্র ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী বৈঠকে গভর্ণর কর্তৃক সরকার গঠনের আমন্ত্রণ আলোচিত হয়। সংগঠনের সভাপতি মাওলানা ভাসানীকে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণে অনুরোধ জানানো হইলে, তিনি সরকার গঠনের জন্য আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী দলের নেতা আতাউর রহমান খানকে দায়িত্ব দেন। ৬ই সেপ্টেম্বর জনাব আতাউর রহমান খান আওয়ামী লীগ, গণতন্ত্রীদল, কৃষক শ্রমিক পার্টি (কফিল উদ্দিন চৌধুরী

উপদল) সমবায়ে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ করান। পরবর্তীকালে পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ পার্টি ও (ধীরেন দত্ত গ্রুপ) আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারে যোগ দেয়।

ভাসানীর অবদানঃ শেখ মুজিবের সাধারণ সম্পাদক পদ

মাওলানা ভাসানীর বর্ণনাতীত ও অপরিসীম ত্যাগ এবং কঠোর পরিশ্রমই আওয়ামী লীগকে পুর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান দখলে সক্ষম করে। অত্যাচারী জালেম মুসলিম লীগ সরকারের আমলে শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হক সরকারী চাকুরী এডভোকেট জেনারেল পদ গ্রহণ করেন। জনাব আতাউর রহমান খান স্বীয় ওকালতি পেশায় অধিকাংশ সময়ই মগ্ন ও স্বীয় পরিবার-পরিজনদের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত ছিলেন। অবসর মুহূর্তে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিতেন। ফলে, সরকারী অত্যাচার, নির্যাতন, জেল-জুলুম, আর্থিক কষ্ট ভোগ সবকিছুই সহ্য করিতে হইত সর্বত্যাগী মওলানা ভাসানীকেই। মজলুম নেতার উপযুক্ত পার্শ্বচর ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক তরুণ নেতা শামসুল হক ও যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৫২ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটকাবস্থায় জনাব শামসুল হক মানসিক ভারসাম্য হারাইয়া ফেলেন ও মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় কারামুক্তি লাভ করেন। জনাব শামসুল হক ১৯৫২ সালে কারান্তরাল থাকা বিধায় যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। কারামুক্তির পরও মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়া না আসায় ১৯৫৩ সালে ঢাকার মুকুল সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত পুর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ অধিবেশনে সভাপতি মাওলানা ভাসানীর অনুরোধক্রমে জনাব শামসুল হকের স্থলে শেখ মুজিবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। মানসিক ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ না করায় রাজনৈতিক গগন হইতে জনাব হকের মত একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়ে। ১৯৪৯ সালের ২৬শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে জয়লাভ করা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ সরকারের হীন কারসাজি জনাব শামসুল হককে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্যপদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। অতঃপর ঘন ঘন কারা নির্যাতন তাঁহার স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত করিতে থাকে এবং এইভাবেই একদিন মানসিক বিস্মৃতির অতল গহবরে তলাইয়া যান। অথচ এই তরুণ নেতা শামসুল হক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর ১৯৪৭ সালে যুব সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করিবার মহান দায়িত্বে উদ্বুদ্ধ হইয়া পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক ইউথ লীগ গঠন করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বিরোধী দল গঠনের প্রয়োজনীয়তায় মওলানা ভাসানীকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনে সর্বোতভাবে সক্রিয় সহযোগিতা দান করেন। ইহা অনস্বীকার্য যে, মজলুম নেতা পূর্বপাক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করিলে বলিষ্ঠ ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের অভাবে মুসলিম লীগের চন্ডনীতির আঘাতে সংগঠনের সকল প্রচেষ্টাই বোধহয় দারুণভাবে অপমৃত্যু বরণ করিত। মাওলানা ভাসানী ছিলেন রাজনৈতিক দিগন্তে এক দিক নির্দেশক 'ধ্রুবতারা'। পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশে এমন কোন শক্তি বা দল বা ব্যক্তি নাই, যিনি বা যারা কোন না কোন সময় মজলুম নেতার ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহন করেন নাই। সংকটময় প্রতিকূল পরিস্থিতিও আবহাওয়ায় মজলুম

নেতা- মওলানা ভাসানী সকল মত ও পথাবলম্বী রাজনীতিকদের একমাত্র নিরাপদ ও নির্ভরশীল আশ্রয়স্থান ছিলেন বটে, তবে কেহই তাঁহার নির্দেশিত পথ বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নাই। স্বীয় মত ও পথের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হইলেই তাঁহারা অত্যন্ত নগ্নভাবে জাতীয় নেতা মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধাচরণ শুরু করিতেন। যদিও খর রৌদ্রতাপে উত্যক্ত পথিকজন সুশীতল ছায়া ভোগ করে, তবুও স্বীয় স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত ছায়াভোগী মানব সন্তানই ছায়া প্রদানকারী বটবৃক্ষ কর্তনে মোটেও ইতস্ততঃ করে না। জাতীয় নেতা মওলানা ভাসানীকেও বিভিন্ন সময়ে আশ্রয় গ্রহীতাদের আক্রমণের শিকারে পরিণত হইতে হইয়াছিল।

বন্দী মুক্তির নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত

জনাব আতাউর রহমান খান মুখ্যমন্ত্রীত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াই কোন প্রকার টালবাহানা ছাড়াই ২১ দফা ওয়াদা মোতাবেক 'জননিরাপত্তা আইন' বাতিল ঘোষণা করেন এবং বিনাবিচারে আটক সকল রাজবন্দীর মুক্তির আদেশ দেন। শুধু তাই নয়, ৮ই সেপ্টেম্বর (১৯৫৬) তিনি তাঁহার মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ সমভিব্যাহারে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ফটকে উপস্থিত হইয়া ৫৯ জন রাজবন্দীকে মুক্তিদান করিয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত আবহাওয়ায় অভ্যর্থনা জানান। ইহা একটি নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত এবং এই ঘটনা বন্দীমুক্তির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার

প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর ক্ষমতা খর্ব করিবার প্রয়াসে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার ইঙ্গিতে সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস নেতা ডাঃ খান সাহেবের প্রচেষ্টায় রিপাবলিকান পার্টি প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির অধিকাংশ সদস্যই রিপালিকান পার্টিতে যোগদান করেন। মুসলিম লীগ সদস্যদের অদ্ভুত আচরণে ক্ষুব্ধ প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী মুসলিম লীগ ও প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে পদত্যাগ করতঃ নেজামে ইসলাম পার্টিতে যোগদানের কথা ঘোষণা করেন।

চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পদত্যাগ করিলে কেন্দ্রে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ রিপাবলিকান কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং ১২ই সেপ্টেম্বর জনাব সোহরাওয়ার্দী ও তাঁহার মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ শপথ গ্রহণ করেন। জনাব সোহরাওয়ার্দীর ত্বরিত ব্যবস্থার ফলে পুর্ব পাকিস্তানে খাদ্য সরবরাহ ত্বরান্বিত হয়। ইহার ফলেই পুর্ব পাকিস্তানের খাদ্য সংকট তথা দুর্ভিক্ষাবস্থা কৃতিত্বের সহিত মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। আবু হোসেন সরকারের দলীয় সদস্যবর্গ ক্ষমতার উচ্ছিষ্টে গাড়ী, বাড়ী, পারমিট, লাইসেন্স, ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারী খাস জমিজমা ইত্যাদি কব্জা করিবার মত জঘন্য কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন বিধায় দুর্ভিক্ষাবস্থা মোকাবেলার দায়িত্ব বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অতীব পরিতাপের বিষয় এই যে, মন্ত্রী মেম্বার হইবার পর পরই ঢাকার অভিজাত এলাকায় তাঁহাদের বাড়ীঘর হয়। স্বোপার্জিত আর্থিক সঙ্গতি থাকিলে মন্ত্রী-মেম্বার হইবার পূর্বে এই পর্বটি সমাধা হইতে বাধা কোথায়?

মুসলিম লীগ আমলে আমলারা যেইভাবে অবাধ লুটপাট চালাইয়াছিল, তেমনি ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে গগনবিদারী আওয়াজ উত্তোলনকারী যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার আমলেও আমলারা পুর্ণোদ্যমে ও দ্বিগুণ উৎসাহে লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করে। কালের গতির সহিত দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির এই অভিশাপই জনতার দুঃখভার দ্বিগুণ হারে বর্ধিত করে। ২১ দফার ওয়াদা মন্ত্রী-মেম্বারদের কৃতকর্মে কাগজী-ওয়াদায় পর্যবসিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রের ধারা অনুযায়ী মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পর সর্বজনাব আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ ও খয়রাত হোসেন সংগঠনের সহ-সভাপতি পদ হইতে পদত্যাগ করিলেও, মন্ত্রীপদ গ্রহণ করিয়া শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ সম্পাদকের পদ হইতে ইস্তফা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। অথচ কতিপয় সাংগঠনিক প্রশ্নে মতভেদ দেখা দেওয়ায় তিনি ১৯৫৬ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের পদে ইস্তফা দিয়া নিম্নলিখিত পত্র দাখিল করেনঃ

Phone 3221/134

The East Pakistan Awami League
(Central office)

56, Simpson Rd, Sadarghat
Dacca 5-9-1956

To

The President,
East Pakistan Awami League

Sir,

With due respect I want to inform you that I cannot continue as general Secretary of your organization for my ill health.

I hope that you will treat this letter as my resignation and to accep;t it as soon as possible otherwise the organization will suffer.

yours sincerely
Sheikh Mujibur Rahman
General Secretary
E.P.A.L.

ফোন ৩২২১/১৩৪
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ
কেন্দ্রীয় অফিস)
৫৬, সিম্পসন রোড, সদরঘাট,
ঢাকা ৫-৯-১৯৫৬

বরাবর

সভাপতি

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ

জনাব,

যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আপনাকে জানাইতেছি, অসুস্থতার কারণে আমার পক্ষে আপনার সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভব নয়। আশাকরি, এই পত্রখানাকে আপনি আমার পদত্যাগপত্র হিসেবে বিবেচনা করিয়া যতশীঘ্র সম্ভব গ্রহণ করিবেন, অন্যথায় সংগঠনের ক্ষতি হইবে।

আপনার বিশ্বস্ত

স্বাঃশেখ মুজিবুর রহমান

সাধারণ সম্পাদক

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ।

যেহেতু অন্যায়ের মানসিকতা লইয়াই মন্ত্রীত্বের গদিতে আসীন হইয়াছিলেন সেইহেতু শিল্প বাণিজ্যমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান কর্মীদিগকে অন্যায় প্রশ্রয় দিতে সামান্যতম বিবেক দংশনবোধ করিতেন না। নেতা কর্তৃক অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ ও প্রশ্রয়দানের সচ্চরিত্র আদর্শবাদী একনিষ্ঠ কর্মীকুল কালের বিবর্তনে হতাশা ও নিরাশার শিকারে পরিণত হন। শুধু তাই নয়-পরিশেষে তাহারা ঘুণেধরা প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংস্কার ও ব্যবস্থা প্রবর্তনের দৃঢ় সংকল্প পরিহার করিতেও বাধ্য হন। এইভাবেই নৈতিক, চারিত্রিক ও মানসিক শক্তি হারাইয়া সরল প্রাণ কর্মীদের সামগ্রিক অবস্থার বিপাকে লক্ষ্যভ্রস্ট হইয়া পড়িতে হয় এবং অনক কর্মী লোভ-লালসার বশবর্তী হইয়া সরকারী আনুকূল্যে সহজপথে অর্থোপার্জনে আত্মনিয়োগ করেন। দুর্নীতির বিষফনার ছোবলে সমগ্র সমাজদেহ বিষে জর্জরিত হইয়া উঠে। অথচ দুর্নীতিদমন মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই হুঙ্কার ছাড়িতেন যে, তিন পয়সার পোস্টকার্ডে লিখিয়া জানাইলেই তিনি দুর্নীতিবাজদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন। হুঙ্কারের তুবড়ীতে দুর্নীতি কতটুকু মূলোৎপাটিত হইয়াছে, দেশবাসী উত্তমভাবেই তাহা অবগত আছেন। ঢাকার ধানমন্ডি এলাকায় ৩২ নং রোডে নির্মিত তাঁহার তেতলা বাড়ীটি দুর্নীতি দমন প্রচেষ্টার এক দুর্বোধ্য ও বিচিত্র নজীর।

চীনের সহিত সম্পর্ক

জনাব সোহরাওয়ার্দী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পর পরই বিশ্বের অন্যতম মহাশক্তি মহাচীনের সহিত সম্পর্কোন্নয়ন মানসে ২২শে অক্টোবর (১৯৫৬) সরকারী সফরে মহাচীন গমন করেন। ফলে সৌহার্দপূর্ণ পাক-চীন সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। মহাচীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর আমন্ত্রণে পাকিস্তান সফর করেন। পাকিস্তাম সফরকালে চৌ-এন-লাই পূর্ব পাকিস্তানেও আসেন। আমরা পাক-

চীন মৈত্রী সমিতির তরফ হইতে ২৯শে ডিসেম্বর (১৯৫৬) ঢাকার 'গুলিস্তান সিনেমা হলে' মহাচীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই-এর সম্বর্ধনা দান উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করি। সেই সুযোগে এই অনুষ্ঠানে প্রমানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই-এর সহিত আমার ব্যক্তিগত পরিচয় হয়। অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা, আমন্ত্রণ ইত্যাদির মোটামুটি দায়িত্ব পাক-চীন মৈত্রী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং সকল প্রকার অপ্রিয় কাজকর্মগুলি আমাকেই সমাধা করিতে হইয়াছিল। গুলিস্তান হলে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের জন্য পূর্ব হতেই আসন নির্ধারিত ছিল। কিন্তু ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব হায়দার তাঁহার প্রভূসুলভ মানসিকতা নিয়ে বৈদেশিক দূতাবাসের প্রতিনিধিদের নির্ধারিত আসনে বসিয়া পড়েন। তাঁহাকে বার কয়েক বিনীত অনুরোধ জানাই; কিন্তু দাম্ভিকতার দরুন তিনি আসন ত্যাগ করিতে সম্মত হন না। তখন বাধ্য হইয়াই বেশ কড়া মেজাজে তাঁহাকে আসন ত্যাগ করিতে আদেশ দেই। এইবার ভিজা বিড়ালের ন্যায় তাঁহাকে সেই আদেশ পালন করিতে হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পাক-চীন মৈত্রী সংস্থা (Pak-China Friendship Society) ১৯৫৬ সলের ২রা নভেম্বর টিচার্চ ট্রেনিং কলেজ হলে এক সভার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান ও সম্পাদক ছিলেন জনাব জহুর হোসেন চৌধুরী। সংস্থার প্রথম সভা বাংলা একাডেমীতে (বর্দ্ধমান হাউস) ১৯৫৬ সালরে ১৩ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়।

সুয়েজ খাল জাতীয়করণ

২৬শে জুলাই (১৯৫৬) মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসের সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অর্থনীতির প্রয়োজনে নীল নদের উপর আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের ব্যয় নির্বাহের কারণেই তাঁহাকে সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করিতে হইয়াছিল। পূর্বাহ্নে স্বীকৃত হইয়াও পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্বব্যাংক আসোয়ান হাইড্যাম নির্মাণকল্পে পূঁজি বিনিয়োগে অস্বীকৃতি জানাইলে বাধ্য হইয়াই প্রেসিডেন্ট নাসের উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, একশত তিন মাইল দীর্ঘ সুয়েজ খালটি ফরাসী নাগরিক ফার্ডিন্যান্ড দ্যা লেসেপস ১৮৫৯ সালের ১লা এপ্রিল খনন শুরু করেন ও ১৮৬৯ সালের ১৭ই নভেম্বর উক্ত খালে জাহাজ চলাচল শুরু হয়। ১৮৭৫ সালে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিজরেইলী মিসরের শাসনকর্তা খেদিব ইসমাইল হইতে চল্লিশ লক্ষ স্টার্লিং পাউন্ড মূল্যে সুয়েজ খালের শেয়ার ক্রয় করিয়া ইংগ-ফরাসী যৌথ মালিকানার সূত্রপাত করেন। তাই বৃটিশ ও ফরাসী সরকার ইসরাইলের সহায়তায় আন্তর্জাতিক নদীপথ সুয়েজ খালটির আয়ের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব রক্ষার বদমতলবে সুয়েজ খাল কোম্পানী জাতীয়করণের তিন মাসের মধ্যে মিসরের উপর সশস্ত্র হামলা পরিচালনা করে। ইসরাইল ২৯শে অক্টোবর (১৯৫৬) সিনাই উপদ্বীপ দখল করে; বৃটেন ও ফ্রান্স ৩১শে অক্টোবর (১৯৫৬) মিসরের রাজধানী কায়রোতে বিমান হামলা ও বোমাবর্ষণ করে। মিসরের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী হামলার প্রতিবাদে ঢাকা শহর বিক্ষোভ মিছিলের শহরে পরিণত হয়। এমনকি ৩রা নভেম্বর (১৯৫৬)

এক পর্যায়ে ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত জনতা পুরানো পল্টনস্থ বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস ভবনটি অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিয়া দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্দার অন্তরাল হইতে ইংগ-ফরাসী শক্তিদ্বয়কে সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে তাহার কঠোর মনোভাব জানাইয়া দেয় এবং সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভ প্রকাশ্য চরমপত্রে ঘোষণা করেন যে, সশস্ত্র আক্রমণ বন্ধ না করিলে রাশিয়া পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। বিশ্বজনমত ও এই দুই মহাশক্তিদ্বয়ের কঠোর মনোভাবের নিকট ইংগ-ফরাসী সরকারদ্বয় নতি স্বীকার করিয়া ১২ই নভেম্বর (১৯৫৬) সশস্ত্র হামলা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হয়। সংকটময় এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী এক অস্পষ্ট, অপরিচ্ছন্ন ও দ্ব্যর্থবোধক ভূমিকা গ্রহণ করেন। এমনকি সুয়েজ সমস্যার উপর ১২ই নভেম্বর দিল্লীতে আহূত কলম্বো শক্তিসমূহের (Colombo Powers) সম্মেলনে আমন্ত্রণ গ্রহণ করা সত্ত্বেও ইরানের রাজধানী তেহরানে আহূত বাগদান প্যাক্ট কাউন্সিল সভায় যোগদানের জন্য প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জাসহ তিনি তেহরান গমন করেন। ফলে জাতিসংঘ কর্তৃক সুয়েজ খাল এলাকায় প্রেরিতব্য আন্তর্জাতিক পুলিশ ফোর্সে পাকিস্তান সৈন্য পাঠাইতে চাহিলে মিসর পাকিস্তানী সৈন্য গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী কায়রো সফরের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসের অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। সোহরাওয়ার্দী অনুসৃত নীতি বস্তুতঃ আরব জাহানে পাকিস্তানকে বিরাগভাজন রাষ্ট্রে পরিণত করে। এইদিকে দিল্লীতে আহূত কলম্বো পাওয়ারস সম্মেলনে যোগদান না করায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাকিস্তান একঘরে হইয়া পড়ে। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর বিস্ময়কর এই ভূমিকা অগ্রাহ্য করিয়াই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান প্রকাশ্য বিবৃতির দ্বারা মিসরের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। মওলানা ভাসানী ৯ই নভেম্বরকে 'মিসর দিবস' হিসাবে ঘোষণা করেন ও আওয়ামী লীগ সরকার 'মিসর দিবসকে' সরকারী ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা জারি করে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করা সত্ত্বেও অবস্থার চাপে উল্লিখিত কর্মসূচীর বিরোধিতা করা হইতে বিরত থাকেন।

আওয়ামী লীগ ভাঙ্গনের সূচনা

বৈদেশিক নীতিকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লগ ক্রমশঃ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়ে। গদিতে আসীন হইবার পর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা বিস্মৃত হইয়া মন্ত্রীবর্গ প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী অনুসৃত পররাষ্ট্র নীতির সহিত একাত্মতা প্রকাশ করিতে থাকেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি, সাংগঠনিক সম্পাদক ও প্রচার সম্পাদক যথাক্রমে মওলানা ভাসানী, আমি ও অধ্যাপক আবদুল হাই ১৯৫৩ সাল হইতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পূর্বপাক আওয়ামী লীগ কর্তৃক গৃহীত 'সাম্রাজ্যবাদী সামরিক চুক্তি বিরোধী পররাষ্ট্র নীতির' প্রতি অবিচল ও অটলভাবে অনুগত রহিলাম। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ শ্রম সম্পাদক ও পরিষদ সদস্য আবদুস সামাদ তাঁহার স্বভাবসুলভ দোদুল্যচিত্ততার কারণে কখনও মন্ত্রীদের কাতারে কখনও সংগঠনের কাতারে ছিলেন।

উপ নির্বাচন

১৯৪৭ সাল হইতে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের শূন্য ৩৫টি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান না করিয়া গণতন্ত্রের অঙ্কুরোদগমনকালেই কুঠারাঘাত হানিয়া সর্বনাশের সূচনা করিয়া যান। তাই ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী যুক্তফ্রন্ট তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি ২১ দফা ওয়াদার অন্তর্ভূক্ত করে। তদানুযায়ী ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াই আওয়ামী লীগ উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। উপনির্বাচন প্রাক্কালে খাদ্য সংকট নিরসনে ব্যর্থ হইয়া যুক্তফ্রন্ট মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার পদত্যাগ করিলে তদস্থলে আতাউর রহমান খান দুর্ভিক্ষাবস্থায় ক্ষমতা গ্রহণ করেন ও প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর সহায়তায় অত্যন্ত দক্ষতার সহিত খাদ্য সংকট মোকাবেলা করেন। আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার কর্তৃক সফল খাদ্য সংকট সমাধানই ১০ই ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ের অন্যতম কারণ। সংগঠন সভাপতি মাওলানা ভাসানী ৭টি উপনির্বাচন কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মনোনয়নের জন্য জনমত যাচাই করিবার নিমিত্ত শেখ মুজিবর রহমান, ইয়ার মোহাম্মদ খান ও আমাকে লইয়া তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করিয়া দিয়াছিলেন। উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং এইভাবেই ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের অঙ্গদল হিসাবে তাহাদের দেয় ২১ দফা ওয়াদার ২১তম ওয়াদাকে রক্ষা করে।

যুব উৎসব

১৯৫৭ সালের ৪ঠা হইতে ৭ই জানুয়ারী রংপুর শহরে পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগ 'যুব উৎসব" উদযাপন করে। উক্ত যুব উৎসবে পূর্ব পাকিস্তান মন্ত্রীসভার সদস্যত্রয় সর্বজনাব খয়রাত হোসেন, মশিউর রহমান ও মাহমুদ আলী অংশগ্রহণ করিয়া যুব সমাজের অনন্য প্রচেষ্টাকে উৎসাহদান করেন। পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমিও যুব উৎসবে যোগ দেই। বিভিন্ন এলাকা হইতে আগত অসংখ্য যুব প্রতিনিধির সমাবেশ ও প্রাণচাঞ্চল্য আমাকে অভিভূত ও আত্মহারা করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না যে, ১৯৫২ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ আমাকে কারান্তরালে থাকা অবস্থায়ই 'ইউথ স্টার' সম্মানে ভূষিত করিয়াছিল। এই ধরনের উৎসব যুবকদের মন ও মানসিকতার উন্নতি ঘটায়, নির্মল করে ও তাহাদের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করে। এতদ্বারা তাহারা নীতি ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, স্বীয় কর্মক্ষমতার প্রতি প্রত্যয় ও পরস্পরের প্রতি মমত্ববোধের শিক্ষাও লাভ করে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ ১৯৫১ সালের ২৭শে ও ২৮শে মার্চ ঢাকায় দুই দিনব্যাপী অধিবেশনের মাধ্যমে গঠিত হয়। জন্মলগ্ন হইতেই পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ নির্ভীক, সচ্চরিত্র, আত্মত্যাগী, আদর্শ নিষ্ঠা ও সংগ্রামী যুব সংগঠনের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। দলমত নির্বিশেষে যুব সমাজ পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের গণতান্ত্রিক মঞ্চে ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হইতে থাকে। এইভাবেই আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, মুসলিম লীগ, ছাত্র

ফেডারেশন, বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল, আত্মগোপনকারী কমিউনিষ্ট পার্টিও নির্দলীয় যুব কর্মীরা পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের পতাকাতলে সমবেত হয়। উপরোল্লিখিত সংগঠনগুলির যুবকর্মী শ্রেণী স্ব স্ব সংগঠনের নেতৃত্বের সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও কোন কোন স্থলে কায়েমী স্বার্থ প্রভাবান্বিত কার্যক্রমকে স্ব স্ব ধ্যান-ধারণা পরিপন্থী জ্ঞান করিত এবং প্রায়শঃ স্বীয় বিবেক ও নীতিজ্ঞানকে দলীয় শৃঙ্খলার যুপকাষ্ঠে বলি দিয়া দেশ ও জাতির চরম ক্ষতির কারণ হইত। উপরোক্ত কারণে যুবকর্মী শ্রেণী মর্মপীড়া ও বিবেক দংশনে হতোদ্যম হইয়া পড়িতেছিল ও প্রখর গণতান্ত্রিক চেতনা হারাইয়া ফেলিতেছিল। এহেন সংকটময় মুহূর্তে 'পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ' এক নব আশার সঞ্চার করে। ১৯৫২-এর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রশ্নে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ, আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ, পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস ও আওয়ামী লীগ প্রভাবান্বিত গণসংগঠনের নেতারা আপোষকামিতার ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন, তদাবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ ২১ শে ফেব্রুয়ারী ও তদপরবর্তী দিনগুলিতে নির্ভীক, সংগ্রামী ও সচেতন নেতৃত্ব না দিলে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন গণআন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করিত না বরং করাচী শাসকচক্রেরই জয় সূচিত হইত। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের কারণেই বাঙালী মন ও মানসিকতার স্বকীয় সত্ত্বাবোধ পুরাপুরি জাগ্রত হয়। বলাই বাহুল্য যে, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে জাগ্রত এই সত্ত্বাবোধই হইল বাংলাদেশের সৃষ্টির সূচনা এবং নব জাতীয়তার মৌলিক ভিত্তি।

পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগকে আপামর জনসাধারণের যুব সংগঠনে পরিণত করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ১৯৫২-এর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে কারারুদ্ধ হওয়ায় অতীব দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয় যে, আমার সেই স্বপ্ন সফল হয় নাই। তাহাছাড়া তদানীন্তন আত্মগোপনকারী কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক যুবলীগের উপরে তাহাদের নেতৃত্ব, কর্মসূচী ও সিদ্ধান্ত চাপাইয়া দিবার অযৌক্তিক প্রবণতা ও প্রচেষ্টা সাধারণ যুবশ্রেণীর মধ্যে ভীতি ও সন্দেহের উদ্রেক করিয়াছিল। ফলে, ক্রমশঃ আপামর যুব সাধারণের প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠনে পরিণত হইবার সুযোগ ও শক্তি যুবলীগ হারাইয়া ফেলে। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে যুবলীগ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের হাতিয়ারে পরিণত হয় ও আত্মগোপনকারী কমিউনিষ্ট পার্টির নির্দেশাবলী পালনের মুখপাত্র সংগঠনে পর্যবসিত হয়। তাই কারামুক্তির পর আমি কার্যতঃ যুবলীগের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করি। কেননা, যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ইহার জন্মলগ্ন হইতেই আমি সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক যুব সমাজকে সংগঠিত করিবার প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিলাম বটে কিন্তু এতদপ্রয়াসে কোন আন্তর্জাতিক শক্তির লেজুড়বৃত্তি করিবার আমি ঘোর বিরোধী ছিলাম।

কাগমারী সম্মেলন

সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কাগমারীতে ৭ ও ৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৭) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন আহবান করেন। সেই সময়ে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে ও পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন ছিল বিধায় উল্লেখিত অধিবেশনটি

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তদুপরি এই সময়ে বৈদেশিক নীতি বিশেষ করিয়া পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি সম্পাদন ও সামরিক চুক্তি সম্পাদনসমূহ যথা 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সামরিক চুক্তি সংস্থা' ও 'বাগদাদ চুক্তি' সংস্থার সদস্যভুক্তির প্রশ্নে মাওলানা ভাসানী ও প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর মতদ্বৈততা চরম আকার ধারণ করিয়াছিল বিধায় এই অধিবেশনের বিশেষ গুরুত্ব দেখা দিয়াছিল। ইতিপূর্বে ৯ই ডিসেম্বর (১৯৫৬) সলিমুল্লাহ মুসলিম হল মিলনায়তনে এক ছাত্র সভায় প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সামরিক চুক্তির স্বপক্ষে জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। ইহা ছিল আওয়ামী লীগের সাম্রাজ্যবাদী সামরিক চুক্তির বিরোধী ভূমিকার পরিপন্থী। সোহরাওয়ার্দীর বাগদাদ চুক্তি সমর্থনের বিরুদ্ধে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক ওসমানী তীব্র প্রতিবাদ জানাইলে জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁহাকে (ওসমানী) পদত্যাগের নির্দেশ দেন। এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এক সভা আহবান করা হয় এবং জনাব সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশের পাল্টা জওয়াবে বাগদাদ চুক্তি সংস্থা হইতে সদস্যপদ প্রত্যাহার করিবার জন্য উক্ত সভা পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহবান জানায়। ১৩ই নভেম্বর (১৯৫৬) অনুষ্ঠিত সভায় পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি বাগদাদ চুক্তিভুক্ত শক্তিবর্গের তেহরান সম্মেলনের সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করে এবং ১৯শে জানুয়ারী (১৯৫৭) করাচী আওয়ামী লীগ সম্পাদক বি,এম,কুটী পদত্যাগ করেন। এই সমস্ত ঘটনা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক অনুসৃত পররাষ্ট্র নীতির বিরুদ্ধে সংগঠন আওয়ামী লীগ কতখানি সোচ্চার ছিল। অবশ্য অকুণ্ঠচিত্তে ইহাও স্বীকার করিতেই হইবে যে, জনাব সোহরাওয়ার্দীর অনবদ্য কূটনীতির ফলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সমর্থনে ২৪শে জানুয়ারী (১৯৫৭) জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরের ভাগ্য নির্ধারণের আহবান জানায়। এই কূটনৈতিক সাফল্যের দরুনই জনাব সোহরাওয়ার্দী দেশের অভ্যন্তরে সাধারণ মুসলমানদের সমর্থন পাইতেছিলেন।

নানাবিধ কারণে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কর্মী, সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীরা ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি আস্থা হারাইয়া ফেলিতেছিল। প্রথমতঃ প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী অনুসৃত মার্কিন ঘেষা পররাষ্ট্রনীতি ও সামরিক জোটের লেজুড়বৃত্তি ছিল সংগঠনের সাধারণ কর্মীবৃন্দের মর্মপীড়ার কারণ। দ্বিতীয়তঃ ১৯৫৬ সালে প্রবর্তিত সংবিধানে ২১ দফা বর্ণিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত ধারা সংযোজিত না হওয়া। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের দাবীদার আওয়ামী লীগ সরকারের ভূমিকা সচেতন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও ছাত্র-যুব সমাজ খুবই আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেছিল। তৃতীয়তঃ ১৯৫৫ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কর্তৃক গৃহীত গঠনতন্ত্রের ৬৬ ধারা মোতাবেক শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রী পদ গ্রহণ করায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের পদ ত্যাগ করা তাহার জন্য অবশ্য পালনীয় ছিল। উক্ত ধারায় সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে, অন্যথায় এক মাস পরে উক্ত কর্মকর্তার পদ শূন্য বলিয়া অবশ্য গণ্য হইবে। উপরে বর্ণিত তিনটি বিষয়ই প্রধানতঃ সংগঠনের নিষ্ঠাবান কর্মীদিগকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। তদুপরি

১৯৫৬ সলের সেপ্টেম্বরে গদিতে আসীন হইবার পর হইতেই ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট ভোগের দুর্দমনীয় লালসায় মন্ত্রীবর্গ স্বল্প সময়ের মধ্যে সংগঠনের গঠনতন্ত্র, সিদ্ধান্ত, নীতি ও আদর্শকে বিসর্জন দিয়া আওয়ামী লীগকে স্বেচ্ছাচারী মন্ত্রীচক্রের লেজুড়ে পরিণত করিবার যে কুটিল পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে কর্মী সমাজ উদ্বিগ্ন না হইয়া পারে নাই। সুতরাং কাগমারী কাউন্সিল অধিবেশনের ইহাই বিবেচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, কেন্দ্রে ও পূর্ব পাকিস্তানে মন্ত্রীসভার নির্দেশে আওয়ামী লীগ সংগঠন পরিচালিত হইবে কি না অর্থাৎ সংগঠন ক্রমশঃ মন্ত্রী আওয়ামী লীগে পরিণত হইবে, না আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র সিদ্ধান্ত, নীতি ও আদর্শের প্রতি অটল আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া মন্ত্রীসভা আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভায় পরিণত হইবে।

শেখ মুজিবের আক্রোশ

এহেন পরিস্থিতিতে ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৭) মওলানা আবুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে সন্তোষ মহারাজার নাটমন্দিরে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসে। মওলানা ভাসানীর বিশেষ আমন্ত্রণে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী ওয়ার্কিং কমিটির এই সভায় যোগদান করেন। পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা ও বাগদাদ চুক্তি সংস্থার সদস্যপদ প্রত্যাহারের দাবীতে ৭ ও ৮ই ফেব্রুয়ারীর কাউন্সিল অধিবেশনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হইবে কি হইবে না- এই প্রশ্ন ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ৩৫-১ ভোটে কোন প্রকার প্রস্তাব আনয়ন না করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কেবলমাত্র আমি সামরিক চুক্তি বাতিল, সামরিক চুক্তি সংস্থা সমূহের সদস্যপদ প্রত্যাহার ও প্রয়োজনবোধে সংগঠনের সিদ্ধান্তের স্বার্থে মন্ত্রীসভার পদত্যাগের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণে দৃঢ়মত প্রকাশ করি এবং ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমি একা ভোট দান করি। সংবাদটি মার্কিন ঘেষা দৈনিক ইত্তেফাকের ৮ই ফেব্রুয়ারীর (১৯৫৭) সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠার ফলাও করিয়া ছাপান হয়। কাউন্সিল অধিবেশনকে লক্ষ্য করিয়া "পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ ও বৈদেশিক নীতি" নামে একটি ক্ষুদ্রাকার পুস্তিকা প্রকাশ করি। তন্মধ্যে ১৯৫৩ সালের ১৪ ও ১৫ই নভেম্বর ময়মনসিংহে, ১৯৫৫ সালের ২১, ২২ ও ২৩শে অক্টোবর ঢাকায় ও ১৯৫৬ সালের ১৯ ও ২০শে মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে সামরিক চুক্তি বিরোধী প্রস্তাবাবলী সন্নিবেশিত করি। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক সংগঠনে গৃহীত সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে দেশবাসীকে অবহিত ও সজাগ হইবার আহবান জানাই। অতীব পরিতাপের বিষয়, সোহরাওয়ার্দী-ভাসানী বৈঠকে মওলানা ভাসানী পররাষ্ট্র বিষয়ে সোহরাওয়ার্দী অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাব আনয়নে বিরত থাকিবার শর্তে সমঝোতা করেন। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে মওলানা ভাসানীর দ্ব্যর্থবোধক ভূমিকাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সাধারণ কর্মী ও সমর্থকবৃন্দের নিকট উচ্চস্থানীয় নেতৃবৃন্দের লীলাখেলা অনুধাবন কষ্টকর ফলশ্রুতিতে বহু ক্ষেত্রেই তাহাদের রাজনৈতিক জীবনের ঘটে অপমৃত্যু আর দেশবাসীর হয় হাড়ির হাল। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ইহা দিবালোকের মত প্রতিভাত ছিল যে, সাম্রাজ্যবাদী সামরিক চুক্তিগুলি চীন-রাশিয়া প্রভৃতি

কমিউনিষ্ট দেশগুলির বিরুদ্ধে- পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হেফাজতের স্বার্থে নয়। কিন্তু ক্ষমতার নেশায় আত্মহারা মন্ত্রী-মেম্বারগণ সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রীত্বকে যে কোন মূল্যে রক্ষার জন্য যেন বদ্ধপরকর ছিলেন। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত প্রশ্নে ও শেখ মুজিবুর রহমানের সাধারণ সম্পাদক পদ ত্যাগে অনীহা সমগ্র প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সক্রিয় করিয়া তোলে। জাতীয়তাবাদী, প্রগতিশীল ও আদর্শনিষ্ঠ কর্মীর বিপুলাংশ ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের সদস্য। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির খুঁটার ভূমিকায় অবতীর্ণ শেখ মুজিবুর রহমানের ক্রোধ স্বাভাবিকভাবেই তাহাদের উপরে নিপতিত হয়। তাই তিনি প্রস্তাব আনয়ন করিলেন যে, কোন সদস্য আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের যুগপৎ সদস্য থাকিতে পারিবে না। মওলানা ভাসানী এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় কয়েক ঘন্টা বক্তৃতা করিলেন বটে, তবে প্রস্তাব গ্রহণ হইতে প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রী-সমর্থকদের বিরত করিতে পারেন নাই।

ভাসানীর আসসালামু আলাইকুম

৬ই ফেব্রুয়ারী ওয়ার্কিং কমিটির সভায় মওলানা সাহেব জনাব সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রীত্ব রক্ষার প্রয়োজনে সংগঠনের প্রতিষ্ঠিত পররাষ্ট্রনীতি বলি দিয়া সাম্রাজ্যবাদী সামরিক চুক্তিনীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, তবে পরদিন ৭ই ফেব্রুয়ারী কাউন্সিলের উদ্বোধনী অধিবেশনে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি এবং সিয়াটো চুক্তি সংস্থা (SEATO) ও বাগদাদ চুক্তিসংস্থার বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় কয়েক ঘন্টা জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন না দিলে ও সামরিক-বেসামরিক চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পায়ন, কৃষি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সংখ্যাসাম্য নীতি পালিত না হইলে পূর্ব পাকিস্তান 'আসসালামু আলাইকুম' বলিবে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হইয়া যাইবে। স্মর্তব্য যে, ১৯৫৫ সালের ১৭ই জুন রোজ শুক্রবার অপরাহ্নে ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভায় সভাপতির ভাষণদানকালেও মওলানা ভাসানী পাকিস্তানের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া ঘোষণা করেন যে, শোষণ-শাসনের মনোবৃত্তি ত্যাগ না করিলে পূর্ব পাকিস্তান 'আসসালামু আলাইকুম' বলিতে বাধ্য হইবে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান পৃথক হইয়া যাইবে। উক্ত মন্তব্য সে সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান ও কেন্দ্রীয় রাজধানী করাচীতে এক বিরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল।

আদান-প্রদানের রাজনীতি

'বিষয় নির্বাচনী কমিটি' সভায় সভাপতির আসন হইতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবুল মনসুর আহমদ জানিতে চাহেন যে, 'কাউন্সিল অধিবেশনে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত আমার প্রস্তাবটি আমি উত্থাপন করিতে চাহি কি না?' তদুত্তরে আমি বলি যে, "ওয়ার্কিং কমিটি ও বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে আমার প্রস্তাবাবলীর পক্ষে দ্বিতীয় কোন সদস্যের সমর্থন অর্জন করিতে ব্যর্থ হইয়াছি, অতএব নিছক শক্তি পরীক্ষার জেদের বশবর্তী হইয়া কাউন্সিল অধিবেশনে আমি আমার প্রস্তাবাবলী উত্থাপন করিব না।" আমার এই বক্তব্যের কারণ এই ছিল যে,

আমি জানিতাম, মজলুম নেতা মওলানা ভাসানীর অব্যবস্থিত চিত্ত দ্ব্যর্থবোধক ভূমিকা ও পলায়নী মনোবৃত্তির কারণে এবং মন্ত্রীবর্গের ঐক্যবদ্ধ জোটের বিরুদ্ধে কাউন্সিল সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে প্রস্তাবের পক্ষে প্রভাবান্বিত করিবার ব্যাপারে আমার একক প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইতে বাধ্য। অকপট মনে সাধারণ্যে স্বীকার করিতেই হইবে যে, আত্মগোপন অবস্থায়ও কমিউনিস্ট নেতৃবর্গ কমরেড মনি সিংহ, কমরেড খোকা রায় ও কমরেড সালাম জাতির সংকটময় মুহূর্তে নীতি-নির্ধারণে ও নীতি-নিষ্ঠায় আওয়ামী লীগ সংগঠনে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে প্রভূত সহায়তা করিয়াছে।

যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত নেপথ্যে দেন-দরবার ও আদান-প্রদান রাজনীতি জয়লাভ করে এবং ভাসানী-মুজিব সমঝোতা হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা ভাসানীর সংগঠন প্রশ্নে অর্থাৎ সাধারণ সম্পাদক পদে মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে বহাল রাখিবার মত গঠনতন্ত্র বিরোধী পদক্ষেপ সংগঠনের প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী সংগ্রামী অংশকে নিদ্রারুণভাবে হতাশ করে। আর এইভাবেই মার্কিন কূটনীতির নিকট আওয়ামী লীগের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পদক্ষেপ সংগঠনের প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী সংগ্রামী অংশকে নিদারুণভাবে হতাশ করে এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনীতি পরাজয় বরণ করে। বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী রণপায়তারার বিরুদ্ধে ১৯৫২ সালে মহাচীনে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনের সক্রিয় অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও এবং ১৯৫৩-৫৬ইং সামরিক চুক্তি ও সামরিক জোট বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ সত্ত্বেও কোন ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদ যে কিভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্রীড়নকে পরিণত হইতে পারেন তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। এই বিষয়ে মন্ত্রী শেখ মুজিবকে সাম্রাজ্যবাদের বশংবদ চীনের চিয়াং কাইশেক, দক্ষিণ কোরিয়ার সিং ম্যানরী, থাইল্যাণ্ডের সরিৎ থানারত ও ইরাকের নূরী আসসাঈদের মন্ত্র শিষ্য বলিলেও ভুল বলা হইবে না। ক্ষমতার রাজনীতির সীমাবদ্ধতা এইখানেই। এইখানেই নীতি, আদর্শ, দর্শন সবকিছুই অপাংক্তেয় বা অবান্তর।

ভাসানীর হাঁ-না

৮ই ফেব্রুয়ারী সমাপ্ত কাউন্সিল অধিবেশনান্তে আমি টাঙ্গাইল বড় বোনের বাড়ীতে চলিয়া যাই। সন্ধ্যার একটু পূর্বে আমি সন্তোষ (কাগমারী) আসি। দেখামাত্র শেখ মুজিবুর রহমান আমাকে লোকের ভিড় হইতে এক পাশে ফুলবাগানের মধ্যে নির্জনস্থানে লইয়া একান্তে প্রশ্ন করেন, "অলি আহাদ, পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে কোন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে কি?" আমি তদুত্তরে গম্ভীরভাবে বলি, "না"। কথা প্রসঙ্গে অত্যন্ত বিচলিত ও উদ্বিগ্ন মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের জবানীতে অবগত হই যে, সংগঠনের সভাপতি মওলানা ভাসানী সাংবাদিকদের নিকট এক বিবৃতিতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৫৬-এর 'মে অধিবেশনে' গৃহীত বৈদেশিক নীতিকে পুনরায় প্রস্তাবাকারে সমর্থন দিয়াছে এবং মন্ত্রীই হউক বা পার্লামেন্ট সদস্যই হউক বা প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যই হউক কেহ প্রস্তাবের খেলাফ কাজ করিলে তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ক্ষমতাও কাউন্সিল তাঁহাকে দিয়াছে। আমার সুস্পষ্ট মনে

আছে, মওলানা ভাসানী উপরোক্ত মর্মে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিয়াছেন বটে, তবে তিনি বা অন্য কেহ আনুষ্ঠানিকভাবে কোন প্রস্তাব কাউন্সিল অধিবেশনে উত্থাপন করেন নাই। আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার এই অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ আমাকে বিস্মিত, বিমূঢ় ও হতবাক করিয়াছিল। বোধহয় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে স্বীয় ভূমিকার গ্লানি মওলানা ভাসানীকে দংশন করিতেছিল এবং ইহা তাঁহার প্রায়শ্চিত্তেরই ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। অথচ মুহূর্তের জন্যও তাঁহার চেতনায় উদিত হয় নাই যে, সংবাদপত্র পাঠক হয়ত তাঁহার বক্তব্যকে বিশ্বাস না করিলেও সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করিবে না। কিন্তু কাউন্সিল অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী ৮৯৬ জন সদস্যের পক্ষে তাঁহার দেয় এই খবর বা বিবৃতিকে সত্য মনে করিবার বাস্তব কোন হেতু নাই। ফলে, তাঁহার বিশাল ব্যক্তিত্বের মর্যাদা কি সদস্যদের নিকট ক্ষুণ্ন হইবে না? সজ্ঞানে তিনি ইহা করিয়া থাকিলে দায়িত্ব তাঁহার, তবে অন্যের প্ররোচনায় করিয়া থাকিলে পরামর্শদানকারীগণ সংগঠনের অথবা দেশের যে কল্যাণকামী নহেন, তাহা দিবালোকের মত স্পষ্ট।

শেখ মুজিবুর রহমানের রিপোর্ট শ্রবণে আমার ইন্দ্রিয়ানুভূতি যেন লোপ পাইতেছিল। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কুচক্রীমহলই মওলানা ভাসানীর প্রায়শ্চিত্তানুভূতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই বৃদ্ধ নেতাকে এইভাবে অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়তো প্ররোচিত করিয়াছে। কে না জানেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে ও কেন্দ্রীয় সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনে প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও শক্তিতে ভীত সন্ত্রস্ত প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা তাঁহার একান্ত বশংবদ শিল্পপতি সদরী ইস্পাহানীচক্র মারফত সোহরাওয়ার্দীর গণভিত্তির মূল ঘাঁটি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগকে দ্বিধাবিভক্ত ও শহীদ-ভাসানীর নীতিগত মত-পার্থক্যের সুযোগে তাঁহাকে তাঁহার রাজনৈতিক দোসর মাওলানা ভাসানী হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার প্রচেষ্টায় রত রহিয়াছেন। যাহা হউক, মজলুম নেতার নাটকীয় আচরণের আলোচনা শেষ করিয়া শেখ মুজিবুর রহমান প্রস্তাবচ্ছলে আমাকে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সহিত আপোষ-আলোচনার উদ্দেশ্যে তাঁহার সহিত করাচী যাইতে অনুরোধ জানান। আমি তাঁহার প্রস্তাবের উত্তর ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর দিব বলিয়া তখনকার মত বিদায় নিলাম।

চাকুরীর টোপ

পরবর্তীকালে মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের আবদুল গণি রোডস্থ সরকারী বাসভবনে আমি ও খুলনার মমিনউদ্দিন আহমদ তাঁহার সহিত আলোচনাকালে শেখ সাহেব আমাকে সোভিয়েট রাশিয়া বা যুক্তরাজ্যের ট্রেড কমিশনারের পদ বা পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশন (East Pakistan Small Industry Corporation or EPSIC) এর চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণের প্রস্তাব করেন। আমি সবিনয়ে তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাই। ইহার কয়েকদিন পর কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নূরুর রহমান করাচী হইতে ঢাকা আগমন করেন ও আমার সহিত দেখা করিয়া প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর পক্ষ হইতে কলিকাতাস্থ ডেপুটি হাই কমিশনারের কূটনৈতিক পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানান। প্রস্তাবগুলির অন্তর্নিহিত মর্মার্থ আমার নিকট সুস্পষ্ট ছিল-রাজনীতির অঙ্গন হইতে আমাকে অপসারণ। চাকুরী গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইলে করাচীর মন্ত্রীমহল, ঢাকার মন্ত্রীমহল ও ঢাকার

দৈনিক ইত্তেফাক মহল আমার উপর বেজায় খাপপা হয়। শুরু হয় আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা। প্রচার চলিতে থাকে যে, আমি ভারত সরকারের এজেন্ট ও রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপে জড়িত। সুতরাং আমার বিচার হওয়া উচিত। তদুত্তরে সংশ্লিষ্ট কুচক্রীমহলকে পরিষ্কার ভাষায় জানাইয়া দিয়াছিলাম যে, মুসলিম লীগের নির্যাতনে আত্মসমর্পণ করি নাই। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর ধমকেও শির নত করিবার কোন কারণ দেখা দেয় নাই।

কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন

১৯৫৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী কাগমারীতে আফ্রো-এশীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ডঃ কুদরত-ই খুদা, ডঃ এস, হেদায়েত উল্লাহ, ডঃ ওসমান গণি, ডঃ শামসুদ্দিন আহমদ, ডঃ নূরুল হুদা, ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, প্রফেসর এ,বি,এ, হালিম (ভাইস চ্যান্সেলর, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়), ডঃ মাহমুদ হোসেন, ডঃ হাসান হাবাসী, ডঃ মমতাজ উদ্দিন আহমদ ও জনাব ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, ভারত হইতে আগত ভারতীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রফেসর হুমায়ূন কবীর, মিঃ তারা শংকর বন্দোপাধ্যায়, মিঃ প্রবোধ সান্যাল, মিসেস রাধারাণী দেবী, কাজী আবদুল ওয়াদুদ, মিসেস সুফিয়া ওয়াদিয়া অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন উপলক্ষে 'কায়েদে আযম', 'মহাত্মা গান্ধী', 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস,' 'নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু', 'হাকিম আজমল খান,' ও আরও খ্যাতনামা ব্যক্তিদের নামে টাঙ্গাইল হইতে কাগমারী পর্যন্ত তোরণ নির্মাণ করা হয়। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি সমর্থন না করায় ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে নীতিগত মতভেদ দেখা দেওয়ায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীমহল এবং ইত্তেফাকের মালিক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়া বেসামাল ও জঘন্য ভাষায় ইত্তেফাকের পৃষ্ঠায় বিশেষতঃ তদীয় লিখিত রাজনৈতিক মঞ্চে আমাদিগকে আক্রমণ করেন।

ভাসানীর পদত্যাগ

কাগমারী কাউন্সিল অধিবেশনের পর বিভেদের মেঘ আকাশে ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে থাকে। আওয়ামী লীগ দ্রুত দ্বিধাবিভক্তির পথে অগ্রসর হইতে শুরু করে, একাংশ পশ্চিমা শক্তির অন্যতম দোসর প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে সমর্থন জানায় ও অপরাংশ সামরিক চুক্তি বিরোধী ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির প্রবক্তা বৃদ্ধ নেতা মওলানা ভাসানীকে সমর্থন দেয়। সংগঠনের নির্ধারিত বক্তব্যের প্রতি দেশবাসী ও কর্মীবাহিনীর সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে আমি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় জনসভা ও কর্মীসভায় যোগ দিতে শুরু করি। উক্ত কর্মসূচী মোতাবেক ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত বারহাট্টা, বৈখরহাটী, নেত্রকোনো ও আটপাড়ায় যথাক্রমে ৬, ৮, ১০ ও ১৭ই মার্চ আওয়ামী লীগ কর্মীসভা ও জনসভায় বক্তৃতা দেই। ১৮ই মার্চ আমি কাগমারীতে (সন্তোষ) সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সহিত সাক্ষাৎ করি। মওলানা ভাসানী সংগঠনের সভাপতি পদ হইতে ইস্তফা দানের সিদ্ধান্ত আমাকে জানান। তিনি আমার কোন যুক্তিই শ্রবণ করিতে রাজী হন নাই। বরং তাঁহার পদত্যাগপত্রটি দৈনিক সংবাদ সম্পাদক জহুর

হোসেন চৌধুরীর নিকট পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য আমাকে আদেশ দেন। পদত্যাগ পত্রটি নিম্নরূপঃ

জনাব. পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী সাহেব,

ঢাকা

আরজ এই যে, আমার শরীর ক্রমেই খারাপ হইতেছে এবং কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এইবার খুলিতে হইবে, তদুপরি আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার লীডার সদস্যদের নিকট আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব ২১ দফা ওয়াদা অনুযায়ী জুয়া, ঘোড়দৌড়, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি হারামী কাজ বন্ধ করিতে, সামাজিক ও ধর্মীয় বিবাহ বন্ধনের উপর ট্যাক্স ধার্য করা জনমত অনুযায়ী বাতিল করিতে আবেদন জানাইয়া ব্যর্থ হইয়াছি। ভয়াবহ খাদ্য সংকটেরও কোন প্রতিকার দেখিতেছি না। ২১ দফা দাবীর অন্যান্য দফা যাহাতে অর্থব্যয় খুব কমই হইবে তাহাও কার্যকরী করিবার নমুনা না দেখিয়া আমি আওয়ামী লীগের সভাপতি পদ হইতে পদত্যাগ করিলাম। আমার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন।

ইতি

স্বা-মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী

কাগমারী ১৮/৩/৫৭

'মারি অরি পারি যে কৌশলে'

যদিও আদেশ অনুযায়ী পদত্যাগপত্রটি দৈনিক সংবাদ সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরীর নিকট পৌছাইয়া দিয়াছিলাম। তবে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকেও বিষয়টি জানাই। শেখ সাহেব আমাকে ভুল বুঝিলেন ও আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলায় কর্মী ও জনসভায় প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী অনুসৃত সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা পররাষ্ট্র নীতির বিরুদ্ধে সংগঠনে গৃহীত সাম্রাজ্যবাদী সামরিক চুক্তি বিরোধী পররাষ্ট্রনীতি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার আহবান জানাইতেছিলাম। তাই মার্কিন অনুচর মন্ত্রীমহল আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়। ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগ সহ-সম্পাদক ফজলুর রহমান এবং সফরউদ্দিন শেখ মুজিবুর রহমানেরই প্ররোচনায় আমার বিরুদ্ধে এক দরখাস্ত তাঁহার নিকট দাখিল করেন। দরখাস্তে বর্ণিত অভিযোগ শেখ সাহেব ৩০শে মার্চ (১৯৫৭) পূর্বপাক আওয়ামী লীগ সদর দফতরে (৫৬ সিম্পসন রোড) আহূত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় বিবেচনার জন্য পেশ করেন। অভিযোগের জবাবে আমি শেখ সাহেবকে আওয়ামী লীগ মন্ত্রীমন্ডলীর বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ জনসমক্ষে খন্ডাইতে আহবান জানাই ও আওয়ামী লীগ মন্ত্রীমন্ডলী কর্তৃক সংগঠনের গৃহীত পররাষ্ট্র বিষয়ক ও পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবীর বরখেলাফ নীতি অনুসরণ পরিহার করিতে বলি। সকাল দশ ঘটিকার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। কোন প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়াই সভা মুলতবী রাখা হয়। সন্ধ্যা আট ঘটিকায় পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

জনাব আবুল মনসুর আহমদের সভাপতিত্বে ওয়ার্কিং কমিটির মুলতবী সভা আরম্ভ হয়। মজার ব্যাপার এই যে, এই সময়ে অসুস্থতা বিধায় আবুল মনসুর আহমদ দফতরে সরকারী কাজ করিতে যাইতে পারিতেন না এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার প্রয়োজনে অবস্থান করিতেছিলেন, তথাপি আমাকে সংগঠন হইতে বহিস্কার করিবার জন্য কার্যকরী সংসদের সভায় যোগ দিতে বা সভাপতিত্ব করিতে কোন অসুবিধা বোধ করেন নাই। গরজ বড় বালাই! চতুর মন্ত্রী আবুল মনসুর আহমদ পূর্বাহ্নে সমস্ত রিপোর্ট অবগত হইয়া বুঝিয়াছিলেন যে, সকাল বেলার অধিবেশনে আনীত অভিযোগ বলে আমাকে বহিষ্কার করা সম্ভব নয়। সুতরাং তিনি ভিন্নপথ অবলম্বন করিলেন। দেখা গেল, ক্ষমতাসীনদের নিকট ন্যায়-অন্যায়, প্রাসঙ্গিক-অপ্রসংগিক ও বৈধ-অবৈধ কোন কিছুই বিবেচ্য নয়। পথের কাঁটা দূর করিতেই হইবে সুতরাং 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'। বলাই বাহুল্য যে, এইভাবে একপ্রকার গায়ের জোরেই আমাকে সংগঠন হইতে বরখাস্ত করা হইল। সভায় সভাপতি আবুল মনসুর আহমদ আমাকে প্রশ্ন করেন, "মওলানা ভাসানীর পদত্যাগপত্র 'সংবাদ' সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরীর নিকট দিলেন কেন?' কাগমারীতে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভায় পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থার সদস্যপদ প্রত্যাহারের দাবীতে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল কি"? প্রত্যুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম যে, উভয় প্রশ্নের সঠিক উত্তর কাগমারীতে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভার সভাপতি মওলানা ভাসানীই দিতে পারেন। তজ্জন্য সভা মুলতবী রাখিতে হয় এবং পরবর্তী সভায় মওলানা ভাসানীর উপস্থিতি নিশ্চিত করিতে হয়। প্রশ্নোত্তরে বেকায়দায় পতিত হইলেও নব্য মার্কিনী দোসর মন্ত্রীশ্রেণীর প্রতিনিধি আবুল মনসুর আহমদ হাল ছাড়িবার পাত্র নহেন। হাল ছাড়িলে মার্কিন অনুচর মহলে মর্যাদা ক্ষুণ্ন হইবে যে! তাই জওয়াব শুনিবার পর কালবিলম্ব না করিয়া সভাপতির আসন হইতে স্বয়ং আবুল মনসুর আহমদ প্রস্তাব করিলেন যে, So "Mr Oli Ahad be suspended from the post of the Organising Secreatry"

অর্থাৎ অতএব "মিঃ অলি আহাদকে সাংগঠনিক সম্পাদকের পদ হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হউক।" সর্বমোট ৩৭ জন সদস্যের মধ্যে আমিসহ ৩০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলাম। ৩০ জনের মধ্যে ১৪ জন সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন এবং নিম্নলিখিত ৯ জন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন ও প্রতিবাদে পদত্যাগ করেনঃ

১। ইয়ার মোহাম্মদ খান, এম,পি,এ, কোষাধ্যক্ষ, ২। আবদুল হাই, প্রচার সম্পাদক, ৩। জনাব আবদুস সামাদ, এম,পি,এ, শ্রম সম্পাদক, ৪। সেলিনা বানু, এম,পি,এ, মহিলা সম্পাদিকা, ৫। দবিরউদ্দিন আহমদ, এম,পি,এ, সভাপতি, রংপুর জেলা আওয়ামী লীগ, ৬। হাবিবুর রহমান, এম,পি,এ, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ, ৭। হাতেম আলী খান, এম,পি,এ, ৮। অধ্যাপক আসহাবউদ্দিন আহমদ, এম,পি,এ, ৯। আকবর হোসেন আখন্দ, এম,পি, সভাপতি, বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগ।

রাত ১-৩০ মিনিটে সভা ভঙ্গ হওয়ার সময় নারায়ণগঞ্জ শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি শামসুজ্জোহা সভাস্থলে আসিয়া ফতুল্লা ঘাটে মওলানা ভাসানীর নৌকায় অবস্থানের খবর

আমাদিগকে জানান। আমরা কালবিলম্ব না করিয়া মওলানা ভাসানীর সহিত দেখা করিতে ঘাটমুখে রওয়ানা হই। মওলানা ভাসানীর সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনার পর শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা অভিমুখে রওয়ানা দেন। শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্থানের পর মওলানা ভাসানী নারায়ণগঞ্জ নগর আওয়ামী লীগ সভাপতিকে ৩১শে মার্চ রোজ রবিবার জনসভা আহবান করিবার আদেশ দান করেন। আমি অবাক দৃষ্টিতে মওলানা ভাসানীর মুখপানে তাকাইয়া রহিলাম। আমি তাঁহাকে ওয়ার্কিং কমিটির সভা পুনঃ আহবান করিতে পরামর্শ দান করি এবং ওয়ার্কিং কমিটির মাধ্যমে মন্ত্রীমহলের কারাসাজিকে মোকাবেলা করিবার অনুরোধ জানাই। কিন্তু গঠনতান্ত্রিক পথে সমস্যার সমাধান না করিয়া তিনি নারায়ণগঞ্জ জনসভার মাধ্যমে সাংগঠনিক অন্যায় ক্রিয়াকলাপ প্রতিরোধ করিবার মত অদ্ভুত মানসিকতার পরিচয় দিলেন। ইহার সারমর্ম হইল, সংগঠনের ঐক্যের পথ পরিহার করিয়া বিভেদের দ্বার উন্মুক্ত করা। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইহাই চাহিয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাহারাই জয়ী হইল। মওলানা ভাসানী সংগঠনের সভাপতি। তিনি স্বয়ং ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহবান করিয়া সাংগঠনিক পদক্ষেপ নিতে পারিতেন। কি চমৎকার! বিচারক নিজেই বিচারপ্রার্থী। মওলানা ভাসানী সুস্থ নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হইলেন। চরম সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিতে মওলানা ভাসানী সবসময় পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। ফলে দেশ, জাতি ও জনতা বঞ্চিত হইয়াছে তাঁহার সঠিক নেতৃত্বের সুফল হইতে।

শো-কজ-নোটিশ

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ক্রমশঃ মন্ত্রীমহলের কুক্ষিগত হয়। মওলানা ভাসানী উপায়ন্তর না দেখিয়া ১৮ ও ১৯শে মে বগুড়ায় কৃষক সম্মেলন আহবান করেন এবং খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১লা জুন হইতে অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তদানুযায়ী ১লা জুন হইতে ৭ই জুন অবধি "আত্মশুদ্ধির" নামে অনশনব্রতও পালন করেন। মওলানা ভাসানী অনশনব্রত পালনকালেই ৩রা জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় আমাকে সংগঠন হইতে তিন বৎসরের জন্য বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং ৩০শে মার্চ ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে পদত্যাগী ৯ জন সদস্যের স্থলে নূতন ৯ জন সদস্য কো-অপট করিবার ব্যবস্থা হয়।

৩০শে মার্চ দিবাগত রাত্রে ওয়ার্কিং কমিটির সভায় গৃহীত প্রস্তাব ছিল নিম্নরূপঃ

"Whereas the general Secretary Sheikh Mujibur Rahman has brought certain-charges of indiscipline and disruptive activitics against Mr. Oli Ahad, Organizing Secreatary and whereas after long deliberations has come to the conclusion that a primafacie case has been made out that he has neglected to perform his duties and responsibilities as the organizing Secreatary, this committee hereby resolves that a notice to show-cause within 15 days why he will not be expelled from the organization or otherwise dealt with. The notice will be sent to Mr. Oli Ahad by registered

post. In the meantime Mr. Oli Ahad will remain under suspension as the Organizing Secretary of the party with immediate effect.

অর্থাৎ "যেহেতু সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান জনাব অলি আহাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গ ও বিভেদাত্মক কার্যকলাপের কতিপয় অভিযোগ আনিয়াছেন, এবং যেহেতু দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, জনাব অলি আহাদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক অভিযোগ (কেস) নির্ণীত হইয়াছে এবং যেহেতু ইহাও নির্ণীত হইয়াছে যে, সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে তিনি স্বীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে অবহেলা করিয়াছেন; সুতরাং এই কমিটি এতদ্বারা প্রস্তাব করিতেছে যে, তাঁহাকে কেন সংগঠন হইতে বহিষ্কার করা হইবে না বা অন্যভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না এই মর্মে পনের দিনের মধ্যে কারণ দর্শাইবার জন্য নোটিশ দেওয়া হউক। নোটিশটি রেজিষ্টার্ড ডাকে জনাব অলি আহাদকে পাঠাইতে হইবে। ইতিমধ্যে সাংগঠনিক পদ হইতে তাৎক্ষণিক কার্যকারিতার সহিত জনাব অলি আহাদ সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত থাকিবেন।"

ইতিপূর্বে ২১শে মে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে পদত্যাগী ৯ জন সদস্যের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয় এবং ৩রা জুন ওয়ার্কিং কমিটির সভায় নিম্নলিখিত সদস্যবর্গকে কো-অপট করা হয়। যথাঃ

জসিমউদ্দিন আহমদ সভাপতি, সিলেট আওয়ামী লীগ; আমজাদ হোসেন, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, পাবনা জেলা আওয়ামী লীগ; মুজিবর রহমান, সভাপতি, রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগ; দেওয়ান মহিউদ্দিন আহমদ, বগুড়া; রওশন আলী, সম্পাদক, যশোর জেলা আওয়ামী লীগ ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড চেয়ারম্যান, শামসুল হক, ঢাকা; আজিজ আহমদ, নোয়াখালী এবং মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ। ইহা ছাড়াও বৈঠকে নিম্নলিখিত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। যথা-

আবদুল হামিদ চৌধুরী	-	সাংগঠনিক সম্পাদক
জহুর আহমদ চৌধুরী	-	শ্রম সম্পাদক
অধ্যাপক হাফেজ হাবিবুর রহমান	-	প্রচার সম্পাদক
মিসেস মেহেরুন্নেসা খাতুন	-	মহিলা সম্পাদিকা

৫ই এপ্রিলে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে শত অনুরোধ সত্ত্বেও মওলানা ভাসানী প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর সহিত অর্থপূর্ণ আলোচনা না হওয়া পর্যন্ত পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারে অস্বীকৃতি জানান। এবং আলোচনাকালে তিনি ১৯৫৫ সালের ২৬শে এপ্রিল আইন মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক লিখিত ও দস্তখতকৃত অঙ্গীকারপত্রের কথা "আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমি যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা দাবী ও যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা কনস্টিটিউশন কনভেনশন মারফত শাসনতন্ত্রে স্বীকৃতির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিব। যদি ইহাতে সক্ষম না হই, তবে মন্ত্রীত্ব হইতে পদত্যাগ করিব" স্মরণ করাইয়া দেন। মিনিট বুকে এই বৈঠকের বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হয় নিম্নভাবেঃ(

"Maulana Bhashani has informmed the working committee that

he will withdraw his resignation letter after a discussion with Mr. Suhrawardy on different subject. Therefore the working committee defers dccision on this matter and the meeting is adjourned. The General secretary is authorised to fix the date of the next meeting."

অর্থাৎ 'মওলানা ভাসানী ওয়ার্কিং কমিটিকে এই মর্মে অবহিত করেন যে, জনাব সোহরাওয়ার্দীর সহিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পর তিনি তাঁহার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিয়া নিবেন। সুতরাং ওয়ার্কিং কমিটি এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখে এবং সভা মূলতবী করা হয়। পরবর্তী সভার তারিখ ধার্য করিবার জন্য সাধারণ সম্পাদককে দায়িত্ব দেওয়া হয়।"

সংগঠন হইতে আমার বহিষ্কার, পদত্যাগী ৯ জন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও কর্মকর্তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ, সংগঠনের সভাপতি পদ হইতে মওলানা ভাসানীর পদত্যাগ পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি, ৩১শে মে মন্ত্রীপদ হইতে শেখ মুজিবুর রহমানের পদত্যাগ ১লা জুন মওলানা ভাসানীর অনশন, পশ্চিম পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট শাসন সেপ্টেম্বর অবধি বলবৎ রাখার সিদ্ধান্ত এবং ৩রা এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে মুদ্রা, পররাষ্ট্রবিষয়াদি, দেশরক্ষাকে কেন্দ্রীয় বিষয়ভুক্ত করিয়া পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবীতে প্রস্তাব গ্রহণের পটভূমিকায় ১৩ ও ১৪ই জুন ঢাকায় সাবিস্তান (পিকচার প্যালেস) ও গুলিস্তান সিনেমা হলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

কাউন্সিল অধিবেশনে মওলানা ভাসানী স্বীয় বক্তব্য পেশ করিবার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অধিবেশন হল ত্যাগ করেন। আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সাম্রাজ্যবাদী সামরিক চুক্তি বিরোধী ঐতিহ্য বিস্মৃত হইয়া সংগঠনের পূর্ব সিদ্ধান্ত নাকচকরতঃ জনাব সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রী থাকিবার প্রয়োজনে যুদ্ধজোটে জড়িত হওয়ার পররাষ্ট্রনীতি অনুমোদন করে। কাগমারী কাউন্সিল অধিবেশনের পর মার্কিন মহলে প্রধানমন্ত্রী বেকায়দায় পতিত হইয়াছিলেন। তাহা হইতে উদ্ধার লাভের জন্যই আওয়ামী লীগকে স্বীয় অতীত নীতি বিসর্জন দিতে হইল। আর এইভাবেই আওয়ামী লীগ পরিণত হইল নেতাসর্বস্ব দলে। দ্বিতীয়তঃ এইবারেও এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে, কেহ একই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সদস্য হইতে পারিবে না। সর্বপরি ১৪ই জুন পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ঘোষণা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইয়াছে। মওলানা ভাসানী ও বহুসংখ্যক ত্যাগী কর্মীর অতিকষ্টে গড়া আওয়ামী লীগে এইভাবেই নীতিজ্ঞানহীন রাজনীতির জয়যাত্রা সূচিত হইল।

পররাষ্ট্রনীতি ও স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে মতানৈক্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগকে দ্বিখন্ডিত করে। কাউন্সিল সভায় মওলানা ভাসানীর নীতির পরাজয়ই চরম উপসংহার নয়, যেমন কাগমারী কাউন্সিল অধিবেশনের পর সংগঠনের সভাপতির ঘোষণায় আওয়ামী লীগ রাজনীতির শেষ কথা ছিল না। ষড়যন্ত্রের রাজনীতির গুরু ঠাকুর ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বশংবদ প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার দাবার চালে দুই নেতাকেই পরাভব স্বীকার করিতে হয়। আওয়ামী লীগ হয় দ্বিধাবিভক্ত।

সন্তোষে মওলানা ভাসানীর সাথে বামে মাহ্মুদ আলী, ডানে গ্রন্থকার

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জন্ম

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নেতৃবৃন্দের ১৩ ও ১৬ই জুন দুই দিনব্যাপী ঢাকা বৈঠকে জাতীয় ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদানুযায়ী মওলানা ভাসানী ১৭ই জুন ঘোষণা করেন যে, আগামী ২৫ ও ২৬শে জুলাই (১৯৫৭) ঢাকায় নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মীসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণকল্পে ১লা জুলাই ব্যারিস্টার শওকত আলী খানের সভাপতিত্বে জেলা বোর্ড হলে অনুষ্ঠিত কর্মীসভায় জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খান চেয়ারম্যান ও জনাব মহিউদ্দিন আহমদকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করিয়া ৪৩ সদস্যবিশিষ্ট এক অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারের অন্যতম সদস্য রাজস্বমন্ত্রী জনাব মাহমুদ আলীর নেতৃত্বে পরিচালিত পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল ২১, ২২ ও ২৩শে জুলাই (১৯৫৭) তিনদিনব্যাপী বরিশাল টাউন হলে অনুষ্ঠিত সুপ্রীম (সর্বোচ্চ) কাউন্সিলের অধিবেশনে ঢাকায় আহূত নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মীসম্মেলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে ২৫শে জুলাইর সম্মেলন বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত আরম্ভ হয়। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পাক-ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপকথার নায়ক সীমান্ত প্রদেশের লালকোর্তা নেতা, সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল

গফফার খান, পাঞ্জাবের জননেতা মিঞা ইফতেখার উদ্দিন আহমদ, সিন্ধুর জননেতা ঝানু পার্লামেন্টারিয়ান জি,এম, সৈয়দ, বেলুচিস্তানের ইংরেজ শাসকদের ত্রাস খান আবদুস সামাদ আচাকজাঁই, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক ওসমানী ও অন্যান্য জনবরেণ্য নেতা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই ন্যাশনাল পার্টির সদস্য। পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে এই ন্যাশনাল পার্টির পঁচিশজন সদস্য ছিলেন এবং জি,এম, সৈয়দ ছিলেন উক্ত পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা। সম্মেলনকে বানচাল করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে সরকারী শাসনতন্ত্রের প্রশ্রয় ও আশ্রয়ে চিরাচরিত হীন পন্থায় আওয়ামী লীগ ভাড়াটিয়া গুন্ডা বাহিনী ব্যবহার করে। আওয়ামী লীগের গুন্ডামীতে হতোদ্যমে ও নিরুৎসাহিত না হইয়া সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশপ্রেমিক বন্ধুগণ আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, আরও সচেতন এবং আরও সজাগ হন। তাই শত বাধা-বিপত্তির ঝড় ও ঝঞ্ঝাকে উপেক্ষা করিয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সম্মেলনেই গঠিত হয় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। এই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধানতঃ পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যাশনাল পার্টি, পূর্ব পাকিস্তানের মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আস্থাশীল আওয়ামী লীগ অংশ ও পাকিস্তান গণতন্ত্রীদল সমবায়ে গঠিত পাকিস্তানব্যাপী জাতীয় রাজনৈতিক দল।

সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর তুষ্টি বিধানের তাগিদে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও আতাউর রহমান সরকার পাকিস্তানের স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে অপরাহ্নে পল্টন ময়দানে আহূত জনসভার উদ্যোক্তাদের উপর হিটলারী ঝটিকা বাহিনীকে লেলাইয়া দিয়া পাকিস্তান ধ্বংসের প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করিবার মহৎ কর্মটি সমাধা করেন। দেশপ্রেমের এতবড় অগ্নি পরীক্ষার মুহূর্তে কোন দেশপ্রেমিক পিছ পা হয়? আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবুর রহমান আদর্শ দেশপ্রেমিক বটে। উভয়ের যুগল প্রচেষ্টায় পাকিস্তান সেইদিন নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়! বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অখন্ডত্ব বজায় রাখিবার ব্যাপারে তাঁহাদের উভয়েরই এই জেহাদীপ্রেম নিশ্চিতভাবেই ভবিষ্যৎ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের কাগমারী (সন্তোষ) অধিবেশনে পররাষ্ট্রনীতিকে কেন্দ্র করিয়া উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আত্মগোপনকারী ও নিষিদ্ধ কমউনিস্ট পার্টির গোপন (আন্ডার গ্রাউন্ড) নেতৃত্ব কমরেড মনিসিংহ, কমরেড খোকা রায়, কমরেড আবদুস সালাম ও অন্যান্যকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করিয়া তোলে। দীর্ঘকালের সংগ্রামী রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাপ্রসূত প্রজ্ঞা ও ব্যাপক থিওরিটিকাল জ্ঞান বলে তাঁহারা সম্ভাব্য রাজনৈতিক পরিণতি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁহারা তখনকার ত্বরিত গতিতে প্রবাহিত ঘটনাস্রোতের উপর তীক্ষ্ম ও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছিলেন। বোধহয় দিব্যচক্ষে অবলোকন করিতেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগকে দ্বিখন্ডিত করিয়া সংগ্রামী, সমাজ সচেতন, দেশপ্রেমিক, সৎ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অংশকে সংগঠন হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইতেছে এবং সেইমতে সামন্তবাদ, উঠতি পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অনুচর শ্রেণীর সুপরিকল্পিত সংকল্প ও চক্রান্ত বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে সুচারুভাবে সমাধা হইতে যাইতেছে। অর্থাৎ গণমুখী আওয়ামী লীগ গণবিরোধী ক্যাম্পে পরিণত হইতেছে। স্বাভাবিকভাবেই কমিউনিস্ট

পার্টির আন্ডার গ্রাউন্ড নেতৃত্ব পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দ্বিধাবিভক্তি রোধ করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। কমিউনিষ্ট পার্টির (ওভার গ্রাউন্ড) সহযোগী নেতা ও কর্মীদের ব্যক্তিগত কোন্দল ও প্রাধান্য লাভের প্রচেষ্টা, ঘৃণ্য ও পরোক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং নানা সন্দেহজনক উচ্চমহল হইতে আনুকূল্য লাভের লোভ, আত্মগোপনকারী কমিউনিষ্ট পার্টির সৎ ও অমূল্য পরামর্শ দানের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। পররাষ্ট্র নীতিকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমশঃ আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে মতভেদ চরম আকার ধারণ করে এবং সর্বশেষে মতভেদ পথভেদের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এই মতভেদ ও পথভেদেরই ফসল।

উল্লেখ্য যে, এই সময়ে মওলানা ভাসানী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবুল মনসুর আহমদ উভয়েই ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসারত ছিলেন। সেইখানেই আপোষ-আলোচনার কিছুটা সূত্রপাত হয়। আবুল মনসুর আহমদ আমার বিরুদ্ধে গৃহীত সাংগঠনিক শাস্তিমূলক বহিষ্কারাদেশের প্রত্যাহার ও পদত্যাগী ৯জন নেতাকে পুনর্বহাল করিবার ব্যাপারে একটি আপোষ-রফা প্রস্তাব দিয়াছিলেন। সাংগঠনিক দিক হইতে আওয়ামী লীগ দ্বিধাবিভক্ত হউক, ইহা কখনও আমার কাম্য ছিল না। মওলানা ভাসানী ইহা জানিতেন। তাই আপোষ-রক্ষা প্রস্তাবাবলী আমার নিকট হইতে সযত্নে লুকাইয়া রাখেন।সেই সময়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর প্রতি এত ক্রোধান্বিত ছিলেন যে, হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া জালেম ইস্কান্দার মীর্জার প্রেমে নিমজ্জিত হইয়া পড়েন এবং ইহার ফলে যে কোন সর্বনাশা পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। ইহারই ফলশ্রুতি হইল আওয়ামী লীগের ভাঙ্গন।

দৈনিক ইওেফাক ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির আবির্ভাবকে বিষ নজরে দেখিতে লাগিল। গায়ের জ্বালা মিটাইবার প্রয়াসে মালিক-সম্পাদক জনগণের ভারত বিরোধী মনোভাবের সুযোগ নিয়া ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ইংরেজী সংক্ষিপ্ত নাম এন,এ,পি, কে বিকৃত করিয়া Nehru Aided party অর্থাৎ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সাহায্যপ্রাপ্ত পার্টি সংক্ষেপে ন্যাপ আখ্যা দিয়া ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকে জনগণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর জিরো থিওরীর গোঁড়া প্রচারক ইত্তেফাকের নিকট পরমতসহিষ্ণুতা ছিল অবিদিত ও অবাঞ্ছিত। তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বিরোধী দলীয় মুখপত্রের ভূমিকায় ইত্তেফাক একদা অত্যন্ত সাহসের পরিচয় রাখিয়াছিল। যত বিপত্তি ক্ষমতাসীন হইলেই! জিরো থিওরীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, ক্ষুদ্র ও অনুন্নত দেশগুলির বিশেষতঃ আরব জাহানের বন্ধুত্ব পাকিস্তানের রক্ষাকবচ নয়; একমাত্র মার্কিন বন্ধুত্বই ভারতের বিরুদ্ধে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান দিতে পারে। অতএব দৈনিক ইত্তেফাকের মতে সামরিক চুক্তি ও সামরিক জোট বিরোধী বক্তব্য পাকিস্তান রাষ্ট্রের সর্বনাশের সূচনা করিবে।

সোহরাওয়ার্দীর পদত্যাগঃ যুক্ত ও পৃথক নির্বাচন

প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দক্ষতার সহিত পাশ্চাত্য জগতের সমর্থন অর্জন করিতে সক্ষম হন। কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত পাশ্চাত্য জগতের মোড়ল শক্তিসমূহের সমর্থন হারাইয়া ফেলে এবং একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়ার ভেটো শক্তির আশ্রয়ে জাতিসংঘের

নিরাপত্তা পরিষদে আত্মরক্ষা করিতে থাকে। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিশেষতঃ পশ্চিম পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর জনপ্রিয়তা অর্জন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার ঈর্ষা ও ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সমগ্র পাকিস্তান ব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় ভীত সন্ত্রস্ত ইস্কান্দার মীর্জা ক্ষমতা হারাইবার ভয়ে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার শুরু করেন। রিপাবলিকান পার্টি ইস্কান্দার মীর্জার ইঙ্গিতে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারের উপর হইতে সমর্থন প্রত্যাহার করে। জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন নাই, এই অজুহাতে প্রেসিডেন্ট মীর্জা প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে পদত্যাগ করিতে আহবান জানান। প্রথমতঃ সোহরাওয়ার্দী পদত্যাগ করিতে অস্বীকার করেন ও প্রেসিডেন্টকে জাতীয় সংসদ অধিবেশন আহবান করিতে অনুরোধ জানান। কিন্তু ইস্কান্দার মীর্জা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ঝামেলা এড়াইবার উদ্দেশ্যে সোহরাওয়ার্দী ১১ই অক্টোবর (১৯৫৭) পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। স্মর্তব্য যে, ১৯৫৩ সালে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনকে একইভাবে বরখাস্ত করিয়াছিলেন। পরিতাপের বিষয়, সেই দিন আইনজ্ঞ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় গভর্নর জেনারেলের এক্তিয়ার বহির্ভূত অন্যায় ও অবৈধ আদেশকে প্রকাশ্যে সমর্থন দান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই! সেই গোলাম মোহাম্মদের উত্তরাধিকারী ইস্কান্দার মীর্জার নিকট অনুরূপ আচরণই প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে পাইতে হইল। ইহাকেই বলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। নীতিজ্ঞানহীন রাজনীতির ফল জাতির জন্য কখনও শুভ হইতে পারে না এবং হয়ও নাই। অতঃপর মুসলিম লীগ নেতা আই, আই, চুন্দ্রীগড় প্রধানমন্ত্রীত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি হইলেন পাকিস্তানের ষষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী।

অবস্থার চাপে পাকিস্তান মুসলিম লীগ ১১ই অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে সোহরাওয়ার্দী অনুসৃত পররাষ্ট্র নীতিকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করে এবং এই মর্মে শঙ্কা প্রকাশ করে যে, পাকিস্তান মুসলিম জাহানে বিশেষতঃ মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন জাতীয় স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য কেতাদূরস্ত মার্কিন বশংবদে পরিণত হইয়াছে। এইদিকে পৃথক নির্বাচন প্রথায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে রিপাবলিকান পার্টি চুক্তিবদ্ধ হওয়ায়, মুসলিম লীগ তাহাদের সহযোগিতায় কেন্দ্রে মন্ত্রীসভা গঠন করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু ইহার ফল শুভ হইবে না উপলব্ধি করিতে পারিয়া রিপাবলিকান পার্টি নির্বাচন প্রথার উপর জনমত যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং একটি তথ্য নিরূপণ কমিটি (Fact Finding Committee) গঠন করে। তথ্য নিরূপণ কমিটির সদস্যরা ২রা ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে আগমন করেন। আওয়ামী লীগ একই তারিখে অর্থাৎ ২রা ডিসেম্বর যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ও ৫ই ডিসেম্বর ঢাকার পল্টন ময়দানে যুক্ত নির্বাচনের দাবীতে বিরাট জনসভার আয়োজন করে। একই তারিখে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কেন্দ্রীয় অফিসে প্রাক্তন মন্ত্রী শামসুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কৃষক শ্রমিক পার্টি (আবু হোসেন সরকার গ্রুপ), পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস ও পাকিস্তান সোস্যালিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের সভায়

নিম্নলিখিতদের সমন্বয়ে সর্বদলীয় যুক্ত নির্বাচন সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়ঃ

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হামিদুল হক চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার (প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী), শামসুদ্দিন আহমদ, মাহমুদ আলী, অলি আহাদ, আবদুস সালাম (সম্পাদক, পাকিস্তান অবজারভার), জহুর হোসেন চৌধুরী (সম্পাদক, দৈনিক সংবাদ), কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস (সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেহাদ)।

১১ই ডিসেম্বর (১৯৫৭) চুন্দ্রীগড় সরকার জাতীয় পরিষদে পৃথক নির্বাচনী বিল উত্থাপনের উদ্যোগ নেয়। সর্বদলীয় যুক্ত নির্বাচন সংগ্রাম পরিষদ ১১ই ডিসেম্বরেই যুক্ত নির্বাচন দিবস পালন করে। জনমতের প্রবল চাপে রিপাবলিকান পার্টি যুক্ত নির্বাচন সমর্থন করিতে বাধ্য হয়। মুসলিম লীগ প্রধানমন্ত্রী পৃথক নির্বাচন প্রথার সমর্থক বিধায় প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে পদত্যাগ করেন এবং তদস্থলে মালিক ফিরোজ খান নূন নূতন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

পশ্চিম পাকিস্তান সফর

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় যোগ দিতে পেশওয়ারের পথে আমরা লাহোর যাত্রা করি এবং দলীয় নেতা মিঞা ইফতেখার উদ্দিনের আতিথ্য গ্রহণ করি। ৩রা নভেম্বর (১৯৫৭) মাওলানা ভাসানী লাহোরের মুচীগেটে এক জনসভায় ভাষণ দান করেন। পেশওয়ারে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জাতীয় কমিটির সভায় পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বিলুপ্ত করিয়া সাবেক চারটি প্রদেশ পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও সিন্ধু প্রদেশ অবিলম্বে পুনর্বহাল না করিলে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাব করেন সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফার খান। স্মর্তব্য যে, ১৭ই সেপ্টেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদে এক ইউনিট বিলুপ্তির প্রস্তাব গৃহীত হয়। পাঞ্জাবের মিঞা ইফতেখার উদ্দিন ও সংগঠনের সভাপতি মাওলানা ভাসানী স্বয়ং আইন অমান্য আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোজাফফর আহমদ ও মোঃ তোয়াহা পাঞ্জাবের মিঞা ইফতেখার উদ্দিনের সহিত কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া 'আইন অমান্য আন্দোলন সময়োচিত নহে' বলিয়া রায় দেন। তাঁহারা আরো দাবী করেন যে, আইন অমান্য আন্দোলনের অজুহাতে সাধারণ নির্বাচন বানচাল করা হইবে এবং দেশে সামরিক শাসনের প্রবর্তন হইবে। আমি আইন অমান্য আন্দোলনের প্রতি জোর সমর্থন জানাই এবং মন্তব্য করি যে, জনতা আন্দোলনমুখর না হইলেই ক্ষমতাবিলাসী উচ্চমহল সাম্রাজ্যবাদী দোসরদের সহায়তায় দেশে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নিবে। মাওলানা ভাসানী ও অন্যান্য লোকদের অনুরোধে খান আবদুল গফফার খান আমাকে আইন অমান্য আন্দোলন দাবী আপাততঃ স্থগিত রাখিবার অনুরোধ করেন। প্রস্তাবক স্বয়ং প্রস্তাব প্রত্যাহার করায় আমার নিশ্চুপ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। পাঠান নেতা সরল বিশ্বাসেই তাঁহাদের আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে নেতৃবৃন্দ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবেন কিন্তু সেই 'অদূর ভবিষ্যৎ' আর কখনও আসে নাই। শুধু তাই নয়, দলের শীর্ষ নেতা ঘটনাপ্রবাহে ইস্কান্দার মীর্জার ষড়যন্ত্র জালের ইচ্ছুক শিকারে পরিণত হন ও দেশের জন্য সর্বনাশা ভবিষ্যৎ ডাকিয়া আনেন।

ন্যাপ প্রার্থীদের পরাজয়বরণ

পশ্চিম পাকিস্তান সফরান্তে ঢাকা পৌছিয়াই সিরাজগঞ্জ, কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত বুড়িচং-কসবা ও রংপুর জেলার অন্তর্গত মিঠাপুকুর-পীরগাছা উপনির্বাচনে যথাক্রমে আমাদের প্রার্থী তমিজুল ইসলাম, অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম ও আবদুল জলিলকে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি মনোনীত প্রার্থী হিসাবে শাসক আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনী ভোটাধিক্যে পরাজয়বরণ করিতে হয়। পরাজয়বরণ করিবার কারণ, জনগণ আওয়ামী লীগের প্রচারণায় বিশ্বাস করিয়াছিল যে, আমরা আল্লাহ বিরোধী কমিউনিস্ট প্রভাবান্বিত ভোট প্রার্থীদল এবং হিন্দুস্থানের দালাল হিসাবে পাকিস্তান ধ্বংসের ভূমিকায় অবতীর্ণ।

সীমান্তে পাচার বিরোধী অভিযান

সীমান্তে অস্বাভাবিক পাচারের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জাতীয় অর্থনীতির প্রয়োজনেই সীমান্তে পাচার বন্ধ করিবার জন্য সেনাবাহিনী নিয়োজিত করা হয়। এই ব্যবস্থা 'ক্লোজ ডোর অপারেশন' (Close Door Operation) নামে পরিচিতি লাভ করে। পাচার বন্ধ করিবার মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই সরকার কতিপয় আওয়ামী লীগের অধিকাংশ বর্ডার অফিসার স্বীয় দায়িত্বজ্ঞান হারাইয়া লোভ-লালসার শিকারে পরিণত হয়। ভূত তাড়াইবার নিমিত্ত ব্যবহৃত সরিষাই ভূতের আস্তানায় পরিণত হওয়ার বহুল প্রচলিত গ্রাম্য প্রবচনটিই আওয়ামী লীগ কর্মীদের ব্যাপারে নির্মম সত্যের রূপ নেয়। তবে ইহার ব্যতিক্রমও ছিল। আমার জানার মধ্যে আখাউড়া-সীমান্তে কর্মরত নোয়াখালী আওয়ামী লীগ নেতা আবদুস সালাম সর্বপ্রকার লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে থাকিয়াও প্রাণহানির চক্রান্ত উপেক্ষা করিয়া স্বীয় নির্মল চরিত্রের সাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টায় সীমান্ত এলাকায় পাচার প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। এইদিকে সেনাবাহিনীর পাচার বিরোধী কঠোর অভিযান সংখ্যালঘু প্রতিনিধিদের কঠোর সমালোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। ইহা দুঃখজনক কিন্তু সত্য। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তোষণপ্রিয়তার কারণে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের নগণ্যসংখ্যক প্রতিনিধিও স্বীয় জ্ঞাত ও অজ্ঞাত স্বার্থে পাচার বিরোধী কঠোর ব্যবস্থাকে প্রকাশ্য সমালোচনা করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

শাহেদ আলীর মৃত্যু

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবর রহমানকে বাড়ী-গাড়ীসহ মোটা ভাতা নির্দিষ্ট করিয়া পাকিস্তান টি বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন এমনকি তিনি শেখ সাহেবকে দামী লিমুজিন গাড়ীও উপহার দেন। শুধু তাই নয়, তাঁহাকে শান্ত করিবার মানসে বিদেশে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসাবেও প্রেরণ করেন। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া শেখ সাহেবকে উক্ত মর্যাদা দিতে অস্বীকৃতি

জানাইলে শেখ সাহেব জাতীয় পরিষদ সদস্যরূপে রাশিয়া মুখে রওয়ানা হন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীত্ব হইতে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের পদত্যাগের পর পরই পাকিস্তান সরকার শেখ সাহেবকে জেনেভা হইতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দান করেন।

নানা কারণ ও অজুহাতে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন পার্লামেন্টারী পার্টির একাংশ আওয়ামী লীগ দলীয় মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের বিরুদ্ধে উপদল গঠন করিবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। মিঃ রসরাজ মন্ডলের নেতৃত্বে 'সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন ভুক্ত' কতিপয় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, দ্বিতীয়তঃ উত্তরবঙ্গ প্রদেশের দাবীতে আওয়ামী লীগ দলীয় কতিপয় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, তৃতীয়তঃ 'ক্লোজ ডোর অপারেশন' (Close door Operation) -এর ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত কংগ্রেস দলীয় কতিপয় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য আতাউর রহমান খান সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য উষ্মা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রধান মওলানা ভাসানী ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশও আতাউর রহমান খান মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপনের পক্ষপাতি ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই ত্রিশঙ্কু অবস্থা লক্ষ্য করিয়া দ্বিধাবিভক্ত কৃষক-শ্রমিক পার্টি আভ্যন্তরীণ কোন্দল ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সৈয়দ আজিজুল হক স্বীয় নেতৃত্বের দাবী ত্যাগ করিয়া পার্লামেন্টারী নেতা সাবেক মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে আস্থা জ্ঞাপন করেন।

বিরোধী দলসমূহের ঐক্যবদ্ধ চাপ ও আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান নিকট ভবিষ্যতে ভরাডুবির আশংকায় ৩০শে মার্চ গভর্নর শেরে বাংলাকে প্রাদেশিক পরিষদ অধিবেশন মুলতবী রাখিবার আহবান জানান। বৈরী গভর্নর মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান সরকারের প্রতি অধিকাংশ অর্থাৎ সংখ্যাগুরু সদস্যের আস্থা নাই অজুহাতে তাঁহাকে পদচ্যুত করেন ও আবু হোসেন সরকারকে মন্ত্রীসভা গঠনের আহবান জানান। নূতন মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরই তাঁহার পরামর্শে গভর্নর প্রাদেশিক পরিষদ মুলতবী ঘোষণা করেন। এই দিকে জনাব সোহরাওয়ার্দীর অনুরোধে কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নূন ৩১শে মার্চ শেরে বাংলাকে গভর্নর পদ হইতে অপসারণ করেন এবং ১লা এপ্রিল প্রদেশের চীফ সেক্রেটারী অস্থায়ী গভর্নরের দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার এক ঘন্টার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারকে পদচ্যুত করেন। পুনর্বার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে জনাব আতাউর রহমান খান ৯ সদস্যবিশিষ্ট সরকার গঠন করেন। নীতিজ্ঞান বিবর্জিত ও ক্ষমতার লালসাসর্বস্ব এই রাজনীতির খেলা দেশবাসীকে হতবাক ও বিক্ষুব্ধ করে। ফলশ্রুতিতে সামরিক অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়। দর্শকদের জন্য খেলা এইখানেই শেষ হয় বটে, কিন্তু পর্দার অন্তরালে খেলা অব্যাহত থাকে। আওয়ামী লীগ জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রচেষ্টায় পুনঃ দেশব্যাপী অবাঙ্গালী বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ৪ঠা জুন (১৯৫৮) করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈমাত্রেয়সুলভ আচরণ, কেন্দ্রীয় সামরিক-বেসামরিক চাকুরীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চনার ঘোরতর ও গভীর অভিযোগ প্রকাশ্যে আনয়ন করেন। এইভাবেই ১৯৫৯ সালের মার্চের সাধারণ

নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার কড়ি অগ্রভাগেই আদায় করিয়া রাখিবার প্রয়াস পান। সত্যই ক্ষমতার রাজনীতির গতি কি বিচিত্র।

১৮ই জুন প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে তেত্রিশ সদস্যবিশিষ্ট ন্যাপ নিরপেক্ষ থাকিবার দরুন আতাউর রহমান খান সরকার সংখ্যাধিক্য হারাইয়া ফেলেন এবং ১৯শে জুন আবু হোসেন সরকার পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। কিন্তু ২২শে জুন অনাস্থা ভোটে আবু হোসেন মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। কেননা, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ভুক্ত পরিষদ সদস্যবর্গ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিল। ২৫শে জুন (১৯৫৮) পূর্ব পাকিস্তানে পুনরায় প্রেসিডেন্ট শাসন প্রবর্তিত হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বিরোধী জনমত এত প্রবল ছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে তদন্তের জন্য আখতার হোসেনের নেতৃত্বে একটি ইনকোয়ারী কমিটি গঠন করিতে বাধ্য হন। ইনকোয়ারী কমিটি পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশে লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিয়োগের পরামর্শ দেন। লক্ষণীয় যে, আওয়ামী লীগ ব্যতীত অন্যান্য রাজনৈতিক দল এক ইউনিট বিলোপ করিয়া সাবেক প্রদেশ গঠন করিবার দাবী করিতেছিল।

পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাংগঠনিক কমিটি ৩০ ও ৩১শে মে (১৯৫৮) করাচীতে অনুষ্ঠিত সভায় ১৯৫৯ সালের প্রথমার্ধে সম্ভাব্য সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন দান কল্পে পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করে। কমিটি পূর্ব পাকিস্তানে আতাউর রহমান খান সরকারকে সমর্থন দানের জন্য পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপ সদস্যদের কঠোর সমালোচনাও করে। বৈঠকে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ড ঢাকা অধিবেশনে এই বিষয়ে চূড়ান্ত রায় দিবে। কেন্দ্রীয় রাজস্বে নির্মিত রাজধানী করাচীকে পশ্চিম পাকিস্তান ভুক্তির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির সভায় আমি একটি প্রস্তাব পেশ করি। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমটি প্রস্তাবটি সুচতুর-ভাবে এড়াইয়া যায়। ইহারই প্রতিবাদে ১লা জুন (১৯৫৮) আমি উক্ত কমিটি হইতে পদত্যাগ করি।

কিছুকালের মধ্যেই মাওলানা ভাসানী বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগদানের নিমিত্ত স্টকহোম গমন করেন। স্টকহোম অবস্থানকালে মিসরের রাষ্ট্রদূত মাওলানা ভাসানীকে মিসর সফরের আমন্ত্রণ জানান। তদানুযায়ী মাওলানা ভাসানী মিসর গমন করেন ও প্রেসিডেন্ট নাসেরের সহিত আলোচনাকালে তিনি তাঁহাকে সমগ্র জনতার অকুণ্ঠ সমর্থনের বার্তা পৌঁছাইয়া দেন। প্রায় দুই মাস পর মাওলানা ভাসানী ১১ই সেপ্টেম্বর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যে ২২শে জুলাই আতাউর রহমান খান পুনরায় মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের নবম সরকার গঠন করিয়াছিলেন।

সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখ প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন আহূত হয়। সরকার দলীয় স্পীকার আবদুল হাকিমের সহিত মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীকে পরিষদের কার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়ার মানসে স্পীকার আবদুল হাকিমের বিরুদ্ধে দেওয়ান মাহবুব আলী (ন্যাপ সদস্য) অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করেন এবং সরকার অনাস্থা প্রস্তাব সংখ্যাধিক্য ভোটে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া দাবী করেন। মজার ব্যাপার,

পরক্ষণেই সরকারী দলভুক্ত পিটার পল গোমেজ (কংগ্রেস) স্পীকার আবদুল হাকিমকে 'পাগল' ঘোষণা করিয়া একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং উক্ত প্রস্তাব গৃহীতও হয়। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছিল যেন পাগলামীর প্রতিযোগিতায় সবাই অবতীর্ণ; দেশ ও জাতি গৌণ। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল পরিষদ অভ্যন্তরে দাঙ্গা। ২৩শে সেপ্টেম্বর দেশবাসী অধিবেশন নাটকের উপসংহার অবলোকন করেন ভারপ্রাপ্ত স্পীকার শাহেদ আলী পরিষদ অভ্যন্তরেই মারাত্মক ভাবে আহত হন এবং ২৬শে সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক পরিষদ অধিবেশন মূলতবী ঘোষণা করা হয় এবং ইহার যবনিকাপাত ঘটে ৭ই অক্টোবর দেশব্যাপী সামরিক শাসন প্রবর্তনের মাধ্যমে।

ইস্কান্দার মীর্জার অপসারণ

আওয়ামী লীগ ১৯৫৯ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পাকাপাকি বুঝাপড়ার ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নূনের কেন্দ্রীয় সরকারকে সমর্থনদানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে। তদানুযায়ী ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৯) সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ধার্য হয়। ক্ষমতা পিপাসু আওয়ামী লীগ ২রা অক্টোবর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগ দেয় এবং দফতর বন্টন বিষয়ে অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগ মন্ত্রীবর্গ ৭ই অক্টোবর (১৯৫৮) পদত্যাগ করে। ৭ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা স্বীয় করাচী বাসভবনে প্রধানমন্ত্রী নূন ও তাঁহার মন্ত্রীদের মন্ত্রীসভার সদস্যবর্গকে এক পার্টিতে আমন্ত্রণ জানান। উপস্থিত আমন্ত্রিত মন্ত্রীদের মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় মন্ত্রীবর্গও ছিলেন। ৭ই অক্টোবর মধ্যরাত্রিতেই ইস্কান্দার মীর্জা বিশেষ ঘোষণায় সমগ্র দেশব্যাপী সামরিক আইন ঘোষণা করেন; কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করেন, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বাতিল করেন, সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত ঘোষণা করেন ও সংবিধান রহিত করেন এবং সেনাধ্যক্ষ জেনারেল মোঃ আইউব খানকে প্রধান সামরিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

সমগ্র পাকিস্তানব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে সোহরাওয়ার্দী-গুরমানী সমঝোতা বা আঁতাত প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জাকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাই প্রেসিডেন্ট মীর্জা নির্বাচন বানচাল করিবার ফিকিরে সবাত্মক প্রচেষ্টা নেন। ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ ব্রহ্মদেশে সেনাপতি জেনারেল নে উইনের সামরিক ক্ষমতা দখল প্রেসিডেন্ট মীর্জাকে অভীষ্ট সিদ্ধির সহজ পথটি বাতলাইয়া দেয়। কালাত রাজ্যের শাসক মীর আহমদ ইয়ার খান কর্তৃক পাকিস্তান রাষ্ট্রে যোগ দেওয়ার ঘটনাকে অস্বীকার করিয়া কালাতের স্বাধীনতা ঘোষণা, পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন চলাকালে পরিষদে মারামারি ও হাতাহাতি এবং পরিষদের ভারপ্রাপ্ত স্পীকারের পরিষদ মিলনায়তনে আঘাতজনিত কারণে হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ, পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশকে ভাঙ্গিয়া সাবেক প্রদেশগুলি পুনবর্হালের জোর আন্দোলন ও প্রচেষ্টা, প্রাদেশিক পরিষদগুলিতে মন্ত্রীত্ব লোভে সীমাহীন নির্লজ্জ তৎপরতা, জাতীয় এবং প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা এবং তদসমর্থক পরিষদ সদস্য ও দলীয় কর্মীদের বলগাহীন দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ, ১৯৫৭ সালের ৯ই মে আততায়ীর ছুরিকাঘাতে

ডাঃ খান সাহেবের মৃত্যুবরণ, পাকিস্তান মুসলিম লীগ কর্তৃক সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত ইত্যাকার ঘটনা সমগ্র দেশে এক উচ্ছৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। প্রাসাদ চক্রান্ত রাজনীতির পাকা খেলোয়াড় প্রেসিডেন্ট মীর্জা ইহারই পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। বলাই বাহুল্য, দেশে সামরিক শাসন জারি করিয়া স্বীয় ব্যক্তি শাসন প্রতিষ্ঠার জঘন্য পদক্ষেপ গ্রহণ ছিল তাহার পূর্ব পরিকল্পিত। কেননা, প্রেসিডেন্ট মীর্জাই উপরোল্লিখিত ঘটনাবলীর নেপথ্য নায়ক। কিন্তু ইহা ভাগ্যেরই নির্মম পরিহাস বলিতে হইবে যে, শেষ পর্যন্ত এই প্রেসিডেন্ট মীর্জাকেই ২৭শে অক্টোবর (১৯৫৮) জেনারেল আইউব খানের নিকট সমগ্র দায়িত্ব অর্পণ করিয়া দেশত্যাগী হইতে হয়। কে জানিত যে, রাজনীতিবিদদের দিকে নজর রাখিয়া একদা তিনি যে 'While the going is good' অর্থাৎ 'দেশত্যাগই শ্রেয়ঃ' বলিয়া বক্রোক্তি করিয়াছিলেন, স্বল্প সময়ের মধ্যে তাহা তাঁহারই বেলায় প্রযোজ্য হইবে। ষড়যন্ত্রের শিরোমণিকে পাল্টা ষড়যন্ত্রই চরম আঘাত হানে। পরবর্তীকালে ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে বক্তৃতাদানকালে বিরোধী দলীয় নেতা সরদার বাহাদুর খান এই চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস করিয়াছিলেন যে, "মার্কিন সরকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জাকে দেশে সামরিক আইন জারি করিতে বাধ্য করে।" অথচ ইস্কান্দার মীর্জার পদচ্যুতির সময় মার্কিন সরকার নীরব দর্শক ছিলেন মাত্র। আবার সাধারণ নির্বাচন বানচাল করিবার ব্যাপারে ইস্কান্দার মীর্জার প্রয়াসে মদদ জোগাইয়া সোহরাওয়ার্দীর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করিতেও মার্কিন সরকার সামান্যতম ইতস্ততঃ করেন নাই। ইহাকেই বলে "বড়র পিরীত বালির বাঁধ।" বিশ্বাসঘাতকতা ও হতাশাই অসম প্রেমকে ক্ষতবিক্ষত করে। মান যায়, জাতি যায়, কুল যায় কিন্তু আরাধ্যজনের কৃপার দেখা পাওয়া যায় না। সহজ সরল চিরন্তন সত্যটি নেতা সোহরাওয়ার্দী অনুধাবন করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। মার্কিন প্রেমে মশগুল হইয়া সোহরাওয়ার্দী আরব জাহান, মুসলিম জাহান ও তৃতীয় বিশ্বের কঠোর সমালোচনার পাত্রে পরিণত হইতেও দ্বিধা করে নাই। এমনকি স্বীয় জনগণের নিকটও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির খুঁটি হিসাবে পরিচিতি অর্জন করিলেন। অদৃষ্টের আরো নির্মম পরিহাস এই সঙ্গেই লক্ষণীয়। তাঁহার হাতে গড়া শেখ মুজিবর রহমানকেও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের নায়ক হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় সরকারের সাক্ষীগোপাল নায়কের অবাঞ্ছিত পরিচয় লইয়াই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থানে ধরাধাম হইতে বিদায় নিতে হইয়াছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ

প্রশ্ন উঠিতে পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপরোল্লিখিত মারাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণে কেন উৎসাহিত হইয়াছিল ? প্রথমতঃ পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি খান আবদুল কাইয়ুম খানের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রকাশ্য ভূমিকা ও পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বিলুপ্তির ব্যাপারে ঐকমত্য এবং গফফার খান, কাইয়ুম খান, মমতাজ দৌলতানা, মিঞা ইফতেখার উদ্দীন, আইউব খুরো, জি, এম, সৈয়দের নেতৃত্বের সমঝোতার ফলে ১৯৫৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন নির্বাচনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘেঁষা আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বদলে মার্কিন বিরোধী শক্তি কর্তৃক পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থাৎ সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানে বিপুল ভোটে জয়ী

হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। দ্বিতীয়তঃ যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হওয়ায় ভারতবিরোধী ভূমিকার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে শহীদ সোহরাওয়ার্দী পরিচালিত আওয়ামী লীগের নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। উপরে বর্ণিত বাস্তব তথ্যাবলীর এই বিশ্লেষণই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে স্বীয় স্বার্থে ভিন্ন সিদ্ধান্তগ্রহণে বাধ্য করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাই জননেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীর চেয়ে সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের প্রতিভূ জেনারেল আইউব খান ও ইস্কান্দার মীর্জাই মার্কিন স্বার্থে অধিক প্রিয় হইয়া উঠিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে জনাব সোহরাওয়ার্দী অনুসৃত পথ কন্টাকাপূর্ণ ও বিপজ্জনক ছিল। মার্কিন প্রভুর এই অভিপ্রায় ছাড়াও সেনাপতি মোঃ আইউব খান ও প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার ক্ষমতা দখলের ব্যক্তিগত অভিলাষও কম ছিল না। স্বার্থান্ধ, দুর্নীতিপরায়ণ ও দুর্বলচিত্ত নেতৃত্ব এইভাবেই দেশ ও জাতিকে বৈদেশিক শক্তির ক্রীড়নকে পরিণত করে। অর্থাৎ দেশ ও জাতি স্বনির্ভর না হইয়া পরনির্ভর হয়।

আগেই বলিয়াছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক চুক্তি মোতাবেক পাকস্তানে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণে অধিকারপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ভূমণ্ডলীয় সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্বার্থে এবং চীন-সোভিয়েট রাশিয়ার রাজনৈতিক প্রভাব ও সামরিক শক্তি খর্ব করিবার প্রয়াসে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে তাবেদার প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের আনুকূল্যে মার্কিন শক্তি এইভাবেই সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করিত। তদানুসারে পেশওয়ারে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি নির্মিত হয়। সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী এই সামরিক চুক্তি বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃত্ব সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করিলে মার্কিন সরকারের ভূমন্ডলীয় পরিকল্পনা পাকিস্তানের মাটিতে প্রচন্ড মার খাইবার আশংকা ছিল। এই ব্যাপারে বিশেষভাবে শঙ্কিত মার্কিন কূটনীতি পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন বানচালের ভূমিকা গ্রহণ করে এবং তাঁহাদের বশংবদ ইস্কান্দার মীর্জা ও সেনাপতি আইউব খানকে সক্রিয় সহায়তার দ্বারা সামরিক আইন প্রবর্তন করিতে প্ররোচিত করে।

৪৭-৫৭ দশকের দুর্নীতি

১৯৪৭ হইতে ১৯৫৭ এই এক দশকের প্রতিনিধিত্বশীল সরকার, আধা সামরিক সরকার ইত্যাদি জগাখিচুড়ী উত্থান-পতনের অবসান ঘটে ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর মধ্যরাত্রির সামরিক অভ্যুত্থানে। প্রতিনিধিত্বশীল সরকারে আস্থাশীল কায়েদে আযমের ইহলোক ত্যাগের অব্যবহিত পর হইতেই পাকিস্তানে ক্ষমতাদ্বন্দ্বপ্রসূত প্রাসাদ রাজনীতির উদ্ভব হয়। ১৯৫১ সালে মেজর জেনারেল আকবর খানের ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান উচ্চাভিলাষী গোষ্ঠীর সম্মুখে ক্ষমতা দখল ও কুক্ষিগত করণের নূতন দ্বার উন্মোচন করে। সামরিক-বেসামরিক আমলা সম্প্রদায় ও কায়েমী স্বার্থের রক্ষক প্রাসাদ রাজনীতিবিদ চক্র ক্রমশঃ বিদেশী শক্তির সাহায্য-সহযোগিতায় ক্ষমতা লাভের বিনিময়ে সামরিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব বিদেশী শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে তুলিয়া দিতে থাকে। ঘটনার বিবর্তনে এবং ক্ষমতাসীনদের উত্থান-পতনে জনসাধারণ সরকার হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং অসহায় নীরব দর্শকে পরিণত হয়। শাসন-শোষণই ছিল রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের 'মূলমন্ত্র'। দুর্নীতি ছিল মন্ত্রী, মেম্বার ও সরকারী আমলাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাঁহারা অবৈধ পথে প্রচুর ধন-সম্পদ

কুক্ষিগত করিয়া যোগ্যতা ও সততার কি অমূল্য নিদর্শনই না ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন।

মুসলিম লীগ, যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-মেম্বার, নেতা-উপনেতা দেশসেবার বদৌলতে ঢাকায় স্ব-স্ব বাড়ী-ঘর নির্মাণে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দেন। ধানমন্ডি এলাকায় আওয়ামী লীগ সদস্যদের নির্মিত ঘরবাড়ীসমূহ আওয়ামী লীগ কলোনি আখ্যা পায়। ইহা আওয়ামী লীগ সরকারের অকৃত্রিম জনসেবার অতুলনীয় স্বাক্ষর বটে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নির্লজ্জ আচরণ সেক্রেটারিয়েটের মহাজন আমলাদিগকে তাঁহাদের অবাঞ্ছিত পদাংক অনুসরণ করিতে উৎসাহিত করে এবং আমলাগোষ্ঠী সংখ্যাধিক্য বিধায় লুটপাটের সিংহভাগ তাহারাই পায়। পাকিস্তান সুপিরিয়র সার্ভিসভুক্ত সিভিল সার্ভিস, পুলিশ সার্ভিস, ফাইনান্স সার্ভিস ইত্যাদির অন্তর্গত কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের শতকরা ৯৫ জন ছিলেন দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তাঁহারা চাকুরীর প্রথম জীবনে ছিলেন ৩ শত হইতে ৫ শত টাকার বেতনভুক্ত কর্মচারী। অথচ প্রশাসনিক ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ও অপব্যবহার দ্বারা স্বীয় জীবন ভোগের উদগ্র বাসনায় চরম অসুদপায় অবলম্বনে তাহারা কোন সময়ই কুণ্ঠিত হন নাই এবং বিপুল অর্থোপার্জনের মাধ্যমে এই দেশে তাহারাই 'রামরাজত্ব' কায়েম করিয়াছিলেন। ৩, ৪ অথবা ৫ বৎসরের চাকুরী জীবনে রাজধানী ঢাকা অথবা বন্দর শহর চট্টগ্রাম বা খুলনার বুকে সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ বা ক্রয়, শহরে, গ্রামে-গঞ্জে জোতজমি ক্রয়, স্বীয় ব্যবহারের জন্য গাড়ী ক্রয়, ঠাঁট বজায় রাখিবার অতিরিক্ত জিনিসপত্র যথাঃ রেফ্রিজারেটর, দামী কার্পেট, ড্রইং রুম সেট, ডাইনিং হলসেট, সহধর্মিনীর শাড়ী-গহনা ক্রয়, দেশে-বিদেশে স্বনামে-বেনামে ব্যাংক ব্যালান্সের মোহ তাহাদের পাইয়া বসিয়াছিল। ৩ শত, ৫ শত এমন কি হাজার দুই হাজার টাকা বেতনভোগী সরকারী কর্মচারীদের জীবনে এইসব ছিল রূপকথার কাহিনীর ন্যায়। পিতৃ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নগণ্যসংখ্যক সরকারী কর্মচারী ব্যতীত অধিকাংশের বেলায়ই ইহা ছিল অকাট্য সত্য। জীবন ও যৌবন ভোগের উন্মত্ত নেশায় তাহাদের সচেতন অপরাধ প্রবণতা জাতিকে দুর্নীতির অতল গহবরে নিমজ্জিত করে। এতদবর্ণিত জাতিদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, নীতিদ্রোহী জীবশ্রেণীর বিরুদ্ধে যাহারা কণ্ঠকে সোচ্চার রাখিয়াছিলেন, তাহাদিগকে প্রশাসনিক ক্ষমতার দাপটের শিকার হইতে হইত ও পুনঃ পুনঃ কারাবরণ ছিল তাহাদের জন্য অবধারিত। মাওলানা ভাসানীর বিশাল ব্যক্তিত্বকেও বার বার কারা নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে। খোলাফায়ে রাশেদীন ইসলামী জীবনবোধ ও মূল্যবোধ বাস্তবায়নের স্বর্ণযুগ ছিল। মাওলানা ভাসানী সেই যুগের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। পক্ষান্তরে পাকিস্তানী শাসনদন্ডের নায়কবৃন্দ যথা-নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান, গোলাম মোহাম্মদ, ইস্কান্দার মীর্জা, শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ ইসলামী জীবনদর্শন নির্দেশিত জীবনবোধ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে ছিলেন পর্বতপ্রমাণ বাধা। তাঁহাদের বক্তৃতা-ভাষণে একদিকে ইসলামী জীবনদর্শনের গভীর তাৎপর্য ও ব্যবহারিক জীবনে উহার রূপায়নের খই ফুটিত এবং অন্যদিকে তাঁহারাই আবার মাওলানাকে 'লুঙ্গীসর্বস্ব' 'ইসলামের শত্রু' 'পাকিস্তানের শত্রু' 'ভারতের চর' ইত্যাদি হীন আখ্যায়িত করিতে সামান্যতম ক্লেশ বোধ করেন নাই।

জাতীয় চরিত্রের অবক্ষয়কালে জনগণ আদর্শচ্যুত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া আত্মশক্তি হারাইয়া ফেলে ও বহিঃশক্তির নিকট অবচেতন অবস্থায় আত্মসমর্পণ করে। আত্মিক শক্তির পরাভব ও অবলুপ্তির এই সন্ধিক্ষণেই ইস্কান্দার মীর্জা আইউব খানের অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানান এবং এইভাবেই জনগণের সার্বভৌমত্বের অস্বীকৃতির উপর জেনারেল আইউব খানের একনায়কত্বের ভিত রচিত হয়।

'৫৮ সালের সামরিক শাসন

গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ সর্বপ্রথম রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা সেনাধ্যক্ষ জেনারেল আইউব খান ৭ই অক্টোবর (১৯৫৮) দিবাগত মধ্যরাত্রিতে সর্বময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন। জেনারেল আইউব খান প্রধান সামরিক শাসনকর্তার দায়িত্বভার গ্রহণের কয়েকদিনের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তান সফরে ঢাকা আগমন করেন ও ঢাকা স্টেডিয়ামে এক বিশাল জনসভায় ভাষণদান করেন। অনস্বীকার্য যে, দুর্নীতির দরুন লোকচোখে হেয় রাজনীতিবিদদের রাজনৈতিক অঙ্গন হইতে বিদায় দেওয়ার কারণে সামরিক অভ্যুত্থানে জনগণ সেই সময়ে আনন্দিত হইয়াছিল এবং জেনারেল আইউব খান সাধারণ লোকের প্রাণঢালা সমর্থনও লাভ করিয়াছিলেন। জেনারেল আইউব খান ঢাকা অবস্থানকালেই ২৪শে অক্টোবর (১৯৫৮) প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা জেনারেল আইউব খানকে ১২ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রীসভার প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন এবং লেঃ জেঃ মুসাকে জেনারেল পদে উন্নীত করিয়া প্রধান সেনাপতির পদ দান করেন। ২৭শে অক্টোবর সকাল ১০টায় জেনারেল আইউব খান প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। দিবা অবসানের কিয়ৎকালের মধ্যেই লেঃ জেঃ আজম খান, লেঃ জেঃ কে, এম, শেখ, লেঃ জেঃ ডবলিউ, এ, বাকী প্রেসিডেন্ট মীর্জার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে পদত্যাগপত্র সহি করিতে বাধ্য করেন। পদত্যাগপত্র সহি করিয়া সস্ত্রীক লন্ডনের পথে রওয়ানা হইবার পূর্বকাল পর্যন্ত সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ কোয়াটা সার্কিট হাউসে ইস্কান্দার মীর্জা কালযাপন করিতে বাধ্য হন।

সামরিক শাসন প্রবর্তিত হইবার অব্যবহিত পরই গভর্নর সুলতানুদ্দিন আহমদের স্থলে পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ জাকির হোসেন গভর্নরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং কালাবাগের নওয়াব পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন।

সামরিক শাসন জারির কিছুকালের মধ্যে জাতীয় নেতা মাওলানা ভাসানীসহ শত শত দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হন। ১২ই অক্টোবর (১৯৫৮) মওলানা ভাসানী কারারুদ্ধ হইলেন এবং ১৯৫৯ সালের ৬ই অক্টোবর হইতে ১৯৬২ সালের ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় সরকারী ভাড়া বাড়ীতে অন্তরীণ রহিলেন। তাহার স্ত্রী ও সন্তানগণ সরকারী খরচে তাঁহার সহিত অবস্থান করিতেন। সাবেক দুর্নীতি দমনমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান ১৯৫৮ সালের East Pakistan Act L X X II/38 -এর VA ও Act II/47 এর 5 (2) ইত্যাদি দুর্নীতি দমন ধারা বলে ১২ই অক্টোবর (১৯৫৮) গ্রেফতার হন এবং

২০শে অক্টোবর কারান্তরালে অবস্থানকালেই বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্সের বলে তাঁহাকে নিরাপত্তা বন্দী করা হয়। তিনি ১৯৫৯ সালের ৭ই ডিসেম্বর মুক্তিলাভ করেন। যদিও নিম্ন আদালত তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত ৯টি মামলার মধ্যে ৮টি বাতিল করিয়া দিয়াছিল; তবুও ঢাকা জেলা ও সেসন জজ (পদাধিকার বলে সিনিয়র স্পেশাল জজ) এ, মওদুদ সাহেব ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৬০) তাঁহার দেয় রায়ে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত শেখ মুজিবর রহমানকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দুই বৎসর বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫০০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে ছয় মাস অতিরিক্ত কারাদন্ড প্রদান করেন। উক্ত সাজার বিরুদ্ধে আপিল করিলে ঢাকা হাইকোর্ট 'সন্দেহের অবকাশ আছে' যুক্তিতে বিশেষ আদালতের রায়কে নাকচ ঘোষণা করে।

সামরিক শাসন প্রবর্তনের স্বল্পকালের মধ্যেই আমি চটগ্রাম বন্দরে ৫৭৭/এ, আসাদগঞ্জ ঠিকানায় চট্টগ্রাম নিবাসী ব্যবসায়ী শেখ নজমুল হকের সহিত পার্টনারশীপ ব্যবসা আরম্ভ করি। আমাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল এম, করপোরেশন সামরিক-বেসামরিক গোয়েন্দার ভয়ে আমাদের ব্যবসায়ী অফিসে ক্রেতা-বিক্রেতা আসিতে দ্বিধাবোধ করিত। আমার পার্শ্ববর্তী ব্যবসায়ীদের স্বাভাবিক কারণে অসুবিধা হইত কিন্তু তাঁহারা এতই সজ্জন ছিলেন যে, কখনও ভুলক্রমেও ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন না। আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদের স্মরণ করি। ১৯৫৮ সালের (অক্টোবর) সামরিক শাসনের প্রথম পর্যায়ে ব্যবসায়ী শ্রেণীর উপর গজব নাজেল হইতে শুরু করে। সামরিক বিভাগীয় উর্দি পরিহিত নওজোয়ান বা অফিসারের আকস্মিক সাক্ষাতেও সাধারণ লোকের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হইত। এই ভয়াল পরিস্থিতিতে ছাপোষা ব্যবসায়ী শেখ নজমুল হক কর্তৃক আমাকে ব্যবসায়ীক পার্টনার করাটা যে ব্যতিক্রমধর্মী ছিল আমি তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি। এই ব্যবসা পরিচালনাকালেই সরকার বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স বলে আমাকে ১৯৫৯ সালে আমার শ্রদ্ধেয়া জ্যেষ্ঠা ভগ্নির বাসা হইতে গ্রেফতার করিয়া চট্টগ্রাম জেলা কারাগারে বন্দী করে।

পূর্ব পাকিস্তান সামরিক আইন শাসনকর্তা মেজর জেনারেল ওমরাও খানের প্রাইভেট সেক্রেটারী মেজর আনিসুজ্জামান সামরিক শাসনকর্তার আদেশে চট্টগ্রাম কারাগারে আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। কুশলাদি বিনিময়ের পর মেজর আনিসুজ্জামান তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবতারণা করিয়া বলেন, 'সামরিক শাসন নির্দলীয় শাসন। কর্তৃপক্ষ আপনার সহযোগিতা কামনা করেন।' তদুত্তরে তাহাকে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলাম, 'সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে সামরিক শাসন প্রবর্তন জনগণের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের ষড়যন্ত্রেরই ফল। সুতরাং সামরিক কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতার প্রশ্ন অবান্তর। তদুপরি কারারুদ্ধ অবস্থায় কোন প্রকার আলোচনায় অংশগ্রহণ মর্যাদা হানিকর। আমার স্পষ্টোক্তিতে ক্ষুব্ধ ও নিরুৎসাহিত মেজর আনিসুজ্জামান বিষন্ন বদনে কারাগার কার্যালয় হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। অবশ্য মেজর সাহেব সহজে হাল ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। পরদিন চট্টগ্রাম জেলা কারাগার সুপারিন্টেনডেন্ট কাইয়ুমুদ্দিন সাহেব আমার সহিত দেখা করিয়া জানান, "আপনি আলোচনা করিতে সম্মত হইলে মেজর আনিসুজ্জামান পুনরায় আপনার সহিত জেল গেটে দেখা করিবেন।" প্রত্যুত্তরে সুপারিন্টেনডেন্ট সাহেবকে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া

দিয়াছিলাম, "বন্দী অবস্থায় সামরিক শাসনকর্তা প্রেরিত প্রস্তাব বিবেচনা করা দূরে থাকুক, আমি শুনিতেই রাজী নই।"

মাসাধিককাল পর আমি চট্টগ্রাম জেলা কারাগার হইতে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরিত হই।

আইউবের স্টিম-রোলার

জনগণের সার্বিক সার্বভৌম অধিকার হরণে প্রেসিডেন্ট আইউবের কৃতিত্বে অনুচর ও পরিষদবর্গ এতবেশী বিমুগ্ধ ও বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, মন্ত্রীসভার সহযোগিতায় তাহারা কিছুকালের মধ্যেই জেনারেল মোহাম্মদ আইউব খানকে ফিল্ড মার্শাল পদে অভিষিক্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে সেনাবাহিনীই ছিল আইউবের ক্ষমতার মূল উৎস এবং সেনাবাহিনীর সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিবার উপরই নির্ভরশীল ছিল তাঁহার প্রতি সেনাবাহিনীর আনুগত্য। পদাধিকার বলেই একজন ফিল্ড মার্শাল সেনাবাহিনীর সহিত আমৃত্যু সম্পর্ক রাখিতে পারেন। কালবিলম্ব না করিয়া ফিল্ড মার্শাল পদ গ্রহণের গূঢ় রহস্য সহজেই অনুধাবনীয়।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পরপরই দুর্নীতি, কর্মবিমুখতা, অদক্ষতা ও শৃঙ্খলা বিরোধী আচরণের অজুহাতে আইউব খান সরকার পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের ১২ জন অফিসার, ৮৪ জন উচ্চপদস্থ প্রথম শ্রেণীর চাকুরে ও আড়াই হাজার নিম্নপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে বরখাস্ত করেন। তদুপরি পাবলিক অফিস ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডিন্যান্স (P.O.D.O.) জারি করিয়া মন্ত্রী ও আইন পরিষদ সদস্যদের বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। উল্লিখিত অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী বিচারে যদি কেহ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন তাহা হইলে ইলেকটিভ বডিস ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী অপরাধী ব্যক্তি ১৯৬৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কোন নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না। স্মর্তব্য যে, বিচারপতি আকরমের নেতৃত্বে গঠিত ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সর্বজনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবু হোসেন সরকার সকল অভিযোগ অস্বীকার করা সত্ত্বেও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা হইতে বঞ্চিত হন এবং জনাব আতাউর রহমান খান অর্ডিন্যান্সের শর্ত অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ মানিয়া লইয়া ট্রাইব্যুনাল মোকাবিলা করা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন।

আগেই বলিয়াছি, সামরিক শাসন জারি হওয়ার সাথে সাথে কয়েক হাজার রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী কারাগারে নীত হইয়াছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে গ্রেফতারকৃত রাজবন্দীদের উপর চালান হয় অকথ্য নির্যাতন। পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির দফতর সম্পাদক জনাব হাসান নাসিরকে ১৯৬০ সালের ৮ই আগস্ট করাচী কারাগারে আটক করা হয়। নির্মমতম দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হইয়া কারারুদ্ধ অবস্থায় লাহোর দুর্গে ১৯৬০ সালের ১৩ই নভেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সীমান্ত প্রদেশে প্রায় তিন হাজার রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী কারাবরণ করেন এবং রাজবন্দীদের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয়। কোয়েটা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ৪শত জন বেলুচীকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় পায়ে দড়ি বাঁধিয়া টাঙ্গাইয়া রাখা হয় ও মাঝে মাঝে তাহাদের তড়িতাঘাত করা হয়। সিন্ধু প্রদেশের হায়দারাবাদ কারাগারে

৭ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

আইউব খান আয়কর ফাঁকিদাতা, বৈদেশিক মুদ্রা পাচারকারী ও সীমান্ত পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন; ফলে এক কোটি ষাট লক্ষ স্টার্লিং বৈদেশিক মুদ্রা ও সমুদ্র তীর হইতে দুই টন স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের ভুমি ব্যবস্থা সংস্কার করিয়া জলসেচ সুবিধাপ্রাপ্ত জমির ক্ষেত্রে পাঁচশত একর ও জলসেচ ব্যবস্থাহীন জমির ক্ষেত্রে এক হাজার একর সর্বোচ্চ জমি মালিকানা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয়। সরকারী বন্ডের বিনিময়ে জমিদারী উচেছদ ও বিনা খেসারতে জায়গীরসমূহের বিলুপ্তি ঘটানো হয়।

রাজধানী স্থানান্তর, আস্থা ভোট গ্রহণ

প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইউব খান সেনাবাহিনীর সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রাখিবার প্রয়াসে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজধানী করাচী হইতে সেনাবাহিনীর সাধারণ সদর দফতর রাওয়ালপিন্ডিতে স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার ক্ষমতা গ্রহণের পিছনে জনসাধারণের অনুমোদন আছে, ইহা বিশ্বকে বুঝাইবার নিমিত্ত প্রেসিডেন্ট ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সমগ্র পাকিস্তানে ইউনিয়ন পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন এবং নির্বাচিত ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্যদের নিকট হইতে ১৯৬০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী 'আস্থা' ভোট গ্রহণ করেন। সামরিক আইনবিধি অনুযায়ী ভোট দাতাগণের 'হ্যাঁ' বা 'না' বলার ক্ষমতা ছিল মাত্র এবং প্রেসিডেন্ট আইউব উক্ত ব্যবস্থাপনায় বিপুল 'হ্যাঁ' সূচক আস্থাভোট আদায় করিতে সমর্থ হন।

"হ্যাঁ" ভোট প্রাপ্তির পর ১৯৬০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী দেশের সংবিধান প্রণয়নকল্পে বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে কনস্টিটিউশন কমিশন গঠন করা হয়। পূর্বপাক হাইকোর্টের এডঃ জেনারেল জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী (পরবর্তীতে হাইকোর্ট বিচারপতি ও ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি) ও চট্টগ্রামের ও, আর, নিজাম উক্ত কমিশনের অন্যতম সদস্যবৃন্দ ছিলেন। কনস্টিটিউশন কমিশন ১৯৬১ সালের মে মাসে রিপোর্ট দাখিল করে। সেই রিপোর্ট মোতাবেক দেখা যায়, কমিশন ৬২৬৯ প্রশ্নোত্তর পায় ও ৫৬৫ জনের ইন্টারভিউ নেয়। সরকার পদ্ধতি, পার্লামেন্টারী পদ্ধতির পক্ষে শতকরা ২১.৩, গুরুতরভাবে সংশোধিত পার্লামেন্টারী পদ্ধতির পক্ষে শতকরা ২৯.৩ প্রেসিডেন্সিয়েল পদ্ধতির পক্ষে শতকরা ৪৭.৪ আর খিলাফত পদ্ধতির পক্ষে শতকরা ২, রাষ্ট্রকে ফেডারেল করিবার পক্ষে শতকরা ৬৫.৫ ও ইউনিটারী করিবার পক্ষে শতকরা ৩৪.৫, শক্তিশালী কেন্দ্র (Strong Center) পক্ষে শতকরা ৬১.৫ ও দেশরক্ষা, বিদেশনীতি, মুদ্রা তিন বিষয় (Strong Center) পক্ষে শতকরা ৬১.৫ ও দেশরক্ষা, বিদেশনীতি, মুদ্রা তিন বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার পক্ষে শতকরা ৩৮.৫, কমিশন রিপোর্ট অদুযায়ী ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ এক প্রভুত্বব্যঞ্জক সংবিধান দেশ ও জাতির উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়।

আইউবের উন্নয়নমূলক কাজ

প্রেসিডেন্ট আইউব স্বীয় শাসন আমলে ভোটাধিকার প্রশ্নে মতামতদানের জন্য 'ফ্রেঞ্চাইজ কমিশন', খাদ্য ও কৃষি সম্বন্ধে সুপারিশ করিবার জন্য 'ফুড এন্ড এগ্রিকালচার কমিশন',

ভূমি ব্যবস্থার জন্য 'ল্যান্ড রিফরম কমিশন', শিক্ষা বিষয়ে 'এডুকেশন কমিশন', চিকিৎসা সম্পর্কে 'মেডিকেল রিফরমস কমিশন', বিজ্ঞান বিষয়ে 'সাইন্টিফিক কমিশন', সংবাদপত্র বিষয়ে 'প্রেস কমিশন', ব্যাংক বিষয়ে 'ক্রেডিট ইনকোয়ারী কমিশন', 'বিবাহ ও পারিবারিক বিষয়ে 'মেরিজ এন্ড ফ্যামিলী ল'জ কমিশন, 'সরকারী চাকুরী বিষয়ে 'পে এন্ড সার্ভিসেস কমিশন,' সামাজিক বিষয়ে 'সোস্যাল ইভিল্‌স ইরিডিকেশন কমিশন', ফেডারেল রাজধানী সম্পর্কে 'ফেডারেল ক্যাপিটাল কমিশন', দ্রব্য মূল্য বিষয়ে 'প্রাইস কমিশন', সমুদ্র বাণিজ্য বিষয়ে 'মেরিটাইম কমিশন', বস্ত্র শিল্প বিষয়ে 'টেক্সটাইল কমিশন', পাট বিষয়ে 'জুট ইনকোয়ারী কমিশন', জাতীয় আয় বিষয়ে 'ন্যাশনাল ইনকাম কমিশন', খেলাধুলা ইত্যাদি সম্পর্কে 'স্পোর্টস, কালচার, ইউথ মুভমেন্ট এন্ড আর্টস ইনকোয়ারী কমিটি, 'সিনেমা বিষয়ক 'ফিল্ম ইনকোয়ারী কমিটি', আইন বিষয়ে 'ল' রিফরমস কমিশন', ইত্যাদি বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি গঠন করেন এবং এই সবের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রকট সমস্যার সমাধান নির্ণয় মানসে দেশীয় ও বিদেশী মেধার সহায়তা গ্রহণ করেন। এইভাবে তাঁহার দ্বারাই দেশব্যাপী উন্নয়নের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ক্রম বিকাশের দ্বার উন্মুক্ত হয়।

ইত্তেফাকের ঐতিহাসিক ভূমিকা

রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ছিল বিধায় জনগণের দুঃখ-দুর্দশা ও সমস্যাবলী তুলিয়া ধরিবার মাধ্যম ছিল সংবাদপত্র। কিন্তু সামরিক শাসন কর্তাদের হামলার ভয়ে কোন পত্রিকা অবাধে সংবাদ ও মতামত প্রকাশ করিত না। এমনি নাজুক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে দৈনিক ইত্তেফাক দুঃসাহসের উপর ভর করিয়া সামরিক শাসনকে লেখার মারপ্যাচে সমালোচনা করিতে শুরু করে। অন্যান্য দৈনিক সংবাদপত্রগুলি সযত্নে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সমালোচনা এড়াইয়া চলিত। দৈনিক সংবাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আহমাদুল কবির স্বীয় স্বভাবসুলভ পথেই সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের বশংবদ পাত্রে পরিণত হন এবং গভর্নর জাকির হোসেন কর্তৃক গঠিত শিল্প উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্যপদ গ্রহণ করিয়া স্বীয় তরক্কির রাজপথ খোলাসা করিয়া লন। ইত্তেফাকের সমালোচনার আঁচড় সহ্য করিতে না পারিয়া সামরিক শাসনকর্তা সেই অন্ধকার যুগে আশার আলোকবর্তিকা ইত্তেফাক সম্পাদক নির্ভীক তফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়াকে ১৯৫৯ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করেন এবং সামরিক আদালত সংক্ষিপ্ত বিচারে তাঁহাকে দণ্ডাদেশ দেন। ভবিষ্যতে লেখনীতে সতর্কতা অবলম্বন করিবেন এই মর্মে লিখিত আশ্বাস দেওয়ার পর প্রেসিডেন্ট আইউব খানের নির্দেশে সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু ইহা সর্বজনবিদিত যে, কারামুক্তির পরও 'মুসাফিরের' লেখনীতে বিশেষ কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। ছদ্মনাম 'মোসাফির' লিখিত পোস্ট এডিটরিয়েল 'রাজনৈতিক মঞ্চ' জেল রাজবন্দীদের জন্য সঞ্জীবনী সুধাবৎ ছিল। ইহা স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কত্ববাদের বিরুদ্ধে মুক্তবুদ্ধি ও মুক্ত চিন্তার সংগ্রামের অন্যতম দৃষ্টান্ত ছিল। উক্ত প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য প্রেরণায় উৎস হইয়া থাকিবে।

গভর্নর পদে আজম খান

পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক প্রধান এবং বেসামরিক গভর্নর-এর মধ্যে প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগে জটিলতা ও দ্বন্দ্ব নিরসনকল্পে জাকির হোসেনের স্থলে লেফটেন্যান্ট জেনারেল আজম খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদে নিযুক্ত করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক উন্নয়নে গভর্নর লেঃ জেঃ আজম খানের আন্তরিকতা ও গতিশীল নেতৃত্ব বাঙ্গালী হৃদয়কে মুগ্ধ ও অভিভূত করে। আজম খানের বিদায় গ্রহণকালে তাঁহার কর্মক্ষমতা, সততা ও আন্তরিকতায় বিমুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ বাঙ্গালী জাতি অশ্রুসিক্তনয়নে ও ব্যথাবিধুর হৃদয়ে তাঁহাকে বিদায় দেয়। ইহা এক মর্মস্পর্শী মুহূর্ত। উর্দুভাষী আজম খানের খাঁটি দেশপ্রেম ও বাঙ্গালী জাতির মহত্ব একই প্রস্রবণ হইতে উৎসারিত। মানবীয় গুণাবলীর ফল্গুধারা একই স্রোতস্বিনীর শাশ্বত স্রোত ধারায় প্রবাহিত হইয়া একই মহামানবের সাগরে লীন হইয়াছে। ইহাই সত্য, ইহাই সনাতন। ব্যতিক্রম মনুষ্য চরিত্রের বিকৃত রূপমাত্র।

১৯৬০ সালের ১০ই ও ৩১শে অক্টোবর উপর্যুপরি দুইটি ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ফলে বন্দর নগর চট্টগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। উক্ত দুর্যোগ-মুহূর্তে ত্রাণ তৎপরতায় গভর্নর আজম খানের কর্মদক্ষতা, আন্তরিকতা ও সততা বাঙ্গালী মনপ্রাণকে বিস্ময়করভাবে অভিভূত করে।

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কঃ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈমাত্রেয়সুলভ আচরণ

ভারত-পাকিস্তান তিক্ত সম্পর্ক জন্মলগ্ন হতেই বিদ্যমান ছিল। কাশ্মীর সমস্যা উক্ত তিক্ত সম্পর্কে সহজতর হইতে দেয় নাই। ইহার সহিত যুক্ত সিন্ধুনদ পানি সমস্যা। পাকিস্তানে প্রবাহিত পানির উৎস ছিল ভারতভুক্ত কাশ্মীরে। পাকিস্তানে পানি সরবরাহ অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে বিশ্ব ব্যাংকের মধ্যস্থতায় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরু ও পাকিস্তনের প্রেসিডেন্ট আইউব খান ১৯৬০ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর করাচীতে 'দি ইন্ডাস ওয়াটার ট্রিটি বা সিন্ধুনদ পানি চুক্তি' স্বাক্ষর করিয়া ভারত-পাকিস্তান সম্ভাব্য সংঘর্ষের একটি জটিল কারণ নিরসন ঘটাইতে সমর্থ হন। উক্ত একই পথে পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতীয় সীমান্তে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ তথা ভারত কর্তৃক গঙ্গার পানি প্রত্যাহার জনিত মারাত্মক সমস্যার সমাধান করা হয়তো সম্ভব ছিল অথচ তাহা হয় নাই। ইহা না হইবার একমাত্র কারণ ছিল যে, তদানীন্তন শাসকবর্গের চোখে পশ্চিম পাকিস্তানই পাকিস্তান বলিয়া বিবেচিত হইত। অতএব তাহাদের নিকট পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যাবলী সমাধানই অগ্রাধিকার পাইত। পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষি উৎপাদন রক্ষা ও বৃদ্ধিকল্পে জলবদ্ধতা ও লবণাক্ততা মোকাবেলা করিবার প্রয়োজনে পাকিস্তান সরকার মার্কিন কারিগরি সাহায্যসহ পাঁচশত নব্বই কোটি টাকা ব্যয় করেন কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের তেমন কোন ব্যবস্থা তাহারা গ্রহণ করেন নাই। বৈমাত্রেয়সুলভ ব্যবহার আর কাহাকে বলে।

আইউবের বৈদেশিক নীতি

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধজোটে অঙ্গীভূত থাকিয়াও প্রেসিডেন্ট আইউব কমিউনিস্ট রাশিয়ার সহিত ১৯৬১ সালের ৩রা এপ্রিল তৈলানুসন্ধান চুক্তি সম্পাদন করেন

এবং ১৯৬১ সালের ৩রা মে কমিউনিস্ট চীনের পাক-চীন সীমান্ত নির্ধারণ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এমন কি ১৯৬২ সালের ২৩শে মে কমিউনিস্ট চীনের অর্থনৈতিক সাহায্যদানের প্রস্তাবও পাকিস্তান সানন্দে গ্রহণ করে। পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী দুই বৃহৎশক্তি সোভিয়েট রাশিয়া ও মহাচীনের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস সত্ত্বেও পাকিস্তানের মাটিতে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পেশোয়ারের নিকট কারবেটে স্থাপিত মার্কিন সামরিক বিমান ঘাঁটি বিদ্যমান ছিল। সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক শক্তি পর্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত মার্কিন ইউ-২ বিমান ১৯৬০ সালের ১লা মে এই ঘাঁটি হইতেই উড্ডয়ন করে এবং সোভিয়েট ভূমিতেই সোভিয়েট সামরিক শক্তি কর্তৃক ভূপাতিত হয়। ইহার ফলে রাশিয়ার সহিত পশ্চিমা শক্তির সম্পর্ক এতই তিক্ত হয় যে, প্রধানমন্ত্রী ও কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নিকিতা ক্রুশ্চেভ ১৬ মে (১৯৬০) প্যারিসে অনুষ্ঠিতব্য রাষ্ট্রপ্রধান চতুষ্টয়ের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার, সোভিয়েট রাশিয়ার প্রমানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভ, বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দ্য গলে) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। সোভিয়েট রাশিয়া প্রেসিডেন্ট আইউব খান সরকারকে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দেয় যে, দ্বিতীয়বার পাকিস্তানের মাটি হইতে অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইলে বিশ্ব মানচিত্র হইতে পাকিস্তানকে চিরতরে মুছিয়ে দেওয়া হইবে। কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া বিশেষতঃ ১৯৬০ সালের নির্বাচনে ডেমোক্রেট পার্টি মনোনীত বিজয়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন, এফ, কেনেডি কর্তৃক ভারত ঘেঁষা নীতি অবলম্বনের আশংকায় শঙ্কিত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইউব খান পররাষ্ট্র নীতিতে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ও অতি ধীরে মার্কিন তাবেদারী হইতে মুক্ত হইবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। তদসত্ত্বেও ১৯৬১ সালের ১১, ১২ ও ১৩ই জুলাই প্রেসিডেন্ট আইউবের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে প্রকাশিত যুক্ত ইশতেহারে ১৯৫৯ সালের ৫ই মার্চ স্বাক্ষরিত চুক্তিতে ঘোষিত 'পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব ও স্বাধীনতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ নিহিত বক্তব্যের পুনরুল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।' পরবর্তীকালে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানকল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টায় পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো ও ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরণ সিংয়ের মধ্যে কয়েক দফা ব্যর্থ আলোচনা বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়।

যাহা হউক, সামরিক শাসনের শ্বাসরুদ্ধকর পরস্থিতি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে জোটবদ্ধ হইতে উৎসাহিত করে। প্রভূত্বব্যঞ্জক সরকারের অবসানের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনার সূত্রপাত করেন। জনাব সোহরাওয়ার্দীর ঐক্য প্রচেষ্টায় ভীত হইয়া প্রেসিডেন্ট আইউব খান ১৯৬২ সালের ৩০শে জানুয়ারী করাচীতে তাঁহাকে গ্রেফতার করেন। ১৯৬২ সালের ১৯শে আগস্ট জনাব সোহরাওয়ার্দী বন্দীশালা হইতে মুক্তি লাভ করেন।

ছাত্র বিক্ষোভ

জনাব সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১লা ফেব্রুয়ারী (১৯৬২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট ও ছাত্র জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ৬ ও ৭ই ফেব্রুয়ারী ছাত্র ধর্মঘট ও বিক্ষোভের মুখে সামরিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা

করেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেনকে (মানিক মিয়া) আবার কারারুদ্ধ করা হয় এবং ৭ই ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবর রহমানও গ্রেফতার হন। তাঁহারা ছাড়াও জনাব আবুল মনসুর আহমদ (প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) বন্দী হন। ছাত্র আন্দোলন দাবানলের ন্যায় পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। আইউব বিরোধী ছাত্র বিক্ষোভ প্রশমিত করিবার জন্য অসংখ্য ছাত্র,রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬২ সালে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলাকালে আমি রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতালে অসুস্থ ছিলাম। দুঃখের হইলেও বলিতে হয়, রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী ছাত্র কর্মীরা সামরিক সরকারের নিকট মুচলেকা সহি করিয়া কারামুক্তি গ্রহণ করে। উক্ত গর্হিত কাজের অন্যতম প্ররোচক ছিলেন রাজশাহী মোক্তার বার সদস্য ও ১৯৫৪ সালে নির্বাচিত আইন পরিষদ সদস্য ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা আতাউর রহমান। প্রসঙ্গতঃ ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৭৫ সালে একদলীয় শাসন প্রবর্তনকারী প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক এই আতাউর রহমানই রাজশাহী জেলার গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উল্লেখ্য যে, জনাব আতাউর রহমান নিজেও ১৯৫১ সালে তদানীন্তন নূরুল আমিন সরকারের আমলে বন্ড বা মুচলেকা সহি করিয়া কারামুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

নূতন সংবিধানঃ নির্বাচন

ছাত্র আন্দোলনের ঢেউ কিছুটা স্তিমিত হইতেই ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট আইউব খান নূতন সংবিধান জারি করেন এবং সংবিধান মোতাবেক এপ্রিল মাসের ২৮ তারিখ জাতীয় পরিষদের নির্বাচন ও মে মাসের ৬ তারিখ প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রদের চাপে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এক অংশ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত থাকেন অর্থাৎ নেতৃত্বদানের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে নেতৃবৃন্দ ব্যর্থ হন। ইহাতে আর যাহাই থাকুক, রাজনীতিবিদদের দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় যে ছিল না ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। পক্ষান্তরে রাজনীতিবিদদের অপর একটি অংশ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করায়; প্রত্যক্ষ ক্ষমতাহীন জাতীয় পরিষদ মঞ্চ হইতেও দেশবাসীর বক্তব্য যথার্থভাবে উপস্থিত করা যে সম্ভব হইয়াছে, তাহা এক ঐতিহাসিক সত্য। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদের সভাপতি তমিজুদ্দিন খান, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী (বগুড়া), মশিউর রহমান, পাকিস্তান সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী রমিজুদ্দিন আহমদ, ফজলুল কাদের চৌধুরী, আবদুস সবুর খান, আবদুল মোনায়েম খান, পশ্চিম পাকিস্তানের সরদার বাহাদুর খান, সিন্ধুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীদ্বয় গোলাম আলী তালপুর ও কাজী ফজলুল্লাহ প্রমুখ এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের সাত নেতা যথা-পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন, আবু হোসেন সরকার, আতাউর রহমান খান, সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক, মাহমুদ আলী, পীর মোহসেন উদ্দিন আহমদ (দুদু মিঞা) ১৪ই এপ্রিল (১৯৬২) আইউব সংবিধান ও তৎকালীন নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিরোধিতা করিয়া সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান করেন। ২৮শে এপ্রিল যথারীতি জাতীয় পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ৮ই জুন রাওয়ালপিন্ডিতে নব নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন

বসে। বিরোধী দলীয় সদস্য জনাব তমিজুদ্দিন খান পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পীকার এবং জনাব আফজাল চীমা ও আবুল কাসেম ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন। পাক পিপলস গ্রুপ, পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম ও কতিপয় স্বতন্ত্র জাতীয় পরিষদ সদস্য ২৪শে নভেম্বর (১৯৬২) রাওয়ালপিন্ডিতে এক সভায় ঐক্যবদ্ধভাবে জাতীয় পরিষদে কাজ করিবার সিদ্ধান্ত নেয়। ২৬শে নভেম্বরের সভায় পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) নেতা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্দার বাহাদুর খান সম্মিলিত বিরোধীদলের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের ৩রা আগস্টের (১৯৬২) অনুষ্ঠিত সভায় এডভোকেট আফসার উদ্দিন আহমদকে আহবায়ক করিয়া এগার সদস্যবিশিষ্ট সাব কমিটি গঠন করা হয়। ৪ঠা আগস্ট জনাব আফসার উদ্দিন আহমদকে নেতা নির্বাচিত করিয়া পরিষদে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক গ্রুপ গঠন করা হয়। একই তারিখে আইউব সরকারের সমর্থনে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে পিপলস ডেমোক্রেটিক গ্রুপ গঠিত হয়।

প্রেসিডেন্ট আইউবের জারিকৃত সংবিধান অগ্রহণীয় ঘোষণা করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের ৯ জন নেতা ২৪শে জুন (১৯৬২) নিম্নলিখিত এক যৌথ বিবৃতিতে সার্বজনীন ভোটাধিকারে নির্বাচিত গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধান প্রণয়নের আহবান জানানঃ

1. Rule by Martial Law has at last been ended. The political gloom that enveloped the country for long 45 months has been partially lifted. Door of progress towards a democratic system to be in the process of opening; but democracy has yet to come. The Constitution promulgated by Field Marshal Ayub Khan only holds out a hope but does not usher it.

2. The main subject that agitates public mind deeply today is again the Constitution of the country. This was the main topic during the recent elections though the election was limited to a small section of the people. Practically every candidate pledged his support for getting a democratic Constitution. During the last weeks since election the volume of opinion for a workable Constituion has increased considerably.

3. We will be failing in our duty if we do not express ourselves on this vital question through the only means available to us; we believe, in this, we share the opinion held by most in the country.

4. The country can make real and abiding progress through the method of evolution and by changes peacefully brought about. This can happen only where free debate and free discussion are fully assured.

A durable and abiding Constitution is the pre-condition for national consolidation and stability.

5. We are convinced that no durable constitution can be adopted unless it is framed by the direct Representatives of the people.

WE SAY SO BECAUSE

6. Whatever type of Constitution is drawn up, it has to be democratic both in form and spirit. In a democracy, sovereignty belongs to the people. All authority must emanate from the people. Anything to be stable and enduring must in the first palce by the expression of the will of the people. That will must be a collective will, an organised will, and such as is freely expressed without any let or hindrance, direct or indirect.

7. A Constitution is framed with a view that it endures the vicissitudes of time, for as long as human intelligence and foresight can see, capable of meeting all situations and contigencis as can be predicted. Each and every Constitution must have such basic qualities as would make it permanent. Such basic laws cease to be basic if there are stresses and strains within it which in time are bound to blow it to pieces.

8. To have he character and quality of permanence it has to be the expression of the will and judgement of the entire community. A set of laws possessing such character alone can evoke the emotional loyalty of this generation and generations to come. Such loyalty and emotion are its strongest buttres and its impregnable defence. A document which depends on external forces other than the will of the people will have no chance of popular support, when in jeopardy.

9. The present Constitution, lacks the basic strength stated above viz, popular consensus enshrined in basic laws framed by the peoples, Representatives entrusted with that mandate and this without reference to its other merits.

10. Besides, the present document is framed on a distrust of popular will, whatever be the justification put forward for that. A body of eighty thousand electors have been provided for as base of the system in a population of more than eighty million. The Assemblies created on the Vote of these electors have practically been given no power to decide anything, Nothing can be done by these bodies unless the President agrees. Whereas the President, after the initial start, can rule without any agreement of the assembly, both in the legislative and in the executive

fields. Experiences of barely 3 weeks working have already demonstrated that the present scheme is unworkable unless it is radically remodelled and changed. It is impossible to expect any genuine co-operate on between the Government and the Assemblies on the present basis. The members will only be tempted to demonstrate their usefullness by turning to acute and extreme criticism of the Government as they have neither any power of shaping directly the policy of the Government nor its activities. The distrust will spread into the country rendering Government more unpopular, Men of ability and independance will hardly be attracted to join such Government, and Administration will completely pass into the dead and soulless hands of bureacieracy.

11. We therefore, urge that steps be taken to have special body elected as soon as possible to give the country a Constitution to make its acceptance unquestioned by the people.

With all the materials on the subject that have accumulated during the last 15 years, a Constitution can be hammered out as will be suitable and will meet the peculiar problems of this country, in the course of 6 months at the longest.

12. In the circumstances of the above recommendations we purposely do not enter into the question as to whether the Constitution to be so framed should be of the Presidential type or Parliamentary type. We are conscious that by far the largest volume of opinion is for the parliamentary form. The reasons are historical; our long association and experiences of the working of this system predisposes us to it.

13. Similarly we need hardly say much over question whether it should be federal for unitary in-character. This question is not very controversial either. More or less it is accepted by all shades or opinion, that has to be federal with a majority of subjects being with the units particuarly in view of our peculiar Geography.

14. The other buring topic to be dealt with is the growing imbalance in the economic progress in the two wings. We believe that there is not want of good will in the people of West pakistan and East pakistan for each other. Public men once entrusted with real responsibility is bound to rise above all narrowness and are sure to concentrate on developing the economy of the country as a whole giving greater attention to the

backward areas wherever they are.

15. All narrow and parochial interest that are responsible for the unequal progress of the two wings had free play as the people had very little say in the policy making of the state so long. Once public opinion can assert itself through their elected representatives all reactionary forces and vested interests will be in the retreat. Much of the disparities between the wings have arisen out of the fact that East Pakistan had rarely shared effective political power in the country's policy making particularly on economic affairs and searely has or had a say in the executive organisations, responsible for carrying out these economic policy into practice. In fact since independence all political powers were concetrated into the hands of a small group of permanent services, here having been not one single general election in the country by which the people could have a say in the country's affairs.

16. The next important for consideration is what needs be done during the interim period.

17. The good will generated by the lifting of the Martial Law needs to be further strengthened by further statesman like acts. The distance between the people and the organs of administration should not be allowed to grow. It is a great responsibility for the President Ayub and we have every hope that it is fully appreciated.

18. Pending the adoption of a permanent Constitution by the method proposed by us, the Government of the Country has to be carried to be on.

19. But even in the interim period some essential changes need be made in the document under which the Government is being carried on.

20. It is necessary that Fundamental Rights as enumerated in the 1956 Constitution be incorporated as such in the present Constitution, and made justiciable, instead of enumerating them as principles of 'law-making' as in the present document.

21. These can be easily incorporated in the present document either by Presidential Order or through the Legislative process as provied for in the Constitution. What is more necessary is that the executive should trust the Assemblies brought under existence under this Constitution. All temptation to fill the house with persons holding office of profit should be checked. Otherwise whatever little freedom the houses have,

will vanish. We should not forget that trust begets trust.

22. All political prisoners detained without trial should be set at liberty to restore an atmosphere of confidence in the country and all penal actions regarding politicians should be done away with.

23. Political parties are the very breath of representative democracies. As life without breath is unthinkable so this elective system without the disciplined parties is unworkable Party means discilpine. No representative body can function with a large body of individuals without any kind of ties binding them and controlling their conduct behaviour within and without. No obligation except that of self-interest will influence members of partyless houses. Finally regular periodic elections are a must in as much as it is the ultimate check on individuals as on parties against irresponsible conducts. So all obstacles against the growth of party should be done away with.

Till democracy is ushered in however, we must think in terms of the National issues now facing the country as a whole. People from all walks of life, be a private citizen, a member of the profession or of the services must make their contributions jointly to its solution.

24. Finally, we feel duty-bound to say that we are passing through very trying and unsettled times. It is not peculiar to us alone. We need all the organs of the state and the Nation to act in harmony, in full understanding and co-operation as a united people to be able to face all the unforeseen contingencies. Those in whose hands destiny has placed the fate of the country shoulder the greatest responsibility to bring about that unity and to lay the foundation of a Nation united on a firm and sound footing. Let us complete the task of Constitution making as quickly as posible and free ourselves from this controversy and concentrate on the nation buliding tasks as a united people determined to fulfil the destiny which is ours.

Sd/-1. Nurul Amin
2. Ataur Rahman Khan
3. Hamidul Hoq Chowdhury
4. Abu Hossain Sarker
5. Sheikh Majibur Rahman
6. Yousuf Ali Chowdhury
7. Mahmood Ali
8. Syed Azizul Hoq
9. Moulana Pir Mohsen Uddin Ahmed

১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর সম্মেলনে কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র সাথে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের আলোচনায় ব্রিটিশ সরকার প্রতিনিধি তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটন ; নিখিল ভারত কংগ্রেস প্রতিনিধিবৃন্দ পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ও বলদেব সিং, নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিনিধি কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান ও সর্দার আবদুর রব নিশতার

১৯৪৮ সালে কারাগার হইতে মুক্তি পাবার পর জনাব অলি আহাদ

৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর পর প্রথম শহীদ মিনার

প্রেসিডেন্ট আইউব খান কর্তৃক আহুত রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স-এর একাংশ। ১০ই মার্চ্চ ১৯৬৯ ইং রাওয়ালপিন্ডিতে মমতাজ দৌলতানা, নুরুল আমিন. নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান, শেখ মজিবর রহমান, মাওলানা আবুল আলা মওদুদী ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলী দাঁড়ানো খন্দকার মোস্তাক আহমদ ও মাহমুদ আলী

আজাদ বাংলা- জিন্দাবাদ

কারারুদ্ধ নেতার ডাক

দিল্লীর দাসত্ব থেকে এই বাংলাকে
আজাদ [illegible] সংগ্রামে যোগ দিন।

আপনার মাধ্যমে 'আজাদ বাংলার'
সংগ্রাম [illegible] করবে

চট্টগ্রামে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন দশজন সংগ্রামী কর্মী। এরা ৩০শে মার্চ,১৯৭১-এ ট্রান্সমিটার ভবনে পাকিস্তানী বিমান হামলার পর একটি ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার নিয়ে দুর্বেদ্য মুক্তাঞ্চলে চলে যান এবং প্রচার অব্যাহত রাখেন। মুক্তাঞ্চলে অবস্থানকালে সংসদ সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ, জনাব এম,আর, সিদ্দিকী ও জনাব তাহের উদ্দীন ঠাকুর স্বাধীন বাংলা বেতারের উপদেস্টা ছিলেন। ছবিতে উপরে ঃ সৈয়দ আবদুস শাকের, মোস্তফা আনোয়ার, বেলাল মোহাম্মদ, আবদুল্লাহ্ আল ফারুক ও রাশেদল হোসেন নীচে ঃ আবুল কাশেম সন্দীপ, আমিনুর রহমান, শরফুজ্জামান, রেজাউল করিম, কাজী হাবিব উদ্দিন।

মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম জি ওসমানী সহ মুক্তিযুদ্ধের সকল সেক্টর কমান্ডারগণ। ছবি সৌজন্যে শাহবুদ্দীন আহম্মেদ সরকার।

অথাৎঃ

" অবশেষে সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়াছে। দেশের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে দীর্ঘ ৪৫ মাসকাল যে তমসা বিরাজ করিতেছিল, আজ তাহা আংশিক অপসারিত হইয়াছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পথে অগ্রগতির দ্বার উন্মুক্ত হইতে চলিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে; কিন্তু সত্যিকারের গণতন্ত্র এখনও অনেক দূরে। ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইউব খান যে শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করিয়াছেন, উহাতে আশার আভাস থাকিলেও উহার বাস্তব রূপায়ণের কোন লক্ষণ নাই। যে বিষয়টি আজ গণমনকে গভীরভাবে আলোড়িত করিতেছে, তাহা হইল- শাসনতন্ত্র। সমগ্র জনসংখ্যার সামান্য অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও সাম্প্রতিক নির্বাচনের সময়ও এই শাসনতন্ত্রই ছিল সকলের মূল আলোচ্য বিষয়। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যেক প্রার্থীই একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র কায়েমের পক্ষে তাঁহাদের নির্বাচনী ওয়াদা দিয়াছিলেন। নির্বাচনের পরবর্তী বিগত ৬ সপ্তাহে কার্যোপযোগী একটি শাসনতন্ত্রের পক্ষে জনমত আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এমতাবস্থায় এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে আমরা আমাদের মতামত ব্যক্ত না করিলে কর্তব্যের খেলাফ করা হইবে বলিয়া মনে করি এবং বিশ্বাস করি, এই মতামত ব্যক্ত করিতে গিয়া আমরা দেশবাসীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের আশা-আকাংখারই প্রতিধ্বনি করিতেছি। বিবর্তন এবং শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমেই কেবলমাত্র দেশের সত্যিকার ও সুষ্ঠু অগ্রগতি সাধিত হইতে পারে। অবাধ বিতর্ক ও আলোচনার পূর্ণ নিশ্চয়তা যেখানে আছে, কেবল সেখানেই তাহা সম্ভব।

এইকথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, স্থায়ী ও সহজে কার্যক্ষম শাসনতন্ত্রই জাতীয় সংহতি ও স্থায়িত্বের পূর্বশর্ত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সত্যিকার গণপ্রতিনিধিগণ কর্তৃক প্রণীত না হইলে কোন শাসনতন্ত্রই টেকসই হইতে পারে না।

আমাদের এই বক্তব্যের কারণ হইতেছে এই যে, যে ধরনের শাসনতন্ত্রই প্রণীত হউক না কেন, পদ্ধতিগত ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্টের দিক দিয়া উহাকে গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইতে হইবে। জনগণই দেশের সার্বভৌমত্বের অধিকারী -ইহাই গণতন্ত্রের সার কথা। জনগণই হইবে সকল ক্ষমতার উৎস। এমতাবস্থায় কোন কিছুকে স্থায়ী ও সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার উপযোগী করিতে হইলে সর্বপ্রথমেই উহাকে জনগণের ইচ্ছানুযায়ী রূপ দিতে হইবে। এই ইচ্ছা হইবে সমষ্টিগত ও সুসংহত ইচ্ছা। এই ইচ্ছার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের জন্য চাই প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ সব রকমের প্রতিবন্ধকতামুক্ত অবাধ পরিবেশ।

শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময় নেতাদের লক্ষ্য থাকে, যাহাতে ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া সে শাসনতন্ত্র টিকিয়া থাকিতে পারে এবং মানুষের চিন্তা ও দূরদৃষ্টির সীমানার মধ্যে যা কিছু বাধা-বিপত্তি ও সঙ্কট আসিয়া দাঁড়ায়, তাহার মোকাবেলায় নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে। সুতরাং স্থায়িত্ব অর্জনের জন্য যা কিছু মৌলিক গুণের প্রয়োজন, প্রত্যেক শাসনতন্ত্রতেই সেগুলি থাকিতে হইবে। এই মৌলিক গুণগুলি আর মৌলিক থাকে না- যদি আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কালক্রমে সেগুলি লণ্ডভণ্ড হইবার সম্ভাবনা থাকে।

শাসনতন্ত্রকে স্থায়িত্বের বৈশিষ্ট্য ও গুণসম্পন্ন হইতে হইলে উহাতে অবশ্যই সমগ্র

জাতির ইচ্ছা ও বিচারবুদ্ধির প্রতিফলন হইতে হইবে। কেবলমাত্র এই পদ্ধতিতে প্রণীত বিধানাবলীই আমাদের বর্তমান ও অনাগতকালের ভাবী বংশধরদের মনে অকৃত্রিম আনুগত্য ও আবেগ জাগাইতে পারে। এই আনুগত্য ও আবেগই শাসনতন্ত্রের প্রধান অবলম্বন ও দুর্ভেদ্য কর্মবিশেষ। অপরপক্ষে, জনমতের ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া বাহির হইতে চাপানো কোন শাসনতন্ত্র বিপর্যয়ের মুখে কোন জনসমর্থন লাভ করিতে পারে না একই উদ্দেশ্যে জনগণের ম্যাণ্ডেটপ্রাপ্ত গণপ্রতিনিধিগণ কর্তৃক জনগণের ইচ্ছামাফিক প্রণীত না হওয়ায় বর্তমান শাসনতন্ত্রে উপরোল্লিখিত অন্তর্নিহিত মৌলিক শক্তিগুলি অবর্তমান।

তাহাছাড়া সংশ্লিষ্ট মহল হইতে যে কৈফিয়তই দেওয়া হউক না কেন, এইকথা সত্য যে, জনমতের প্রতি অবিশ্বাসের ভিত্তিতেই নয়া শাসনতন্ত্র প্রণীত হইয়াছে। দেশের জনসংখ্যা যেখানে ৮ কোটিরও বেশী সেখানে ভোটারধিকার দেওয়া হইয়াছে মাত্র ৮০ হাজার লোককে। এবং তাহারই ভিত্তিতে দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এমনকি এই নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে যে সব পরিষদ গঠন করা হইয়াছে, সেগুলিকে বাস্তবক্ষেত্রে কোন ক্ষমতাই দেওয়া হয় নাই। প্রেসিডেন্ট সম্মতি না দিলে এইসব পরিষদের কোন কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই। অথচ, আইন প্রণয়ন ও শাসনক্ষেত্রে পরিষদের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া বা তাহাদের সহিত একমত না হইয়াই প্রেসিডেন্ট দেশ শাসন করিয়া যাইতে পারেন। মাত্র ৩ সপ্তাহের অভিজ্ঞতা হইতে এই কথাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, আমূল পুনর্বিন্যাস ও পরিবর্তন ব্যতিরেকে নয়া শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে কাজের অনুপযোগী। এমতাবস্থায় বর্তমান ব্যবস্থার ভিত্তিতে সরকার ও পরিষদের মধ্যে সত্যিকার সহযোগিতার আশা বাতুলতামাত্র।

প্রত্যক্ষভাবে সরকারী নীতি অথবা ইহার কার্যকলাপ নির্ধারণের কোন ক্ষমতা না থাকায় সদস্যরা শুধুমাত্র সরকারের তীব্র ও চরম সমালোচনার মারফত নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করিতে প্রলুব্ধ হইবেন। অবিশ্বাস দেশব্যাপী ছড়াইয়া পড়িয়া সরকারকে অধিকতর অপ্রিয় করিয়া তুলিবে। যোগ্য ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তিরা এই ধরনের সরকারে যোগ দিতে আগ্রহবোধ করিবেন না। আর উহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রাণ আমলাতন্ত্রের হস্তে ন্যস্ত হইবে।

সুতরাং দেশবাসী বিনাদ্বিধায় গ্রহণ করিবে- এমন একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবার জন্য যথাসম্ভব দ্রুত নির্বাচনের মাধ্যমে একটি বিশেষ সংস্থা গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা আহ্বান জানাইতেছি।

প্রত্যেক শাসনতন্ত্রতেই সেগুলি থাকিতে হইবে। এই মৌলিক গুণগুলি আর মৌলিক থাকে না- যদি আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কালক্রমে সেগুলি লণ্ডভণ্ড হইবার সম্ভাবনা থাকে।

দীর্ঘ ১৫ বৎসর যাবত শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে যা কিছু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা দ্বারা উর্ধ্বপক্ষে ৬ মাসের মধ্যেই এদেশের বিশেষ সমস্যার মোকাবেলা করিতে সক্ষম- এমন একটি উপযুক্ত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা একান্তই অপরিহার্য।

উপরিউক্ত সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে শাসনতন্ত্রটি প্রেসিডেন্সিয়াল না পার্লামেন্টারী

ধরনের হইবে, সে প্রশ্ন উত্থাপন হইতে আমরা ইচ্ছা করিয়াই বিরত থাকিতেছি। তবে এই ব্যাপারে আমরা সচেতন যে, জনমতের বৃহত্তম অংশই পার্লামেন্টারী ধরনের সরকারের পক্ষপাতি। ইহার কারণ ঐতিহাসিক। কেননা, পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকারের সহিত আমাদের দীর্ঘদিনের পরিচয় ও উহার রূপায়ণে বহুদিনের অভিজ্ঞতাই আমাদিগকে উহার অনুকূল করিয়া তুলিয়াছে। অনুরূপভাবে শাসনতন্ত্র ফেডারেলধর্মী হইবে, না ইউনিটারী-সে প্রশ্নেও বেশি কিছু বলিবার প্রয়োজন করে না, বস্তুতঃ এই প্রশ্নটি তেমন একটা বিতর্কমূলক কিছু নহে। দেশের সর্ববাদীসম্মত অভিমতই হইল, দেশের বিচিত্র ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ বিষয় ইউনিটের হাতে রাখার ব্যবস্থাসহ ফেডারেল শাসনতন্ত্র কায়েমের পক্ষে।

আর যে একটি জ্বলন্ত সমস্যার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা হইল অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে দেশের দুই অংশের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান বৈষম্য। আমরা বিশ্বাস করি, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সদিচ্ছার কোন অভাব নাই। জনপ্রতিনিধিগণকে একবার সত্যিকার দায়িত্ব দেওয়া হইলে সকল সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উঠিতে তাহারা যে বাধ্য এবং সে অবস্থাতেও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে মনোনিবেশ করিয়া তাঁহারা সে দেশের অনুন্নত অঞ্চলগুলির প্রতি অধিকতর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবেন, তাহাও সুনিশ্চিত।

বলাবাহুল্য, এতদিন ধরিয়া রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে জনসাধারণের কোন কথা বলিবার সুযোগ না থাকায় সঙ্কীর্ণ ও শ্রেণীস্বার্থের হাতে দেশের দুই অংশের মধ্যে উন্নয়নের ক্ষেত্রে পর্বতপ্রমাণ বৈষম্য সৃষ্টি হইতে পারিয়াছে। এক্ষণে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মারফত একবার যদি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনমত প্রতিষ্ঠা পায়, তাহা হইলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও কায়েমী স্বার্থের দিন যে ফুরাইয়া আসিবে- ইহাও সুনিশ্চিত। ইতিপূর্বে দেশের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান সত্যিকার রাজনৈতিক ক্ষমতায় শরীক হওয়ার সুযোগ কচিৎ পাইয়াছে। এমন কি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের নীতি বাস্তাবায়নের দায়িত্ব যাহাদের হাতে, সেই সব প্রশাসনিক সংস্থার কার্য পরিচালনার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলার কোন সুযোগও পূর্ব পাকিস্তানের ছিল না। বস্তুতঃ, এই সবই হইল দুই অংশের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টির প্রধানতম কারণ। স্বাধীনতা উত্তর যুগে প্রকৃত প্রস্তাবে সব রাজনৈতিক ক্ষমতারই সমাবেশ ঘটিয়াছিল মুষ্টিমেয় সরকারী সরকারী অফিসারদের হাতে। তদুপরি আজ পর্যন্ত দেশে একটিও সাধারণ নির্বাচন না হওয়ায় রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে জনসাধারণ কথা বলার কোন সুযোগই পায় নাই।

এমতাবস্থায় অন্তর্বর্তীকালে কি করণীয়, তাহাই হইল পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। এই প্রশ্নে আমরা বলিতে চাই, সামরিক শাসন প্রত্যাহৃত হওয়ার ফলে দেশে যে সদিচ্ছার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে আরও জোরদার করিবার জন্য প্রয়োজন রাজনীতিকসুলভ প্রজ্ঞার। দেশবাসী, সাধারণ ও সরকারী শাসনতন্ত্রের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর গড়িয়া উঠিতে দেওয়া আর চলিবে না। এই ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট আইউবের দায়িত্ব অপরিসীম এবং আমরা আশা করি, তিনি ইহার সারবত্তা সম্যক উপলব্ধি করিবেন।

আমাদের প্রস্তাবিত পদ্ধতি মতে একটি স্থায়ী শাসনতন্ত্র প্রণীত হওয়া সাপেক্ষে দেশের সরকার পরিচালনার কাজও চালাইয়া যাইতে হইবে।

তদুপরি যে দলিলের বলে বর্তমান সরকারী কার্যাদি পরিচালিত হইতেছে,এই অর্ন্তবর্তীকালের জন্য তাহার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে।

১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অংশটিকে বর্তমান শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশ করিয়া জনসাধারণের মৌলিক অধিকারকে আদালতের একতিয়ারভুক্ত করিতে হইবে।

বস্তুতঃ এই মৌলিক অধিকারগুলি প্রেসিডেন্টের ফর্মান বলে অথবা শাসনতন্ত্রের বিধান মাফিক জাতীয় পরিষদের মাধ্যমে সহজেই বর্তমান শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশ করা যাইতে পারে। সর্বোপরি যাহা প্রয়োজন তাহা হইল, বর্তমান শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী যে পরিষদ গঠিত হইয়াছে তৎপ্রতি শাসক কর্তৃপক্ষকে আস্থাশীল হইতে হইবে।

তদুপরি লাভজনক নপদ বন্টন করিয়া 'ভাগ্যবান' সদস্যদের দ্বারা পরিষদ গৃহ ভরাট করিবার আসক্তি বর্জন করিতে হইবে। অন্যথায় পরিষদের যেটুকুবা স্বাধীনতা আছে, তাহাও লুপ্ত হইবে। ভুলিলে চলিবে না যে, বিশ্বাসেই বিশ্বাস বাড়ে। দেশে আস্থার ভাব যাহাতে ফিরিয়া আসে তজ্জন্য বিনা বিচারে আটক সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিতে হইবে এবং রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে গৃহীত যাবতীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অবসান ঘটাইতে হইবে।

রাজনৈতিক দলই হইল প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের প্রাণবায়ূ। প্রাণবায়ূ ব্যতীত যেমন জীবনের অস্তিত্বে কল্পনা হইতে পারে না, তেমনি শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজনৈতিক দল ব্যতীত নির্বাচন পদ্ধতিও কর্মক্ষম হইতে পারে না। বিরাট কোন মানব গোষ্ঠীর সহিত কোন প্রকার সম্পর্কসূত্র না থাকিলে কোন প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠনই চালু থাকিতে পারে না। রাজনৈতিক দল-বর্জিত পরিষদেও স্বার্থশিকার ব্যতীত অন্য কোন দায়িত্ববোধ সদস্যদের প্রভাবিত করিতে পারে না। এবম্বিধ পদ্ধতিতে নির্বাচন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নির্বাচিত সদস্যের উপর নির্বাচকমণ্ডলীর আর কোন প্রভাব'ও থাকে না। এমতাবস্থায় দেশে রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠার পথে যা কিছু অন্তরায়, উহার অবসান ঘটাইতে হইবে।

দেশে যতক্ষণ না সত্যিকার গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটিতেছে, ততক্ষণ আমাদিগকে সামগ্রিকভাবে দেশের সব ধরনের সমস্যাকে জাতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিতে হইবে। জীবনের সর্বস্তর হইতে তাহা তিনি সাধারণ নাগরিকই ইউন, আর বুদ্ধিজীবী বা চাকুরীজীবীই হউন-সকলকে আজ সমবেতভাবে আগাইয়া আসিতে হইবে এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য।

উপসংহারে আমরা বলিতে চাই যে, আজ এক বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন; স্থিরতাহীনতার মধ্য দিয়া সে আগাইয়া চলিয়াছে। এই ব্যবস্থা কেবল যে আমাদের নিকটই বিচিত্র ঠেকিতেছে, তাহা নহে।

রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে আজ প্রয়োজন গভীর সম্প্রীতি, পূর্ণ সমঝোতা ও সহযোগিতা-যাহাতে সংঘবদ্ধ একটি জাতি হিসাবে যেকোন অভাবিতপূর্ণ জরুরী অবস্থারও

আমরা মোকাবেলা করিতে পারি। যাঁহাদের হস্তে আজ দেশের ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্ব বর্তাইয়াছে, এই ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং একটি সুষ্ঠু ও সুনিশ্চিত ভিত্তির উপর একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়িয়া তুলিবার এই বিরাট দায়িত্ব আজ তাঁহাদেরকেই বহন করিতে হইবে।

আসুন, যতশীঘ্র সম্ভব আমরা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ শেষ করিয়া এই বিতর্কের হাত হইতে নিজদিগকে মুক্ত করিয়া অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার দুর্জয় সংকল্প লইয়া একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে গঠনমূলক কাজে মনোনিবেশ করি।" বিবৃতিতে যাঁহারা স্বাক্ষর করেন তাঁহারা হইতেছেনঃ নূরুল আমিন, আতাউর রহমান খান, হামিদুল হক চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার, শেখ মুজিবর রহমান, ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), মাহমুদ আলী, সৈয়দ আজিজুল হক ও মোহসেন উদ্দিন আহমদ (দুদু মিয়া)।

(ঢাকা, ২৪শে জুন, ১৯৬২)।

৮ই জুলাই (১৯৬২) ঢাকার আউটার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় ৯ নেতা সংবিধান প্রণয়নের জন্য জনগণ কর্তৃক গণপরিষদ নির্বাচন এবং দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দ যথা- শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী, সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফার খান, আবদুস সামাদ খান আচাকজাঁই, আল্লামা মাশরেকীসহ বিনাবিচারে আটক সকল রাজবন্দীর অবিলম্বে মুক্তিদানের দাবী জানান।

পূর্ব পাকিস্তানে জনমতের ঢেউ এবং জাতীয় প্রাদেশিক পরিষদ অভ্যন্তরে বিরোধী দলীয় সদস্যদের ভূমিকা সমগ্র পাকিস্তানে রাজনৈতিক শূন্যতা অবসানের অপ্রতিরোধ্য আবেদন সৃষ্টি করে এবং পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে ইস্পাতদৃঢ় ঐক্যের শুভ সূচনা ঘটায়। ঢাকা ও করাচী হইতে ন্যাশনাল ফ্রন্ট গঠনের আওয়াজ উঠে। ৯ই মে (১৯৬২) প্রেসিডেন্ট আইউব খান কর্তৃক জারিকৃত পলিটিক্যাল পার্টিস অর্ডিন্যান্স রাজনীতিবিদদের ঐক্যে আরও দৃঢ় হইতে সহায়তা করে। রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দের ঐক্যে ভীত সন্ত্রস্ত প্রেসিডেন্ট আইউব খান জনতার ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করিবার মানসে ১৯৬২ সালের ১৪ই জুলাই 'রাজনৈতিক দল বিধি' (Political parties Act) প্রণয়ন করেন। সেপ্টেম্বর মাসে করাচীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ কনভেনশনে নির্দলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা প্রেসিডেন্ট আইউব খান স্বয়ং চৌধুরী খালেকুজ্জামানের নেতৃত্বে পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কনভেনশন) গঠন করেন ও উত্তরকালে ইহার নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন।

সোহরাওয়ার্দীর কারামুক্তি

পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যতম স্রষ্টা ও পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মান্যবর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে ৩০শে জানুয়ারী (১৯৬২) গ্রেফতার ১৯শে আগস্ট (১৯৬২) কারামুক্তিকালে নিম্নলিখিত প্রেসনোটেই অবৈধ সেনাপতি রাজের জঘন্য চেহারা প্রতিভাত হয়। কারামুক্তির পর জনবরেণ্য নেতার সরকারী প্রেসনোটের প্রতিবাদে দেয় উত্তরও নিম্নে দেওয়া হইলঃ

The press Note of January 30 explaining the reasons of his arrest had said in part:

"It is already well known that Mr. Suhrawardy ever since the inception of pakistan had been for reasons of personal aggrandisement, indulging in activities which were of a highly prejudicial nature and it would not be unfair to say that in a large measure, he along with several others, was responsible for the predicament in which Pakistan found itself in the latter half of 1958. The role played by Mr. Suhrawardy and people of his ilk had virtually brought the country to the brink of major disaster and led to the revolution. With the consummation of the revolution the rot that had set in was stemmed-not only was it stemmed but positive gains were achieved in the course of the last three years and more. Throughout this period it has been the avowed policy of the Government not to victimise or punish any one for his past misdeeds even though they bordered on the criminal. And it was for this reason that even the politicians whose conduct had been scrutinsed by EBDO tribunals were treated generously. Mr. Suhrawardy was one of such persons.

But Mr. Suhrawardy misunderstood this generosity and as his ambitions knew no bounds be continued to indulge in activities prejudicial to the integrity and safety of Pakistan. It is a sad thought that a man of his inteligence and experience, instead of serving the country in the manner of a good patriot has taken it upon himself to play a destructive role. Even after the revolution Mr. Suhrawardy has openly associated with anti-Pakistan elements both within and out side the country."

"It was in these circumstances that the Government have been reluctantly compelled to order the detention of Mr. Suhrawardy whose activities in the recent past have been fraught with such danger to the security and safety to Pakistan that one could fairly describe them as being treasonable."

Following is the text of the Press Note issued by the ministry of Home Affairs:

Mr. H.S. Suhrawardy was detained under the Security of Pakistan Act, 1952 on January 30, 1962 as such a step was then considered

necessary to prevent him from acting in a manner prejudicial to the security of Pakistan.

"The Government is now satisfied that Mr. Suhrawardy will not henceforth participate in any disruptive activities."

"It has, therefore, been decided to release him forthwith and an order of his release was accordingly been issued today August 19, 1962".

Following is the text of the statement issued by former Prime Minister, Mr. H.S. Suhrawardy, on his release from Karachi Central Jail after over six months of detention:

After giving praise to Allah and the holy Prophet (Peace be on him), I wish to thank all those people, who have been demanding my release, within the legislatures and outside particularly those, who had not believed the charges, that were levelled against me.

I hardly think it necessary to deny that I was attempting to disrupt East pakistan and thereafter planned to disrupt West pakistan, that I was not above taking money from enemy sources or-that I was indulging in treasonable activities for those who know me and who know the services that I have rendere in the creation of Pakistan and perhaps the services which I rendered during the time I was the prime Minister of this country can not Possibly be given credence to this.

Incidentally these allegations, which were published against me, had nothing to do, whatsoever, to the reasons given to me by the Central Government for my detention. These were entirely different and I need hardly to discuss them.

I thank my friends all the more because I had never the chance to deny these charges and yet from the very kind words that have been expressed on my behalf, it would appear that it was not necessary for me to do so and the charges have not been believed.

During my detention, other people, too, were let loose to make foul charges against me. Thanks to the protection of Allah and his prophet (peace be on Him), my forefathers and respected parents, none of these appear to have been believed.

I was to thank particularly my student friends. May Allay bless them

and keep them on the right path and may they always serve the cause of truth and justice. I hug them and embrace them.

It is a foul charge against them that they are the tools of Subersieve elements. The students know their own mind very well and there is no need for any body outside their category to influence them.

At present, do not feel strong enough to make a long statement and deal with controversial matters which have arisen during the last few months. But I would like to say one thing just now, which I should expand later.

Please stop the campaign of Vilification and abusive language against the 'discredited" politician. For four years there has been a campaign to discredit us. At the end of four years, it is those "discredited" politicians that the country is looking forward for a lead.

What is the point in carrying on this compaign further. As a matter of fact we have noticed that this campaign is backfiring. Let us now, if we want to serve the country start with constructive thinking instead of vitiating the atmosphere by vilification and abusive language.

In conclusion Mr. Suhrawardy hoped that other political workers now detained in Jail would also be released by the Government.

সমগ্র দেশব্যাপী রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে ১৯৬২ সালের ১৯শে আগষ্ট মুক্তি দান করেন। কারামুক্তির পর চিকিৎসার জন্য তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। হাসপাতাল ত্যাগের পর জনাব সোহরাওয়ার্দী ৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকা আগমন করেন। ঢাকা বিমান বন্দরে লক্ষ লোকের জনসমুদ্র সোহরাওয়ার্দীকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট

বিক্ষুব্ধ ছাত্র সমাজের শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের আন্দোলন ১৭ই সেপ্টেম্বর এক মর্মান্তিক ঘটনায় পরিণতি লাভ করে। অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, আন্দোলন বা হৈ চৈ প্রসূত মনোভাবই ছিল শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মূল কারণ। পেশাদার ছাত্র নেতৃবৃন্দ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের মত উত্তম রিপোর্টটির বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হইয়া উঠিলে অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিতে এই রিপোর্ট বাতিল ঘোষিত হয় ও ১৯৬৩ সালে পরীক্ষার্থী ছাত্রদের বিনা পরীক্ষায় বি.এ, বি.কম, বি.এস.সি ডিগ্রী প্রদান করা হয়। এই ধরনের উদ্ভট সিদ্ধান্তের বিস্ময়কর দিকটি হইতেছে পাঠ্য বিষয় কি হইবে, তাহার সিদ্ধান্ত গ্রহণের মালিক ছাত্ররা-শিক্ষকগণ নয়। যেন রোগীই ডাক্তারকে প্রেসিক্রিপশন অর্থাৎ ঔষধ

ও পথ্য বাতলাইয়া দিতেছে, কি হাস্যকর পরিস্থিতির শিকার আমরা! যাহা হউক, ১৭ই সেপ্টেম্বর ছাত্র বিক্ষোভকালে পুলিশের গুলীতে কয়েকটি তাজা তরুণকে প্রাণ দিতে হয়। জনাব সোহরাওয়ার্দীর আহ্বানে গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে ৭ই অক্টোবর সমগ্র পাকিস্তানে "প্রতিবাদ দিবস" পালিত হয়।

সংবিধানের গণতন্ত্রায়ন

কারামুক্তির পর জনাব সোহরাওয়ার্দী প্রারম্ভেই "নয় নেতা'র বিবৃতির সহিত একাত্মতা ঘোষণা করেন। তবে সেই সাথে বাস্তবতার আলোকে ১৯৬২-র সাংবিধানিক গণতন্ত্রায়নের (Democratisation of the Constitution) সুনির্দিষ্ট নিয়মতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক পন্থাও তিনি দেশবাসীর নিকট পেশ করেন। ইহা নিঃসন্দেহে সোহরাওয়ার্দীর অশেষ বিচক্ষণতা ও বাস্তব রাজনৈতিক প্রজ্ঞার নিদর্শন ছিল; কেননা প্রেসিডেন্ট আইউব খানের প্রতি সংবিধান বাতিল করিয়া নির্বাচিত গণপরিষদ দ্বারা নূতন সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে ৯ নেতার আহ্বান মোটেও বাস্তবসম্মত ছিল না। জনাব সোহরাওয়ার্দীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নিম্নলিখিত স্বাক্ষরদানকারীগণ কর্তৃক সংবিধান গণতন্ত্রায়নের সংকল্প ঘোষিত হয়ঃ

মাওলানা আবুল আলা মওদুদী, মাওলানা তোফায়েল মোহাম্মদ, জামায়াতে ইসলামী; মাহমুদ আলী কাসুরী, সি.আর, আসলাম, ন্যাপ; কর্নেল আবুল হোসেন, রিপাবলিকান পার্টি, আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবর রহমান, আবদুস ছালাম খান, খাজা খায়ের উদ্দিন, মোশতাক আহমদ গুরমানী, সাবেক গভর্নর পশ্চিম পাকিস্তান; মৌলভী গোলাম মোহাম্মদ, মেজর ইসহাক, চৌধুরী ফজল ইলাহী, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান, মাহমুদ আলী, মোহাম্মদ সোলায়মান, সৈয়দ আজিজুল হক, ইউসুফ আলী চৌধুরী, সর্দার মাহমুদ খান, রাজা গোলাম নবী, মাহমুদুল হক ওসমানী, জয়েন উদ্দিন, আখতার উদ্দিন খান, মনজরুল হক, হায়দর বকস জাতোই, শেখ আবদুল মজিদ সিন্ধী, আলী বকস খান তালপুর, ইউসুফ খাটক, গোলাম মোস্তফা ভুরঘুরি, সর্দার বাহাদুর খান, ফজলুর রহমান, আবুল কাসেম, মিঞা মোমতাজ দওলাতানা, গোলাম জিলানী খান, মোহাম্মদ হোসেন চাট্টা, জাতীয় পরিষদ সদস্য; মোহাম্মদ ইউসুফ খাটক, জাতীয় পরিষদ সদস্য; সর্দার এম, আইয়ুব, প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য; আহমদ সৈয়দ কিরমানী, প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, সর্দার মোহম্মদ জাফরুল্লাহ, জেড, এইচ, লারী, জৈন নোরানী, সৈয়দ ইবনে হাসান,, এম, এইচ, এ, গাজদার, আগা গোলাম নবী পাঠান, কাজী ফয়েজুল্লাহ, হাজ মাওলা বকস খসরু, গোলাম মোহাম্মদ খান, গোলাম আলী তালপুর, জাতীয় পরিষদ সদস্য, কাজী ফয়েজ মোহম্মদ, রসুল বকস তালপুর, মোহাম্মদ হানিফ সিদ্দিকী, এম, এ, খুরু, আলী গহর খুরু।

আজম খানের পদত্যাগ

প্রেসিডেন্ট আইউব খানের সহিত মতবিরোধ দেখা দেয়ায় লেঃ জেঃ আজম খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদ হইতে ইস্তফা দেন। তদস্থলে জনাব গোলাম ফারুক এপ্রিল মাসে

(১৯৬২) গভর্নর হইয়া আসেন। কিছুকাল পর স্বাস্থ্যগত কারণে গভর্নর গোলাম ফারুক পদত্যাগ করিলে প্রেসিডেন্ট আইউব ২৮-১০-৬২ ইং তারিখে তাহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আবদুল মোনায়েম খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন।

ভাসানীর অনশন

বন্দী জননেতা মাওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানের বন্যাকবলিত দুর্গতদের জন্য ২৫ কোটি টাকা খয়রাতি সাহায্য, পাটের ন্যায্যমূল্য, মোহাজেরদের পুনর্বাসন ও ক্রুগ মিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ব্যবস্থার দাবীতে ২৬শে অক্টোবর (১৯৬২) হইতে অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করেন। তাঁহার স্বাস্থ্যের অবনতি দেখা দিলে ২৭শে অক্টোবর তাঁহাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।সর্বজনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী, নূরুল আমিন, আবু হোসেন সরকার, আতাউর রহমান খান, হামিদুল হক চৌধুরী, ইউসুফ আলী চৌধুরী, পীর মোহসেন উদ্দিন আহমদ (দুদু মিয়া), সৈয়দ আজিজুল হক, শেখ মুজিবর রহমান, মাহমুদ আলী, শাহ আজিজুর রহমান প্রমুখ ২৯শে অক্টোবর অনশনরত মাওলানা ভাসানীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দেশের ও দশের স্বার্থে অনশন ভংগ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ জানান এবং বিবৃতিতে মাওলানা ভাসানীকে মুক্তি দানের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান। অবশেষে প্রবল অপ্রতিরোধ্য গণদাবীর মুখে সরকার ৩রা নভেম্বর (১৯৬২) মাওলানা ভাসানীর উপর হইতে সকল প্রকার বাধা-নিষেধ ও অন্তরীণাদেশ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন।

রাজবন্দী মুক্তি

জনগণের চাপে জুন, জুলাই ও আগষ্ট মসে (১৯৬২) বেশ কিছু সংখ্যক বিনাবিচারে আটক রাজবন্দীকে মুক্তিদান করা হয়। ১৩ই আগষ্ট পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে নিরাপত্তা আইন সংশোধন করিয়া নিরাপত্তা বন্দীদের আটক পর্যালোচনা করিবার জন্য হাইকোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে একটি রিভিউ বোর্ড গঠনের আইন পাস করা হয়। এই সময়ে প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দলীয় সদস্যদের একান্ত চাপ প্রয়োগে ক্রোধানিত্ব অর্থমন্ত্রী হাফিজুর রহমান সদর্পে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, অভ্যস্ত বা পাশব অপরাধী ব্যতীত অন্য সকলকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে (Released all except the hardended criminals)। এককালে ইংরেজ শাসকের তাবেদার হাফিজুর রহমানের মুখে এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য আমাকে কারান্তরালে শুধু হতভম্বই করিয়াছে। এই প্রকার অপ্রত্যাশিত মন্তব্য শাসক মহলের বিকৃত মনোভাবপ্রসূত। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর এই ধরনের অসহিষ্ণু ও অন্যায় আচরণ এবং বক্তব্য যে রাষ্ট্রের স্বাচ্ছন্দ্য গতির সমূহ ক্ষতি করিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

চীন-ভারত সীমান্তঃ ক্রুশ্চেভের ভূমিকা

গণচীন গোড়া হইতেই চীন-ভারত সীমান্ত "ম্যাকমোহন লাইন" মানিয়া নিতে অস্বীকৃতি জানাইয়া আসিতেছিল। উক্ত বিষয়ে মতান্তর ১৯৫৯ সাল হইতে ক্রমাগতভাবে তিক্ততার রূপ পরিগ্রহ করে এবং 'হিন্দি-চীনী ভাই ভাই' মধুর সম্পর্ক ১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর

উভয় দেশের মধ্যে সংঘর্ষে রূপান্তরিত হয়। বৃহৎ শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে জোরদার করিবার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহায়তাদানে অতি উৎসাহ প্রদর্শন করে। পক্ষান্তরে সোভিয়েট রাশিয়া চীনের সমমতাদর্শী হওয়া সত্ত্বেও ভারতের মত আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দাবীর যৌক্তিকতাকে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মানব সভ্যতা বিধ্বংসী আণবিক অস্ত্রের মারাত্মক শক্তি সম্পর্কে সচেতন নিকিতা ক্রুশ্চেভ মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখিবার স্বার্থেই সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ও ধনতান্ত্রিক বিশ্বের "শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান" নীতি অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালনে সচেষ্ট ছিলেন। ক্রুশ্চেভ কর্তৃক বিশ্ব যুদ্ধ সূত্রপাতের সামান্যতম কারণকেও উৎসাহ না দেওয়ায় অটল ছিল, ১৯৫১ সালেও সোভিয়েত রাশিয়া গণচীনকে অদূরদর্শী পদক্ষেপে উৎসাহ দেওয়া হইতে বিরত ছিল। মাওসেতুং যখন "সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা গোষ্ঠীকে কাগুজে বাঘ" (Paper Tiger) ও অন্যান্য অসার ভাষার কথা মালায় তুচ্ছ করিয়া সভ্যতা বিধ্বংসী আণবিক যুদ্ধের পটভূমিকা সৃষ্টির প্রচেষ্টায় লিপ্ত, ক্রুশ্চেভ তখন তাঁকে কাগুজে বাঘদের আণবিক দাঁত আছে, (Paper tiger have nuclear teeth) কথাটা স্মরণ করাইয়া দিতে ইতঃস্তত করেন নাই। মানব সভ্যতার মহা সংকটময় মুহূর্তে ক্রুশ্চেভের মত ব্যক্তি সোভিয়েট রাশিয়া তথা বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন বিধায় আণবিক যুদ্ধ অতি সতর্কতার সহিত এড়ানো সম্ভব হইয়াছে। তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ারের সহিত ক্যাম্প ডেভিডে মিলিত হইয়া শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করেন। আগামী দিনের ইতিহাসবেত্তাগণ ক্রুশ্চেভের এই পদক্ষেপের যথার্থতা লিপিবদ্ধ করিতে কার্পণ্য করিবেন না বলিয়া আমার বিশ্বাস। অবশ্য ইহার ফলে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত হয়। বলাই বাহুল্য যে, মানবজাতি ও সভ্যতা সংরক্ষণ ও অগ্রযাত্রার একান্ত প্রয়োজনেই কমিউনিষ্ট বিশ্বের এই দ্বিধাবিভক্তি ছিল এক ঐতিহাসিক অপরিহার্যতা (Historical imperative) ক্রুশ্চেভের বাস্তব বুদ্ধির আরেকটি নিদর্শন ১৯৬২ সালের ২৮শে অক্টোবর কিউবা হইতে আণবিক যুদ্ধাস্ত্র প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা। এই সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র দুর্বলতাপ্রসূত- এই ঢালাও মন্তব্য কেবলমাত্র মানবপ্রেম বিবর্জিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষেই করা সম্ভব। পক্ষান্তরে ইহা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তথা সভ্যতা বিধ্বংসী আণবিক সংঘর্ষ পরিহারে ক্রুশ্চেভের অনন্য ভূমিকা হিসাবেও চিহ্নিত হওয়ার দাবী রাখে। সবাই স্বীকার করিবেন, স্টালিন শাসনের হত্যা ও নিধনের ভাষাকে ক্রুশ্চেভ সোভিয়েট নাগরিকদের জীবনে, নিরাপত্তার ভাষায় রূপান্তরিত করিবার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করিয়া গিয়াছেন। মানবাধিকারের ইতহাসেও যে নিরপেক্ষ মূল্যায়নে তাঁহার নাম যথাযথ মর্যাদার সহিত উচ্চারিত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্মার্তব্য যে, ক্রুশ্চেভ ১৯৫৮ সালের ২৭শে মার্চ সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রীত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং ক্ষমতার কোন্দলে পড়িয়া ১৯৬৪ সালের ১৪ই অক্টোবর তাঁহার পদত্যাগ করিতে হয়।

গণচীন সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক আন্তর্জাতিক সীমান্ত ম্যাকমোহন লাইন অতিক্রমকে ১৯৬২ সালের ১লা নভেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির জাতীয় কাউন্সিল ৬০-৩০ ভোটে দ্ব্যর্থহীনভাবে "ভারত আক্রমণ" ঘোষণা করে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরু ইতিমধ্যে (২০শে নভেম্বর ১৯৬২ ইং) মার্কিন শক্তিদ্বয়ের সমীপে সাহায্য প্রার্থনা করেন

এবং এর আগে ২২শে অক্টোবর (১৯৬২) জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে আজাদী রক্ষার অগ্নি পরীক্ষায় দলমত-নির্বিশেষে সকল ভারতীয় নাগরিকের সাহায্য-সহায়তা কামনা করেন। চীন-ভারত যুদ্ধে নেফা এলাকায় অর্থাৎ ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বিপর্যয়বরণ ও ছত্রভঙ্গ হওয়ার মত সংকটময় পরিস্থিতিতে ২৬শে অক্টোবর (১৯৬২) সমগ্র ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। ইহার পর পরই ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির রাজনীতি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়ে এবং জ্যোতিবসু ও নামুদ্রিপদের নেতৃত্বে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসিষ্ট) নাম ধারণ করে। দেশ ও দেশের মাটির প্রতি এই ধরনের আনুগত্য নিবেদন এতকাল আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট বিশ্বে অকল্পনীয় ও অচিন্তনীয় ছিল। স্বীকৃত কমিউনিষ্ট প্রভুর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন বিভিন্ন কমিউনিষ্ট পার্টির জন্য অবশ্য করণীয়। ইহাই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের নিয়ম-আইন ও ভিত্তি। গোঁড়া ধর্মান্ধ ও কমিউনিষ্টদের মধ্যে মূলতঃ চারিত্রিক কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান এস,এ, ডাংগের সুযোগ্য নেতৃত্ব এইভাবেই কমিউনিষ্ট আন্দোলনে এক নূতন ধারা সংযোজিত করে। ইহাই উত্তরকালে ফুলে ফুলে বিকশিত হইয়া "এককেন্দ্রীক" কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে বিভিন্ন দেশের মাটির নানান বাস্তব পারিপার্শ্বিকতাকে স্বীকার করিবার মত আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে এবং পরিণতিতে "বহু কেন্দ্রিক" কমিউনিষ্ট আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। ফলে উন্মোচিত হইয়াছে কমিউনিষ্ট বিশ্বে এক নব দিগন্ত। অবশ্য উল্লেখ্য যে, কমিউনিষ্ট বিশ্বের শিরোমণি সোভিয়েট রাশিয়া মতভেদ সত্ত্বেও প্রকাশ্যে গণচীনের পররাজ্য আক্রমণের ভুমিকাকে সমালোচনা করে নাই বা মতদ্বৈততা প্রকাশ করে নাই। অন্ধ অনুসরণে বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়। তাই এই কথা স্বীকার করিতে হইবে, ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি সভ্যতার অগ্রযাত্রায় এইভাবেই এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করিয়াছে। আমি মনে-প্রাণেই বিশ্বাস করি যে, তর্ক-বিতর্কের গর্ভেই আবিষ্কৃত হইবে মানব সভ্যতার অগ্রাভিযানে সুপ্ত দিক-দর্শন। তাই মুক্তবুদ্ধির অনুসারী হিসাবে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির এই সাহসিক পদক্ষেপকে মুক্ত মনেই অভিনন্দন জানাইতে সেইদিন আমার এতটুকু কুণ্ঠা জাগে নাই।

কারামুক্তি

আগেই বলিয়াছি, নিরাপত্তা বন্দীদের মুক্তি বিবেচনার নিমিত্ত পূর্ব পাকিস্তান সরকার ১৩ই আগষ্ট প্রাদেশিক পরিষদে সংশোধনী বিধি অনুযায়ী পর্যালোচনা বোর্ড (Review Board) গঠন করেন। পর্যালোচনা বোর্ডে ব্যক্তিগত হাজিরা দেওয়ার প্রয়োজনে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার হইতে আমাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁহার পত্নী প্রচুর খাদ্যদ্রব্যসহ আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের সহৃদয়তায় আমি মুগ্ধ হইলাম। ইতিপূর্বে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকাকালেই শেখ সাহেব আমাকে ১৯৬২'র সংবিধান (আইউব সংবিধান)-এর কপি পাঠাইয়াছিলেন। সে সম রাজশাহীতে জনাব সহরোয়ার্দী ও আতাউর রহমানের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় শেখ মুজিব বলেন যে আমাদের নেতা অলি আহাদ রাজশাহীর কারাগারে বন্দী অবিলম্বে তার মুক্তি চাই। সে দিনের মুজিব ভাইয়ের এই কথায় কারাগারে আমার সম্পর্কে অনেকের উৎসাহ জাগে যারা আমাকে চিনতো না তারা আমাকে চিনলো- মোট

কথা কারাগারে আমার সম্মান অনেক বৃদ্ধি পোলো। মুজিব ভাই ও ভাবীর রাজনৈতিক মতবাদ ও কর্মধারার সহিত আমার প্রভূত গড়মিল থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সময়ে আমার প্রতি তাঁহাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও সৌহার্দ্য আমাকে চিরকাল তাঁহাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যাঁহারা রাজনৈতিক মত-বিরোধকে সামাজিক সম্পর্কোচ্ছেদের সোপান হিসাবে ব্যবহার করেন; এই ঘটনার উল্লেখে আশা করি তাঁহাদের চক্ষু উন্মিলিত হইবে, তাঁহারা অতঃপর ইহার অন্তর্নিহিত মূল্য ও তাৎপর্য অনুধাবনে সচেষ্ট হইবেন।

যাহা হউক, পর্যালোচনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন বিচারপতি আবদুস সাত্তার ও সদস্য ছিলেন স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় সেক্রেটারী আলী হাসান (সি,এস,পি)। পর্যালোচনাকালে বোর্ডের চেয়ারম্যানের সহিত শুভেচ্ছা বিনিময়ান্তে তাঁহার উদ্দেশ্যে বলি যে, "My Lord, My Submission shall be against the heady & power drunk executives & if the detaining authority Home Secretary All Hassan talks, I shall immediately withdraw."

অর্থাৎ "ক্ষমতা মদমত্ত আমলাদের বিরুদ্ধেই আমার বক্তব্য উপস্থাপিত করিব। এই অবস্থায় আমাকে আটককারী স্বরাষ্ট্র সেক্রেটারী আলী হাসান যদি একটি কথাও উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিব।" যাহা হউক, বিচারপতি সাত্তারই সর্বক্ষণ একাকী বিভিন্ন প্রশ্নে আমার সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইয়া যান। অতঃপর ৬ই ডিসেম্বর (১৯৬২) বৃস্পতিবার আমি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করি।

রাজনৈতিক দলিলাদি বিনষ্ট

সামরিক শাসন প্রবর্তনের কিছুকাল পর আমি একটি ট্রাংক ভর্তি রাজনৈতিক বিভিন্ন দলিলপত্র আমার অগ্রজতুল্য শ্রদ্ধেয় আবদুর রউফ সাহেবের বাসায় জমা রাখি। পরিতাপের বিষয়, কারামুক্তির পর ট্রাংকটি আনিতে গিয়া অবগত হই যে, পুলিশী হামলার অনর্থক চিন্তায় ভীত-সন্ত্রস্ত রউফ ভাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে কাগজপত্রগুলি অগ্নি সংযোগে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৫৯ সালে চট্টগ্রামে গ্রেফতার হওয়ার পর আমার অগ্রজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ডঃ আবদুল করিমের বাসায় কয়েকবার খানা তল্লাশি করা হইয়াছিল। তাই, তাঁহার বাসায় রক্ষিত রাজনৈতিক দলিলপত্রগুলিও এক আত্মীয়ের বাসায় স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উল্লিখিত এই আত্মীয়টিও সামরিক আইনের ভয়ে শংকিত হইয়া এইসব কাগজপত্রও অগ্নিদাহ করেন। তবে আমার স্নেহময়ী বড় বোন রওশন আখতার তাঁহার নিকট রক্ষিত আমার কাগজপত্রগুলি যক্ষের ধনের ন্যায় আঁকড়াইয়া রাখেন এবং কারামুক্তির পর আমাকে সকল কাগজপত্র বুঝাইয়া দেন; ইহার ফলেই আজ আমার পক্ষে দলিল নির্ভর ঘটনারাজি বর্ণনা সম্ভব হইতেছে। আপার স্বামী জনাব মতিউর রহমান সাহেব ছিলেন চট্টগ্রাম বন বিভাগের ডেপুটি কনজারভেটর অব ফরেষ্টস।

কারা মুক্তির পর

কারামুক্তির পর শেখ মুজিবর রহমানের সহিত আমার রাজনৈতিক বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা হয়। আমরা উভয়ই জেনারেল আইউব খানের একনায়কত্ববাদের বিরুদ্ধে

জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নীতিগত, কৌশলগত ও সাংগঠনিকগত দিক লইয়া আলোচনা করি। এই সময়ে মফঃস্বল সফরান্তে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের নির্দিষ্ট দিবসে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য শেখ মুজিবর রহমান ও আমি ঢাকা ফুলবাড়িয়া ষ্টেশনে যাই। ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়াই জনাব সোহরাওয়ার্দী উপস্থিত সকলের সহিত শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর আমার দিকে তাকাইয়া তরল হাস্যে মন্তব্য করেন, "তোমাকে ছাড়িয়াছে। গভর্নর মোনায়েম খান ঠিক করেন নাই"। তদুত্তরে আমিও হাস্যরসের অবতারণা করিয়া বলি "স্যার, আপনাকেও মুক্তি দিয়ে প্রেসিডেন্ট আইউব খান ভাল করেন নাই। কেননা আপনি তো গণতন্ত্রের দাবীতে গোটা দেশের জনগণকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছেন।" ইহার পর ষ্টেশনের বারান্দায় দাঁড়াইয়া তিনি উচ্চস্বরে অভিযোগ জানাইলেন, "মার্কিনীরা আমার জন্য গাড়ী পাঠায় নাই কেন? কি করিয়া যাইবো"---- কথা বলিবার সাথে সাথে দুষ্ট ও মিষ্টি হাসি দিয়া আমার দিকে তাকাইলেন। বুঝিলাম, লক্ষ্য আমি। উত্তরে আমি বলিলাম, স্যার, সোভিয়েট রাশিয়ার কর্ণধার নিকিতা ক্রুশ্চেভ ও কিউবার একনায়ক ফিডেল কেষ্ট্রোকে সামাল দিতে গিয়া প্রেসিডেন্ট কেনেডির প্রাণ ওষ্ঠাগত, তাই আপনার গাড়ীর কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। এইভাবে তরল পরিহাস্যোচ্ছলে আমার মনের কোনে পুঞ্জীভূত সঙ্কোচ কাটাইয়া উঠিবার ব্যাপারে তিনি আমাকে সংগোপনে সহায়তা করিতেছিলেন। মনে পড়ে, আওয়ামী লীগের কর্মী থাকাকালে ১৯৫৫ সালে জনাব সোহরাওয়ার্দীকে করাচীর পথে আমরা তেজগাঁও বিমান বন্দরে বিদায় জানাইতে গিয়াছিলাম। জনাব সোহরাওয়ার্দী আমার সাংগঠনিক সফরসূচী জানিতে চাহেন ও আর্থিক অনটনের কাহিনী শুনিয়া চট্টগ্রামের জনাব আমীর হোসেন দোভাষকে ডাকিয়া বলেন, "অলি আহাদকে টাকা দিও।" "I can say every pie will be rightly spent. He is honest to the pie". আরো উল্লেখ্য যে, ১৯৬৩ সালে দৈনিক ইত্তেফাকের মালিক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন সাহেবের কাকরাইলের বাসায় জনাব সোহরাওয়ার্দী ব্যারিষ্টার ডঃ কামাল হোসেনের নিকট যে উচ্ছসিত প্রশংসার ভাষায় আমার পরিচিতি তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহাতে আমি নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়ি। উপরের দুইটি ঘটনা সোহরাওয়ার্দীর বিরাট মনের পরিচয় বহন করে। ইহা কেবল সোহরাওয়ার্দীর পক্ষেই সম্ভব ছিল; কেননা, তিনি ছিলেন পরশ্রীকাতর বাংগালী চরিত্রের ব্যতিক্রম।

এইস্থলে অন্য একটি ঘটনা উল্লেখের লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা অপরাহ্ন চারটায়। ঢাকায় অবস্থানরত নেতা সোহরাওয়ার্দীকে সভায় সময়মত (Punctually) উপস্থিত হইতে পুনঃপুনঃ স্মরণ করাইয়া আমি ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার নিকট হইতে পূর্বাহ্নে বিদায় গ্রহণ করি। স্মরণ করাইবার কারণ, বাংগালী নেতাদের সময়জ্ঞান নাই। আর আমার নিজের গর্ব আছে, আমি ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় চলি। যদিও নেতা যথাসময়ে সভায় হাজির হইবেন বলিয়া কথা দিয়াছিলেন, তবুও চিরাচরিত অভ্যাসবশতঃ তাঁহার সেই কথায় বিশেষ আস্থা স্থাপন করি নাই; অথচ আমি নিজেও নির্ধারিত সময় অপরাহ্ন চার ঘটিকায় আওয়ামী লীগ সদর দফতর ৫৬ নং সিম্পসন রোডে যাই নাই। কিন্তু জনাব সোহরাওয়ার্দী নির্ধারিত

চার ঘটিকায় সভায় যোগ দিতে অফিসে আসেন। আমরা কেহই তখন উপস্থিত হই নাই। সার্কস্কিন স্যুট পরিহিত সোহরাওয়ার্দী অফিস পিয়ন শামসুর ময়লা দড়ির খাটিয়ায় দিব্যি দিবা-নিদ্রায় আত্মসমর্পণ করিলেন। বেশ কিছু পরে উপস্থিত হইয়া শেখ মুজিবর রহমান ও আমি অফিস বারান্দায় ফুলস্যুট পরিহিত ঘুমন্ত সোহরাওয়ার্দীকে দেখিয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলাম। পিয়নের ময়লা খাটিয়ায় এইভাবে অবলীলায় নিদ্রা যাওয়া একমাত্র কর্মবীর সোহরাওয়ার্দীর পক্ষেই সম্ভব। মানুষের আর্থিক সংকটে সোহরাওয়ার্দী হাইকোর্ট মামলায় সদ্য উপার্জিত অর্থের শেষ কপর্দক পর্যন্ত এক মুঠায় বিলাইয়া দিয়া পরক্ষণেই স্বীয় চলিবার টাকার জন্য ঋণ করিতে দ্বিধা করেন নাই। বাংগালী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীবৃন্দ সোহরাওয়ার্দী উপার্জিত টাকা কিভাবে লুট করিয়াছে, তাহাও দেখিয়াছি।

সোহরাওয়ার্দী কর্মীদের সহিত আদর্শিক সম্বন্ধের চাইতে ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর বেশী গুরুত্ব দিতেন; তাই কর্মীর সহিত সম্পর্কোচ্ছেদে তিনি বিচলিত হইতেন ও মনে আঘাত পাইতেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা বৃহৎ শক্তির সহিত সামরিক জোটে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব খর্ব ও বিশ্বশান্তি বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া আমি সোহওরায়ার্দী অনুসৃত পররাষ্ট্র নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিলে তিনি এতই আঘাত পান যে, ঢাকার জগন্নাথ হলে অবস্থিত পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের বারান্দায় আমার প্রথম দর্শনেই মন্তব্য করেন "You have stabbed me in the back" অর্থাৎ "তুমি পিছন হইতে আমাকে ছুরিকাঘাত করিয়াছ।" ব্যথায় আমার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। কিছুতেই বুঝাইতে পারি নাই যে, ইহা আমার সৎ আদর্শিক মতভেদ, সংগঠন কর্তৃক গৃহীত ও অনুসৃত নীতিরই আমি প্রতিধ্বনি করিয়াছি মাত্র। বিষয়টি সোহরাওয়ার্দী আবেগজনিত দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন; তাই এই ব্যাপারে তিনি ভাবাবেগপ্রসূত মন্তব্য করিয়াছেন। আদর্শও বড়, ব্যক্তি সম্পর্কও বড়, কোনটি কোন চরিত্রে প্রাধান্য লাভ করিবে, তাহা দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভরশীল।

ঢাকা ফুলবাড়িয়া ষ্টেশন হইতে আমরা জনাব সোহরাওয়ার্দীর সহিত দৈনিক ইত্তেফাকের মালিক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনের কাকরাইলস্থ বাসভবনে গমন করি। জনাব সোহরাওয়ার্দী তথায় অবস্থান করিতেন। প্রেসিডেন্ট আইউবের ব্যক্তি শাসন বিরোধী গণআন্দোলনের প্রকৃতি ও গতিধারার উপর আলোকপাত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সহিত পুনরায় দেখা করিবার নির্দেশ দিয়া জনাব সোহরাওয়ার্দী আমাকে বিদায় দিলেন। নির্ধারিত সময়ে তাঁহার সহিত দেখা করিলে তিনি স্বীয় উদ্যোগে নিজস্ব দৃষ্টিভংগীতে রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দান করিয়া মন্তব্য করেন যে, রাজনৈতিক দল পুনরুজ্জীবন ও পৃথক পৃথক রাজনৈতিক সভা সমিতি অনুষ্ঠান বিভিন্ন দলের মধ্যে ক্রমশঃ অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিবে ও স্ব স্ব সংগঠনকে নেতৃবৃন্দের নিয়ন্ত্রণে রাখিতে ব্যর্থ হইবে। ফলে ঘটনার বিবর্তনে জেনারেল আইউব খানের একনায়কত্ব বিরোধী সংগ্রাম পারস্পরিক অবাঞ্ছিত কলহ-বিবাদে পর্যবসিত হইবে। ইতিমধ্যেই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির এক অংশ ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের বিরুদ্ধে তৎপরতা শুরু করিয়া দিয়াছে। অন্তরীণ হইতে মুক্তি পাওয়ার পর মওলানা ভাসানীও সহযোগিতা করিতেছেন না। কেহ কেহ সংবিধান বাতিলের দাবী তুলিয়াছেন। বলপূর্বক

আইউব খানকে উৎখাত ব্যতীত ইহা সম্ভব নহে। সুতরাং সবল ও অপ্রতিরোধ্য জনমতের চাপের দ্বারাই সংবিধানের গণতন্ত্রায়ন সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে। এই প্রসঙ্গেই ১৯৬২-র সংবিধান মোতাবেক অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করাকে রাজনৈতিক ভুল বলিয়া সোহ্‌রাওয়ার্দী মত প্রকাশ করেন।

ইউনাইটেড অপজিশন পার্টি

জাতীয় পরিষদে সদ্য নির্বাচিত সদস্যগণ (বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তান হইতে নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ) জনাব মশিউর রহমানকে আহ্বায়ক নিযুক্ত করিয়া 'ইউনাইটেড অপজিশন পার্টি' গঠন করেন। অবশ্য জনাব রমিজউদ্দিন আহমদ, জনাব নাসরুল্লাহ খান স্ব স্ব গ্রুপের নেতা ছিলে। ইউনাইটেড অপজিশন পার্টি ও পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) জাতীয় পরিষদে একযোগে কাজ করিবার নিমিত্ত Combined Opposition party গঠন করে। সর্দার বাহাদুর খান, জনাব মশিউর রহমান, জনাব কামরুজ্জামান কমবাইন্ড অপজিশন পার্টির যথাক্রমে লীডার, ডেপুটি লীডার ও সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জাতীয় পরিষদের অভ্যন্তরে কমবাইণ্ড অপজিশন পার্টির ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়।

পরিতাপের বিষয়, সর্বজনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী (বগুড়া), আবদুস সবুর খান, আবদুল মোনায়েম খান, অহিদুজ্জামান প্রমুখ ওয়াদা ভংগ করিয়া প্রেসিডেন্ট আইউব খানের সরকারে মন্ত্রীপদ গ্রহণ করেন। ফলে, সামরিক শাসকের একনায়কত্ববাদ বিরোধী আন্দোলন কিছুটা দুর্বল হয়।

শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সহিত আলোচনার পর পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ আলীর সঙ্গে সংগঠনের সভাপতি মওলানা ভাসানীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সন্তোষ গমন করি। আমরা সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর একমত হওয়া সত্ত্বেও জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ও তাঁহার যৌথনেতৃত্বে পল্টন ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠানের প্রস্তাব মওলানা ভাসানী প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহার অস্বীকৃতি আমি সহজভাবে মানিয়া লইতে পারি নাই। কারণ আমার মনে পড়ে, ১৯৫৮ সালের মে মাসে করাচীতে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ওয়ার্কিং কমিটির সভা চলাকালে মওলানা সাহেব মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে না। তাঁহার এই উক্তি ছিল প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার সহিত যোগাযোগপ্রসূত। সুতরাং বর্তমানে তাঁহার সোহ্‌রাওয়ার্দী বিদ্বেষী মনোভাবই উক্ত যোগাযোগ বা আঁতাতেরই জের বলিয়া মনে করিবার কারণ ছিল। নেতাদের এইরূপ মনোভাবই দেশ ও জাতির সর্বনাশের কারণ হয়। মওলানা ভাসানী অবশ্য এই বৈঠকেই ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টে জনাব মাহমুদ আলী ও হাজী মোহাম্মদ দানেশকে নিজ সংগঠনের প্রতিনিধি মনোনয়ন করেন।

জাতীয় পরিষদ অভ্যন্তরে ও বাহিরে প্রবল জনমতের চাপের মুখে প্রেসিডেন্ট আইউব খান জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর সহিত আলোচনা করিবার জন্যে তাঁহার উপদেষ্টা লেঃ জেঃ

ডব্লিউ, এ, বাকীকে প্রেরণ করেন। করাচীর নিজস্ব বাস ভবনে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা বৈঠকে লেঃজেঃ বাকীর এক প্রশ্নের জওয়াবে জনাব সোহরাওয়ার্দী মন্তব্য করেন যে, ধারাবাহিক সংশোধনী দ্বারা সংবিধান সংশোধন করা হইলে ১৯৬২ সালের এই সংবিধান মূল চরিত্রই হারাইয়া ফেলিবে এবং সংশোধিত সংবিধানটি ১৯৫৬ সালের সংবিধানের রূপ গ্রহণ করিবে। জেনারেল বাকীর নিকট হইতে এই বৈঠকে আলোচনার রিপোর্ট লাভের পর আইউব খান দ্বিতীয়বার আলোচনার উৎসাহ হারাইয়া ফেলেন।

স্বাধীন বাংলার আওয়াজ

কারামুক্তির পর অত্যন্ত সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিতেছিলাম যে, পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-যুব সমাজে ও রাজনৈতিক অংগনে স্বাধীন বাংলার আওয়াজ একটি সোচ্চার আওয়াজে পরিণত হইয়াছে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কার্যকলাপে উদ্বিগ্ন পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) সভাপতি খাজা নাজিমুদ্দিন ২৭শে নভেম্বর (১৯৬২) রাত্রিতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভায় ভাষণদানকালে মন্তব্য করেন, "During the last five years that I have been in Dacca people from all sections of East pakistan have called on me mostly my friends, colleagues and co-workers & it has pained me to learn that a whispering campaing among a large section of people is going on contemptating secession....... Unfortunately this idea is also finding support amongst every small section of west pakistan. The other day at a dinner party a very high official from west Pakistan told me what is the harm if we have confederation"?

অর্থাৎ "পাঁচ বৎসরকাল ঢাকায় অবস্থানকালে বিভিন্ন স্তরের লোকজন যাহার অধিকাংশই আমার বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মী আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তাহাদের নিকট হইতে আমি জানিতে পারিয়া ব্যথিত হইয়াছি যে, বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিচ্ছিন্ন হইবার ব্যাপারে কানাঘুষা চলিতেছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ পশ্চিম পাকিস্তানীদেরও একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ এই মতের সমর্থক। সম্প্রতি এক নৈশভোজে পশ্চিম পাকিস্তানের একজন অতি উচ্চপদস্থ কর্মচারী আমাকে বলেন যে, কনফেডারশন গঠন করিলে ক্ষতি কি?"

১৯৬৩ সালেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত মার্কিন সাহায্য হইতে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ পূর্বাহ্নেই নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। ইহার ফলে পূর্ব পাকিস্তানীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের চাইতে অধিকতর সহানুভূতিশীল মনে করিবার ইন্ধন পাইয়া গেল। সুকৌশলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানী জনতাকে উস্কানি দান করাই ছিল উপরোক্ত মন্তব্যের লক্ষ্য। প্রেসিডেন্ট আইউব এই সময়ে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব চীন-সোভিয়েটের সহিত ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটের প্রতি উৎসাহ হারাইয়া ফেলেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে বেকায়দায় ফেলিবার জন্যই মার্কিন সরকার নানাভাবে প্রচেষ্টা চালাইতে থাকে। এই প্রচেষ্টায় শেখ মুজিবর রহমান দাবার ঘুঁটি হইতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। শক্তিশালী দোসর হিসাবে তাঁহার সহিত

যোগ দেয় দৈনিক ইত্তেফাক। পক্ষান্তরে আইউব সরকার কর্তৃক পনঃ পুনঃ লাঞ্ছিত হওয়া সত্ত্বেও শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের সংহতি, একাত্মতা ও অখণ্ডত্ব রক্ষায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। কোন প্রকার প্রলোভন বা প্ররোচনা তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট ও বিচলিত করিতে পারে নাই।

১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থানকালে ময়মনসিংহ নিবাসী রাজবন্দীদ্বয় আবদুর রহমান সিদ্দিকী ও আবু সৈয়দের নিকট হইতে আমি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বিষয়াদি অবগত হই। ভারতে মুদ্রিত বিচ্ছিন্নতাবাদ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন ময়মনসিংহ ও বিভিন্ন জেলায় বিতরণকালেই তাঁহারা গ্রেফতার হইয়াছিলেন।

এমনি বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক শূন্যতায় "৯ নেতার" ঐতিহাসিক বিবৃতির সূত্র ধরিয়া জনাব সোহরাওয়ার্দী ১৯৬২'র সংবিধান 'গণতন্ত্রায়নের' আওয়াজ তোলেন এবং পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতা, কর্মী এবং জনতাকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করিবার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেন; কিন্তু বিধিবাম! অচিরেই সোহরাওয়ার্দী অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং চিকিৎসার উদ্দেশ্যে লণ্ডন গমন করেন। জনাব সোহরাওয়ার্দী লণ্ডন গমনে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের রাজনৈতিক তৎপরতা স্তিমিত হইয়া পড়ে। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে নেতৃবৃন্দ তখনও কিছুটা সক্রিয় ছিলেন যেমন, জুলাই মাসে (১৯৬৩) চট্টগ্রাম জেলা বন্যাকবলিত হইয়া পড়িলে তাঁহারা সাহায্য ও পুর্নবাসন কাজে কিছুটা তৎপরতা দেখান।

টাঙ্গাইল-বাসাইল উপ নির্বাচন

টাঙ্গাইল-বাসাইল উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার প্রয়াসে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, সাবেক আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কৃষক শ্রমিক পার্টি ও অপুনরুজ্জীবিত মুসলিম লীগ অংশ এবং মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), নেজামে ইসলাম পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর ২৩শে আগষ্ট (১৯৬৩)-এর সম্মিলিত বৈঠকে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আসন্ন উপনির্বাচন সুষ্ঠুভাবে তত্ত্বাবধানের জন্য আমাকে আহ্বায়ক নিয়োগ করিয়া সাত সদস্যবিশিষ্ট এক "নির্বাচন সমন্বয় কমিটি" গঠন করে এবং উপরে বর্ণিত রাজনৈতিক সংস্থাগুলি সম্মিলিত বিরোধী দল নামে উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নেয়। টাঙ্গাইল-বাসাইল প্রাদেশিক পরিষদ উপনির্বাচনে প্রেসিডেন্ট আইউব খানের নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম লীগ (কনভেনশন) প্রার্থী ছিলেন করটিয়ার জনাব বায়জিদ খান পন্নী ও সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী ছিলেন টাঙ্গাইলের খোদা বকস। সরকারী প্রার্থী প্রশাসনযন্ত্র ব্যবহার করিয়া মৌলিক গণতন্ত্রীদের (নির্বাচনী কলেজ) ভোটে নির্বাচিত হন। পূর্বাহ্নে বিচক্ষণ সোহরাওয়ার্দী লন্ডনের রোগশয্যা হইতে সতর্কবানী উচ্চারণ করিয়া সংবাদপত্রে এই মর্মে বিবৃতি দিয়াছিলেন যে, "Going will be heavy" অর্থাৎ 'যাত্রাপথ হইবে বন্ধুর'। এই সময়ের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পে, ওয়ার্কস প্রোগ্রামের নামে যে বিপুল অর্থ মৌলিক গণতন্ত্রী অর্থাৎ ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের দেওয়া হইয়াছিল ইহার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তাহাদের পকেটস্থ হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় সরকার মনোনীত প্রার্থী এইসব মৌলিক গণতন্ত্রীর ভোটে নির্বাচিত হওয়াটাই স্বাভাবিক এবং হইয়াছিল তাহাই।

এন,ডি, এফ-এর দুর্বলতা

স্বাস্থ্যগত কারণে জনাব সোহরাওয়ার্দীর বিদেশ অবস্থানকালে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে মাওলানা ভাসানী নিজের সংগ্রামী ঐতিহ্য ও আদর্শবোধ ত্যাগ করিয়া প্রাসাদ কুচক্রীদের কবলে পতিত হন। এই ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কেন্দ্রীয় কমটির সদস্যদ্বয় জনাব মহিউদ্দিন আহমদ ও আহমাদুল কবীর। লাহোরের ব্যারিষ্টার মিয়া মাহমুদ আলী কাসুরীর বাসভবনে প্রেসিডেন্ট আইউব খানের মিলিটারী সেক্রেটারী ব্রিগেডিয়ার পীরজাদার সহিত তাঁহাদের গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উহাতে আইউব-ভাসানীর গোপন আঁতাতের ভিত রচিত হয়। কিসের বিনিময়ে উক্ত দুই ভদ্রলোক এবং মাওলানা ভাসানী জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামে এইভাবে ছুরিকাঘাত করিয়াছিলেন ভবিষ্যৎ ইতিহাস সে বিষয়ে সাক্ষী দিবে। আইউব-ভাসানী দূতদের গোপন মিলনের প্রত্যক্ষ ফসল ১৯৬৩ সালের ২২শে জুন রাওয়ালপিন্ডিতে আইউব-ভাসানী সাক্ষাৎকার। বলাই বাহুল্য যে, প্রেসিডেন্ট আইউব খানের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে জনগণের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের সংগ্রামকে নস্যাৎ করিবার উদ্দেশ্যেই এই দুই উদ্যোক্তা ভাসানী-আইউব সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। জাতীয় পরিষদ সদস্য ও পরিষদে বিরোধী দলীয় সোচ্চার কণ্ঠ জনাব মশিউর রহমান প্রেসিডেন্ট আইউব ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর নিমকের মর্যাদা রক্ষার জন্য পর্দার অন্তরালে নাটের গুরুর ভূমিকা পালন করিতে থাকেন। পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পরবর্তী রাজনৈতিক ভূমিকার ক্রমবিকাশ উপরোক্ত তিক্ত সত্যের ফলশ্রুতি মাত্র। উত্তরকালে জনাব মশিউর রহমান গর্বের সহিত একই দালালীর ভূমিকা অবৈধ প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া ও অবৈধ প্রেসিডেন্ট সেনাপতি লেঃ জেঃ জিয়াউর রহমানের কালেও পালন করিয়াছিলেন।

ভাসানী-আইউব সাক্ষাৎকারের অব্যবহিত পরই ৩০ ও ৩১শে আগষ্ট এবং ১লা সেপ্টেম্বর ঢাকায় পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাংগঠনিক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিঞা মাহমুদ আলী কাসুরী সংগঠন পুনরুজ্জীবনের পক্ষে জোরালো বক্তব্য পেশ করেন এবং চক্রান্তকারীরা তাঁহাকে জোর সমর্থন জানান। কিন্তু পূর্বাহ্নে ২৮ ও ২৯শে আগষ্ট ৩/৮, লিয়াকত এভিনিউ (জনসন রোড) ঢাকায়, দুই দিবসব্যাপী বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাংগঠনিক কমিটি জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে জোরদার করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। তাই কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় আমি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি পুনরুজ্জীবনের তীব্র বিরোধীতা করি। সভায় শেষ পর্যন্ত আমাদের বক্তব্যই গৃহীত হয় এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে শক্তিশালী করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ঐক্যের এই পথকে বিঘ্নিত করিবার প্রয়াসেই মাওলানা ভাসানী পল্টনে আহুত জনসভায় এক জোরালো বক্তৃতা দিলেন এবং এই বক্তৃতা মঞ্চ হইতে পার্টির অভিমত না নিয়াই এককভাবে ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করিলেন।

১৯৬৩ সালের ১লা অক্টোবর প্রেসিডেন্ট আইউব খানের সরকারী প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে মাওলানা ভাসানী নয়া চীনের প্রজাতন্ত্র দিবসে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিদলের

অন্যান্য সদস্য ছিলেনঃ সর্বজনাব মশিউর রহমান, সদস্য জাতীয় পরিষদ; আখতার উদ্দিন আহমদ, সদস্য জাতীয় পরিষদ; ডঃ জাবেদ ইকবাল, শওকত আলী, বার-এট-ল, কায়সার আহমদ, পি,এফ, এস (পাকিস্তান ফরেন সার্ভিস) ও জেনারেল হাবীবউল্লাহ। চীন সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই মাওলানা ভাসানী তাঁহার ঘোষিত আইন অমান্য আন্দোলন বাতিল ঘোষণা করেন এবং আইউব সরকারের প্রতি সমর্থনদানের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানাইতে থাকেন। ইহাই ব্যক্তিপূজা রাজনীতির অভিশাপ।

সোহ্‌রাওয়ার্দীর তিরোধান

শেখ মুজিবর রহমান করাচী-পিণ্ডিতে সরকারী উচ্চ মহলের দোসর পুঁজিপতি শ্রেণীর একটি বিশেষ অংশের অবাঞ্ছিত প্রভাবে আইউব বিরোধী ঐক্য সংস্থা ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টকে জোরদার করিবার প্রয়াস পরিত্যাগ করেন। শুধু তাই নয়, আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবনের প্রস্তাব লইয়া তিনি জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী সমীপে লন্ডন পর্যন্ত গমন করেন। বিচক্ষণ সোহ্‌রাওয়ার্দী অন্তর্দৃষ্টি বলেই শেখ মুজিবর রহমানের প্রস্তাবের আড়ালে করাচী-পিণ্ডি কুচক্রী মহলের কুৎসিৎ চেহারাগুলি অবলোকন করিতে পারিয়াছিলেন। তাই জনগণের সার্ভভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একনিষ্ঠ সোহ্‌রাওয়ার্দী তাঁহার রোগ শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান শেখ মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে শক্তিশালী করিবার ব্যাপারে তাঁহাকে নির্দেশ দান করেন। ইহা সহজেই অনুমেয় যে, শেখ মুজিবর রহমান নির্দেশটি হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য যে, ইহার কিছুকাল পরেই হৃদরোগে আক্রান্ত জাতির কাণ্ডারী ১৯৬৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর লেবাননের রাজধানী বৈরুতের 'কন্টিন্যান্টাল' হোটেলে আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ী বিবর্জিত পরিবেশে পরলোকগমন করেন। ৭ই ডিসেম্বর সকাল ১১-৫০ মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃতদেহসহ বিমান করাচী বিমান বন্দরে অবতরণ করে। করাচীর শোকাকুল জনতা কর্তৃক অনুষ্ঠিত জানাযায় ইমামতি করেন মাওলানা আবদুস সাত্তার নিয়াজী। দাফনের জন্য পরের দিন অর্থাৎ ৮ই ডিসেম্বর সকাল ১০-১৭ মিঃ শবাধারবাহী বিমানটি ঢাকা (তেজগাঁও) বিমান বন্দরে অবতরণ করিলে লক্ষ লক্ষ শোকাভিভূত ও অশ্রুবিগলিত জনতা এক অবিস্মরণীয় মর্মান্তিক দৃশ্যের অবতারণা করে। ইহা কেবল উপলব্ধি করা যায়, বর্ণনা করা যায় না। "সোহ্‌রাওয়ার্দী নাই" কঠিন সত্যটি গ্রহণ করিয়াই ঢাকার রেসকোর্সে পীর মোহসেন উদ্দিন আহমেদের ইমামতিতে জনসমুদ্র জানাযা নামাজ আদায় করে এবং অপরাহ্ন ২-৩০ মিঃ ঢাকা হাইকোর্টের পার্শ্ববর্তী জমিনে তাঁহাকে দাফন করা হয়। পরিতাপের বিষয়, তাঁহার নশ্বর দেহকে ঢাকার মাটিতে শায়িত রাখিয়া তাঁহার উত্তরসূরীগণ তাঁহার গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণাকে অবমাননা করিতে বিন্দুমাত্রও বিবেক দংশনবোধ করে নাই। গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলিয়া অভিহিত সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রতি ব্যঙ্গ আর কাহাকে বলে!

একনায়কত্ববাদী সরকারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন একমাত্র নির্ভরশীল কাণ্ডারী। সোহ্‌রাওয়ার্দী জনগণকে ক্ষমতার মূল উৎস মনে করিতেন। তাই জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁহার রাজনীতির মূলমন্ত্র।

রাষ্ট্রীয় বা জীবন-দর্শনে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ও আমাদের অনেকের দৃষ্টিভঙ্গীতে পর্বতপ্রমাণ পার্থক্য ছিল; তবে, তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অন্তঃশক্তিপ্রসূত এবং কখনই উহা ষড়যন্ত্র বা চক্রান্তপ্রসূত ছিল না।

রাজনৈতিক শূন্যতা

সোহরাওয়ার্দীর তিরোধান জাতিকে সম্বিৎহারা করিয়াছে; কিন্তু বাঁচাইয়াছে আইউব-মুজিব চক্রান্তের রাজনীতিকে। শেখ মুজিব কালবিলম্ব না করিয়াই স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন এবং অদৃশ্য হস্তের অংগুলী হেলনে পশ্চিম পাকিস্তানে পাড়ি জমাইলেন। তাঁর পশ্চিম পাকিস্তান সফরের উদ্দেশ্য ছিল সুস্পষ্ট। উল্লেখ্য যে, পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান, পশ্চিম পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মিঞা মাহমুদ আলী কাসুরী ও কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা খাজা মোহাম্মদ সফদার ২১শে জনুয়ারী এক যুক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের সংবাদ প্রকাশ করেন। ইহারও আগে ২৬, ২৭ ও ২৮শে জানুয়ারী (১৯৬৩) করাচী বৈঠকে দশ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠিত হইয়াছিল। উক্ত বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবের দায়ে মে মাসে (১৯৬৩) ঐ সদস্যদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র বিরোধী মামলা দায়ের করা হয়। এইভাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট যখন জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় যুগপৎ আন্দোলন চালাইয়া যাওয়ার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত, ঠিক তখনই শেখ মুজিবর রহমান পশ্চিম পাকিস্তান গমন করেন। এবং আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করিবার উৎসাহ দেন। ফল যাহা হইবার তাতাই হইল; পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত হইল। ঢাকা ফিরিয়া ২৫শে জানুয়ারী (১৯৬৪) স্বীয় বাসভবনে (৬৭৭, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, সড়ক নম্বর-৩২) শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি, জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সম্পাদকবৃন্দ এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দের এক যুক্তসভা আহ্বান করেন এবং উক্ত সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে নভেম্বর মাসে (১৯৬৩) অনুষ্ঠিত অনুরূপ সভায় আওয়ামী লীগকে পুনজ্জীবনের দাবী উঠিয়াছিল। কিন্তু আগেই বলিয়াছি, জনাব সোহরাওয়ার্দী লন্ডনে উপস্থিত শেখ মুজিবকে স্পষ্টভাবে আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত না করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। ব্যর্থ মনোরথ শেখ মুজিবর রহমান লণ্ডন হইতে ফিরিয়া সোহরাওয়ার্দীর বক্তব্য নেতৃবৃন্দকে জানাইবার জন্য ৭ই ডিসেম্বর (১৯৬৩) জনাব আতাউর রহমান খানের বাসভবনে (৫০০-এ, ধানমণ্ডি আ/এ, সড়ক নং- ৭) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা আহ্বান করেন; কিন্তু সোহরাওয়ার্দীর আকস্মিক ইন্তেকালের কারণে এই সভা মুলতবী হইয়া যায়।

আমি ও আবদুস সামাদ কারান্তরালে আটক থাকাকালেই পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাংগঠনিক কমিটি আওয়ামী লীগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই ২৮ ও ২৯শে ফেব্রুয়ারী ও ১লা মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে দল পুনরুজ্জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এইভাবেই কৃষক শ্রমিক পার্টি ব্যতীত অন্য সকল রাজনৈতিক দল পুনরুজ্জীবত করিযা জাতীয় সেই সংকটকালে

নেতৃবৃন্দ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকেই দুর্বল করেন। কনভেনশন মুসলিম লীগ গঠনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট আইউব যাহা চাহিয়াছিলেন- এইভাবেই নেতৃবর্গের অবিমৃষ্যকারিতায় অর্থাৎ নিজ নিজ দল পুনরুজ্জীবনের আইউবের সেই আকাংখাই পূর্ণ হইয়াছিল এবং পরিণতিতে আইউবের প্রভুত্বব্যঞ্জক শাসন ব্যবস্থা হইয়াছিল আরও দৃঢ়।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাংগা শুরু হইলে ঢাকায় উহার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। দাংগা প্রতিরোধকল্পে ঢাকার সর্বস্তরের নাগরিকই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতা, ছাত্র,কর্মী, আইন পরিষদ সদস্য, আইনজ্ঞ ও সাংবাদিকদের এক যৌথ সভায় 'দাংগা প্রতিরোধ কমিটি" গঠন করা হয়। গভর্নর মোনায়েম খান ও কনভেনশন মুসলিম লীগ "দাংগা প্রতিরোধ কমিটির" তাৎপরতাকে সুনজরে দেখেন নাই। দাঙ্গা কবলিতদের পুনর্বাসনের প্রশ্নে প্রশাসনিক যন্ত্রের কর্মশিথিলতা আমাদিগকে মর্মাহত করিতে এবং কোন কোন স্থলে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সহিত তর্কবিতর্ক ও বচসা এড়ান যাইত না। গরীব হিন্দু কুমারদের বসতি এলাকা রায়েরবাজার দাংগায় বিধ্বস্ত হইয়াছিল। আমি, জনাব আবদুস সামাদ এবং ওজিউদ্দিন আহমদ চৌধুরী ওই এলাকায় সাহায্য ও পুনর্বাসন কাজে ব্যাপৃত থাকাকালে উগ্র মেজাজী প্রশাসনিক কর্মকর্তার সহিত কথা কাটাকাটি হয়। ক্ষমতা প্রদর্শনের নেশায় উন্মত্ত উক্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তার অভিলাষেই ২৭শে জানুয়ারী (১৯৬৪) প্রাদেশিক সার্কিট হাউসে অবস্থানরত আমার প্রাণপ্রতিম অনুজ মোহাম্মদ আমিরুজ্জামান, সি,এস,পি'র কামরা হইতে নিরাপত্তা আইনে আমাকে গ্রেফতার করা হয়। কারাগারে প্রবেশে করিবার পর জনাব আবদুস সামাদের গ্রেফতারের খবর পাই। যাহা হউক, আমরা উভয়েই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ২৬ সেলের বাসিন্দা হইলাম। আমাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ২৮শে জানুয়ারী কুমিল্লা জেলা হইতে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব সুলতান আহমদ প্রাদেশিক পরিষদে মূলতবী প্রস্তাব আনয়ন করেন।

আমি ও আবদুস সামাদ দল পুনরুজ্জীবনের ঘোর বিরোধী ছিলাম। আমাদের সিদ্ধান্ত যতটা নীতিভিত্তিক ছিল, ততটা বাস্তবধর্মী ছিল না। কর্মী বাহিনীর সমর্থন বিবর্জিত নীতি বা আদর্শের বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা সফল হয় না। বৈঠকী রাজনীতিতে অভ্যস্ত ও অন্যের কর্মক্ষমতায় বিব্রত জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতারা মরহুম সোহরাওয়ার্দীর গতিশীল নেতৃত্বে সৃষ্ট সম্ভাবনাময় গণ আন্দোলনের প্রতি প্রকারান্তরে বিশ্বাসঘাতকতাই করেন এবং দেশের ভবিষ্যতকে অনিবার্য সর্বনাশের দিকে ঠেলিয়া দেন।

আব্বার ইন্তেকাল

১৯৬৪ সালের ২৯শে জুলাই শ্রদ্ধেয় আব্বাজান ইন্তেকাল করেন। আমি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী। আব্বাজানের অন্তিম শয্যায় তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত থাকিবার অনুমতি গভর্নর মোনায়েম খান সরকার দেন নাই। বিদেশী ইংরেজ সরকার আমলেও প্রিয়জনের

রোগ এবং মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত থাকিবার জন্য প্যারলে সাময়িক মুক্তি দেওয়া হইত। করাচী হইতে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক 'ডন' পাঠে মর্মান্তিক হৃদয় বিদারক ঘটনাটি জানিতে পারি। কি দুর্বহ যাতনা, কি দুঃসহ বেদনা, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না। শুধুমাত্র ভুক্তভোগীই তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারে। জেল জীবনের ঐ কঠিন মুহূর্তগুলিতে নিরাপত্তা বন্দী শেখ ফজলুল হক (মনি) আমার পাশে পাশেই থাকিত ও আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিত। স্নেহভাজন মনির কোমল হৃদয়ের আন্তরিকতা আমার স্মৃতিকোটরে চিরসজীব থাকিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ

১৯৬৪ সালের ২২শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিতব্য কনভোকেশন উপলক্ষে সম্ভাব্য গোলযোগ সৃষ্টির বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে শেখ ফজলুল হক মনিকে সরকার নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করেন। কনভোকেশনে গোলযোগের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত ছাত্রদের বিরুদ্ধে বর্ণিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যথাঃ শেখ ফজলুল হক (মনি)ও আসমত আলী এম, এ, ডিগ্রী বাতিল; কে, এম, ওবায়দুর রহমান, এ,কে, বদরুল হক, রাশেদ খান মেনন ও সত্তগাত আলম- পাঁচ বৎসরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কার, হায়াৎ হোসেন, আনোয়ারুল হক চৌধুরী, নূরুল ইসলাম চৌধুরী, আনোয়ার আলী হায়দার খান, শহীদুল হক-৩ বৎসরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কার, গিয়াসুদ্দিন আহমদ চৌধুরী, মনসুরুদ্দিন আহমদ, জাকি আহমদ, আবদুল করিম, সৈয়দ মতিয়ূর রহমান, আবদুর রাজ্জাক মিঞা, সিরাজুল আলম খান, কাজী মোজাম্মেল ইসলাম, আতিকুর রহমান, হুমায়ুন কবীর, কামালউদ্দিন সিকদার ও ফেরদৌস আহমদ কোরেশী-- দুই বৎসরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কার।

উল্লেখ্য যে, জাকী আহমদ ও আহমদ ফারুকের রীট আবেদনক্রমে ঢাকা হাইকোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ছাত্র বহিষ্কারাদেশ নাকচ ঘোষরা করিয়াছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (এন,এস,এফ) সমগ্র দেশে গভর্নর মোনায়েম খানের লাঠিয়াল বাহিনী হিসাবে কাজ করিত ও শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র নামধারী এন,এস, এফ গুণ্ডাবাহিনী সর্বপ্রকার অনাচার ও অসৎ কর্মের হোতা ছিল (যেমন ছিল বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ৪ খলিফা নুরে আলম সিদ্দিকী, শাহাজাহান সিরাজ, আ,স,ম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখনের নেতৃত্বাধীন ছাত্র লীগ)। ১৯৬৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডঃ আবু নসর মাহমুদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননা মামলায় ঢাকা হাইকোর্টে জিতিলে অদৃশ্য হস্তের ইংগিতে জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন গুণ্ডারা ঐদিনই তাঁহাকে নির্মমভাবে প্রহার করে। ইহার অব্যবহিত পর পরই বিষাক্ত পরিবেশ হইতে মুক্তিলাভ মানসে সম্মানীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক দেশ ত্যাগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সভায় ইহারই প্রতিবাদ করিবার অপরাধে ডঃ আবদুল মতিন চৌধুরী ইকবাল হল প্রভোষ্ট পদ হইতে অপসারিত হন। ঘটনার বিবর্তনের কি নির্মম পরিহাস যে, ডঃ আবদুল মতিন চৌধুরী ১৯৭৩-৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পদে

অধিষ্ঠিত থাকাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অরাজকতা, নৈরাজ্য, মারামারি, কাটাকাটি, চরিত্রহীনতা, কথায় কথায় আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার সর্বোচ্চ সীমায় পৌছে। শিক্ষার পরিবেশকে দেওয়া হয় চিরবিদায়, ছাত্র-শিক্ষক ভূলিয়া যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয় তপোবন বিশেষ। নিরীহ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র সম্প্রদায় মুষ্টিমেয় অস্ত্রধারীর অশুভ শিকারে পরিণত হইয়া পড়ে। তাহাদের "ছাত্র নং অধ্যয়নং তপঃ" প্রয়াস অংকুরেই বিনষ্ট হয়।

দাংগা প্রতিরোধের দায়ে মামলা

'দাংগা প্রতিরোধ কমিটি" কর্তৃক দাংগা প্রতিরোধের আহ্বান জানাইয়া "পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও" শিরোনামে একটি বিজ্ঞাপন ছাপানো ও বিলানো হয়। ১৯৬০ সালের প্রেস পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্সের ২ ধারার 'গ' উপধারার নির্দেশ মোতাবেক বিজ্ঞাপনে প্রকাশক ও মুদ্রাকরের নাম ছিল না। তাই বর্ণিত অর্ডিন্যান্সের ৫০, ৫২(১) (২) মোতাবেক ১৯৬৪ সালের ৩০শে এপ্রিল সর্বজনাব হামিদুল হক চৌধুরী, আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবর রহমান, শাহ আজিজুর রহমান, ডঃ আলীম আল-রাজী, তফাজ্জল হোসেন, সম্পাদক দৈনিক ইত্তেফাক, জহুর হোসেন চৌধুরী, সম্পাদক দৈনিক সংবাদ, মাহমুদ আলী, মাহবুবুল হক, অলি আহাদ, কে, এম, ওবায়দুর রহমান, আলী আকসাদ ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে ঢাকা (দক্ষিণ) মহকুমা প্রশাসকের এজলাশে গভর্নর মোনায়েম খান সরকার মামলা রুজু করেন। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরকাল এই মামলা লইয়া টানাটানির পর ১৯৬৯ সালের ৫ই এপ্রিল সরকার মামলা প্রত্যাহার করে। এইভাবেই রাজনৈতিক কর্মীদের হয়রানি করা হয়।

কারামুক্তি

জনাব সামাদ আমার বহু পূর্বেই কারামুক্তির ব্যবস্থা করিয়া আমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় জনাব মাহমুদ আলী আমার মুক্তি দাবী করিয়া ঢাকা হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস মামলা দায়ের করেন। বিচারপতি, এ,এম, চৌধুরী ও বিচারপতি আবদুল্লাহ্ সমবায়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চে শুনানীর প্রারম্ভেই সরকার পক্ষীয় কৌসুলী সৈয়দ মাহমুদ হোসেন আদালতকে জানান যে, সরকার আমাকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত নিয়াছেন, তাই পূর্বাহ্নে প্রাথমিক শুনানীতেই আমার পক্ষে প্রদত্ত রুল খারিজ হইয়া যায় এবং আমি ১৪ই সেপ্টেম্বর মুক্তি লাভ করি। ঐদিনই আমার প্রাণপ্রতিম অনুজ মোহাম্মদ আমীরুজ্জামানের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। পাত্রী জনাব নুরুল আমিনের কন্যা হাসিনা।

'৬৫-এর নির্বাচন

১৯৬৫ সালের ২রা জানুয়ারী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দিবস ধার্য হয়। ইহার পর মার্চে জাতীয় পরিষদ নির্বাচন ও এপ্রিলে প্রাদিশেক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান স্থির হয়। আইউবী সংবিধানে প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদ সদস্য ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধান ছিল না। পক্ষান্তরে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার জনগণ কর্তৃক 'নির্বাচক মণ্ডলী' পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবে এবং এই নির্বাচক মণ্ডলী প্রেসিডেন্ট,

জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরষদ সদস্যবর্গকে নির্বাচিত করিবে। নির্বাচক মণ্ডলীই ইউনিয়ন কাউন্সিল পরিচালনার দয়িত্বপ্রাপ্ত হইবে। ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যগণ সাধারণতঃ "মৌলিক গণতন্ত্রী" নামে অভিহিত। সরকারী ওয়ার্কস প্রোগ্রামের অর্থ ইউনিয়ন কাউন্সিলের মাধ্যমে ব্যয় করিবার পরিকল্পনা এবং দেয় অর্থের অডিট ব্যবস্থা সরকারী খেয়ালীপনার উপর নির্ভরশীল থাকায় ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যবর্গ তথা নির্বাচক মণ্ডলী দ্বারা সরকার মনোনীত প্রার্থীগণ স্বাভাবিকভাবেই অধিক ভোটে নির্বাচিত হইবার সুযোগপ্রাপ্ত হন।

মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম ও নিষিদ্ধ জামায়াতে ইসলামী প্রতিনিধিবৃন্দ ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ার সংকল্পে ঢাকায় খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে ২০শে জুলাই (১৯৬৪) চার দিবসব্যাপী বৈঠকে ৯ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে সম্মিলিত বিরোধী দল (Combined Opposition Parties) গঠন করেন। এবং ২৪শে জুলাই (১৯৬৪) এতদ্‌মর্মে সাধারণ্যে ঘোষণা প্রকাশ করেন। ১৭ ও ১৮ই সেপ্টেম্বর করাচী বৈঠকে এই সম্মিলিত বিরোধী দল পাকিস্তান রাষ্ট্রস্রষ্টা কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সহোদরা মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাকে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী মনোনীত করেন। ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট উক্ত মনোনয়নকে স্বাগত জানায় ও সমর্থন করিবার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে। মোহতারেমার মনোনয়ন সমগ্র দেশে অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার করিল। মোহতারেমার জনসভাগুলি স্বতস্ফূর্ত জনসমুদ্রে পরিণত হইতে লাগিল। ঢাকা হইতে চট্টগ্রাম গমনকালে পথে পথে স্টেশনে স্টেশনে উদ্বেলিত লক্ষ লক্ষ জনতার সম্বর্ধনার দৃশ্য শাসককুলের হৃদকম্প সৃষ্টি করে। কিন্তু নির্বাচনে যাহা হইবার তাহাই হয়, নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা জেনারেল আইউব খানই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানে মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ ও আইউব খান যথাক্রমে ১৮৪২৪+১০২৪৪ ও ২১০১২+২৮৯২১ ভোট পান। মার্চ মাসে (১৯৬৫) অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদ ও এপ্রিল মাসে (১৯৬৫) অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে সরকারী মুসলিম লীগ (কনভেনশন) মনোনীত সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রার্থীরাই জয়লাভ করেন। যাহা হউক, পূর্ব পাকিস্তান হইতে সর্বজনাব নূরুল আমিন, শাহ আজিজুর রহমান, মশিউর রহমান, মাহমুদ আলী ও আবুল কাসেম প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ নির্বাচিত হন। নির্বাচিত সংস্থা (অযোগ্য) আদেশ ১৯৫৯ (Elective bodies disqualification order1959) মোতাবেক ছয় মাসের অধিক নিরাপত্তা বা নিবর্তনমূলক আইনে কারাবাস হইলে ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া আইনতঃ নিষিদ্ধ ছিল। সে কারণেই আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারি নাই। কেননা ১৯৬৪ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর মুক্তির আগেকার সাড়ে সাত মাসের কারাবাস ছাড়াও ১৯৫৯ হইতে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত আমাকে জেলে বিনাবিচারে আটক থাকিতে হইয়াছিল। সে হিসাবে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত আমার জন্য নির্বাচন নিষিদ্ধ ছিল।

জাতীয় পরিষদে সম্মিলিতভাবে কাজ করিবার নিমিত্ত বিরোধীদল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (National Democratic Front)

সম্মিলিত বিরোধীদল (Combined Opposition Party) গঠন করেন এবং জনাব নূরুল আমিন, শাহ্ আজিজুর রহমান ও কামরুজ্জামান যথাক্রমে উহার নেতা, উপনেতা ও সম্পাদক নির্বাচিত হন।

ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ

কাশ্মীর বিরোধ উপলক্ষে ১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ভারত-পাকিস্তান সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হয়। যাহা হউক, জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট-এর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ও নিরাপত্তা পরিষদের সময়মত হস্তক্ষেপের ফলে নিরাপত্তা পরিষদের ২০শে সেপ্টেম্বর গৃহীত নির্দেশ মোতাবেক ২২/২৩শে সেপ্টেম্বর ভোররাত্রি ৩ ঘটিকায় যুদ্ধ বিরতি আদেশ কার্যকর হয়। ইতিমধ্যে ১৯শে সেপ্টেম্বর সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আলেক্সী কোসিগিন সরাসরি আলোচনার জন্য ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোহাম্মদ আইউব খানকে মস্কো আমন্ত্রণ জানান।

প্রকাশ, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সহায়তায় বেসরকারী মোজাহেদ বাহিনী ১লা সেপ্টেম্বর ভারত কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের মাধ্যমে কাশ্মীরীদের ব্যাপক মুক্তিযুদ্ধে সংগঠিত করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। ইহারই পরিণতিতে পাকিস্তানের উপর ভারত হামলা চালায়। এই ঘটনার আর একটু নেপথ্য পটভূমি রহিয়াছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও জেনারেল আইউব খানের ধারণা হয় যে, মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহর জনসমর্থন তাঁহার চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং সস্তায় জনপ্রিয়তা অর্জন করিবার নেশায় কাশ্মীরকে পাকিস্তানভুক্ত করিবার প্রচেষ্টায় তিনি লিপ্ত হন। জনসমর্থনহীন শাসকরা আভ্যন্তরীণ সংকট উৎরাইবার জন্য এবং সঙ্কট হইতে জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরাইবার উদ্দেশ্যে এই ধরনের সর্বনাশা ঝুঁকি গ্রহণে মোটেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। আইউব সরকারের অতি উৎসাহী পদক্ষেপে স্পষ্টতঃ পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। তাই মহাচীন জেনেভায় ভারতীয় ও মার্কিন রাষ্ট্রদূতদ্বয়কে স্পষ্টভাষায় সতর্ক করিয়া দেয় যে, যদি পূর্ব পাকিস্তান আক্রান্ত হয় বা পাকিস্তানের কোন বড় শহরের পতন ঘটে তাহা হইলে নিরপেক্ষ নীতি বর্জন করিয়া চীন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইবে। চীনের এই সতর্কবাণী নিঃসন্দেহে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ও জাতিসংঘের মোড়লদিগকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।

ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধের পটভূমিকায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রদ্বয়ের অমীমাংসিত সমস্যাবলী সমাধানের সন্ধানে ও সৎ প্রতিবেশীসুলভ পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়নের প্রয়াসে বৃহৎ শক্তিদ্বয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া উদ্যোগ গ্রহণ করে। আগেই বলিয়াছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইউব খানকে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার জন্য সোভিয়েট ভূমিতে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। তদানুযায়ী ভারত-পাকিস্তান সরকার প্রধানদ্বয় ৪ঠা জানুয়ারী হইতে ১০ই জানুয়ারী (১৯৬৬) অবধি তাসখন্দে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় মিলত হন এবং সফল আলোচনার পর ১০ই জানুয়ারী এক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করেন। ইহাই 'তাসখন্দ ঘোষণাপত্র' নামে

পরিচিত। তাসখন্দেই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী পরলোকগমন করেন। বিশ্বের জন্য ইহা ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক ঘটনা। ইতিপূর্বে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিনডন বি জনসনের আমন্ত্রণক্রমে প্রেসিডেন্ট আইউব খান ১৪ ও ১৫ই ডিসেম্বর দুই দিনব্যাপী সফরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গমন করিয়াছিলেন। আলোচনায় ইন্দো-পাকিস্তানের অমীমাংসিত সমস্যাবলী শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের ইঙ্গিত সম্বলিত এক যুক্ত ইশতেহার প্রকাশিত হয় ১৬ই ডিসেম্বর।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো "তাসখন্দ ঘোষণাপত্রের" ঘোর বিরোধী ছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানী জনমতও মোটামুটিভাবে "তাসখন্দ ঘোষণাপত্রের" প্রতিকূলে ছিল। জনমতের প্রতিধ্বনি করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিকবৃন্দ তাসখন্দ
ঘোষণাপত্রের বিরুদ্ধে ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে এক সম্মেলন আহবান করেন। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট নেতা জনাব নূরুল আমিনও লাহোর সম্মেলনকে লক্ষ্য করিয়া ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলনে যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করেন এবং জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ও শাসনতান্ত্রিক জটিলতা নিরসনের আহবান জানান। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান লাহোর সম্মেলনে যোগ দেন এবং পাকিস্তানের সাংবিধানিক সমাধানকল্পে কতিপয় প্রস্তাব উত্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। এই প্রস্তাবগুলি পরবর্তীকালে বিখ্যাত ছয় দফা কর্মসূচী হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

ছয় দফা

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ অবসানের পর ও যুক্তরাষ্ট্র সফরের মধ্যবর্তী সময়ে প্রেসিডেন্ট আইউব খান পূর্ব পাকিস্তানে আসেন এবং গভর্নর হাউসে (বর্তমান বঙ্গভবন) রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হন। পাক-ভারত যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় রাজধানী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এখানকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। ফলে এই দেশ রক্ষার দায়িত্বভার পড়িয়াছিল গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের উপর। ইত্যকার তথ্য ও বক্তব্য মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, চাকুরীজীবী সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে আলোড়িত করে। বলা আবশ্যক যে, ১৯৪৭ সাল হইতে নানা কারণে পূর্ব পশ্চিম পাকস্তান তথা বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীর মধ্যে মানসিক দূরত্ব জন্ম নিয়াছিল এবং তাহাই উভয় অংশের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল বিচ্ছিন্নতার আবহাওয়া। তদুপরি কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কার্যকরী ক্ষমতার কোন অবকাশ ১৯৬২ সালের সংবিধানে না থাকায়, বাঙ্গালী মনে যে ক্ষোভ জমা হইয়াছিল, তাহারই অভিব্যক্তি ঘটে নিম্নে প্রদত্ত 'সাত দফা' রচনায়। প্রেসিডেন্ট আইউব খান কর্তৃক আহূত নেতৃবৈঠকে ইংরেজীতে লিখিত দফাগুলি উত্থাপন করিবার জন্য রচয়িতাদের পক্ষ হইতে জনাব খায়রুল কবীর পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিনকে প্রদান করেন। সেইদিন আমি ঘটনাচক্রে নুরুল আমিন সাহেবের সহিত তাঁহার বাসভবনে পূর্ব হইতেই আলোচনায় রত ছিলাম। সেই দিনই উক্ত কপিটি আমি নূরুল আমিন সাহেবের নিকট হইতে ভবিষ্যৎ রেফারেন্সের জন্য লইয়া আসি। সেই আলোচনা বৈঠকেই খাবরুল কবীর সাহেব হইতে আমি অবগত হই যে,

তাঁহারা আমন্ত্রিত সব নেতাকেই ইহার কপি দিয়াছেন। এই কপিতে বর্ণিত ষষ্ঠ দফার নিম্নাংশ ও সাত নং দফা বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই শেখ মুজিবর রহমানের ছয় দফা। এবং পরবর্তীকালে তিনিই এই ছয় দফার প্রবক্তা হিসাবে পরিচিত লাভ করেন। উল্লেখ্য যে, সেদিন নূরুল আমিন সাহেবের বাসভবনেই আমি জনাব খায়রুল কবীরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ইহা কাহার রচনা? জওয়াবে তিনি বলেন যে, সর্ব মহলের প্রায় ৫০ ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে ইহা রচনা করিয়াছেন। সেদিন এই ব্যাপারে আমার মধ্যে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে ছয় দফা আন্দোলনের ঘটনাবলীতে আমার নিকট প্রতীয়মান হইয়াছিল যে, ইহার নেপথ্যে (ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, (খ) আন্তর্জাতিক ইহুদী কারসাজি তো ছিলই, (গ) ভারত সরকারের গোপন হস্তও ইহাতে সক্রিয়ভাবে সহায়তা প্রদান করিয়াছিল। আগেই উল্লেখ করিয়াছি যে, শেখ মুজিব লাহোর কনফারেন্সে ছয় দফা উত্থাপনের ব্যর্থ প্রয়াস পান।

১১ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়া শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার লাহোর সম্মেলন ত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করেন এবং লাহোর সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের বিবেচনার্থে দেয় তাঁহার ছয় দফা সাংবাদিকদের নিকট প্রকাশ করেন। ১৯শে মার্চ (১৯৬৬ইং) পূর্ব-পাক আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ৬ দফাকে সাংগঠনিক কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করে এবং ২০শে মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভায় অনুমোদিত হয়। উল্ল্যেখ করা প্রয়োজন যে, শেখ মুজিব প্রদত্ত ৬ দফা সংবাদ পত্রে প্রকাশ না করতে সর্ব জনাব আবুল মুনসুর আহমদ, আতাউর রহমান খান ও মানিক মিয়া একমত হন এবং সে মতে মানিক মিয়া তার পত্রিকা দৈনিক ইত্তেফাকে তা প্রকাশ করেননি। প্রকাশ করে ছিলেন আবদুল গাফফার চৌধুর তাঁর সম্পাদিত দৈনিক আওয়াজে।

যাহা হউক, আমি এখানে জনাব খায়রুল কবীর প্রদত্ত ও জনাব নূরুল আমিনের নিকট হইতে প্রাপ্ত 'সাত দফা' এবং শেখ মুজিবর রহমান প্রদত্ত 'ছয় দফা'র পূর্ণ চিত্র পাঠকবর্গের খেদমতে পেশ করিতেছিঃ

শেখ মুজিবর রহমান প্রদত্ত ৬ দফা

In view of the experiences gathered during the 17 days war with India some rethinking for East pakistan from the constitutional point of view is necessary, keeping in view the practical aspects of administration for the welfare of the people of this province. It is evident that the people of East Pakistan's determination to keep the country as a whole saved the two parts of Pakistan from disintergration which could have taken place during this period of extraodinary emergency.

The main object of this brief note is to make an earnest effort to continue to keep the two parts of pakistan united as one political entity. With this object, the following suggestions are made:

1. The constitution and working form of government should be a federation of Pakistan in its real sense of the term. Although Pakistan was styled as a federal Republic till today name of the constitution so far provided for a practical form of federal government.
2. Federal Government shall have only two subjects, defence and foreign affairs.
3. Regarding currency either of the following two suggestion:

A. Two separate freely convertilble currency may be introduced.

OR

B. One currency for the whole country may be maintained. In this case effective constitutional provisions are to be made in stoping flight of capital from East to West Pakistan. Separate banking reserve is also to be made for East Pakistan (ii) Separate fiscal and monetary policy is to be maintained for East Pakistan.

4. TAXATION

All taxes and duties shall be provided. The federal government will have not taxation authority except a levy on provincial taxes for meeting their required expenditure in consultation with the province or state. The consolidated Federal fund should come out of a levy of a certain uniform percentage of all state taxes.

5. FOREIGN TRADE

(i) Sep;arate external trade account for each of the province is to be maintained.

(ii) Foreign Exchange earned out of external trade will be at the disposal of the state.

(iii) The federal foreign exchange rquirements will be met by the province on the basis of a uniform percentage rate of the earnings of the each provinces or state.

(iv) Commodities from one province or state to other will move free of any texation or tarrif restrictions by the province or state.

(v) Province or state would be allowed to place trade representative abroad and negotiate trade deals in the interest of the province.

or the state irrespective of federal foreign relations.

6 Province or state should have the authority to raise and maintain under its own control para-military or territorial forces to protect the territorial integrity as well as the constitution.

অর্থাৎ ঃ ভারতের সহিত ১৭ দিনব্যাপী যুদ্ধের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে এবং এই প্রদেশের জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থার কার্যকরী বিষয়াদির প্রতি খেয়াল রাখিয়া শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ হইতে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে কিছু কিছু পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, দেশকে অখন্ড রাখিবার প্রয়াসে পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের সংকল্প দুই অংশকেই খন্ড বিখন্ড হইয়া যাওয়া হইতে রক্ষা করিয়াছে যাহা এই "বিশেষ ইমারজেন্সীর" সময় ঘটিতে পারিত। এই সংক্ষিপ্ত খসড়ার উদ্দেশ্য হইতেছে পাকিস্তানের দুই অংশকে একটি অখন্ড রাজনৈতিক সত্ত্বায় গ্রথিত করিবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। এই উদ্দেশ্যেই নিম্নেবর্ণিত সুপারিশগুলি করা হইলঃ

১। শাসনতন্ত্র ও সরকারের কার্যকরী পদ্ধতি গঠিত হইবে সত্যিকার "ফেডারেশন অব পাকিস্তান" কাঠামোর ভিত্তিতে। যদিও পাকিস্তানকে একটি ফেডারেল রিপাবলিক হিসাবে আখ্যায়িত করা হইয়াছিল তথাপি অদ্যাবধি যতগুলি শাসনতন্ত্র প্রণীত হইয়াছিল তাহার কোনটিতেই ফেডারেল পদ্ধতির সরকারের বাস্তব রূপায়নের ব্যবস্থা করা হয় নাই।

২। ফেডারেল সরকারের হাতে কেবল দুইটি বিষয় থাকিবে যথা- দেশরক্ষা এবং বৈদেশিক বিষয়।

৩। মুদ্রা বিষয়ে নিম্নোক্ত যে কোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ক) দুইটি পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু করা যাইতে পারে। অথবা

খ) সমগ্র দেশের জন্য একটি মুদ্রা চালু করা যাইতে পারে। এই ক্ষেত্রে এমন কার্যকর শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকিতে হইবে যাহাতে পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার বন্ধ হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভের ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

গ) পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনৈতিক ও মুদ্রানীতি গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। ট্যাক্সেশন

সকল ট্যাক্স ও ডিউটি আদায়ের ব্যবস্থা থাকিবে। ফেডারেশন সরকারের ট্যাক্স আদায় করিবার কোন অধিকার থাকিবে না, তবে কেবলমাত্র প্রদেশের বা স্টেটের সহিত আলোচনা সাপেক্ষে খরচপত্রাদি বহন করিবার জন্য প্রাদেশিক ট্যাক্সের উপর লেভি বসাইতে পারিবে। এইভাবে সকল স্টেট ব্যাংকের উপর সমহারে লেভীর দ্বারা অর্জিত অর্থে ফেডারেল ফান্ড গঠিত হইবে।

৫। বৈদেশিক বাণিজ্য

(ক) প্রতিটি প্রদেশের জন্য পৃথক বৈদেশিক বাণিজ্য একাউন্টের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা স্টেটের হাতে থাকিবে।

(গ) প্রতিটি প্রদেশ বা স্টেটের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার একটি সমহার প্রদানের মাধ্যমে ফেডারেল সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন মিটানো হইবে।

(ঘ) এক প্রদেশ অথবা স্টেট হইতে অন্য প্রদেশ বা স্টেটে জিনিসপত্রের আদান-প্রদনে কোন ট্যাক্স বা ট্যারিফ নিষেধাজ্ঞা থাকিবে না।

(ঙ) বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ এবং নিজেদের স্বার্থে বাণিজ্যিক আলোচনা করিবার অধিকার প্রদেশ বা স্টেটের থাকিবে। এই অধিকার ফেডারেল সরকারের নীতির বিষয়ে নিরপেক্ষ হইবে।

৬। রাষ্ট্রীয় অখন্ড ও শাসনতন্ত্রকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় কর্তৃত্বাধীন স্থানীয় বাহিনী বা প্যারা মিলিশিয়া গড়িয়া তোলার অধিকার প্রদেশ বা স্টেটের থাকা উচিত।

খায়রুল কবীর প্রদত্ত ৭ দফা

In view of the experiences gathered during the 17 days war with India some rethinking about constitutional framework of the country is necessary, keeping in view the practical aspects of administration for the welfare of the people. It is evident that the determination of the people of East Pakistan to keep the country as a single whole saved the two parts of pakistan from disintegration which could have taken place during the period of extra-ordinary emergency.

The main object of this brief note is to make an earnest effort to continue to keep the two parts of Pakistan united as one political entity. With this object in view the following suggestions are made:

1. The constitution should provide for a federation of pakistan in its true sense on the basis of Lahore Resolution, and parliamentary Form fo Governement with supremacy of Legislatures elected on the basis of adult franchise and direct Voting.
2. Federal Government shall deal with two subjects, defence and foreign affairs; all other residuary subjects shall vest in the federating states.
3. Regarding currency either of the following two suggestions may be accepted:

A. Two separte freely convertible currencies may be introduced.

or

B. One currency for the whole country may be maintained. In this case effective constitutional provisions are to be made in stoping flight of capital from East to West Pakistan. Separate banking reserve is

also to be made for East Pakistan. Separate fiscal and monetary policy is to be adapted for East Pakistan.

4. TAXATION

The federating states shall have exclusive authority to levy all taxes and duties. The federal government will have no tax levying authority, but will have a share on state taxes for meeting their required expenditure. The consolidate federal fund should come out of levy of a certain percentage of all state taxes.

5. FOREIGN TRADE

(i) Separate external trade account for each of the federating state is to be maintained.

(ii) The federal foreign exchnge requirements will be made by the states on the basis of equal percentage rate or a rate to be agreed upon.

(iii) The foreign Exchange earned out of external trade will be at the disposal of the state.

(iv) Indigenous Commodities will move between state free of any taxation or tariff restrictions.

(v) State should be allowed by constitutional provisions to place trade representatives abroad and negotiate trade deals in the interest of the states.

6. States should have the authority under the constitution to raise and maintain under its own control paramilitary or territorial forces to protect the territioral integrity as well as the constitutional.

In case all the above points are provided for the constitution, the present system of appointment of Governor of the province or the state by the President may continue but in case the constitutional changes suggested above are not agreed to by the President, the Provincial Governor shall be elected by an Electoral college on the basis of adult Franchise or a direct election by a restricted adult Franchise basis. In this case the Governor shall only be removed by an impeachment of the legislature.

7. For the election to the legislatures at this stage, Universal adult Franchise may not be introduced but resricted adult franchise on the basis of educational or tax qualification should be introduced. Such elected legislature should be Vested with more authority in regard to control of finance for both the Federal and provincial governments.

It may take some time to implement all the suggestions mentioned above but for an immediate political settlement between the people and the present rulers acceptance of these on principal and a public declaration of such acceptance in the greater interest of the country's intregrity and prosperity.

অর্থাৎ ঃ ভারতের সহিত ১৭ দিনের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে এবং জনসাধারণের কল্যাণের লক্ষ্যে প্রশাসনের কার্যকর বিষয়গুলি বিবেচনায় রাখিয়া দেশে সাংবিধানিক কাঠামো সম্পর্কে কিছু পুনর্বিন্যাসের চিন্তা প্রয়োজনীয় হইয়া দেখা দিয়াছে। ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, দেশকে অখণ্ড রাখিবার প্রয়াসে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সংকল্প দুই অংশকেই খন্ড-বিখণ্ড হইয়া যাওয়ার পরিণতি হইতে রক্ষা করিযাছে যাহা এই "বিশেষ ইমারজেন্সী" সময় ঘটিতে পারিত। এই সংক্ষিপ্ত খসড়ার উদ্দেশ্য হইতেছে পাকিস্তানের দুই অংশকে একটি অখণ্ড রাজনৈতিক সত্তায় গ্রথিত করিবার আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। এই উদ্দেশ্যেই নিম্নবর্ণিত সুপারিশগুলি করা হইলঃ

১। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র সত্যিকার অর্থে ফেডারেশন অব পাকিস্তানের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে, এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ও প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত আইন সভার শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিতকরণ পূর্বক সরকার পদ্ধতি হইবে পার্লামেন্টারী।

২। ফেডারেল সরকার দুইটি বিষয় দেশ রক্ষা ও বৈদেশিক বিষয় নিয়ন্ত্রণ করিবে, অবশিষ্ট বিষয়গুলি ফেডারেটিং ইউনিটগুলির কাছে ন্যস্ত থাকিবে।

৩। মুদ্রা সংক্রান্ত নিম্নোক্ত যে কোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ক) দুইটি পৃথক অথচ সহজে বিনিয়োগ মুদ্রা চালু করা যাইতে পারে।

অথবা

খ) সমগ্র দেশের জন্য একটি মুদ্রা চালু করা যাইতে পারে, এই ক্ষেত্রে এমন কার্যকর শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকিতে হইবে যাহাতে পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার বন্ধ হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি ও মুদ্রানীতি গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। ট্যাক্সেশন

সকল প্রকার ট্যাক্স ও কর আদায়ের একক কর্তৃত্ব ফেডারেটিং স্টেটগুলির থাকিবে। ফেডারেল সরকারের ট্যাক্স আদায়ের কোন কর্তৃত্ব থাকিবে না; কিন্তু তাহাদের খরচ মিটাইবার জন্য ফেডারেটিং স্টেটগুলির প্রাপ্য ট্যাক্সের উপর একটি অংশ তাহাদের থাকিবে। সব

কয়টি ফেডারেটিং ইউনিটের লেভির একটি বিশেষ শতকরা হিসাবে আদায়কৃত অর্থে ফেডারেল তহবিল গঠিত হইবে।

৫। বৈদেশিক বাণিজ্য

(ক) প্রতিটি ফেডারেটিং ইউনিটের জন্য পৃথক বৈদেশিক বাণিজ্য একাউন্টের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) ইউনিটগুলির সমহারের অথবা কোন গৃহীত হারে প্রদত্ত লেভির ভিত্তিতে ফেডারেল সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন মিটান হইবে।

(গ) বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ফেডারেটিং ইউনিটগুলির হাতে থাকিবে।

(ঘ) দেশজ পণ্য এক ইউনিট হইতে অন্য ইউনিটে আদান-প্রদানে কোন ট্যাক্স বা ট্যারিফ নিষেধাজ্ঞা থাকিবে না।

(ঙ) শাসনতন্ত্রে এমন ব্যবস্থা থাকিতে হইবে যাহাতে সে বিদেশে 'বাণিজ্য প্রতিনিধি' নিয়োগ করিতে এবং স্টেটগুলির স্বার্থে বাণিজ্যিক আলোচনা করিতে পারে।

৬। শাসনতন্ত্র মোতাবেক রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও শাসনতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য স্বীয় কর্তৃত্বাধীন স্থানীয় বাহিনী বা প্যারামিলিশিয়া গড়িয়া তোলার অধিকার স্টেটগুলির থাকা উচিত। যদি উপরোক্ত বিষয়গুলি শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত হয়, তাহা হইলে বর্তমানে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রদেশ বা স্টেটের গভর্নর নিয়োগের পদ্ধতি চলিতে পারে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট যদি এইগুলিতে সম্মত না হন, তাহা হইলে প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত ইলেকটোরাল কলেজ কর্তৃক অথবা প্রাপ্ত বয়স্কদের একটি বিশেষ সংখ্যার প্রত্যক্ষ ভোটে গভর্নর নির্বাচিত হইবেন। এমতাবস্থায় কেবল আইনসভা ইমপিচমেন্ট মাধ্যমে গভর্নরকে অপসারিত করিতে পারিবে।

৭। বর্তমান অবস্থায় আইনসভার নির্বাচনে প্রাপ্ত বয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি হয়ত প্রবর্তন করা যাইবে না কিন্তু শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ট্যাক্স প্রদানের ক্ষমতার ভিত্তিতে নির্ণীত প্রাপ্ত বয়স্কদের একটি সীমিত সংখ্যার ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এই আইনসভা নির্বাচিত হওয়া উচিত। এই নির্বাচিত আইন সভার ফেডারেল ও প্রাদেশিক সরকারের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের অধিকতর ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিতে হইবে।

উপরে বর্ণিত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নে কিছু সময় প্রয়োজন হইতে পারে কিন্তু বর্তমান শাসকদের জনগণের আশু রাজনৈতিক মীমাংসার প্রয়োজনে এই প্রস্তাবসমূহের নীতিগত স্বীকৃতি এবং এই স্বীকৃতি জনসমাজে ঘোষণা দেশের অখণ্ডতা ও অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য।

উপরের চিত্র হইতেই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, ছয় দফা সাত দফারই খণ্ডিত অনুলিপি মাত্র।

ইহাই ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদ ও ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদ সাধারণ নির্বাচনের নির্বাচনী ঘোষণাপত্রে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা হয়ঃ

১। "সরকারের ধরন হবে ফেডারেল এবং পার্লামেন্টারী। এতে ফেডারেল আইন সভার এবং ফেডারেশনের অন্তর্গত ইউনিট আইন সভার নির্বাচন হইবে প্রত্যক্ষ এবং সার্বজনীন

ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। ফেডারেল আইন সভার প্রতিনিধিত্ব হইবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে।"

২। "ফেডারেল সরকারের হাতে থাকিবে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় এবং নীচে ৩ নং দফার শর্তাধীনে মুদ্রা।"

৩। "দেশের দুইটি অংশের জন্যে দুইটি পৃথক এবং সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যাংকগুলি এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে সম্পদ হস্তান্তর করিবে এবং মূলধন পাচার বন্ধের ব্যবস্থা করিবে।"

৪। "রাজস্ব সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব এবং ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির হাতে থাকিবে। দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্র দফতর পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব ফেডারেল সরকারকে দেওয়া হইবে। শাসনতন্ত্রে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে নির্ধারিত হারের ভিত্তিতে উক্ত আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় ফেডারেল সরকারের তহবিলে জমা হইবে। করনীতির উপর অঙ্গরাষ্ট্রগুলির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অভিলক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া ফেডারেল সরকারের রাজস্বের প্রয়োজন মিটাবার নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকিবে।"

৫। 'ফেডারেশনের অন্তর্গত অঙ্গরাষ্ট্রগুলির নিয়ন্ত্রণে প্রত্যেকটি ইউনিটের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পৃথক হিসাব রাখিবার শাসনতান্ত্রিক বিধান থাকিবে। শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী ধার্য হারের ভিত্তিতে অঙ্গরাষ্ট্রগুলি ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মিটাইবে। ফেডারেল সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পররাষ্ট্র নীতির কাঠামোর মধ্য হইতে আঞ্চলিক সরকারগুলিকে বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে আলোচনা ও চুক্তির ক্ষমতা শাসনতন্ত্রে দেওয়া হইবে।"

৬। "কার্যকরভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে ফেডারেশনের অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিশিয়া রাখিবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে।"

এখানে আরও উলেখযোগ্য যে, ছয়দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের এই পরিকল্পনাটি মূলতঃ নূতন কিছু নয়। ইহা ১৯৫০ সালের ৫ই নভেম্বর ঢাকার বার লাইব্রেরী হলে জনাব আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মহাজাতীয় সম্মেলনে (Grand National Conference) গৃহীত সাংবিধানিক সুপারিশাবলীর অভিন্নরূপ।

আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ছয় দফাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীয় সাংগঠনিক কর্মসূচী হিসাবে অনুমোদন দান করে ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী স্বীয় বাসভবনে আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ সাহেব ছয় দফা আনুষ্ঠানিকভাবে সাধারণ্যে প্রকাশ করেন।১৮ ও ১৯শে মার্চ ঢাকা ইডেন হোটেলে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয় দফাকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করে। শেখ মুজিবর রহমান উক্ত অধিবেশনেই সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন। এইদিকে ঢাকায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ (কনভেনশন) অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইউব খান ছয় দফাকে রাষ্ট্রের সংহতির পরিপন্থী কর্মসূচী বলিয়া ঘোষণা করেন এবং প্রয়োজনবোধে ছয় দফা আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করা হইবে বলিয়াও সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। ২০শে মার্চ পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার ভাষণে বলেন, "কোন হুমকিই ছয় দফা আন্দোলনকে প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।"

এন ডি এফ-এর ৭ দফা

এই সময় নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পরিহার করিয়া একনায়কত্ববাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত করিবার জন্য আমি জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের উপর চাপ সৃষ্টি করিতে থাকি। আইউব খান ৮ই মার্চ জাতীয় পরিষদে প্রদত্ত বক্তব্যে ফেডারেল ও পার্লামেন্টারী সরকার পদ্ধতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। ইহারই প্রতিবাদে পাক-ভারত যুদ্ধোত্তর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সমস্যাবলীর সাংবিধানিক সমাধানকল্পে আমরা জাতীয় ফ্রন্টের এক অংশ জনাব আতাউর রহমান খানের মাধ্যমে ১০ই মার্চ (১৯৬৬) এক সাংবাদিক সম্মেলন আহবান করি এবং দেশবাসীর বিবেচনার জন্য সাত দফা পরিকল্পনা প্রকাশ করি। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বহু বাক-বিতন্ডার পর ৩০শে এপ্রিল (১৯৬৬) জনাব নূরুল আমিনের ইস্কাটনস্থ বাসভবনে অনুষ্ঠিত কমিটির বৈঠকে স্বয়ং নূরুল আমিন, মাহমুদ আলী (সিলেট), আবদুস সামাদ (সিলেট), ইউসুফ আলী চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হকের তীব্র বিরোধিতার মুখেও এই সাত দফাকে অনুমোদন করেন। নিম্নে সাত দফা পরিকল্পনা দেওয়া হইলঃ

(a) Constitutional arrangements should be remodelled and the country reverted to federal system both in theory and practice. Parliamentary form of Government should be reintroduced vesting all powers in the parliament which should be directly elected by adult franchise. The two Regions must have full Regional Autonomy with DEFENCE, FOREIGN AFFAIRS (POLITICAL) CURRENCY (MINTING) in the centre.

(b) The federal structure should include a sub-federation of former provinces of Sind, Baluchistan, N.W.F.P. and West Punjab with such territorial readjustment as may reconstitute the area now West pakistan into four cultural and linguistic units.

The question of one unit needs to be re-examined in consultation with the people of West pakistan particularly of the affected provinces of that area.

(c) On account of sheer distance between East & West Pakistan there is total immobility of labour and capital between them so that Economic forces generated in one wing hardly produce any effect on the other. Pakistan therefore, is IPSOFACTO a two Economy State, although the pattern of economy is the same. As such the economy of the country should be remodeled.

(d) Effective steps should be taken to remove disparity between two

wings within a period of ten years.

(e) In order to ensure economic security of the people through equitable distribution of wealth, the economic structure of the country with heavy concentration of wealth in a few hands to the utter destitution of the masses, has to be recast, in the shortest possible time into a mixed economy under which the people shall as of right, have access to the economic advantages of socialism.

(f) The17-day armed conflict with India with all communication cut off left East Pakistan severely isolated from the west wing. The theory of East pakistan's dependence on West Pakistan for Defence measures does not hold good and therefore defence of each wing has to be adequately organised in the wing itself based and organised on local resources.

(g) Our foreign policy should be independent without any bias or leaning towards either of the power Blocs. With malice towards none and friendship for all, our diplomatic policy should be conducted with greater maturity and greater sense of responsibility. Our past activities in this field have been anything but satisfactory. All misunderstanding between ourselves and other countries abroad should be removed and co-operation with them in the Economic field strengthened.

ক) শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস সাধন করিতে হইবে এবং দেশে ফেডারেল পদ্ধতির তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক প্রবর্তন নিশ্চিত করিতে হইবে। প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত পার্লামেন্টের নিকট সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করাপূর্বক পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার চালু করিতে হইবে। দুই অঞ্চলেরই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন থাকিতে হইবে এবং দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি (রাজনৈতিক) এবং মুদ্রা (মুদ্রণ) কেন্দ্রের হাতে থাকিবে।

খ) সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব এই সাবেক প্রদেশগুলির সমবায়ে গঠিত একটি সাব-ফেডারেশন ফেডারেল কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হইবে। আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে উল্লিখিত সাব-ফেডারেশন এমনভাবে গঠন করিতে হইবে যাহাতে বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তান চারটি সংস্কৃতি ও ভাষাগত অঞ্চলে পুনর্গঠিত হইতে পারে।

গ) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দূরত্বের দরুন দুই অঞ্চলের মধ্যে শ্রম ও মূলধনের বিনিময় একেবারেই অনুপস্থিত, ফলে এক অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যক্রম অন্য অঞ্চলে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং পাকিস্তান বস্তুতঃপক্ষে 'দুই অর্থনৈতিক দেশ' যদিও অর্থনীতির প্যার্টান একই প্রকার। এই কারণেই দেশের অর্থনীতি ঢালিয়া সাজাইতে হইবে।

ঘ) দশ বৎসরের মধ্যে দুই অঞ্চলের বৈষম্য দূর করিতে হইবে।

ঙ) সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে জনগণের নিদারুণ দুর্দশার বিনিময়ে গুটিকতকের হাতে বিপুল সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ার বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোকে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে একটি মিশ্র অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করিতে হইবে; এই মিশ্র অর্থনীতির অধীনে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করিবার অধিকার জনগণের থাকিবে।

চ) ভারতের সহিত ১৭ দিনের সশস্ত্র যুদ্ধকালীন সময়ে সমস্ত যোগাযোগ বিপর্যস্ত হইয়া যাওয়ায় পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিমাঞ্চল হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। দেশরক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীলতার তত্ত্ব কার্যকর নয়; সুতরাং প্রতিটি অঞ্চলের দেশরক্ষা স্থানীয় সম্পদের উপর ভিত্তি করিয়া সেই অঞ্চলেই সম্পূর্ণভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি স্বাধীন হইতে হইবে। কোন বৃহৎ শক্তি শিবিরের প্রতি এই নীতির কোন পক্ষপাত থাকিবে না। 'কাহারও প্রতি বিদ্বেষ নয়, সকলের প্রতি বন্ধুত্ব' এই নীতির উপর ভিত্তি করিয়া অধিকতর বিচক্ষণতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে আমাদের কুটনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হইতে হইবে। বিদেশী রাষ্ট্র এবং আমাদের মধ্যে সকল ভুল বুঝাবুঝি দূর করিতে হইবে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদের দৃঢ় সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হইবে।

ইতিপূর্বে প্রফেসর মিজানুর রহমান শেলী সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক "The Concept of Pakistan" ৬ই জানুয়ারী-১৯৬৫ দুই অর্থনীতির উপর প্রফেসর রেহমান সোবহানের সারগর্ভ প্রবন্ধটি ছাপায়। প্রবন্ধটি নিম্নরূপঃ

"THE CONCEPT OF PAKISTAN"

Edited by Mizanur Rahaman Sheely Vol. 1, No. 6, January 1965

Mr. Rehman Sobhon approaches the problem of national integration and harmony in Pakistan from an Economic's point of view. To suggest the means to national unity, he first investigates into the the root causes of disunity. The central reason of the potentially disastrous economic conflicts of the country-Mr. Sobhan points out is the economic disparity between the Eastern and the Western Wing of Pakistan. Writting in an engaging style he pinpoints the factors that has brought into being and is sustaining this glaring disparity.

Discussing the ways of removing this gap in the economic prosperity of the two parts of the land Mr. Sobhan opines that a policy of stepped up allocation to East Pakistan to eliminate disparity may result in the creation of hostility in West Pakistan after a period of time if not immediately. Hence the only way to ensure that national harmony

prevails, thinks Mr. Sobhan, "is to eliminate" the main point of tension." A logical solution, would therefore be," to have two cakes instead of one." With that Mr. Sobhan brings-into the picture the burning issue of the hour, the idea of two economics for Pakistan- Ed.

The Nation and its Economy

A Nation economically well-knit. How to build Pakistan into a well -knit nation is a subject which provides a good occasion to indulge in generalisations which range over he field of politics, law, sociology, economics, anthropology and even aestheitics Economics teaches us the virtues of division of labour; working on the assumption that other contributors will draw on their abundant qualifications as erstwhile politicians or practising lawyers, I propose to take refuge in my profession and approach the subject from the point of view of an economist.

When people talk of the need for an economically well knit nation one is faced with the danger of being bogged down in essentially semantic discourses without actually getting into the subject. But then what is the subject? What do we really mean by a well knit nation? Does it mean a nation with an integrated economy? We find all these issues being paraded in the course of discussion. Now we could no doubt discuss each of these aspect of the problem with equal vigour. However, for purpose of this paper it is proposed to assume that a well knit nation means one which is free of conflict over economic issues between its separate regions. As we will see this is by no means an adequate assumption but will have to do for a working hypothesis if the discussion is ever to leave the ground.

The causes of disunity. Even with our restricted assumption we are left with the question of what is a region. After all the agitation of Sindhis and Pathans about economic neglect are quite familiar to us. However, because West pakistan is (1) integrated geographical region with a (2) well developed internal transportation system and because the cultural differences are somewhat less pronounced, the prospects of both labour and capital moving from one region to another is always likely to **initiate equlising tendencies.** This is not to say that there are no obstacles to this mobility and that certain regions in West Pakistan have not visibly lagged behind others but that the problems are somewhat smaller compared to the mobility of labour and capital between East and West Pakistan. Now

the essence of any discussion on unity lies in an analysis of the causes of disunity. It would, therefore, be appropriate to examine the nature of these controversies which have arisen between East and West Pakistan.

Historical evidence clearly indicates that the economic development of East Pakistan has lagged far behind that of the West. Both the wings inherited backward economics in the aftermath of partition. Both West and East Pakistan were economic hinterlands which provided the food and raw materials for the more developed regions of undivided India. Industry was virtually absent though we had he embryo of a textile Industry in East Pakistan and the begining of a metal industry in the West. However, in the years after partition whilst substantial economic development occured in the West, East pakistan slowly fell behind in the race. Evidence based on national income statistics indicates that East pakistan's per capita income actually decline during the 1st 5-year plan whilst West pakistan's income rose. No doubt these along with all other statistics in Pakistan must be accepted with reservation but these figures if nothing else indicate a trend which is apparent to the more acute observers of the economic scene. The crux of the matter for East Pakistan is that even though she has made considerable economic progress it has not been enough to keep pace with her population increase. For those who think that the fecundity of the East pakistani is the chief villain it may be mentioned that population in the last decade has increased here by 20.9% whereas it has increased by 23.7% in West Pakistan.

The glaring gap: This glaring gap has of course been a basic issue of conflict for the last decade and is only to be expected. Pakistan is not the first country where the backwardness of one region has become an explosive political issue. The United States is one of the most obvious examples with the Civil War acting as a crisis point for this conflict. Similarly, North and South Italy, North and South Belgium and the conflict between the different Indonesian Islands are some of the many conflicts which come to mind. The Congo is the most recent addition to an impressive list.

Poverty, whatever its causes, is always likely to generate tensions particularly when it occurs in juxtaposition to prosperity. No matter how one rationalises the economic progress of the West the facts of life indicate that as long as there is a gap, irrespective of its genuine

origins, East Pakistanis will accumulate resentment and will do whatever they can to remedy their predicament.

Its raison d'etre. It, therefore, becomes important to examine the raison d'etre of this gap. Is it a byproduct of malafide intentions or of certain inexorable economic forces? In a country which is completely committed to free enterprise, resources tend to flow to those regions which offer the best prospects for high returns on investment. However, high returns are not created by the atmospheric conditions but are in turn the byproduct of economic forces at work in the region. The existence of good roads, electricity, water supply are all conventional factors. In addition to this, government policies about import lincences allocations, Credit facilities, industrial estate locations, are also important in promoting investment.

Patronage for the west. In West Pakistan which was slightly advanced in all these fields but was also blessesd with the virtues of government patronage the post-partition period saw heavy investment, in what is known in our professional jargon, as social over-heads. Investment in roads power, irrigation were reinforced by liberal credit policies and import licences. This basic policy decision was reinforced by the flow of refugee capital, from india into West Pakistan, where these facilities offered by the government butterssed the cultural affinities to the region and the belief that the region was politically more stable. In turn the big government investments created the purchasing power to sustain this industrialisation. The emergence of the textile industry which became the basis of many fortunes and furthter industrialisation was again fostered by acts of policy in West Pakistan. Today most of the industrial giant of the west are those who had their genesis in the textile industry.

This rapid expansion in the West carried within it its own dynamics. What Professor Gunner Myrdal has called the law of cumulative causation got to work. The essence of the law is that riches beget riches. As West Pakistan prospered and incomes increased not only was the purchasing power of the people stimulated but the existence of well developed social overhead facilities and thriving business acted as an incentive to people to come in and set up new industries. Thus acts of policy could now be supported by the claims of economic logic whence, left to themeselve the market forces automatically led to flow and concentration of resources in the West.

The first plan. The introduction of the 1st 5-year-plan was a land mark indicating that the logic of the market place was not going to be the rationale of our economic development. Conscious policy decisions were to be made with a view to promoting development. The first 5 year plan, however, saw East Pakistan getting a much smaller share of the total allocations. This was aggravated by the inability of East Pakistan to spend the money allotted to them the total expenditure during the first plan coming to about Rs.98 crores.

The low allocation of resources to East Pakistan were themselves a byproduct of the same forces with led to East Pakistan lagging behind in the past. It was agreed that investment should take place where the prospects of income generation were higher. Since West Pakistan had the advantage of social overhead and allied investment it followed that it was likely to yield a higher productivity for investment. So the fruits of man-made decisions were now used to justify further decisions.

Furthermore the low administrative potential in the East Pakistan which was another legacy of neglect was unable to work up acceptable schemes and more important, to get them accepted at the centre. When the allocations came through the paucity of administrative and technical personnel led to poor implementation. Thus a further variable was introduced in limiting allocations to East Pakistan and it was not unnatural that the First plan, instead of narrowing the gap between the two wings, actually served to widen it.

And the second. The second five year plan indicates a consciousness of this problem and allocations have been substantially stepped up with the ratio working out at about Rs.800 crores, out of Rs. 1,900 crores, to be spent in East Pakistan. However, these figures are misleading in that they overlook the expenditure on the Cannel Water replacement works in West pakistan which amounts to about Rs. 500 crores if not more and a projected Rs. 400 crores expenditure to combat water logging and salinity. Even within the original allocations some of the old rational still persist, this time in the form of on going projects. Here it is urged that substantial investments were made in the West, e.g. in power and irrigations and the textile industry, further investment is necessary to complete the projects or balance them as the case may be. Similarly, forgein exchange allocations also have to be higher in order to keep these investments functioning. We thus find that no matter how well-intentioned the planners may be certain built in forces are likely to

widen the development gap.

A further point of special interest arises from the peculiar geographical dispersal of the regions. The tendency for disparate rates of regional development, we have seen, existed and exists in other countries. However, over time, given a well knit communications net work, the fruits of economic progress slowly percolate down to the rest of the regions. The starting development and prosperity of the southern states of the U.S.A. are a case in point. However, given the 1,000 miles gap between East and West Pakistan it is not possible for labour to move across and participate in the development in the West. Similarly, the growing incomes in the West do not lead to a growing demand for goods in East Pakistan but either go for imported goods if available or goods manufactured in the West. It follows then that the normal movement of economic forces cannot be relied upon to make good this growing development gap and consciously motivated and redically different policies may be required to alter this trend.

Removing the gap. The purpose of this analysis has been to demonstrate that for historic and economic reasons East Pakistan has fallen behind in the race for economic development. This economic lag has been one of the paramount factors promoting conflict. This conflict has manifested itself and can in the future menifest itself in one of two ways. Firstly, that a conscious attempt be made to redically alter the distributions of development resources in favour of East Pakistan. This in itself may not be all that difficult if the will is there. The basic bottleneck to development in Pakistan has been foreign exchange. East Pakistan which has nearly always had a surplus of foreign exports over import has, in fact, subsidised the development of West Pakistan by giving her use of her exchange surplus. Furhtermore, the bulk of the foreign aid allocations have been channelised into West Pakistan. This trend can be reversed by simple administrative decisions. A policy of channelising most exchange allocations to the East would lead to an influx of West Pakistan Capital to exploit these allocations. Similarly, a centrally aided policy to work out acceptable schemes would lead to a flow of aid to East Pakistan, since a good deal of the aid is also likely to be in the form of commodity surpluses under President Kennedy's Food for Peace plan; this could be diverted independently of the on going projects, However, both policies would require emancipation from the tyranny of the on going

projects- arguments or East Pakistan will find that it is always ending up with the short end of the stick.

This policy of stepped up allocations assumes an integrated economic system sicne the flow of West Pakistan's capital and technical and administrative skills will have to play a strategic part in the operations. No doubt in time as incomes are generated from investment and training programme are accelerated, East Pakistani Capital and skills can be expected to come forward. In fact there is evidence that East pakistan capital is available even today on a larger scale than is popularly assumed and given the requisite governmental assistance could easily come forward. However, such a solution which really rests on the principle of diverting a bigger share of the developmental cake to East Pakistan and a smaller share to West Pakistan is likely to generate its own problems. A study of any society shows that one of the roots of tension is the income distribution question. In our case the fact that the East is now getting the plums may be tolerated for a while, but it would be most unlikely if it did not creat hostility in West Pakistan after a period of time, if not immediatly. It would be grossly unnatural if they did not contest the distribution of development expenditure. We may thus visualise a stage where West Pakistan becomes the aggrived section of Pakistan questioning the favours being given to the Eastern wing.

Two cakes in place of one. The logic of this danger leads one to the conclusion that if harmony is to prevail the main point of tension should be eliminated. In this case it is the distributional question since the problem arises out of the conflict for shares of the development cake. A logical solution would, therefore, be to have two cakes instead of one. This could be eschewed by introducing a policy of complete regional autonomy in an economic sense, with each region having full control over its resources both foreign exchange and domestic. The only expenditures left with the centre would be foreign affairs and defence. Both wings could contribute to this on the basis of their incomes and the benefits received.

Here two issues need clarification. Firstly, East Pakistan whilst having a foreign exchange surplus is also faced with an inadequancy of domestic finance. This could be offset by either a sale of foreign exchange to West Pakistan at the market price or by attracting West Pakistan capital with the lure of foreign exchange, Notwithstanding either alternative, a policy of deficit finance could creat the rupee equivalent to match the

foreign exchange earned. This step may be no more inflationary than financing development in East Pakistan from savings in West Pakistan.

More important than the question of internal finance is the question of foreign aid. A glance at our plan would reveal that the total foreign exchange component is expected to be met by foreign Aid. This brings to the sobering conclusion that all discussions of more or less development in either wing are academic, since the real resources come from aid. It is here that the political wisdom, not only of the centre but more so, of the aid giving countries will have to be taken into account. If the aid givers can evaluate East Pakistan as an autonomous economic entity and visualise its problems, social, economic and political, independently they may be more conscious of the need for an accelerated aid programme. As it stands when the two units are compared in juxtaposition to one another consideration of on going projects and relative rates of return, not to mention more dynamic lobbying by West Pakistan, tends to colour decisions in their favour. However, if the aid givers could have their aid missions in East Pakistan and eveluate in the context of the requlrements of the region, a substantially accelerated aid programme may not be unlikely. Given this accelerated aid a major bottleneck to development would climinate itself.

Now it may appear paradoxical that the conclusion of discussion aiming to build Pakistan into a well-knit nation leads to a case for regional autonomy. One submits that this paradox stems from the illusion that unity means conformity and physical contact. In fact true unity only emerges when the main points of conflict between the two groups have been climinated or reduced there is greater danger in forging an artificial unity which may ultimately give way at the seams under pressure from the explosive issues inherent in the distributional questions; rather than face this a policy of leaving the regions to look after their own economic destiny from their own economic resources will lead to the emergence of a healthy relationship built up on the free intercourse of private trade and investment and common foreign policy and defense interests which can be viewed independently of the economic question.

Only one aspect of the distribution problem has thus been touched upon. The regional question has obviously formed the centre of this paper because it is an issue which is most frequently in our minds. However,

even within regionally autonomous economic units fissaporous tendencies will be at work. This is because the struggle for the economic cake is an old question which has its origins in antiquity and even transcends economic systems. The conflict between agriculture and industry and labour and capital will always be with us. Socialist countries may have got round the labour and capital question in its more obvious forms but are still faced with the consumptions investment and industry-agriculture conflict which has led to explosive consequence on many occasions.

Similarly, in Pakistan these issues will be with us and will always work against a harmony of interest for many years to come. However, such conflicts are the life blood of a society. Monolithic or totalitarian societies try and eliminte these by a plea for national unity. But this plea is essentially temporary. Countries may unite against foreign aggression or for independence or other common problems but once left to themselves these issues will emerge. The point of conflict may be minimised initially by propaganda palliatives but sooner or later the questions of who gets the cake at whose expense will assert itself. In a democratic society one simply lives with these conflicts and tries to minimise their harshness by channelising them into the parliamentary process. In other societies the conflict expresses itself ultimately in explosions and revolution. Perhaps, in some future day when technology has introduced an era of such abundance that all men can have all they want, we can visualise a conflict free and well-knit society.

এই সময় পূর্ব পাকিস্তানে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সাধারণের ক্রয়ক্ষমতাকে অতিক্রম করিয়া এক দুর্বিষহ অবস্থা সৃষ্টি করে। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের বৈঠকে বিলাসী নেতৃবৃন্দের অপেক্ষা না করিয়াই আমরা সক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার নিমিত্ত জনাব আতাউর রহমান খানের বাসভবনের (৫০০ এ, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, সড়ক নং-৭) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সভা আহবান করি এবং নিম্নোক্তদের সমবায়ে 'সর্বদলীয় খাদ্য ও দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করিঃ

খাজা খায়ের উদ্দিন	পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউঃ)
জনাব শফিকুল ইসলাম	" "
মাওলানা আবদুর রহিম	পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী
জনাব গোলাম আযম	" "
জনাব ফরিদ আহমদ	পাকিস্তানে নেজামে ইসলাম পার্টি
জনাব এম, আর, খান	" "

জনাব আতাউর রহমান খান — জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট
জনাব অলি আহাদ — " "
জনাব ইমদাদুল্লাহ — খিলাফতে রাব্বানী পার্টি

মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন

পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রতিনিধিবর্গ এই সভায় খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করে বটে, তবে পার্টি সভাপতি মাওলানা ভাসানীর অনুমতির অপেক্ষায় থাকেন এবং মাওলানা ভাসানীর অনুমতি আর আসে নাই। ১৯৬৩ সালে আইউব-ভাসানী সাক্ষাৎকারের পর হইতে মাওলানা প্রকৃতপক্ষে সরকার বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণে তীব্র অনীহা প্রকাশ করিতেন এবং কালক্রমে ঘটনাস্রোতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রেসিডেন্ট আইউব খানের গদি রক্ষায় সহায়ক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

প্রেসিডেন্ট আইউব খানের বিচক্ষণ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর সিদ্ধহস্ত পরিচালিত পররাষ্ট্রনীতি একই সঙ্গে দুই কমিউনিষ্ট দৈত্য মহাচীন ও সোভিয়েট রাশিয়ার বন্ধুত্ব অর্জনে সমর্থ হয়। সাম্রাজ্যবাদী সামরিক চুক্তি ও জোট বদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান কাশ্মীর সমস্যা সমাধান প্রশ্নে কমিউনিষ্ট মহাচীনের প্রকাশ্য সমর্থন পায় এবং ভারতের অন্ধ বন্ধু সোভিয়েট রাশিয়াও কাশ্মীর সমস্যা প্রশ্নে পূর্বেকার কঠিন মনোভাব পরিহার করিয়া নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে। পররাষ্ট্রীয় নীতির আকস্মিক গতিশীলতা ও সার্বজনীনতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে ক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। ১৯৬৭ সালের ৮ই মে মস্কো রেডিও ইংরেজী টিকা ভাষ্যে ঘোষণা করে, "পাকিস্তান কর্তৃক মার্কিনী ফরমাবরদারী হইতে মুক্ত স্বাধীন ও বাস্তবধর্মী বৈদেশিক নীতি গ্রহণের দরুন মার্কিন সরকার নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছিল। ইতিমধ্যে অকূটনীতিসুলভ কার্যকলাপের দরুন পাকিস্তান সরকার মার্কিন সরকারের নিযুক্ত মাসত খুই, ম্যাকডোনাল্ড, কিং ও জেলবার্টকে পাকিস্তান হইতে বহিষ্কার করিয়া দেন। মার্কিন সরকারের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (C.I.A.) পূর্ব পাকিস্তানের শেখ মুজিবকে লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নের স্বপক্ষে সাহায্য করিতেছে এবং কোন একটি রাজনৈতিক দলের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে। শুধু তাহাই নয়, ইহার ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিবার জন্য ষাট লক্ষ টাকা সাহায্য দিয়াছে।"

উল্লেখ্য যে, ১৯৬৭ সালের ১৬ই মার্চ রেডিও পিস এন্ড প্রগ্রেস, মস্কোর ঘোষণাপত্রেও অনুরূপ বক্তব্য শোনা গিয়াছিল। বলাই বাহুল্য যে, মস্কো রেডিও কথিত এই রাজনৈতিক দল ও ঘোষণাপত্র হইতেছে ছয় দফা ও শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পেশোয়ার সামরিক ঘাঁটি গুটাইয়া দেওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নারাজ হয় এবং ইহার ফলে বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে উস্কানি দিতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত সরকার স্ব-স্ব দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে নানাভাবে বিশেষ করিয়া আর্থিক সাহায্য মারফত শক্তিশালী করিবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। পরিস্থিতির এই ক্রান্তিলগ্নে আওয়ামী লীগকে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা (সি,আই,এ)-এর ফরমাবরদার আখ্যা দান

করিয়া সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কোন কোন মহল স্বীয় কর্তব্য সমাধা হইয়াছে মনে করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করে এবং প্রেসিডেন্ট আইউব খানের পররাষ্ট্র নীতিতে অভিনন্দনযোগ্য পরিবর্তনের জয়ধ্বনিতে মশগুল হইয়া পড়ে। তারপর জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন প্রকট সমস্যা সমাধানে গণআন্দোলনে নেতৃত্ব না দিয়া মার্কস, লেনিন ও মাও সেতুং-এর বক্তব্যকেন্দ্রিক তর্ক-বিতর্কে অনাহূত কালক্ষেপণ করিতে থাকে এবং প্রগতির লেবাস পরিধান করিয়া গণশক্তি হইতে শত ক্রোশ দূরে থাকিয়া সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামী শক্তি আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিল। বলাই বাহুল্য যে, তাঁহারা মূলতঃ জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার ও বহুদলীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। তাহারা একদলীয় একনায়কত্বে বিশ্বাসী। তাই চীন-রাশিয়া বন্ধুত্বের ক্ষীণ-রশ্মি অবলোকনেই তাহারা জনতার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা আন্দোলন ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার অর্জন আন্দোলনকে ছুরিকাঘাত করিয়া স্বীয় দলীয় মোঃ তোয়াহা, মোজাফফর আহমদ, আসহাবউদ্দিন প্রমুখের উপর হইতে গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার হাসিলে আত্মনিয়োগ করে। আদর্শ সংক্রান্ত সংঘাতের ইহাই স্বাভাবিক পরিণতি, বাদবাকী ব্যতিক্রম মাত্র। এই কারণেই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগদানে বিরত থাকাটা বিস্ময়কর কিছু ছিল না। উল্লেখ্য যে, এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সর্বদলীয় কোন আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করিয়া একলা চল নীতি গ্রহণ করে।

খাদ্য দাবী দিবস

এইদিকে সর্বদলীয় খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধে অংশগ্রহণ কমিটি ২২শে মে (১৯৬৬) "খাদ্য দাবী দিবস" পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তদানুযায়ী ঢাকার পল্টন ময়দানে জনসভা আহবান করা হয়। পূর্বেই ঘোষণা করা হয় যে, জনাব আতাউর রহমান খান এই সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। ইতিমধ্যে ২০শে মে (১৯৬৬) পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় ডেপুটি সেক্রেটারী রাওয়ালপিন্ডি হইতে এক আদেশ বলে জনাব আতাউর খানকে রাজনৈতিক দল বিধির ৮-ক ধারার ১ উপধারা (Subsection I of Section 8A of the political parties Act) মোতাবেক আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ছয় মাস অবধি কোন জনসভা, সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণদান ও বিবৃতি দান হইতে বিরত থাকিতে বলেন। আতাউর রহমান খান ২১শে মে উক্ত আদেশপত্রের এক কপি রাখেন। তড়িঘড়ি কমিটির সভা আহবান করা হয়। আদেশ লংঘন প্রশ্নে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। অবশেষে সিদ্ধান্তের ভার আতাউর রহমান খানের উপরেই ন্যস্ত হয়।

২২শে মে অপরাহ্নে পল্টন ময়দানে আহূত জনসভায় বিপুল জন সমাগম হয়। আইউব-মোনায়েমের অন্যায় আদেশকে উপেক্ষা করিয়া সভায় সভাপতির ভাষণ দিতে আমি অনুরোধ করিলে প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে তিনি ভাষণ দান করেন। পরিতাপের বিষয়, ২২শে মে সন্ধ্যার পর বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার সংবাদদাতা ও সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিকে টেলিফোনযোগে তিনি ভাষণদান খবরটি বেমালুম অস্বীকার করেন। নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের খবরটি তিনি যখন আমতা আমতা করিয়া অস্বীকার করিতেছিলেন; আমি তখন স্বয়ং তাহার সম্মুখস্থ সেক্রেটারিয়েট টেবিলটির পার্শ্বে বসা। দুর্ভাগ্য, স্বকর্ণেই তাহার ভুল তথ্য পরিবেশন শুনিতে হইল। আমি

মর্মাহত ও বিস্মিত হইলাম। ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তাহার গণমুখী হইবার প্রবল আকাঙ্খা আছে কিন্তু চরম মুহূর্ত মোকাবিলা করিবার সৎ সাহস নাই। (ক) ১৯৪৯ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকা অবস্থানকালে খাদ্য মিছিল পরিচালনার অপরাধে আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতৃবর্গ গ্রেফতার হইলে, তিনি শিলং অধ্যয়নরত সন্তানদের সঙ্গ দিতে ঢাকা ত্যাগ করেন, (খ) ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর ভয়ালরূপ দেখিবার পূর্বেই মামলা সংক্রান্ত কাজে ঢাকা ত্যাগ করিয়া ময়মনসিংহ গমন করেন, (গ) ১৯৭০ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ১৯৭১ সালে অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং (ঘ) মুজিব আমলে ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন সরকার বিরোধী কমিটি অব এ্যাকনশনে ১৪৪ধারা ভঙ্গের অপরাধে আমাদের গ্রেফতার করা হইলে-তিনি কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেন নাই। এমন কি স্বীয় প্রেস কনফারেন্সে আমাদের নামোল্লেখ করিতেও সাহস পান নাই, (ঙ) ১৯৭৫ সালে মুজিব এক দলীয় শাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে বাকশাল গঠন করিলে তিনি বাকশালে যোগ দিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই।

যাহা হউক, পরবর্তী কর্মসূচী গ্রহণকল্পে কমিটির বৈঠক আহবান করা হইল। জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা আবদুর রহিম বলিলেন "মন্দ আইনকে মন্দ বলিব কিন্তু আইন ভঙ্গ করিব না।" অন্যান্য দক্ষিণপন্থী দলীয় প্রতিনিধিবৃন্দও একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করেন। ফলে সভার সামগ্রিক আবহাওয়ার মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। সক্রিয় গণআন্দোলনের কোন কর্মসূচী গ্রহণের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। বস্তুতঃ আলাপ-আলোচনার আসর জমাইয়া গণআন্দোলন হয় না। সরকারী ভ্রান্ত নীতির প্রতিবাদে সরকারের সহিত সংঘাত- সংঘর্ষের মাধ্যমেই ধীরে ধীরে আন্দোলন গণআন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। গণআন্দোলন, গণ ঐক্য, গণ প্রতিবাদই জালেম সরকারের সমুচিত জওয়াব দিতে পারে, অন্যথায় জালেম শাহী জগদ্দল পাথরের ন্যায় অনড় হইয়া স্থায়িত্ব পায়।

আমাদের শ্রমিক সমাজ

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয় দফা আদায় উদ্দেশ্যে ৭ই জুন হরতাল ঘোষণা করে। এই হরতালে শ্রমিক শ্রেণী সক্রিয় অংশগ্রহণ করায় গণআন্দোলনে এক নূতন ডাইমেনশন যুক্ত হয়। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন হইতে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত সরকার বিরোধী আন্দোলনে সাধারণতঃ ছাত্র সমাজ ও সমস্যা জর্জরিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীই সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছে। স্বীয় মুজুরী বৃদ্ধি, বোনাস বা ভাতা আদায় ইত্যাদি অর্থনৈতিক দাবী আদায়ের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল; কোন ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলনে তাহাদের উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা ছিল না।

প্রসঙ্গক্রমে গোটা শ্রমিক আন্দোলনের পূর্বাপর একটি সাংগঠনিক আলোকচিত্র আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞানমতে তুলিয়া ধরা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। কমিউনিস্ট পার্টি সদস্য কমরেড অনিল মুখার্জী ও কমরেড নেপাল নাগের সক্রিয় সহায়তায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডক শ্রমিক নেতা আফতাব আলী ও কলিকাতার খিদিরপুর শ্রমিক নেতা এডভোকেট ফয়েজ আহমদ ১৯৪৮ সালে 'পূর্ব পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবার' গঠন করেন। জনাব আফতাব আলী ও জনাব ফয়েজ আহমদ যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৬ সালে মজদুর ফেডারেশন গঠিত হয় এবং ১৯৫৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ ইহার কর্মকর্তা নির্বাচিত হনঃ

মোহাম্মদ তোয়াহা	সভাপতি
এডভোকেট এম, এ, জব্বার (খুলনা)	সহ-সভাপতি
এ, আর, সুন্নামাত (ঢাকা)	" "
হারুনুর রশিদ চৌধুরী (চট্টগ্রাম)	" "
কাজী মহিউদ্দিন আহমদ	সম্পাদক
হাবিবুর রহমান	সাংগঠনিক সম্পাদক

১৯৬১ সালে পূর্ব পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশন পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশন (ইস্ট জোন) নামে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাসহ পুনর্গঠিত হয়ঃ

এ, আর সুন্নামাত	সভাপতি
কাজী মহিউদ্দিন	সহ-সভাপতি
দেওয়ান সিরাজুল হক	" "
এম, এ, হাই	" "
খোন্দকার আবদুল হাই	সম্পাদক
আশরাফ হোসেন	সহ-সম্পাদক
শাহ আবদুল হালিম	" "

১৯৬৪ সালে পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশন (ইস্ট জোন) দুই ভাগে বিভক্ত হয়। ইহার একভাগে এ,আর, সুন্নামাত ও দেওয়ান সিরাজুল হক যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক এবং আশরাফ হোসেন, রুহুল আমীন ভূঁইয়া ও মোহাম্মদ এজাজ সহ-সম্পাদক ও আনিসুর রহমান সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই অংশ 'বাংলা মজদুর ফেডারেশন' নাম গ্রহণ করে। পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশনের (ইস্ট জোন) অন্য অংশের সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে খন্দকার আবদুল হাই ও শাহ আবদুল হালিম। তাঁহারা ১৯৭১-এর মুক্তি আন্দোলন বিরোধী ছিলেন; কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর সংগঠনের নাম রাখেন 'বাংলাদেশ মজদুর ফেডারেশন।"

১৯৬৬ সালে মার্কসীয় দর্শন ভাবাপন্ন শ্রমিক নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন গঠন করেন। জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা ও সিরাজুল হোসেন খান যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ সালে সভাপতি মোহাম্মদ তোয়াহা ও যুগ্ম সম্পাদক হাবিবুর রহমান শ্রমিক ফেডারেশন হইতে পদত্যাগ করেন। ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন কমরেড কাজী জাফর আহমদ ও চট্টগ্রামের শ্রমিক নেতা কমরেড আবুল বাশারের নেতৃত্বে দ্বিধাবিভক্ত হয়। উক্ত বিভক্তির পিছনে ব্যক্তিনেতৃত্বের অভিলাষ ও মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী কমিউনিষ্টদের তত্ত্বগত মতভেদ সমভাবেই কাজ করিয়াছে।

শ্রমিক আন্দোলন বহুধা পথে সংগঠিত হয় বটে তবে অবস্থার বিপাকে শ্রমিক শ্রেণী ক্রমশঃ রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত হইয়া পড়ে। বাংলা ভাষাভাষী শ্রমিক সম্প্রদায়

আওয়ামী লীগ পরিচালিত ছয় দফা তথা বাংলার স্বাধীকার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিয়া অশেষ ত্যাগ স্বীকার করে।

৭ই জুনের প্রস্তুতি

দেশের আনাচে কানাচে ছয় দফার বাণী পৌছাইয়া দেওয়ার প্রয়াসে শেখ মুজিবর রহমান বিভিন্ন জেলা সদরে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দিতে লাগিলেন। ক্ষিপ্ত গভর্নর মোনায়েম খান বক্তৃতার কোন কোন অংশকে আপত্তিকর নির্ধারিত করিয়া পেনাল কোডের বিভিন্ন ধারায় বিচারের জন্য তাঁহাকে গ্রেফতারের আদেশ দেন। ১৯৬৬ সালের ২০শে মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানে বক্তৃতার জন্য খুলনা হইতে ঢাকা আগমন পথে ২১শে এপ্রিল যশোর জেলা শহরে গ্রেফতার, যশোর দায়রা জজ কর্তৃক জামিন মঞ্জুর; ময়মনসিংহে বক্তৃতার অপরাধে পুনঃ সিলেট জেল গেটে গ্রেফতার এবং ময়মনসিংহ দায়রা জজ কর্তৃক জামিন মঞ্জুর প্রাপ্ত হন। এইভাবেই শেখ মুজিবর রহমানের পুনঃপুনঃ গ্রেফতার এবং দৈনিক ইত্তেফাককে নিরবচ্ছিন্ন প্রচার-অভিযান পূর্ব পাকিস্তানে সর্বশ্রেণীর শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি মহলে তীব্র আলোড়ন ও যুগান্তকারী আবেদন সৃষ্টি করে। ১৯৬৬ সালের ৮ই মে নারায়ণগঞ্জে আয়োজিত জনসভায় পার্শ্ববর্তী শিল্প এলাকা হইতে সহস্র সহস্র মেহনতি শ্রমিক যোগদান করে এবং ছয় দফার প্রবক্তা শেখ মুজিবর রহমানকে পাটের মালায় ভূষিত করে। পাটকল শ্রমিক শ্রেণী হইতে আওয়াজ শুনা যায় আপোষহীন সংগ্রামের। নারায়ণগঞ্জ জনসভা হইতে প্রত্যাবর্তনের পরই ১৯৬৫ সালে দেশরক্ষা আইনের ৩৪ ধারায় ঢাকায় স্বীয় বাসভবন হইতে ৮ই মে রাত্রিতে শেখ মুজিবর রহমান গ্রেফতার হন এবং ১৯৬৮ সালের ১৭ই জানুয়ারী মুক্তির আদেশ পান বটে তবে কারাগার ফটকে তাঁহাকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রথম ও প্রধান আসামী হিসাবে পুনরায় গ্রেফতার করা হয় এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে স্থানান্তরিত করা হয়। শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১৩ই মে (১৯৬৬) ঢাকার পল্টন ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই দিকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ সভাপতি মাজহারুল হক বাকী; ময়মনসিংহ জিলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক রফিকউদ্দিন ভুঁইয়া ও শ্রমিক নেতা আবদুল মান্নান সক্রিয় কর্মসূচী নিতে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে চাপ দিতে থাকেন। ফলে আওয়ামী লীগ ৭ই জুন (মঙ্গলবার) সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ হরতাল পালনের ডাক দেয়। এই সময়ে চটকল শ্রমিক ফেডারেশন, মোঃ তোয়াহার নেতৃত্বে পরিচালিত পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন; আফতাব আলী, ফয়েজ আহমদ পরিচালিত পূর্ব পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবার বিভিন্ন শিল্প এলাকায় হরতাল বিরোধী সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ব্যতিক্রম ছিল পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশন (ইস্ট জোন)। এই সংগঠন ৪ঠা জুনের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে কোনপ্রকার সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া "অবস্থাভেদে ব্যবস্থা গ্রহণ নীতি" অবলম্বনে শাখা কমিটিগুলি নির্দেশ দান করে। আমার ধারণা, ইহার দ্বারা ৬ দফা দাবীতে আহূত হরতাল কর্মসূচী বহুলভাবে উপকৃত হয়। মজদুর ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত আঞ্চলিক তেজগাঁও ট্রেড ইউনিয়ন এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন ভুঁইয়া ৫ই জুন কার্যকরী কমিটির সভা আহবান করেন। শাখা সংগঠন সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান হরতাল

পালনের বিরুদ্ধে রায় দিলেন। কিন্তু সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন ভুঁইয়া ৬ই জুন তেজগাঁও আঞ্চলিক শাখাভুক্ত প্রত্যেক ইউনিয়ন হইতে দুইজন প্রতিনিধি সম্বলিত এক সম্প্রসারিত শ্রমিক বৈঠক আহবান করেন। সভায় বিভিন্ন বক্তা আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবর রহমান বিরোধী বক্তব্য রাখিলেও অবশেষে রাত্রি দেড় ঘটিকায় আইউব-মোনায়েম সরকারের জুলুম এবং কলকারখানার মালিক শ্রেণীর অত্যাচারের প্রতিবাদে ৭ই জুন রোজ মঙ্গলবার হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শ্রমিকদের মুজিব বিরোধী মনোভাবের কারণ অবশ্য ছিল। ১৯৫৬-৫৭ সালে শ্রমমন্ত্রী থাকাকালে শেখ মুজিবর রহমান শ্রমিকদের দাবীনামা গ্রহণের পরিবর্তে হাবিব ম্যাচ ফ্যাক্টরীর শ্রমিক প্রতিনিধিসহ শ্রমিকদিগকে পুলিশ মারফত ট্রাকে করিয়া জয়দেবপুর জঙ্গলে ছাড়িয়া দিবার ব্যবস্থা করেন।

৭ই জুনের ঘটনাবলী

৭ই জুন ঢাকা শহরে হরতালের প্রথম বেলায় বিশেষ কোন সক্রিয় সাড়া জাগাইতে পারে নাই। কিন্তু সমগ্র পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়া যায় তেজগাঁও শিল্প এলাকার মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া। সকাল ৮ ঘটিকার দিকে তেজগাঁয়ে অবস্থিত কোহিনূর কেমিক্যাল কোঃ (তিব্বত) ও হক ব্রাদার্স কোঃ সম্মুখস্থ রাজপথের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত একটি চায়ের দোকানে ধর্মঘটী শ্রমিক দল চা-নাস্তা গ্রহণকালে একজন শ্রমিক সাইকেলে তথায় আসিলে দোকানে উপবিষ্ট শ্রমিকদের একজন সাইকেলের হাওয়া ছাড়িয়া দেয়। এমনি আপোষী দৃশ্যে হাসি-কৌতুকের হিল্লোড় বহিয়া যায়। হঠাৎ হরিষে বিষাদ সৃষ্টি করে একটি পুলিশ জীপের আগমন। পুলিশ জীপে আগত পুলিশ শ্রমিকদিগকে লাঠিপেটা আরম্ভ করে, শুরু হয় পাল্টা শ্রমিক প্রতিরোধ। অসহিষ্ণু পুলিশের রিভলবারের গুলীতে তিনজন শ্রমিক গুলীবিদ্ধ হয়। উক্ত গুলীবিদ্ধ তিনজনের মধ্যে সিলেট জেলা নিবাসী বেঙ্গল বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিজের শ্রমিক মনু মিয়া ঘটনাস্থলে শাহাদৎবরণ করেন।

উক্ত হৃদয় বিদারক ঘটনার পর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলের সহস্র সহস্র শ্রমিক লাঠি হাতে মিছিল সহকারে পথে বাহির হইয়া পড়ে। মিছিল তেজগাঁও রেলওয়ে ক্রসিং অতিক্রমকালে উত্তর দিক হইতে আগত ট্রেনকে পথিমধ্যে থামাইয়া দেয়।ট্রেনটি পুনঃ চালাইবার চেষ্টা করিলে উহা লাইনচ্যুত হইয়া যায়। ঘটনার অব্যবহিত পরই পুলিশ ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর) এর সশস্ত্র বাহিনী রেল লাইনের পশ্চিম দিক হইতে রেল লাইনের পূর্ব দিকে অবস্থানরত শ্রমিক মিছিল ছত্রভঙ্গ করিবার প্রয়াসে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলী ছোঁড়ে। এমতাবস্থায় আকস্মিকভাবে নোয়াখালী জেলা নিবাসী আজাদ এনামেল এন্ড এলোমিনিয়াম কারখানার ছাঁটাইকৃত শ্রমিক আবুল হোসেন পায়ে গুলীবিদ্ধ হয়। ইহাতে উত্তেজিত হইয়া আহত আবুল হোসেন বীরদর্পে দাঁড়াইয়া সশস্ত্র বাহিনীকে তাহার বক্ষে গুলী করিতে আহবান জানায়। পুলিশের উদ্যত রাইফেলের নির্মম গুলী তাহার বক্ষকে বিদির্ণ করে। এইভাবেই ধরাশায়ী শহীদ আবুল হোসেন স্বীয় তপ্ত শোনিতে মুক্তি সংগ্রামের মৃত্যুঞ্জয়ী ডাক লিখিয়া গেলেন। এই স্থানেই পুলিশের পরবর্তী গুলীতে আরও ৫ জন শ্রমিক আহত হয়। প্রায় দুপুর ১২-৩০ মিঃ এই নগ্ন দমননীতি ও পাইকারী শ্রমিক-হত্যার প্রতিবাদে জারিকৃত ১৪৪ ধারা নিষেধাজ্ঞা অমান্য

করিয়া লাঠি হস্তে অকুতোভয় শ্রমিক জনতার মিছিল ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে তেজগাঁও হইতে পাক মোটর এলাকা, হোটেল শাহবাগ, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউট, কমিশনার্স অফিস (বর্তমান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) অর্থাৎ সেগুন বাগিচার মোড়ে উপস্থিত হয়। মিছিল পল্টন ময়দান মুখে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলে সশস্ত্র পুলিশ ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনী বাধাদান করে। বাধাপ্রাপ্ত জঙ্গী মিছিলটি হাইকোর্ট অভিমুখে রওয়ানা হয়। সময় তখন অপরাহ্ন দুই কি আড়াইটা। মিছিলের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর বেস্টনি লক্ষ্য করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ মিছিলকারীগণকে কার্জন হল প্রাঙ্গনে সমবেত হইবার আহ্বান জানায়। অপরাহ্ন চার ঘটিকায় পল্টনে আহূত জনসভায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কাহাকেও না দেখিয়া বিহবল, হতাশ ও উদ্বিগ্ন মনে শ্রমিকগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া স্ব-স্ব পথে তেজগাঁও অভিমুখে যাত্রা করে। প্রত্যাবর্তনকারী শ্রমিকদের ১শত ৫০ জনকে পুলিশ রমনা থানা, পাক মোটর, হোটেল শাহবাগ ও অন্যান্য স্থান হইতে গ্রেফতার করে। পরে ৯ই জুন রাত্রে সান্ধ্য আইন জারি করিয়া তেজগাঁওয়ের নাখালপাড়া হইতে ৬০ জন শ্রমিককে গ্রেফতার করা হয়।

'৭ই জুন ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব

নারায়গণগঞ্জ শহরে ৭ই জুন হরতাল উপলক্ষে কয়েক স্থলে পুলিশ-জনতা সংঘর্ষ ঘটে। সর্বশেষ বোস কেবিনের নিকট জনতা রেলওয়ে ওয়াগন লুট করিবার চেষ্টা নিলে পুলিশের গুলীতে ৬ জন মৃত্যুবরণ করে। ক্রুদ্ধ জনতা নারায়ণগঞ্জ থানা আক্রমণ করে। তেজগাঁও, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শহরে পুলিশ-জনতা সংঘর্ষ ও পুলিশের গুলীতে নিহত হইবার সংবাদে উত্তেজিত লক্ষাধিক শ্রমিক-জনতা পোস্তগোলা, ডেমরা, নারায়ণগঞ্জ হইতে যাত্রাবাড়ী পৌঁছিলে সশস্ত্র পুলিশ ও ই,পি, আর বাহিনী বাধা দান করে। কর্তৃপক্ষ জনতাকে জানায় যে, ঢাকার পল্টন ময়দানে কোন জনসভা হইতেছে না। সত্যতা যাচাইয়ের জন্য শ্রমিক নেতা সায়েদুল হক, নূর মোহাম্মদ ও শফি সহ ৫ জনকে ঢাকার পল্টন ময়দানে পাঠানো হয়। শ্রমিক নেতৃবৃন্দ যাত্রাবাড়ী প্রত্যাবর্তন করিয়া জনশূন্য পল্টন ময়দানের রিপোর্ট দিলে শোভাযাত্রীগণ ঢাকা গমন কর্মসূচী বাতিল করেন। এইভাবে ই,পি, আর ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সময়োপযোগী পদক্ষেপ আসন্ন প্রলয়কান্ড হইতে পরিস্থিতিকে রক্ষা করে। উলেখ্য যে, ৭ই জুন দুপুর নাগাদ ঢাকা শহরের হরতাল ও জনসভা সম্পর্কে আলোচনা করিতে আমি স্ব উদ্যোগে পুরানা পল্টন আওয়ামী লীগ অফিসে গমন করিয়াছিলাম। তথায় মিজানুর রহমান চৌধুরী, মিসেস আমেনা বেগম, এ,কে, রফিকুল হোসেন, গাজী গোলাম মোস্তফা ও সিরাজুল আলম খানের সহিত আমার আলোচনাও হইয়াছিল। ৭ই জুন তেজগাঁও এবং নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলীবর্ষণের সংবাদে ঢাকা শহর স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। হরতাল স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়। উৎসুক জনতা পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গকে দেখিতে চায়। আমি বার বার যোগাযোগ করিয়াও তাহাদিগকে পল্টন ময়দানে লইয়া যাইতে সমর্থ হই নাই। বোধহয় গভর্নর মোনায়েম খানের ভয়াল মূর্তি কল্পনানেত্রে তাহাদিগকে অদৃশ্য স্থল হইতে শাসাইতেছিল। তাই ৭ই জুন সরকারী হিসাবে ১০জন নিহত হওয়া সত্ত্বেও নেতৃবৃন্দ কোন প্রতিবাদ কর্মসূচী ঘোষণা করেন নাই। ৬ দফা দাবী প্রতিষ্ঠার প্রথম

পর্যায় এই অভিযানের (৭ই জুনের কর্মসূচীর) সাফল্য ও গৌরব তেজগাঁও, পোস্তগোলা নারায়ণগঞ্জ, ডেমরা ও আদমজী নগর শিল্পাঞ্চলের সংগ্রমী, নির্ভীক ও সরল শ্রমিক শ্রেণীর অবশ্য প্রাপ্য। ইতিপূর্বে আর কখনও এত ব্যাপক ও সংঘবদ্ধভাবে শ্রমিক শ্রেণী রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নাই।

পাকিস্তান জন্মলগ্ন হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের গণতন্ত্র বিরোধী, প্রভূত্বব্যঞ্জক ও বাঙ্গালী বিদ্বেষী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পদক্ষেপগুলির বিরুদ্ধে বাংলা ভাষাভাষী পূর্ব পাকিস্তানীদের মনের দিগন্তে পুঞ্জীভূত রোষ ধীরে ধীরে শাসকচক্রের অজান্তে ও অগোচরে প্রলয়ংকরী রূপ ধারণ করিতেছিল। ইহারই অসংগঠিত ও স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে ৭ই জুন। ঐতিহাসিক যুগ সন্ধিক্ষণের যুগ পরিবর্তনকারী অবশ্যম্ভাবী সংগ্রামের নির্ভীক অজেয় অগ্রণী সেনা মেহনতি শ্রমিক শ্রেণী শত্রুকে চিহ্নিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অদূর ভবিষ্যতে শাসক শ্রেণীর বিস্তর হাঁকডাক ও দম্ভের শোচনীয় পরাজয়ের সংকেতধ্বনি ছিল ৭ই জুনের আন্দোলন।১৩ই মে (১৯৬৬) পল্টন ময়দানের জনসভায় আওয়ামী লীগ নেতা জনাব জহিরুদ্দিন আহমদ তাঁহার ভাষণে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানকল্পে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর চৌদ্দ দফা প্রত্যাখ্যান করায় ভারত দ্বিখন্ডিত হয়, তদ্রূপ ৬ দফা দাবী গ্রহণে পাকিস্তানী শাসকবর্গ ব্যর্থ হইলে পূর্ব পাকিস্তান এক দফা দাবী করিবে।"

ইত্তেফাক বন্ধ

৬ দফা আন্দোলন প্রচারে নিয়োজিত দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেনকে ১৫ই জুন গ্রেফতার করা হয়। ১৬ই জুন দৈনিক ইত্তেফাকের মুদ্রাযন্ত্র দি নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেসকে বাজেয়াপ্ত এবং দৈনিক ইত্তেফাক প্রকাশনার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। দৈনিক ইত্তেফাক বাজেয়াপ্তকরণ আদেশের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় ঢাকা হাইকোর্ট সরকারী আদেশের বিরুদ্ধে রায় দিলে সরকার অর্ডিন্যান্সে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে দৈনিক ইত্তেফাকের মুদ্রাযন্ত্র দি নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেসকে পুনরায় বাজেয়াপ্ত করে। উল্লেখ্য যে, এই ৭ই জুনের ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে বেশীর ভাগ আওয়ামী লীগ নেতাই গ্রেফতার হন। নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হইবার পর মহিলা সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা নিযুক্ত হয়। তাহার কঠোর পরিশ্রম ৬ দফাকে গণভিত্তি দিতে সমর্থ হয় এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আওয়ামী লীগের পতাকা সমুন্নত থাকে।

এইদিকে এক ব্যক্তি শাসনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি হইতে সমগ্র দেশকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে ও জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক বাসনায় পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ঐক্য সংস্থা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। জনাব আতাউর রহমান খানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত ৩০শে এপ্রিলের (১৯৬৭) সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সমবায়ে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট গঠিত হয়ঃ

জনাব নুরুল আমিন   জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট
জনাব হামিদুল হক চৌধুরী   "   "   "
জনাব আতাউর রহমান খান   "   "   "
জনাব মমতাজ দৌলতানা   পাকিস্তান মুসলিম লীগ
জনাব তোফাজ্জল আলী   "   "   "
সৈয়দ খাজা খায়ের উদ্দিন   "   "   "
মাওলানা তোফায়েল মোহাম্মদ   জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান
মাওলানা আবদুর রহিম   "   "   "
অধ্যাপক গোলাম আযম   "   "   "
নওয়াবজাদা নাসুরুল্লাহ খান   পাকিস্তান আওয়ামী লীগ
আবদুস সালাম খান   "   "   "
গোলাম মোহাম্মদ খান লুন্দখোর   "   "   "
চৌধুরী মোহাম্মদ আলী   পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টি
মৌলভী ফরিদ আহমদ   "   "   "
এম, আর, খান   "   "   "

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট গঠন প্রশ্নে পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও আমেনা বেগমের (যথাক্রমে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদিকা) নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগ ও মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ (সভাপতি) ও রাজশাহীর মুজিবুর রহমান (সাধারণ সম্পাদক) পরিচালিত আওয়ামী লীগ যথাক্রমে ৬ দফা আওয়ামী লীগ ও আট দফা আওয়ামী লীগ নামে পরিচিতি লাভ করে। ৬ দফা পূর্বেই দেওয়া আছে। পাঠকদের সুবিচধার্থে ৮ দফা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

৮ দফা কর্মসূচী

১। শাসনতন্ত্রে নিম্ন বিধানসমূহের ব্যবস্থা থাকিবেঃ

ক) পার্লামেন্টারী পদ্ধতির ফেডারেল সরকার
খ) ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র মোতাবেক প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত আইন পরিষদের প্রাধান্য
গ) পূর্ণাঙ্গ মৌলিক অধিকার
ঘ) সংবাদপত্রের অবাধ আযাদী ও
ঙ) বিচার বিভাগের নিশ্চিত স্বাধীনতা

২। ফেডারেল সরকার নিম্ন বিষয়সমূহের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেনঃ

ক) প্রতিরক্ষা (ডিফেন্স)
খ) বৈদেশিক বিষয়
গ) মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় অর্থ ব্যবস্থা
ঘ) আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগ ও বাণিজ্য এবং ঐকমত্যে নির্ধারিত অন্য যে কোন বিষয়।

৩। পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম করা হইবে এবং কেন্দ্রীয় বিষয় ছাড়া সরকারের অবশিষ্ট যাবতীয় ক্ষমতা শাসনতন্ত্র মোতাবেক স্থাপিত উভয় আঞ্চলিক সরকারের নিকটই ন্যস্ত থাকিবে।

৪। উভয় প্রদেশের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য ১০ বৎসরের মধ্যে দূর করা পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হইবে ঃ

ক) এই সময়ের মধ্যে দেশরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয় ব্যয় এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বৈদেশিক ঋণসহ কেন্দ্রীয় সরকারের দেনায় পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়িত অর্থের আনুপাতিক অংশ আদায়ের পর পূর্ব পাকিস্তানে অর্জিত সম্পূর্ণ মুদ্রা নিরংকুশভাবে এই প্রদেশেই ব্যয় করা হইবে।

খ) দুই অঞ্চলের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রাদেশিক সরকারদ্বয়ের নিরংকুশ কতৃত্বাধীনেই থাকিবে।

গ) অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন এবং এমন আর্থিক নীতি গ্রহণ করিবেন যাহাতে পূর্ব পাকিস্তান হইতে মূলধন পাচার সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে ব্যাংকের মওজুদ অর্থ ও মুনাফা, বীমার প্রিমিয়াম এবং শিল্পের মুনাফা সম্পর্কে যথা সময়ে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা হইবে।

৫। ক) মুদ্রা, বৈদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং

খ) আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য

গ) আন্তঃ আঞ্চলিক যোগাযোগ

ঘ) বৈদেশিক বাণিজ্য

উপরোক্ত বিষয়সমূহের প্রত্যেকটি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমসংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত এক একটি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হইবে। জাতীয় পরিষদের প্রত্যেক প্রদেশের সদস্যগণ নিজ প্রদেশের জন্য উক্ত বোর্ডসমূহের সদস্যগণকে নির্বাচন করিবেন।

৬। সুপ্রীম কোর্ট এবং কূটনৈতিক বিভাগসহ কেন্দ্রীয় সরকারের সকল বিভাগ ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমসংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হইবে। এই সংখ্যা সাম্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে এমন ভাবে কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে যাহাতে ১০ বৎসরের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা উভয় প্রদেশে সমান হইতে পারে।

৭। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কার্যকরী সামরিক শক্তি ও সমর-সজ্জার ব্যাপারে উভয় অঞ্চলের মধ্যে সমতা বিধান করা পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হইবে। এই উদ্দেশ্যে–

ক) পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক একাডেমী, অস্ত্র নির্মাণ কারখানা, ক্যাডেট কলেজ ও স্কুল স্থাপন করিতে হইবে।

খ) দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি বিভাগেই পূর্ব পাকিস্তান হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক নিয়োগ করিতে হইবে।

গ) নৌ-বাহিনীর সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করিতে হইবে।

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমসংখ্যক সদস্য সম্বলিত একটি ডিফেন্স কাউন্সিল গঠন করা হইবে।

৮। এই ঘোষণায় 'শাসনতন্ত্র' শব্দ দ্বারা ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বুঝায় যাহা অবিলম্বে জারি করা হইবে। এই শাসনতন্ত্র চালু করিবার ৬ মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনেই এই কর্মসূচী ২ হইতে ৭ নম্বর দফাসমূহকে শাসনতন্ত্রে সন্নিবেসিত করা হইবে।

উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত সকল রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠান ঐক্যবদ্ধ এবং পৃথক পৃথকভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ২৩শে আগস্টের (১৯৬৭) বৈঠকে নিম্নোক্তদের দ্বারা 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ এডহক কমিটি' গঠন করে ঃ

১। মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ	(পাবনা)	সভাপতি
২। মশিউর রহমান	(যশোহর)	সহ-সভাপতি
৩। মুজিবুর রহমান	(রাজশাহী)	সাধারণ সম্পাদক
৪। নূরুল ইসলাম চৌধুরী	(ঢাকা)	কোষাধ্যক্ষ
৫। আবদুস সালাম খান	(ফরিদপুর)	সদস্য
৬। মিয়া আবদুর রশিদ	(যশোহর)	"
৭। আবদুর রহমান খান	(কুমিল্লা)	"
৮। মতিউর রহমান	(রংপুর)	"
৯। রওশন আলী	(যশোহর)	"
১০। রহিমুদ্দি আহমদ	(দিনাজপুর)	"
১১। সা'দ আহমদ	(কুষ্টিয়া)	"
১২। আবদুর রউফ	(কুষ্টিয়া)	"
১৩। এ, ডব্লিও, লকিউতুল্লাহ	(বরিশাল)	"
১৪। মোমেন উদ্দিন আহমদ	(খুলনা)	"

১৫। আবদুল হাই (সিলেট) সদস্য
১৬। জালাল উদ্দিন আহমদ (সিলেট) ”
১৭। নূরুল হক (রংপুর) ”
১৮। আহমদ আলী (কুমিল্লা) ”
১৯। ডাঃ সুলতান আহমদ (কুমিল্লা) ”
২০। দেওয়ান শফিউল আলম (ঢাকা) ”
২১। আবদুর রহমান চৌধুরী (দিনাজপুর) ”
২২। মনসুর আলী (পাবনা) ”
২৩। বি, এম, ইলিয়াস (বগুড়া) ”
২৪। জুল্মত আলী (ময়মনসিংহ) ”

ইহার জবাবে ২৭শে আগস্ট নিম্নোক্তদের লইয়া নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কমিটি (৬ দফা) গঠন করা হয় ঃ

১। শেখ মুজিবুর রহমান (ফরিদপুর) সভাপতি
২। কামারুজ্জামান (রাজশাহী) সাধারণ সম্পাদক
৩। নজরুল ইসলাম (ময়মনসিংহ) সদস্য
৪। মিজানুর রহমান চৌধুরী (কুমিল্লা) ”
৫। খন্দকার মোশতাক আহমদ (কুমিল্লা) ”
৬। মিসেস আমেনা বেগম (কুমিল্লা) ”
৭। আমজাদ হোসেন (পাবনা) ”
৮। সোহরাব হোসেন (যশোহর) ”
৯। হোসেন মনসুর (পাবনা) ”
১০। শাহ আজিজুর রহমান (কুষ্টিয়া) ”
১১। এ, বি, এম, নূরুল ইসলাম (ফরিদপুর) ”
১২। অধ্যাপক ইউসুফ আলী (দিনাজপুর) ”
১৩। আবদুল মালেক উকিল (নোয়াখালী) ”
১৪। নূরুল হক (নোয়াখালী) ”
১৫। বাহাউদ্দীন চৌধুরী (বরিশাল) ”
১৬। শামসুল হক (ঢাকা) ”
১৭। হাফেজ মুসা (ঢাকা) ”

১৮। শেখ আবদুল আজিজ	(খুলনা)	"
১৯। তাজউদ্দিন আহমদ	(ঢাকা)	"
২০। আফজাল হোসেন	(যশোহর)	"
২১। জাকিরুল হক	(চট্টগ্রাম)	"
২২। মহিবুস সামাদ	(সিলেট)	"
২৩। মোহাম্মদুল্লাহ	(নোয়াখালী)	"

ভুট্টোর অপসারণ

ইত্যবসরে বিনাশর্তে পাক-ভারত যুদ্ধ অবসান বিরোধী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোকে প্রেসিডেন্ট আইউব খানের নির্দেশে ১৯৬৬ সালের ১৮ই জুন চিকিৎসার অজুহাতে পদত্যাগ করিতে হয়। ইতিপূর্বে তাঁহাকে পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কনভেনশন) সাধারণ সম্পাদক পদ হইতে অপসারণ করা হইয়াছিল। গণভোট অনুষ্ঠান মারফত কাশ্মীর সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পাক-ভারত যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা ও তাসখন্দ শান্তিচুক্তি সম্পাদনের খেলাফে স্থির সংকল্প আপোষহীন বিরোধিতার দরুন জনাব ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানী জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠেন। সোভিয়েট রাশিয়া ও কমিউনিস্ট চীনের সহিত সম্পর্কোন্নয়নের জন্য জনাব ভুট্টোর বলিষ্ঠ ভূমিকা প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী উদীয়মান ও ক্রমবর্ধিষ্ণু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদ হইতে অপসারিত হইবার পর ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে জনাব ভুট্টো পাকিস্তান পিপলস পার্টি নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ শেষে পশ্চিম পাকিস্তানীদের ধূমায়িত বিক্ষোভ আইউব বিরোধী খাতে প্রবাহিত হয় এবং ইহাই রূপান্তরিত হয় ভুট্টোর রাজনৈতিক মূলধনে।

এন, ডি, এফ-এর নিষ্ক্রিয়তা

ইতিমধ্যে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), নেজামে ইসলাম পার্টি নিষ্কর্মা ক্ষমতালোভী নেতৃত্বসর্বস্ব দলে পরিণত হয়। যুব-ছাত্র-শিক্ষক সাধারণের বিশেষ কোন সমর্থন উক্ত দলগুলির পিছনে ছিল না। তদুপরি এই দলগুলি নিজেরাও প্রেসিডেন্ট আইউব খানের ডাণ্ডার ভয়ে নিষ্ক্রিয় হইয়া বৈঠকী রাজনীতিতে মশগুল ছিল। অন্যদিকে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পরিচালিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি আইউবের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন সংগঠিত করিবার ছিল বিরোধী। মোজাফফর আহমদ পরিচালিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির একাংশ জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন একটি কর্মীসর্বস্ব মার্কসবাদীদল হিসাবে বিরাজ করিতেছিল। পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী অন্ধ ও গোঁড়া ভাবধারার ধারক ও বাহক। এই সময়ে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ জন সমর্থিত, যুব ছাত্র সম্প্রদায় সমর্থিত ও

সাধারণ শ্রমিক শ্রেণী সমর্থিত সংগ্রামী সংগঠনে পরিণত হয়। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তান কোটায় ও প্রাদেশিক পরিষদে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীরা প্রায় সব কয়টি আসনে নির্বাচিত হন। ফলে পরিষদের অভ্যন্তরে ও বাহিরেও আওয়ামী লীগ একমাত্র সংগঠিত দল হিসাবেই রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হয়। এইদিকে আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচী বিচ্ছিন্নতাবাদী, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংহতি পরিপন্থী বলিয়া উর্ধ্বতন মহল উচ্চস্বরে চিৎকার করিতেছিল। তাই, সরকার আওয়ামী লীগকে নেক নজরে নহে বরং বিষ নজরে দেখিত।

জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নিষ্ক্রিয় ভীরু ভূমিকা আমাদিগকে (আতাউর রহমান খান, নূরুর রহমান, আবদুর রব সেরনিয়াবাত, মফিজুল ইসলাম, দেওয়ান সিরাজুল হক, আবুল মনসুর আহমদ এবং আমি) অত্যন্ত চিন্তিত করিয়া তোলে। আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত। এই কারণে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী ও আবদুল মোমেন, রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া, কে, এম, ওবায়দুর রহমান, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ সভাপতি ফেরদৌস আহমদ কোরেশী, সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক, মাজহারুল হক বাকী, সিরাজুল আলম খান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রুপে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করিতেন। তাঁহাদের মতে ৭ দফা অর্থাৎ দুই অর্থনীতির প্রবক্তাদের সহিত তাহাদের মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। অতএব আওয়ামী লীগ মঞ্চ হইতেই ঐক্যবদ্ধভাবে সকলের কাজ করা শ্রেয় ও বিধেয়। আমাদের প্রস্তাব ছিল, প্রথমে পি, ডি, এম ভুক্ত আওয়ামী লীগ, ইহার পর অপুনরুজ্জীবিত আওয়ামী লীগ ও তাহার পর জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মীদের পর্যায়ক্রমে আওয়ামী লীগভুক্ত করা। আওয়ামী লীগের (৬ দফা) প্রস্তাব ছিল ১৯৬৪ সাল পূর্বেকার সাংগঠনিকরূপে ফিরিয়া যাওয়া। উভয় প্রস্তাব তেমন কোন তফাৎ ছিল না, কিন্তু ব্যক্তি নেতৃত্ব নিশ্চয়তা না পাওয়ায় এবং কারান্তরালে যাওয়ার ভয়ে নেতা আতাউর রহমান খান সম্মত হন নাই। জাতীয়তাবাদী সংগ্রামী নেতৃত্ব দ্বিধাবিভক্ত রহিয়া গেল।

ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানে নেতৃবৃন্দের সহিত কয়েক দফা বৈঠকে মিলিত হন; কিন্তু আইউব খানের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক বা আইন অমান্য কোনপ্রকার আন্দোলন করিবার মত মানসিকতা তাঁহাদের ছিল না। আইউব খান তাহা জানিতেন, তাই তিনি তাঁহাদের বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। এইদিকে সরকার হইতে বিতাড়িত ফজলুল কাদের চৌধুরী আমাদের সহিত রাজনৈতিক আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন; কিন্তু কোন প্রকার কার্যকর অংশগ্রহণ হইতে বিরত থাকেন–কারণ জেল-ভীতি।

আগরতলা ষড়যন্ত্র

এমনি হতবুদ্ধিকর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ১৯৬৭ সালের মধ্য ডিসেম্বর ঢাকা নগরে জোর গুজব ছড়াইয়া পড়ে যে, পূর্ব পাকিস্তানকে রাষ্ট্রীয় কাঠামো হইতে বিচ্ছিন্ন

করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিবার অপরাধে লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ও তাঁহার কতিপয় সহচরকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। সকল জল্পনা-কল্পনা ও গুজবের অসান ঘটাইয়া সরকার ৬ই জানুয়ারী (১৯৬৮) এক প্রেসনোটে ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের প্রথম সচিবের (ফার্স্ট সেক্রেটারী) যোগসাজশে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিবার অপরাধে ১৮ জন সামরিক, বেসামরিক ব্যক্তিকে গ্রেফতারের সংবাদ জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। পুনঃ ১৮ই জানুয়ারী (১৯৬৮) এক সরকারী প্রেসনোটে ঘোষণা করা হয় যে, রাষ্ট্রদ্রোহী ষড়যন্ত্রে জড়িত শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। আগেই বলিয়াছি, শেখ সাহেব ১৯৬৬ সালের ৮ই মে হইতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বিনা বিচারে আটক ছিলেন। ১৭ই জানুয়ারী (১৯৬৮) দিবাগত গভীর রাত্রে (আনুমানিক রাত ১টায়) শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার হইতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে স্থানান্তরিত করা হয়।

২১শে এপ্রিল (১৯৬৮) প্রেসিডেন্ট এক অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া পাকিস্তান পেনাল কোডের ১২১ ক ও ১৩১ ধারায় দোষীদের বিচার করিবার নিমিত্ত বিশেষ আদালত গঠনের ব্যবস্থা করেন। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এক আদেশ বলে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এস, এ, রহমান, ইস্ট পাকিস্তান হাইকোর্টের বিচারপতি মুজিবর রহমান ও বিচারপতি মকসুমুল হাকিমের সমবায়ে বিশেষ আদালত গঠন করেন এবং অন্য এক আদেশ বলে কেন্দ্রীয় সরকার ঢাকা ক্যান্টনমেন্টকেই বিচারস্থল হিসাবে ঘোষণা করে। ৬ই জুন (১৯৬৮) গেজেটে ঘোষণা করা হয় যে, ১৯শে জুন ঢাকা ক্যান্টমেন্ট সিগন্যাল মেস প্রাঙ্গণে বিশেষ আদালতে বিচার আরম্ভ হইবে। মামলা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯শে জুন হইতে নিম্নলিখিত ৩৫ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা আরম্ভ হয় ঃ

১। শেখ মুজিবুর রহমান, ২। লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, ৩। স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, ৪। এল, এস, সুলতানুদ্দিন আহমদ, ৫। এল, এস, সি, ডি, আই, নূর মোহাম্মদ, ৬। আহমদ ফজলুল রহমান, সি, এস, পি, ৭। ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ, ৮। প্রাক্তন করপোরাল আবুল বশার মোহাম্মদ আবদুস সামাদ, ৯। প্রাক্তন হাবিলদার দলিল উদ্দিন, ১০। ফ্লাইট সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হক, ১১। খন্দকার রুহুল কুদ্দুস, সি, এস.পি, ১২। ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী, ১৩। বিধান কৃষ্ণ সেন, ১৪। সুবেদার আবদুর রাজ্জাক, ১৫। প্রাক্তন হাবিলদার ক্লার্ক মুজিবর রহমান, ১৬। প্রাক্তন ফ্লাইট সার্জেন্ট মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, ১৭। সার্জেন্ট জহুরুল হক, ১৮। প্রাক্তন, এ, টি, মোহাম্মদ খুরশীদ, ১৯। খান এম, শামসুর রহমান সি, এস, পি, ২০। হাবিলদার এ, কে, এম, শামসুল হক, ২১। হাবিলদার আজিজুল হক, ২২। এস, এ, সি, মাহফুজুল বারী, ২৩। সার্জেন্ট শামসুল হক, ২৪। মেজর শামসুল আলম, ২৫। ক্যাপ্টেন মোঃ আবদুল মোত্তালেব, ২৬। ক্যাপ্টেন এম, শওকত আলী, ২৭। ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা, ২৮। ক্যাপ্টেন এ, এন, এম, নূরুজ্জামান, ২৯। সার্জেন্ট আবদুল

জলিল, ৩০। মোহাম্মদ মাহবুবুদ্দিন চৌধুরী, ৩১। ফার্স্ট লেঃ এম, এস, এম, রহমান, ৩২। প্রাক্তন সুবেদার এ, কে, এম, তাজুল ইসলাম, ৩৩। মোহাম্মদ আলী রেজা, ৩৪। ক্যাপ্টেন খুরশীদ উদ্দিন আহমদ, ৩৫। ফার্স্ট লেঃ আবদুর রউফ।

মামলার বিবরণ প্রকাশে আদালত সংবাদপত্রগুলিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে। শেখ মুজিবর রহমান আগরতলা মামলার প্রধান আসামী ছিলেন। প্রখ্যাত আইনজীবী আবদুস সালাম খান শেখ সাহেবের মামলা পরিচালনা করেন এবং সরকার পক্ষে পরিচালনা করেন প্রাক্তন বৈদেশিকমন্ত্রী ব্যারিস্টার মনজুর কাদের, এডভোকেট টি, এইচ, খান, গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আসলাম, এডভোকেট করাচী, এ, আলীম এডভোকেট, ঢাকা ও খাকন বাবর, এডভোকেট, লাহোর।

আওয়ামী লীগ, শ্রমিক লীগ ও ছাত্রলীগ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে মিথ্যা মামলা বলিয়া গোড়া হইতেই কানাঘুষার আন্দোলন শুরু করে। সাংগঠনিক শক্তির বলে এই প্রচার মোটামুটি কার্যকর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। তাই, ঢাকা নগরে বিভিন্ন সভায় মিছিলে, 'জাগো জাগো বাঙ্গালী জাগো" আওয়াজ উঠে। জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ হইতে থাকে। যুব সম্প্রদায় যখন এইভাবে মাঠে এক ব্যক্তির শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত, তখন হুক্কাসেবী বৈঠকী রাজনীতির আড্ডা পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পি, ডি, এম,) আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, অথচ একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন প্রকার সক্রিয় আন্দোলন বা কর্মসূচী গ্রহণে বিরত থাকে।

নিম্নলিখিত দলিল আগরতলা মামলার বাস্তবতা প্রমাণ করে

জনাব ফয়েজ আহমদ একটি বই লিখেছেন। নাম 'আগরতলা মামলা, শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ'। প্রকাশক মফিজুল হক। এই বইটির শেষ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'পরিশিষ্ট-৭' নীচে হুবহু উদ্ধৃত করা হলো।

আগরতলায় শেখ মুজিব সম্পর্কে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী

১৯৬৩ ইং আমার ভাই এম এল এ শ্রী উমেশলাল সিং সমভিব্যাহারে শেখ মুজিবর রহমানের সাথে ১০ জন ত্রিপুরার পালম জিলার খোয়াই মহকুমা দিয়া আগরতলায় আমার আগরতলার বাংলোয় রাত্র ১২ ঘটিকায় আগমন করেন। প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার পর আমার বাংলো বাড়ি হইতে মাইল দেড়েক দূরে ভগ্নী হেমাঙ্গিনী দেবীর বাড়িতে শেখ সাহেব আসেন। সেখানেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর মুজিবুর ভাইয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরুর সাথে দেখা করি। আমার সাথে ছিলেন শ্রী শ্রীরমণ, চীফ সেক্রেটারী। তাকে (শ্রীরমণকে) শ্রী ভাণ্ডারিয়ার বিদেশ সচিবের রুমে রাখিয়া প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করি। তিনি মুজিবুর রহমানকে ত্রিপুরায় থাকিয়া প্রচার করিতে সম্মত হন নাই। কারণ চীনের সাথে লড়াইয়ের পর এতো বড় ঝুঁকি নিতে রাজি হন নাই। তাই ১৫ দিন থাকার পর তিনি (শেখ মুজিব) ত্রিপুরা ত্যাগ করেন। সোনামুড়া পশ্চিম ত্রিপুরারই এক মহকুমা

কুমিল্লার সাথে সংলগ্ন। শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী
ত্রিপুরা

নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা

এই পরিস্থিতিতে ৮ই অক্টোবর (১৯৬৮) জনাব আতাউর রহমান খানের বাসভবনে আমরা পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (৬ দফা) এর সৈয়দ নজরুল ইসলাম-ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, মিজানুর রহমান চৌধুরী-ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক, মিসেস আমেনা বেগম-মহিলা সম্পাদিকা, আবদুল মান্নান ও আবুল কালাম, পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মস্কো) কোষাধ্যক্ষ, মহিউদ্দিন আহমদ ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের আতাউর রহমান খান, নুরুর রহমান ও আমি। আগামীদিনের আন্দোলনের নীল-নকশা প্রণয়নকল্পে এক বৈঠকে মিলিত হই। আমরা পি, ডি, এম-এর সিদ্ধান্ত পুংখানুপুংখভাবে আলোচনা করি। আমি স্পষ্ট ভাষায় পি,ডি এম-এর সিদ্ধান্তের সহিত দ্বিমত প্রকাশ করি।

৯ই অক্টোবর (১৯৬৮) প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবুল মনসুর আহমদের বাড়ীতে আলোচনার সিদ্ধান্ত অনুসারে আমি ও জনাব নূরুর রহমান ১০ই অক্টোবর টাঙ্গাইলে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (পিকিং) সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সহিত সাক্ষাৎ করি। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা রাজনৈতিক আলোচনায় আমরা ঐকমত্যে পৌছি যে, জনগণের সার্বভৌমত্ব ও প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠাকল্পে অবিলম্বে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া অপরিহার্য। দল মত নির্বিশেষে ঐক্যই সকল সংগ্রামের পূর্বশর্ত। সাধারণ নির্বাচন ঘোষণার পূর্বেই বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রশ্নে গণ আন্দোলন আরম্ভ করিবার এবং আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তাব করেন মওলানা ভাসানী। খাজনা বন্ধের মত উগ্র কর্মসূচীকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে যে সাংগঠনিক শক্তির প্রয়োজন তাহা বর্তমানে নাই বিধায় সরকারী দমননীতি অংকুরেই আন্দোলনকে বানচাল করিয়া দিবে বলাতে মওলানা বলেন যে, সামরিক বাহিনীতে আইউব খানের পূর্ব প্রতিপত্তি নাই, এমন কি জেনারেল হামিদ ও জেনারেল ইয়াহিয়া খান আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনী ব্যবহারে সম্মত হইবেন না। মওলানা আরো বলেন যে, এইসব বিষয়ে তাঁহার যোগাযোগ আছে; সুতরাং তিনি মনে করেন, গণ আন্দোলনের পর ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচনে বিরোধী শিবির জয়লাভ করিবে এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আমাদের জয় অবধারিত।

দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া গেল যে, সশস্ত্র বাহিনীর এক অংশের আইউব বিরোধী মনোভাবের উপর নির্ভর করিয়া মওলানা ভাসানী এখন স্বচ্ছন্দে গণ-আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন, কেননা তাহাতে বিপদ কম। উপসংহারে ন্যাপ (মস্কো)-এর সহিত আলোচনায় বসিতে রাজী কিনা জানিতে চাইলে মওলানা বলেন যে, ঐক্যের খাতিরে

সহযোগিতা করিতে তিনি প্রস্তুত আছেন।

যাহা হউক, আমাদের নিকট দেয় প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মওলানা ভাসানী ঢাকা আসিলেন বটে; কিন্তু ১৩ই অক্টোবর (১৯৬৮) জনাব সাঈদুল হাসানের বাসভবনে জনাব নূরুর রহমান, দেলদার আহমদ ও আমার সহিত আলোচনাকালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকে (মস্কো) প্রস্তাবিত সংগ্রাম পরিষদে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন। রাত ৯টায় জনাব আবুল মনসুর আহমদের বাসভবনে আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, আবদুস সালাম খান, নূরুর রহমান, দেলদার আহমদ, জমির উদ্দিন আহমদ ও আমি পুনরায় মওলানা ভাসানীর সহিত বৈঠকে মিলিত হই। আলোচনায় নিম্ন বিষয়ে আমরা ঐকমত্যে উপনীত হই ঃ

'নির্বাচনী কলেজ' নির্বাচনকে সরকার গঠন পদ্ধতির উপর গণভোট হিসাবে গণ্য করা হইবে। আমরা তাই আসন্ন নির্বাচনী কলেজ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিব। ইহার পর প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত ইলেকটরেল কলেজ অংশগ্রহণ করিবে না। আওয়ামী লীগ (৬ দফা) এর সহিত ঐক্যফ্রন্ট গঠনে মওলানা ভাসানী সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। এমনকি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মিজানুর রহমান চৌধুরী, মিসেস আমেনা বেগম ও মোল্লা জালালউদ্দিন আহমদের সহিত এতদমর্মে বৈঠকে বসিবার জন্য তাঁহাদের ঠিকানা পর্যন্ত চাহিলেন। কিন্তু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাইয়া দিলেন যে, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মস্কো) সহিত ঐক্যফ্রন্ট গঠনে তিনি অপারগ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কিছুই হইল না। ঐক্যফ্রন্ট গঠনের চূড়ান্ত মুহূর্তে আমাদিগকে কিছুই জানিতে না দিয়া মওলানা ভাসানী ঢাকা ত্যাগ করিলেন। মনে হয়, পিকিং লবী আইউব বিরোধী আন্দোলন অর্থাৎ প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনের সংগ্রামে সায় দিতে পারে নাই। তাই, চূড়ান্ত মুহূর্তে আমাদের সকল প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল।

কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত

১৯৫৬ সাল হইতে চীন-সোভিয়েট মত বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল। ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরে আহূত বিশ্ব কমিউনিস্ট পার্টি সম্মেলন খসড়া কমিটির বৈঠকের দিনই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভাঙ্গনের দিন বলিয়া কমিউনিস্ট চীন ৩০শে জুলাই লিখিত এক চিঠিতে সোভিয়েট ইউনিয়নকে জানায়। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট পার্টি পিকিং গ্রুপ ও মস্কো গ্রুপে বিভক্ত হইয়া পড়ে। কমিউনিস্ট চিন্তাধারার প্রভাবান্বিত ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটে আহূত বার্ষিক সম্মেলনে জনাব রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (পিকিং) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস ইকবাল হলের ছাদে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন সম্মেলনে বেগম মতিয়া চৌধুরীর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মস্কো) গঠিত হয়।

মস্কো-পিকিং মতদ্বৈততার এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও দ্বিখণ্ডিত হয়; মস্কোপন্থী ন্যাপ নেতৃবৃন্দ কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করিবার দাবীতে সংগঠনের সভাপতি মওলানা ভাসানীকে রিকুইজিশন পত্র বা অধিযাচন পত্র দেয়। সভাপতি মওলানা ভাসানী রিকুইজিশন পত্রের কোন উত্তর না দিয়া রংপুরে কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠান করেন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে মস্কো সমর্থক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেনসহ অন্যান্য নেতাকে সংগঠন হইতে বহিষ্কার করেন। মস্কোপন্থী ন্যাপ নেতৃবৃন্দ ১৯৬৮ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভায় মোজাফফর আহমদকে সভাপতি নির্বাচিত করেন। ১১ই ফেব্রুয়ারি কাউন্সিল অধিবেশনের পূর্বে ৮ই ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক ওসমানী ও খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস আমার বাসভবন ৭ নং কলেজ স্ট্রীটে আমার সহিত দেখা করেন এবং ন্যাপে যোগ দিতে অনুরোধ জানান। আমি উত্তরে তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম, কমিউনিস্ট প্রভাবান্বিত সংগঠনে জাতীয়তাবাদী ও গণতন্ত্রীদের যোগ দিবার কোন ভিত্তি নাই। ইতিপূর্বে জনাব আতাউর রহমান খান ও নুরুর রহমান সাহেবকে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছিলাম যে, ন্যাপ নেতৃবৃন্দের সহিত আমার আদর্শগত মৌলিক মতভেদ আছে, অতএব কোন ন্যাপ গ্রুপের সহিত আমার যোগ দিবার প্রশ্নই উঠে না। ভলগা-ইয়াংসি নদীতে বৃষ্টি হইলে ঢাকার বুড়িগঙ্গার পাড়ে দাঁড়াইয়া আমার ছাতা খুলিবার সবিশেষ কারণ নাই। ন্যাপের সহিত আলোচনা সুতরাং তখনকার মত আর অগ্রসর হয় নাই।

ছাত্র শক্তির বিভক্তি

১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পাকিস্তান ছাত্র শক্তি ঘোষণাপত্র ও আন্দোলনের কর্মসূচী সংশোধনের প্রশ্নে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মেলনে দ্বিধাবিভক্ত হয়। আনিসুর রহমানকে সভাপতি এবং মোজাফফর হোসেন পল্টুকে সাধারণ সম্পাদক করিয়া একটি কমিটি এবং ফজলুল হককে সভাপতি ও মোহাম্মদ হোসেন খানকে সম্পাদক করিয়া অপর একটি কমিটি গঠিত হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানের পরিস্থিতি

পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সাধারণভাবে শান্ত ছিল। তবে আকস্মিক দমকা হাওয়া ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হইয়া প্রেসিডেন্ট আইউব খানের ক্ষমতার মসনদকে লণ্ডভণ্ড করিয়া তাঁহাকে রাজনৈতিক অঙ্গন হইতে চিরতরে বিদায় দেয়। এক ব্যক্তি শাসন প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী ক্ষমতালোভীদের জন্য ইহা এক জ্বলন্ত সতর্ক দৃষ্টান্ত।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত লাণ্ডিকোটালে ছিল বিদেশ হইতে পাচারকৃত মালের বাজার। রাওয়ালপিণ্ডি গর্ডন কলেজের ৭০ জন ছাত্র কর্তৃক লাণ্ডিকোটাল হইতে বিদেশী মাল ক্রয় সংক্রান্ত অতি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্র ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ বাঁধে। উল্লেখ্য, কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের ক্রয়কৃত বিদেশী মাল বাজেয়াপ্ত

করিয়াছিল। এই বিরোধই অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ছাত্র-প্রতিবাদ আন্দোলন হইতে অপ্রতিরোধ্য গণ-আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভূট্টো সূচনা হইতে পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণের নিমিত্ত ছাত্রদের পক্ষাবলম্বন করেন। ৭ই নভেম্বর ছাত্র-জনতা ও পুলিশের সংঘর্ষে পুলিশ ছাত্রদের উপর গুলীবর্ষণ করে এবং পুলিশের গুলীতে রাওয়ালপিন্ডিতে আবদুল হামিদ নিহত হন। ফলে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে গণ-আন্দোলনের বিস্ফোরণ ঘটে। এমনি অবস্থায় ১০ নভেম্বর (১৯৬৮) পেশোয়ার জনসভায় ভাষণদানকালে প্রেসিডেন্ট আইউব খানের জীবন নাশের ব্যর্থ প্রচেষ্টা হয়। ইহার জওয়াবে আইউব খান ১৩ই নভেম্বর (১৯৬৮) জুলফিকার আলী ভুট্টোকে গ্রেফতার করেন।

আন্দোলনের নূতন দিক

এই সময়ে সরকারের বিরুদ্ধে ছয় দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তান এমনিতেই বিক্ষুব্ধ। পশ্চিম পাকিস্তানের এই ছাত্র আন্দোলনের সহিত একাত্মতা প্রকাশ করা হইবে কি হইবে না, এই প্রশ্নে সবাই দ্বিধান্বিত। এমনি অস্বস্তিকর সন্ধিক্ষণে মওলানা ভাসানী মঞ্চে উপস্থিত হইলেন। জনাব আবদুস সেলিমের নেতৃত্বে পরিচালিত ঢাকা বেবী ট্রাক্সি ইউনিয়ন কর্তৃক ৬ই ডিসেম্বর হরতাল দিবসের অপরাহ্নে আহূত পল্টন ময়দানের জনসভায় মওলানা ভাসানী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন এবং জনসভার পর মওলানা ভাসানীর পরিচালনায় এক বিক্ষোভ মিছিল গভর্নর হাউসে গমন করে। বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে পুলিশ লাঠিচার্জ করিয়া জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। পুলিশী হামলার প্রতিবাদে ৭ই ডিসেম্বর (১৯৬৮) ঢাকায় ও সমগ্র পাকিস্তানে ৮ই ডিসেম্বর হরতাল পালনের আহবান জানানো হয়। ৮ই ডিসেম্বর হরতাল পালনকালে পুলিশের গুলীতে সিলেটে জনাব আবদুল হামিদ শাহাদতবরণ করেন।

মওলানা ভাসানী কর্তৃক সৃষ্ট অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ৩০শে ডিসেম্বর (১৯৬৮) হাতিয়াদিরায় পুলিশের গুলীতে ৩ জন নিহত হন ও নড়াইলেও পুলিশ গুলী চালনা করে। এইভাবেই ক্রমে ক্রমে পূর্ব পাকিস্তানে এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (মস্কো), ছাত্র ইউনিয়ন (পিকিং) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ এগার দফা প্রণয়ন করে এবং আন্দোলনের ডাক দেয়। আইউব-মোনায়েম সরকার সমর্থক জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (এনএসএফ) ১৯৬৮-৬৯ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র সংসদের নির্বাচনে তৎকালীন মোহসীন হল, জিন্নাহ হল ও ঢাকা হল সংসদের শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ এবং ফজলুল হক হল সংসদের সাধারণ সম্পাদকের আসনসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসন দখল করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদ (ঢাকা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন বা ডাকসুর (DUCSU) সাধারণ সম্পাদক নাজিম কামরান (এন, এস, এফ) এগার দফা কর্মসূচীর অন্যতম প্রণেতা ছিলেন। ফলে, এগার দফা কর্মসূচীকে সমর্থন জানাইয়া তাহার মূল ছাত্র সংগঠন জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন দলীয় বিভিন্ন হল সংসদের সহ-সভাপতি ও

সাধারণ সম্পাদক এবং ঢাকা নগরের বিভিন্ন কলেজের ছাত্র কর্মকর্তাগণ এক যুক্ত বিবৃতি প্রচার করেন। এগার দফা ভিত্তিক দেশব্যাপী আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে ৫ই জানুয়ারী (১৯৬৯) নিম্নলিখিতদের সমবায়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় ঃ

আবদুর রউফ–	সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ	
সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক –	সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন	(মস্কো)
মোস্তফা জামাল হায়দার–	সভাপতি "	(পিকিং)
মাহবুবু-উল-হক দুলন –	সভাপতি, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন	
খালেদ মোহাম্মদ আলী–	সাধারণ সম্পাদক, ছাত্রলীগ	
শামসুজ্জোহা –	" " ছাত্র ইউনিয়ন	(মস্কো)
মাহবুব উল্লাহ –	" "	(পিকিং)
ইব্রাহিম খলিল–	সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন	
তোফায়েল আহমেদ –	সহ-সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ	
নাজিম কামরান–	সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ	

১৪ই জানুয়ারী (১৯৬৯) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক আহূত সাধারণ ছাত্রসভায় এগার দফা কর্মসূচী আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়।

এগার দফা কর্মসূচী নিম্নরূপ ঃ

এগার দফা

১। ক। স্বচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং জগন্নাথ কলেজসহ প্রাদেশিকীকরণকৃত কলেজসমূহকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিতে হইবে।

খ। শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রদেশের সর্বত্র বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে এবং বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজসমূহকে সত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। কারিগরি শিক্ষা প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকিনিক, টেকনিকেল ও কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট স্থাপন করিতে হইবে।

গ। প্রদেশের কলেজসমূহে দ্বিতীয় 'শিফটে' নৈশ আই,এ, আই,এস,সি, আই, কম ও বি, এ, বি, এস, সি; বি, কম এবং প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহে নৈশ এম, এ ও এম, কম ক্লাশ চালু করিতে হইবে।

ঘ। ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। স্কলারশীপ ও স্টাইপেন্ড কাড়িয়া লওয়া চলিবে না।

ঙ। হল ও হোস্টেলের ডাইনিং হল ও কেন্টিন খরচার শতকরা ৫০ ভাগ সরকার

কর্তৃক 'সাবসিডি' হিসেবে প্রদান করিতে হইবে।

চ। হল ও হোস্টেল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

ছ। মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অফিস আদালতে বাংলা ভাষা চালু করিতে হইবে।

জ। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষকের বেতনবৃদ্ধি করিতে হইবে এবং স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার দিতে হইবে।

ঝ। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে।

ঞ। মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং অটোমেশন প্রথা বিলোপ, নমিনেশন ভর্তি প্রথা বন্ধ, মেডিকেল কাউন্সিল বাতিল, ডেন্টাল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত করা প্রভৃতি মেডিকেল ছাত্রদের দাবী মানিয়া লইতে হইবে। নার্স ছাত্রদের সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

ট। প্রকৌশল শিক্ষার অটোমেশন প্রথা বিলোপ, ১০% ও ৭৫% রুল বাতিল, রেন্টাল লাইব্রেরীর সুব্যবস্থা, প্রকৌশল ছাত্রদের শেষবর্ষেও ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থাসহ সকল দাবী মনিয়া লইতে হইবে।

ঠ। পলিটেকনিক ছাত্রদের কনডেন্স কোর্সের সুযোগ দিতে হইবে এবং বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষা বাতিল করিয়া একমাত্র সেমিষ্টার পরীক্ষার ভিত্তিতে ডিপ্লোমা দিতে হইবে।

টেক্সটাইল, সিরামিক, লেদার, টেকনলজী এবং আর্ট কলেজ ছাত্রদের সকল দাবী অবিলম্বে মানিয়া লইতে হইবে।

ড। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের ন্যায্য দাবী মানিয়া লইতে হইবে। কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্রদের 'কনডেন্স কোর্সের' দাবীসহ কৃষি ছাত্রদের সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

ঢ। ট্রেনে ছাত্রদের 'আইডেনটিটি কার্ড' দেখাইয়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 'কনসেসনে' টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাসিক টিকিটও এই 'কনসেসনে' দিতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের মত বাসে ১০ পয়সা ভাড়ায় শহরের যে কোন স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দূরবর্তী অঞ্চলে বাস যাতায়াতেও শতকরা ৫০ ভাগ 'কনসেসন' দিতে হইবে। ছাত্রীদের স্কুল-কলেজে যাতয়াতের জন্য পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারী ও আধা সরকারী উদ্যোগে আয়োজিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের শতকরা ৫০ ভাগ 'কনসেসন' দিতে হইবে।

ণ। চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

ত। কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিতে হইবে।

থ। শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামাণ্য দলিল জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে এবং ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে হইবে।

২। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩। নিম্নলিখিত দাবীসমূহ মানিয়া লইবার ভিত্তিতে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দিতে হইবে।

ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেল শাসনভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম।

খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ।

গ) দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই অবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে; কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যে, যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পরে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে, দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

ঘ) সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোন কর ধার্য ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায় রেভিনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিবে।

ঙ) ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহিঃবাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিবে এবং বহিঃবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির এক্তিয়ারাধীন থাকিবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্র সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত হার অনুযায়ী প্রদান করিবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমদানি রফতানি চলবে এবং ব্যবসা বাণিজ্য

সম্পর্কে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রফতানী করিবার অধিকার অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতন্ত্রে বিধান করিতে হইবে।

চ) পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারী রক্ষী বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌ-বাহিনীর সদর দফতর স্থাপন করিতে হইবে।

৪। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্বশাসন প্রদান করতঃ সাব ফেডারেশন গঠন করিতে হইবে।

৫। ব্যাঙ্ক, বীমা ইনস্যুরেন্স ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬। কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুক করিতে হইবে; সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণ প্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে।

৭। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী ও বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করিবার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৮। পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯। জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০। সিয়াটো, সেন্টো পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১। দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

আন্দোলনের নূতন পটভূমি

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্র আন্দোলন, জুলফিকার আলী ভুট্টোর গ্রেফতার ও পাকিস্তান বিমান বাহিনী প্রাক্তন এয়ার মার্শাল আসগর খানের এক ব্যক্তির শাসন অবসানের দাবিতে গণ-আন্দোলনে যোগদান, সমগ্র পাকিস্তানে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের নূতন পটভূমি রচনা করে। তাই সমগ্র দেশবাসী গণআন্দোলন

পরিচালনার তাগিদে ৭ই ও ৮ই জানুয়ারী ঢাকায় অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী বৈঠকে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আমীর হোসেন শাহ, পাকিস্তান নেজাম-ই-ইসলাম পার্টির সভাপতি চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, পাকিস্তান জমিতে-উল উলামা-ই-ইসলামের সেক্রেটারী জেনারেল মুফতি মাহমুদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ-এর (৬ দফা) ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি মমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের সভাপতি জনাব নূরুল আমিন, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ভারপ্রাপ্ত আমীর তোফায়েল আহমদ, সভাপতি পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান-এর স্বাক্ষরে নিম্নলিখিত ৮ দফা দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি গঠন করা হয় ঃ

১। ফেডারেল পার্লামেন্টারী সরকার

২। প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন

৩। অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার।

৪। নাগরিক স্বাধীনতা পূনর্বহাল ও সকল কালাকানুন বাতিল বিশেষতঃ বিনাবিচারে আটক আইনসমূহ ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল।

৫। শেখ মুজিবুর রহমান, খান আবদুল ওয়ালী খান, জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সকল রাজনৈতিক বন্দী ও ছাত্র-শ্রমিক-সাংবাদিক বন্দীদের মুক্তি এবং কোর্ট ও ট্রাইব্যুনাল সমীপে দায়েরকৃত সকল রাজনৈতিক মামলা সংক্রান্ত সকল গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার।

৬। ১৪৪ ধারা মোতাবেক সর্বপ্রকার আদেশ প্রত্যাহার।

৭। শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার বহাল।

৮। নূতন ডিক্লারেশনসহ সংবাদপত্রের উপর আরোপিত সকল বিধিনিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং বাজেয়াপ্ত সকল প্রেস, পত্রিকা ও সাময়িকী পুনঃবহাল অথবা 'ইত্তেফাক' ও 'চাত্তান'সহ বাতিলকৃত ডিক্লারেশন পুনঃবহাল এবং আদত মালিকের নিকট প্রগ্রেসিভ পেপারস লিমিটেডকে পুনঃফেরত দান।

ডেমোক্রেটিক কমিটি অব এ্যাকশন (সংক্ষেপে ডাক) ১৭ই জানুয়ারী দেশব্যাপী দাবী দিবস পালন করিবার আহবান জানায়। ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮ ইং হইতে ঢাকা শহরে বলবৎ ১৪৪ ধারা নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ না করিয়া বায়তুল মোকাররম মসজিদ হইতে জুম্মা নামাজের পর ৩ জন ৩ জন করিয়া মৌন মিছিল ঢাকা জিলা বার লাইব্রেরীতে আহূত সভায় যোগদানের কর্মসূচী 'ডাক'-এর নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন। কিন্তু মোনায়েম খানের সরকার ইহার বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণে কার্পণ্য [illegible]
জানুয়ারীতেই (১৯৬৯) যে কোন শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ [illegible]
আদেশকে তোয়াক্কা না করিয়া পুলিশ বাহিনীর [illegible]

শোভাযাত্রাসহ গন্তব্য স্থল ঢাকা জিলা বার লাইব্রেরী হলে গমন করেন এবং সেখানে জনাব নুরুল আমিনের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অবস্থিত বটতলায় ছাত্রসভা অনুষ্ঠানের পর ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এইভাবেই সংগ্রামী ছাত্র সমাজ বিধি-নিষেধের প্রাচীর ধূলিস্যাৎ করিয়া স্বৈরাচারী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামী কাফেলার অগ্রাভিযানের সূচনা ঘটায়। জালেম শাহীর রক্ষক পুলিশ বাহিনী লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করে। লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস ব্যবহারের প্রতিবাদে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১৮ই জানুয়ারী (১৯৬১) ঢাকা শহরে ছাত্র ধর্মঘট ঘোষণা করে। ঐ দিন সভা অনুষ্ঠানের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর হইতে মিছিল সহকারে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় গেট ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেই পুলিশ বাহিনী লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করিয়া ছাত্র মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করে। অপরাহ্ন পুলিশ ও ই,পি, আর বাহিনী আবাসিক হল রেইড করে এবং ছাত্রদের নির্দয়ভাবে মারধর করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি পর্যন্ত ১৭ ও ১৮ই জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পুলিশের এই জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হয়।

১৮ই জানুয়ারী ইকবাল হল প্রাঙ্গণে ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির ২ জন ছাত্রকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১৯ শে জানুয়ারী রবিবার ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের স্বতস্ফূর্ত ও তাৎক্ষণিক ধর্মঘট, ছাত্রসভা ও শোভাযাত্রা হয়। পুলিশ বাহিনী ছাত্র মিছিলে লাঠিচার্জ করে, টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করে ও ৮ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রাবাস ও সলিমুল্লাহ হল হইতে কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মঘটী ছাত্রদের সমর্থনে পৃথক পৃথক মিছিল বাহির হয়।

আসাদের মৃত্যু

এইভাবেই ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণকারী ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বিরোধী এক ব্যক্তি শাসনের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ ক্রমশঃ পূর্ব পাকিস্তানের রাজপথকে প্রকম্পিত করিয়া তোলে। ২০শে জানুয়ারী (১৯৬৯) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আহূত ছাত্রসভায় শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে হাজার হাজার ছাত্র যোগদান করে। পুলিশ ই,পি,আর বাহিনীর লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস ব্যবহারকে অগ্রাহ্য করিয়া মূল ছাত্র মিছিল ছত্রভঙ্গ ও খণ্ড-বিখণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজপথ অবলম্বন করিয়া সমগ্র ঢাকা নগরকে বিক্ষোভের নগরীতে পরিণত করে। এমনি একটি খণ্ড মিছিল মেডিকেল কলেজের সম্মুখস্থ রাজপথ ধরিয়া অগ্রসর হওয়ার পথে সশস্ত্র পুলিশ ই, পি, আর বাহিনীর সহিত ছাত্রদের ইট-পাটকেল, লাঠি ও টিয়ার গ্যাসের খণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হয়। চরম উত্তেজনার মুহূর্তে চর্তুদিক হইতে ছাত্র জনতা কর্তৃক আক্রান্ত ও পরিবেষ্টিত সশস্ত্র আইন শৃংখলা রক্ষা বাহিনীর গুলী ১টা ৫৫ মিনিটে ঢাকা সেন্ট্রাল ল' কলেজের ছাত্র এ, এম,

আসাদুজ্জামানের বক্ষ বিদীর্ণ করে। সমগ্র ঢাকা নগর ক্ষণিকের তরে মূহ্যমান হইয়া পড়ে। ইহার পর সম্বিত ফিরিয়া পাওয়া ঢাকা নগরবাসী সমগ্র দেশকে নতুন দিশার সন্ধান দেয়। শহীদ আসাদের তপ্ত শোণিতকণা সংগ্রামী ছাত্র আন্দোলনকে আপোষহীন গণ অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত করে। এইদিন পুলিশের সহিত সংঘর্ষে আরো ৩ জন আহত হয়।

শহীদ আসাদুজ্জামানের মৃতদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হইতে ছিনাইয়া নিতে ব্যর্থ হইয়া ছাত্র-জনতা ঢাকা মেডিকেল কলেজ বিল্ডিং সম্মুখে শোকসভা করে, কালো পতাকা উত্তোলন করে, এক মিনিট নীরবে দন্ডায়মান হইয়া শোক প্রকাশ করে এবং ঢাকা নগরে প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সাধারণ হরতাল ঘোষণা করে। ২১ শে জানুয়ারী অপরাহ্ন এক ঘটিকায় পল্টন ময়দানে এ, এম, আসাদুজ্জামানের গায়েবানা নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। ইহার পর নগ্নপদে মৌন মিছিল ঢাকার বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিণ করিয়া শহীদ মিনারে উপস্থিত হয় এবং শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত শোকসভায় পুনরায় ঢাকা শহরে সাধারণ হরতাল পালনের আহবান জানায়। উল্লেখ্য যে, ২১শে জানুয়ারী সাধারণ হরতাল পালনকালে ঢাকা ইডেন গার্লস কলেজের সম্মুখে ও ঢাকা নিউ মার্কেট এলাকায় জনতার উপর পুলিশ গুলী চালায়। ২৯ জন আহত হয় এবং ৫৯ জন গ্রেফতার হয়। প্রসঙ্গতঃ ইহাও উল্লেখ্য যে, অপরাহ্ন ১ ঘটিকায় পল্টন ময়দানে শহীদ আসাদের গায়েবানা নামাজে জানাযায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল। নামাজ আদায়ের পূর্বে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আসাদুজ্জামানের মৃত্যু উপলক্ষ্যে ২২শে, ২৩শে ও ২৪ শে জানুয়ারী 'শোককাল' (Mourning Period) হিসেবে ঘোষণা করে। এবং এই শোককালে নিম্নোক্ত প্রোগ্রাম ঘোষণা করে ঃ

২২শে জানুয়ারী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ও কাল পতাকা উত্তোলন, কালব্যাজ ধারণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবনে অপরাহ্ন ১২-৩০ মিনিটে গায়েবানা নামাজে জানাযা।

২৩শে জানুয়ারী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ও কালো পতাকা উত্তোলন এবং কালোব্যাজ ধারণ, সন্ধ্যা ৬টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবন বটতলা হইতে মশাল মিছিল।

২৪শে জানুয়ারী–প্রদেশব্যাপী হরতাল।

পূর্ব পাকিস্তান বন্‌দ

গায়েবানা নামাজে জানাযার পর ১৪৪ ধারাকে উপেক্ষা করিয়া জনসমুদ্রের শোক মিছিল শহরের রাজপথ প্রদক্ষিণে নির্গত হয়। শোক মিছিলে শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলী ভুট্টো, খান মোহাম্মদ আলী ওয়ালী খান ও মনি সিং সহ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের গগনবিদারী ধ্বনিতে ঢাকার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হইয়া উঠে। দাবী ধ্বনিত হয় এগার দফা মানার।

২২শে জানুয়ারী ঢাকায় পুলিশের গুলীর প্রতিবাদে করাচী, রাওয়ালপিন্ডি, লাহোর, হায়দারাবাদ, পেশোয়ার, মুলতান, শিয়ালকোট ও লায়ালপুরে ধর্মঘট, মিছিল, সভা ও গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি ২১ শে জানুয়ারী লাহোরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ৮ দফার সমর্থনে ১২ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) সমগ্র পাকিস্তান ব্যাপী হরতাল পালনের আহবান জানায়।

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত সাধারণ হরতাল ২৪শে জানুয়ারী এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করে। মিছিলের পর মিছিল চলিতে থাকে। রাজধানী ঢাকার রাজপথ ছাত্র, শ্রমিক-মধ্যবিত্ত জনতার পদভারে প্রকম্পিত হইয়া উঠে। এমন একটি দুর্জয় মিছিল সেক্রেটারিয়েটের পার্শ্ববর্তী রাজপথে অগ্রসর হওয়াকালে সংঘর্ষ বাঁধে আইউব-মোনায়েম খাঁর গদী রক্ষায় নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনীর সহিত। তাহাদের নিষ্ঠুর বুলেটে নিহত হয় নবকুমার ইনস্টিটিউটের দশম শ্রেণীর ছাত্র কিশোর মতিউর রহমান মল্লিক, মকবুল, রুস্তম আলী ও অসনাক্ত একজন এবং আহত হয় ১৫ জন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ইমারজেন্সী ওয়ার্ড হইতে শহীদ মকবুল ও রুস্তম আলীর মৃতদেহ বলপূর্বক ছিনাইয়া আনা হয় এবং ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া লক্ষ জনতার শোক মিছিল পল্টন ময়দানে যথারীতি নামাজে জানাযা আদায়ের পর শহীদানের লাশসহ জঙ্গী মিছিলটি ইকবাল হলে গমন করে। মারমুখী বিদ্রোহী জনতা সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত পাকিস্তান ট্রাস্ট সংবাদপত্র 'দৈনিক পাকিস্তান' ও ইংরেজী দৈনিক 'মর্নিং নিউজ' ভবনে অগ্নি সংযোগ করে। জনতার এই আপোষহীন সংগ্রামকে দমন করিবার জন্য শেষ অবলম্বন স্বরূপ সেনাবাহিনী তলব করা হয়। রাত ৮টা হইতে ২৪ ঘণ্টার জন্য জারি করা হয় কারফিউ। ঢাকা হইতে বহির্গামী ট্রেন সার্ভিস, আভ্যন্তরীণ বিমান সার্ভিস ও ঢাকা-করাচী টেলি কমিউনিকেশন বাতিল হইয়া যায়। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সৃষ্ট হয় অচল অবস্থা।

এইভাবেই জালেমশাহী খতমে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অগ্নিশপথে উজ্জীবিত বিদ্রোহী বংগসন্তান গুলী-গোলা ও সান্ধ্য আইনের প্রাচীরকে চুরমার করিয়া আইউবের নতমুখে বিদায় গ্রহণ অবধি দুঃশাসনের প্রতিরোধ আবেষ্টনিকে আঘাতে আঘাতে বিধ্বস্ত করিয়া চলে। অজেয় জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার অবিরাম আঘাতে পর্যুদস্ত আইউব সরকার সান্ধ্য আইন জারি করে করাচী, খুলনা, নারায়ণগঞ্জে; সান্ধ্য আইন বর্ধিত করে ঢাকা নগরীতে। সান্ধ্য আইন অমান্য করিয়া তেজগাঁও এলাকাধীন নাখালপাড়ার বিক্ষুব্ধ শ্রমিক শ্রেণী সরকারী নরহত্যা অভিযানের বিরুদ্ধে ২৫শে জানুয়ারী জংগী মিছিল বাহির করিলে সেনা বাহিনীর নির্মম গুলীতে বরিশাল নিবাসী তেজগাঁও চৌধুরী কেমিক্যালস ওয়ার্কস-এর কর্মচারী জনাব ইসহাকের সহধর্মিনী আনোয়ারা বেগম কন্যাকে স্তন্যদানকালে শাহাদৎবরণ করেন। তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র আবদুল লতিফ প্রাণ দেন সেনাবাহিনীর বুলেটে; আহত হয় ১২ জন।

শোককালের কর্মসূচী

ছাত্রদের সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ রবিবার (২৬-১-৬৯) হইতে তিন দিনব্যাপী 'শোককাল' পালনের আহবান জানায়। শোককালে কালো পতাকা উত্তোলন ও কালো ব্যাজ ধারণ-এর প্রোগ্রাম ঘোষণা করা হয় এবং ছাত্র সমাজ ও জনগণের ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর আন্দোলন পরিচালনার নিমিত্ত ঘোষণা করা হয় নিম্ন নির্দেশাবলী ঃ

(১) প্রত্যেক জিলা, মহকুমা, থানা, গ্রাম, মহল্লা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক এলাকায় ছাত্র সমাজের উদ্যোগে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা, শৃংখলা ও সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম পরিষদগুলির মাধ্যমে আন্দোলন পরিচালনা করা ও নিম্ন কমিটি উচ্চতর কমিটির সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলা, (২) জনগণকে সংগঠিত করা, (৩) গণ-অভ্যুত্থান গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া দেয়া, (৪) সর্বত্র সুশৃংখল সেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা, (৫) শৃংখলা রক্ষা করা, সর্বপ্রকার সরকারী উস্কানির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকা, (৬) বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রের মধ্যে সৌহার্দ্য ও শান্তি বজায় রাখা এবং এইভাবে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ায় সহায়তা করা, (৭) স্থানীয় সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক বিজ্ঞাপন, পোষ্টার, পথসভা, মাইক প্রচার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বহুল প্রচারাভিযান চালানো, (৮) কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশাবলী বিনা বাক্যব্যয়ে সর্বদাই পালন করা।

উপরে বর্ণিত নির্দেশাবলী দ্বারা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সরকার বিরোধী গণ-আন্দোলনকে পুরাপুরিভাবে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করে। ইহা দ্বারা পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক কমিটি অব এ্যাকশান অন্ততঃ পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তরুণের ডাক ছিল এগার দফা বাস্তবায়ন আর বয়োবৃদ্ধ নেতৃত্বের আহবান ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। ইহাতে বয়োবৃদ্ধ নেতৃত্বের প্রতি তরুণ ছাত্র সমাজের পূর্ণ অনাস্থার বহিঃপ্রকাশ স্পষ্ট হইয়া উঠে। ইহার পিছনে অপরিপক্ক তরুণ ছাত্রনেতৃবৃন্দের নেতৃত্বাভিলাষও কাজ করিয়াছে। ইহার ফলে, ইতিহাসই রায় দিয়াছে, জনগণের মংগল হইয়াছে, না সর্বনাশ হইয়াছে। অনুন্নত দেশগুলিতে আদর্শহীন, দুর্নীতিপরায়ণ ও গণ-বিরোধী নেতৃত্বই এইরূপ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ী। দেশপ্রেমিক, ত্যাগী ও পরিপক্ক ভারতীয় নেতৃত্ব ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা সরকার বিরোধী আন্দোলনকে কিভাবে অহিংস শান্তিপূর্ণ খাতে প্রবাহিত করিয়া গণসচেতনতা সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা সরকার পরিবর্তনের আন্দোলনে এক উজ্জ্বল উদাহরণ। তাহা ছাড়া ভারতের এই একই নেতৃত্ব ১৯৭৭ সালের মার্চ-এর নির্বাচনে প্রমাণ করিয়াছে, বাঞ্ছিত শান্তিপুর্ণ পথে কিভাবে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব পরিবর্তন করিতে হয়।

যাহা হউক, ঐদিকে পিণ্ডি, লাহোর, পেশোয়ার, হায়দরাবাদ ও করাচীর বিদ্রোহানল সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে দাবানলের ন্যায় ছড়াইয়া পড়ে। গণতন্ত্রের দাবীতে একনায়কত্বের প্রতিবাদে, জুলুমের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন ক্রমশঃ পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন মফঃস্বল শহরে ব্যাপ্তি লাভ করে। এইদিকে শোককালের কর্মসূচী পালনকালে ২৬ শে জানুয়ারী (১৯৬৯) রবিবার ঢাকা, ডেমরা ও নারায়ণগঞ্জে ৪ জন নিহত হয় ও

১৬ জন আহত হয়। আন্দোলনের প্রচণ্ডতায় বিব্রত সরকার ঢাকা, খুলনা, নারায়ণগঞ্জ ও করাচীতে পুনরায় সান্ধ্য আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি করে। কিন্তু ২৭শে জানুয়ারী (সোমবার) করাচী ও লাহোর শহরে গণআন্দোলনের বৈপ্লবিক ভূমিকায় ভীত-সন্ত্রস্ত সরকার বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় সেনাবাহিনী তলব করিয়া বসে।

গণবিদ্রোহের জোয়ার

করাচীতে সশস্ত্র বাহিনীর বুলেটের আঘাতে ৬ জন শাহাদাৎবরণ করে। ২৭শে জানুয়ারী (১৯৬৯) জাতীয় পরিষদের ঢাকা অধিবেশনে ঢাকায় সান্ধ্য আইন ও হত্যাকাণ্ডের উপরে পরিষদ সদস্য মোখলেসুজ্জামানের উত্থাপিত মুলতবী প্রস্তাব পরিষদ স্পীকার নাকচ করিয়া দেন। এইদিন ঢাকা, খুলনা ও নারায়ণগঞ্জে এবং ২৮শে জানুয়ারী (১৯৬৯) করাচী ও লাহোরে পুনরায় সান্ধ্য আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। লাহোরে পুলিশের গুরীতে ২ জন শাহাদৎবরণ করে এবং করাচীতে ১ হাজার লোককে গ্রেফতার করা হয়। পেশোয়ার ও বরিশালে আন্দোলনের ঢেউ জনতা ও সশস্ত্র বাহিনীর সংঘর্ষের রূপ পরিগ্রহ করে। আন্দোলনের চতুর্থ দিনে পেশোয়ারের জনতাকে দমন করিতে ব্যর্থ হইয়া কর্তৃপক্ষ সেখানে ২৮শে জানুয়ারী (১৯৬৯) সেনাবাহিনী তলব করে এবং বরিশালের বুকে বিপ্লবী জনতার ৯ জন পুলিশ, ই, পি, আর ও সশস্ত্র বাহিনীর বুলেটের আঘাতে আহত হয়।

২৯ শে জানুয়ারী (১৯৬৯) গুজরানওয়ালা শহরে পুলিশের গুলীতে ৩ জন নিহত ও ১০ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়। অবস্থা আয়ত্তে আনার প্রয়াসে কর্তৃপক্ষ সেনাবাহিনী তলব করে এবং সান্ধ্য আইন জারি করে। ডেরা ইসমাইল খাঁ শহরে পুলিশের লাঠিচার্জের ফলে আহত হয় ৬ জন। এইদিকে পূর্ব পাকিস্তানের ঝালকাঠি বন্দর-শহরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া মিছিল বাহির হয়। মিছিল ছত্রভঙ্গ করিবার চেষ্টায় পুলিশ প্রথমে লাঠিচার্জ অতঃরপর ফাঁকা গুলীবর্ষণ করে। ৩০শে জানুয়ারী (১৯৬৯) ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত জাজিরা থানা সদরে পুলিশ মিছিলকারীদের উপরে গুলীবর্ষণ করে এবং সেই গুলীতে ১ জন নিহত ও ৪ জন আহত হয়।

ঢাকা শহরের অবস্থার উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ৩১শে জানুয়ারী (১৯৬৯) হইতে সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করে। প্রচণ্ড দমননীতির মোকাবেলায় আন্দোলন সাময়িকভাবে স্তিমিত হইয়া উঠিলে সমগ্র দেশে শুরু হয় গ্রেফতারের হিড়িক। ৩১শে জানুয়ারী (১৯৬৯) শুক্রবার আমাকে আমার ৭ নং কলেজ স্ট্রীট, ধানমণ্ডি বাসভবন হইতে গ্রেফতার করা হয় ও ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাকিস্তান দেশরক্ষা বিধি বলে বিনাবিচারে আটক করা হয়।

করাচী, লাহোর, পিন্ডি, পেশোয়ার, হায়দরাবাদ, কোয়েটা, ঢাকা, খুলনা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম অর্থাৎ এক কথায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিটি জনপদ যখন গণবিদ্রোহের জোয়ারে উত্তাল, প্রতিটি রাজপথ যখন লক্ষ জনতার মিছিলের পদভারে প্রকম্পিত, আত্মাধিকার আদায়ে দৃঢ় সংকল্প জনতার সুপ্ত আগ্নেয়গিরি ভিসুবিয়াসের

আকস্মিক বিস্ফোরণে এক ব্যক্তির শাসন রক্ষায় নিয়োজিত পুলিশ, আধা সামরিক বাহিনীর লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস, গুলীগোলা ও গ্রেফতার ইত্যাদি যখন অকেজো প্রায়, অর্থাৎ আইউব শাহীর মসনদ যখন টলটলায়মান সেই অবস্থায় ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) প্রেসিডেন্ট আইউব খান রাওয়ালপিন্ডি হইতে লাহোর বিমান বন্দরে অবতরণ করিয়া সাংবাদিকদের নিকট প্রকাশ করিলেন যে, বর্তমান সমস্যাবলী সমাধানের উদ্দেশ্যে তিনি ১৭ই ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের সহিত রাওয়ালপিন্ডিতে এক বৈঠকে মিলিত হইবেন। সাংবাদিকদের তিনি আরো জানাইলেন যে, ইতিমধ্যে বিভিন্ন নেতাকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য তিনি বিরোধী দলীয় নেতা নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ্ খানকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। নওয়াবজাদার নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট আইউবের সেই অনুরোধ পত্রটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

Nawabzada Shahib,

In the course of my broadcast on the 1st of January 1969, I said that I along with my colleagues would like to have the first opportunity to meet the repersentatives of the opposition parties to mutually discuss the political problems which are agitating the people's mind & to seek their assistance in finding solutions thereto, I am therefore, requesting you convenor of Democratic Action Committee to invite on my behalf whomsoever you like to attend a conference in Rawalpindi on the 17th of February, 1969 at 10. a. m. if this is suitable & convenient to you. I am suggesting this date because before that I expect to be in East Pakistan but I shall be available to discuss any preliminaries in Dhaka should that be considered necessary by you.

I shall be very happy indeed if you & such representatives of the opposition parties as you may nominate would accept the invitation. I shall also be happy if you and your colleagues would stay in Rawalpindi as my guests during the conference.

In view of the public interest in the matter I feel that communication should be made available to the press for publication at the earliest possible opportunity.

I am sure you will have no objection to this.

With kind regards.

Yours sincerely,
Singned,
Field Marshall Mohammad Ayub Khan

নওয়াবজাদা সাহেব,

১৯৬৯ সালের ১লা জানুয়ারী জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে আমি বলিয়াছিলাম যে,

আমি ও আমার সহকর্মীবৃন্দ বিরোধী দলসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের সহিত প্রথম সুযোগেই জনগণের মনে বিরাজমান সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনাপূর্বক এইগুলি সমাধানে উপনীত হওয়ার জন্য মিলিত হইতে চাই। ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটির আহবায়ক হিসাবে আমি আপনাকে এই মর্মে অনুরোধ জানাইতেছি যে, যদি আপনার নিকট উপযোগী বিবেচিত হয়, তাহা হইলে আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) সকাল ১০টায় রাওয়ালপিন্ডিতে এক সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য আপনার পছন্দমাফিক ব্যক্তিবর্গকে আমার পক্ষ হইতে দাওয়াত করিবেন। আমি উক্ত তারিখের কথা বলিতেছি এই কারণে যে, সম্ভবতঃ ইহার পূর্ব পর্যন্ত আমার পূর্ব পাকিস্তানে থাকার কথা। কিন্তু যদি আপনার নিকট প্রয়োজন অনুভূত হয়, তাহা হইলে আমি যে কোন প্রাথমিক আলোচনা করিবার জন্য ঢাকায় প্রস্তুত থাকিব।

যদি আপনি ও আপনার মনোনীত বিরোধীদলীয় প্রতিনিধিবৃন্দ এই দাওয়াত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি অত্যান্ত সুখী হইব। আমি আরও সুখী হইব যদি আপনি ও আপনার সহকর্মীরা সম্মেলন চলাকালে আমার মেহমান হিসাবে রাওয়ালপিন্ডিতে অবস্থান করেন।

জনস্বার্থের খাতিরে আমি মনে করি এই পত্রখানি, যত শীঘ্র সম্ভব সংবাদপত্রে প্রেরণ করা প্রয়োজন।

আমি নিশ্চিত যে, এই প্রস্তাবে আপনার কোন আপত্তি নাই।

শ্রদ্ধান্তে–

আপনার বিশ্বস্ত

স্বাঃ ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইউব খান

আলোচনার পরিবেশ

আলোচনায় অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির মানসে ৬ই ফেব্রুয়ারী মধ্যরাত্রি ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ হইতে সৈন্য বাহিনী ও ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু ছাত্র-পুলিশ হাংগামা রোধকল্পে লাহোর শহরে সৈন্য বাহিনী তলব করা হয়। ঢাকায় ৬ই ফেব্রুয়ারী 'কালো দিবস' (ব্ল্যাক ডে) পালন করা হয়। গাড়িতে, বাড়িতে, দোকানে, অফিসে, শরীরে কালো পতাকা ও কালো ব্যাজ সরকারী জুলুমের প্রতিবাদ জানাইতেছিল। ঢাকা যেন কালো পতাকা আর কালো ব্যাজের নগরীতে পরিণত হয়। ঢাকা এবং লাহোরের ছাত্রদের বিভিন্ন দাবীতে সভা, শোভাযাত্রা নগর জীবনকে যেমনি উত্তেজনাময় করিয়া রাখে ঠিক তেমনি আবার ১৭ই ফেব্রুয়ারী গোলটেবিল বৈঠককে কেন্দ্র করিয়া নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান, শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা ভাসানী ও ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটির নেতৃবৃন্দের ঢাকায় আলোচনা রাজনৈতিক মহলে স্বস্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করে। এমনি দ্বিধাদ্বন্দ্বজনিত পরিস্থিতিতে ৮ই ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) দৈনিক

ইত্তেফাকের ছাপাখানা নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেসের বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ প্রত্যাহার করা হয়। রাজনৈতিক সমঝোতার পথে ইহা ছিল নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সঠিক পদক্ষেপ।

রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী গ্রেফতারের প্রতিবাদে, রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে আগতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের ও ১১ দফা বাস্তবায়নের দাবীতে ঢাকার রাজপথ প্রকম্পিক করিয়া লক্ষ জনতার মিছিল প্রত্যহ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার প্রদক্ষিণ করিত। এমনি একটি দিন ৯ই ফেব্রুয়ারি। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত মরণজয়ী সংগ্রামে লিপ্ত লক্ষ ইনসানের মিছিল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সদর ফটক ও বিভিন্ন পার্শ্বস্থ দেওয়াল ভাঙ্গায় উদ্যত হইলে চিরাচরিত প্রথানুযায়ী আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া বিচক্ষণ জেলার নির্মল বাবু কম্পিত পদে ১০ নং সেলে উপস্থিত হন ও ভীত-শঙ্কিতকণ্ঠে সংক্ষেপে মারাত্মক পরিস্থিতি উদ্ভবের আশংকা প্রকাশ করেন এবং আমাকে জেলগেটে উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। আমার সেল-মেট বন্ধুবর জনাব তাজউদ্দিন আহমদ শোনামাত্র আমাকে কালক্ষেপ না করিয়া জেলগেটে যাইতে বাধ্য করেন। জেলগেটের লোহার শিকের অবলম্বণে কিছুদূর আরোহণ করিয়া আমি প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী অনর্গল বক্তৃতা দানের ফলে সমগ্র পরিস্থিতি আয়ত্বের মধ্যে আসে এবং কারাগার প্রাচীরে যাহারা আরোহণ করিয়াছিল তাহারাও নামিয়া পড়ে। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব জেলার নির্মল বাবু যদি আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা প্রার্থনা করিতেন, তাহা হইলে হাজার হাজার মিছিলকারীর রক্তে কালো পীচের রাজপথ শাব্দিক অর্থেই রক্ত গঙ্গায় পরিণত হইত; জেলগেট ও জেলের দেওয়াল চুরমার হইয়া যাইত। এবং পরিণতিতে চোর-ডাকাত সবাই জেলমুক্ত হইয়া সমাজ জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিত, গোল টেবিল বৈঠকের কোন প্রশ্নই উঠিত না। নির্মল বাবুর মত এই ধরনের কর্মকর্তা বড় একটা দেখা যায় না। প্রশাসন তাঁহাকে যথাযথ পারিতোষিক দ্বারা যথোপযুক্ত মর্যাদা দিয়াছে কিনা জানি না। হয়ত দেয় নাই। কারণ ক্ষুদ্রমনা, পরশ্রীকাতর মাথা ভারী প্রশাসনের পক্ষে না দেওয়াই স্বাভাবিক।

রাতে আমার কারামুক্তির আদেশ আসে। আমি মুক্তি আদেশ প্রত্যাখ্যান করি এবং সঙ্গে অন্য দুইজন সদ্য কারামুক্তি আদেশপ্রাপ্ত জনাব সিরাজুল হোসেন খান এবং এডভোকেট মুজিবর রহমান আমার বক্তব্যের সহিত একাত্মতা প্রকাশ করেন। আমাদের দাবী ছিল, দেশরক্ষা বিধি বলে বা নিরাপত্তা আইনে আটক সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দিলেই আমরা কারামুক্তি মানিব; নতুবা নয়। আমাদের অভিনব আন্দোলন পদ্ধতিতে কারাগারের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল মওলানা ওবায়দুল্লাহ বড় বেকায়দায় পড়েন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্বরাস্ট্র সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ইতিমধ্যেই জাতীয় পরিষদের সদস্য আফাজউদ্দিন ফকীর জেলগেটে আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং স্বরাষ্ট্র সচিবের তরফ হইতে সকল রাজবন্দীদের মুক্তির নিশ্চয়তা দান করেন। পরিশেষে জেলার নির্মল বাবুর কাকুতি-মিনতিতে বন্ধুবর তাজউদ্দিন আহমদ, ওবায়দুর রহমান, ছাত্রনেতা

আনিসুর রহমান ও জিয়াউদ্দীন খান আমাকে ১০ নং সেলে ডাকাইয়া নেয় এবং মুক্তিপত্র সই করিতে বলেন। তাহাদের অনুরোধে মুক্তিপত্র সই করি এবং রাত দুইটার পর আমরা কারাগার ত্যাগ করি।

১৬ই ফেব্রুয়ারী রাত ১২টায় দেশরক্ষা আইন তুলিয়া লওয়ার কারণে ১৭ই ফেব্রুয়ারি দেশরক্ষা আইনে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইলেও জনাব আনিসুর রহমানকে ১৭ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৮টায় দেশরক্ষা আইনে আটকাদেশ হইতে মুক্তি দিয়া জেলগেটে পুনরায় নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোর, করাচী, পিণ্ডি ও পেশোয়ারে ছাত্র জনতার আন্দোলন সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ও নিরস্ত্র মিছিলকারীদের মধ্যে অহরহ সংঘর্ষের কারণে পরিণত হয়। রাজবন্দী জনাব জুলফিকার আলী ভূট্টোর রীট পিটিশন শুনানীর উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্ট কর্তৃক বিচারপতি মুশতাক আহমদ ও বিচারপতি মোহাম্মদ গুল দ্বারা গঠিত স্পেশাল বেঞ্চ ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) তারিখের রায়ে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার অবধি লারকানায় স্বীয় বাসভবনে তাঁহাকে আটক রাখিবার নির্দেশ দান করেন। ২৪ শে জানুয়ারী (১৯৬৯) ঢাকায় জাতীয় পরিষদের যে অধিবেশন শুরু হইয়াছিল তাহা ১২ই ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) তারিখে মুলতবী ঘোষণা করা হয়। মূলতবী দিবসে দলীয় প্রধান মওলানা ভাসানীর নির্দেশে সর্বজনাব মশিউর রহমান, আরিফ ইফতেখার (লাহোর), মুজিবুর রহমান চৌধুরী (রাজশাহী) জাতীয় পরিষদের বিদায়ী অধিবেশনে সদস্য পদ হইতে ইস্তফাদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং সর্বজনাব এ,এইচ, এম, কামরুজ্জামান, ইউসুফ আলী, এ, বি, এম, নূরুল ইসলাম ও মিজানুর রহমান চৌধুরী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (৬ দফা) ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের নিকট ইস্তফাপত্র দাখিল করেন। উদ্দেশ্য, ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটিভুক্ত অঙ্গদলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্যগণকেও একত্রে সদস্যপদ হইতে ইস্তফা দানে উদ্বুদ্ধ করা। যাহা হউক, ২৫শে মার্চ (১৯৬৯) সামরিক আইন জারি করিয়া জাতীয় পরিষদের বিলুপ্তি ঘোষণার কারণে ইস্তফাদান প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব পায় নাই।

১২ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (৬ দফা) ওয়ার্কিং কমিটি ডেকোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটিতে প্রেরিত স্বীয় প্রতিনিধিবর্গকে এই মর্মে নির্দেশ দেয় যে, ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি ঘোষিত ৮ দফা কর্মসূচী ৩ হইতে ৮ (অর্থাৎ ৬টি) কর্মসূচীগুলি (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার যাহার অন্তর্ভুক্ত) বাস্তবায়িত করিয়া সরকার স্বীয় আন্তরিকতা প্রমাণ করিলেই যেন ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি প্রেসিডেন্ট আইউব খান কর্তৃক আহূত গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেয়, নতুবা নয়।

আন্দোলনের প্রচণ্ডতায় বিহ্বল ও দিশেহারা আইউব সরকার লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলসমূহ বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার (১৩ই ফেব্রুয়ারি হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী) বন্ধ ঘোষণা করে। এইদিকে বন্দী জুলফিকার আলী ভূট্টো জরুরী অবস্থা

মেজর খুরশীদ, তোফায়েল আহমেদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান, সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান জিয়াউর রহমান ও সেনাবাহিনীর প্রধান এ.কে.এম শফিউল্লাহ

মুক্তি পাগল বাংলার দামাল মুক্তিযোদ্ধা দেশমাতৃকার স্বাধীনতাই যাদের শেষ কথা–

অন্তরঙ্গ মুহূর্তে শেখ মুজিব ও কবি জসিম উদ্দীন

পল্লী কবি জসিম উদ্‌দীন শেখ মুজিবর রহমানকে নিয়ে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন যার কয়েকটি লাইন "------- মুজিবর রহমান ওই নাম যেনো বিসুভিয়াসের অগ্নি-উগারী বান..... শুনেছি আমরা গান্ধীর বাণী জীবন করিয়া দান, মিলাতে পারেনি প্রেম বন্ধনে হিন্দু-মুসলমান। তারা যা পারেনি তুমি তা করেছ, ধর্মে ধর্মে আর জাতিতে জাতিতে তুলিয়াছ ভেদ সন্তান বাংলার।"

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন স্বদেশে। ডানে তাজউদ্দিন আহমদ বামে খন্দকার মোশতাক আহমদ।

১৯৭৪ সালের ৬ই মার্চ বাংলা জাতীয় লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব অলি আহাদ পল্টন ময়দানের জনসভায় বক্তৃতারত।
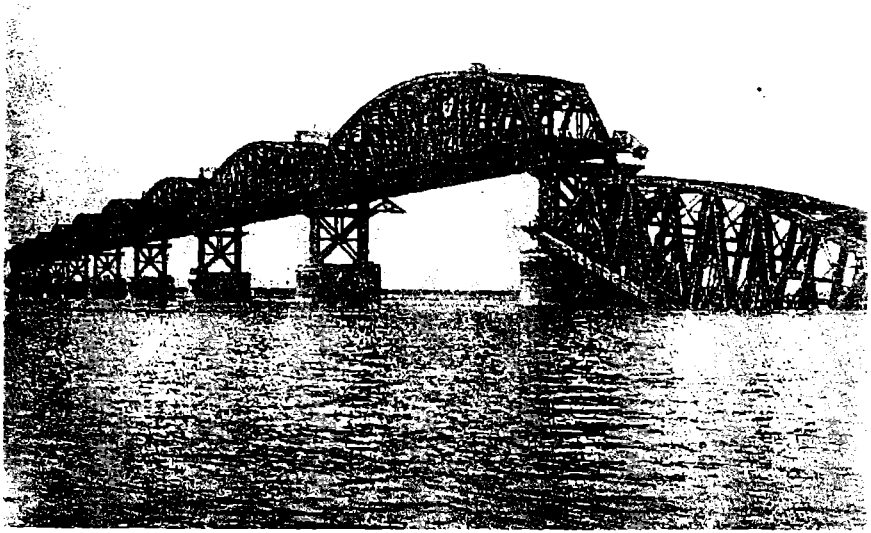
১৯৭১ সালে অথৈ পানির উপর মুক্তি যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ হার্ডিঞ্জ ব্রীজ

ফারাক্কার অভিশাপগ্রস্থ বর্তমানের হার্ডিঞ্জ ব্রীজ। ব্রীজের নীচ দিয়ে চলাচলরত পণ্য বোঝাই ট্রাক বহর। ছবি সৌজন্যে মোঃ সালাউদ্দিন

প্রত্যাহারের দাবীতে ১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) হইতে অনশন ধর্মঘট করিবার হুমকি দেন। ১৪ই ফেব্রুয়ারী জনাব ভুট্টোকে বন্দীদশা হইতে মুক্তি দেয়া হয় এবং ১৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

১৪ই ফেব্রুয়ারী পল্টনে সভা

ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি ৮ দফা দাবীর সমর্থনে ও জুলুমের প্রতিবাদে ১৪ই ফেব্রুয়ারী সমগ্র দেশব্যাপী সাধারণ হরতাল ঘোষণা করে এবং একই দিবসে ছাত্রদের সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ও ১১ দফা দাবীর সমর্থনে ও জুলুমের প্রতিবাদে সাধারণ হরতাল ঘোষণা করে। সভায় সংগ্রাম পরিষদের একই হরতাল দিবসের একই কর্মসূচী ঘোষিত হয় এবং একই পল্টন ময়দানে হরতাল দিবসে উভয় গ্রুপের জনসভা আহবান করা হয়।

১১ দফা বনাম ৮ দফা আন্দোলনের ছদ্মবরণে জননেতাদের প্রতি সাধারণ যুবসমাজ ও ছাত্র সমাজের অবিশ্বাস, অবজ্ঞা ও অনীহার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৪ই ফেব্রুয়ারীতে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভায়। অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় বিশাল জনসমুদ্রে সভাপতিত্ব করিবার জন্য বৃদ্ধ নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জনাব নূরুল আমিনের নাম প্রস্তাব করিতেই সভার মঞ্চ ও সভা হইতে তরুণ শ্রেণী প্রতিবাদমুখর হইয়া উঠে। কোন সুস্থ ও রাজনৈতিক বক্তব্যই শ্রবণ করিতে তরুণ সমাজ প্রস্তুত ছিল না। ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে, ধাপে ধাপে, সমগ্র আন্দোলনের পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব ছাত্রদের সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ কবলিত হয়। উল্লেখ্য যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ৬ দফাকে অঙ্গীভূত করিয়াই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা প্রণীত হইয়াছিল এবং ১১ দফা দাবীকে কেন্দ্র করিয়াই সমগ্র আন্দোলন ছাত্র নেতৃত্বে পরিচালিত হইতেছিল। সেই সাথে আরগতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের ভাবমূর্তিও দিন দিন গগনচুম্বি হইয়া উঠিতেছিল। এইভাবেই অবশেষে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি প্রায় সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানীদের দাবীতে পরিণত হয়। যাহা হউক, পল্টনের ঐ সভায় ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা তোফায়েল আহমদ, আওয়ামী লীগের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা আমেনা বেগম, সদ্য কারামুক্ত (১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯) আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ, আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মোজাফফর আহমদ বক্তৃতা করেন। অর্থাৎ ৮ দলীয় ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটির অন্য ৬ দলীয় কোন নেতাকেই সেইদিন বক্তৃতা করিতে দেওয়া হয় নাই। তবে আমার দৃঢ়মত ছাত্রনেতৃবৃন্দ ইচ্ছা করিলেই উক্ত সভাকে ছাত্র ও জননেতৃবৃন্দের যৌথ সভায় পরিণত করিতে পারিতেন। পল্টন ময়দানে এই বিশাল বৈপ্লবিক জনসভাটির অসহিষ্ণু, ভাবাবেগপ্রসূত কার্যধারা দেশ ও দেশবাসী কতটুকু মঙ্গল ও কল্যাণের কারণ হইয়াছে, ভবিষ্যৎ ইতিহাসই ইহার রায় দিবে। তবে এই ঘটনাপ্রবাহ আমার মত আন্দোলনমুখী মানুষকে

পীড়া দিয়াছে নিঃসন্দেহে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী সাধারণ হরতাল পালন উপলক্ষে সৃষ্ট হাংগামায় করাচীতে ২ জন ও লাহোরে ২ জন নিহত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনিবার প্রয়োজনে প্রশাসন হায়দরাবাদ, করাচী ও লাহোরে সেনা বাহিনী তলব করে। ৮টি দলের সমন্বয়ে ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি সাধারণভাবে ভাসা ভাসা সমর্থনপুষ্ট ছিল কিন্তু জনসাধারণ জুলফিকার আলী ভূট্টোকেই প্রেসিডেন্ট আইউব বিরোধী রাজনীতি ও গণ-আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তি হিসাবে জ্ঞান করিত অর্থাৎ সরল ভাষায় একমাত্র জনপ্রিয় নেতারূপে জনাব ভূট্টো রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হন।

সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু

দেশবাসী যখন প্রাণ দিতেছে, জখম হইতেছে, নির্বিচারে পুলিশের জুলুম মোকাবিলা করিতেছে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবী করিতেছে এবং দেশের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংকট উত্তরণ মানসে প্রেসিডেন্ট আইউব যখন নেতৃবৃন্দের সহিত গোলটেবিল বৈঠকে বসিতে যাইতেছেন ঠিক এমনি মুহূর্তে ও অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায়। ১৫ই ফেব্রুয়ারী প্রত্যুষে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদ্বয় ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক ও সার্জেন্ট জহুরুল হক প্রাতঃকৃত করিতে যাইবার পথে প্রহরারত সৈন্য প্রহরীর গুলিতে গুরুতরভাবে আহত হন এবং সরকারি ঘোষণা মোতাবেক রাত ৯টা ৫ মিনিটে সার্জেন্ট জহুরুল হক কমবাইন্ড মিলিটারী হসপিটালে শাহাদৎ বরণ করেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) ভোরবেলা সার্জেন্ট জহুরুল হকের লাশ তাঁহার ভাইয়ের এলিফ্যান্ট রোডের বাসায় লইয়া যাওয়া হয়। সহস্র সহস্র দর্শনার্থী অত্যন্ত শৃংখলার সহিত কাতারে দাঁড়াইয়া শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অপরাহ্ন ২-৩০ মিনিটে শহীদের লাশসহ শোক মিছিল শহরের বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিণের পর পল্টন ময়দানে নামাজে জানাযা আদায় করে এবং অপরাহ্ন ৩-৩০ মিনিটে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হককে আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করা হয়।

শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু সংবাদে সমগ্র শহর যেন অগ্নিমূর্তি ধারণ করে। উত্তেজিত অথচ চরম মর্মাহত জনতা বিভিন্ন দিক হইতে শোক মিছিলসহ বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। এই অবস্থায় পুলিশের গুলি, লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহারের প্রতিবাদে ক্ষিপ্ত জনতা বাংলা একাডেমীর পার্শ্ববর্তী গভর্নমেন্ট গেস্ট হাউস, আগা মাসীহ লেনে অবস্থিত প্রাদেশিক মুসলিম লীগের (কনভেনশন) সদর দফতর ভবন, নওয়াব হাসান আসকারী ও আইউব মন্ত্রিসভার ইনফরমেশন ও ব্রডকাস্টিং মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীনের বাসভবন, ওয়ার্কার্স মন্ত্রী (প্রাদেশিক) মং সু প্রুর সরকারী বাসভবন, প্রাদেশিক মন্ত্রী সুলতান আহমদের সরকারী বাস ভবনে অবস্থিত মিনিয়েলস কোয়ার্টার ও একটা মোটর গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। এবম্বিধ পরিস্থিতিতে শহরে স্বাভাবিক জীবন যাত্রা চরমভাবে ব্যাহত হয় এবং অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনিবার প্রচেষ্টায় শহরে সেনা

বাহিনী তলব করা হয়। কর্তৃপক্ষ শহরে পুনরায় ১৪৪ ধারা জারি করে। অবশেষে পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার জন্য সন্ধ্যা ৭টা হইতে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটির অনুরোধে প্রেসিডেন্ট আইউব খান গোল টেবিল বৈঠক ১৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯)-এর স্থলে ১৯শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য নিম্নলিখিতদের আমন্ত্রণ জানান :

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (ন্যাপ), জুলফিকার আলী ভুট্টো (পিপলস পার্টি), এয়ার মার্শাল আসগর খান, লেঃ জেঃ মোহাম্মদ আজম খান, সৈয়দ মাহবুব মোরশেদ (প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, ঢাকা হাইকোর্ট),। ইহা ছাড়াও ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটির অংগদলগুলির পক্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে উক্ত বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয় :

মমজাত মোহাম্মদ খান দৌলতানা	পাকিস্তান মুসলিম লীগ
খাজা খায়ের উদ্দিন	,, ,, ,,
মুফতি মাহমুদ	পাকিস্তান জমিয়াতুল উলেমায়ে ইসলাম
পীর মোহসেন উদ্দিন আহমদ দুদু মিয়া	,, ,, ,, ,,
নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান	পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (৮ দফা)
আবদুস সালাম খান	,, ,, ,,
চৌধুরী মোহাম্মদ আলী	পাকিস্তান নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি
মৌলভী ফরিদ আহমদ	,, ,, ,,
আবদুল ওয়ালী খান	পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি
মোজাফফর আহমদ	,, ,, ,,
নূরুল আমিন	পাকিস্তান ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট
হামিদুল হক চৌধুরী	,, ,, ,,
শেখ মুজিবুর রহমান	পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (৬ দফা)
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	,, ,, ,,
মাওলানা আবুল আলা মওদুদী	পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী
অধ্যাপক গোলাম আযম	,, ,, ,,

যাহা হউক, ইতিমধ্যে আন্দোলনের পরিব্যাপ্তি মফঃস্বলেও ছড়াইয়া পড়ে। সর্বত্রই প্রতিহিংসার প্রতিচ্ছবি। হিংসাত্মক প্রবণতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে রাজশাহীতেও। সোমাবার দিন (১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯) রাজশাহী মিছিলের শহরে পরিণত হয়। শোভাযাত্রীরা পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী আইয়েন উদ্দিনের বাসভবন, পাকিস্তান কাউন্সিল লাইব্রেরী, রাজশাহী গভর্নমেন্ট কলেজ প্রিন্সিপালের ব্যক্তিগত মোটর

গাড়ী ও অকট্রয় পোস্ট আক্রমণ করে ও অগ্নিসংযোগ করে। পুলিশের কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার ও লাঠিচার্জের ফলে ১৩ জন আহত হয় এবং ১৮ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। চট্টগ্রাম বন্দর নগরীতেও শাসক কনভেনশন মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের বাড়িঘর ও প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিক্ষুব্ধ জনতা বার বার অগ্নিসংযোগ করিতে প্রচেষ্টা চালায়। জেলা প্রশাসক পরিস্থিতি আয়ত্বে রাখিবার তাগিদে ১৪৪ ধারা জারি করে ই.পি.আর বাহিনীকে তলব করেন এবং ঈদুল আজহা ও শহীদ দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার ১৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে চট্টগ্রাম শহরের সকল স্কুল-কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের করাচী ও অন্যান্য শহরে জনতার আপোষহীন সংগ্রামের অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে প্রশাসন কর্তৃপক্ষ আগ্নেয়াস্ত্রের যথেচ্ছা ব্যবহার করিয়া ২ জনকে হত্যা করেন। পরিশেষে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনিবার জন্য শহরে সেনাবাহিনীকে তলব করা হয়।

ডঃ জোহার মৃত্যু

১৭ই ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) পুলিশ ও মিছিলকারীদের সংঘর্ষে উদ্ভূত তিক্ত অবস্থার পুনরাবৃত্তি আশংকায় ১৮ই ফেব্রুয়ারী পূর্বাহ্নেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের রিডার প্রক্টর ডঃ শামসুজ্জোহা, কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেট প্রহরা দিতে থাকেন। অপরাপর অধ্যাপক কাজলা গেটে প্রহরারত ছিলেন। উদ্দেশ্য, ছাত্রবৃন্দ যেন মিছিলসহ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের চেষ্টা করিতে না পারে। যাহা হউক, অধ্যাপকবৃন্দের এই আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও এবং সেনাবাহিনীর গাড়ী বা সেনা বাহিনী তলব না করিবার বিষয়ে পূর্বাহ্নেই ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত চুক্তি থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ সেনাবাহিনীপূর্ণ গাড়ী ছুটিয়া আসে এবং কোনরূপ সতর্কবাণী উচ্চারণ না করিয়াই গুলিবর্ষণ শুরু করে। দিশাহারা অবস্থায় ডঃ কসিমুদ্দিন মোল্লার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয় এবং ডঃ শামসুজ্জোহা বেয়নেটের আঘাতে গুরুতরভাবে আহত অবস্থা রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নীত হইবার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সরকারী প্রেসনোটের ভাষ্য অনুসারে লেফটেন্যান্টের গুলিতে ডঃ জোহার নিহত হওয়ার কথা বলা হইয়াছিল। তাহা সত্য নয় বরং বেয়নেট চার্জের ফলেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এইরূপ নাজুক পরিস্থিতিতে প্রশাসন কর্তৃপক্ষ যদি ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে বিচক্ষণতা ও ধৈর্যের সহিত পরিস্থিতি মোকাবিলা করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে দেশ ও দশের চরম ক্ষতি হইয়া যায় এবং এই ধরনের ক্ষুদে গরম মাথাওয়ালা প্রশাসন কর্তৃপক্ষের কারণেই সমগ্র সরকার জনতার ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়।

সিদ্ধান্ত ছিল, ৩ জন করিয়া মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইবে এবং বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিণ করিবে। গুলিবর্ষণ ও শিক্ষক হত্যার কারণে পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন হয়। শুরু হয় মারমুখী জনতার মিছিলের উত্তাল তরঙ্গ, লংঘিত হয় ১৪৪ ধারার সমস্ত নিষেধাজ্ঞা। প্রশাসন কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি বেগতিক দেখিয়া ১৮ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ন ২-৩০ মিনিটের মধ্যে রাজশাহী শহরে সান্ধ্য আইন জারি করেন। ডঃ জোহার মৃত্যুর খবরে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে এক অব্যক্ত শোকের ছায়া নামিয়া আসে। নোয়াখালী

ও কুষ্টিয়ায় ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ আয়ত্বে আনিবার প্রচেষ্টায় পুলিশ গুলি চালায়। নোয়াখালীতে ৩ জন ও কুষ্টিয়ায় ১ জন নিহত হয়। কারফিউ না থাকিলে ঢাকার পরিস্থিতি সেনাবাহিনীও আয়ত্বে আনিতে পারিত কিনা, সন্দেহ। যে অমানুষিক ও বর্বরোচিত পন্থায় পাশবিক শক্তি ডঃ জোহাকে হত্যা করিয়াছে তাহা সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের অস্তিত্ব ও বিবেকের উপরে হানিয়াছে দারুণ কশাঘাত। কোন রক্তমাংসের দেহ এই ঘটনাকে কিছুতেই বিনা প্রতিবাদে শান্তভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালসহ প্রায় প্রত্যেকটি জেলা শহর, মহকুমা শহর এমন কি থানা সদর পর্যন্ত বিভিন্ন পতাকাতলে ডঃ জোহার মর্মান্তিক মৃত্যুর প্রতিবাদে মুখর হইয়া উঠে। এমতাবস্থায় বাঙগালীর দ্বারে আঘাত হানা ত্যাগের মূর্তপ্রতীক ২১শে ফেব্রুয়ারীর শহীদ দিবস। স্বৈরাচারী শক্তির সাথে জনতার সংঘর্ষ হয় খুলনা ও পাবনা জেলাতে। রক্তরাংগা ২১শে ফেব্রুয়ারী আবার বাংগালী সন্তানের রাক্তপ্রার্থী হয় এবং খুলনা ও পাবনায় যথাক্রমে ৮ জন ও ২ জন শহীদের বুকের শোণিতে পুনর্বার অবগাহন করে ২১শে ফেব্রুয়ারী। এই রক্তদান বৃথা যায় নাই। এক ব্যক্তির শাসন প্রবর্তক, জনতার সার্বভৌমত্ব ছিনতাইকারী, দেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইন মোতাবেক দেয় ওয়াদা ভংগকারী প্রেসিডেন্ট আইউব খান এই ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী না হইবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং ২২শে ফেব্রুয়ারী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহৃত হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তবৃন্দ মুক্তি পান। ঢাকায় সংগ্রামী লক্ষ লক্ষ জনতা তাঁহাদের স্বতঃস্ফূর্ত সম্বর্ধনা জানায় অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত পল্টন জনসভায়। লক্ষণীয় যে, শেখ মুজিবুর রহমান এই জনসভায় উপস্থিত হন নাই, অধিকন্তু সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদ একক ও বিচ্ছিন্নভাবে ২৩শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে গণ-সম্বর্ধনা দানের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত সদ্যমুক্ত অন্যদের সম্পর্কে কোন বক্তব্য নাই। এইভাবেই ষড়যন্ত্র মামলার সকল কৃতিত্ব ও ত্যাগ তিতিক্ষার নৈবেদ্য ও জনপ্রিয়তা সুচতুর শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক মূলধনে পরিণত হয়। মামলার প্রকৃত ত্যাগী অভিযুক্ত লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের সকল ভূমিকা একপাশে পড়িয়া রহিল– আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শিরোপা এককভাবে কুক্ষিগত করিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, জন কয়েক যুব নেতার বদৌলতে তিনি ভূষিত হইলেন বঙ্গবন্ধু উপাধিতে। কাহার প্রাপ্য কে আত্মসাৎ করে? রাজনীতির চানক্যচাল কি ইহাকেই বলে? আসলে, লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করিবার গোপন আন্দোলনের প্রকৃত নায়ক। শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন উক্ত আন্দোলন লক্ষ্যের বন্ধু ও সমর্থক মাত্র।

গোল টেবিল বৈঠক

যাহা হউক, ২৬শে ফেব্রুয়ারী রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিতব্য গোল টেবিল বৈঠকে

যোগদানের সিদ্ধান্ত শেখ মুজিব পূর্বাহ্নেই রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় ঘোষণা করিয়াছিলেন। ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটির ১৬ জন প্রতিনিধি, প্রেসিডেন্ট আইউব খানের নেতৃত্বে ১৫ জন, নির্দলীয় এয়ার মার্শাল আসগর খান, বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ ২৬শে ফেব্রুয়ারী সকাল ১০-৩০ মিনিটে রাওয়ালপিন্ডিতে অবস্থিত প্রেসিডেন্ট গেস্ট হাউসে রাজনৈতিক সংকট উত্তরণকল্পে গোল টেবিল বৈঠকে মিলিত হন। ৪০ মিনিটব্যাপী বৈঠকের পর ঈদুল আযহা উপলক্ষে বৈঠক ১০ই মার্চ সকাল ১০ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রাখা হয়। লেঃ জেঃ আজম খান রাওয়ালপিন্ডিতে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও বৈঠকে যোগ দেন নাই। পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো করাচীর এক সভায় কিছু অসংলগ্ন উক্তি প্রসংগে প্রেসিডেন্ট আইউব খানকে পদত্যাগ করিয়া জাতীয় পরিষদের স্পীকার আবদুল জব্বার খানের নিকট দায়িত্ব বুঝাইয়া দেওয়ার আহবান জানান। তাঁহার প্রস্তাব মতে, জাতীয় পরিষদের স্পীকার উক্ত দায়িত্বভার প্রাপ্তির পর প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন এবং নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ দেশের নূতন সংবিধান রচনা করিবে। উল্লেখ্য যে, জনাব ভুট্টো ইতিপূর্বেও বৈঠকে যোগদানের পূর্বশর্ত হিসাবে ১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) করাচী প্রেসক্লাবে বক্তৃতায় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের নিমিত্ত প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এবং কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য নিজস্ব ১০ দফা দাবী ঘোষণা করিয়াছিলেন। পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তখন 'জ্বালাও পোড়াও' আন্দোলনের মুখপাত্র, পিকিং-এর নির্দেশে আইউব সরকারের খুঁটি। সুতরাং গঠনমূলক কাজে সহায়তা প্রদান তাঁহার পক্ষে ছিল অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ও তাঁহার দলের সরকার বিরোধী বিশেষ কোন কার্যকর ভূমিকা ছিল না, মৌখিক বুলি বা সংবাদপত্রে গা বাঁচানো বিবৃতিই ছিল তাঁহাদের একমাত্র অবদান।

মুলতবী গোল টেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবের ভাষণ :

১০ই মার্চ মুলতবী গোল টেবিল বৈঠকে বাংলার কণ্ঠস্বর শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ নিম্নে দেওয়া হইল।

Mr. President & Gentlemen,

The nation today is experiencing a crisis which has shaken its very foundations. For all of us who love the nation and recall the sacrifices which were made to create Pakistan, this is a time of grave anxiety. In order to resolve the crisis, it is imperative that its nature should be understood and its causes identified. Nothing would be more casstrophic than the failure to come to grips with the basic issues which underline the upheaval which has taken place in the country. These issues have been evaded for twenty one years. The moment has a arrived for us to face them squarely. I am

convinced that comprehensive solution must be found for our problems, for clearly the situation is too grave for palliatives and half-measures. What is at stake is our survival.

Is is this conviction that obliges me to expound a comprehensive solution to our basic problems. If the demands that have been expressed by different sections of the people are carefully examined, it will be seen that there are three basic issues which underlie them. The first is that of deprivation of political rights and civil liberties. The second is the economic injustice suffered by vast majority of the people, comprising workers, peasants, low and middle income groups, who have had to bear the burden of the costs of development in the form of increasing inflation while the benefits of such development are increasingly concentrated in the hands of a few families, who in turn are concentrated in one region. The third is the sense of injustice felt by the people of East Pakistan, who find that under the existing constitutional arrangements their basic interests have consistently suffered in the absence of effective political power being conferred upon them. The former minority provinces of West Pakistan feel similarly aggrieved by the present constitutional arrangements.

The issue of deprivation of political rights finds expression in the 11-point programme of the Students of East Pakistan, as also in the 6-point programme of the Awami League, as a demand for the establishment of a Parliamentary Democracy, based on the principle of the supremacy of the legislature, in which there is representation of all units on the basis of population, and to which representatives are directly elected by the people on the basis of universal adult franchise.

The issue of economic injustice is reflected in the 11-point programme in the form of clearly formulated demands for re-organisation of the economic and educational system of the country. The 6-point programme of my party clearly recognises the need for redical economic re-organisation, and the demand for regional autonomy, as outlined in it, is insisted upon as an essential pre-condition for economic re-organisation and the implementation of effective economic programmes.

The issue of justice for the different regions and units of Pakistan is the basis of the demand for the establishment of a Federation providing for full regional autonomy, as embodied in the 6-point programme as also in the 11-point programme, This is also the bassis of the demand for dismemberment of one Unit and the establishment of a Sub-Federation in West Pakistan.

The Democratic Action Committe has held detailed deliberations regarding these grave and challenging national issues. There has always been complete unanimity in the Democratic Action Committee on the imperative necessity of effecting the following constitutional changes :

(a) The establishment of a federal parlimentary democracy.

(b) The introduction of a system of direct elections based on universal adult franchise.

A consensus has also been apparent among the members of the Committee on the following matters :

(a) The dismemberment of One Unit and the establishment of a Sub-Federation in West Pakistan

(b) Full regional autonomy being granted to the regions.

The Committee further agreed that its members should be at liberty to present furhter proposals, which in their view were essential for achiving an effective and lasting solution of the problems that are at the root of the present crisis.

Since we are here for the very purpose of seeking to find such and effective and lasting solution. I have felt it my bounden duty to press before this Conference with all earnestness that every one sitting at this table should realise that constituional changes to provide for representation on the basis of population in the Federal Legislature as well as for the granting of full regional autonomy, as outlined in the 6-point programme, are essential for achieving a strong, united and vigorous Pakistan.

I would like to state that the Awami League is a party of the freedom-fighters for Pakistan. Its founder, Huseyn Shaheed Suhrawardy is indeed one of the founders of Pakistan. I recall with some pride that under his leadership, my colleagues and I were in the vanguared of the struggle for Pakistan. Such proposals as I am presenting before the Conference are based on the conviction that they are absolutely essential in order to preserve and indeed to strengthen Pakistan.

The demand for representation in the Federal Legislature to be on basis of population stems from the first principle of democracy, viz., "one man, one vote". In the national forum, as envisaged in the 6-point scheme, only national issues would arise for consideration, The representatives would, therefore, be called upon to deal with matters from a national point of view and hence the voitng would not be on a regional basis, Further, national

political parties would be representated in the Federal Legislature, which would ensure that voting would be on a party, and not on regional basis. Indeed the experience of the lest twentyone years bears out the fact that voting in the National Assembly has invariably been on party basis, It is the principle of party in representation of each wing, which is based on the false premise that representatives in to Federal Legislature are likely to vote on a regional basis. It is thus the party principle that places and unjustified emphasis on regionalism as a factor in national politics. The entire historical experience of the last twentyone years fully bears out the facts that East Pakistan has always subordinated its regional interest to the over-riding national interest, not withstanding the fact that it had the majority of the population. It should not be necessary to recall that in the first Constituent. Assembly East Pakistan had 44 representatives as against 28 from West Pakistan; yet this majority was never used to promote any regional interest. Indeed, six West Pakistanis were elected to the Constituent Assembly from East Pakistan. Despite being a majority, East Pakistan accepted the principle of party not only in representation in the legislature but also in other organs of the Sate. It is painful to record that party so far as representation in the Legislature was concerned, was promptly implemented, but the benefit of party in representation in the other organs of the State, including the civil, foreign and defence servies, was never extended to East Pakistan. East Pakistan had even acquiesced in the Federal Capital as well as all the Defence head-quarters being located in West Pakistan. This meant that the bulk of the expenditure on defence and civil administration, amounting to about Rs. 270 crores, or over 70% of the central budget is made in West Pakistan. Should our West Pakistani brethern persist in refusing us representation on a population basis in the Federal legislature, East Pakitanis will feel constrained to insist on the shifting of the Federal Capital and the Defence headquarters to East Pakistan.

It would be a positive step toward cementing the relations between the two wings of Pakistan if our West Pakistani brethern were to affirm their confidence in their East Pakistani brethern by not opposing the demand for representation in the Federal Legislature on the basis of population. Such a step would pay rich dividend by way of building up mutual confidence and trust between the people of East and West Pakistan.

The adoption of the Federal Scheme presented in the 6-point programme is an essential pre-requisite for the achievement of a political

solution for the problems of the country. I would reiterate that the spirit underlying the 6-point programme is that Pakistan should present itself to the community of the nations as one single united nation of one hundred and twenty million people. This object is served by the Federal Government being entrusted with the three subjects of Defence, Foreign Affairs and Currency. It is the same objective of having a strong and vigorous Pakistan that requires that due regard be paid to the facts of geography by granting full regional autonomy to the regions in order to enable them to have complete control in all matters relating to economic management.

I cannot too strongly emphasise the imperative necessity of removing economic injustices, if we are to put our society back on an even keel. The 11-point programme of the students for which I have expresed support contains proposals regarding the re-ordering of the economic and education system. These demands stem from the basic urge for the attainment of economic justice.

I would, however, like at this time to confine myself to outlining the constitutional changes, which are necessary for the attainment of economic justice, between man and man and between region and region.

The centralisation of economic management has steadily aggravated the existing economic injustices to the point of crisis. I need hardly dilate on the subject of the 22 families, who have already achieved considerable notoriety both at home and abroad on account of the concentration of wealth in their hands resulting from their ready access to the corridors of power. Monopolies and cartels have been created and a capitalist system has been promoted, in which the gulf between the privileged few and the suffering multitude of workers and peasants has been greatly widened. Gross injustices have also been inflicted on East Pakistan and the monirity provinces of West Pakistan.

The existence of per capita income disparity between East and West Pakistan is known to all. As early as 1959-60, the Chief Economist of the Planning Commission estimated that the real per capita income disparity between East and West Pakistan was 60%. The Mid-plan Review made by the Planning Commision and other recent documents show that the disparity in real per capita income has been steadily increasing and therefore, would be much higher than 60% today. Underlying such disparity, is the disparity in general economic structure and infrastructure of the two regions, in the rates of employment, in facilities for education, and in medical and welfare

services. To give just a few examples, power generating capacity in West Pakistan is 5 to 6 times higher than in East Pakistan; the number of hospital beds in 1966 in West Pakistan was estimated to be 26,200, while that in East Pakistan was estimated to be 6,900; between 1961-1966, only 18 Polytechnic Institutes were established in East Pakistan as against 48 in West Pakistan. Further, the disparity in the total availability of resources has been even higher. More than 80% of all foreign aid has been utilized in West Pakistan in addition to the net transfer of East Pakistan's foreign exchange earnings to West Pakistan. This made it possible for West Pakistan over 20 years to import Rs. 3109 crores worth of goods against the total export earnings of Rs. 1337 crore, while during the same period East Pakistan imported Rs 1210 crore worth of goods as against its total earnings of Rs. 1650 crore. All these facts underline the gross economic injustice which has been done to East Pakistan. There has been a failure to discharge to constitutional obligation to remove disparity between the provinces in the shortest possible time. The Annual Report on disparity for the year 1968 placed before the National Assembly records that disparity has continued to increase.

The centralisation of economic management has thus failed miserably to meet the objective of attaining ecnomic justice. It has failed to meet the constitutional obligation to remove economic disparity between region and region. Instead, therefore, of persisting in centralized economic management which has failed to deliver the goods, we should adopt a bold and imaginative solution to this challenging problem The Federal Scheme at the Six-point programme, is in my view, such a bold and imaginative solution.

It is in essence a scheme for entrusting the responsbitity for economic managment to the regions. The proposal is born of the conviction that this alone can effectively meet the problems, which centralised economic management has failed to overcome. This unique geography of the country, resulting in lack of labour mobility, as well as the different levels of development obtaining in the different regions, requires that economic management should not be centralised.

The specific proposal embodied in the Six-point Programme with regard to currency, foreign trade, foreign exchange earnings and taxation are all designed to give full responsibility for economic management to the regional Governments. The proposals with regard to currency are designed to provent flight of capital and to secure control over monetary policy. The

proposals regarding foreign trade and foreign exchange are desigened to ensure that the resources of a region are available to that region and to ensure it to obtain the maximum amount of foreign exchange resources for development purposes.. The proposal regarding taxation is designed to ensure control by the regional governments over fiscal policy, without in any way depriving the Federal Government of its revenue requirements.

The substance of these proposals are as follows :

(a) With regard to currency, measures should be adopted to prevent flight of capital from one region to another and to secure control over monetary policy by the regional governments. This can be done by adoption of two currencies or by having one currency with a separate Reserve Bank being set up in each region, to control monetary policy, with the State Bank retaining control over certain defined matters. Subject to the above arrangements, Currency would be a Federal subject.

(b) With regard to foreign trade and aid, the regional Governments should have power to negotiate trade and aid, within the frame work of the foreign policy of the country, which shall be the responsibility of the Federal Ministry of Foreign Affairs.

(c) The foreign exchange earnings of each region should be maintained in an account in each Regional Reserve Bank and be under the control of the regional Government; the Federal requirements from the two regional accounts on the basis of an agreed ratio.

(d) With regard to taxation., it is proposed that the power of tax levy and collection should be left to the regional Governments, but the Federal Government should be empowered to realise its revenue requirements from levies on the regional Governments. It should be clearly understood that it is not at all contemplted that the Federal Government be left at the mercy of the regional Governments for its revenue needs.

I would emphasize that there would be no difficulty in devising appropriate constitutional provisions whereby the Federal Government's revenue requirements could be met, consistently with the objective of ensuring control over fiscal policy by the regional Governments. The scheme also envisages that there would be just representation on a

population basis of persons from each part of Pakistan in all Federal services, including Defence Services.

If these principles are accepted, the detailed provisions can be worked out by a Committee consisting of experts, to be designated by both parties.

This scheme holds enormous promise of removing the canker of economic injustice from the body politic of Pakistan while at the same time removing the mistrust and frustration which centralised economic management has fostere over the years. I am confident that the people of West Pakistan would give their whole-hearted support to this scheme.

I urge the participants in this Conference to come forward with open minds and with large hearts, in spitit of fraternity and national solidarity, to adopt the Federal Scheme presented above, as the only means of overcoming what has been one of the most formidable problems conforming the country, i.e., that of the attainment of economic justice. No source had fed the current crisis more than the sense of economic injustice. Let us remove it; let us tackle problems at their source. Any attempt to avoid coming to grips with these basic problems will jeopardise our very survival.

Neither Almighty Allah nor history will forgive us if at this time of national crisis we fail to rise to the occasion to adopt bold solutions in order to restore the fromidable problems which have created a national crisis. This is a great opportunity, and one which may not pesent itself again, to face our national problems squarely. We must, Therefore, strain every nerve to agree upon and implement the required solutions. Let us strive together to lift our beloved Pakistan out of the tragic situation in which she is placed, and to lay the constitutional foundations for a real, living, Federal Parliamentary Democracy, which will secure for the people of Pakistan full political economic and social justice. Only thus can a strong and united Pakistan face the future with hope and confidence.

The 10th March, 1969. PAKISTAN ZINDABAD.

১০ই মার্চ অনুষ্ঠিত মুলতবী গোল টেবিল বৈঠকে ৮ দলীয় ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটির আহবায়ক নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ্ খান কমিটির পক্ষ হইতে দুইটি দাবী উত্থাপন করেন : (১) আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ ফেডারেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতি সরকার; (২) প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে আইন পরিষদ নির্বাচন। ১০ই মার্চ হইতে ১৩ই মার্চ পর্যন্ত রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেসিডেন্ট গেস্ট হাউসে গোল টেবিল বৈঠক চলে এবং ১৩ই মার্চ গোল টেবিল বৈঠকের সমাপ্তি অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট আইউব খান নিম্নবর্ণিত

২টি দাবী গ্রহণ করেন :

(১) প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচন এবং (২) ফেডারেল পার্লামেন্টারী সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন।

ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটির সভায় প্রেসিডেন্ট আইউব খানের এওয়ার্ড বা রায় বিবেচনার পর কমিটির লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার প্রেক্ষিতে ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটির বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের (৬ দফা) সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান পূর্বাহ্নেই ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটির সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলেন এবং পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মস্কো) প্রতিনিধি ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটির সভায় যোগদান করেন নাই।

বৈঠকের পর

এয়ার মার্শাল আসগর খান একই দিন ১৩ই মার্চ (১৯৬৯) রাওয়ালপিণ্ডিতে আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে জাস্টিস পার্টি নামে স্বীয় রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১৩ই নভেম্বর (১৯৬৮) জুলফিকার আলী ভুট্টোর গ্রেফতারের পর গণআন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকল্পে অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর খান ১৭ই নভেম্বর (১৯৬৮) হইতে রাজনীতিতে অবতরণ করেন। আগেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ৭ই নভেম্বর (১৯৬৮) রাওয়ালপিণ্ডিতে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে ছাত্রদের মৃত্যুতে পশ্চিম পাকিস্তানে আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠে; এবং ইহারই ক্রমব্যাপ্তি সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানকে গ্রাস করে।

শেখ মুজিবুর রহমান রাওয়ালপিণ্ডি গোল টেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণের পর ১৪ই মার্চ ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করিলে জনতা তাঁহাকে বীরোচিত সম্বর্ধনা দান করে। বিমান-বন্দরে তিনি ঘোষণা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ সমর্থন করিলে প্রেসিডেন্ট আইউব আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ পূর্ব পাকিস্তানের দাবী মানিতে বাধ্য হইতেন। শেখ সাহেব আরো মন্তব্য করেন যে, সর্বজনাব হামিদুল হক চৌধুরী, মাহমুদ আলী, ফরিদ আহমদ ও আবদুস সালাম খান অদ্যাবধি বিগত ২২ বৎসর যাবৎ একই খেলায় মাতিয়া আছেন। অসামঞ্জস্যপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের প্রেক্ষিত্রে মওলানা ভাসানীর রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করা বিধেয় বলিয়াও তিনি মন্তব্য করেন। ১১ দফা আন্দোলন পরিচালনাকারী সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নেতৃত্ব শেখ মুজিবুর রহমানকে সমর্থন করিত এবং তাহাদেরই প্রত্যক্ষ প্রয়াসের ফলেই শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে একচ্ছত্র নেতার মর্যাদা পান। প্রসঙ্গত ইহাও অনস্বীকার্য যে, ঘটনার আবর্তনে সমগ্র বাংগালী জনতাই শেখ সাহেবকে বিনা প্রশ্নে নেতারূপে বরণ করিয়াছিল। অতএব ব্যক্তি-আক্রোশ মিটাইবার মতলবে বিমান বন্দরে লক্ষ জনতার সামনে উপরোক্ত নেতাদের নাম প্রকাশ তাঁহার আদৌ নেতাসুলভ কাজ হয় নাই। ইহা প্রকারান্তরে উপরোক্ত নেতাদের বিরুদ্ধে জনতাকে উস্কাইয়া দেওয়া ছাড়া আর কিছুই

ছিল না।

শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকা বিমান বন্দরের বক্তৃতার ফলে গভর্নর পদ হইতে মোনায়েম খানের অপসারণ ঘটে। বোধহয় ঐ কারণেই প্রেসিডেন্ট আইউব খান প্রফেসর নূরুল হুদাকে ২১শে মার্চ গভর্নর পদে নিয়োগ করেন এবং জনাব হুদা ২৩শে মার্চ (১৯৬৯) তারিখে গভর্নর হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে ১৫ই মার্চ প্রেসিডেন্ট আইউব খান জেনারেল মুসার স্থলে জনাব ইউসুফ হারুনকে পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ইতিমধ্যে দেশের এবং সমাজ জীবনের সর্বত্র জ্বালাও, পোড়াও, ঘেরাও আন্দোলন শুরু হইয়া গিয়াছিল এবং হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, ধর্মঘট পর্যবসিত হইয়াছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে। প্রশাসনে আইন-শৃঙ্খলা বলিয়া কিছুই ছিল না; এমন কি দেশে কোন সরকার আছে বলিয়াও মনে হইত না। বস্তুতঃ সেই সময়ে এইভাবেই ক্রমে ক্রমে উচ্ছৃংখলতা সমাজ জীবনের একমাত্র নিয়ামক শক্তি হইয়া পড়ে; জীবন মূল্যবোধ দ্রুত ধ্বংসের সম্মুখীন হয়; শান্তিপূর্ণ নাগরিক জীবনযাপন প্রচেষ্টা পরিণত হয় বাতুলতায়। সেক্রেটারিয়েটে হরতাল, শ্রমিকদের হরতাল, সরকারী বিভিন্ন বিভাগে হরতাল, শিক্ষক-ছাত্র হরতাল, শিল্প কারখানায় হরতাল, ট্রেনে, বাসে বিনা টিকিটে ভ্রমণ, আবার অসহিষ্ণু, দাংগা-হাংগামায় পারদর্শী রাজনৈতিক কর্মী কর্তৃক বিপক্ষীয় দলীয় নেতা ও কর্মীদের উপর নগ্ন হামলা– ইত্যাদি অবাধে চলিতে থাকে। ১৬ই মার্চ পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত শাহীওয়াল রেলওয়ে স্টেশনে অপেক্ষারত তেজগাঁম ট্রেনে ভ্রমণকালে মওলানা ভাসানীর উপর হামলা চালান হয়। ২৩শে মার্চ (১৯৬৯) ভোরবেলা ঢাকার লালমাটিয়ার নিজ বাড়ীর নিকট হইতে আওয়ামী লীগ কর্মীবৃন্দ কর্তৃক স্ত্রী, কন্যার চোখের সামনে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতা মাহমুদ আলীকে জোরপূর্বক অপহরণ করিয়া ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকার ১৯ নং সড়কে অবস্থিত এক স্টুডিওতে আটক করা হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে কিছু বলিবে না, তাহাকে দিয়া এক অংগীকারপত্রেও বলপূর্বক সহি করানো হয়। এইসব ঘটনায় আমার মতো আন্দোলনমুখী মানুষেরও স্নায়ুমন্ডলী ভীষণভাবে পীড়িত হইতে থাকে। বস্তুতঃ যে রাজনীতিবিদ তথা রাজনৈতিক দল পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা কখনো তাহাদের লক্ষ্য হইতে পারে না; ক্ষমতাই হয় তাদের একমাত্র সর্বোচ্চ লক্ষ্য। তাহাদের নিকট দেশ ও জাতি গৌণ, ক্ষমতাই মুখ্য। ক্ষমতার জন্যই তাহাদের আদর্শের বুলি; নীতি ও আদর্শের জন্য ক্ষমতা নয়।

আইউবের পদত্যাগ

এমনি উচ্ছৃংখল সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ সভ্য জীবনযাপন অসম্ভব হইয়া উঠায় জেনারেল আইউব খান দেশব্যাপী সামরিক শাসন জারি করিবার মনস্থ করেন। কিন্তু তদানীন্তন সেনাবাহিনীর প্রধান ইয়াহিয়া খান তাঁহাকে স্পষ্ট ভাষায় জানান যে, সামরিক শাসন জারি করিতে হইলে,

তাহা করিবে সেনাবাহিনী। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের এই বক্তব্যের প্রচ্ছন্ন ইংগিত কি, তা আইউব বুঝিতে পারিলেন। তাই জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা লিপ্সা মিটাইবার প্রয়োজনে ক্ষমতা হস্তান্তরের অপরিহার্যতায় প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইউব খান ২৪শে মার্চ (১৯৬৯) তারিখে নিম্নলিখিত পত্রে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার অনুরোধ জানান :

President's House,
Rawalpindi, 24th March, 1969
My dear General Yahhya,

It is with profound regret that I have come to the conclusion that all civil administration & constituttional authority in the country have become ineffective. If the situation continues to deteriorate at the present alarming rate all economy, life, indeed the civilised existence will become impossible.

I am left with no option but to step aside & leave it to the Defence Forces of Pakistan which today represent the only effective & legal instrument to take full control of the affairs of this country. They are by the grace of God in a position to retrieve the situation and to save the country from utter chaos and total destruction. They alone can restore sanity and put the country back on the road to progress in a civil and constitutional manner.

Restoration and maintenance of full democracy according to the fundamental principles of our faith and the needs of our people must remain our ultimate goal. In that lies the salvation of our people who are blessed with the highest qualities of dedication and vision and who are destined to play a glorious role in the world.

It is most tragic that while we were well on our way to happy and prosperous future, we plunged into an abyss of senseless agitation. Whatever name may have been used to glorify it, the time will show that this turmoil was deliberately created by well tutored and well backed elements. They made it impossible for the government to maintain any semblance of law and order or to protect the civil liberitics, life & property of the people.

Every single instrument of administration and every medium of expression of saner public opinion was subjected to inhuman pressure. Dedicated but defenceless government functionaries were subjected to ruthless public criticism or blackmail. The result is that social & ethical norms have been destroyed & instruments of Govt. have become inoperative & ineffective.

The economic life of the country has all but collapsed. Workers and labourers are being incited and urged to commit acts of lawlessness and brutality. While demands of higher wages, & amenities are being extracted under threat of violence, production is going down. There has been serious fall in exports and I am afraid the country may soon find itself in the grip of serious inflation.

All this is the result of the reckless conduct of those who acting under the cover of a mass movement struck blow at the very roots of the country during the last few months. The pity is that a large number of innocent but gullible people become victims of their evil design.

I have served my people to the best of my ability under all circumstances. Mistakes there must have been but what has been achieved and accomplished is not negligible. There are some who would like to undo all that I have done and even that which was done by the government before me. But the most tragic & heartrending thought is that there are elements at work which would like to undo even what the Quaid-E-Azam had done namely the creation of Pakistan.

I have exhausted all possible civil and constitutional means to resolve the present crisis. I offered to meet all those regarded as the leaders of the people. Many of them came to a conference recently but only after I had fulfilled all their preconditions. Some declined to come for reasons best known to them. I asked these people to evolve an agreed formula. They failed to do so inspite of days of deliberations. They finally agreed on two points and I accepted both of them. I then offered that the unagreed issues should be referred to the representatives of the people after they had been elected on the basis of direct adult franchise. My argument was that the delegates in the conference who had not been elected by the people could not arrogate to themselves the authority to decide all civil and constitutional issues including those on which even they are not agreeing among themselves.

I thought I would call the National Assembly to consider the two agreed points but it soon became obvious that this would be an exercise in futility. The members of the Assembly are no longer free agents & there is no likelihood of the agreed two points faithfully adopted. Indeed members are being threatened & compelled either to boycott the session or to move such amendments as would liquidate the central government, make the maintenance of the Armed Forces impossible, divide the economy of the

country and break up Pakistan into little bits and pieces. Calling the Assembly in such chaotic conditions can only aggravate the situation. How can any one deliberate coolly and dispassionately on fundamental problems under threat of instant violence?

It is your legal and constitutional responsibility to defend the country not only against external agression but also to save it from internal disorder and chaos. The nation expects you to discharge this responsibility to preserve the security and integrity of the country and to restore normal social, economic and administrative life. Let peace and happiness be borught back to this anguished land of 120 million people. I believe you have the capacity, patriotism, dedication and imagination to deal with the formidable problems facing the country. You are the leader of a force which enjoys the respect and admiration of the whole world. Your colleagues in the Pakistan Air Force and in the Pakistan Navy—many are men of honour and know that you will always have their full support together the Armed Forces of Pakistan must save Pakistan from disintegration.

I should be grateful if you would convey to every soldier, sailor & airman that I shall always be proud of having been associated with them as their supreme Commander.

They must know in this grave hour, they have to act as the custodians of Pakistan. Their conduct and actions must be inspired by the principles of Islam and by the conviction that they are serving the interests of their people.

It has been a great honour to have served the valiant and inspired people of Pakistan for so long a period. May God guide them to move towards greater prosperity and glory.

I must also record my great appreciation of your unswerving loyalty. I know that patriotism has been a constant source of inspiration for you all your life. I pray for your success and for the welfare and happiness of my people. Khuda Hafiz.

Yours sincerly

Sd/- M. A. Khan

General A. M. Yahya Khan

H. Pk. H G. C-in-C Army

General Head Quarters

(অনুবাদ)

প্রেসিডেন্ট ভবন
রাওয়ালপিন্ডি
২৪শে মার্চ, ১৯৬৯

প্রিয় জেনারেল ইয়াহিয়া,

গভীর বেদনার সাথে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, দেশে সমস্ত বেসামরিক প্রশাসন ও শাসনতান্ত্রিক কর্তৃত্ব কার্যকারিতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। যদি বর্তমানের আশংকাজনক গতিতে অবস্থার অবনতি ঘটিতে থাকে তাহা হইলে সভ্যভাবে জীবন ধারণ অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া দেশরক্ষা বাহিনীর কাছে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করা ছাড়া আমার কোন বিকল্প নেই। বর্তমান সময়ে দেশের পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণের জন্য দেশরক্ষা বাহিনীই একমাত্র কার্যকর ও আইনানুগ প্রতিষ্ঠান। খোদা চাহেত অবস্থার পরিবর্তন সাধনপূর্বক পরিপূর্ণ বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাহাদের রহিয়াছে। একমাত্র তাহারাই দেশে সুস্থতা ফিরাইয়া আনিতে পারে এবং বেসামরিক ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশকে অগ্রগতির পথে ফিরাইয়া নিতে পারে।

আমাদের বিশ্বাসের মৌলিক নীতিমালা এবং আমাদের জনগণের প্রয়োজন মোতাবেক পূর্ণ গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ইহা বজায় রাখাই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। ইহার মধ্যেই আমাদের জনগণের মুক্তি নিহিত। আত্মোৎসর্গের শ্রেষ্ঠতম গুণাবলীসমৃদ্ধ আমাদের জনগণের পৃথিবীতে একটি গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রহিয়াছে।

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, যখন আমরা সুখী ও সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হইতেছিলাম তখনই আমরা কান্ডজ্ঞানহীন বিক্ষোভের শিকারে পরিণত হই। ইহাকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য যে নামই ব্যবহার করা হইয়া থাকুক না কেন, সময়ে প্রমাণিত হইবে যে, এই বিক্ষোভ ইচ্ছাকৃতভাবে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে যাহাদিগকে বিপুলভাবে প্রণোদিত করা হইয়াছে এবং মদদ যোগান হইয়াছে। আইন ও শৃঙ্খলার ন্যূনতম চিহ্ন বজায় রাখা কিংবা নাগরিক স্বাধীনতা এবং জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ তাহারা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। প্রশাসনের প্রতিটি অঙ্গ এবং সুস্থ জনমত প্রকাশের প্রতিটি মাধ্যমের উপর অমানবিক চাপ প্রয়োগ করা হয়। ত্যাগী মনোভাবাপন্ন অথচ নিরাপত্তাহীন সরকারী প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ জনগণের ক্রুর সমালোচনা অথবা ব্ল্যাকমেইলের শিকারে পরিণত হয়। ফলে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধগুলি বিনষ্ট হইয়া পড়ে এবং সরকারী যন্ত্র কার্যকারিতা হারাইয়া ফেলে। দেশের অর্থনৈতিক জীবন সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আইন-বহির্ভূত এবং নৃশংস কাজ করিবার জন্য কর্মচারী ও শ্রমিকদিগকে উত্তেজিত

করা হইতেছে। একদিকে সন্ত্রাসের হুমকির মুখে অধিক পারিশ্রমিক, বেতন ও সুযোগ সুবিধা আদায় করা হইতেছে অন্যদিকে উৎপাদন হ্রাস পাইতেছে। রফতানী ক্ষেত্রে মারাত্মক অবনতি ঘটিয়াছে এবং আমার আশংকা অতিসত্ত্বরই দেশ মারাত্মক মুদ্রাস্ফীতির কবলে নিপতিত হইবে।

এইসব হইতেছে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের নৈরাজ্যমূলক আচরণের ফল যাহারা গত কয়েক মাস ধরিয়া গণআন্দোলনের নামে দেশের ভিত্তিমূলে একটির পর একটি আঘাত হানিতেছে। দুঃখের বিষয়, বিপুল সংখ্যক নির্দোষ লোক এই অসৎ পরিকল্পনার শিকারে পরিণত হইয়াছে।

সকল অবস্থার মধ্যে আমি আমার ক্ষমতা অনুযায়ী দেশবাসীর খেদমত করিয়াছি। অবশ্য যথেষ্ট ভুলভ্রান্তি রহিয়াছে কিন্তু যাহা অর্জন করা হইয়াছে তাহাও নগণ্য নয়। এমন অনেকে আছেন যাহারা আমি যাহা করিয়াছি এমনকি পূর্বতন সরকার যাহা করিয়াছে তাহাকে ব্যর্থ করিয়া দিতে চাহিবে। কিন্তু সবচাইতে দুঃখজনক ও হৃদয়বিদারক চিন্তা হইল যে, এমন অনেকে এখন ক্রিয়াশীল রহিয়াছে যাহারা কায়েদে আযমের অবদান অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টিকেও ব্যর্থ করিয়া দিতে চাহিবে।

বর্তমান সংকট নিরসনের জন্য আমি সকল বেসামরিক ও শাসনতান্ত্রিক পন্থা প্রয়োগ করিয়াছি। যাহারা জনগণের নেতা হিসাবে পরিচিত তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার প্রস্তাব দিয়াছি। সম্প্রতি তাঁহাদের অনেকে একটি কনফারেন্সে যোগ দিয়াছিলেন তখনই যখন আমি তাঁহাদের সকল পূর্বশর্ত পূরণ করিয়াছিলাম। কয়েকজন উক্ত কনফারেন্সে যোগ দিতে অস্বীকার করিয়াছেন; এই অস্বীকৃতির কারণ তাঁহাদেরই ভাল জানা। একটি সর্বস্বীকৃত ফর্মূলা উদ্ভাবন করিবার জন্য আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম। কয়েকদিনের আলোচনা সত্ত্বেও তাঁহারা উহা করিতে পারেন নাই। শেষ পর্যন্ত তাঁহারা দুইটি বিষয়ে একমত হইয়াছিলেন এবং আমি ঐ দুইটি বিষয়ই গ্রহণ করিয়াছিলাম। তারপরে আমি প্রস্তাব দিয়াছিলাম, যে সমস্ত বিষয়ে মতৈক্য হয় নাই সেইগুলি প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে যখন জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হইয়া আসিবেন তখন তাঁহাদের বিবেচনার জন্য পেশ করা হইবে। আমার যুক্তি ছিল– এই কনফারেন্সে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ যাঁহারা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন নাই তাঁহারা সকল বেসামরিক ও শাসনতান্ত্রিক বিষয় ও নিজেদের মধ্যে যে সমস্ত বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই সেইগুলির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দাবী করিতে পারেন না।

যে দুইটি বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেইগুলি বিবেচনার জন্য জাতীয় পরিষদ আহবান করিবার কথা আমি চিন্তা করিয়াছিলাম কিন্তু ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, ইহা নিরর্থক প্রচেষ্টা। পরিষদের সদস্যরা আর স্বাধীন প্রতিনিধি নন এবং যে দুইটি বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেইগুলি বিশ্বস্ততার সহিত গৃহীত হয় এমন কোন সম্ভাবনা নাই। প্রকৃতপক্ষে পরিষদ সদস্যদেরকে এই মর্মে হুমকি প্রদানেও বাধ্য করা

হইতেছে যাহাতে তাঁহারা হয় অধিবেশন বয়কট করেন অথবা এমন সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করেন যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার বিলুপ্ত হইয়া যায়, সশস্ত্র বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ অসম্ভব হইয়া পড়ে, দেশের অর্থনীতি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়ে এবং পাকিস্তান ছোট ছোট খন্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এমন একটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে জাতীয় পরিষদ আহ্বান করিবার অর্থই হইতেছে পরিস্থিতিকে আরও সংকটাপন্ন করিয়া তোলা।

শুধু বিদেশী আগ্রাসনই নয় বরং আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা হইতে দেশকে রক্ষা করিবার আইনগত ও শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব আপনার। জাতি আশা করে, দেশের নিরাপত্তা ও অখন্ডতা বজায় রাখা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আপনি এই দায়িত্ব পালন করিবেন। ১২ কোটি মানুষের এই বিক্ষুব্ধ দেশে শান্তি ও সুখ ফিরিয়া আসুক। আমি বিশ্বাস করি, দেশের বর্তমান কঠিন সমস্যা মোকাবেলা করিবার মতো ক্ষমতা, দেশপ্রেম, ত্যাগী মনোভাব ও প্রজ্ঞা আপনার রহিয়াছে। আপনি এমন এক বাহিনীর নেতা যার সমগ্র বিশ্বে সম্মান রহিয়াছে। পাকিস্তান বিমান বাহিনী ও নৌ-বাহিনীর আপনার সহকর্মীদের অনেকেই সম্মানিত ব্যক্তি এবং আমি জানি, আপনি সর্ব সময়েই তাঁহাদের সমর্থন পাইবেন। পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীকে অবশ্যই বিচ্ছিন্নতার হাত হইতে পাকিস্তানকে রক্ষা করিতে হইবে।

প্রতিটি সৈনিক, নাবিক ও বৈমানিকের নিকট আপনি এই কথা পৌঁছাইয়া দিবেন যে, তাহাদের সুপ্রীম কমান্ডার হিসাবে তাহাদের সহিত সম্পর্কিত হওয়াতে আমি গর্বিত; সেই জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।

তাহাদের জানা উচিত, বর্তমান সংকটাপন্ন মুহূর্তে তাহাদিগকে পাকিস্তানের রক্ষক হিসাবে কাজ করিতে হইবে। তাহাদের আচরণ ও কাজ ইসলামের নীতিমালা ও জনগণের স্বার্থ রক্ষার মনোবৃত্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। দীর্ঘকাল ধরিয়া পাকিস্তানের সাহসী ও অনুপ্রাণিত জনগণের খেদমত করিতে পারিয়া আমি পরম সম্মানিত বোধ করিতেছি। আল্লাহ তাঁহাদিগকে অধিকতর অগ্রগতি ও গৌরবের পথে পরিচালিত করুন।

আপনার দ্বিধাহীন আনুগত্যের কথাও আমি পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করিতেছি। আমি জানি, আপনার সমগ্র জীবনে দেশপ্রেমই হইতেছে সর্বময় প্রেরণার উৎস। আমি আপনার সাফল্য এবং আমার দেশবাসীর কল্যাণ ও সুখের জন্য দোয়া করি। খোদা হাফেজ।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বা/- এম. এ খান

ইয়াহিয়ার আগমন

ফিল্ড মার্শাল আইউব খানের পত্র প্রাপ্তির পর সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া

খান ২৫শে মার্চ (১৯৬৯) সন্ধ্যা ৭-১৫ মিনিটে সমগ্র দেশে সামরিক আইন জারি করেন; সংবিধান বাতিল করেন, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন, গভর্নর ও মন্ত্রীদের স্ব-স্ব পদ হইতে অপসারণ করেন এবং সমগ্র দেশকে দুইটি সামরিক আইন অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানকে মার্শাল ল' জোন 'এ' ও পূর্ব পাকিস্তানকে মার্শাল ল' জোন 'বি' করা হয়। লেঃ জেঃ আতিকুর রহমান ও মেজর জেনারেল মোজাফফর উদ্দিনকে যথাক্রমে জোন 'এ' ও জোন 'বি'-এর সামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়।

জেনারেল ইয়াহিয়া ২৬শে মার্চ জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে, দেশবাসীকে প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ কর্তৃক সংবিধান প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি দেন।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে, ফিল্ড মার্শাল আইউব খান ইস্তফা দিলেন কেন এবং সাংবিধানিক পথে বেসামরিক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিলেন না কেন? আমার স্পষ্ট মত, প্রেসিডেন্ট আইউব খানের ক্ষমতার মূল উৎস (পাওয়ার বেস) ছিল সেনাবাহিনীর ছাউনী, জনতা নয়। অতএব উচ্চাভিলাষী সামরিক জেনারেলরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সত্যিকারের জনপ্রতিনিধিদের নিকট হস্তান্তরের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ক্ষমতাপিপাসু উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীদের প্রচন্ড চাপের মুখে প্রেসিডেন্ট আইউব খানকে ক্ষমতা ত্যাগ করিতে হয়; এবং সামরিক জান্তার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে হয়। আমার আরও অভিমত, আইউবের ক্ষমতা হস্তান্তরের পশ্চাতে নিম্নলিখিত কার্যকারণসমূহ সক্রিয় ছিল। যথা–

(১) জাতীয়, আন্তর্জাতিক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী বশংবদ, (২) ক্ষমতাভিলাসী সামরিক-বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারী, (৩) বিদেশী অর্থপুষ্ট ক্ষমতাপিপাসু রাজনীতিবিদ, (৪) পরস্পর বিবাদমান ক্ষমতাপিপাসু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং (৫) দিল্লীচক্রের বশংবদ ও অখণ্ড ভারত সমর্থকবৃন্দের ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ। উহারাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভুত্বব্যঞ্জক আইউব সরকারের জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশবাসীর পুঞ্জীভূত রোষের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া সমগ্র দেশে অরাজকতার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। প্রেসিডেন্ট আইউব খান ব্যক্তি শাসন প্রতিষ্ঠায় ব্রতী না হইয়া যদি জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বশীল সংসদ ও সরকার গঠনে প্রয়াসী হইতেন, তাহা হইলে ঘটনাপ্রবাহ নিঃসন্দেহে ভিন্ন হইতে পারিত। অন্ততঃ লেলিহান অগ্নিশিখায় দেশ ও জাতিকে নিক্ষেপ করিয়া অকস্মাৎ তাঁহাকে বিদায় নিতে হইত না, যেই লেলিহান শিখায় পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, সেই লেলিহান শিখায় দেশ ও জাতিকে তেমনি মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন হইতে হইত না।

৩১শে মার্চ প্রক্লামেশন (ঘোষণা) অনুযায়ী প্রধান সামরিক আইন শাসনকর্তা জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ২৫শে মার্চ সন্ধ্যা ৭-১৫ মিঃ হইতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। যতটুকু মনে পড়ে, জেনারেল

ইয়াহিয়া ১৯৬৮ সালে ব্যাংককে সাংবাদিকের প্রশ্নোত্তরে এক অসতর্ক মুহূর্তে নিজেকে পাকিস্তানের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং ঘটনাপ্রবাহে এইভাবেই তিনি সেই বহু আকাঙ্খিত পদে আসীন হন। এই সময়ে পরিবর্তিত নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমরা একটি নূতন রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। গণতন্ত্র হইল এই নূতন রাজনৈতিক দলটির জীবন দর্শন বা কর্মপদ্ধতি। স্বচ্ছ রাজনীতিতে বিশ্বাসী এবং ডান, বাম ও ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে সচেতন এইরূপ রাজনীতিকদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২০শে জুলাই (১৯৬৯) ইডেন হোটেলে। জনাব খয়রাত হোসেনের সভাপতিত্বে এই সম্মেলনেই আমরা ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ লীগ গঠন করি।

২৮শে নভেম্বর জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে জেনারেল ইয়াহিয়া খান কতিপয় সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যথা– (১) পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ বিলুপ্তি এবং তদস্থলে সাবেক অবলুপ্ত প্রদেশগুলি পুনর্বহাল, (২) এক ব্যক্তি এক ভোট ভিত্তিতে জনসংখ্যানুপাতে নির্বাচন অর্থাৎ সংখ্যাসাম্যনীতির অবলুপ্তি, (৩) ফেডারেল পার্লামেন্টারী গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা, (৪) নূতন নির্বাচিত গণপরিষদ কর্তৃক প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনা ও সংবিধান রচনার পর গণপরিষদের জাতীয় সংসদে রূপান্তর, (৫) ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারি হইতে প্রকাশ্য রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, (৬) সংবিধান রচনা অবধি সামরিক আইন বলবৎ এবং (৭) ৫ই অক্টোবর (১৯৭০) জাতীয় পরিষদের নির্বাচন।

লিগাল ফ্রেম ওয়ার্ক

২৮শে মার্চ (১৯৭০) ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত অপর এক ভাষণে ২২শে অক্টোবরের মধ্যে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তাহার এই বেতার ভাষণ মোতাবেক ৩০শে মার্চ (১৯৭০) আইনগত কাঠামো আদেশ (LEGAL FRAME WORK ORDER) প্রকাশিত হয়।

আইনগত কাঠামো আদেশে জাতীয় পরিষদ সদস্য সংখ্যা জনসংখ্যাভিত্তিক নিম্নলিখিতভাবে নির্ধারিত হয় :

পূর্ব পাকিস্তান	সাধারণ আসন ১৬২	মহিলা আসন ৭
পাঞ্জাব	,, ,, ৮২	,, ,, ৩
সিন্ধু	,, ,, ২৭	,, ,, ১
বেলুচিস্তান	,, ,, ৪	,, ,, ১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	,, ,, ১৮	,, ,, ১
কেন্দ্রীয় শাসিত উপজাতীয় এলাকা	,, ,, ৭	,, ,, ০
সর্বমোট	৩০০	১৩

প্রাদেশিক পরিষদ		
পূর্ব পাকিস্তান	,, ,, ৩০০	,, ,, ১০
পাঞ্জাব	,, ,, ১৮০	,, ,, ৬
সিন্ধু	,, ,, ৬০	,, ,, ২
বেলুচিস্তান	,, ,, ২০	,, ,, ১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	,, ,, ৪০	,, ,, ২

মহিলা সদস্যগণ স্ব-স্ব প্রদেশ হইতে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যবৃন্দ দ্বারা, এবং প্রাদেশিক পরিষদে সংরক্ষিত মহিলা আসন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনায় ব্যর্থ হইলে অথবা জাতীয় পরিষদ কর্তৃক রচিত সংবিধান প্রেসিডেন্টের অথেনটিকেশন (Authentication) না পাইলে জাতীয় পরিষদ অবলুপ্ত বিবেচিত হইবে, তবে ১০০ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনা করিতে সমর্থ হইলে এবং প্রেসিডেন্টের অথেনটিকেশন পাইলে জাতীয় পরিষদ পূর্ণ মেয়াদের জন্য কাজ করিবে।

আজগর খানের সহিত আলোচনা

জাস্টিস পার্টি গঠন করিবার পর এয়ার মার্শাল আসগর খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন এবং বিভিন্ন নেতার সহিত আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। জনাব আতাউর রহমান খানের সহিতও তাঁহার সামগ্রিক রাজনীতি সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা হয়। সন্তোষজনক প্রাথমিক আলোচনার পর এয়ার মার্শাল আসগর খান আমাদিগকে লাহোর সফরে আমন্ত্রণ জানান। সেই আমন্ত্রণ মোতাবেক রাজনৈতিক আলোচনার উদ্দেশ্যে জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব নূরুর রহমান ও আমি ৯ই মে লাহোর গমন করি। আমরা লাহোরে জনাব মনজার বশীর সাহেবের আতিথ্য গ্রহণ করি। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও অন্যান্য ভারত বিখ্যাত নেতৃবৃন্দও অতীতে ঐ বাড়ীতেই আতিথ্য গ্রহণ করিতেন।

১০ই মে জাস্টিস পার্টি নেতৃবৃন্দের সহিত দীর্ঘ বৈঠকের প্রস্তুতি হিসাবে আমাদের চিন্তার সহিত পরিচয় করাইবার প্রয়াসে ৯ই মে দিবাগত রাত্রে এয়ার মার্শাল আসগর খান ও তাঁহার সহকর্মী বন্ধুবর্গের অবগতির জন্য আমাদের তৈরী খসড়া "OUR APPROACH TO PAKISTAN'S POLITICAL PROBLEMS" শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের হাতে দেই। ১০ই মের বৈঠকে 'দুই অর্থনীতির রাষ্ট্র' (TWO ECONOMY STATE CONCEPT) সংক্রান্ত ধারণা ও সমাজতন্ত্র (SOCIALISM) তাঁহারা গ্রহণ করিতে মোটেই সম্মত হন নাই। দীর্ঘ আলোচনায় আমার ধারণা হইয়াছে, লাহোরের রাজনৈতিক আকাশ পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডত্ব ও সংহতির প্রশ্নে অত্যন্ত মেঘাচ্ছন্ন।

লাহোর আলোচনা অসমাপ্ত রহিল। ১১ই মে লাহোর হইতে আমরা পেশোয়ার গমন করি। পেশোয়ারে জনাব আতাউর রহমান খান ও এয়ার মার্শাল আসগর খানের মধ্যে দ্বিতীয় দফা বৈঠক হয়। বৈঠকে জনাব নূরুল আমিন ও অন্যান্যের সহিত রাজনৈতিক একাত্মতা গড়িয়া তুলিবার জন্য এয়ার মার্শাল প্রস্তাব দেন।

পেশোয়ারে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্দার আবদুর রশিদ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নেতা খান আবদুল ওয়ালী খানের সহিতও রাজনৈতিক পরিস্থিতি-সম্পর্কে আমাদের মত-বিনিময় হয়।

পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্কিওলজীর প্রফেসর ডঃ আহমদ হাসান দানী আমাদের সহিত আলোচনাকালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান ও বিচ্ছিন্নতা বনাম রাষ্ট্রীয় সংহতির আলোকপাত করিতে গিয়া মন্তব্য করেন যে, ইতিহাসের গতিতে পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত দুইটি সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইবে।

সীমান্ত নেতা খান আবদুল ওয়ালী খানের সহিত বৈঠকেও ইহার একটি চমৎকার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই যে, যেমন পাঞ্জাব কুচক্রী মহলের স্বার্থে একদিন চারটি প্রদেশের বিলুপ্তি ঘটাইয়া এক ইউনিট অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ গঠন করা হইয়াছিল, ঠিক তেমনি কোন কোন স্বার্থান্বেষী মহল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়াসে দলিল তৈরী করিতেছে। ১৩ই মে পেশোয়ার হইতে রাওয়ালপিন্ডি পৌছি। রাওয়ালপিন্ডিতে নওয়া-ই-ওয়াকত সম্পাদক হামিদ আখতারের সহিত মতবিনিময় হয়। জাস্টিস পার্টি সদস্য অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার রাজা সকল রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার ইন্তেজাম করেন। তিনি বড় অতিথিপরায়ণ, বয়স ষাট, কিন্তু অত্যন্ত কর্মঠ।

১৪ই মে, সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ পুনরায় লাহোর এবং ১৫ই মে লাহোর হইতে বিমানে করাচী পৌছি। ১৫ই হইতে ২০শে মে অবধি আমরা করাচী অবস্থান করি এবং করাচীতে আমরা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তনয়া মিসেস আখতার সোলায়মান; পাকিস্তান মুসলিম লীগ নেতা হাসান এ শেখ, পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক আমজাদ আলী শাহ, 'জিয়ে-সিন্দ' আন্দোলনের নেতা ঝানু পার্লামেন্টারিয়ান জিএম সৈয়দ ও প্যাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর সহিত মত-বিনিময় করি। ১৭ই মে আমরা সিন্ধু প্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদ সফরে যাই এবং জনাব কেবি জাফরের আতিথ্য গ্রহণ করি।

২০শে মে জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর সহিত জনাব আতাউর রহমান খান ও আমার তিন ঘন্টাব্যাপী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংবিধানিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। দুই অর্থনীতি, সমাজতন্ত্র, দেশ রক্ষানীতি, এক ইউনিট বাতিল ও করাচী ফেডারেল এলাকা ঘোষণা প্রশ্নে আমাদের মধ্যে মোটামুটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

আলোচনা প্রসঙ্গে জনাব ভুট্টো হইতে আমরা অবহিত হই যে, ১৯৬৯ সালের ১০ই মার্চ পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর

সহিত তাঁহার নিম্নোক্ত ত্রি-বিষয়ে সমঝোতা হইয়াছে :

১) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বীকৃত দাবীর ভিত্তিতে জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা;

২) পাকিস্তানের আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সমাজতন্ত্র কায়েম এবং

৩) সর্বপ্রকার বিদেশী স্বার্থ বিলুপ্তি, সর্বপ্রকার উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদের বিরোধিতা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা, কেন্দ্রীয় চুক্তি সংস্থা ও সকল সামরিক চুক্তি হইতে সদস্যপদ প্রত্যাহার।

আলোচনায় ইহাও জানিতে পারি যে, মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক কার্যকলাপের সহিত একমত হইতে না পারায় জনাব ভুট্টো উপরে বর্ণিত সমঝোতা সত্ত্বেও মওলানা ভাসানীর সহিত দূরত্ব বজায় রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

করাচীতে প্রবাসী বাঙ্গালীদের সহিত আলোচনার জন্য আমি করাচীর ড্রিগ রোডে গমন করি। বাঙ্গালী প্রবাসীদের ধারণায় শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা আন্দোলনে আমাদের শরীক হওয়া উচিত, ইহার অন্যথা করিবার অর্থ বাঙ্গালী স্বার্থে আঘাত হানা এবং পশ্চিম পাকিস্তানী কুচক্রী শাসক-শোষকের হাত প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে জোরদার করা।

পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানবাসীর একটি মাত্র প্রশ্ন, পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব ও সংহতি বজায় থাকিবে কি থাকিবে না। অখণ্ডত্ব ও সংহতি বজায় রাখিবার খাতিরে তাহারা প্রচলিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের ঘোর বিরোধী; অর্থাৎ শোষণ-শাসনের যন্ত্র অবিকল থাকিবে। অন্য কথায় সমগ্র দেশের অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসকারীদের যে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হইয়াছে, সেই বাস্তব সত্যকে অম্লানবদনে স্বীকৃতি দিয়া সমস্যা-সংকট নিরসনের জন্য কুসংস্কার বর্জিত বদ্ধমূল ধারণামুক্ত জ্ঞানালোকসম্পন্ন উচ্চ চিন্তা প্রণোদিত প্রজ্ঞা প্রদর্শনে পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিবিদরা পুরাপুরিভাবেই ব্যর্থ হইয়াছেন। ইহাই আমার তিক্ত ও দৃঢ় মত। বস্তুতঃ একই ভিটায় সমঝোতার সহিত দুই ভাইয়ের সহঅবস্থানের উচ্চ মন ও হৃদয় পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিবিদদের ছিল না।

পশ্চিম পাকিস্তানে সমগ্র সফরই জাস্টিস পার্টির নেতৃবৃন্দ ও কর্মীবৃন্দের সতর্ক ও আন্তরিক তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। করাচী জাস্টিস পার্টির চেয়ারম্যান মিসেস সাদী জমিরের আন্তরিকতা, অতিথিপরায়ণতা ও সেবা আমাদিগকে অত্যন্ত মুগ্ধ করে। করাচীতে যেমনি দলীয় মহলে তেমনি করাচীবাসীর মধ্যে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন।

এরপর এয়ার মার্শাল আসগর খানের নেতৃত্বে জাস্টিস পার্টির একটি প্রতিনিধি দল ঢাকায় আগমন করেন। হোটেল শাহবাগে অবস্থান করেন, প্রাথমিক আলোচনার জন্য জনাব আতাউর রহমান খাঁনের নেতৃত্বে জনাব নূরুর রহমান, ইকবাল আনসারী খাঁন, ফেরদৌস আহমদ কোরেশী, আনিসুর রহমান ও আমি হোটেল শাহবাগে উক্ত প্রতিনিধি দলের সহিত বৈঠকে বসি। তাঁহাদের সম্মানে ১৬ই জুন হোটেল পূর্বাণীতে জনাব

আতাউর রহমান খান এক নৈশভোজের আয়োজন করেন। দুই নেতা এয়ার মার্শাল আসগর খাঁন ও আতাউর রহমান খান আমাদিগকে অর্থাৎ সর্বজনাব মোখলেছুজ্জামান খান, নূরুর রহমান ও আমি (পূর্ব পাকিস্তান) এবং আবু সৈয়দ আনোয়ার ও মঞ্জুর বশীর (পশ্চিম পাকিস্তান)কে আলোচনার জন্য মনোনীত করেন। তদানুযায়ী আমরা ২০শে জুন জনাব মোখলেছুজ্জামান খানের বাসভবনে মিলিত হই এবং জনাব আতাউর রহমান খানের সাত দফা ও "our approach to Pakistan's political problems"–এ আমাদের লিখিত বক্তব্য পুংখানুপুংখরূপে আলোচনা করি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের সেই আলোচনা ফলপ্রসূ হয় নাই। পক্ষান্তরে আসগর খানের সহিত পি.ডি.এম নেতৃবৃন্দের মতৈক্য প্রতিষ্ঠা হওয়ায় তাহারা সম্মিলিতভাবে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেপ্টেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত কনভেনশনে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি গঠিত হয়। অবশ্য রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ আসগর খান কনভেনশনের অব্যবহিত পরে নব গঠিত পি.ডি.পি হইতে পদত্যাগ করেন এবং এককভাবে পাকিস্তান তাহরিক-এ-ইসতেকলাল পার্টি গঠন করেন।

দুঃখজনক হইলেও ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, ভারত হইতে আগত অবাঙ্গালী মোহাজের শ্রেণী স্থানীয় বাসিন্দাদের সহিত একাত্ম হইতে পারে নাই। ফলে স্থানীয়দের সহিত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাহাদের তিক্ততা এত বৃদ্ধি পায় যে, অবশেষে ঢাকায় বাংলা ভাষাভাষী ও উর্দু ভাষাভাষীদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধে। রক্তাক্ত দাঙ্গা বন্ধ করিবার মানসে আমরা, তাজউদ্দিন আহমদ (সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ), খন্দকার মোশতাক আহমদ (সহ-সভাপতি, ঐ), মোজাফফর আহমদ (সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি), সৈয়দ আলতাফ হোসেন (সাধারণ সম্পাদক, ঐ), পীর হাবিবুর রহমান (ঐ, ন্যাপ), নূরুর রহমান (ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ লীগ) ও আমি (ঐ), জনাব আতাউর রহমান খানের বাসভবনে ৩রা নভেম্বর এক সভায় মিলিত হই। সভা হইতে আমরা গভর্নমেন্ট হাউসে গমন করি এবং প্রাদেশিক গভর্নর রিয়ার এডমিরাল আহসানকে শান্তি বজায় রাখিবার জন্য প্রাশসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাই।

উল্লেখ্য যে, এই বাঙ্গালী অবাঙ্গালী দাঙ্গার পিছনে ইন্ধন যোগাইয়াছিল সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষ করিয়া আওয়ামী লীগের একটি অতি উৎসাহী অবিবেচক অংশের রাজনীতি। তখনকার দিনে একমাত্র আওয়ামী লীগই বাঙ্গালী জনতার ব্যাপক আস্থাভাজন ছিল এবং আওয়ামী লীগের পিছনে বাঙ্গালী জনতার সার্বজনীন সমর্থনের মূলেও ছিল এই অবাঙ্গালী বিদ্বেষ ও তদসম্পর্কে সর্বগ্রাসী প্রচারণা।

ইয়াহিয়া-মুজিব আঁতাত

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আঁতাতের ফলে ৩০শে মার্চ ঘোষিত আইনগত কাঠামো আদেশের বিরুদ্ধে

কোন প্রকার সক্রিয় আন্দোলন সম্ভব হয় নাই। পক্ষান্তরে এই আঁতাতের দরুন সরকারও ৬ দফাভিত্তিক নির্বাচনী প্রচারণায় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া স্বীয় ঘোষিত আইনগত কাঠামো আদেশের পরিপন্থী কাজ করিতে দ্বিধা করেন নাই। বস্তুতঃ এই ব্যাপারে সরকার স্পষ্টতঃ দ্বিমুখী নীতিই অনুসরণ করিয়াছিলেন। হয়তো এইভাবেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান উক্ত ছককাটা রাজপথে শেখ সাহেবের সহিত ক্ষমতা ভাগাভাগি করিবার ও ভোগ করিবারই চিন্তা করিয়াছিলেন। কেননা ইহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না যে, আওয়ামী লীগের '৬ দফা' ও আইনগত কাঠামো আদেশ ছিল পরস্পর পরিপন্থী।

ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ লীগ

ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ লীগ নূতন সংগঠন। সর্বস্তরে পরিচিত নয় বিধায় এই সংগঠনের মাধ্যমে একক আন্দোলন করা সম্ভব ছিল না। তাই আমি পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান মওলানা ভাসানীর সহিত ২০শে এপ্রিল (১৯৭০) ঢাকায় সাক্ষাৎ করি। আলোচনার পর তিনি কয়েকদিনের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাইবার অভিমত প্রকাশ করেন; কিন্তু সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাইবার প্রয়োজন বাকী জীবনে বোধ করেন নাই। আমাদের অনেক নেতারই মুখ ও পেটের মধ্যে এই ধরনের গরমিল বলিয়াই কি দেশ কি জাতি পুনঃপুনঃ জুলুমের শিকার হইয়াছে; এবং দেশ ও জাতির অমানিশা বা দুঃখ রজনী কখনও কাটে নাই। এই সময়ে খুলনার খালিশপুর শিল্প এলাকার শ্রমিকদের জনপ্রিয় শ্রমিক নেতা জনাব আশরাফ হোসেন ও জনাব আবদুল বাতেনকে গ্রেফতার করিয়া খুলনা জেলা কারাগারে আটক করিলে মজদুর ফেডারেশনের খুলনা আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি আনিসুর রহমানের নেতৃত্বে হাজার হাজার শ্রমিক খুলনা জেলা কারাগার ঘেরাও করে। ঘেরাও ২৩ ঘন্টা অতিক্রম করিবার পর পরিস্থিতি হঠাৎ মোড় নেয় এবং ৩১শে মে ভোর রাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও শ্রমিকদের মধ্যে অপ্রীতিকর সংঘর্ষ হয়। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে বহু শ্রমিক আহত হয়। উদ্ভূত তিক্ত পরিস্থিতি সরেজমিনে তদন্তের জন্য আমি খুলনা গমন করি। যাহা হউক, আমার উপস্থিতি শান্তরূপ ধারণে সহায়ক হয়। বেসামরিক জেলা কর্তৃপক্ষ অনেকটা নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করিলেও সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ ব্রিগেডিয়ার সাহেব জানান যে, একমাত্র সামরিক আইন প্রশাসকই সামরিক বিধি মামলা প্রত্যাহার করিতে পারেন। শ্রমিক এলাকায় শান্ত আবহাওয়া সৃষ্টির প্রয়াসেই আমরা সামরিক, বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করিয়া নিউজপ্রিন্ট পেপার মিলস যথারীতি চালু করিতে অনুরোধ করি।

সামরিক শাসনের আওতায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পটভূমিকায় ১লা ও ২রা আগস্ট (১৯৭০) ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ লীগের জাতীয় মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন দলীয় ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র অনুমোদন করে। ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ লীগের

নাম পরিবর্তন করিয়া ন্যাশনাল লীগ রাখা হয়। জনাব আতাউর রহমান খান ও শাহ আজিজুর রহমান যথাক্রমে পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং জনাব আতাউর রহমান ও আমি যথাক্রমে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হই। কিন্তু ২রা আগস্ট বৈকালিক সমাপ্তি অধিবেশনে জনাব আতাউর রহমান খান কোন প্রকার ভূমিকা ছাড়াই দলীয় কর্মকর্তাদের নাম প্রস্তাব করিলে সাধারণ কাউন্সিল অধিবেশনে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। প্রস্তাব সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করিয়াই জনাব আতাউর রহমান খান তাঁহার গঠিত কর্মকর্তা তালিকা গৃহীত ঘোষণা করিয়া মঞ্চ হইতে অবতরণ করেন ও প্রস্থান করেন। একটু ধৈর্য, একটু সহনশীলতা, একটু নমনীয়তা, একটু বিচক্ষণতা ও একটু প্রজ্ঞা প্রদর্শন করিলেই সমস্যার মীমাংসা তৎক্ষণাৎ হইয়া যাইত। উত্তরকালে সংগঠনটি ছিন্নভিন্ন হইত না, দ্বিধাবিভক্ত হইত না, সংগঠনে তিক্ততা ও কোন্দল দেখা দিত না এবং দেশ অতি প্রয়োজনীয় পরিচ্ছন্ন রাজনীতির নেতৃত্ব পাইতে পারিত। নেতারা তাহা করিবেন কেন? সবাই আপন আপন স্তরে এক একজন ক্ষুদে হিটলার যে। আমরা বাঙ্গালী, পরশ্রীকাতরতা আমাদের বাঙ্গালী চরিত্রের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ, আমরা সর্বদাই ব্যক্তি নেতৃত্ব, ব্যক্তি প্রাধান্য ও ব্যক্তি পূজার আকাঙ্খী, তাই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কোন্দলই আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাই নীতি ও আদর্শপ্রসূত কার্যক্রমের অবস্থান বহুক্রোশ দূরে। নীতি-আদর্শের পার্থক্য মত ও পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং ইহাই স্বাভাবিক। কেতাবে, বাক্যে, বুলিতে আমাদের মুখে নীতি আদর্শের খই ফোটে; কিন্তু ব্যক্তি জীবনে যেমন, গোষ্ঠী জীবনেও তেমনি ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ একমাত্র লক্ষ্য হইয়া থাকে। ইহা দুঃখজনক কিন্তু নির্মম সত্য।

বাংলা মজদুর ফেডারেশনের ভূমিকা

১৯৬৪ সালে জনাব এ. আর. সুন্যামত ও দেওয়ান সিরাজুল হককে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, জনাব আশরাফ হোসেন, রুহুল আমিন ভূঁইয়া ও এজাজ আহম্মদকে সহ-সম্পাদক এবং আনিসুর রহমানকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশন ইস্ট জোন গঠন করা হয়। এই সংগঠনটি প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এই সংগঠনের নেতা জনাব আশরাফ হোসেন ও আনিসুর রহমানের নেতৃত্বে খুলনায়, আবদুল বাতেন-এর নেতৃত্বে মংলা পোর্টে, আমিনুর রহমান (মল্লিক), গোলাম মোস্তফা (বাটুল), রেজাউল হক সরকার (রানার) নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গে, জনাব রুহুল আমিন ভূঁইয়া, আনসার হোসেন (ভানু) নেতৃত্বে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে, আঃ জলিলের নেতৃত্বে ডেমরা শিল্পাঞ্চলে, দেওয়ান সিরাজুল হক, ফজলুর রহমান খাঁ, মোঃ সেলিম হোসেন, আলী আকবর, আজিজুল হক মুক্তর নেতৃত্বে সড়ক পরিবহন শিল্পে গভর্নর মোনায়েম খানের বাড়ী ঘেরাওসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় নেতৃবৃন্দের মুক্তি আন্দোলন, ৬ দফা আন্দোলন, ৭ই জুনের আন্দোলন, ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন, জঙ্গী

রূপ ধারণ করে। স্বাধীনতা আন্দোলনে এই সংগঠনটির নেতাকর্মীদের ত্যাগ অপরিসীম। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রশ্নে জাতীয় লীগ দ্বিধা-বিভক্ত হলে এই সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের আগ্রহে কুমিল্লা টাউন হলে জাতীয় লীগের সম্মেলনে 'বাংলা জাতীয় লীগ' নামকরণ করা হয়। বাংলা জাতীয় লীগ, বাংলা মজদুর ফেডারেশন ও ফরোয়ার্ড স্টুডেন্ট ব্লক সমন্বয়ে বাংলা মুক্তি ফ্রন্ট গঠন করে। মুক্তি ফ্রন্টের অনেক ইপিআরটিসির অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর লোকেরা অস্ত্র সংগ্রহের জন্য সরকারের আহবানে সামরিক বাহিনীতে পুনরায় যোগদান করে। ২৫শে মার্চের রাত্রে ক্যান্টনমেন্টে অস্ত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে ১৮ জন জোয়ান প্রাণ হারায়। কুমিল্লা মুক্তি ফ্রন্টের কর্মী শিব নারায়ণ দাসের তৈরি পতাকা ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রথম কুমিল্লা ইপিআরটিসির ডিপোর সামনে আবদুস সালাম, আবদুর রশিদ, আলী আজগর ও শিবনারায়ণ দাসের নেতৃত্বে উত্তোলন করে। যাহা পরবর্তীতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঢাকার পল্টন ময়দানে আ.স.ম. আবদুর রব-এর নেতৃত্বে উত্তোলিত হয়। কুমিল্লা মুক্তি ফ্রন্টের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহ থেকে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া ডিগ্রী কলেজের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন হাবিলদার জনাব আবদুস সালামের নেতৃত্বে ইউটিসির রাইফেল দ্বারা মুক্তি পাগল ছাত্র শ্রমিক যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যার ফলে ২৫শে মার্চ কাল রাত্রে ঢাকার সাথে একই সঙ্গে কুমিল্লা ইপিআরটিসি বর্তমান বিআরটিসি ডিপোতে ভিক্টোরিয়া কলেজ ডিগ্রি হোস্টেল, মজদুর ফেডারেশন আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি আবদুর রশিদ-এর বাসায় পাক বাহিনী হামলা করে।

এই আবদুস সালাম-এর নেতৃত্বে পলায়নরত কুমিল্লার রাজনৈতিক ছাত্র-শ্রমিক ও জনগণের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধের বক্স নগর ক্যাম্পের কার্যক্রম শুরু হয়। এর প্রাথমিক অর্থ যোগান দিয়াছিল কুমিল্লা ইপিআরটিসি'র শ্রমিকরা এবং ইপিআরটিসির ডিপোতে রক্ষিত শ্রমিকদের সব পোষাক ক্যাম্পে নেওয়া হয়। সেই পোষাকের অনুকরণে পরবর্তীতে মুক্তি যোদ্ধাদের জলপাই রংয়ের পোষাক তৈরী করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে ভারতীয় সৈন্যদের লুটপাটে প্রথম বাধা দিয়াছিল খুলনার মজদুর ফেডারেশনের নেতা আশরাফ হোসেনসহ মুক্তি যুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল ও মেজর জয়নাল আবেদীনের নেতৃত্বে যাহা দেশবাসীর স্মরণ থাকা দরকার।

দেশ স্বাধীন হবার পর অবাঙ্গালীদের বাড়ী, গাড়ী ও কল-কারখানা দখলের হিড়িক পরে যায়। অন্যদিকে মজদুর ফেডারেশনের উদ্যোগে প্রথম 'শহীদ স্মরণী ট্রাস্ট' গঠন করা হয়। যাহাতে মজদুর ফেডারেশনের নেতৃত্বে শ্রমিক সংগঠনগুলি অবাঙ্গালীদের সম্পদ এনে জড় করে। পরবর্তীতে সরকার মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করে বলেছিল, যে অবাঙ্গালীদের সকল সম্পদ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টে আনা হবে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় শহীদ স্মরণী ট্রাস্টের সম্পদ মুক্তিযোদ্ধা ট্রাস্টে নেওয়া হলেও আওয়ামী নেতাদের দখলকৃত সম্পদ ব্যক্তি নামেই রয়ে গেল।

অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার পর বুক ভরা আশা নিয়ে জাতি যাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের

দায়িত্ব দিয়াছিল। তাদের প্রণীত সংবিধানে এক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করণ, লাল বাহিনী গঠন, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার হরণসহ বাকশাল গঠনের প্রতিবাদ করেছিল মজদুর ফেডারেশন, যার ফলে শেখ মজিবুর রহমান সরকারের সন্ত্রাসীরা ফেডারেশনের ১০৮ বিসিসি রোডের অফিস জোরপূর্বক দখল করে ও দেওয়ান সিরাজুল হক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে। রাষ্ট্রপতির ৯নং আদেশ বলে প্রায় ২ শতাধিক ইপিআরটিসির শ্রমিক-কর্মচারীকে চাকুরী চ্যুত করে। ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে শতাধিক চটকল শ্রমিক ইউনিয়ন ধর্মঘট করে। উক্ত ধর্মঘটের সমর্থনে বাংলা মজদুর ফেডারেশন, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, জাতীয় শ্রমিক জোট ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে সভা আহবান করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মজদুর ফেডারেশন নেতা দেওয়ান সিরাজুল হকের গ্রেফতারের সংবাদে নেতৃবৃন্দগণ সভায় উপস্থিত না হয়ে বাকশালে যোগদানের প্রতিযোগিতায় নেমে পরে। দেওয়ান সিরাজুল হকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা '৭৫-এর শেষ ভাগে মুক্তি লাভ করে।

নভেম্বরে ঘূর্ণিঝড়

যাহা হউক, আগস্ট মাসে বন্যা দেখা দেওয়ায় নির্বাচন তারিখ পিছাইয়া দেওয়া হয়। জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন তারিখ ৫ই ও ২২শে অক্টোবরের স্থলে যথাক্রমে ৭ই ডিসেম্বর ও ১৭ই ডিসেম্বর পুনঃনির্ধারিত হয়। আমরা সর্বপ্রকার তিক্ততা ভুলিয়া গিয়া সংগঠন ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে জনাব আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হই। ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিবাত্যা ও জলোচ্ছ্বাসে হাতিয়া, সন্দ্বীপ, ভোলা ইত্যাদি সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ২০ লক্ষ অধিবাসীর প্রাণহানি ঘটে এবং অজস্র গবাদি পশু, ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র, জমি-জিরাতের হানি হয়। ইতিপূর্বে ১৮৭৬-এর নভেম্বর মাসের মহাবিধ্বংসী ঘূর্ণিবাত্যা ও জলোচ্ছ্বাসে সমুদ্র উপকূলবর্তী ২ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছিল। মহাচীন প্রজাতন্ত্র সফরান্তে রাওয়ালপিন্ডির পথে ঢাকা আগমন করিলেও প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান বাত্যাবিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন হইতে বিরত থাকেন। এবং গভর্নর এস.এম আহসানকে কতিপয় উপদেশ দিয়া রাজধানী ইসলামাবাদ অভিমুখে ঢাকা ত্যাগ করেন। ইহাতে বাঙ্গালী মন আরও তিক্ত ও বিষাক্ত হইয়া পড়ে। আওয়ামী লীগ সুচতুরভাবে ইহাকেই নির্বাচনী প্রচারণায় অত্যন্ত দক্ষতা ও কার্যকারিতার সহিত ব্যবহার করে। উল্লেখ্য যে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ ব্যতীত সকল রাজনৈতিক দলই সমন্বরে নির্বাচন পিছাইবার আওয়াজ তুলিয়াছিল। কারণ, অবশ্যই বাত্যাবিধ্বস্ত হতভাগ্য মানব সন্তানদের প্রতি দরদ ছিল না। নির্বাচনী হালে পানি পাওয়ার ব্যাপারটাই ছিল প্রকৃত কিন্তু অব্যক্ত কারণ। প্রতিকূল আবহাওয়ায় ভীত সন্ত্রস্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কর্তৃক ২৩শে নভেম্বর ঢাকায় পল্টন ময়দানের আহূত জনসভায় মওলানা ভাসানী 'স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তানের' আওয়াজ প্রকাশ্যে উত্থাপন করেন। বলাই বাহুল্য যে,

১৯৬৮-৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও প্রেসিডেন্ট আইউব খান কর্তৃক আহূত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের গোল টেবিল বৈঠকের ব্যর্থতার পর পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর হৃদয়ে শেখ মুজিবের সার্বজনীন শ্রদ্ধা, আস্থা ও জনপ্রিয়তা অর্জন এবং একচ্ছত্র নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দরুন অনেকটা বেকায়দায় পতিত হইয়াই ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা হাসিলের উদ্দেশ্যেই মওলানা ভাসানী আকস্মিকভাবে এই স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তানের দাবী তুলিয়াছিলেন অথচ এই মওলানা ভাসানীই ১৯৬২ সালের কারামুক্তির পর এক ব্যক্তির শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করিয়া পাক-চীন সম্পর্কোন্নয়নের একদিক ঘেষা অন্ধ চিন্তায় প্রেসিডেন্ট আইউব খান সরকারের পিছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন যোগাইয়া গিয়াছেন। আইউবের পতনের পর ইহা তাঁহার নয়া মূর্তি। এইদিকে তিনিই ১৯৭০ সালের আগস্ট মাসে খুলনায় অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কাউন্সিল অধিবেশনে ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নির্বাচন না পিছাইলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১২ই নভেম্বর (১৯৭০) উপকূল এলাকায় ও দ্বীপাঞ্চলে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলার অজুহাতে নির্বাচন বানচাল বা স্থগিত রাখিবার উদ্দেশ্যে যাহারা সোচ্চার ছিলেন সেইসব নেতা যথা পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের সভাপতি ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান, পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের ডেপুটি লীডার শাহ আজিজুর রহমান, পূর্ব পাক জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম-এর সভাপতি পীর মোহসীন উদ্দিন আহমদ, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের প্রাক্তন সদস্য এ.এস.এম সোলায়মান, পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও ১৯৬২-৬৫ সালের পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের ডেপুটি লীডার মশিউর রহমান ও আরো অনেকে সাধারণ ভোটদাতাদের নিকট যথার্থই হালে পানি পাইতেছিলেন না। তাহারা ৬ দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের নামে ভিরমীও খাইতেন। মওলানাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহারাই হঠাৎ বিপ্লবী ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারাই মওলানা ভাসানীর স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান দাবীর ছত্রছায়ায় সস্তা বাজীমাত করিবার উন্মাদনায় মওলানা ভাসানী কর্তৃক আহূত ২৩শে নভেম্বর (১৯৭০), ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯৭০) ও ১০ই জানুয়ারী পল্টন জনসভায় ও ৯ই জানুয়ারী (১৯৭১) সন্তোষ জাতীয় সম্মেলনের আসর জমাইয়াছিলেন। যখন মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়, তখন পূর্ব পাক ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি সাধারণ সম্পাদক জনাব মশিউর রহমান ভারত ভূমিতে গমন করিয়াছিলেন বটে তবে মুক্তিযুদ্ধ যখন মধ্যগগনে, বাঙ্গালীরা পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যখন মরণপণ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত, জনাব মশিউর রহমান মুক্তিযুদ্ধকে পিছন হইতে ছুরিকাঘাত করিবার মানসে ভারত ভূমি হইতে চলিয়া আসে ও আগস্ট মাসে (১৯৭১) পাক হানাদার বাহিনীর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে ও রংপুর ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সভায় পাকিস্তানের অখণ্ডত্বের পক্ষে রাজনৈতিক সমাধানের আওয়াজ তুলেন। পরবর্তীকালে ৪ঠা সেপ্টেম্বর (১৯৭১) ঢাকায় শান্তিনগর বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলন

করে পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক সমঝোতার পক্ষে ওকালতি করে পাক হানাদার বাহিনীর মনোরঞ্জনে প্রয়াসী হয় আর জনাব শাহ আজিজুর রহমান জাতিসংঘে পাক সরকার ডেলিগেশনে ডেপুটি লীডার নিযুক্ত হইয়া পাক-রাষ্ট্রীয় অখণ্ডত্ব বজায় রাখিবার পক্ষে ও বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রাখেন ইহাই হইল নেতৃচরিত্র। স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করিবার লক্ষ্যে সকাল-বিকাল মত পরিবর্তন করে— জাতি, রাষ্ট্র, জনগণ, আদর্শনীতি তাহাদের চিন্তা-চেতনায় কত গৌণ। ঘূর্ণিবাত্যা বিধ্বস্ত এলাকা সফরের পর শেখ মুজিব ২৬শে নভেম্বর ঢাকায় প্রেস কনফারেন্সে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "আমি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানাইয়াছি, স্বাধীনতার নয়।" এইদিকে নির্বাচন বয়কটের প্রশ্নে দ্বিমত সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমি সভাপতি আতাউর রহমান খানের তাগিদে ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯৭০) পল্টন জনসভায় যোগ দিয়াছিলাম।

পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের সভাপতি আতাউর রহমান খান ২৮শে নভেম্বর জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে স্বীয় নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষনা করেন এবং ২৯শে নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তিনি ন্যাশনাল লীগ মনোনীত প্রার্থীদিগকেও জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিতে অনুরোধ জানান। আমার নির্বাচনী এলাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সরাইল-নাছিরনগর হইতে ২৯শে নভেম্বর ঢাকায় পৌছিয়া ইংরেজী দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় দলীয় সভাপতি আতাউর রহমান খানের এই বিবৃতি পাঠে আমি হতভম্ব হইয়া পড়ি। তৎক্ষণাৎ তাঁহার ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে দেখা করিয়া আমার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া প্রকাশকালে তাঁহাকে বলি যে, তাঁহার ঘোষিত সিদ্ধান্ত সংগঠনের গঠনতন্ত্র পরিপন্থী, অনিয়মতান্ত্রিক ও অবিবেচনাপ্রসূত। প্রথমতঃ সংগঠনের পার্লামেন্টারী বোর্ড, ওয়ার্কিং কমিটির সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ব্যতীত নির্বাচনে অংশগ্রহণ হইতে বিরত থাকিবার অধিকার সংগঠনের সভাপতির একার নাই; দ্বিতীয়তঃ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখের মাত্র সাতদিন বাকী। সুতরাং মনোনীত প্রার্থীদের মতামত গ্রহণ ব্যতীত এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ অন্যায়। তৃতীয়তঃ আমি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক। আমার সহিত আলোচনা করা অপরিহার্য ছিল। আমি তাঁহাকে ইহাও বলি যে, এ ধরনের ব্যক্তি-রাজনীতির অভিশাপ সমগ্র সংগঠনকে পোহাইতে হইবে। ব্যক্তি পূজার রাজনীতি আমরা করিব না এবং একার সিদ্ধান্তই পার্টির সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। যদিও আজ দলীয় ঐক্যের খাতিরে আমি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে আমার নাম প্রত্যাহার করিতেছি, তবে ভবিষ্যতে সাংগঠনিক ফোরামে ব্যক্তি-প্রধান রাজনীতির সুরাহা করিতে সচেষ্ট থাকিব।

সবাই জানেন, গণতান্ত্রিক সংসদীয় রাজনীতিতে বিরোধী দলীয় ভূমিকা দেশ ও জাতির জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন। আতাউর রহমান খানের বিবৃতিতে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন বর্জনের আহবান ছিল না। তাই ন্যাশনাল লীগ মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণার উদ্দেশ্যে আর কালবিলম্ব না

করিয়া আমি ঢাকা ত্যাগ করি। পরিতাপের বিষয়, সংগঠনের সভাপতি আতাউর রহমান খান ইংরেজী দৈনিক পাকিস্তান অবজারভারের ১৬ই ডিসেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে কোন ন্যাশনাল লীগ মনোনীত প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন না। বলা অনাবশ্যক যে, পূর্বের মতই এই ঘোষণাও ছিল সাংগঠনিক গণতন্ত্রের পরিপন্থী। ইহা ছিল বস্তুতঃ সংগঠনকে দ্বিখণ্ডিত করিবার এক প্রকাশ্য উস্কানী।

বাংলা জাতীয় লীগ

নীতিজ্ঞানবর্জিত নেতৃত্বের খপ্পর হইতে সংগঠনকে মুক্ত করিবার তাগিদে ১৯৭১ সালের ১০ই জানুয়ারী কুমিল্লায় বাংলা ন্যাশনাল লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন আহবান করি। অধিবেশন বঙ্গবাসীদের নব জাগ্রত জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশকে স্বাগত জানায় ও জনমানুষের নবচেতনার প্রতিধ্বনি করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করে :

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়"

এই দেশে জাতীয়তাবাদের চেতনার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটিতে থাকে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর হইতেই। এবং এই জাতীয়তাবাদী চেতনার রেশ ধরিয়া পাক-ভারত সশস্ত্র সংঘাত, আশীর্বাদপুষ্ট বরপুত্রদ্বয় জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ও শেখ মুজিবুর রহমান যথাক্রমে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চলে একচ্ছত্র জন-প্রিয় ব্যক্তিসত্ত্বারূপে আবির্ভূত হন। আগেই বলিয়াছি, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধবিরতি ও তাসখন্দ শান্তিচুক্তি বিরোধী প্রচণ্ড গণ-অসন্তোষই পশ্চিম পাকিস্তানে জনাব ভুট্টোর একক ব্যক্তি জনপ্রিয়তার মূল ভিত্তি ছিল এবং ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধকালে যথোপযুক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অবর্তমানে ও অভাবে পূর্ব পাকিস্তানীদের অসহায় জনিত ক্ষোভ ও লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক স্বাধিকারের ক্রমবর্ধমান অপ্রতিরোধ্য গণদাবীই নিরবচ্ছিন্ন সরব কণ্ঠ শেখ মুজিবুর রহমানের জনপ্রিয়তার দৃশ্যমান কারণ ছিল। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ আসনে যথাক্রমে শেখ মুজিব পরিচালিত আওয়ামী লীগ ও জুলফিকার আলী ভুট্টো পরিচালিত পিপল্স পার্টির একচেটিয়া বিজয় ছিল উপরোক্ত বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থারই ফলশ্রুতি। লক্ষণীয় যে, আওয়ামী লীগ মনোনীত কোন প্রার্থী পশ্চিম পাকিস্তানে এবং পিপলস পার্টি মনোনীত কোন প্রার্থী পূর্ব পাকিস্তানের কি জাতীয় পরিষদে কি প্রাদেশিক পরিষদের কোন আসনে জয়লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। অর্থাৎ কোন দলই জাতীয় বা নিখিল পাকিস্তান পার্টির মর্যাদা অর্জন করিতে পারে নাই। ইহার দরুনই ক্ষমতালোভী জুলফিকার আলী ভুট্টোর মুখ হইতে এই মন্তব্য উচ্চারিত হইতে পারিয়াছিল যে, পূর্ব-পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের ও পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হউক এবং কেন্দ্রের সরকার গঠনের ফর্মুলা বাহির করা হউক।

আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬৭টি আসন লাভ করে। অপর দুইটি আসনে নির্বাচিত হন পি.ডি.পি প্রধান জনাব নূরুল আমিন এবং রাজা ত্রিবিদ রায়। প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ ২৬৬টি আসন লাভ করে। অপর ১২টি আসনে পি ডি পি-২ নেজামে ইসলাম-১, জামায়াতে ইসলামী-১, ন্যাপ (মস্কো)-১, স্বতন্ত্র ৭টি আসনে জয়লাভ করে।

আওয়ামী লীগ ৩রা জানুয়ারী (১৯৭১) বিজয় দিবস ঘোষণা করে। বিজয় দিবস উপলক্ষে ঢাকা রেসকোর্সে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগ টিকেটে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যবৃন্দের ৬ দফা বাস্তবায়নের প্রকাশ্য শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। আওয়ামী লীগের সেই শপথনামাটি নিম্নে প্রদত্ত হইল :

In the name of Allah the merciful and Almighty. In the name of the brave martyrs and fighters who heralded our initial victory by laying down their lives and undergoing the utmost hardship and repression, in the name of the peasnts workers, students, toiling masses and the people of all classes of this country, we the newly elected members of the National and Provincial assemblies do hereby take oath that we shall dovote all our energy to honour the over whelming support and instinted confidence the people of this country have reposed in the programme and the leadership of Awami League in the National General election.

That we shall remain whole heartly faithful to the people's mandate on the Six point and Eleven point Programmes and that we shall strive to the best of our ability to reflect both in the constitution and in day-to-day praptice the principles of autonomy based on the Six point Formula & Eleven point Programme.

That we shall remain absolutely loyal to the aims, objects and programmes of the Awami League and that we undertake to eliminate permanently extreme political, economic and social differences that exist between region & region and between man and man and struggle relentlessly to lay the foundation of a society free from exploitation so that injustices yield place to justice and fairplay.

That we shall build up a massive resistance movement against any quarter or evil force that may try to thwart our line of action behind whcih the people have their support & we shall remain ever prepared for an uncompromising struggle for the establishment of rights of the common man.

May Allah help us in our endeavour.

Joy Bangla —Joy Pakistan.

নিম্নে উক্ত শপথনামার বঙ্গানুবাদ দেয়া হইল :

করুণাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার নামে, বীর শহীদান ও যোদ্ধাদের নামে যাহারা স্বীয় জীবন বিসর্জন করিয়া ও অশেষ দুঃখ ও নির্যাতন স্বীকার করিয়া আমাদের প্রাথমিক বিজয় নিশ্চিত করিয়াছে, কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-মেহনতি জনতা ও এই দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের নামে আমরা নব-নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যরা এতদ্বারা শপথ গ্রহণ করিতেছি যে, জাতীয় সাধারণ নির্বাচনে দেশের জনগণ আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব ও কর্মসূচীর প্রতি যে ব্যাপক সমর্থন ও অবিচল আস্থা স্থাপন করিয়াছেন তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমাদের সকল শক্তি নিয়োজিত করিব।

আমরা সর্বোতভাবে ৬ দফা ও ১১ দফা কর্মসূচীর প্রতি, জনগণের ম্যান্ডেটের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিব এবং উভয় কর্মসূচীকে শাসনতন্ত্রে প্রতিফলিত করিতে এবং ৬ দফা ও ১১ দফা কর্মসূচীভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের নীতিমালাকে দৈনন্দিন কর্মে প্রতিফলিত করিতে আমাদের সর্বক্ষমতা নিয়োগ করিব।

আমরা আওয়ামী লীগের কর্মসূচীর প্রতি পরিপূর্ণভাবে অনুগত থাকিব এবং বর্তমানে অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষে মানুষে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈষম্য বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা দূর করিব, এবং এমন একটি শোষণমুক্ত সমাজের ভিত্তি স্থাপনে সংগ্রাম করিব যেখানে অন্যায়ের পরিবর্তে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমাদের কর্মসূচী যাহার প্রতি জনগণের সমর্থন রহিয়াছে তাহাকে বানচাল করিবার জন্য যদি কোন মহল ও দুষ্ট-শক্তি তৎপর হয়, তাহা হইলে আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিব এবং সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আপোষহীন সংগ্রামের জন্য আমরা সদা প্রস্তুত থাকিব।

আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টায় সহায় হউন।

জয় বাংলা–জয় পাকিস্তান।

উল্লেখ্য যে, এই অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবুর রহমান স্বীয় ভাষণ সমাপনান্তে 'জয় বাংলা' ও 'জয় পাকিস্তান' ধ্বনি দ্বারা বাঙ্গালীর দাবী-দাওয়া আদায়ের অঙ্গীকার ঘোষণা করেন।

ইয়াহিয়ার কালক্ষেপণ

নির্বাচনোত্তরকালে প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান সন্দেহজনক উদ্দেশ্যে পিন্ডি, ঢাকা, লারকানা পদচারণা করিয়া তাঁহার মূল কর্তব্য ও তাঁহার দেয়া আইনগত কাঠামোর আদেশ মোতাবেক ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবানে অনর্থক কালক্ষেপণ করিতেছিলেন। ১৯৭১ সালের ১১ই জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঢাকা আগমন এবং ১২ ও ১৩ই জানুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ এবং ১৪ই জানুয়ারী ঢাকা ত্যাগকালে শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা ও ১৯৭০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর করাচীতে, ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারী লারকানায়, ১৯৭১ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী

রাওয়ালপিন্ডিতে, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ইয়াহিয়া-ভুট্টো পুনঃপুনঃ সাক্ষাৎ ছিল পরবর্তীকালের ঘটনারাজীকে অনভিপ্রেত খাতে প্রবাহিত করিবার অপপ্রয়াসমাত্র। স্বীয় উদ্যোগে ইয়াহিয়া খানের এই ব্যক্তিগত কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিবার বিশেষ কারণ আর কিছুই ছিল না, ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট পদপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান। ক্ষমতা লোভই তদানীন্তন সামরিক বাহিনীর অধিনায়কের কর্মকান্ডকে নিয়ন্ত্রণ করিত, দেশপ্রেমও নয়, কর্তব্যবোধ বা নৈতিকতাবোধও নয়।

এইদিকে পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো ২৫ সদস্যবিশিষ্ট এক প্রতিনিধিদলসহ ১৯৭১ সালের ২৭শে জানুয়ারী সাংবিধানিক বিষয়ে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত আলোচনা করিবার নিমিত্ত ঢাকা আগমন করেন এবং ৩০শে জানুয়ারী ঢাকা ত্যাগ করেন। পরিতাপের বিষয়, উভয় নেতার ব্যক্তিগত খামখেয়ালীপনা ও অহমিকাবোধই তাঁহাদের ২৭, ২৮ ও ২৯শে জানুয়ারী তিন দিবসব্যাপী আলোচনাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে।

ইতিমধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থবাদী মহল সংবিধান প্রণয়ন বানচালে অত্যন্ত তৎপর হইয়া উঠে। সংবিধান প্রণয়নে গণপরিষদের সহজাত সার্বভৌম অধিকার অস্বীকার করিয়া জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো অদ্ভুত ও ইতিপূর্বে অশ্রুত এক থিওরী আকস্মিকভাবে ঘোষণা করেন এবং বলেন, "Three bastions of Power—Awami League, Peoples party and Army". অর্থাৎ ক্ষমতার তিনটি খুঁটি– আওয়ামী লীগ, পিপলস পার্টি এবং সৈন্য বাহিনী। ইহার সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, বেতনভুক সরকারী কর্মচারী, সামরিক বাহিনী সংবিধান রচনায় ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিন্যাসে সংশ্লিষ্ট। এইভাবেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক গণপরিষদ অধিবেশন আহবানে অহেতুক কালক্ষেপণ, স্বউদ্যোগে ব্যক্তিগত কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ, জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো কর্তৃক সংখ্যাধিক্য গণপরিষদ সদস্যদের সংবিধান গ্রহণে অস্বীকৃতি ও আকস্মিকভাবে সশস্ত্র বাহিনীকে ভবিষ্যৎ সংবিধানের রূপরেখা নির্ধারণে জড়িত করিবার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রস্তাব, প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক শাসনকর্তা জেনারেল ইয়াহিয়া খান কর্তৃক আইনগত কাঠামো আদেশের খেলাফে আওয়ামী লীগকে সাধারণ নির্বাচনে ৬ দফা দাবীর উপর রায় দানে নির্বাচকমন্ডলীকে আহবানের সুযোগ দান, রাজনৈতিক বিবর্তনের বিভিন্ন দিক কালের ঘটনা স্রোতেরই এক নীরব সাক্ষী।

বিমান ছিনতাই

এক অনিশ্চিত ও সংকটজনক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশ যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তখনই ঘটনা প্রবাহের এক নূতন অথচ অশুভ ও সর্বনাশা দিক উন্মোচিত হইল। ১৯৭১ সালের ৩০শে জানুয়ারী 'গঙ্গা' নামীয় এক ভারতীয় ফকার ফ্রেন্ডশীপ বিমান জম্মু বন্দরে অবতরণকালে দুইজন কাশ্মীরী স্পাই মোঃ হাশেম কোরেশী ও মোঃ আশরাফ ছিনতাই করে। তাহারা নিজদের জম্মু ও কাশ্মীর ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের সদস্য বলিয়া দাবী করে এবং ছিনতাইকৃত বিমানটিকে লাহোর বিমান বন্দরে অবতরণ করিতে বাধ্য করে।

ছিনতাইকারীগণ আরও দাবী করে যে, ভারত সরকার ৩৬ জন আটক কাশ্মীর মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তি দিলে ফকার বিমানটি ভারতকে ফেরত দেওয়া হইবে। ভারত দাবী মানিতে অস্বীকৃতি জানাইলে ছিনতাইকারীরা ২রা ফেব্রুয়ারী (১৯৭১) বিমানটি লাহোর বিমান বন্দরে ডিনামাইট দ্বারা ধ্বংস করে। প্রণিধানযোগ্য ঘোষণা আসে ভারতীয় কাশ্মীর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গোলাম মোহাম্মদ সাদিকের নিকট হইতে। তিনি জানান, মোহাম্মদ হাশেম কোরেশী (ছিনতাইকারীর অন্যতম) একজন ডবল এজেন্ট এবং ভারতীয় কাশ্মীর সরকার কয়েক মাস পূর্বেই ছিনতাই পরিকল্পনা কোরেশীর নিকট হইতেই জ্ঞাত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের এক এজেন্সীর আশ্রয়ে থাকায় কাশ্মীর সরকারের পক্ষে ছিনতাইকারী কোরেশীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই।

৩১শে জানুয়ারী ঢাকা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে লাহোর বিমান বন্দরে অবতরণ করিয়া জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ছিনতাইকারী মোহাম্মদ হাশেম কোরেশীর সহিত আলোচনা করেন। পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে নাজুক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সে সময়ে জনাব ভুট্টোর এই ধরনের বালসুলভ অভিনয় বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

উল্লেখ্য যে, ভারত তার বিমান ধ্বংসের প্রতিবাদে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ২রা ফেব্রুয়ারী হইতে পাকিস্তানের সমস্ত বেসামরিক যাত্রীবাহী বিমান ভারতীয় আকাশ পথে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। তাই অনেকের ধারণা ছিল এই যে, ছিনতাই নাটক সুপরিকল্পিত এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র ধ্বংসের জন্য সযত্নে রচিত ভারতীয় বৃহত্তর ষড়যন্ত্রমূলক নাটকের অন্যতম অংশমাত্র।

ছিনতাইকারী মোহাম্মদ হাশেম কোরেশী যে একজন ডবল এজেন্ট ছিলেন, ভারতীয় কাশ্মীরের মন্ত্রী মোহাম্মদ সাদেকের সেই বক্তব্য আগেই উল্লেখ করিয়াছি। ছিনতাই নাটকটিই পাকিস্তানের নাজুক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দুই অঞ্চলের মধ্যে দ্রুত বিমান যোগাযোগ অবসানের অজুহাত সৃষ্টি করে। ঐদিকে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানকল্পে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা গ্রহণের পাকিস্তানী প্রস্তাবও ভারত সরকার প্রত্যাখ্যান করে। ইহা আর যাহাই হউক, দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সহায়ক ছিল না। ৩রা ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ছিনতাইকৃত বিমান ধ্বংসের ঘটনাকে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলিয়া আখ্যা দেন। পক্ষান্তরে পিপলস পার্টি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ছিনতাইকৃত বিমান ধ্বংসকে সমর্থন করেন। উভয় নেতার বিবৃতিই ছিল যথেষ্ট রহস্যপূর্ণ। আরো রহস্যপূর্ণ ছিল ভুট্টোর ১৩ই ফেব্রুয়ারীর বিবৃতি। বিবৃতিতে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড হকি কাপ টুর্নামেন্টে ভারতীয় হকি টীমের অংশগ্রহণে বিরোধিতা করেন। তদুপরি ১৩ই ফেব্রুয়ারীর বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী কর্তৃক এই ঘটনায় স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবীর যথার্থতা খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রয়াস ভারত সরকারকে সুপরিকল্পিত সুদূর লক্ষ্যমুখে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করে।

যাহা হউক, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া অনেক টালবাহানা ও গড়িমসির পর এবং জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর সহিত ১২ই ফেব্রুয়ারী (১৯৭১) আলোচনাক্রমে এক ঘোষণায় ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় আহ্বান করেন। সাড়ে সাত কোটি বঙ্গবাসীর মুখপাত্র হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান ইতিপূর্বেই প্রেসিডেন্টকে ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের অনুরোধ জানাইয়াছিলেন।

প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জাতীয় পরিষদ অধিবেশন আহ্বানের পরপরই পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক আবহাওয়া ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইতে থাকে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী পেশোয়ারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণা করেন যে, জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের পূর্বে কোন প্রকার সমঝোতা ও বোঝাপড়া না হইলে পিপলস পার্টি ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগ দিবে না। তিনি একই সাংবাদিক সম্মেলনে আরোও ঘোষনা করেন যে, বিমান ছিনতাই প্রশ্নে পাক-ভারত যুদ্ধংদেহী অবস্থা ও ৬ দফা গ্রহণ না করিবার কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পিপলস পার্টির সদস্যবর্গ ঢাকায় গমন করিলে তাহারা ডবল হোস্টেজে পরিণত হইবে। ১৭ই ফেব্রুয়ারী করাচীতে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব ভুট্টো জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদানের পূর্বে সবার আগে আওয়ামী লীগের সহিত সমঝোতা প্রয়োজন বলিয়া পুনঃ মত প্রকাশ করেন।

এইভাবেই ক্রমে ক্রমে জুলফিকার আলী ভুট্টোর রাজনৈতিক কর্মধারায় পশ্চিম পাকিস্তানের জনমত পিপলস পার্টির পিছনে সংহত হইতে থাকে। এমনি অবস্থায় ৮৮ সদস্যবিশিষ্ট পিপলস পার্টি জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। চতুর্দিকে যখন তুলকালাম কান্ড, তখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের আহবানে রাওয়ালপিন্ডিতে ভুট্টো-ইয়াহিয়া এক সাক্ষাৎকার হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সহিত সাক্ষাৎকারের অব্যবহিত পরেই সাংবাদিকদিগকে জনাব ভুট্টো জানান যে, মুদ্রা, বৈদেশিক বাণিজ্য ও কর সম্পর্কে প্রকৃত বা মৌলিক মীমাংসা সম্ভব হইলেই সংবিধান রচনায় পিপলস পার্টি অংশগ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে। তিনি আরো দাবী করেন যে, পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তান অর্থাৎ সমগ্র দেশের এক-অর্ধাংশের প্রতিনিধি। তিনি এই মর্মে আরো দাবী করেন যে, ভারতীয় সৈন্য সমাবেশ পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তেই হইয়াছে, পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে নয়।

করাচীতে ওয়েস্ট পাকিস্তান ইনস্টিটিউট ম্যানেজমেন্ট প্রাঙ্গণে জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর সভাপতিত্বে ২০শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত পাকিস্তান পিপলস পার্টি জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের দুই দিবসব্যাপী পার্লামেন্টারী কনফারেন্সের প্রথম দিবসের অধিবেশনেই ৬ দফা ভিত্তিক সংবিধান বনাম পিপলস পার্টির ভূমিকা সংক্রান্ত বক্তব্যের প্রশ্নে সদস্যবৃন্দ পার্টি চেয়ারম্যানের নিকট সানন্দে পদত্যাগপত্র জমা দিতে সম্মত হন। পদত্যাগের এই হুমকির পটভূমিকায় বোধহয় ১৮ই ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান

এক আদেশে আইনগত কাঠামো আদেশ (১৯৭০)কে সংশোধন করিয়া পরিষদের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বে জাতীয় বা প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের পদত্যাগের ধারা সংযোজিত করেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হইল, পিপলস পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ২২শে ফেব্রুয়ারী করাচীর সভায় পরিষদ সদস্যদের পদত্যাগের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সংবিধান সম্পর্কে পিপলস পার্টির সুপারিশ

করাচীতে অনুষ্ঠিত পিপলস পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় দেশের ভাবী সংবিধান নিম্নবর্ণিত নীতিমালার উপর প্রণীত হওয়ার সুপারিশ করা হয়।

(১) ফেডারেল সরকার এবং কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংস্থা প্রত্যেকটি ফেডারেটিং ইউনিটের সমান প্রতিনিধিত্ব পাইবে।

(২) আন্তঃ ও আন্তঃআঞ্চলিক শোষণ বন্ধ করিবার নিমিত্ত সুষম মুদ্রা ও কর ব্যবস্থার প্রবর্তন হইবে।

(৩) ভায়াবল (viable) কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনার প্রয়োজনে ফেডারেল সরকার কর আরোপ ও আদায় করিবে।

(৪) বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য ফেডারেল সরকারাধীন থাকিবে।

(৫) প্রদেশগুলির মধ্যে পণ্যদ্রব্য ও চলাচলের অবাধ অধিকার থাকিবে।

ভুট্টো-ইয়াহিয়া আঁতাত

২২শে ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সভাপতিত্বে প্রাদেশিক গভর্নর ও আঞ্চলিক সামরিক শাসনকর্তাদের বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির দরুন সামরিক জান্তার উগ্রপন্থী জেনারেল যথা– জেনারেল হামিদ, ওমর, গুল হাসান, পীরজাদা প্রমুখের দাবীতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৭ই ফেব্রুয়ারী মন্ত্রিসভা বিলুপ্তি ঘোষণা করেন।

২৬শে ফেব্রুয়ারী পিপলস পার্টি চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সহিত করাচীস্থ রাষ্ট্রপতি ভবনে চার ঘন্টাব্যাপী সাংবিধানিক বিষয়ে আলোচনা করেন। অনুমিত হয় যে, ভুট্টো-ইয়াহিয়া এই সাক্ষাৎকারেই জাতীয় পরিষদের ঢাকা অধিবেশন স্থগিত রাখিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল নতুবা ২৮শে ফেব্রুয়ারী লাহোর জনসভায় জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখিবার দাবী এবং অন্যথায় ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনার সময়সীমা প্রত্যাহারের দাবী উত্থাপন করিতে পারিতেন না। তিনি এই মর্মেও হুমকি প্রদান করেন যে, নারী সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবার প্রচেষ্টা চালাইলে খাইবার হইতে করাচী পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হইবে এবং পিপলস পার্টির কোন সদস্য পরিষদ অধিবেশনে যোগ দিলে তাহাকে নিশ্চিহ্ন করা হইবে। উল্লেখ্য যে, জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক শক্তিতে পরিণত হইলেও এবং

ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য অধিবেশনকে পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যবৃন্দের জন্য 'কসাইখানা' আখ্যা দিলেও ৩রা মার্চ ঢাকা অধিবেশনে অংশগ্রহণ করিবার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত ৩৫ জন সদস্য ঢাকা আগমন করেন। স্মর্তব্য, নির্বাচন কমিশন ১৪ই ফেব্রুয়ারীর এক ঘোষণায় জাতীয় পরিষদে ১৩ জন নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ২রা মার্চ ধার্য করেন এবং ১লা মার্চ ঢাকায় রিটার্নিং অফিসার সমীপে নমিনেশন পেপার জমা দেওয়ার জন্য ইচ্ছুক প্রার্থীদিগকে আহ্বান জানান।

পরিষদ অধিবেশন স্থগিত : বাংলাদেশ বিক্ষুব্ধ

১৫ এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদ সদস্য, প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দের যুক্ত সভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে দলীয় লক্ষ্য অর্জনে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে যথাক্রমে জাতীয় পরিষদ পার্লামেন্টারী পার্টির লীডার ও ডেপুটি লীডার নির্বাচিত করা হয়।

ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচীর রদবদলের জন্য সরাসরিভাবে দাবী উত্থাপন করে। ইহার উত্তরেই বোধহয় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ২৪শে ফেব্রুয়ারী দলীয় সদর দফতরে সাততাড়া আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, ৬ দফা প্রশ্নে কোন প্রকার রদবদল সম্ভব নয়। তিনি আরো বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের উপর ৬ দফা বাধ্যতঃ গ্রহণীয়ও নয় বরং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশসমূহ পারস্পরিক প্রয়োজন ও স্বার্থে যে কোন প্রকার সাংবিধানিক ব্যবস্থা উদ্ভাবন্ করিতে পারে।

শেখ মুজিবুর রহমানের উপরোক্ত ঘোষণা ইহাই প্রামণ করে যে, শেখ সাহেব রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় ভিত্তিতে পাকিস্তানের সামগ্রিক সাংবিধানিক সমস্যা সমাধানে আগ্রাহান্বিত ছিলেন না। বলাই বাহুল্য যে, বিগত ২৩ বৎসরের ক্ষমতার লড়াই-এর ইহাই ছিল অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফলশ্রুতি।

বোধহয়, ২৮শে ফেব্রুয়ারী লাহোরে অনুষ্ঠিত ভুট্টোর জনসভার দাবীর প্রেক্ষিতেই ১লা মার্চ, অপরাহ্ন ১টা ৫ মিঃ-এর বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চ ঢাকায় আহূত জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী ঘোষণা করেন। জাতীয় পরিষদ মূলতবী ঘোষণায় হতচকিত ঢাকাবাসী স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। ঢাকা স্টেডিয়ামে ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ দর্শক কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়; ঢাকা হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশন ও ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের প্রতিবাদ মিছিল রাস্তায় নামে; ছাত্র সম্প্রদায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে রাজপথে নামিয়া আসে; বিভিন্ন শিল্প এলাকা হইতে শ্রমিকরা দলে দলে মিছিল সহকারে রাজধানী ঢাকা মুখে যাত্রা করে; সকল সিনেমা হল বন্ধ হইয়া যায়। এইসব বিক্ষোভ মিছিলের স্রোত হোটেল পূর্বাণীর দিকে

অগ্রসর হইতে থাকে। হোটেল পূর্বাণীতে তখন আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের পার্লামেন্টারী পার্টির সভা চলিতেছিল। মিছিলকারীরা সহস্র কণ্ঠে আওয়াজ উঠায়, "পাকিস্তানের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন কর। বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা কর।" শেখ মুজিবুর রহমান বিদ্রোহী জনতার উদ্দেশ্যে তাহার ভাষণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ঘোষণার প্রতিবাদে ২রা মার্চ ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক সাধারণ হরতাল পালনের আহবান জানান। এইভাবে সেইদিন সারাদিন ধরিয়া মিছিলে মিছিলে ঢাকা নগরী প্রকম্পিত হইতে থাকে; অফিস-আদালত পরিত্যক্ত হয়; আইনজীবীরা পথে নামিয়া আসেন, দোকানপাট বন্ধ, সর্বত্র বিদ্রোহবহ্নি। পল্টন ময়দানে স্বতঃস্ফূর্ত বিরাট জনসমাগমে আগামীদিনের গণআন্দোলনের ডাক দেয় আওয়ামী লীগ, শ্রমিক লীগ ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ। ২রা মার্চ ঢাকা নগরে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। এই ২রা মার্চেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ছাত্রসভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি আ স ম আবদুর রব সর্বপ্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন। সবুজ জমিনে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত এই পতাকাটি উত্তরকালে মানচিত্র বাদ দিয়া রাষ্ট্রীয় পতাকার মর্যাদা পায়।

পরিস্থিতিকে আয়ত্তে রাখিবার প্রয়োজনে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১লা মার্চ এক আদেশ বলে প্রদেশগুলিতে নিয়োজিত সামরিক শাসনকর্তাকেই বেসামরিক গভর্নর পদে নিয়োগ করেন অর্থাৎ দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটাইয়া সামরিক বাহিনীই দেশের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস এডমিরাল এস.এম আহসান অনতিবিলম্বে সামরিক শাসন কর্তা লেঃ জেঃ সাহেবজাদা এম. ইয়াকুব খানের নিকট দায়িত্বভার দিয়া পূর্ব পাকিস্তান হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। ২রা মার্চ ঢাকায় প্রতিবাদ হরতাল পালনকালে বুলেটের আঘাতে ২ ব্যক্তি শাহাদৎবরণ করে এবং অনেকেই আহত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ২রা মার্চ এক বিবৃতিতে সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবী করেন এবং নিম্ন কর্মসূচী ঘোষণা করেন। (ক) ৩রা মার্চ হইতে ৬ই মার্চ পর্যন্ত ভোর ৬টা হইতে ২ ঘটিকা পর্যন্ত প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট, (খ) ৩রা মার্চ জাতীয় শোক দিবস পালন এবং (গ) ৩রা মার্চ ছাত্র জনসভা অনুষ্ঠানের পর অপরাহ্ন চার ঘটিকায় পল্টন ময়দান হইতে শেখ সাহেব কর্তৃক মিছিল পরিচালনা। শেখ সাহেব আরো ঘোষণা করেন যে, 'রেডিও-টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ না করিলে বাঙ্গালী কর্মচারীরা সহযোগিতা করিতে অস্বীকৃতি জানাইবে।' ঘোষণায় ইহাও বলা হয় যে, ৭ই মার্চ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঘোষণা করিবেন।

পরিস্থিতি মোকাবিলা করিবার প্রয়াসে সামরিক কর্তৃপক্ষ পৌরসভা এলাকায় রাত্রি ৮টা হইতে ভোর ৭টা পর্যন্ত এবং ৩রা মার্চ সন্ধ্যা ৭টা হইতে ভোর ৭টা পর্যন্ত সান্ধ্য আইন জারি করেন। কিন্তু তথাপি সান্ধ্য আইন অমান্য করিয়াই মিছিল ব্যারিকেড পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকে; বিদ্রোহী জনতা অকাতরে প্রাণ দিতে থাকে। সান্ধ্য আইন

জারির এই বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়াই কর্তৃপক্ষ ৪ঠা মার্চ হইতে সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করেন।

বাংলা জাতীয় লীগের প্রচেষ্টা

এইদিকে লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য যৌথ সংগ্রাম পরিষদের দাবীতে বাংলা জাতীয় লীগ, বাংলা মজদুর ফেডারেশন ও ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের এক বিরাট জঙ্গী মিছিল ঢাকা নগরের বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। অবশ্য আওয়ামী লীগ কর্মীরা উক্ত যৌথ সংগ্রাম পরিষদ গঠনের দাবীকে সুনজরে দেখে নাই। ৩রা মার্চ সকাল দশ ঘটিকায় দেওয়ান সিরাজুল হক ও এম.এম. আনোয়ার ও আমার সমবায়ে গঠিত এক প্রতিনিধি দল বাংলা জাতীয় লীগের পক্ষ হইতে শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত তাঁহার ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে এক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হই। আলোচনায় জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ও মনসুর আলী অংশগ্রহণ করেন। আমরা বাংলা জাতীয় লীগের পক্ষ হইতে শেখ সাহেবের সমীপে নিম্ন প্রস্তাবাবলী পেশ করি :

(১) জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত সংক্রান্ত প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ঘোষণাকে উপেক্ষা করিয়াই আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য ও পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আগত সদস্যবর্গের আজই ঢাকায় সংবিধান প্রণয়নকল্পে যথারীতি অধিবেশনে মিলিত হওয়া উচিত এবং যথাশীঘ্র সংবিধান প্রণয়ন করিয়া উহা মোতাবেক জনপ্রতিনিধিগণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সামরিক আইন শাসনকর্তা প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে আনুষ্ঠানিকভাবে আহবান জানান উচিত।

(২) প্রেসিডেন্ট এই আহবান অস্বীকার করিলে অস্থায়ী সরকার ঘোষণা করা ও জাতিসংঘের সাহায্য প্রার্থনা করা প্রয়োজন।

(৩) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান সমবায়ে কনফেডারেশন গঠন।

(৪) উপরে বর্ণিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জনতার ঐক্য সুদৃঢ় করিবার মানসে সংগ্রামী জনতার মোর্চা গঠন।

জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ও জনাব মনসুর আলী পরিকল্পনাটি বাস্তব নহে বলিয়া মন্তব্য করেন। শেখ সাহেব বলেন, এই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিলে সরকার সেনাবাহিনীর দ্বারা আন্দোলন দমাইয়া ফেলিবে। যাহা হউক, পরবর্তী ঘটনাবলীই প্রমাণ করিয়াছে যে, আমাদের প্রস্তাবসমূহ সঠিক ছিল কি-না এবং আমাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবার পরেও সেনাবাহিনীর দমন চলিয়াছিল কি-না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আলোচনার ফাঁকে এক পর্যায়ে ২রা মার্চ তাঁর বাসভবনে নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মি. ফারল্যান্ডের সাথে তাঁর যে বৈঠক হয় সেই বৈঠকের প্রসঙ্গে মুজিব ভাইয়ের কাছে জানতে চাইলাম আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া যাবে কিনা? এ ব্যাপারে কোন আলোচনা হয়েছে

কিনা? মুজিব ভাই উত্তরে বললেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সমর্থন করবে না। তবে নভেম্বরে মার্কিন সিনেটে হয়তো প্রসঙ্গটি আলোচনা হতে পারে সে ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানে মার্কিন সামরিক ঘাঁটির জন্য পটুয়াখালী অথবা সেন্ট মার্টিন যে কোন একটি দ্বীপ তারা চায়– আমি তাদের সরাসরি না বলে দিয়েছি।" এরকম বলা একমাত্র মুজিব ভাইয়ের মতো সাহসী লোকের পক্ষেই সম্ভব।

মুজিব ভাই কিন্তু আত্মসমর্পণও করেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইংগিতেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নিরাপত্তার সম্পূর্ণ গ্যারান্টি দেয়ার ফলেই তিনি নির্দ্বিধায় ২৫শে মার্চ পাক বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

আবার গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব

৩রা মার্চ অপরাহ্নে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পল্টনের বিরাট জনসমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমান অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং সরকারের নিকট (১) অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার, (২) সশস্ত্র বাহিনীর ব্যারাকে প্রত্যাবর্তন ও (৩) জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর দাবী করেন। এবং ৪ঠা মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান নিম্নলিখিত নির্দেশ জারি করেন :

কর্মচারীদের বেতন পরিশোধের নিমিত্ত সরকারী, বেসরকারী অফিস অপরাহ্ন ২-৩০ হইতে ৪-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা থাকিবে, ১৬ শত টাকার অনূর্ধ্বের চেক পরিশোধের জন্য ব্যাংকসমূহ অপরাহ্ন ২-৩০ মিঃ হইতে ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত কাজ করিবে; স্টেট ব্যাংক কর্তৃক অথবা অন্য কোন প্রকারে বাংলাদেশের বাহিরে টাকা প্রেরণ করা যাইবে না। ইহার আগের দিন অর্থাৎ ৩রা মার্চেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সংকট উত্তরণ প্রচেষ্টায় নিম্নলিখিত পার্লামেন্টারী পার্টি নেতৃবর্গকে ঢাকায় এক গোল টেবিল বৈঠকের আহবান জানান :

(১) শেখ মুজিবুর রহমান, আওয়ামী লীগ; (২) জুলফিকার আলী ভুট্টো, পাকিস্তান পিপলস পার্টি; (৩) খান আবদুল কাইউম খান, পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইউম); (৪) মিঞা মোহাম্মদ মমতাজ দৌলতানা, কাউন্সিল মুসলিম লীগ; (৫) মাওলানা মুফতি মাহমুদ জমিয়তুল উলেমায়ে ইসলাম (হাজারভী); (৬) খান আবদুল ওয়ালী খান, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী); (৭) মাওলানা শাহ আহমদ নূরানী, জমিয়তুল উলেমায়ে পাকিস্তান; (৮) জনাব আবদুল গফুর আহমদ, জামায়াতে ইসলামী; (৯) মিঃ মোহাম্মদ জামাল কুরেকা, পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কনভেনশন); (১০) জনাব নূরুল আমিন, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি; (১১) মেজর জেনারেল জামালদার, উপজাতীয় এলাকা হইতে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যদের প্রতিনিধি; (১২) মালিক জাহাঙ্গীর খান, উপজাতীয় এলাকা হইতে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যদের প্রতিনিধি।

শেখ মুজিবুর রহমান গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন।

জনাব নূরুল আমিনও গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানান। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানী সংখ্যাগুরু জনতার আস্থাভাজন নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাবকে স্বাগত জানান।

পল্টনে বাংলা জাতীয় লীগের জনসভা

৩রা মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত আলোচনাকালে আমরা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ও মুক্তি ফৌজ গঠনেরও প্রস্তাব রাখিয়াছিলাম। আমাদের প্রস্তাবের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানের অনীহা লক্ষ্য করিয়া, সমগ্র পরিস্থিতির আলোকে বাংলা জাতীয় লীগের দৃষ্টিভঙ্গিতে করণীয় আশু কর্তব্য নির্দেশ করিবার উদ্দেশ্যে আমরা ১৯৭১ সালের ৬ই মার্চ অপরাহ্নে ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে এক জনসভা আহবান করি। পল্টন ময়দানে আমাদের সংগঠনের নামকরণ করি 'বাংলা জাতীয় লীগ'। এই জনসভাতে সভাপতির ভাষণদানে আমি ৭ই মার্চ রেসকোর্সে অনুষ্ঠিতব্য জনসভায় বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আহবান জানাই এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা জাতীয় লীগের পক্ষ হইতে সর্বশক্তি নিয়োগেরও প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস দান করি।

গভর্নর পদে টিক্কা খান

১০ই মার্চ আহূত গোল টেবিল বৈঠকের প্রতি বাংলার নেতার অনমনীয় মনোভাব লক্ষ্য করিয়া ৬ই মার্চ এক বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করেন। ৭ই মার্চ অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় লক্ষ লক্ষ লোকের পদভারে প্রকম্পিত রেসকোর্স ময়াদনে মুহুর্মুহু ধ্বনি ও করতালির মধ্যে স্বাধীন বাংলার পতাকা শোভিত মঞ্চ হইতে স্বাধীন বাংলার নায়ক শেখ মুজিবুর রহমান বজ্রকণ্ঠে প্রথমবারের মতো ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

স্মর্তব্য যে, একই দিবসে অর্থাৎ ৭ই মার্চ লেঃ জেঃ সাহেবজাদা এয়াকুবের স্থলে কঠোরমনা লেঃ জেঃ টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শাসনকর্তা বেসামরিক গভর্নর পদে নিযুক্ত হইয়া ঢাকায় আসেন। ঢাকায় আগমনের পরই লেঃ জেঃ টিক্কা খান বিমানে রেসকোর্স ময়দানের জনারণ্য পর্যবেক্ষণ করেন। বোধহয় ভীতি প্রদর্শনের প্রয়াসে রেসকোর্সের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সশস্ত্র বাহিনীকে মোতায়েন রাখা হয়।

ইতিপূর্বে ১লা মার্চ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি আ স ম আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন সমবায়ে চার সদস্যবিশিষ্ট "স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের উক্ত একক পদক্ষেপের ফলে স্বাভাবিকভাবেই ১১ দফা দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে গঠিত 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের' বিলুপ্তি ঘটে।

বাংলা ন্যাশন্যাল লীগের উদ্যোগে

৬ই মার্চ ১৯৭১ ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত

জনসভার প্রস্তাব—

বাংলা ন্যাশন্যাল লীগের উদ্যোগে ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে বাংলার জাতীয় জীবনের এই চরম সংকট মুহূর্তে ও যুগসন্ধিক্ষণে অনুষ্ঠিত এই জনসভা বিশ্বাস করে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল হ'তে মুক্ত হয়ে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলা দেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বের স্বাধীন জাতীয় মানচিত্রে স্থান পায়নি। তারপর তেইশ বছরের ইতিহাস প্রমাণ করেছে, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ দুর্নীতি উপনিবেশিক শাসন শোষণের যাতাকলে আজো পৃষ্ঠপিষ্ট। বাহান্নের রক্তপাত থেকে শুরু করে স্বাধীনতাকামী বীর বাঙালীরা আজ পর্যন্ত বুকের রক্ত দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে এদেশের ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক, জনতার বুকে। তৎসত্বেও কায়েমী স্বার্থবাদী স্বৈরতান্ত্রিক গোষ্ঠি ১লা মার্চে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আহুত ৩রা মার্চের অধিবেশন স্থগিত করে ষড়যন্ত্রের নতুন জাল বিস্তার করে। তারই প্রতিবাদে বাংলার গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে মুক্তিকামী মানুষের উত্তাল তরঙ্গে বজ্রনির্ঘোষে ধ্বনিত হচ্ছে একই কথা—বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধরো, বাংলা দেশ স্বাধীন করো।

এই ঐতিহাসিক জনসভা বিশ্বাস করে, সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী, ও সামন্তবাদের প্রভুরা একদিনের ধনে-ধান্যে ভরা সোনার বাংলাকে শোষণ করে আজ পরিণত করেছে শ্মশানে। ক্ষুধা, অভাব আর মৃত্যুর হাহাকার আজ চারিদিকে। বাংলার সম্পদে বাঙালীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সুষম বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই যুগে যুগে শোষণের ইতিহাসের একমাত্র জবাব।

অতএব বাংলা ন্যাশন্যাল লীগের এই ঐতিহাসিক জনসভা বাংলার নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যদের প্রতি অবিলম্বে "স্বাধীন সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক" শাসনতন্ত্র ঘোষণা এবং প্রয়োজন বোধে উক্ত শাসনতন্ত্র বানচাল প্রতিরোধের জন্য স্বাধীনতাকামী সকল রাজনৈতিক, দলের ঐক্যবদ্ধ "মুক্তিফ্রন্ট" গঠন করার আহ্বান জানাইতেছে।"

বাংলা ন্যাশন্যাল লীগের প্রচার সম্পাদক জনাব কাজী জওয়াহেরুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত।

শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণ

"আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সকলে জানেন এবং বোঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়া চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর আমার ভায়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের সময় বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো এবং এ দেশের ইতিহাসকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি, বাংলাদেশের করুণ ইতিহাস, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস- এই রক্তের মুমূর্ষু মানুষের করুণ আর্তনাদ, এদেশের করুণ ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইউব খাঁ মার্শাল ল' জারি করে ১০ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনের সময় আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইউব খাঁর পতনের পরে ইয়াহিয়া এলেন। ইয়াহিয়া খান সাহেব বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন- আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হোল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করেছিলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আমাদের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে সভা হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেমব্লিতে বসবো। আমি বললাম, এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করবো- এমনকি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনের মতেও যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা মেনে নেব।

ভুট্টো সাহেব এখানে ঢাকা এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম- আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো- সবাই আসুন, বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বার যদি আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেমব্লি। তিনি বললেন যে, যে যাবে তাদের মেরে ফেলে দেওয়া হবে, যদি কেউ এসেমব্লিতে আসে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত সব জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেমব্লি চলবে আর হঠাৎ মার্চের ১ তারিখ এসেমব্লি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসাবে এসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো বললেন, যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে এলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হোল, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষের, দোষ দেওয়া হোল আমাকে। দেশের মানুষ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোল। আমি বললাম, আমরা জামা কেনার পয়সা দিয়ে অস্ত্র পেয়েছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য, আজ সেই অস্ত্র আমার দেশের গরীব দুঃখী মানুষের বিরুদ্ধে–তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু– আমরা বাঙ্গালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের উপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন, আপনি দেখুন। তিনি বললেন, আমি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ডাকবো। আমি বলেছি, কিসের এসেমব্লি বসবে, কার সঙ্গে কথা বলবে? আপনারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলবো? পাঁচ ঘন্টার গোপন বৈঠকে সমস্ত দোষ তারা আমাদের উপর, বাংলার মানুষের ওপর দিয়েছেন। দায়ী আমরা।

২৫ তারিখে এসেমব্লি ডেকেছেন। রক্তের দাগ শুকায় নাই। ১০ তারিখে বলেছি, রক্তে পাড়া দিয়ে, শহীদের উপর পাড়া দিয়ে, এসেমব্লি খোলা চলবে না। সামরিক আইন মার্শাল ল' উইড্রো করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকের ভিতরে ঢুকাতে হবে। যে ভাইদের হত্যা করা হয়েছে তাদের তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে, তারপর বিবেচনা করে দেখবো আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেমব্লিতে আমরা বসতে পারি না।

আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিতে চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারী, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সে জন্য যে সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলো হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ী, রেল চলবে, শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দফতর, ওয়াপদা– কোনকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, এরপর যদি ১টি গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়– তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে, এবং

জীবনের তরে রাস্তাঘাট, যা যা আছে সবকিছু– আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। সৈন্যেরা, তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, তোমাদের কেহ কিছু বলবে না কিন্তু আর তোমরা গুলি করার চেষ্টা কর না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগ থেকে যদ্দুর পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আওয়ামী লীগ অফিসে সামান্য টাকা পয়সা পৌছে দেবেন। আর ৭ দিন হরতালে শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌছে দেবেন। সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে ততদিন ওয়াপদা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হোল– কেউ দেবেন না। শুনুন, মনে রাখুন, শত্রু পিছনে ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু, মুসলমান যারা আছে তারা আমাদের ভাই, বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী– তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন কর্মচারীরা, রেডিও যদি আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালী রেডিও ষ্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, তাহলে টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘন্টা ব্যাংকগুলো খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনে পত্র নিতে পারে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বাংলাদেশের নিউজ বাইরে পাঠানো চলবে। এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা চলছে– বাঙালীরা বুঝে সুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলুন। এবং আমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। যখন রক্ত দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।

জয় বাংলা। জয় পাকিস্তান।

উল্লেখ্য যে, ৭ই মার্চের জনসভাতেই ২৫শে মার্চে আহূত জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদান প্রসঙ্গে শেখ মুজিব নিম্নোক্ত শর্তাবলী আরোপ করেন :

(ক) সামরিক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

(খ) সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।

(গ) হত্যার তদন্ত করিতে হইবে।

(ঘ) জনপ্রতিনিধিগণের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে হইবে।

তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানান, উপরোক্ত শর্তাবলী পূরণ না হইলে "শহীদের কাঁচারক্ত মাড়াইয়া ২৫শে মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যাইব না।"

উল্লেখ্য যে, ৭ই মার্চ রবিবার এক বিবৃতিতে শেখ মুজিব ৮ই মার্চ হইতে পরবর্তী সপ্তাহের নিম্নলিখিত কর্মসূচী ঘোষণা করেন :

১। কর না দেওয়ার আন্দোলন চলিবে।

২। সেক্রেটারিয়েট, সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস, হাইকোর্ট এবং বাংলাদেশের অন্যান্য আদালত হরতাল পালন করিবে। এই ব্যাপারে কি কি শিথিল করা হইবে, তাহা সময়ে সময়ে জানান হইবে।

৩। রেলওয়ে ও বন্দরসমূহ কাজ চালাইয়া যাইবে। তবে জনগণের উপর অত্যাচার চালাইতে সৈন্য সমাবেশকে রেলওয়ে ও বন্দর কর্মচারীরা সহযোগিতা করিবে না।

৪। বেতার, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রকে আমাদের বক্তব্যের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করিতে হইবে এবং তাহারা জনতার আন্দোলনের সংবাদ চাপিয়া যাইতে পারিবে না।

৫। কেবলমাত্র স্থানীয় ও আন্তঃজেলা ট্রাংক টেলিফোন যোগাযোগ চলিবে।

৬। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকিবে।

৭। স্টেট ব্যাংক বা অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যাংক দেশের পশ্চিম অংশে টাকা পাঠাইতে পারিবে না।

৮। প্রতিদিন সমস্ত ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন করা হইবে।

৯। অন্যান্য ক্ষেত্রে হরতাল প্রত্যাহার করা হইল। তবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন মুহূর্তে পূর্ণ অথবা আংশিক হরতাল ঘোষণা করা যাইতে পারে।

১০। স্থানীয় আওয়ামী লীগ শাখার নেতৃত্বে প্রত্যেক ইউনিয়ন, মহল্লা, থানা, মহকুমা এবং জেলায় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হইবে।

সামরিক কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা

এইভাবেই সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর আকাঙ্খার বলিষ্ঠ কণ্ঠ শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করেন এবং ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত্রির অন্ধকারে পাক সেনাবাহিনীর হামলার পূর্বাহ্ন অবধি পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বেসামরিক অফিস-আদালতসমূহ আওয়ামী লীগ সদর দফতর হইতে জারিকৃত প্রশাসনিক আদেশ ও ফরমান নির্বিবাদে প্রতিপালন করিয়া চলে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বেসামরিক ব্যবস্থা পূর্ব পাকিস্তানে সম্পূর্ণ অচল ও বিকল হইয়া পড়ে।

লক্ষণীয় যে, ২২শে মার্চ সংখ্যায় ঢাকার সকল দৈনিক সংবাদপত্র স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকার ছবি সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, পাকিস্তান দিবস ২৩শে মার্চে কেবলমাত্র ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও প্রেসিডেন্ট হাউসে

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলিত হইতে দেখা যায়। পক্ষান্তরে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবানে সেই দিন ঢাকার ঘরে ঘরে স্বাধীন বাংলার পতাকা শোভা পাইতেছিল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসনের সর্বময় কর্তৃত্ব শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে চলিয়া যায়।

এইদিকে ঘটনার স্রোত দ্রুত প্রবাহিত হইতে লাগিল। পরিস্থিতির জটিলতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাহার অঘোষিত উপদেষ্টা ও সামরিক জান্তার সদস্যবৃন্দ জেনারেল আবদুল হামিদ খান, লেঃ জেঃ এস.জি.এম.এম পীরজাদা, লেঃ জেঃ আকবর খানের পরামর্শে ১৯৬৯ সালের ৫ই আগস্টে গঠিত বেসামরিক মন্ত্রিসভা ১৯৭১ সালে বিলুপ্ত করেন (১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭১)। ১লা মার্চ গভর্নর ভাইস এডমিরাল এস.এম আহসানের স্থলে সামরিক শাসনকর্তা লেঃ জেঃ ইয়াকুব খানকে বেসামরিক গভর্নরের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং ৭ই মার্চ ভদ্র ও নরম মেজাজী লেঃ জেঃ ইয়াকুব খান সাহেবজাদার স্থলে কঠোরমনা লেঃ জেঃ টিক্কা খানকে যুগপৎ সামরিক শাসনকর্তা ও বেসামরিক গভর্নর পদে নিয়োগ করেন। রাজনৈতিক দিকপাল রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের মন্তব্য "Poltics is too serious a matter to be left with the Generals" অর্থাৎ "রাজনীতি এতই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, ইহা জেনারেলদের দায়িত্বে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না"– এই স্থলে প্রণিধানযোগ্য। উক্ত মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণের জন্যই যেন পাকিস্তানী সামরিক জান্তা অচিরেই রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে সমর দ্বন্দ্বে পরিণত করে।

উল্লেখ্য যে, এই সময়ে জনতার প্রতিরোধ-ঐক্য ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতিমন্ডলীকেও প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। প্রধান বিচারপতি বি.এ সিদ্দিকী (বদিউদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী) নবনিযুক্ত গভর্নর লেঃ জেঃ টিক্কা খানের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করিতে অস্বীকৃতি জানাইয়া আওয়ামী লীগ পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে শরীক হন।

পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক শাসনকর্তা ১৩ই মার্চ এক আদেশ বলে সামরিক বিভাগে কর্মরত বেসামরিক কর্মচারীদের ১৫ই মার্চ যথারীতি কাজে যোগ দিতে নির্দেশ দেন। নির্দেশে ইহাও বলা হয় যে, ইহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ কাজে যোগ না দিলে কেবল চাকুরী হইতেই বরখাস্ত করা হইবে না, উপরন্তু সামরিক আদালতের বিচারে সর্বোচ্চ দশ বৎসর সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হইবে।

ইহার পাল্টা জবাবে বেসামরিক প্রশাসন চালু রাখিবার স্বার্থে ১৪ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান ৩৫টি নূতন বিধি জারি করেন এবং তদানুযায়ী ১৫ই মার্চ হইতে পরবর্তী দিবসগুলি বেসামরিক প্রশাসনযন্ত্র তাঁহার নির্দেশিত বিধি মোতাবেক দেশের প্রশাসন কার্যপরিচালনা করিতে থাকে।

এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকটে জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার আশংকায় জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট জাতিসংঘ কর্মচারীদিগকে পূর্ব

জয় স্বাধীন বাঙলা

ফরওয়ার্ড ষ্টুডেণ্টস ব্লকের আবেদন

। আপোষের চোরাবালিতে বাঙলার এ স্বাধীনতার উদীত সূর্য্য যেন মেঘাচ্ছন্ন না হয় ।

সংগ্রামী বন্ধুগন,

সাড়ে সাতকোটি বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে—ঘরে ঘরে আজ উড়ছে স্বাধীন বাঙলার পতাকা। দুই যুগ ধরে যারা বাঙলার রাজনৈতিক, সামাজিক আর অর্থনৈতিক ঐতিহ্যের চিহ্নটুকু নিশ্চিহ্ন করার জন্য স্বৈরাচারের নির্মম, হিংস্র নখরে থাবা এ বাঙলার মাটিতে চালিয়েছিল—আজকে বীর বাঙালীর রুদ্র রোষের মুখে আর কালের অমোঘ বিচারে বাঙলার মাটি থেকে উৎখাৎ হয়ে আজ তারা আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবার পথে।

সংগ্রামী সাথী ভাইবোনেরা,

স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার এ দুর্বার সংগ্রামকে খতম করার নিমিত্তে শোষক চক্রের কারসাজির জাল বিস্তার সবিশেষ লক্ষনীয়। মুক্তিপাগল বাঙালীরা শোষকদের দু-একটি কারসাজির মুখোশ ইতিমধ্যেই আঁচ করতে সক্ষম হয়েছে।

বাঙলার জনপদ আজ বাঙলার বীর মুক্তি ফৌজদের রক্তে রঞ্জিত। বিদেশী সেনাদের পদচারনায় বাঙলার মাটি আজও অপবিত্র ও কলঙ্কিত।

এরই পটভূমিতে যে চক্র শোষকদের রুদ্ররোষের দাবানলে বহ্নিশিখা সাময়িক ক্ষীনতর হয়ে এ বাঙালার মানুষের জন্য কুম্ভীরাশ্রু প্রদর্শন করা আরম্ভ করেছে।

মুক্তিকামী জাগ্রত ভাইবোনেরা,

ইয়াহিয়া-ভুট্টো-কাইয়ুম চক্র আজ আপোষের চোরাবালি সৃষ্টি করতে চায়। প্রাসাদ চক্রের এ বিস্তারিত জালের পতন অভিলাষী কিন্তু আজ আমাদের সর্বাগ্রে আপোষের সেই জালে পদচারনা থেকে বিরত থাকার শপথ নিতে হবে।

সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী নিপিড়ীত বাঙালী যদি পশ্চিমাদের সে আপোষের চোরাবালিতে পদচারনা করে তা'হলে যুগের নির্ধারিত স্থানে আর ইতিহাসের অবধারিত কলঙ্কিত অধ্যায়েই বাঙালীদের স্থান হবে। আজকের এ স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়কদের এ শিক্ষা গ্রহন করা উচিৎ হবে, নচেৎ ভাবীকালেও পলাশীর বিশ্বাসঘাতকদের দলেই ইতিহাসের রক্ত বাক্য চিহ্নিত করে রাখবে।

পরিশেষে বাংলার সাড়ে সাতকোটি জাগ্রত স্বাধীনতাকামী ভাইবোনদের নিকট আমাদের আকুল আবেদন টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত বাঙলার প্রতিটি ঘরে ঘরে মাতৃভূমি বাঙালাকে স্বাধীন করার যে দুর্বার প্রতিজ্ঞা গর্জে উঠেছে তাকে যে কোন মূল্যে বাঁচিয়ে রেখে "স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাঙলা দেশ" গঠন করতে হবেই। এরই প্রেক্ষিতে সর্বস্তরে "বাঙালা মুক্তিফ্রন্ট" (Bengal Liberation Front) গঠন করুন, গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে, মুক্তি ফৌজ গড়ে তুলুন আর স্বাধীনতা সংগ্রামকে সঠিক পথিতে এগিয়ে নিয়ে চলুন। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী।

জয় স্বাধীন বাঙলা

বিনীত

মো: লুৎফর রহমান
সভাপতি

সৈয়দ ওয়াহেদুল করীম
সাধারণ সম্পাদক

ফরওয়ার্ড ষ্টুডেন্টস ব্লকের সাংগঠনিক সম্পাদক মো: এম, সামুল হক সেলিম কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

পাকিস্তান হইতে অপসারণের অনুমতি প্রদান করেন। শেখ মুজিব ১৯শে মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবৃতিতে ইহার প্রতিবাদ করিয়া মন্তব্য করেন যে, কর্মচারী অপসারণের মাধ্যমেই জাতিসংঘের দায়িত্ব সমাপ্ত হয় না। বাংলাদেশে যে গণহত্যা চলিতেছে, তাহাতে জাতিসংঘের মানবাধিকার হুকমির সম্মুখীন বলিয়াও শেখ মুজিব এই বিবৃতিতে মন্তব্য করেন।

ইয়াহিয়া-ভুট্টোর ঢাকা আগমন

রাজনৈতিক সংকট নিরসনকল্পে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৫ই মার্চ ঢাকা আগমন করেন এবং শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত ১৬ই মার্চ আড়াই ঘন্টা, ১৭ই মার্চ এক ঘন্টা, ১৯শে মার্চ এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট, ২০শে মার্চ দুই ঘন্টা দশ মিনিট, ২১শে মার্চ এক ঘন্টা তিরিশ মিনিটব্যাপী কয়েক দফা রাজনৈতিক বৈঠকে মিলিত হন। মুজিব-ইয়াহিয়ার আলোচনার আলোকে প্রেসিডেন্ট হাউস হইতে ঢাকা সফরের আমন্ত্রণ পাইয়া পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৫ সদস্যবিশিষ্ট এক প্রতিনিধিদলসহ ২১শে মার্চ ঢাকা আগমন করেন। এবং ২১শে মার্চ হইতে ২৪শে মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টোর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২২শে মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টোর ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের ঐকমত্য অনুসারে প্রেসিডেন্ট ২৫শে মার্চে আহূত জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য যে, এই মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনায় তিন মাসের জন্যে নিম্নলিখিত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যথা :

১। সামরিক আইন প্রত্যাহার, ২। বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান) ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তর, ৩। জেনারেল ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকিবেন, ৪। দেশ রক্ষা, বৈদেশিক নীতি (বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যতীত মুদ্রা ও পুঁজি পাচার নিষিদ্ধকরণসহ) ছাড়া বাকি সর্বময় ক্ষমতা বাংলাদেশ সরকারের হাতে থাকিবে, ৫। তিন মাস অতিক্রান্ত হইলে প্রত্যেক অঞ্চলের জাতীয় পরিষদ সদস্যবর্গ সংবিধান রচনাকল্পে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী স্থিরীকরণের নিমিত্ত পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হইবেন। তৎপর সংবিধান সমস্যাবলীর সর্বগ্রাহ্য সমাধান নির্ধারণকল্পে সদস্যবর্গ যুক্ত বৈঠকে মিলিত হইবেন।

এই সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত রূপদানের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের তরফ হইতে সর্বজনাব তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও ডঃ কামাল হোসেন এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার পক্ষ হইতে এম.এম আহমদ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, বিরচাপতি এ.আর কর্নেলিয়াস, লেঃ জেঃ পীরজাদা ও লেঃ কঃ এম.এ হাসান ১৯শে মার্চ, ২৩শে মার্চ ও ২৪শে মার্চ বৈঠকে মিলিত হন। ২৫শে মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের এতদসংক্রান্ত চূড়ান্ত ঐকমত্যের বিষয় ঘোষণার কথা ছিল।

২৫শে মার্চের কালোরাত্রি

কিন্তু সকলই গরল ভেল। খুব সম্ভব পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোই ইয়াহিয়া-মুজিব প্রণীত ঐকমত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান এবং ফলে ২৫শে মার্চ কালো রাত্রিতে জাতিকে বিভক্ত করিবার পথে এক অশুভ চক্রের পদচারণা শুরু হয়, এবং রচিত হয় এক নির্মম কালো ইতিহাস।

এই কালো ইতিহাসের জঘন্যতম ও নির্মম ভূমিকা পালনের অসৎ উদ্দেশ্যে অতিসন্তর্পণে ও সংগোপনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঢাকা অবস্থান ও আলোচনার ছদ্মাবরণে সর্বাত্মক সামরিক প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করা হয়। আলোচনার ফলাফল জানার জন্য দেশবাসী যখন উদ্বিগ্নচিত্তে ও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল, আশা-নিরাশার ঠিক সেই মুহূর্তেই ২৫শে মার্চ (১৯৭১) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সহিত বৈঠকের পর ভুট্টো সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে বলেন যে, "অবস্থা অত্যন্ত সংকটপূর্ণ"।

প্রকাশ, সন্ধ্যার মধ্যেই নাকি শেখ মুজিব জানিতে পারেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ জনতার নেতা ও স্বাধীন বাংলা সংগ্রামের অন্যতম অধিনায়ক হিসাবে পরিচিত শেখ মুজিব সেদিন কি নির্মমভাবেই না বিভ্রান্ত ও প্রতারিত হইয়াছিলেন প্রতারক ও চানক্যরূপী সমর নায়ক জেনারেল ইয়াহিয়ার কূট-কৌশলের মারপ্যাচে।

সেদিন রাত ৯-৩০ মিনিটে বাংলা জাতীয় লীগের সদর দফতর হইতে আমি পূর্বদেশের প্রখ্যাত কলামিস্ট জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরীর বাসায় যাই। তাহার সহিত অবস্থার আলোচনা-পর্যালোচনার পর স্বীয় বাসভবন মুখে রওয়ানা হই। যাত্রাপথে বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে ব্যারিকেড রচনা করিতে দেখিতে পাই ভয়ার্ত অথচ সংকল্পে অটল জনতাকে। উদ্বিগ্ন ও উদ্‌গ্রীব জনতা স্থানে স্থানে আমার গাড়ী থামাইয়া পরিস্থিতি জানিতে চায়। আমি তখনও অনাগত হামলা সম্পর্কে কিছুই ওয়াকিফহাল ছিলাম না। পথিমধ্যে সর্বত্র ব্যারিকেড, উদ্বিগ্ন জনতার ভিড়। আঁচ করিলাম, সংঘর্ষ অত্যাসন্ন এবং বোধহয় সর্বশেষ ফল সুখের নয়।

বাসায় পৌছিয়াই জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরীকে টেলিফোন করি এবং পথে পথে ব্যরিকেড ও উৎকণ্ঠিত জনতার সহিত আলোচনার বিষয়বস্তু তাহাকে জানাই। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মিরপুর রোডের উপর সাঁজোয়া বাহিনীর গাড়ীর আওয়াজ ও অহরহ গুলির শব্দ শুনিতে পাই এবং টেলিফোনে জনাব চৌধুরীকে সে খবরও জানাই। রাত ১২টার দিকে পুনরায় জনাব চৌধুরীর সহিত আলাপ করিবার নিমিত্ত টেলিফোনের রিসিভার উঠাইয়া বুঝিলাম টেলিফোন বিকল। চারিদিকে তখন মুহুর্মুহু রকেট, মর্টার, মেশিনগান ও কামানের আওয়াজ, চতুর্দিকে আগুনের লেলিহান শিখা ও গগনচুম্বি অন্ধকার ধোঁয়া। রাতভর কখনও বিছানায় কখনও বারান্দায়, কখনও ছাদে গভীর উৎকণ্ঠার সহিত পায়চারি করিতে থাকি। রাত্রি তিন ঘটিকার দিকে মাইকে ঘোষণা শুনিতে পাই, সামরিক শাসনকর্তা ঢাকা নগরে

অনির্দিষ্টকালের জন্য সান্ধ্য আইন জারি করিয়াছেন।

২৫শে মার্চ কালো রাত্রিতে পাক সেনাবাহিনীর নির্মম হামলায় প্রাণ হারান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দ্বিতীয় প্রধান আসামী পাক নৌ-বাহিনীর তেজস্বী অফিসার লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন। আগেই বলিয়াছি, পূর্ব পাকিস্তান সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিকল্পনার পশ্চাতে মূল ব্যক্তি ছিলেন তিনি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের পর তিনি তাঁহার পরিকল্পিত 'স্বাধীন বাংলা' সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার মানসে 'লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি' গঠন করেন। আমি তাহার পথের পথিক ছিলাম। আমিই কমিটির উক্ত নামকরণ করি। পাক বাহিনী লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে তাহার এলিফ্যান্ট রোডস্থ বাসভবন হইতে বলপূর্বক বাহিরে আনিয়া প্রাণাধিক প্রিয় স্ত্রী ও সন্তানদের দৃষ্টিসীমার স্বল্প দূরেই গুলি করিয়া হত্যা করে। শুধু তাঁহাকেই নয়, সেই কালো রাত্রে হত্যা করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব, প্রফেসর এম. মুনিরুজ্জামান, জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ডঃ জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, সিনিয়র লেকচারার ডঃ ফজলুর রহমান খান, সিনিয়র লেকচারার এম.এ মোকতাদির, লেকচারার অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, লেকচারার এম.আর খান খাদেম, লেকচারার শরাফত আলী, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সিনিয়র লেকচারার ডঃ মোহাম্মদ সাদত আলী ও সিনিয়র টিচার মোঃ সাদেককে। ইহা ছাড়াও এই কালো রাত্রিতে এসএম হল, জহুরুল হক হল ও জগন্নাথ হলের বহু সংখ্যক আবাসিক ছাত্রকে হত্যা করা হয়। ব্যারিকেড রচনাকারী জনতা, রেসকোর্স মন্দিরবাসী, নিঃস্ব বস্তিবাসী কেহই এই হত্যাযজ্ঞের হাত হইতে রেহাই পায় নাই। বস্তুতঃ সেই রাত্রিতে হত্যার তান্ডব নৃত্যই চলিয়াছে পাক বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীতে। খেলা হইয়াছে রক্তের হোলি। সংহতি রক্ষার নামে কি অদ্ভুত পাশবিক নৃশংস কর্মকান্ড! কিন্তু শুধু কি মানুষ? পাক বাহিনীর হাতে সেই রাত্রিতে অগ্নিদাহ হইয়াছে জনতার কণ্ঠ দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, সাপ্তাহিক গণবাংলা ও ইংরেজী দৈনিক পিপলস অফিস। অগ্নিদাহ হয় নয়াবাজার বস্তি, কাঠের আড়ত।

উপরে বর্ণিত নারকীয় লোমহর্ষক ঘটনা পুনরায় ঘটে ১৪ই ডিসেম্বর (১৯৭১) তারিখ। এই দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুনির চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক ডঃ আবুল খায়ের, অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক আনোয়ার পাশা, অধ্যাপক রশিদুল হাসান, ডঃ সিরাজুল হক খান, অধ্যাপক ডঃ ফয়জুল মুহি, ডঃ মর্তুজা ঘাতকের হিংস্র ছোবলের শিকারে পরিণত হন এবং জাতিকে বঞ্চিত করিয়া পরপারের যাত্রায় পাড়ি জমান। ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ যথা– ডাঃ আলীম চৌধুরী, ডাঃ ফজলে রাব্বি, প্রখ্যাত সাংবাদিকবৃন্দ যেমন দৈনিক ইত্তেফাকের বার্তা সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেন, সংবাদের বার্তা সম্পাদক শহীদুল্লাহ কায়সার, বিবিসি, ও পিপিআই-এর নিজামুদ্দীন আহমদ, পিপিআই-এর নাজমুল হক, দৈনিক পূর্বদেশের এ.এন.এম গোলাম মোস্তফা, দৈনিক মর্নিং নিউজের আবুল বশার চৌধুরী ও খন্দকার আবু তালেব একই প্রতহিংসার বা জিঘাংসাবৃত্তির হুতাশনে প্রাণ দেন।

শেখ মুজিবের গ্রেফতারবরণ

পাকিস্তানী সামরিক শাসকবর্গ ২৫শে মার্চের অপারেশনের নাম দিয়াছিল "অপারেশন সার্চ লাইট"। তদানীন্তন ঢাকাস্থ পাকিস্তানী সামরিক হেড কোয়ার্টারের জনসংযোগ কর্মকর্তা লেঃ কঃ সিদ্দিক সালেক রচিত "Witness to surrender" নামক গ্রন্থে এই অপারেশনের পূর্ণ নীল নকশা বিবৃত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্ট-২ এবং ১৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, নিম্নোক্ত ১৬ জন ও অন্যান্য রাজনীতিবিদ ও ছাত্রনেতাদের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত কবিরার জন্য আর্মি হেড কোয়ার্টার তাহাদের এজেন্সীকে নির্দেশ প্রদান করে :

১) শেখ মুজিবুর রহমান ২) সৈয়দ নজরুল ইসলাম ৩) তাজউদ্দিন আহমদ
৪) এম.এ.জি ওসমানী ৫) সিরাজুল আলম খান ৬) আবদুল মান্নান
৭) আতাউর রহমান খান ৮) প্রফেসর মোজাফফর আহমদ ৯) অলি আহাদ
১০) মিসেস মতিয়া চৌধুরী ১১) ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ১২) ফয়জুল হক
১৩) তোফায়েল আহমদ ১৪) নূরে আলম সিদ্দিকী ১৫) আবদুর রউফ
১৬) আবদুল কুদ্দুস মাখন এবং অন্যান্য ছাত্র নেতৃবৃন্দ

হানাদার বাহিনীর হামলার খবর পূর্বাহ্নে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমান ২৫শে মার্চ কাল রাত্রিতে স্বীয় বাসভবনে অবস্থান করিবার মনস্থ করেন। পাক হানাদার বাহিনী তাঁহার ধানমন্ডির ৩২নং রোডস্থ বাড়ী ঘেরাও করিলে শেখ সাহেব বিনাবাক্য ব্যয়ে ধরা দিলেন। শেখ মুজিবের মুক্তিযুদ্ধের সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণই ছিল আপামর দেশবাসীর প্রত্যাশা ও আকাঙ্খা। বিস্ময়-বিমূঢ় দেশবাসী শেখ সাহেবের সংকট মুহূর্তে ভিন্ন আচরণে হইল বিভ্রান্ত ও হতবাক। জেনারেল মিঠার আদেশ ছিল শেখ সাহেবকে জীবিত বন্দী করিবার এবং তাহাই হইল। উপরে উল্লেখিত অন্য কাহাকেও গ্রেফতার করিতে পাক হানাদার বাহিনী সেই কৃষ্ণ রাত্রে ব্যর্থ হয়। তাই আজও আমরা জীবিত।

গ্রেফতারের পর শেখ সাহেব আদমজী ক্যান্টনমেন্ট স্কুলে কালো রাত্রি যাপন করেন, ২৬শে মার্চ তাঁহাকে ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউসে (Flag stafe House) স্থানান্তরিত করা হয় এবং ২৮শে মার্চ বিমানযোগে শেখ সাহেবকে করাচী নিয়া যাওয়া হয়।

চতুর্দিকে গুজব ছিল শেখ মুজিব মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিতেছে। ইহা মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্যই ২রা এপ্রিল (১৯৭১) করাচী বিমান বন্দরে তোলা ছবি বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় ছাপানো হয় এবং তাঁহাকে মীয়নওয়ালী কারাগারের বদ্ধ প্রকোষ্ঠে বন্দী করিয়া রাখা হয়।

এইভাবে সমঝোতার নামে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান বিশ্বাসঘাতকতা ও লজ্জাকর কাপুরুষোচিত ভূমিকায় অভিনয় করেন। পাছে এই গণহত্যা অভিযান, লোমহর্ষক ধর্ষণকাহিনী ও গৃহদাহের এবং ধ্বংসযজ্ঞের কাহিনী ফাঁস হইয়া যায়, তাই হোটেল ইন্টারকন্টিন্যান্টালে ৩৫ জন বিদেশী সাংবাদিককে প্রথমে আটক করা হয় এবং

২৬শে মার্চ (১৯৭১) পাঠাইয়া দেওয়া হয় বিমানযোগে ঢাকার বাহিরে।

পশ্চিম পাকিস্তানের মীয়ানওয়ালী কারাগারে আটক থাকাকালে আগস্ট মাসে সামরিক আদালতে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া ও ভারতসহ বিভিন্ন দেশের অবিরাম প্রচেষ্টা ও জাগ্রত বিশ্ববিবেকের চাপে পাক-সরকারের পক্ষে শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবের প্রাণনাশ করা সম্ভব হয় নাই। শেখ সাহেব নেতৃবৃন্দকে ঢাকা ত্যাগ করে গা-ঢাকা দেওয়ার পরামর্শ দিলেও আন্দোলনের খাতিরে নিজে আত্মগোপন করেন নাই কেন? ১৯৪৯ সালের অক্টোবর ব্যতীত অতীতেও গণ-আন্দোলনের প্রয়োজনে শেখ সাহেব কখনও আত্মগোপন করেন নাই। দেখা গিয়াছে, সকল আন্দোলনের সূচনা মুহূর্তে স্বগৃহে অবস্থান করিয়াই তিনি গ্রেফতারবরণ করিতেন। রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য আলোচনায় বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবরের উপস্থিতির অপরিহার্যতা সন্দেহের অবকাশ রাখে না। প্রকাশ, মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ ফারল্যান্ড শেখ সাহেবের সহিত তাঁহার বাসভবনে দেখা করিয়া তাঁহার জীবনের নিরাপত্তায় মার্কিন সাহায্যের নিশ্চয়তা দিয়াছিলেন। উল্লেখ্য যে, ২১শে জুন এস.এস পদ্মা ও এস.এস সুন্দরবন অস্ত্র বোঝাই বিষয়ে 'সিনেট সাব কমিটি অন রিফিউজি'র নিকট সাক্ষাৎদানকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি এসিসট্যান্ট সেক্রেটারী মিঃ ক্রিস পারভন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা রাজনৈতিক সমাধানকল্পে পাকিস্তানের সহিত আলোচনার ইঙ্গিত বহন করে। বোধহয় এই কারণেই বন্দী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকায় অবস্থানকারী পরিবারের ব্যয় বহনকল্পে পাক সরকার শেখ মুজিবুর রহমানের স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেসাকে প্রতি মাসে ১৫০০ (পনের শত টাকা) করিয়া মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিউজ উইকের সিনিয়র এডিটর আরন্ড ডি বোরচগ্রেভের (Arnand de Brochgrave) সহিত এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এই মর্মেও আভাস দিয়াছিলেন যে, "জাতি দাবী করিলে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিবেন।"

ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লক

প্রসঙ্গত ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লক সম্পর্কে দু'একটি কথা না বলিলে ইতিহাসের প্রতি অবিচার করা হইবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই ছাত্র সংগঠনটির অবদান অনস্বীকার্য নয়, অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বলও বটে। সরকারী অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত ১৪ খন্ডের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলসহ মুক্তিযুদ্ধের উপর লেখা অনেক গ্রন্থেও স্বাধীনতা আন্দোলনে এই ছাত্র সংগঠনটির নানাবিধ সাহসী ভূমিকার কথা উল্লেখ রহিয়াছে।

ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লক প্রতিষ্ঠা লাভ করে উনিশ'শ একাত্তরের ১৭ই ফেব্রুয়ারী। বস্তুতঃ বাংলা ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রশক্তির একদল মেধাবী ও সম্ভাবনাময় তরুণের সমন্বয়ে গোড়াপত্তন ঘটে এ সংগঠনটির। তোপখানা রোডের দোতালায় (বর্তমান হোটেল সম্রাট) এক অনাড়ম্বর ছাত্র সমাবেশে এই সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। সে সমাবেশে জনাব লুৎফর রহমানকে সভাপতি, জনাব সৈয়দ ওয়াজেদুল করিমকে

সাধারণ সম্পাদক ও জনাব মোঃ এহ্সানুল হক সেলিমকে সাংগঠনিক সম্পাদক করিয়া ৩১ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়। অন্যান্য নির্বাহী সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সর্বজনাব সিরাজুল ইসলাম, চৌধুরী মোহাম্মদ ফারুক, ফোরকান আহমদ, সাহনেওয়াজ খান, আলতাফ হোসেন, চৌধুরী সাইদুর রেজা মানিক, মোশাররফ হোসেন খান (মালেক) ও মীর্জা সফিকুল ইসলাম প্রমুখ। '৭১-এর ১লা মার্চ হইতে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের সেই উত্তাল দিনগুলিতে তাহাদের উচ্চকিত "মুক্তিফৌজ গঠন কর বাংলাদেশ স্বাধীন কর" এ বুলন্দ আওয়াজ সারা বাংলায় এক অভূতপূর্ব শিহরণ জাগায়। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি লগ্নে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লক যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করে তার সার্বিক নেতৃত্বে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক জনাব মোঃ এহ্সানুল হক সেলিম।

স্বাধীনতা যুদ্ধে এই সংগঠনের প্রত্যেকেই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে এই সংগঠনের সভাপতি লুৎফর রহমান ফরিদপুরে পাক বাহিনীর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে ধৃত হইয়া নিগৃহিত হন এবং পরবর্তীতে শাহাদত বরণ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কোন ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতির স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়া শহীদ হওয়ার গৌরব একমাত্র ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকেরই। উপরন্তু ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লক-এর সবাই মুক্তিযুদ্ধে কোন না কোনভাবে নিগৃহিত হইয়াছেন।

স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পর '৭২ এর ১৪ই জানুয়ারীতে ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লক কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে "স্বাধীনতা বরণ উৎসব" পালন করে। বর্ণাঢ্য সেই অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এক বিশাল ছাত্র জনসভাও অনুষ্ঠিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অংশ বিশেষ পরদিন বাংলাদেশ বেতারেও প্রচার করা হয়। সেই অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় বক্তাগণ স্বাধীন বাংলার তৎকালীন সরকারের উদ্দেশ্যে দেশ থেকে অনতিবিলম্বে ভারতীয় সৈন্য ভারতে ফেরৎ পাঠানোর ব্যবস্থা করা এবং ভারতের সাথে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকারের কোন গোপন চুক্তি হইয়াছে কিনা, হইয়া থাকিলে তা প্রকাশের দাবী জানান। সেই সভায় বক্তাগণ সরকারের প্রতিটি ভালো কাজে সহযোগীতা এবং জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী যে কোন কার্যক্রমের কঠোর বিরোধীতা করিবার ঘোষণা প্রদান করেন।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হইয়াছিলেন জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ ফারুক- পরবর্তীতে ১৯৭৩ এর ডিসেম্বরে সংগঠনের কাউন্সিল অধিবেশনে তিনি সভাপতি ও জনাব আ.হ.ম আবদুল বাতেন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। একতরফাভাবে ভারত কর্তৃক ফারাক্কার পানি প্রত্যাহার, ২৫ সালা ভারত-বাংলা দাসত্ব চুক্তি, ভারতের সহিত সম্পাদিত সকল গোপন ও অসমচুক্তি বাতিলের আন্দোলনসহ মুজিব বিরোধী প্রতিটি আন্দোলনে এ ছাত্র সংগঠনের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সাহসিকতাপূর্ণ।

নেতাদের আত্মগোপন

২৭শে মার্চ সকাল ৮টায় সান্ধ্য আইন কিছুক্ষণের জন্য শিথিল হইবার পর পরেই বাংলা মজদুর ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান সিরাজুল হক ইপিআর টিসি'র গাড়ী লইয়া আমার ৭নং কলেজ স্ট্রীট ধানমন্ডি বাসভবনে আসেন। আমি তাঁহার সহৃদয়তায় বিমোহিত ও কৃতজ্ঞ। দেওয়ান সাহেবের গাড়ী লইয়াই আমি সহোদরা বোন সুফিয়া ও তাহার সন্তানদিগকে রেলওয়ে অফিসার্স বাংলো হইতে ঢাকার এলিফ্যান্ট রোডে উর্দুভাষিনী মিসেস রাজিয়া বেগমের হেফাজতে পৌঁছাইয়া বিদায় গ্রহণ করি। রেলওয়ে অফিসারদের বাংলোগুলিতে বাঙ্গালী পরিবারের উপরে নামিয়া আসিয়াছিল নারকীয় পরিস্থিতি। সতর্ক সাহসী ও সহৃদয়া মিসেস রাজিয়া বেগম ১৯৭১ সালের ভয়াবহ নয়টি মাস আমার বোনের পরিবারের যুবক-যুবতী ও শিশু-সন্তানদের, বোনের স্বামী রেলওয়ে অফিসার কফিলউদ্দিন আহমদ ও বোনকে আশ্রয় দান করিয়া ইজ্জত ও প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ। ভারত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমিও তাঁহার আবাসস্থলে আত্মগোপন অবস্থায় জীবন যাপন করিয়াছি।

২৭শে মার্চ ভোর ৮ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা পর্যন্ত এবং ২৮শে মার্চ ভোর ৭টা হইতে দ্বি-প্রহর ১২টা পর্যন্ত সান্ধ্য আইন শিথিল করা হয়। পরে সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার-বিবেচনা করিয়া সান্ধ্য আইন শিথিলের মেয়াদ অপরাহ্ন ৫টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং পরবর্তী দিবসগুলিতে সান্ধ্য আইন আরো শিথিল করা হয়।

ঢাকায় বাঙ্গালী পুলিশ বাহিনী ও গোয়েন্দা কর্মচারীরা তখন পলাতক। অতএব বাঙ্গালী গোয়েন্দা কর্মচারীর অবর্তমানে সাহসী রাজনৈতিক কর্মীর পক্ষে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা কঠিন ছিল না। তাই আমরা শাহজাহানপুরে দেওয়ান সিরাজুল হকের বাসভবনে এক বৈঠকে মিলিত হইয়া উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া প্রতিরোধ সংগ্রাম সংগঠিত করিবার এবং প্রতিরোধ শক্তি সংহত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

বলাই বাহুল্য যে, সরকারী রোষ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের উপর ছিল প্রচন্ড। তাই আত্মগোপন ছাড়া তাহাদের উপায় ছিল না। সান্ধ্য-আইন শিথিল হইবার সঙ্গে সঙ্গে নগরবাসী প্রায় সকলেই পরিবার-পরিজনসহ ঢাকা ত্যাগে উদ্যোগী হন। এইসব পলায়নপর কাফেলার অন্তর্ভুক্ত নারী ও শিশু সন্তানের চরম কষ্ট স্বচক্ষে না দেখিলে অনুধাবন করা যাবে না। যানবাহন নাই, সম্বল স্বীয় পদযুগল, নিজ নিজ শিরে বাক্স-পেটরা, কাঁখে দুধের শিশু। তবু চলিতে হয় জান-মাল-ইজ্জতের তাগিদে। কেহ কেহ দেশ ছাড়ার ব্রতী হইয়াই ভিনদেশের অচেনা পরিবেশে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করে। এই কাহিনী লিখা সম্ভব নয়। কারণ, তখনকার দৃশ্য বর্ণনা করিবার জন্য ভাষার উপর যে দখল থাকা দরকার, তাহা আমার নাই। এমনি কাফেলার সঙ্গী হইয়া পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি নেতা জনাব মনসুর

আলীসহ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের যুবক সদস্য ডাঃ আবু হেনা নদী পাড়ি দেন এবং অপরতীরে জিঞ্জিরা পথে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামানের সহিত তাঁহাদের মোলাকাত হয়। তাঁহারা একই সঙ্গে কলাতিয়ার জনাব রতন সাহেবের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। পূর্বাহ্নে ঐ বাড়ীতে শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ, আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রাত্রে নূরে আলম সিদ্দিকী ও আবদুল কুদ্দুস মাখনও আশ্রয় সন্ধানে ঐ বাড়ীতে আসেন।

রাত্রির আলোচনা বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সর্বজনাব মনসুর আলী, কামরুজ্জামান, শেখ ফজলুল হক মনি, তোফায়েল আহমদ ও ডাঃ আবু হেনা ৪ঠা এপ্রিল ভারতের পথে সারিয়াকান্দি পৌছেন। পরিবার-পরিজনের জন্য বিচলিত মনসুর আলী স্পীডবোটযোগে সিরাজগঞ্জ যাত্রা করেন। সারিয়াকান্দি হইতে ৪ঠা এপ্রিল (১৯৭১) বগুড়া পৌছিয়া জীপযোগে সর্বজনাব কামরুজ্জামান, শেখ ফজলুল হক মনি, তোফায়েল আহমদ ও ডাঃ আবু হেনা পাক-হিলি সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতীয় হিলিতে প্রবেশ করেন এবং তথা হইতেই ৬ই এপ্রিল (১৯৭১) কলিকাতা পৌছেন। প্রকাশ, তাঁহারা নাকি পূর্ব ব্যবস্থা মোতাবেক ভবানীপুর এলাকার ডাঃ রাজেন্দ্র রোডের ২৬ নং বাড়ীতে পৌছান এবং তথায় তাঁহাদের অবস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। ঐ বাড়ীতে শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে "শ্রী ভূজঙ্গ ভূষণ রায়" এই ছদ্মনামে বরিশাল জেলা নিবাসী সাবেক পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রী চিত্তরঞ্জন সুতার স্ত্রী-পুত্র ও কয়েকজন সহকর্মীসহ বাস করিতেন। প্রকাশ, তিনিই ভারত সরকার ও শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করিতেন এবং ভারত সরকারই তাঁহাকে ঐ বাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

এই সময় কলিকাতায় খবর আসে যে, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম যথাক্রমে মোহাম্মদ আলী, রহমত আলী ছদ্মনামে দিল্লীতে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা ২রা এপ্রিল ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সহিত আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। উল্লেখ্য যে, তাঁহারা উভয়েই ৩০শে মার্চ বনগাঁয় পৌছিয়াছিলেন। তাহাদের পরিচয় পাওয়া মাত্র বিএসএফ-এর একজন মেজর তাঁহাদিগকে স্যালুটদানের পর বিওপিতে (Border out post) লইয়া গিয়া যথারীতি আদর-আপ্যায়ন করেন। ইহা জনাব তাজউদ্দিন-এর ১৮ই মার্চ প্রেরিত ম্যাসেজ যথাস্থানে পৌছিবার ফল। ওই রাত্রিতেই দিল্লী হইতে তাঁহাদের উদ্দেশ্যে হেলিকপ্টার পাঠান হয়। তাঁহারা দিল্লীর পথে যাত্রা করেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৭২-এর ১৪ই মার্চ সাংবাদিক সম্মেলনের এক পর্যায়ে উপরোক্ত তথ্য সরবরাহ করা হয়।

পরবর্তী তথ্য হইতে ইহাও জানা যায় যে, যশোহর হইতে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য মোশাররফ আলী সর্বপ্রথম দিল্লী গমন করেন ও ভারতীয় সরকারের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন।

অস্থায়ী সরকার

যাহা হউক, কলিকাতায় দলীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনার পর জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম পুনঃ দিল্লী গমন করেন এবং ৫ ও ৬ই এপ্রিল ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সহিত দুই দিবসব্যাপী আলোচনায় ভারত-বাংলাদেশ সহযোগিতার ভিত রচিত হয়। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে ভারতের সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতার নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, জনাব তাজউদ্দিন আহমদের এই দিল্লী অবস্থানকালেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী পদে তাঁহার অধিষ্ঠিত হইবার ঘোষণা টেপ রেকর্ডিং করা হয়। ভারত সরকার সৈয়দ নজরুল ইসলামকে আনিবার জন্য ডাঃ আবু হেনাকে ময়মনসিংহ প্রেরণ করেন। ডাঃ আবু হেনা গারো এলাকাভুক্ত গারোবোদা হইয়া ময়মনসিংহ যান। ৮ই এপ্রিল জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম দিল্লী হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ময়মনসিংহের অন্তর্গত গারো হিলের ঢালু হইয়া ভারতে প্রবেশ করতঃ তুরাতে অবস্থান করিতেছেন– এই খবর পাইয়া জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম ও শেখ ফজলুল হক মনি শিলিগুড়ি রওয়ানা হইয়া যান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামকে লইয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন পথে যেসব নেতা কলিকাতা পৌছেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্বজনাব মনসুর আলী, কর্নেল আতাউল গনি ওসমানী, মিজানুর রহমান চৌধুরী ও অধ্যাপক ইউসুফ আলী উল্লেখযোগ্য। ভারত সরকার সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ ও কর্নেল আতাউল গনি ওসমানীর বিএসএফ-এর কলিকাতা হেড অফিসে অবস্থানের ব্যবস্থা করেন। ভারত সরকারের এবম্বিদ তৎপরতার অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল সুস্পষ্ট অর্থাৎ যাহাতে ভারত সরকারের অভীষ্ট সিদ্ধি অর্থাৎ পাকিস্তানকে বিভক্ত করিবার মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া না হয়। অনেক বাক-বিতণ্ডার পর শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রেসিডেন্ট, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট, তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী, খন্দকার মোশতাক আহমদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মনসুর আলীকে অর্থমন্ত্রী, কামরুজ্জামানকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করিয়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়।

১নং ক্যামাক স্ট্রীটে এম.এল.এ হোস্টেলে (ব্যবস্থাপক পরিষদ সদস্য ভবন) জনাব কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত ৭৬ জন জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যের বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে সর্বজনমান্য নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রেসিডেন্ট এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খন্দকার মোশতাক আহমদ, তাজউদ্দিন আহমদ, মনসুর আলী ও কামরুজ্জামানকে উপদেষ্টা করা হয়। জনাব তাজউদ্দিন আহমদ সভায় উপস্থিত ছিলেন না। অধ্যাপক ইউসুফ আলী সভার কার্যবিবরণী ও প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করেন।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সহিত দিল্লীতে আলোচনাকালে জনাব তাজউদ্দিন আহমদ

কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী হিসাবে স্বীয় নাম ঘোষণা এবং ১নং ক্যামাক স্ট্রীটে এম.এল.এ হোস্টেলের এই বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাব পরস্পর বিরোধী ও সামঞ্জস্যহীন। এই বিরোধ নিরসনকল্পে সর্বজনাব তাজউদ্দিন আহমদ, কামরুজ্জামান, মনসুর আলী, আবদুল মান্নান (সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় শ্রমিক লীগ), শেখ ফজলুল হক মনি, আবদুর রাজ্জাক, আ স ম রব, আমিরুল ইসলম বার-এট-ল', মিজানুর রহমান চৌধুরী এক বৈঠকে মিলিত হইয়া ঐকমত্যে পৌছান এবং জনাব তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী পদে বরণ করিয়া লন। বস্তুতঃ ব্যক্তি তাজউদ্দিন আহমদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করিলে ভারত সরকারের নিকট হইতে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য প্রাপ্তি ঘোরতরভাবে ব্যাহত হইবার আশংকা ছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা

১০ই এপ্রিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় ও ১১ই এপ্রিল জনাব তাজউদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বেতার ভাষণ দেন। ১২ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ৬ সদস্যবিশিষ্ট অস্থায়ী সরকার গঠনের সংবাদ প্রচারিত হয়। ১৩ই এপ্রিল আগরতলা আশ্রয় গ্রহণকারী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের সভায় উদ্ভূত পরিস্থিতির আলোকে সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়। ১৭ই এপ্রিল অপরাহ্ন দেড় ঘটিকায় কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথপুর গ্রামের আম্রকুঞ্জে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। এইভাবেই ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে বাংলার যে স্বাধীনতা সূর্য অস্ত যায়, ১৯৭১ সালে বৈদ্যনাথপুর আম্রকাননে সেই স্বাধীনতা সূর্যের পুনঃ উদয় হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

"যেহেতু ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হইয়াছিল।"

এবং

"যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়াছিলেন।"

এবং

"যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ তারিখে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহবান করেন।"

এবং

"যেহেতু আহূত এই পরিষদ স্বেচ্ছাচার এবং বেআইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য

বন্ধ ঘোষণা করেন।"

এবং

"যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিবার পরিবর্তে বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের সহিত পারস্পরিক আলোচনাকালে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ন্যায়নীতি বহির্ভূত এবং বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করেন।"

এবং

"যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান।"

এবং

"যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছে এবং এখনও বাংলাদেশে বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন গণহত্যা ও নির্যাতন চালাইতেছে।"

এবং

"যেহেতু পাকিস্তান সরকার অন্যায় যুদ্ধ, গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার পরিচালনা দ্বারা বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের একত্রিত হইয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়া জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।"

এবং

"যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর তাহাদের কার্যকরী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যে ম্যান্ডেট দিয়াছেন সেই ম্যান্ডেট মোতাবেক আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন করিয়া পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য– সেইহেতু আমরা বাংলাদেশকে রূপায়িত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি এবং উহা দ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করিতেছি।

এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক পদেও অধিষ্ঠিত থাকিবেন। রাষ্ট্রপ্রধানই সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী।

রাষ্ট্রপ্রধানের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়োগের ক্ষমতা থাকিবে। তাঁহার করধার্য ও অর্থব্যয়ের ক্ষমতা থাকিবে। তাঁহার গণপরিষদের অধিবেশন আহবান ও উহা মুলতবী ঘোষণার ক্ষমতা থাকিবে। উহা দ্বারা বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতার তিনি অধিকারী হইবেন।

বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, কোন কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকনে অথবা যদি রাষ্ট্রপ্রধান কাজে যোগদান করিতে না পারেন অথবা তাঁহার কর্তব্য এবং প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পালন করিবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসেবে এবং জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তাইয়াছে উহা যথাযথভাবে আমরা পালন করিব।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের এই স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকরী বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার জন্য আমরা অধ্যাপক এম. ইউসুফ আলীকে যথাযথভাবে রাষ্ট্রপ্রধান ও উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য দায়িত্ব অর্পণ ও নিযুক্ত করিলাম।"

স্বাক্ষর ঃ- এম. ইউসুফ আলী

(বাংলাদেশ গণপরিষদের পক্ষ থেকে)।

রাজনৈতিক সমাধানের শর্তাবলী

গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ ঘোষণার পর দেশী-বিদেশী বিভিন্ন মহল কর্তৃক রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাবের জওয়াবে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম ১৯৭১ সালের ৬ই জুন বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হইতে প্রচারিত ভাষণে নিম্নোক্ত শর্তাধীনে রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাব দেন :

১। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বীকৃতি দান,

২। বাংলার মাটি হইতে পাক-বাহিনী প্রত্যাহার,

৩। বঙ্গবন্ধু ও ধৃত জনপ্রতিনিধিদের অবিলম্বে মুক্তিদান,

৪। আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ নির্ণয় ও ক্ষতিপূরণ দান।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ২৮শে জুন (১৯৭১) এক বেতার ভাষণে অনুপস্থিত, পলাতক সদস্যদের আসন শূন্য ঘোষণা করিয়া জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের শূন্য

আসনগুলিতে উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা সাধারণ্যে প্রকাশ করেন। উদ্দেশ্য জনপ্রতিনিধিদের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তর।

৫ ও ৬ই জুলাই (১৯৭১) বাংলাদেশ হইতে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের এক যুক্ত অধিবেশনে ভাষণদানকালে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার দুইমুখী নীতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া বলেন, "...বঙ্গবন্ধুর আদেশে ও নির্দেশে আমি এবং আপনাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন সাহেব আলোচনা শুরু করিলাম। জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেবের পক্ষে ছিলেন লেঃ জেঃ পীরজাদা।... আলোচনা চলিতে থাকিল। ২৪শে মার্চ পর্যন্ত আলোচনা হইল। আমার বন্ধু তাজউদ্দিন উপস্থিত। আমি বারবার এই কথা বলিয়াছি, এই আলোচনা কোনকালেই ব্যর্থ হয় নাই। ২৪ তারিখে ডকুমেন্ট (Document) তৈরী হোল। অথচ ২৫শে মার্চ রাত্রে অতর্কিতে হামলা হইল নিরস্ত্র অপ্রস্তুত বাংগালীর উপর। তাই বিশ্বাসঘাতক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ২৮শে জুন পরিকল্পনার দাঁতভাংগা জওয়াব লড়াই-এর মাঠে দেওয়ার সংকল্প বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করিলেন।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার কর্নেল আতাউল গণি ওসমানীকে জেনারেল পদে উন্নীত করিয়া সর্বাধিনায়ক ও কর্নেল আবদুর রবকে চীফ অব স্টাফ নিযুক্ত করেন। বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ১১ই এপ্রিল-এর বেতার ভাষণে মেজর শফিউল্লাহ্, মেজর জিয়াউর রহমান ও মেজর খালেদ মোশাররফকে যথাক্রমে ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল অঞ্চল, চট্টগ্রাম-নোয়াখালী অঞ্চল ও শ্রীহট্ট-কুমিল্লা অঞ্চলের সেক্টর কমান্ডার হিসাবে ঘোষণা করেন।

পরবর্তীতে রণাঙ্গন অর্থাৎ সমগ্র বাংলাদেশকে মোট ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। এই সেক্টরগুলির নেতৃত্ব বা কমান্ডে যাহারা বিভিন্ন সময়ে ছিলেন তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল :

সেক্টর ১। (ক) মেজর জিয়াউর রহমান (জুন পর্যন্ত)
(খ) ক্যাপ্টেন মোঃ রফিক (জুন হইতে ডিসেম্বর)

সেক্টর ২। (ক) মেজর খালেদ মোশাররফ (সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)
(খ) মেজর এ.টি.এম. হায়দার (সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর)

সেক্টর ৩। (ক) মেজর কে. এম. শফিউল্লাহ্ (সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)
(খ) মেজর এ.এন.এম. নূরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর)

সেক্টর ৪। মেজর সি.আর. দত্ত

সেক্টর ৫। মেজর মীর শওকত আলী

সেক্টর ৬। উইং কমান্ডার এম. কে. বাশার

সেক্টর ৭। মেজর কাজী নূরুজ্জামান

সেক্টর ৮। (ক) মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (আগস্ট পর্যন্ত)

(খ) মেজর এম.এ. মনজুর (আগষ্ট হইতে ডিসেম্বর)

সেক্টর ৯। (ক) মেজর এম.এ. জলিল (ডিসেম্বরের প্রথমার্ধ পর্যন্ত)

(খ) মেজর জয়নাল আবেদীন (যুদ্ধের শেষ কিছুদিন)

সেক্টর ১০। হেড কোয়ার্টার পরিচালিত কমান্ড বাহিনী

সেক্টর ১১। (ক) মেজর আবু তাহের (আগস্ট হইতে নভেম্বর)

(খ) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এম. হামিদুল্লাহ (নভেম্বর হইতে ডিসেম্বর)

ইহা ছাড়া নৌ-কমান্ডাররা নির্দিষ্ট মিশনে নিয়োজিত হইলে তাহারা সংশ্লিষ্ট কমান্ডারদের অধীনে কাজে নিয়োজিত থাকিতেন।

ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের প্রায় ১৪ হাজার বাঙ্গালী নওজোয়ান, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় ৩ হাজার নওজোয়ান ও ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ, আনসার-মোজাহিদদের লইয়া পুনর্গঠিত সশস্ত্রবাহিনী কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয়। সেক্টর কমান্ডারদের নামের ইংরেজী অধ্যাক্ষরে 'এস' (S) ফোর্স, 'জেড' (Z) ফোর্স ও 'কে' (K) ফোর্স নামে মুক্তিযোদ্ধারা বিভক্তি ও পরিচিতি লাভ করে। উল্লেখ্য যে, নিউজ উইকের সিনিয়র এডিটর আরনয়নড ডি. ব্রচগ্রেডের সহিত সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রকাশ করেন যে, ৬ ব্যাটেলিয়ন সৈন্য, পুলিশ ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস হইতে সর্বমোট ৬০ হাজার সশস্ত্র বাহিনী ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে (পাকিস্তান টাইমস, ৭/১১/৭১)।

ঢাকা ত্যাগ

২৫শে মার্চের পর কারফিউ তুলিয়া নেওয়া হইলে আমি ঢাকা নগরে বেবী ট্যাক্সিতে সর্বত্র সকাল-সন্ধ্যা ঘোরাফেরা করিতাম। স্বচক্ষে পাক-বাহিনীর অত্যাচার, জুলুম হত্যাযজ্ঞের চিহ্নসমূহ পরিদর্শন করিতাম। সুবিধা ছিল, বাংগালীরা মর্মাহত ও ঐক্যবদ্ধ, কেহ কাহারো বিরুদ্ধে কোন সংবাদ অত্যাচারী সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষকে কর্ণগোচর করিত না। এমনি অবস্থায় সাপ্তাহিক 'জনতা' সম্পাদক আনিসুজ্জামানের সহিত তাঁহার শেখ সাহেব বাজারস্থ বাসভবনে সাক্ষাৎ করি। পরিস্থিতির পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের পর জনাব আনিসুজ্জামান আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গের সহিত যোগাযোগ করিবার জন্য কলাতিয়া যাইতে সম্মতি জানান এবং তদানুযায়ী ৩১শে মার্চ তিনি কলাতিয়ার পথে ঢাকা ত্যাগ করেন। ১লা এপ্রিল কলাতিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া জনাব আনিসুজ্জামান আমাদিগকে জানান যে, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তাঁহার কলাতিয়া পৌছিবার পূর্বেই ভারতের পথে রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন।

আমি জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরীর সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করিতাম এবং মাঝে মাঝে তাঁহার অভয়দাস লেনের বাসায় রাত্রিযাপন করিতাম। তাঁহার বাসায় রাত্রিযাপন করিতে গিয়া তাঁহারই রেডিও সেটে ২৭শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র হইতে 'স্বাধীন বাংলা'র ঘোষণা শুনিতে পাই। চট্টগ্রাম বেতারের কালুরঘাট ট্রান্সমিশন কেন্দ্র হইতে মেজর জিয়াউর রহমানের কণ্ঠস্বরে 'স্বাধীন বাংলার' ডাক ধ্বনিত হইয়াছিল। এই ডাকের মধ্যে সেই দিশাহারা, হতভম্ব, সম্বিতহারা ও মুর্ছিতপ্রাণ বাংগালী জনতা শুনিতে পায় এক অভয়বাণী, আত্মমর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িবার আহবান, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের লড়াই-এর সংবাদ। ফলে সর্বত্র উচ্চারিত হয় মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতনের সংকল্প, আওয়াজ উঠে– জালেমের নিকট আত্মসমর্পণ নয়, আহবান ধ্বনিত হইতে থাকে আত্মপ্রতিষ্ঠার, প্রতিরোধ শক্তিকে সুসংহতকরণের। এইভাবেই সেদিন জাতি আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পায় এবং মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

যাহা হউক, জনাব আনিসুজ্জামানের রিপোর্ট শুনিবার পর আমি ঢাকায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাতের আশা ত্যাগ করিয়া আগরতলায় যাওয়ার মনস্থ করি। আমরা পূর্ব পাকিস্তানকে কয়েকটি এলাকায় বিভক্ত করি এবং বিভিন্ন গ্রুপে বাংলা জাতীয় লীগ কর্মীদিগকে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ছড়াইয়া পড়িবার নির্দেশ দান করি। স্থানীয় পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করিয়া স্থানীয়ভাবে নেতৃত্ব দিবার ও দলমত-নির্বিশেষে প্রতিরোধ শক্তিকে সুসংহত করিবার আহবান জানাই। ঢাকা নগরীকে যোগাযোগ রক্ষার কেন্দ্রস্থল ঘোষণা করি। আমরা মুক্তি সংগ্রামের একটি দলীয় কর্মসূচী প্রণয়ন করি এবং কর্মীদের উদ্দেশ্যে উহার মাধ্যমে যথাযথ নির্দেশ দিয়া সবাইকে মুক্তি সংগ্রামের মূল প্রতিরোধ শক্তি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সহিত যোগাযোগ করিবার নির্দেশ দেই। এইভাবে সবকিছু ঠিকঠাক করিয়া দিয়া আমি ৩রা এপ্রিল আগরতলার পথে ঢাকা ত্যাগ করি। জনাব গাফফার চৌধুরীর আমাদের সহিত যাইবার কথা ছিল কিন্তু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণে তিনি নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা করিতে পারেন নাই।

যাত্রা পথে দেওয়ান সিরাজুল হক ও আমি ডেমরা ও নরসিংদী অতিক্রম করিয়া নবীনগর পৌছি এবং নবীনগরে আমার বড় ভাইয়ের শ্বশুর জনাব আমীর আলী খান সাহেবের বাড়ীতে রাত্রিযাপন করিয়া ৪ঠা এপ্রিল ভোরে লঞ্চে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাই। সেখানে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য লুৎফল হাই সাচ্চুর সহিত উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়। মেজর খালেদ মোশাররফ তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মুক্ত এলাকার প্রতিরক্ষা ব্যূহের সিপাহসালার।

এরপর আমি ও দেওয়ান সিরাজুল হক আখাউড়া যাই এবং আখাউড়া ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এম.এ. তাহেরের আতিথ্য গ্রহণ করি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য আলী আজম ভূঁইয়া আগরতলায় অবস্থানরত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের পক্ষ হইতে ৮ই এপ্রিল আমাদের সহিত রাজনৈতিক আলোচনা করিবার

জন্য আখাউড়া আসেন এবং আমরা এম.এ. তাহেরের বাসভবনে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হই। বৈঠকে আমরা নিম্নলিখিত ঐকমত্যে পৌছি :

১। ভারতীয় সৈন্যকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইবে না।

২। মুক্তিযুদ্ধে জয়ের পর ভারতীয় হিন্দু বাংগালীদের বাংলাদেশে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইবে না।

৩। লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী সার্বভৌম ও স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান গঠন। পূর্ব পাকিস্তান ভারতভুক্ত অংশ হইবে না।

৪। মুক্তিযুদ্ধে জয়ের পর দেশে কোন ফৌজি শাসন কায়েম হইবে না।

জনাব আলী আযম ভূঁইয়ার সহিত আলোচনার পর আমি পুনরায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রত্যাবর্তন করি। ১৪ই এপ্রিল অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিমান হামলা হয়। ১৫ই এপ্রিল ভোরে পুনরায় পাক বিমান বাহিনীর হামলা চলিল। বিমান হামলার পর আমি ও দেওয়ান সিরাজুল হক পুনরায় আখাউড়া পথে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ত্যাগ করি। পরে আমরা আখাউড়া হইতে সীমান্ত গ্রাম চাঁদপুরে আশ্রয় গ্রহণ করি এবং এইভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করি যাহাতে প্রয়োজন দেখা দিলে আত্মরক্ষার কারণে যেন ত্বরিত ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি। পাক হাওয়াই হামলায় পর্যুদস্ত মুক্তিবাহিনী ও বেঙ্গল আর্মি বিনা যুদ্ধে ভৈরব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গোপনাঘাট, উজানীসার ও আজমপুর হইতে পশ্চাদপসরণ করে এবং অনায়াসেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া পাক বাহিনীর করায়ত্ত হয়।

সীমান্তগ্রামগুলি পাক বাহিনীর বিষদৃষ্টিমুক্ত নয় এই আশংকায় ও সীমান্তের অপর পাড়ে সরকারের নিকট হইতে বাস্তব সাহায্যের আশায় ও মুক্তিকামী সহযোগী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহিত ঐক্যবদ্ধ কর্মপন্থা নির্ধারণকল্পে আমরা পরিশেষে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আগরতলায় পৌছি।

ভারতের অভিজ্ঞতা

আগরতলায় লক্ষ্য করি, আওয়ামী লীগ নেতা, কর্মী ও সমর্থক ব্যতীত অন্য রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তবে প্রকৃত জাতীয়তাবাদী দলগুলির সংকট চরম ও বর্ণনাতীত ছিল। আওয়ামী লীগ প্রকৃত জাতীয়তাবাদী দল ছিল না, ইহা ছিল বরং ক্ষমতা লিপ্সু, নীতি বিবর্জিত রাজনৈতিক কর্মীদের সমাবেশ মাত্র। তাই বলিয়া আওয়ামী লীগে যে কিছুসংখ্যক আদর্শবাদী নিঃস্বার্থ কর্মী ছিলেন না, তাহা নহে, তবে তাঁহারা ছিলেন ব্যতিক্রম।

কমিউনিস্ট পার্টি এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও তাহাদের গণ-সংগঠন কর্মীদের আহার ও বাসস্থানের দায়িত্ব গ্রহণ করে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মস্কো বা পিকিং)। আমরা জাতীয়তাবাদী দলগুলি তাহাদের সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা দল, সেই বোধটুকু তাহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় নাই। তাহারা ছিল আত্মস্বার্থগত প্রাণ, আত্মবিলীনগত

প্রাণ নহে। মন্তব্যটি কটু শুনাইলেও নির্মম সত্য।

আগরতলায় আমি স্বল্পবেতনভুক সরকারী কর্মচারী বাবু সুধীরচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করি। মহৎপ্রাণ সুধীর বাবুর আতিথেয়তা ও অমায়িক ব্যবহার আমার স্মৃতিপটে চিরজাগরুক থাকিবে। তাঁহারই বাসভবনে জনাব সিরাজুল আলম খান ও জনাব আ স ম আবদুর রবের সহিত মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তাঁহারা আমার সহিত নীতিগতভাবে একমত হলেও বাস্তবে ১৬ই ডিসেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের মাটিতে মুক্তিযুদ্ধের মহড়া দিয়াছেন, কিন্তু বাংলার মাটিতে দাঁড়াইয়া মাতৃভূমির মুক্তির জন্য পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েন নাই। তাঁহারা উভয়েই পৃথক পৃথক আলোচনায় আমাকে কলিকাতার অস্থায়ী সরকার প্রধান তাজউদ্দিন আহমদের সহিত দেখা করিবার প্রস্তাব দিলে আমি তাহাদিগকে বলি, প্রথমতঃ আমার বুঝা দরকার, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ভারতের ক্রীড়নক শক্তি কি না, দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় সেনাবাহিনী মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত হইবে, নাকি বঙ্গসন্তানরাই বঙ্গের স্বাধীনতা পরিচালনা করিবে। যদি ভারতীয় সৈন্য সশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়া বাংলাদেশের মাটিকে পাক বাহিনীমুক্ত করে, তাহা হইলে কার্যক্ষেত্রে আমরা ভারতের ক্রীড়নক রাষ্ট্রেই পরিণত হইব। তৃতীয়তঃ আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব বাংলা জাতীয় লীগের মতো সহযোগী স্বাধীনতা কামী দলগুলির সহিত যুক্তভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করিতে সম্মত আছে কি না? চতুর্থতঃ এখানকার অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছে আপনাদের অবস্থা খুব একটা সুবিধাজনক নহে। চতুর্থ মন্তব্যের উত্তরে আ স ম আবদুর রব দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, ভারত সরকার জানেন, আমাদের শক্তি আছে কি-না। তাই "ভারত সরকার আমাদিগকে পৃথকভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় বাস্তব সাহায্য দিবে, এই মর্মে আমরা (সিরাজুল আলম গ্রুপ) আশ্বাস পাইয়াছি।" কথা প্রসঙ্গে তিনি আমার সহিত এই বিষয়েও একমত হইলেন যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই গেরিলা যুদ্ধ সংগঠিত করিতে হইবে। সিরাজুল আলম খান তখন কলিকাতা রওয়ানা হওয়ার পথে। তিনি বলিলেন যে, কলিকাতায় অবস্থানরত অস্থায়ী সরকারের সহিত আমার বক্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করিয়া আমাকে ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের মাধ্যমে ফলাফল জানাইবেন। সিরাজুল আলম খান কলিকাতা গেলেন বটে, তবে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক কোন উত্তর আমাকে কখনও পাঠান নাই। সেইদিন আমি যে আশংকা প্রকাশ করিয়াছিলাম, পরবর্তীকালে হইয়াছেও তাহাই। ভারত নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতেই পাকিস্তানের অভ্যুদয় লগ্ন হইতে পাকিস্তান ধ্বংসের চেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োগ অব্যাহত রাখিয়াছে আর আমরা আমাদের নিজস্ব প্রয়োজনে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা চাহিয়াছি। ইহা শুধু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নয়, অনুধাবনের বিষয়।

যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত বাংলা জাতীয় লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এম.এম. আনোয়ারের উদ্যোগে আগরতলা এসেম্বলি মেম্বার রেস্ট হাউসে আমার ও আওয়ামী লীগ নেতা এবং জাতীয় পরিষদ সদস্য আবদুল মালেক উকিলের মধ্যে সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর এক দীর্ঘ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্পষ্ট ভাষায়

জানাইয়া দেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতারের পূর্ব মুহূর্ত অবধি কোন নির্দেশ দান করেন নাই। এইদিকে মুজিব-ইয়াহিয়ার মার্চ-এর আলোচনার সূত্র ধরিয়া কনফেডারেশন প্রস্তাবের ভিত্তিতে সমঝোতার আলোচনা চলিতেছে। জনাব মালেক উকিল আমাকে ইহাও জানান যে, তিনি এই আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে আশাবাদী। প্রসঙ্গত ইহাও উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে আমি সর্বজনাব আবদুল মালেক উকিল, জহুর আহমদ চৌধুরী, আবদুল হান্নান চৌধুরী, আলী আজম, খালেদ মোহাম্মদ আলী, লুৎফুল হাই সাচ্চু প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতার সহিত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে আলোচনাকালে নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বা লক্ষ্য সম্পর্কে কোন নির্দেশ দিয়াছিলেন কিনা, জানিতে চাহিয়াছিলাম। তাহারা সবাই স্পষ্ট ভাষায় ও নিঃসঙ্কোচে জবাব দিলেন যে, ২৫ মার্চ পাক বাহিনীর আকস্মিক অতর্কিত হামলার ফলে কোন নির্দেশ দান কিংবা পরামর্শ দান নেতার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। অথচ স্বাধীনতা উত্তরকালে বানোয়াটভাবে বলা হয় যে, তিনি পূর্বাহ্নেই নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়, শেখ মুজিবুর রহমানও ১৯৭২ সালের ৭ই এপ্রিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে ঘোষণা করেন যে, তিনি নির্দেশনামা জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীকে পাঠাইয়াছিলেন। কথিত সেই নির্দেশনামাটি নিম্নরূপ :

DECLARATION OF WAR OF INDEPENDENCE

BY

BANGABANDHU SK. MUJIBUR RAHMAN

A historic message from Bangabandhu Sk. Mujibur Rahman conveyed to Mr. Zahur Ahmed Chowdhury on 25th March, 1971 at 11.30 hours immediately after crack-down of Pak Armay.

"Pak army suddenly attacked E.P.R. base at Pilkhana, Rajarbagh Police line and killing citizens, Streets battles are going on in every street of Dacca, Chittagong. I appeal to the nations of the World for help. Our freedom fighters are gallantly fighting with the enemies to free the motherland. I appeal and order you all in the name of Almighty Allah to fight to the last drop of blood to liberate the country. Ask Police, E.P.R; Bengal Regiment and Ansar to stand by you and to fight. No compromise, Victory is ours. Drive out the last enemy from the holy soil of motherland. Convey this message to all Awami League leaders, workers and other patriots and lovers of freedom. May Allah bless you.

"Joy Bangla"

Sk. Mujibur Rahman

(This message was communicated from Teknaf to Dinajpur and to

friendly countries through some vessels which were anchored at Bay of Bengal near Chittagong by Mr. Zahur Ahmed Chowdhury)

পাক বাহিনীর আক্রমণের অব্যবহিত পর রাত সাড়ে ১১টায় (২৫শে মার্চ, ১৯৭১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীর নিকট প্রেরিত একটি ঐতিহাসিক বাণী : (অনুবাদ)

"পাক বাহিনী আকস্মিকভাবে পিলখানাস্থ ইপিআর বেইজ এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করিয়াছে এবং নাগরিকদের হত্যা করিতেছে। ঢাকা চট্টগ্রামে প্রতিটি রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলিতেছে। আমি সাহায্যের জন্য বিশ্বের জাতিসংঘের প্রতি আবেদন জানাইতেছি। মাতৃভূমিকে মুক্ত করিবার জন্য আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুর সহিত বীরের মতো যুদ্ধ করিতেছে। আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার নামে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়ার জন্য আপনাদের প্রতি আবেদন জানাইতেছি এবং নির্দেশ প্রদান করিতেছি। পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং আনসারদের আমাদের পাশে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করুন। কোন আপোষ নাই, বিজয় আমাদেরই হইবে।

মাতৃভূমির পবিত্র মৃত্তিকা হইতে শেষ শত্রুটিকেও বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা, কর্মী ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাপিয়াসী ব্যক্তিদের নিকট এই বাণী পৌঁছাইয়া দিবেন। আল্লাহ আপনাদের সহায় হউন।

জয় বাংলা
শেখ মুজিবুর রহমান

উপরে আওয়ামী লীগ নেতাদের সাক্ষ্য অনুসারেই শেখ মুজিবুর রহমানের এই দাবী যে বিতর্কের উর্ধ্বে নয়, তার জ্বলন্ত প্রমাণ "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র" গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত বার্তাটি হচ্ছে "এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহবান জানাচ্ছি, আপনারা যেখানেই আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে দখলদার বাহিনীর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিরোধ করুন। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি হইতে বহিষ্কার এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদেরকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।" উপরোক্ত বক্তব্যটিই হুবহু ভারতীয় বৈদেশিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত "বাংলাদেশ ডকুমেন্টসেও" পূর্বাহ্নে ছাপা হয়। অবশ্য একথা সত্য যে, সেইদিন আমার মতো কোটি কোটি উৎকণ্ঠিত বাঙ্গালীপ্রাণ উল্লিখিত অনুরূপ একটি নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল।

শেখ মুজিবুর রহমান যে স্বাধীনতার কোন ঘোষণা দেন নাই তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৭১-এর ৬ই নভেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভাষণ দেন সে ভাষণে। সেই ভাষণে মিসেস গান্ধী বলেন,

...The cry for Independence (of Bangladesh) arose after Sheikh Mujib was arrested and not before. He (Mujib) himself, so far as I know has not ask for Independence even now. ...

"স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠে (বাংলাদেশের) শেখ মুজিব গ্রেফতার হওয়ার পর তার আগে নয়। আমি যতদূর জানি আজো পর্যন্ত শেখ মুজিব স্বাধীনতা দাবী করেননি।"

পক্ষান্তরে সেই অন্ধকার ও সংকটময় মুহূর্তে ২৭শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র হইতে ভাসিয়া আসিয়াছিল একটি নির্ভয় বীরদর্পী বিদ্রোহী কণ্ঠ। এই কণ্ঠই সেইদিন লক্ষ কোটি বাঙ্গালীকে দিয়াছিল অভয়বানী, ডাক দিয়াছিল মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিতে। কণ্ঠটি বেঙ্গল আর্মি মেজর জিয়াউর রহমানের। উক্ত ঘোষণার অংশ বিশেষ হইল :

"I major Ziaur Rahman head of the provisionery revoletionary Government of Bangladesh do hereby proclaim and declare the Independence of Bangladesh.... and also appeal to the all Democratic socialist and other countries of the world to immediate recognise our country Bangladesh. .... Insha Allah victory is ours."

"প্রিয় দেশবাসী,

আমি মেজর জিয়া বলছি। এতদ্বারা আমি স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি...

বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও অপরাপর রাষ্ট্রসমূহকে অনতিবিলম্বে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার আহবান জানাচ্ছি।... ইনশা আল্লাহ জয় আমাদের সুনিশ্চিত।"

পরবর্তীতে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে জিয়াউর রহমান কর্তৃক সংশাধিত ঘোষণাটি নিম্নরূপ :

I major Ziaur Rahman on behalf of our great Leader Bangabandhu Sheikh Mujibar Rahman supreem commander and head of the provisionery Revoletionary Govt of Bangladesh do hereby proclaim and declare the Independence of Bangladesh. ...

সময়োপযোগী নেতৃত্বদানের ব্যর্থতা ঢাকিবার জন্যই পরবর্তীকালে শেখ মুজিবুর রহমান অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নির্দেশ প্রদানের একটি ঘোষণা পত্র ছাপাইয়া সাধারণ্যে বিলি করিয়াছিলেন। ইহা না করিয়া তাহার উচিত ছিল সময়োপযোগী অবদানের জন্য মেজর জিয়াউর রহমানকে স্বীকৃতিদান, ইহা হইত নেতাসুলভ আচরণ। তাঁহার মানসিকতার কারণেই শেখ মুজিবুর রহমান স্বাভাবিকভাবেই তাহা করিতে ব্যর্থ হন। ইহা অতীব পরিতাপ এবং দুঃখের বিষয়। যাহা হউক, মেজর জিয়ার বলিষ্ঠকণ্ঠস্বর সেইদিন বাংগালী জাতিকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল কবির সেই অভয় বাণী :

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই;
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

এই ভাবেই মেজর জিয়ার সেই ঘোষণা বাংগালী জাতির ধমনীতে সেইদিনের সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে জোগাইয়াছিল ঐশ্বরিক শক্তি; মনে-প্রাণে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিল দৃঢ়প্রত্যয়, আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধ। ফলকথা, সেইদিন বাংগালীকে নিজস্ব সত্ত্বায় আত্মস্থ ও বলীয়ান করিবার জন্যই যেন মেজর জিয়ার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা আন্দোলনকে নিয়মতান্ত্রিক অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে আপামর জনতার সার্বিক গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত করেন এবং এইভাবেই তিনি বাংগালী জনতার একচ্ছত্র ও অবিসংবাদিত নেতার আসনে আসীন হয়। ২৫শে মার্চ (১৯৭১) মধ্যরাত্রিতে পাক হানাদার বাহিনীর আক্রমণের খবর পূর্বাহ্নে জ্ঞাত হইয়াও তিনি তদমুহূর্তে জাতির মরণপণ সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক হওয়া সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় স্বীয় বাসভবনে অবস্থান করিয়া হানাদার বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ইতিহাস সচেতন মাত্রই জ্ঞাত যে, ১৯৪২ সালের আগস্টের অহিংস আন্দোলনের মহাপ্রাণ মহাত্মা গান্ধী ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়' (Quit India) আন্দোলনের ডাক দিলে কারারুদ্ধ গান্ধী পন্থী লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ 'হাজারীবাগ' কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া সশরীরে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তদ্রূপ শাসক ফরাসীদের বিরুদ্ধে আলজিরিয়ার মুক্তিযুদ্ধে সশরীরে নেতৃত্বদানের উদ্দীপনায় বিপ্লবী আহমদ বেনবেল্লাহ্ কারাগার হইতে পলায়ন করেন। গ্রেফতারী পরোয়ানা জ্ঞাত হওয়ার পর দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি নেলসন ম্যান্ডেলা ১৯৬২ সালে গোপনে দেশ ত্যাগ করে আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশে বর্ণবাদী রাষ্ট্রীয় নীতির বিরুদ্ধে জনমত গড়ার জন্য সভা-সমিতি করেন। এমনকি লন্ডনে জনমত গড়ার জন্য আত্মগোপন অবস্থায় তাহার বক্তব্য দিতে সাহসী ভূমিকা পালন করেন– অতঃপর আত্মগোপন অবস্থায় দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করেন। আমরা দেশবাসী পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশরীরে সেনাপতিত্ব চাহিয়াছিলাম– পাক হানাদার বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ চাই নাই। তথাপি আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের বিশাল সাংগঠনিক শক্তির কারণেই দেশবাসী তাহার নামেই মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণে কুণ্ঠাবোধ করে নাই।

প্রসঙ্গ চট্টগ্রাম বেতার মারফত স্বাধীনতার ঘোষণা ও মেজর জিয়া

স্বাধীনতা যুদ্ধ হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা নয় কিংবা হঠাৎ করে রেডিওতে ভেসে আসা কোন এক ব্যক্তির ঘোষণায় সারাদেশের মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লো এমনও নয়। একটি দেশের– একটি জাতির, স্বাধীনতা সংগ্রাম দীর্ঘদিনের প্রস্তুতিরই ফসল। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত-সংঘাত-আত্মত্যাগ আর আত্মাহুতির বিনিময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপট গড়ে উঠে। মনে রাখতে হবে আমাদের দেশের স্বাধীনতা

আন্দোলনের প্রেক্ষাপটও দীর্ঘদিনের লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, আন্দোলন-সংগ্রাম আর জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের চরম পরিণতিরই ফলশ্রুতি। ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হতেই পশ্চিম পাকিস্তানী অবাঙালী শাসক-শোষকগোষ্ঠী নিজেদেরকে ক্ষমতায় স্থায়ীভাবে আসীন রাখার মানসে ছলে বলে কৌশলে আমাদেরকে তাদের পদানত রেখে কখনো ইসলামের নামে কখনো গণতন্ত্রের নামে বিভিন্নভাবে তাদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখে। আমাদের ভাষা সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উপর চালায় আগ্রাসন। এরই সূচনা হয় ১৯৪৮ সালে আমাদের মাতৃভাষার উপর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে। এরপর রক্তস্নাত '৫২-এর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, '৫৪-এর নির্বাচনে এ অঞ্চলে মুসলিম লীগের ভরাডুবির মাধ্যমে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয়, '৬২-এর আইউবী সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, '৬৬-এ শেখ মুজিবের ৬ দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, '৬৯-এর ১১ দফা আন্দোলন তথা আইউব শাহীর বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে ৬ দফার পক্ষে এদেশের মানুষের ম্যান্ডেট। স্বায়ত্তশাসন, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। '৫৫ এবং '৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানীর পাকিস্তানকে আস্‌সালামু আলাইকুম, '৭০-এ নির্বাচন বর্জন করে স্বাধীন পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা, '৭০-এর নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সত্ত্বেও পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে নিয়মমাফিক ক্ষমতা হস্তান্তর না করে চক্রান্তের আশ্রয় গ্রহণ– সবকিছু মিলিয়ে ২৩ বছরের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ আর বেদনাই মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করে। ২৫শে মার্চের কালো রাত্রিতে নিরস্ত্র বাঙালীর উপর পাক বাহিনীর নগ্ন হামলার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত সারাদেশে একই আওয়াজ– "মুক্তিফৌজ গঠন করো বাংলাদেশ স্বাধীন করো" ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে এদেশের সর্বস্তরের মানুষ তখন স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত।

অবস্থা এমন দাঁড়ায় সমস্ত বেসামরিক প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ চলে আসে শেখ মুজিবের হাতে। সমস্ত দলমত ছাপিয়ে শেখ মুজিব হয়ে যান একচ্ছত্র নেতা। স্বাধীনতার প্রশ্নে দলমত নির্বিশেষে দেশবাসী বিজয়ী দলের নেতা হিসাবে শেখ মুজিবকে মেনে নেয় স্বাধীনতা সংগ্রামের একছত্র নেতা হিসাবে– জাতীয় স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে। ২৫শে মার্চ কালো রাত্রির পর চট্টগ্রামেও সঙ্গত কারণেই বেসামরিক প্রশাসন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ছিল। ২৬শে মার্চ বেলা ২টায় চট্টগ্রাম বেতার থেকে আওয়ামী লীগ নেতা এম.এ. হান্নান দেশবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানিয়ে একটি ঘোষণা দেয়। যে কোন কারণেই হোক সেটি অনেকের গোচরীভূত হয়নি। পরে নেতৃবৃন্দ দেশের সামরিক বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীকে সংঘবদ্ধ করা এবং দেশবাসীর মনে সাহস সঞ্চারের লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর একজন বাঙালী অফিসার দিয়ে বেতারে একটি ঘোষণা প্রদানের পরিকল্পনা করে। তৎকালীন ইপিআর-এর দায়িত্বে নিয়োজিত ক্যাপটেন রফিক বাংগালীদের মধ্যে সিনিয়র অফিসার হিসেবে ৮ম ইষ্ট বঙ্গেল

রেজিমেন্টের মেজর জিয়ার কথা বলেন। মেজর জিয়া এতে সম্মত হবেন কিনা এ ব্যাপারে নেতৃবৃন্দের মনে সংশয় ছিল। কেননা চট্টগ্রাম বন্দরে ২৪শে মার্চ বাংগালী শ্রমিকরা করাচী হতে আগত সোয়াত জাহাজ হতে অস্ত্র খালাশের কাজ বন্ধ করে দিলে বন্দরের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। এ পরিস্থিতিতে এম. এ. হান্নান, এস.এম ইউসুফ সহ কতিপয় আওয়ামী লীগ, শ্রমিক লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ বন্দরে যায়। সেখানে তাদের সাথে মেজর জিয়ার সাক্ষাৎ হয় নেতৃবৃন্দ মেজর জিয়াকে বাংগালীর স্বাধীকারের আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে সহযোগীতা করার কথা বললে তিনি রাগান্বিত হয়ে তাদের বলেন– **"You know I am a deceipline Army. I can not take the risk of my job and life. You politiceans are created the problems and make the country unstable. What do you think you will libarate the country? It is not possible. Situation will be under control within short time. I am the last man to go with you."** এই যার অবস্থান তাঁকে দিয়ে বেতারে ঘোষণা সম্ভব কিভাবে? তবুও তারা তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। ২৬শে মার্চ মেজর জিয়া যথারীতি সোয়াত জাহাজ হতে অস্ত্র খালাসের জন্য সেনানিবাস হতে চট্টগ্রাম বন্দরের উদ্দেশে বের হবার পর পরই পাকবাহিনী সেনানিবাসে অবস্থানরত মেজর জিয়ার ইউনিটসহ সকল বাংগালী সৈনিকদের নিরস্ত্র করে ফেলে। এমনি অবস্থায় যে কয়জন বাইরে আসতে পেরেছেন তার মধ্যে ল্যাঃ শমসের মুবিন চৌধুরী সেনানিবাসের পরিস্থিতি মেজর জিয়াকে অবহিত করে পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে তার সাথে যোগাযোগ করতে বন্দর অভিমুখে ছুটে যান। টাইগার পাশ এলাকায় জিয়ার সাথে তার সাক্ষাৎ হলে গাড়ী থামিয়ে জিয়াকে সেনানিবাসের পরিস্থিতি জানান। জিয়া তার কথায় বিশ্বাস না করে তাকে ধমক দেন। শমসের মুবিন তাকে সেনানিবাসে টেলিফোন করে সত্যতা যাচাই করতে বলেন। টেলিফোনে তার ইউনিট কিংবা বাসভবনে যোগাযোগে ব্যর্থ হয়ে শমসের মবিনের কথায় তার বিশ্বাস হয়। অতঃপর তারা সেনানিবাসে ফিরে গিয়ে অতর্কিতে তার কমান্ডার কর্নেল জানজুয়াকে হত্যা করে পরিবার পরিজনকে সেনানিব্যসে ফেলে রেখে তার ইউনিটের সৈনিকদের নিয়ে সেনানিবাস ত্যাগ করে। প্রথমে কক্সবাজার চলে যান পরে সেখান থেকে ফিরে এসে গোমদন্তীতে আশ্রয় নেন। এদিকে ২৭শে মার্চ প্রত্যুষে কালুরঘাটে অবস্থিত চট্টগ্রাম বেতারের বিপ্লবী কর্মীরাও অদূরে বাংগালী সেনাদের অবস্থানের খবর পেয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ করে। সেখানে তারা মেজর জিয়াকে বেতারে একটি ঘোষণা দিতে এবং ট্রান্সমিশন কেন্দ্র পাহারা দিতে কয়েকজন সৈনিক দেবার অনুরোধ করে। মেজর জিয়া এতে রাগান্বিত হয়ে তাদের ফিরিয়ে দেন। অবশ্য কিছুক্ষণ পরে তিনি কালুরঘাট ট্রান্সমিশন কেন্দ্র পাহারার জন্য ৮ জন সৈনিক পাঠান। তারপর হঠাৎ করে নিজে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন এবং ট্রান্সমিশন কেন্দ্র থেকে নিজেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ঘোষণা করে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। তার এই ধরনের ঘোষণায় নেতৃবৃন্দ

হতভম্ব হয়ে পড়েন। পরে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব এ.কে. খান সাহেব তার বাসভবনে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে নিজ হাতে মেজর জিয়ার মাধ্যমে শেখ মুজিবের পক্ষে ঘোষণার জন্য সংশোধিত ঘোষণাটি লিখে দেন।

এই সংশোধিত ঘোষণাটি মেজর জিয়া সেদিনই ২৭শে মার্চ সন্ধ্যে ৭-৩০ মিঃ ইংরেজীতে পাঠ করেন এবং কিছুক্ষণ পর পর পুনঃ পুনঃ প্রচারিত হতে থাকে। অবশ্য এর মধ্যে এই ঘোষণার বাংলা অনুবাদও প্রচারিত হতে থাকে। ঘোষণাটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :-

"I Major Ziaur Rahman on behalf of our great leader, the supreeme commander of Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, do here by proclaim and declare the Independence of Bangladesh, and that the government headed by Bangabandhu Sheik Mujibur Rahman has already been formed. It is further proclaimed that Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is the sole leader of the elected representitives of Seventy five millions people of Bangladesh and the Government headed by him is the only legilimate government of the people of the independent sovereign state of Bangladesh which is legally and constitutionaly formed and is worthy of being recognised by all the government, of the world. I therefor reppeal on behalf of our great leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to the governments of all the Democratic, Socialist and other countries of the world specially the big powers and the Nighbouring countries to recognise the legal government of Bangladesh and take effective steps to stop immediately the awful genocide that has been curried on by the army of occupation from Pakistan. To dub out the legally elected representitive of the majority of the peoples as secessionist is a crude joke and contradiction to truth which should be fool none. The guiding princeple of the new state will be first Neutrality. Second peace and third friendship to all and enimity to none. May Allah help us. Joy Bangla."

এটাই হলো জিয়ার কণ্ঠে স্বাধীনতা ঘোষণার ইতিহাস। বিভিন্ন স্থান থেকে এ ধরনের ঘোষণা এসেছে যেমন কুষ্টিয়া থেকে ইপিআর-এ দায়িত্বে নিয়োজিত ক্যাপটেন আবু ওসমান চৌধুরী, গাজীপুর থেকে তৎকালীন মেজর সফিউল্লাহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে তিতাস গ্যাসের মাইক্রোওয়েভ এর মাধ্যমে মেজর খালেদ মোশাররফ। তবে ওই সব ঘোষণাকে ছাপিয়ে জিয়ার ঘোষণাই বেশী সাড়া জাগিয়েছে এ কারণে যে, কালুরঘাট ট্রান্সমিশন কেন্দ্রটি ১০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল। এ কারণে এর ব্যপ্তি ছিল বেশী। জিয়াউর রহমানের ঘোষণাটি তৎকালীন পরিস্থিতিতে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত

দেশবাসীকে নূতন করে সাহস আর আত্মবিশ্বাসের অভয়বাণী শুনিয়ে ছিল এবং নবউদ্যোমে স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নেবার প্রেরণা যুগিয়ে ছিল। এতে কিন্তু জিয়ার কোন একক কৃতিত্ব নাই– এটা মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা আর কার্যক্রমের মধ্যে একটি। পরে জিয়াউর রহমান একজন সেক্টর কমান্ডার হিসাবে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অধীনে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধোত্তর কালে বীরত্বের জন্য 'বীরউত্তম' খেতাবে ভূষিত হন এবং শেখ মুজিব শাসনামল ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ডিপুটি চীফ অব স্টাফ এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তার বাহিনীর নাম ছিল 'জেড ফোর্স'। ২৫ থেকে ২৭শে মার্চ পর্যন্ত চট্টগ্রামে ও পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে তৎকালীন ক্যাঃ রফিক, ক্যাঃ মীর শওকত আলী, লেঃ অলি আহমদ, ল্যাঃ শমসের মুবিন চৌধুরী, ক্যাঃ সুবেদ আলী ভূঁইয়ার অবদান অনস্বীকার্য।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অবদান

আজাদীর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অবদান ছিল বর্ণনাতীত। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সূচনা করে সৈয়দ আব্দুস শাকের, মোস্তফা আনোয়ার, রেজাউল করিম চৌধুরী, রাশেদুল হাসান, আবুল কাসেম (সন্দ্বীপ), আমিনুর রহমান, বেলাল আহমদ, সরফুজ্জামান, আব্দুল্লাহ আল ফারুক ও কাজী হাবিবুদ্দিন বাংলা মায়ের এই দশজন দামাল ছেলেই ২৬শে মার্চ কালুরঘাট ট্রান্সমিশন ও রিসেপশন কেন্দ্র এবং আগ্রাবাদ ব্রড কাস্টিং স্টেশন দখল করেন। ৩০শে মার্চ কালুরঘাট বেতার ভবনে পাক বাহিনী বোমা বর্ষণ করিলে তাহারা ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারসহ গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন। ৩রা এপ্রিল হইতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পূর্ণোদ্যমে চালু হয়।

২৯শে মার্চ উক্ত বেতার কেন্দ্র হইতে ঘোষণা করা হয় যে, শেখ মুজিব মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গেই আছেন, নেতৃত্ব দিতেছেন এবং সংঘর্ষে জেনারেল টিক্কা খান নিহত হইয়াছেন। উক্ত ঘোষণা দেশবাসীর মনে বর্ণনাতীত সাহস সঞ্চার করে। ভারত গমনকালে হাটে-মাঠে, ঘাটে সংবাদটি প্রত্যেকের মুখে মুখে আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি এবং পাক বেতার কেন্দ্রের বিপরীত সত্য ঘোষণা কেহ সেই দিন বিশ্বাস করে নাই। স্বজাতি বেতার কেন্দ্রের ঘোষণার প্রতি যে কি অবিচল আস্থা স্বীয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব্যতীত উহা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। বাংগালী জাতির বদ্ধমূল ধারণাকে বিনষ্ট করিবার প্রয়াসেই পাকিস্তান সরকার করাচী বিমান বন্দরে বসা অবস্থায় বন্দী শেখ মুজিবুর রহমানের ছবিসহ গ্রেফতারের খবর ২রা এপ্রিল পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় প্রকাশ করে। ইহাই পরে ১৫ই এপ্রিল দৈনিক পূর্বদেশে ছাপা হয়।

আগরতলায় পুলিশী হয়রানি

আগরতলা হইতে রওয়ানা হইয়া সোনামোড়া শহরে টেকসী হইতে অবতরণ করিলে আমাকে থানায় যাইতে অনুরোধ জানানো হয়। থানায় জিজ্ঞাসাবাদের পর থানার

অফিসার-ইন-চার্জের বাসভবনে আমার রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করা হয় অর্থাৎ ভদ্রভাবে পরোক্ষ ক্রিয়ায় আমাকে পুলিশী হেফাজতে আটক রাখা হয়। পরদিন ভোর ৮ ঘটিকায় ভারতীয় দেশরক্ষা বিভাগীয় সিকিউরিটি অফিসার ক্যাপ্টেন ঘোষ প্রায় দুই ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। মনে হইল, তাহাদের মনের রোগ কিছুটা প্রশমিত হইয়াছে। তবে, আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে, আমার মতো স্পষ্টভাষী স্বাধীনচেতা জাতীয়তাবাদীদের জন্য ভারত ভূমিতে কোন আশ্রয় নাই; আশ্রয় রহিয়াছে তাহাদের অর্থে পোষা মেরুদন্ডহীন আওয়ামী লীগ মার্কা জাতীয়তাবাদীদের, তাহাদের জন্যই সর্বত্র অবারিত দ্বার।

আগরতলার বাংগালী হিন্দুদিগকে পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংগালীর মরণপণ সংগ্রামে উৎফুল্ল মনে হইয়াছে। ইহা সর্ববাদী সত্য যে, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে সীমান্তের ওপারের বংগভাষাভাষী হিন্দুদের নৈতিক, আর্থিক ও বাস্তব সমর্থন অর্থাৎ সর্বাত্মক সহায়তা ছিল অতুলনীয়। কিন্তু যখনই আমরা বাংলা ভাষাভাষী সকলে ঐক্যবদ্ধ হইয়া বৃহত্তর বাংগালী জাতির জন্য বৃহত্তর স্বাধীন সার্বভৌম বঙ্গদেশ রাষ্ট্র গঠন মর্মে প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি, তখন কেহ কেহ সরাসরি প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, কেহ অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া মূল আলোচনার মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছেন। ঘনিষ্ঠ মেলামেশা, ভাবের গভীর আদান-প্রদান এবং সর্বোপরি বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের ফলে নিঃসন্দেহে এবং স্থির নিশ্চিত হইলাম যে, সীমান্ত পরপারের বঙ্গ ভাষাভাষী হিন্দুদের নিকট বৃহৎ ভারতীয় রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব প্রকৃতই গর্বের বস্তু।

তাহারা যতটাবা বাংগালী তাহার চাইতে অধিক ভারতীয়। ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণেই বোধহয় বঙ্গ ভাষাভাষী হিন্দুদের চিন্তা ভিন্নরূপ। অবাংগালীর শোষণ তাহারা স্বীকার করেন; কিন্তু বাংগালীর সত্ত্বা বিকাশের সংগ্রামে তাহারা আগ্রহী নহেন। পূর্ববংগ, পশ্চিমবংগ, আসাম, মেঘালয় ও পার্বত্য ত্রিপুরা এক সমৃদ্ধশালী বৃহত্তর এলাকা এবং উক্ত গোটা এলাকাই বংগ ভাষাভাষী অধ্যুষিত। ভাষা, সংস্কৃতি, রক্ত ও ভৌগোলিক অবস্থান যদি স্বাধীন রাষ্ট্রের ভিত্তি হয়, তাহা হইলে স্বাধীন ও সার্বভৌম বৃহত্তর বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দাবী একান্ত স্বাভাবিক। সুতরাং কালের যাত্রায় এই দাবী উত্থিত হইবার বিরুদ্ধে সীমান্ত পারের বাঙ্গালীদের বাস্তব ও মনস্তাত্ত্বিক বাধা কোথায়?

স্মর্তব্য, বাংগালী হিন্দু জনতাই সাম্প্রদায়িকতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া ১৯৪৭ সালে 'বোস-সোহরাওয়ার্দী'র উত্থাপিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পরিকল্পনাকে আঁতুড় ঘরেই হত্যা করে। যে মজ্জাগত ধ্যান-ধারণায় তাহারা সেইদিন আত্মবলির রাজপথ অবলম্বন করিয়াছিল, একদিন না একদিন ভারতে অবস্থানরত বংগ ভাষাভাষী হিন্দু জনতা নিজেদের সেই ভুল উপলব্ধি করিবে এবং বৃহত্তর স্বাধীন বংগদেশ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইবে, এই বিশ্বাস ও প্রীতি লইয়া সেইদিনের অপেক্ষায় রহিলাম।

ঢাকা প্রত্যাবর্তন

ভারত ভূমিতে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের দৌরাত্ম্যে মনে হইত যে, আমাদের জীবনের নিরাপত্তা নাই। আমরা সংগ্রামের প্রেরণায় ভারত ভূমিতে গিয়াছিলাম, প্রাণ বাঁচাইতে যাই নাই, ব্যবসা করিতে যাই নাই, ব্যাংক লুটের টাকা সামলাইতে যাই নাই, অসৎ কর্মে লিপ্ত হইতে যাই নাই। লুটের টাকায় জীবনভোগ করিতে যাই নাই, হোটেল রেস্তোরাঁয় বিলাস জীবন-যাপন করিতে যাই নাই, দয়ার ভিক্ষা চাহিতে যাই নাই, সর্বোপরি কাহারো সহিত ঝগড়া করিতেও যাই নাই। আমাদের ঝগড়া-বিবাদ জালেম জেনারেল ইয়াহিয়া সরকারের বিরুদ্ধে, অত্যাচারী পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে। তাই পাক-বাহিনী কবলিত কোটি কোটি বাংগালীদের সহিত সমভাবে মানসিক ও প্রয়োজনবোধে দৈহিক নির্যাতন সহ্য করিবার দৃঢ় সংকল্প লইয়া আমি, সহকর্মী এহসানুল হক সেলিম ও কবিরসহ মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করি এবং ঢাকায় আত্মগোপন জীবনযাপন শুরু করি। আমরা আগরতলা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে ইলিয়টগঞ্জ ব্রিজের সন্নিকটে আসিয়া দেখি যে, ব্রিজটি ভাংগা। কবিরই কিছুদিন পূর্বে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর এক ক্যাপ্টেন ও অন্যান্যের সহায়তায় ব্রিজটি বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে উড়াইয়া দিয়াছিল। উল্লেখ্য যে, পরবর্তীকালে ঢাকার মালিবাগের মোড়ে সশস্ত্র মোকাবেলায় পাক-বাহিনীর গুলিতে কবির শাহাদৎবরণ করে। বলিতে ভুলিয়াছি যে, ভারতে অবস্থানরত আশ্রয় গ্রহণকারী বাংলা জাতীয় লীগ নেতৃবৃন্দ সর্বজনাব দেওয়ান সিরাজুল হক, আশরাফ হোসেন, এম.এম. আনোয়ার ও পরিমল সাহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম-সূচী গ্রহণের অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, অবশ্য ফল বিশেষ কিছু হয় নাই।

দেশে অবস্থানকারী বাংগালীদের অবদান

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হইতে ১৫ই ডিসেম্বর এই সময়টা ছিল পূর্ব পাকিস্তানবাসী বাংগালীদের জন্য মহাসংকটকাল, মহাদুর্ভোগকাল ও মহাত্যাগের কাল। এই সময়ে আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের বাড়ীঘর কোন কোন ক্ষেত্রে ভস্মীভূত হইয়াছে, কোন কোন ক্ষেত্রে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। ২৬শে মার্চ সন্ধ্যা ৭টায় বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া দেশে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং আওয়ামী লীগকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। দেশবাসীর জান-মাল ইজ্জতের কোন প্রকার নিরাপত্তা ছিল না। যখন তখন গ্রেফতার, পাশবিক ও দৈহিক অত্যাচার ও নির্যাতন ভোগ ছিল ভাগ্যলিপি। সীমান্ত পারে ভারত ভূখন্ডে আশ্রয়প্রার্থী কয়েক লক্ষ শরণার্থী ব্যতীত বাকী সাত কোটি নিরস্ত্র বাংগালী ছিল কার্যতঃ সশস্ত্র হিংস্র পাক বাহিনীর হাতে বন্দী। তাহারাই পাক বাহিনীর জুলুম সহ্য করিয়াছে; তাহারাই মুক্তিযোদ্ধাকে আহার, আশ্রয় ও অন্যান্য সাহায্য দিয়াছে। তাহারা আত্মবিসর্জন দিয়াছে; কিন্তু শত্রু সেনার নিকট

আত্মসমর্পণ করে নাই। ভাগ্যের কি পরিহাস, ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর মৃত্যুঞ্জয়ী এই জনতাই মুহূর্তের মধ্যে ভারতে আশ্রয়-প্রার্থী শরণার্থীদের দৃষ্টিতে পাক-বাহিনীর সহযোগীরূপে অভিযুক্ত হয় এবং এক পলকে পরিণত হয় এক অচ্ছুত শ্রেণীতে। আরো পরিতাপের বিষয়, ১৬ই ডিসেম্বরের পরে অনুষ্ঠিত অত্যাচার, অবিচার, লুটপাট, খুন, রাহাজানী ও মান-ইজ্জত এবং সতীত্ব হরণ ১৬ই ডিসেম্বরের আগেকার সময়ের মতই সমভাবে গ্রামজীবন ও বাংগালী জন-জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তোলে। ভারত হইতে প্রত্যাগত মুষ্টিমেয় শরণার্থীই ছিল ইহার জন্য দায়ী। ইতিহাসের কি নির্মম শিক্ষা; ফরাসী বিপ্লবের কি মর্মন্তদ পুনরাবৃত্তি!

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া পাক-ভারত যুদ্ধ

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ নিরস্ত্র বাংলা ভাষাভাষী পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর উর্দুভাষী পাক-বাহিনীর হামলা ও ডিসেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধ ছিল একাধারে পাকিস্তানী উর্দুভাষী কায়েমী স্বার্থ চক্র, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী কুচক্রী মহল এবং পাক-চীন ও পাক-সোভিয়েত বন্ধুত্বের ক্ষিপ্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী মহলের বহুমুখী সাঁড়াশি অভিযানের সহিংস ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও প্রতিফল।

জুলাই মাস হইতে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট সহানুভূতিশীল মনোভাবপ্রসূত যে সব প্রস্তাব দিয়া আসিতেছিলেন, কূটবুদ্ধি ইন্দিরা গান্ধীর বিরোধিতার ফলে সেইগুলি ব্যর্থ হয়। ফলে জাতিসংঘের ২৬তম সাধারণ পরিষদ অধিবেশনের প্রস্তাবানুযায়ী অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে পাক-ভারত সীমান্ত এলাকায় জাতিসংঘ প্রহরী নিয়োগের প্রচেষ্টা বানচাল হইয়া পড়ে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী পরিকল্পনা মোতাবেক ২৪শে অক্টোবর (১৯৭১) যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বৃটেন ও পশ্চিম জার্মানীর সমর্থন কুড়াইবার মানসে ভ্রমণ করেন ও রাষ্ট্রনায়কদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পূর্বাহ্নে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে যে কোন অবস্থা মোকাবেলার চিন্তায় সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত ৯ই আগস্ট (১৯৭১) শান্তি মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি (TREATY OF PEACE, FRIENDSHIP & CO-OPERATION) নামে সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ২১শে নভেম্বর 'বয়রা' এলাকায় পাক-বাহিনী সম্মিলিত ভারতীয় ও মুক্তি বাহিনীর নিকট পরাজয়বরণ করেন। তাহাদের তেরটি ট্যাংক ও চারটির মধ্যে তিনটি সেবর জেট ভারত ভূমিতে ধ্বংস হয়। ক্ষিপ্ত ইয়াহিয়া খান ২৩শে নভেম্বর দেশব্যাপী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। ২৬শে নভেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ সংকটজনক পরিস্থিতি হইতে ত্রাণ লাভের আশায় পাক-ভারত সশস্ত্র সংঘর্ষের প্রস্তুতি নেন। তিনি হয়ত আশা করিয়াছিলেন যে, আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের ফলে ভারত কর্তৃক মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য সহায়তাদান বন্ধ হইবে। ১৯শে জুলাই লন্ডনের ফিনানসিয়াল টাইমস প্রতিনিধির সহিত এক সাক্ষাৎকারে জেনারেল ইয়াহিয়া খান হুমকি দেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের কোন অংশ বিদ্রোহীদের ঘাঁটি নির্মাণকল্পে

দখল করা হইলে পূর্ণ যুদ্ধ ঘোষণা করা হইবে। ৪ঠা আগস্ট করাচী টেলিভিশন ঘোষণায়ও তিনি একই উক্তি করেন। উল্লেখ্য যে, পূর্ব পাকিস্তানকে দেখানোর ব্যাপারে ইয়াহিয়া খানের পদক্ষেপ সম্পর্কে লন্ডনের 'গার্ডিয়ান' পত্রিকায় মিঃ পিটার প্রেসটন ২৯শে মার্চ (১৯৭১) এক রিপোর্টে মন্তব্য করেছিলেন, "It is an act of a mindless sergeant Major" অর্থাৎ ইহা নির্বোধ বা ধীশক্তিহীন সার্জেন্ট মেজরের কাজ। বস্তুতঃ ঘটনাপ্রবাহ মিঃ প্রেসটনের মন্তব্যের যথার্থতাই প্রমাণ করে।

ভারতীয় সামরিক হামলা

ইন্দিরা গান্ধীর ভুল চাল অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর রাত্রে পাকিস্তান ভারতের উপর অতর্কিত বিমান আক্রমণ করিলে পাক-ভারত যুদ্ধ বাধে- ইহা সত্য নহে। নিম্নবর্ণিত বক্তব্যই সত্য- Henry Broaudon of the Sunday Times তাহার "The Retreat of American Power" (১৯৭৩) গ্রন্থে লিখেছেন- "The Indian Cabinet On April 28 ('71) had secretly decided to prepare for the possibility of war" বক্তব্যের অকাট্য প্রমাণিক সমর্থন পাওয়া যায় Major General Sukhwant Sing, তৎকালীন Deputy Director, Military Operations at Army Head-Quarters কর্তৃক লিখিত ও ১৯৮০ সালে প্রকাশিত "The Liberation of Bangladesh" এর অংশ বিশেষে "The Army was asked to take over the guidance of all aspects of guerilla warfare on April 30, 1971."

ভারতের পক্ষে যুদ্ধ পরিচালনায় সর্বাধিনায়ক Field Marshal Sam Manekshaw বোম্বেতে এক জনসভায় ১৯৭৭ সালের ১৬ই নভেম্বর প্রকাশ করেন যে, ১৯৭১ সালে ডিসেম্বর ইন্দো-পাক যুদ্ধের ৯ মাস পূর্বে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী CABINET MEETING-এ উপস্থিত হইতে তলব করেন। ক্যাবিনেট সভায় তাহাকে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে আঘাত হানার জন্য নির্দেশ দেন- কিন্তু Field Marshal আঘাত হানার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে সময় প্রার্থনা করে।

International Commission of Jurists তদন্তের সিদ্ধান্ত যে, ১৯৭১ সালের ২১শে নভেম্বর ভারতীয় সাঁজোয়া বাহিনী পূর্ব পাকিস্তান ভূমিখন্ডে ঢুকিয়া পড়ে- সেইদিন হইতেই ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আরম্ভ হয়- ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর নয়। তখনি পাকিস্তান অবস্থার বিপাকে মরিয়া হইয়া ভারতের উপর বিমান হামলা করিতে বাধ্য হয়।

মাত্র কিছুদিনের মধ্যে অর্থাৎ ১৬ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে পাক বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং ইহারই ফলে পূর্ব পাকিস্তান পাক বাহিনীর অত্যাচার হইতে মুক্ত হয়। বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশের।

ইতিপূর্বে ৬ই ডিসেম্বর ভারতীয় পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশনে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেন। উল্লেখ্য যে, ১লা জুন

মিঃ ফনীভূষণ মজুমদারের নেতৃত্বে মিসেস নূরজাহান মুর্শেদ ও শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন সমবায়ে গঠিত তিন সদস্যবিশিষ্ট পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদল ভারতীয় পার্লামেন্ট সেন্ট্রাল হলে অনুষ্ঠিত ভারতীয় পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দানের জন্য আকুল আবেদন জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তখন ভারত সরকার অপেক্ষা করিবার নীতি গ্রহণ করিয়া বিষয়টি এড়াইয়া গিয়াছিল। অবশ্য ইতিপূর্বে ৩১শে মার্চ ভারতীয় পার্লামেন্ট পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সহিত একাত্মতা ঘোষণা করিয়া সর্বপ্রকার সাহায্য দানের সংকল্প প্রকাশ করে এবং ১লা ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধী পূর্ব পাকিস্তান হইতে পাক সৈন্য প্রত্যাহারের দাবী জানান। প্রকাশ, মুক্তির নয় মাস সংগ্রামে ১০৪৭ জন ভারতীয় সৈন্য প্রাণ হারায়, ৩ হাজার ৪৭ জন আহত হয় ও ৮৯ জন নিখোঁজ হয়।

বলা অনাবশ্যক যে, ভারতীয় বাহিনীর এই ত্যাগ আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি। এবং বলিবার অপেক্ষা রাখে না যে, ভারতীয় বাহিনী সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ না হইলে বাংলাদেশ অচিরেই ভিয়েতনামে পরিণত হইত আর মুক্তিবাহিনী কয়েক যুগ অবিরাম সংগ্রাম করিয়াও দেশকে পাক বাহিনী-মুক্ত করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। সুতরাং ইহাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, ১৯৭১ সালের সেই ভয়াল কালো দিনগুলিতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ও ভারতীয় জনগণ সম্ভাব্য ঝুঁকি সত্ত্বেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া বাংলাদেশকে পাক হানাদার বাহিনী মুক্ত করিবার চেষ্টা না করিলে অত্র এলাকার বংগভাষী মাত্রই হয়তো নগণ্য সংখ্যক উর্দু ভাষাভাষী ও তাহাদের নগণ্য সংখ্যক স্থানীয় সমর্থকদের সেবাদাসে পরিণত হইত। সুতরাং কৃতজ্ঞ বংগ ভাষাভাষী আপামর জনগণ গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে রাজধানীর রাজপথে ১৬ই ডিসেম্বর ও ইহার পরবর্তী কয়েকদিন ভারতীয় নাগরিক ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে যে যত্রতত্র স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিক ও প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছে তাহা বিস্ময়কর কিছু ছিল না। বাংগালী মজলুম জনগণ ১৯৭১-এর মার্চ হইতে ডিসেম্বর নয় মাসে যখন প্রায় ন্যুব্জদেহ, কুব্জপৃষ্ঠ, অতিমাত্রায় শ্রান্ত-ক্লান্ত ও অসহায়, বাংগালীর ফরিয়াদে যখন সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার আরশ পর্যন্ত কাঁপিতেছিল, তখনই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বাংগালী জাতির মুক্তিদাতার ভূমিকাই গ্রহণ করেন।

অবশ্য ইহা বলাও সত্যের অপলাপ হইবে যে, একমাত্র মহান পরার্থপরতা বা মানবাধিকার নীতিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াই ভারত পাক হানাদার বাহিনী বিতাড়নে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিল। বরং আন্তর্জাতিক শক্তিতে পরিণত হইবার প্রবল আকাংখা এবং জাতীয় স্বার্থ চরিতার্থ করিবার মানসেই ভারত সেইদিন অস্ত্র ধরিয়াছিল। সুতরাং ইহার পরিণতি কি দাঁড়াইতে পারে, সেই চিন্তাও সেইদিন অনেকের মাথায় ছিল। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বাংলাদেশ সরকারের মেরুদন্ড, শক্তি, দক্ষতা ও দেশপ্রেমের গভীরতার উপরই নির্ভর করিবে যে, ভারতীয় বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী শ্রেণী এই দেশকে একচেটিয়া লুট-পাট ও শোষণের যাঁতাকলে পরিণত করিতে সক্ষম হইবে কি হইবে না।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাক বাহিনীর অধিনায়ক লেঃ জেঃ নিয়াজী ঢাকার রেসকোর্সে দেশরক্ষা বাহিনীর যৌথ কম্যান্ড প্রতিনিধিদ্বয় ভারতীয় সেনা বিভাগের লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং অরোরা ও বাংলাদেশ দেশরক্ষা বাহিনীর এ.কে খন্দকারের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করিলে পাক দেশরক্ষা বাহিনীর ৭৫ হাজার ও বেসামরিক ১৮ হাজার যুদ্ধবন্দীকে ভারত ভূমিতে স্থানান্তরিত করিয়া তথায় আটক রাখা হয়।

যে দলিলের মাধ্যমে এই আত্মসমর্পণ সংঘটিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে দেওয়া হইল:

TEXT OF INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLADESH to Lieutenant General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding-in-Chief of the Indian and Bangladesh force in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN Land, Air and Naval forces as also all paramilitary forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under the orders of Lieutenant General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument is signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms. Lieutenant General Jagjit Singh Aurora gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with the dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with the provisions of the GENEVA convention and guarantees the safety and well-being of all Pak Military and Paramilitary forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of West Pakistan origin by the forces under the command of Lieutenant General Jagjit Singh Aurora.

JAGJIT SINGH AURORA
Lieutenant General
General Officer Commanding in Chief
Indian and Bangladesh Forces
in the Eastern Theatre
16, December, 1971

AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI
Lieutenant General
Martial Law Administrator
Zone B and Commander
Eastern Command (Pakistan)
16, December, 1971

অর্থাৎ পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ড পূর্ব রণাঙ্গনে ভারত ও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট বাংলাদেশে অবস্থানরত সকল পাকিস্তানী সৈন্যের আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত হইতেছে। পাকিস্তান স্থল, বিমান ও নৌ এবং প্যারামিলিটারী ও বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনী এই আত্মসমর্পণের অন্তর্ভুক্ত। এই বাহিনীরা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার পরিচালনাধীন নিকটবর্তী সামরিক বাহিনীর নিকট অস্ত্র জমা দিবে। এই পত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার সাথে সাথে পাকিস্তান পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ড লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার পরিচালনাধীন হইবে। এই আদেশের লংঘন আত্মসমর্পণের শর্ত লংঘন বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং প্রতিষ্ঠিত আইন ও যুদ্ধনীতি অনুসারে ইহার বিচার হইবে। আত্মসমর্পণের শর্তাবলীর অর্থ বা ব্যাখ্যার ব্যাপারে কোন সন্দেহ উত্থিত হইলে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এই মর্মে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন যে, জেনেভা কনভেনশনের নিয়মাবলী অনুযায়ী আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদের সহিত সম্মানজনক আচরণ করা হইবে এবং আত্মসমর্পণকারী সকল পাকিস্তান সামরিক প্যারামিলিটারী বাহিনীর নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা হইবে। জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা পরিচালনাধীন বাহিনী সকল বিদেশী নাগরিক নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু এবং পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যক্তিবর্গের রক্ষাণাবেক্ষণ করিবে।

স্বাঃ/ জগজিৎ সিং অরোরা
লেফটেন্যান্ট জেনারেল
জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চীফ
পূর্ব রণাঙ্গনে ভারত ও
বাংলাদেশ বাহিনী
১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১।

স্বাঃ/ আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী
লেফটেন্যান্ট জেনারেল
মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর
জোন-বি এবং কমান্ডার
পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ড (পাকিস্তান)
১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১

যুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণ প্রশ্নে

বাংলাদেশের মাটিতে পাক সেনাবাহিনী মুক্ত করিবার নীতিগত কারণ ছাড়াও ভারত নিজস্ব কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। প্রথমতঃ ভারত দ্বিখন্ডিত হইয়া পাকিস্তানী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হইয়াছিল। অখন্ড ভারত বিশ্বাসী ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল কখন সাফল্যের সহিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের বিলোপ ঘটানো যায়। পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিলোপ না হইলেও বরং তাহার রাষ্ট্রীয় অংগচ্ছেদের সুবর্ণ সুযোগই ১৯৭১ সালের এক মহাক্ষণে ভারতের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়তঃ ১৯৬২ সালের শেষার্ধে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এলাকায় চীন-ভারত যুদ্ধ প্রমাণ করিয়াছিল যে, চীন-ভারত বৈরীতা ও চীন-পাকিস্তান মৈত্রীর পটভূমিকায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অঙ্গ পূর্ব পাকিস্তানের অস্তিত্ব ভারতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি স্বরূপ। ইহার

অবশ্যম্ভাবী কার্যকারণেই ভারতকে বিপুল অর্থ ব্যয়ে আসাম-নেফা সীমান্তে দেশরক্ষা' ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হয়। তৃতীয়তঃ আসাম, সীমান্তবর্তী নাগাভূমি, মিজোরাম প্রভৃতি ভারতীয় পার্বত্য এলাকাবাসী স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। পূর্ব পাকিস্তান এই সকল পার্বত্য উপজাতীয় বিদ্রোহী গেরিলা বাহিনীর মুক্তচারণ ভূমি ও আশ্রয়স্থল। চতুর্থতঃ পূর্ব পাকিস্তানের বর্ধনশীল পাট শিল্প বিশ্ববাজারে ভারতীয় পাট শিল্পকে কোণঠাসা করিয়া ফেলিয়াছে। পঞ্চমতঃ ভারতীয় বর্ধিষ্ণু শিল্প কারখানার শিল্পজাত দ্রব্যের নিরাপদ বাজার অন্বেষণ।

উপরোক্ত কারণেই ৩১শে মার্চ (১৯৭১) ভারতীয় পার্লামেন্ট উভয় পক্ষের যুক্ত সভায় বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনকে সর্বোতভাবে সাহায্য-সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে। সেইকথা আগেই বলিয়াছি, ইহা ছিল ২৭শে মার্চ '৭১-এ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভারতীয় পার্লামেন্টে উদ্বেগ প্রকাশের প্রতিধ্বনি মাত্র। পূর্ব পাকিস্তান হইতে শরণার্থীদের অবাধে ভারতভূমিতে আশ্রয় গ্রহণে ভারত সরকার সীমান্ত অতিক্রমণে কোন প্রকার বাধা দেয় নাই। ভারতীয় মন্ত্রীর (শ্রম ও পুনর্বাসন) লোকসভায় প্রদত্ত তথ্যানুসারে মুক্তিযুদ্ধকালে শরণার্থীদের সাহায্যের ৩২৬ কোটি টাকা খরচের মধ্যে আন্তর্জাতিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল সর্বসাকুল্যে ৩৬.৭৭ কোটি টাকা, বাকি ২৮৯.২৩ কোটি টাকা ভারত সরকার ব্যয় করে। পাক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানকে হিন্দু সম্প্রদায়মুক্ত করার প্রচেষ্টার ফলে ১৬ই আগস্টের মধ্যে ভারতে ৫৯.৭১ লক্ষ হিন্দ ৫.৪১ লক্ষ মুসলমান ও ৪৪ হাজার অন্যান্য সম্প্রদায় ভুক্ত শরণার্থী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। অবশ্য পাকিস্তান সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২০ লক্ষ ২ হাজার ৬২৩ ব্যক্তি পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে। পাক জংগী সরকারের হয়ত ধারণা ছিল, ইহার ফলে বাস্তুত্যাগী হিন্দুরা ভারতে সাম্প্রদায়িক দাংগার সূত্রপাত করিবে এবং ইহারই অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ায় মুসলমান মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীরা ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে ও অভ্যন্তরে মুসলিম বাসিন্দারা হিন্দু ও ভারত বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করিবে আর ইহারই ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অঙ্কুরেই জনসমর্থন হারাইয়া ফেলিবে। অকপট মনে বলিতে হইবে, ভারতীয় জনতা ব্যাপকভাবে সুস্থ রাজনৈতিক চেতনা ও মানবিকবোধের বিরল নিদর্শন স্থাপন করে। সাম্প্রদায়িক দুষ্কৃতিকারীদের যে কোন অপচেষ্টা সাধারণ ভারতবাসী অত্যন্ত সতর্কতা ও ক্ষিপ্রতার সহিত স্তব্ধ করিয়া দেয়। ইহা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ মন্তব্য, কাহারো সমর্থন-অসমর্থনের অপেক্ষা রাখে না।

পাকিস্তান দ্বিখন্ডিত হওয়ার পশ্চাতে

বস্তুতঃ ভারতের জনসাধারণের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। ভারতীয় প্রভাবশালী উচ্চ মহলে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় স্বার্থে পাকিস্তান অখন্ডিত বা দ্বিখন্ডিত হইবার ঔচিত্যের প্রশ্নে মতভেদ ছিল। ভারতীয় 'ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স স্টাডিস এন্ড এনালাইসিস'-এর মতানুসারে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় স্বার্থে পাকিস্তান দ্বিখন্ডিত ছিল অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয়।

১৯৭১-এর মার্চ হইতে ডিসেম্বর অবধি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পদক্ষেপগুলি ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি পাকিস্তান দ্বিখন্ডনের পক্ষে ছিলেন। উল্লেখ্য, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিখন্ডনের বিরুদ্ধে ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯৬৯-এর আগস্টে ২২ ঘন্টা মেয়াদী পাকিস্তান সফরকালে প্রেসিডেন্ট নিক্সন চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করিতে পাক সরকারকে অনুরোধ করে। ফলে পাক-মার্কিন সম্পর্কোন্নয়ন দেখা দেয়। চীন-মার্কিন বলয়ের এই প্রভাব অকার্যকর করিবার মানসেই ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরণ সিং ও সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আঁন্দ্রে গ্রোমিকো দিল্লীতে ৯ই আগস্ট (১৯৭১) ২০ সালা রুশ-ভারত "শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা" (কার্যতঃ সামরিক) চুক্তি সম্পাদন করেন। ১৯৬৯ সালের মে মাসে পাকিস্তান সফরকালে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন পাক-চীন বন্ধুত্বের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন এবং পাক-সোভিয়েত ও পাক-চীন বন্ধুত্ব সমান্তরালভাবে ও সমভাবে চলিতে পারে না বলিয়া নছিয়ত করেন। পাক সরকার অবশ্য উপরোক্ত প্রতিপাদ্যের প্রতি দৃঢ়ভাবে দ্বিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পাকিস্তানের দ্বিখন্ডিত হওয়াটা বোধহয় তাহারই ফল। এইদিকে আন্তর্জাতিক প্রভাবশালী দেশগুলির সরকারী মত প্রভাবান্বিত করিবার প্রয়াসে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ২০ হইতে ২১শে সেপ্টেম্বর রাশিয়া সফর করিলেন এবং ৬ই অক্টোবর হইতে ১৩ই নভেম্বর বেলজিয়াম, অষ্ট্রিয়া, ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী ইত্যাদি সফর করিয়া পশ্চিমা শক্তিগুলির কার্যকরি হস্তক্ষেপ বন্ধের নিশ্চয়তা বিধান করিলেন। শুধু তাই নয় সফরান্তে মিসেস গান্ধী ইহার পরেও ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন অবধি জাতীয়-আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিক্রিয়াগুলি অত্যন্ত সুনিপুণভাবে মোকাবিলা করিলেন। পাক-ভারত সীমান্ত এলাকায় উভয় রাষ্ট্র সশস্ত্র সংঘর্ষের সম্ভাবনা এড়াইবার জন্য পারস্পরিক সৈন্য প্রত্যাহার প্রস্তাবের জওয়াবে ৩০শে নভেম্বর ভারতীয় রাজ্যসভায় বক্তৃতাকালে মিসেস গান্ধী স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিলেন যে, বাংলাদেশ হইতে পাক-বাহিনী প্রত্যাহার করিলে তিনি পূর্ব সীমান্ত হইতে ভারতীয় সৈন্য বাহিনী প্রত্যাহার করিতে সম্মত আছেন। ইহার নির্গলিতার্থ বাংলাদেশ পাকিস্তানের অঙ্গ নহে। অন্যথায় ৩রা ডিসেম্বর হইতে ১৬ই ডিসেম্বর পাক-ভারত সশস্ত্র সংঘর্ষ ও বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ছিল প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর রাজ্যসভায় ৩০শে নভেম্বর ঘোষণার স্বতঃসিদ্ধ পরিণতি।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংগচ্ছেদ অভিযান নিশ্ছিদ্র করিবার প্রয়াসে ইন্দিরা গান্ধী শরণার্থীদের ব্যয়ভার যথাসম্ভব নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেন। একই উদ্দেশ্যে তিনি জনপ্রতিনিধি, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের বেতন, ভাতা ও বাসস্থানের সম্ভাব্য ব্যবস্থা করিলেন, অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন; আবার চীন সমর্থক জননেতা ও দলগুলির উপর কড়া পুলিশী নজর রাখিলেন। এইভাবেই বাংলাদেশের অভ্যুদয় নাটিকার সফল যবনিকাপাতের মাধ্যমে

১৯৬২ সালে মহাচীনের হস্তে পরাজয় ও ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের নিকট নাকানিচুবানি খাইবার কালিমা মুছিয়া ভারত মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের স্বীকৃতি মোতাবেক 'মেজর পাওয়ার' অর্থাৎ বড় শক্তিতে উন্নীত হইল।

বাংলাদেশের অভ্যুদয় : ঐতিহাসিক পটভূমি

বাংলাদেশ নিজস্ব কারণে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের সংগ্রামে লিপ্ত হয়। প্রথমতঃ ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে বংগীয় প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের প্রস্তাবক্রমে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশগুলির সমবায়ে ভারতীয় উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে দুইটি মুসলিম প্রধান স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করিবার পরিকল্পনা ছিল। ইহাই পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব হিসাবে খ্যাত হয়। দ্বিতীয়তঃ প্রাসাদচক্রের রাজনীতি ও ক্ষমতা দখলের আবর্তে পাকিস্তান গণতন্ত্রের মূল বক্তব্য জনগণের সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ জনগণের রায়ে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনের নীতি বিসর্জন দেয়। তৃতীয়তঃ রাষ্ট্র পরিচালনায় অর্থাৎ শাসন ক্ষমতায় পূর্ব পাকিস্তানী বংগ ভাষাভাষীদের কার্যকর অনুপস্থিতি বাংগালী মন-প্রাণকে বিষাক্ত ও বিদ্রোহী করিয়া তোলে। পশ্চিম পাকিস্তানের স্থানীয়, ভারত হইতে আগত মোহাজের, সরকারী সামরিক-বেসামরিক কর্মচারী, রাজনীতিবিদ, পুঁজিপতি, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী শ্রেণী ও বহিরাগত অর্থাৎ আফ্রিকা ইত্যাদি হইতে আগত অবাংগালী শিল্পপতি ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে আভ্যন্তরীণ স্বার্থগত কলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানী বাঙ্গালীদের উপর নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ও আধিপত্য বজায় রাখিবার প্রয়াসে তাহারা ছিল ঐক্যবদ্ধ ও বদ্ধপরিকর। পাকিস্তান সামরিক বিভাগে বরাদ্দ অর্থের উপর সৈন্য বিভাগের কর্তাব্যক্তিদের প্রশ্নাতীত একচেটিয়া সর্বময় ক্ষমতা ছিল। বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বাজেটের সিংহভাগের উপর পার্লামেন্টের বা জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের কোন প্রকার অর্থপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল না। শাসকচক্রের স্বার্থে দেশ শাসিত হইত এবং জনগণ পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল নেপথ্যের বস্তুতে। সংখ্যাধিক্য হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানীগণ পর্যবসিত হইয়াছিল শাসিতের শ্রেণীতে। জনগণের সার্বভৌমত্ব হরণকারী এই প্রাসাদ চক্রেরই মদদগার হিসাবে যুক্ত হয় সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন শক্তি। তাই (ক) ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে একচেটিয়া জয়লাভ করিয়াও সরকার গঠনের কিছুকালের মধ্যে শেরে বাংলা ফজলুল হকের মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত হইতে হয়। (খ) ১৯৫১ সালের ১৬ই অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ভাষণদানকালে প্রকাশ্য জনসভায় নিহত হন। (গ) ১৯৫৩ সালে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বেআইনিভাবে বরখাস্ত হন। (ঘ) ১৯৫৪ সালের অক্টোবরে বেআইনিভাবে গণপরিষদ বাতিল ঘোষিত হয়। (ঙ) ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর সেনাপতি জেনারেল আইউব খান সামরিক শাসন জারি ও সর্বময়

ক্ষমতা দখল করেন এবং (চ) ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান ব্যাপী প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কর্তৃক ৩১৩টি জাতীয় পরিষদে আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন দখল করা সত্ত্বেও জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসিতে দেওয়া হয় নাই। তৃতীয়তঃ অনস্বীকার্য যে, ভৌগোলিক অবস্থান ও ভাষা সংস্কৃতির মৌলিক প্রভেদের দরুন পাকিস্তানী জাতিত্ববোধের দ্রুত উন্মেষ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং চতুর্থতঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈষম্য বাংগালী জীবনে হতাশার সৃষ্টি করে। সামরিক-বেসামরিক বিভাগে চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, লাইসেন্স-পারমিট বন্টন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পর্বতপ্রমাণ বৈষম্য পূর্ব পাকিস্তানী জনমনে গভীর অসন্তোষ ও তিক্ততার কারণ হইয়া দেখা দেয়। সংকটের গুরুত্ব তুলিয়া ধরিবার নিমিত্ত কিছু কিছু পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হইল :

শিক্ষা				
	পূর্ব পাকিস্তান		পশ্চিম পাকিস্তান	
	১৯৪৭-৪৮	১৯৬৮-৬৯	১৯৪৭-৪৮	১৯৬৮-৬৯
প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৬৩৩	২৮৩০৮	৮৪১৩	৩৯৪১৮
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৪৮১	৩৯৬৪	২৫৯৮	৪৫৭২
কলেজ	৫০	১৭৩	৪০	২৭১
মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং কৃষি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়	৩	৯	৪	১৭
বিশ্ববিদ্যালয়	১	৪	২	৬
বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র	১৬২০	৮৮৩১	৬৫৪	১৮৭০৮

লক্ষণীয় যে, ১৯৫০-৭১ মুদ্দতে ৭২০ কোটি ডলার ঋণ-এর আশ্বাস পায়, তন্মধ্যে ৪৪০ কোটি ডলার ঋণ প্রকৃতপক্ষে খরচ হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ৮০ কোটি ডলার ঋণ পরিশোধ হইয়াছে এবং বাকী ৩৬০ কোটি ডলারের মধ্যে ৩৩.৪% ও ৬০.৮% যথাক্রমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইয়াছে। বাকি ৫.৮% অনির্ধারিত রহিয়াছে।

		পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৪৭-১৯৬৯	উন্নয়ন খাতে	৩০০০ কোটি	৬০০০ কোটি
১৯৪৭-১৯৬৫	রপ্তানী আয়	১৬২৮ কোটি	১৩১৯ কোটি
১৯৬৫-১৯৬৮	রপ্তানী আয়	৪৭২ কোটি	৪২২ কোটি
১৯৪৮-১৯৬৫	আমদানী ব্যয়	১২০৭ কোটি	২৮৯৯.৮২ কোটি
১৯৬৫-১৯৬৮	,,	৩৯৩.৭৬ কোটি	৯৮৩.৮ কোটি
১৯৫৮-১৯৬৭	বৈদেশিক মুদ্রা (উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ)	২০%	৮০%
	মার্কিন সাহায্য ব্যয়	৩৩%	৬৬%
	মার্কিন ব্যতীত অন্যান্য দেশের সাহায্য ব্যয়	৪%	৯৬%
১৯৫০-১৯৭১	মোট বৈদেশিক ঋণ	৩৩.৪%	৬০.৮% (অনির্ধারিত ৫.৮%)
	কেন্দ্রীয় চাকুরী (বেসামরিক)	১৫%	৮৫%
	দেশ রক্ষা ব্যয়	১০%	৯০%

(অথচ ১৯৫০-৫১ হইতে ১৯৬৮-৬৯ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় রাজস্ব আয় ৩৭৯৬ কোটি টাকার মধ্যে ২১৩২ কোটি টাকা দেশরক্ষা বিভাগ খাতে ব্যয় হয়।)

		পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৬৪-৬৮	সার বিতরণ	৩৭১,০০০ টন (৩৩%)	৭৩৯০০০ টন (৬৬%)
১৯৬৪-৬৯	উন্নত বীজ বিতরণ	৪০,০০০ টন (১১%)	৩৪২০০০ টন (৮৯%)
১৯৬০	মাথা পিছু আয়	২৬৯ টাকা	৩৫৫ টাকা
১৯৭০	মাথা পিছু আয়	৩০৮ টাকা	৪৯২ টাকা
১৯৬৪-৬৯	আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য রফতানী	৩১৭.৪ কোটি	৫২৯ কোটি

এইভাবেই একদিকে পূর্ব পাকিস্তানের রফতানী আয় পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতি উন্নয়নে ব্যয় হইতে থাকে এবং অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি পশ্চিম পাকিস্তানের কলকারখানা ও ক্ষেত খামারের আশ্রিত বাজারে পরিণত হয়। তাই চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বিবেচনার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত উপদেষ্টা মন্ডলীর প্রতিবেদনে করুণ চিত্র ফুটিয়া উঠে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায়, এই যাবত পূর্ব পাকিস্তানের ২৬০ কোটি মার্কিন ডলার অর্থাৎ ১২৩৮ কোটি টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে পুঁজি পাচার হয়। ইহারই অবধারিত

ফল গ্রাম বাংলা অধিবাসীদের ১৯৫৯-৬০ সালের বাজার দর অনুযায়ী ১৯৪৯-৫০–১৯৫৩-৫৪ সালের মাথাপিছু আয় ২২৮ টাকা হইতে কমিয়া ১৯৬৪-৬৫, ১৯৬৭-৬৮ সালে ১৯৮ টাকাতে দাঁড়ায়। ক্রেতা সাধারণের অবস্থা নিম্নলিখিত তুলনামূলক বাজার দর হইতে বুঝা যাইবে :

	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
প্রতিমণ চাউল	৩৫.০০ টাকা	২০–২৫ টাকা
প্রতিমণ আটা	২৫–৩০ টাকা	১৫–২০ টাকা
প্রতিসের সরিষার তৈল	৫.০০ টাকা	২.৫০ টাকা

১৯৭১ সালের ৯ মাস যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে ৩০০ কোটি টাকার সম্পদ পাচার হয় এবং ব্যাংক হইতে ৮৬ কোটি টাকা ঋণ লওয়া হয়। সিন্ধু অববাহিকা পরিকল্পনা, ওয়ার্কস প্রজেক্ট-তারবেলা বাঁধ, গোলাম মোহাম্মদ ব্যারাজ, জলবদ্ধতা ও লবণাক্ততা দূরীকরণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পায়ন ও সহজ ও দ্রুততর হয়। পশ্চিম ভারতের কাথিওয়ার ও কচ্ছ এলাকা হইতে আগত বড় বড় ব্যবসায়ী, পাক পাঞ্জাবের চিনিয়ট শহরবাসী দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, ভারতীয় গুজরাট ও কাথিওয়ার হইতে আগত তৃতীয় বৃহত্তম ব্যবসায়ী বোহরা, খোজা, ইসমাইলীয়া ও খোদা ইশ্‌নাসারী সম্প্রদায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানী বড় বড় সামন্ত প্রভুরা পশ্চিম পাকিস্তানকে কেন্দ্র করিয়া পাকিস্তানী অর্থনীতিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে। ফলে পাকিস্তানের অর্থনীতি ২২টি পরিবারে কুক্ষিগত হইয়া পড়ে। শিল্প সম্পদের ৬৬%, বীমা সম্পদের ৭৫%, ব্যাংক সম্পদের ৮০% এই ২২টি পরিবারের আয়ত্বে চলিয়া যায়। এই অবাংগালী পুঁজিপতি গোষ্ঠীই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বেশীরভাগ শিল্প ব্যবসার মালিক। ইহাই বাংগালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আক্রোশের কারণে পরিণত হয় এবং ইহাতেই আপামর বাংগালী জনতার সর্বস্তরে অভিযোগ ও বিদ্বেষের মানসিকতা জন্ম নেয়।

উপরে বর্ণিত দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ কার্যকারণসমূহ নগরে-বন্দরে, স্কুল-কলেজে, কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে, সামরিক-বেসামরিক কার্যালয়ে পূর্ব পাকিস্তানী বংগ ভাষাভাষীদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মূল জীবনী শক্তি হিসাবে কাজ করে এবং এই সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিচালিত আন্দোলনই যুগপৎ পাকিস্তান অংগচ্ছেদের মূল শক্তিতে পরিণত হয়।

১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হইবার পরপরই পশ্চিম পাকিস্তানের পিপল্‌স পার্টি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর নিকট দিবালোকের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া উঠে যে, ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করিয়া আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতায় পরিণত হইয়াছেন এবং ৮৮ আসনের অধিকারী পিপল্‌স পার্টি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর ক্ষমতার

গদিতে আসীন হইবার চিন্তা দিবাস্বপ্ন মাত্র। তাই তিনি সময়ক্ষেপ না করিয়া ২০শে ডিসেম্বর ঘোষনা করিলেন "পিপলস পার্টি জাতীয় পরিষদে বিরোধীদলীয় আসন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে।" এমনকি ক্ষমতার গরজে ও কায়েমী স্বার্থের প্ররোচণায় তিনি দুই প্রধানমন্ত্রীর থিউরী প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। সামরিক চক্র ইহার সুযোগ গ্রহণ করে। সামরিক চক্র জনগণের নির্বাচিত আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টির মধ্যে পারস্পরিক রাজনৈতিক কলহের সদ্ব্যবহার করিতে এবং সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে কায়েমী স্বার্থবাদীদের মারফত ইন্ধন দানেও কসুর করে নাই। সোনার ডিম প্রাপ্তির লোভে ক্ষমতালোভী সামরিক জান্তা হাঁসের উপর এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিল- সেই হাঁস অর্থাৎ পাকিস্তান অস্তিত্ব হারাইল এবং সামরিক জান্তা শিরকুলমণি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সোনার ডিম অর্থাৎ ক্ষমতা হারাইলেন। ভাগ্যে বন্দীজীবন। পাকিস্তান অংগচ্ছেদের বিনিময়ে ক্ষমতা পিপাসু জুলফিকার আলী ভুট্টো ক্ষমতা পাইলেন। ক্ষমতার সিংহভাগ ভোগী পাঞ্জাবী কায়েমী স্বার্থ বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দুঃস্বপ্ন হইতে মুক্তি পাইল। বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাবের জনসংখ্যা ৫৩% অর্থাৎ সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান প্রভৃতি প্রদেশের মোট জনসংখ্যারও অধিক। সুতরাং বোধগম্য কারণেই অতঃপর পাকিস্তানে (সাবেক পশ্চিম পাকিস্তান) এক ব্যক্তি এক ভোট নীতির গণতন্ত্র প্রবর্তনে পাঞ্জাবী কায়েমী স্বার্থ মহল গোঁড়া সমর্থক হইতে দ্বিধা করিবে না। বরং তাহাদের শ্লোগান হইবে যে, গণতন্ত্রই পাকিস্তানের রক্ষা কবচ- কেননা It suits them well! অর্থাৎ ইহাই তাহাদের ভাল মানায়।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়ার এক ব্যক্তি এক ভোট গণতান্ত্রিক নীতি সংখ্যাগুরু বাংলাদেশের মোকাবিলায় পাঞ্জাবকে অত্যন্ত বেকায়দায় ফেলিয়াছিল। পাঞ্জাববাসীদের দেশপ্রেম ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখন্ডত্বের বিশ্বাস ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ অন্যান্য প্রদেশগুলির উপর লুণ্ঠন ও আধিপত্য বজায় রাখা সম্ভব, নতুবা স্বার্থের খাতিরে পাকিস্তান ও ইসলাম বিসর্জন দিতে পাঞ্জাবীদের এতটুকু বাধিতনা। স্বীয় হীন-উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে সিন্ধু প্রদেশের জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ও সীমান্ত প্রদেশের জেনারেল ইয়াহিয়া খান সর্বনাশা ভূমিকা গ্রহণ করেন। ভবিষ্যৎ ইতিহাসে এই দুই ব্যক্তিই এই মর্মান্তিক কলঙ্কজনক ও বিয়োগান্তক নাটকের দুরাচার নরাধম (Villain) হিসাবে চিত্রিত হইবেন।

উপনির্বাচনী প্রহসন ও শান্তি কমিটি

১৯৭০ সালে ঐতিহাসিক লাহোর নগরে পাকিস্তান ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ লীগ ও অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর খানের নেতৃত্বে জাস্টিস পার্টির প্রতিনিধিদের মধ্যে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে ভৌগোলিক কারণে "পাকিস্তান দুই অর্থনীতির রাষ্ট্র" এই যুক্তি গ্রহণে জাস্টিস পার্টির প্রতিনিধিদল অস্বীকৃতি জানায় এবং ইহার মধ্যে তাঁহারা বিচ্ছিন্নতাবাদের গন্ধ আবিষ্কার করেন। জওয়াবে তখন তাহাদিগকে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম যে, পাকিস্তান যদি পৃথক হইয়া যায় তাহা হইলে ক্রমশঃ পাঠান, বেলুচ ও

সিন্ধীগণ স্ব-স্ব স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে। ১৯৭৪-৭৫ সালের পাঠান ও বেলুচদের মুক্তি সংগ্রাম এক নির্মম সত্য ঘটনা। সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হইতে পারে বটে তবে ইতিহাস নিজস্ব পথেই অগ্রসর হয়। স্মর্তব্য যে, সমগ্র বিশ্বব্যাপী পাক সেনা বাহিনীর বর্বর হামলার প্রতিক্রিয়ায় সোভিয়েত প্রেসিডেন্টের দিল্লী হইতে প্রেরিত ২রা এপ্রিল (১৯৭১) তারিখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিকট লিখিত পত্র, ১১ই আগস্ট (১৯৭১) ও ২৯শে সেপ্টেম্বর (১৯৭১) মস্কো হইতে প্রচারিত ভারত-সোভিয়েট দুইটি পৃথক ইশতেহার এবং এমনকি যুক্তরাষ্ট্র ও মহাচীনের "রাজনৈতিক সমঝোতা" প্রস্তাবেও স্বেচ্ছাচারী ইয়াহিয়া খান কর্ণপাত করেন নাই বরং তিনি দুই দুইবার ১০ই জুন (১৯৭১) ও ৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৭১) "সাধারণ ক্ষমার" প্রহসন অভিনয় করেন। শুধু তাই নয়, তিনি ৭ই আগস্ট (১৯৭১) তারিখে আওয়ামী লীগ দলীয় ৭৯ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য (উল্লেখ্য যে, শেখ মুজিবুর রহমান ও ডঃ কামাল হোসেনের এন.ই ১১১ ও ১১২ নির্বাচনী এলাকা শূন্য ঘোষিত হয় নাই) এবং ১৯শে আগস্ট '৭১ তারিখে ১৯৪ জন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য অযোগ্য ঘোষণা করিয়া তদস্থলে সেনাবাহিনীর ছত্র-ছায়ায় উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। তদানুসারে ২০শে নভেম্বর ও ১৯শে ডিসেম্বর (১৯৭১) মধ্যে উপ-নির্বাচনের নামে সদস্য বাছাই প্রহসন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১২ই আগস্ট (১৯৭১) ডঃ আবদুল মোত্তালেব মালিককে গভর্নর নিযুক্ত করিয়া সর্বজনাব আবুল কাসেম (কাউন্সিল মুসলিম লীগ), আখতার উদ্দীন আহমদ (কনভেনশন মুসলিম লীগ), মাওলানা এ.কে.এম ইউসুফ (জামায়াতে ইসলাম), মাওলানা ইসহাক (নেজামে ইসলামী), নওয়াজেশ আহমদ (কাউন্সিল মুসলিম লীগ), মাওলানা আব্বাস আলী খান (জামায়াতে ইসলামী), মুজিবর রহমান (কাইয়ুম মুসলিম লীগ), ওবায়দুল্লাহ মজুমদার (আওয়ামী লীগ), অধ্যাপক শামসুল হক (আওয়ামী লীগ), এ এস এম সোলায়মান (কৃষক শ্রমিক পার্টি), প্রাক্তন সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট এবং বর্তমান পিডিপি নেতা জসিম উদ্দিন, এ কে মোশাররফ হোসেন এমপিএ, (পিডিপি), মং সুপ্রু চৌধুরী (পার্বত্য চট্টগ্রাম) সমন্বয়ে মন্ত্রিসভা গঠনের প্রহসন অভিনয় নিষ্পন্ন হইয়া যায়। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় সংহতি ও অখণ্ডত্ব বজায় রাখিবার তাগিদে এবং সামরিক শাসনকর্তা ও জনগণের মধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় অখন্ডত্বে বিশ্বাসী নিম্নলিখিত রাজনীতিবিদগণ সমবায়ে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি (পূর্ব পাকিস্তান) গঠন করেন :

১। সৈয়দ খাজা খয়েরুদ্দীন — আহবায়ক
২। মাওলানা নূরুজ্জামান — প্রচার সম্পাদক
৩। এডভোকেট নূরুল হক মজুমদার — অফিস সম্পাদক
৪। এডভোকেট এ কিউ এম শফীকুল ইসলাম — কোষাধ্যক্ষ

কার্যকরি কমিটির সদস্যবৃন্দ হইলেন :

১। অধ্যাপক গোলাম আযম ২। মাহমুদ আলী ৩। আবদুল জব্বার খদ্দর ৪।

মাওলানা সিদ্দিক আহমদ ৫। আবুল কাসেম ৬। ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) ৭। মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম ৮। আবদুল মতিন ৯। আবদুল খালেক ১০। ব্যারিস্টার আখতার উদ্দিন ১১। পীর মোহসেন উদ্দিন (দুদু মিয়া) ১২। এ.এস.এম সোলায়মান ১৩। এ.কে. রফিকুল হোসেন ১৪। আতাউল হক খান ১৫। তোয়াহা বিন হাবিব ১৬। মেজর আফসার উদ্দীন ১৭। ইয়াহিয়া বাওয়ানী ১৮। হাকিম ইরতিজাউর রহমান খান আকুন-জাদা ১৯। সাত্তার কারওয়াদিয়া ২০। আবু আহমদ শাহ এবং ২১। মোহাম্মদ ভাই।

১১৬ নং বড় মগবাজার, ঢাকা-২, শান্তি কমিটির সদর দফতর স্থাপিত হয়। শান্তি কমিটি যে কেবল মুক্তিবাহিনী বা বাংলাদেশ সমর্থকদের দমনে ব্যস্ত ছিল, তাহা নহে, পাক সেনাবাহিনীর অকথ্য পাশবিক অত্যাচার ও লুণ্ঠন হইতেও দেশবাসীকে রক্ষা করিতে আপ্রাণ সচেষ্ট ছিল; উভয় বাস্তবতাকে স্বীকার করাই হইবে সত্য ভাষণ। শেষ রক্ষা হইল না। এমনকি বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধি মিঃ পিটার কারগিল কর্তৃক সরেজমিনে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমতঃ অশান্ত অবস্থা নিরসন, দ্বিতীয়তঃ ভারত হইতে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন এই শর্তদ্বয় পূরণ না হওয়া অবধি "এইড টু পাকিস্তান কনসর্টিটিয়াম" ২১শে জুন (১৯৭১) "প্যারিস বৈঠকে" কোন প্রকার সাহায্য দিতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ, মূলধন নিয়োগের যথাযথ পরিস্থিতি অবিদ্যমান। অন্যদিকে দুই মহাবন্ধু বৃহৎ শক্তি আমেরিকা ও গণপ্রজাতন্ত্রী মহাচীনের প্রচেষ্টায় জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে এবং ৭ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংহতি ও অখন্ডত্বের পক্ষে ১০৪ ভোট জোগাড় হইয়াছিল সত্য কিন্তু পাক-ভারত সশস্ত্র সংঘর্ষের মুহূর্তে (ডিসেম্বর ১৯৭১) মহাচীন ও যুক্তরাষ্ট্র বাস্তব ও কার্যকর সহায়তাদানে বিরত থাকে। উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ১১টি ভোট বিপক্ষে যায়, ১০টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত ছিল। মহাচীন ৬, ১১ ও ১২ই এপ্রিল (১৯৭১) এবং ৫, ১৯ ও ২৭শে নভেম্বর (১৯৭১) পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষার সংগ্রামে দৃঢ়ভাবে পাশে থাকিবার প্রতিশ্রুতি দিলেও এবং কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সিস্টেমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পাকিস্তান আক্রান্ত হইলে হস্তক্ষেপ করিবার অভিমত উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করিলেও ডিসেম্বরের পাক-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তানকে একাই যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। ৫ই নভেম্বর (১৯৭১) জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে ৯ সদস্যবিশিষ্ট এক প্রতিনিধি দল মহাচীন গমন করে। তৎকালীন অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী চীপেঙ ফি পাকিস্তানকে ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সমর্থন দানের প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত আপোষ রফারও পরামর্শ দেন। মহাচীন পিকিং হইতে আগাগোড়া বাস্তব সাহায্যদানের লম্বা চওড়া প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করিলেও, কার্যক্ষেত্রে তাহাদের সকল প্রতিশ্রুতি কথার তুবড়িতে পরিণত হয়। বাস্তবে কিছুই হয় নাই।

বাংলাদেশে ভারতীয় স্বার্থ

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালোরাত্রিতে পাক বাহিনীর অতর্কিত হামলা ৬ দফা

ভিত্তিক সাংবিধানিক দাবীকে স্বাধীনতার দাবীতে রূপান্তরিত করে। অবস্থাদৃষ্টে পূর্ব পাকিস্তানী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের ভারতীয় সাহায্য প্রার্থনা বৈরী রাষ্ট্র পাকিস্তানকে খন্ড-বিখন্ড করিবার সুবর্ণ সুযোগ হিসাবেই অপেক্ষমান ভারতীয় নেতৃবৃন্দের দ্বারস্থ হয়। এইভাবেই কালের প্রবাহে, ঘটনাস্রোতে আকস্মিক মোড় পরিবর্তনের ফলে পূর্বে বর্ণিত ভারতীয় নিজস্ব কারণ ও বাংলাদেশের নিজস্ব কারণ একই ঘটনাস্রোতে লীন হইয়া বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়। আমি ভারতের অভিসন্ধি সম্বন্ধে সর্বদাই সন্দিগ্ধ ছিলাম। ভারত বৃহৎ দেশ, তাহার প্রয়োজনও বৃহৎ। ছোট ছোট দেশ বড় বড় দেশের স্বার্থে উচ্ছন্নে যাইতে বাধ্য হয়। কেবলমাত্র দৃঢ়চেতা সৎ সাহসী নেতাই কোন ছোট দেশকে বৃহৎ দেশের ছোবল হইতে রক্ষা করিতে পারেন। সিকিম রাজ্য ও কাশ্মীর রাজ্যের দুর্বল নেতৃত্ব দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ব্যর্থ হইয়া দেশ দুইটিকে বৃহৎ ভারতীয় রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের একশ্রেণীর নেতা ১৯৫৪-৫৮ সালের মধ্যে বিশেষতঃ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক একচেটিয়া বিজয়ের পর নিজেদের কার্যকলাপের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, নীতি, আদর্শ, সততা তাহাদের মুখের বুলি মাত্র– চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ নহে, অর্থাৎ বুকের বুলি নহে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অক্টোবর মাসে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারের সাথে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, প্রশাসনিক, সামরিক ও বাণিজ্য সমঝোতা বিষয়ে ৭ দফা গোপন চুক্তি সম্পাদন করে। সুতরাং সেই গোপন চুক্তি অনুযায়ী স্বাধীন বাংলাদেশ কাগজে কলমে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান পাইলেও কার্যক্ষেত্রে ভারতের বশংবদ রাষ্ট্রে পরিণত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি! অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সরকার ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয় হওয়া সত্ত্বেও ভারতের মাটি হইতে ঢাকায় পদার্পণ করে ২০শে ডিসেম্বর। ইহা এক অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় ঘটনা। শুধু তাই নয়, স্বদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সরকার ১লা জানুয়ারী (১৯৭২) এক আদেশ বলে বাংলাদেশের মুদ্রামান শতকরা ৬৬ ভাগ হ্রাস করেন। উল্লেখ্য যে, এই সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের মুদ্রামান ছিল ভারতীয় মুদ্রামান হইতে বেশী। তাজউদ্দিন সরকার এক ঘোষণায় দুই মুদ্রামানের বিনিময় হারের সমতা আনিতে চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ফল দাঁড়াইল অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি এবং জনজীবনে আকাশচুম্বী দ্রব্যমূল্য। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় ও বাংলাদেশ অর্থনীতিদ্বয়কে পরস্পর সম্পূরক ঘোষণা করা হয় এবং এতদিন যাবত ভারতে পাট বিক্রির উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তাজউদ্দিন সরকার ১৯৭২-এর ১লা জানুয়ারী হইতে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে।

তাজউদ্দিন সরকারের উক্ত ঘোষণা অর্থনীতির মূল সত্যকে অস্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বিশ্ব বাজারে ভারত ও বাংলাদেশ পাট, চা, চামড়া বিক্রির ব্যাপারে পরস্পরের প্রতিযোগী। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা ৯০ ভাগ উপার্জন ছিল কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্যের উপর নির্ভরশীল। আবার ভারত ও

বাংলাদেশ স্ব-স্ব বস্ত্র শিল্পের প্রয়োজনে বিদেশ হইতে কাঁচামাল, তুলা আমদানী করে। উভয় রাষ্ট্রকে বিশ্ব বাজার হইতে স্ব-স্ব প্রয়োজনে খাদ্য ক্রয় করিতে হয়। মুদ্রামানের হ্রাস উহার উপরে প্রচন্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এক কথায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আত্মনাশা নীতি দেশের অর্থনীতিকে ভাংগিয়া চুরমার করিয়া দেয়। তৃতীয়তঃ ভারতীয় সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস হইতে মুদ্রিত বাংলাদেশের নোটের সংখ্যা সরকার কর্তৃক ঘোষিত সংখ্যা হইতে অনেক অধিক বলিয়া জনসাধারণের মধ্যে একটা ধারণার সৃষ্টি হয়। তাহাদের এই ধারণা বদ্ধমূল হয় ভারতের মুদ্রিত নোট অচল বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর মুজিব সরকারের এক অভিনব ও বিস্ময়কর ঘোষণায়। এই ঘোষণায় বলা হয় যে, ভারতে মুদ্রিত নোট দুই মাস যাবত বদল করা যাইবে। ইহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য যে কোন সাধারণ চোখেও ধরা পড়িতে বাধ্য। এইভাবেই বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রকট মুদ্রাস্ফীতির অভিশাপের শিকারে পরিণত হয়। চতুর্থতঃ চরম বিস্ময়কর ঘটনা পরিলক্ষিত হয় বাংলাদেশের বাজারে। কেনা-কাটায় ভারতীয় মুদ্রার অবাধ প্রচলন শুরু হয়। ভারতীয় সৈন্য, ভারতীয় ব্যবসায়ী, ভারতীয় সাধারণ নাগরিক বাংলাদেশের বাজার হইতে দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রায় ক্রীত বিদেশী পণ্যদ্রব্য ও দেশীয় মাছ, আলু, ডিম, মোরগ, হাঁস, রসুন, মরিচ ইত্যাদি কয়েকশত কোটি টাকার দ্রব্য ভারতীয় মুদ্রায় অবাধে ক্রয় করিয়া ভারতে লইয়া যায়। আবার বিভিন্ন কলকারখানা হইতে শত শত কোটি টাকার মেশিনপত্র ও যন্ত্রপাতির খুচরা অংশ, কাঁচামাল ভারতের মারোয়াড়ী শিল্পপতি ব্যবসায়ীরা পাচার করিয়া লইয়া যায়।

পৃথিবীর ইতিহাসে বহু রাষ্ট্র বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য সহায়তায় স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে; কিন্তু বন্ধু রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীয় কাগজী নোটের বিনিময়ে অর্থাৎ বিনামূল্যে সংঘবদ্ধ প্রতারণার দ্বারা লুটপাট করিয়া সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রকে এইভাবে নিঃস্ব করিবার নির্মম নজীর আর কোথাও নাই। বাংলার মাটিরই সন্তান ছিলেন তাজউদ্দিন। অথচ তাহার সরকার ভারতীয় কাগজী মুদ্রা বেআইনীভাবে চালু হইতে বাধা দেয় নাই। দেশ বিক্রি আর কাহাকে বলে? পঞ্চমতঃ ৯৩০০০ যুদ্ধ বন্দী বাংলাদেশ হইতে যে দামী দ্রব্য লুট করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছিল ভারতীয় সেনা বাহিনী যুদ্ধ বন্দীদের নিকট হইতে সেইগুলি ছিনাইয়া লইয়াছে; আত্মসাৎ করিয়াছে ও ভারতে স্বীয় পরিবার-পরিজনের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছে। তদুপরি যুদ্ধবন্দীগণ যুদ্ধের নয় মাসে (১৯৭১ মার্চ হইতে ডিসেম্বর) বাংলাদেশের নাগরিকদের নিকট হইতে যে বিপুল পরিমাণ পাকিস্তানী মুদ্রা বিভিন্নভাবে অর্জন করিয়াছিল; ভারতীয় সৈন্যরা সেই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দ্বারা বাংলাদেশ হইতে মাল ক্রয় করতঃ ট্রাকে ভর্তি করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করিয়াছে। একটি সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের দুষ্প্রাপ্য সম্পদ বন্ধুত্বের নামাবলীর আড়ালে এইভাবে বাংলাদেশস্থ বিভিন্ন সামরিক ছাউনী হইতে (Millitary Cantonment) ভারতে স্থানান্তরিত করিবার প্রতিবাদে তাজউদ্দিন সরকার টু শব্দটি পর্যন্ত করেন নাই।

ভারতীয় দৈনিক সংবাপত্র "অমৃতবাজার"-এর ১২ই মে (১৯৭৪) সংখ্যার রিপোর্ট

অনুসারে ভারত সরকার দুই হইতে আড়াই শত রেলওয়ে ওয়াগন ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধক্রমে স্থানান্তরিত করিয়াছে। অথচ ১৯৭৩ সালের ১১ই জুলাই বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, ভারতে কোন অস্ত্রশস্ত্র পাচার হয় নাই; বা লইয়াও যায় নাই। ১৯৭৪ সালের ১৭ই জুন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দিন ঠাকুর প্রকাশ করেন যে, ভারতে স্থানান্তরিত অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশকে ফেরত দেওয়া শুরু হইয়াছে। দুই মন্ত্রীর এই দুই বক্তব্যের মধ্যে স্ব-বিরোধিতা লক্ষণীয়। দেশ ও জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা আর কাহাকে বলে? আর কাহাকেই বা বলা হয় সাক্ষী গোপাল সরকার? স্বর্ণের ভরি ১৭১ টাকা মানে স্থানান্তরিত অস্ত্রশস্ত্রের মুল্য যদি ৪৫০ কোটি টাকা হয়, তাহা হইলে স্বর্ণভরি ১০০০ টাকা মানে উক্ত অস্ত্রশস্ত্রের মূল্য প্রায় ২৭০০ কোটি টাকা হয়। তদুপরি মহাচীন কর্তৃক নির্মিত জয়দেবপুর অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী হইতে অস্ত্র নির্মাণ যন্ত্রপাতি ভারতে স্থানান্তরের অভিযোগ উত্থিত হয়। আমরা বাংলা জাতীয় লীগ উপরোক্ত বক্তব্যগুলি জনসাধারণ্যে তুলিয়া ধরি এবং দিল্লীর দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভের আকাংখায় দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হইয়া 'আজাদ বাংলা' আন্দোলন গড়িয়া তুলি।

ভারতের সহিত গোপন চুক্তি

১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকারের সাথে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার প্রশাসনিক, সামরিক, বাণিজ্যিক, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে একটি সাতদফা গোপন সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তিগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. **প্রশাসনিক বিষয়ক ঃ** যারা সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে শুধু তাঁরাই প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে নিয়োজিত থাকতে পারবে। বাকীদের শুন্য জায়গা পূরণ করবে ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ।

২. **সামরিক বিষয়ক ঃ** বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে। ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাস থেকে আরম্ভ করে প্রতিবছর এ সম্পর্কে পুনরীক্ষণের জন্য দু'দেশের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

৩. **বাংলাদেশের নিজস্ব সেনাবাহিনী বিষয়ক ঃ** বাংলাদেশের নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী থাকবে না। অভ্যন্তরীণ আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য মুক্তিবাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে।

৪. **ভারত-পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধ বিষয়ক ঃ** সম্ভাব্য ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অধিনায়কত্ব দেবেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান। এবং যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তি বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়কত্বে থাকবে।

৫. **বাণিজ্য বিষয়ক ঃ** খোলা বাজার ভিত্তিতে (open market) চলবে দু'দেশের বাণিজ্য। তবে বাণিজ্যের পরিমাণের হিসাব নিকাশ হবে বছর ওয়ারী এবং

যার যা প্রাপ্য সেটা স্টার্লিং এ পরিশোধ করা হবে।

৬. **পররাষ্ট্র বিষয়ক ঃ** বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংগে বাংলাদেশের সম্পর্কের প্রশ্নে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে এবং যতদুর পারে ভারত বাংলাদেশকে এ ব্যাপারে সহায়তা দেবে।

৭. **প্রতিরক্ষা বিষয়ক ঃ** বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করবে ভারত।

গোপন চুক্তি প্রসঙ্গে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার ঃ

... বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগর সরকারের সাথে ভারত যে ৭ দফা গোপন চুক্তি করে সে ব্যাপারে জনাব মাসুদুল হক রচিত "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র" এবং সি.আই.এ" শীর্ষক গ্রন্থে মুক্তি যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দিল্লীতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে রাষ্ট্র দূতের দায়িত্ব পালনকারী জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী পরবর্তীতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের স্পীকার ছিলেন। ১৯৮৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর প্রদত্ত জনাব চৌধুরীর-এ সাক্ষাৎকারের সংশ্লিষ্ট অংশ উক্ত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ১৬৩ থেকে ১৬৬ পৃষ্ঠা হুবহু নীচে তুলে ধরা হলো ঃ

প্রশ্ন ঃ অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার ভারতের সঙ্গে যে গোপন সাত দফা চুক্তি করে, প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা কি সেই সাত দফার মধ্যেই একটি? রক্ষীবাহিনীই কি এই প্যারামিলিশিয়া বাহিনী?

হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ঃ ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকারের সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এক লিখিত চুক্তিতে প্যাক্ট নয়–এগ্রিমেন্টে আসেন। এই চুক্তি বা এগ্রিমেন্ট অনুসারে দু'পক্ষ কিছু প্রশাসনিক, সামরিক ও বাণিজ্যিক সমঝোতায় আসেন। প্রশাসনিক বিষয়ে তা হলো যারা সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধ করেছে, শুধু তারাই প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে নিয়োজিত থাকতে পারবে। বাকীদের চাকুরীচ্যুত করা হবে এবং সেই শূন্য জায়গা পূরণ করবে ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। স্বাধীনতার পর বেশ কিছু ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা বাংলাদেশে এসেও গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু (শেখ মুজিব) এসে তাদেরকে বের করে দেন।

সামরিক সমঝোতা হলো ঃ বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে (কতদিন অবস্থান করবে তার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় না)। ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাস থেকে আরম্ভ করে প্রতিবছর এ সম্পর্কে পুনরীক্ষণের জন্য দু'দেশের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশের নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী থাকবে না।

আভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মুক্তিবাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারা-মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে। এই লিখিত সমঝোতাই রক্ষীবাহিনীর উৎস।

আর ভারত পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধবিষয়ক সমঝোতাটি হলো ঃ সম্ভাব্য ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অধিনায়কত্ব দেবেন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান। মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিকনায়ক নন। এবং যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়কত্বে থাকবে।

চুক্তির এই অনুচ্ছেদটির কথা মুক্তিবাহিনী সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীকে জানানো হলে তীব্র ক্ষোভে তিনি ফেটে পড়েন। এর প্রতিবাদে রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকেন না।

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কোলকাতা সফরে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ কথাবার্তার মাঝে প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে অপ্রস্তুত করে দিয়ে বলেন ঃ 'আমার দেশ থেকে আপনার সেনাবাহিনী ফিরিয়ে আনতে হবে।' শেখ মুজিব এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এত সহজভাবে তুলতে পারেন, ভাবতেও পারেননি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী। তার এই অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগ নিয়ে শেখ মুজিব নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন, 'এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর আদেশই যথেষ্ট।' অস্বস্তিকর অবস্থা পাশ কাটাতে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে রাজি হতে হয় এবং জেনারেল মানেকশকে বাংলাদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের নিদক্ষণ নির্ধারণের নির্দেশ দেন।

বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে যে চুক্তি হয়, সেটা খোলা বাজার (ওপেন মার্কেট) ভিত্তিক। খোলা বাজার ভিত্তিতে চলবে দু'দেশের বাণিজ্য। তবে বাণিজ্যের পরিমাণের হিসাব-নিকাশ হবে বছরওয়ারী এবং যারা যা প্রাপ্য, সেটা স্টার্লিং-এ পরিশোধ করা হবে।

স্বাধীনতার পর পরই চুক্তি অনুসারে খোলা বাজারভিত্তিক বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। দু'দেশের সীমান্তের তিন মাইল খুলে দেয়া হয়। শেখ মুজিব এটা বন্ধ করে দেন।

বৈদেশিক বিষয়ে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার যে চুক্তিতে আসেন-সেটা হল ঃ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের প্রশ্নে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে এবং যতদূর পারে ভারত এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে সহায়তা দেবে।

মূলতঃ বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ও পরাষ্ট্র বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করবে ভারত।

এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। চুক্তি স্বাক্ষরের পর মুহূর্তেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ভারত সরকারের সঙ্গে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গৃহীত এই পুরো ব্যবস্থাকেই অগ্রাহ্য করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ কারণে আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি

যে, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ বাংলাদেশ পাকিস্তান সৈন্যমুক্ত হয় মাত্র। কিন্তু স্বাধীন-সার্বভৌম হয় ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারীতে। যেদিন শেখ মুজিব পাকিস্তান জেল থেকে মুক্ত হয়ে ঢাকা আসেন। বস্তুতঃ শেখ মুজিব ছিলেন প্রকৃত সাহসী এবং খাঁটি জাতীয়তাবাদী।

(স্বাক্ষর)
হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী,
২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৯"

পরবর্তীকালে এই সাতটি চুক্তি স্বল্প-পরিমার্জিতরূপে ১৯৭২ সালের ১৯শে মার্চ ঢাকার বুকে বংগভবনে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান স্বাক্ষরিত ২৫ সালা "বন্ধুত্ব সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তি' তে মহাসমারোহে সন্নিবেশিত করা হয়। বাংলা জাতীয় লীগ ইহাকে 'দাসত্ব চুক্তি' বলিয়া আখ্যায়িত করে। উপরোক্ত দেশীয় স্বার্থ বিরোধী ও স্বজাতিদ্রোহী নীতি অবলম্বন ও অবাধ লুটতরাজ প্রতিরোধে অনীহা প্রদর্শন একমাত্র সাক্ষীগোপাল সরকারের পক্ষেই সম্ভব। দেশীয় স্বার্থ ও দেশীয় সম্পদকে বন্ধু রাষ্ট্রের ছোবল হইতে সংরক্ষণে চরম ব্যর্থতার সন্তোষজনক কোন জওয়াব তাজউদ্দিন আহমদ কিংবা শেখ মুজিবর রহমানের কূট-তর্ক ভাণ্ডারে ছিল কি?

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত হইতে বিশ মাইলের মধ্যে অবস্থিত এলাকায় অবাধ বাণিজ্য প্রচলনের মানসে ২৭শে মার্চ (১৯৭২) সীমান্ত অবাধ বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন মুজিব সরকারের ইতিহাসে আরেকটি কলঙ্কময় অধ্যায়। এই চুক্তি কি সর্বনাশই না সাধন করিয়াছে জাতীয় অর্থনীতিতে। আরো ন্যাক্কারজনক অধ্যায় সংযোজিত হয় শেখ মুজিবর রহমান যখন ১৯৭৪ সালের ১৬ই মে দিল্লী শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বেরুবাড়ী ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পদযুগলে নৈবেদ্য হিসাবে অর্পণ করেন। ইহার প্রতিবাদে যখন গণ-আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলাম সেই সময়ে ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন মুজিব সরকার আমাকে কারারুদ্ধ করে। মুজিবের অভিশপ্ত ও সর্বনাশা নেতৃত্ব হইতে বাংলাদেশ মুক্তি পায় ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট। এই দিন বাংলাদেশের ইতিহাসে সংযোজিত হয় এক নবতর অধ্যায়। এই নবতর অধ্যায় সৃষ্টিকারী ১৫ই আগস্টের প্রকৃত নায়ক কর্নেল আবদুর রশীদ ও লেঃ কঃ ফারুকের নাম বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। এই ১৫ই আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানে সপরিবারে নিহত হন শেখ মুজিব এবং ওই দিনই রেডিও এবং টেলিভিশন হইতে নব-নিযুক্ত প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে গোটা জাতির পক্ষ হইতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বুলন্দ আওয়াজ উচ্চারণ করেন। গোটা দেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। নূতন করিয়া শুরু হয় নবতর পথযাত্রা।

ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার প্রসঙ্গে জে. এন. দীক্ষিতের সাফাই

ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব জে, এন, দীক্ষিত ৪-৭-৯৫ ইং INDIAN EXPRESS পত্রিকায় তার লিখিত নিবন্ধে প্রকাশ করেন যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান চেয়েছিলেন যে ভারতীয় সেনাবাহিনী যেন অন্ততঃ এক বৎসর বাংলাদেশে অবস্থান করে কিন্তু ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার আশংকায় উপরোক্ত প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান লেঃ জেনারেল জগজিৎসিংহ অরোরা এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে নিখিল চক্রবর্তীর এক প্রশ্নোত্তরে বলেন, "ভারতীয় বাহিনীর ইষ্টার্ণ হেডকোয়ার্টার ছিল কলিকাতায়। ঢাকা অভিমুখে মার্চ্চ করার আগে আমরা ঢাকায় কতদিন থাকব সেটা নিয়ে ভাবলাম। আমি ঢাকায় আমাদের অবস্থানের সময়সীমা নির্দ্ধারণ করেছিলাম তিন মাস। আমরা ঢাকায় তিন মাস থাকব। এটা এই জন্যেই ঠিক করেছিলাম যে যদি আমরা এর বেশী থাকি আমরা আর লিবারেশন আর্মি হিসাবে অভিনন্দিত না হয়ে অকপেশন আর্মি (দখলদার বাহিনী) হিসাবে চিহ্নিত হব। তাই আমরা ৩ মাসের বেশী থাকিনি।" (দৈনিক ইনকিলাব-১২-৩-৯৪ ইং) উপরোক্ত উক্তিগুলিই প্রমাণ করে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের দাবী সত্য নহে। অথচ এটি নিছক ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিজেদের এবং সৈয়দ নজরুল ও তাজউদ্দিন গংদের পক্ষে সাফাই ছাড়া অন্য কিছু নয়।

যুদ্ধোত্তর পাকিস্তান

যুদ্ধ চলাকালে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনাব নূরুল আমিনকে প্রধানমন্ত্রী ও জুলফিকার আলী ভুট্টোকে উপ-প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ১৬ই ডিসেম্বরে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অংগচ্ছেদের পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ২০শে ডিসেম্বর (১৯৭১) পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগুরু সদস্যবৃন্দের নির্বাচিত সংসদীয় নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর হস্তে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। জনাব নূরুল আমিন পশ্চিম পাকিস্তানেই ইন্তেকাল করেন এবং করাচীতে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সমাধি পার্শ্বেই তাঁহাতে সমাধিস্থ করা হয়। জনাব নূরুল আমিনের পক্ষে ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, কায়েদে আযমের পার্শ্বেই তিনি অন্তিম শয্যায় শায়িত আছেন।

ক্ষমতা হস্তান্তরকালে জেনারেল ইয়াহিয়া বন্দী শেখ মুজিবর রহমানকে ফাঁসী দেয়ার পরামর্শ দেয়। উত্তরে ক্ষমতাগ্রহণকারী জুলফিকার আলী ভুট্টোর উক্তি প্রণিধানযোগ্য "If I kill Mujib, not a single West Pakistani will ever come home" অর্থাৎ "আমি মুজিবকে হত্যা করিলে একজন পশ্চিম পাকিস্তানী আর দেশে আসিতে পারিবে না।" ৯৩০০০ যুদ্ধবন্দী ও কয়েক হাজার পাকিস্তানী বেসামরিক কর্মচারীবৃন্দ বাংলাদেশে আটক। "Partition & After Math-Memoirs of an Ambasador by kewal singh

I.C.S.-Foreign secretary-Govt. of India.

জনাব জুলফিকার আলী ভূট্টো প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণের কিয়ৎ কালের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগার হইতে মুক্তি দিয়া এক গৃহে অন্তরীণ করেন এবং ৩রা জানুয়ারী করাচীতে অনুষ্ঠিত জনসভায় দেয় ভাষণ অনুসারে ৮ই জানুয়ারী (১৯৭২) শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তিদান করিয়া বাংলাদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। বিষয়টি নিঃসন্দেহে জনাব ভুট্টোর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাক্ষ্য বহন করে। ১৯৭১ সালের ১১ই আগস্ট নাকি গোপন সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। মুক্তির পর শেখ মুজিবর রহমান ৮ই জানুয়ারী (১৯৭২) অপরাহ্ন ১২টা ৩৫ মিঃ লণ্ডন বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। তথায় একদিন অবস্থানের পর ১০ই জানুয়ারী বৃটিশ সরকার প্রদত্ত রাজকীয় বিমান বাহিনীর 'কমেট' বিমানযোগে ঢাকার পথে ভারত সরকার কর্তৃক দিল্লীতে আয়োজিত সম্বর্ধনা উপলক্ষে শেখ মুজিব সকাল ৮-৩০ মিনিটে কয়েক ঘণ্টার জন্য পালাম বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। ভারতীয় প্রেসিডেন্ট ভি, ভি, গিরি ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাহাকে পালাম বিমান বন্দরে স্বাগত জানান। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সহিত মত-বিনিময় ও দিল্লী সম্বর্ধনা সমাপনের পর অপরাহ্ন ১টা ৪২ মিনিটে বৃটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর কমেট বিমানেই শেখ মুজিব ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। নেতার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিমান বন্দর হইতে ঢাকা রেসকোর্স ময়দান (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পর্যন্ত দীর্ঘপথ লোকে লোকারণ্য হয়। তেজগাঁ বিমান বন্দর হইতে ঢাকা রেসকোর্স ময়দান পর্যন্ত মাত্র ৪ মাইল পথ ট্রাকযোগে অতিক্রম করিতে ২ ঘণ্টারও অধিক সময় লাগে। স্বচক্ষে অবলোকন না করিলে জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার গভীরতা অনুধাবন করা অসম্ভব। এই দৃশ্য অভূতপূর্ব; ছিল আগেবপ্রসূত; এই দৃশ্য অবিস্মরণীয় এবং ঐতিহাসিক।

সেইদিন তাঁর সম্মানে রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় বক্তব্য দিতে গিয়ে এক পর্যায়ে তিনি বলেন যে, "আমি একজন মুসলমান। মৃত্যু আমার একবারই হবে। বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ ...।" তাঁর সেদিনের সেই সাহসী ও সময়োপযোগী সুস্পষ্ট উচ্চারণ বাংলাদেশের অস্তিত্বের ভিত্তিকে মজবুত করতে নতুন মাত্রা যোগ করে।

প্রধানমন্ত্রী পদে শেখ মুজিব

১১ই জানুয়ারী (১৯৭২) টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। রিসিভার তুলিয়া একটি অতি পরিচিত কিন্তু অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। কণ্ঠস্বরটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের। কলেজ জীবন হইতে বন্ধুত্ব; কিন্তু কলিকাতায় প্রবাসী অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে আমাদের মত ভিন্ন দলীয় জাতীয়তাবাদীদের সহিত শোভনীয় আচরণ প্রদর্শন করেন নাই। যাহা হইক,

টেলিফোনে তাজউদ্দিন কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর আমাকে বলেন, শেখ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন.করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছি ও প্রস্তাবও করিয়াছি। কারণ তিনি যে কোন পদেই বহাল থাকুন না কেন, তাঁহার ইচ্ছা-অনিচ্ছাতেই রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালিত হইবে। শেখ সাহেবের মানসিক গড়ন তুমিও জান; আমিও জানি। তিনি সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্থ। অতএব ক্ষণিকের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য পার্লামেন্টারী কেবিনেট পদ্ধতির প্রশাসন প্রহসনে পরিণত হইবে। তিনি প্রেসিডেন্ট পদে আসীন থাকিলে নিয়মতান্ত্রিক নাম-মাত্র দায়িত্ব পালন না করিয়া মনের অজান্তে কার্যতঃ ইহাকে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির প্রশাসনে পরিণত করিবেন। এইদিকে প্রেসিডেন্ট পদে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে নির্বাচনের কথা ভাবিতেছি। তোমার মত কি?

তদুত্তরে তাঁহাকে বলি "তোমার সিদ্ধান্ত সঠিক। নামমাত্র প্রেসিডেন্টের ভূমিকা পালন শেখ সাহেবের শুধু চরিত্র বিরুদ্ধ হইবে না; বরং উহা হইবে অভিনয় বিশেষ। কেননা, ক্ষমতার লোভ তাঁহার সহজাত।" তাজউদ্দিন টেলিফোনের অপর প্রান্তে সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আমি জানিতাম, মৌলিক প্রশ্নে তোমার আমার মধ্যে মতভেদ হইবে না।"।

১২ই জানুয়ারীর এক ঘোষণায় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও শেখ মুজিবুর রহমান যথাক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করিলেন বটে; কিন্তু উত্তরকালে ঘটনা প্রবাহে বন্ধুবর তাজউদ্দিনের সদিচ্ছার শেষ রক্ষা হইল না।

ভারত-বাংলা দাসত্ব চুক্তি

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের আমন্ত্রণক্রমে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৭ই মার্চ (১৯৭২) ঢাকা সফরে আসেন। লক্ষ লক্ষ জনতা তাঁহার আন্তরিক অভ্যর্থনা জানায়। ১৯শে মার্চ উভয় প্রধানমন্ত্রী যুক্ত ইশ্‌তেহার প্রকাশ করেন ও ২৫ বৎসর মেয়াদী "বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তি" স্বাক্ষর করেন। আমাদের বাংলা জাতীয় লীগের দৃষ্টিতে চুক্তিটি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব খর্বকারী সামরিক চুক্তি অন্য কথায় দাসত্ব চুক্তি ছাড়া কিছুই ছিল না। ১৯৫৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান অনুরূপ পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সে সময়ে এই পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করে। কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পর সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবর রহমান, আতাউর রহমান খান, মানিক মিয়া (সম্পাদক, ইত্তেফাক) প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির গোঁড়া সমর্থকে পরিণত হন। সেই শেখ মুজিবুর রহমানই পুনরায় ক্ষমতার মোহে ভারতের সহিত ২৫ সালা দাসত্ব চুক্তি তথা সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। লক্ষণীয় যে, পুনঃ পুনঃ অভিযোগ সত্ত্বেও মুজিব-তাজউদ্দিন ভারতের সহিত গোপন চুক্তি অস্বীকার করিতেন, ঠিক যেমন পার্ক-মার্কিন সামরিক চুক্তির সর্বনাশা গোপন

ধারাগুলি পাক-সরকার প্রকাশ্যে উচ্চকণ্ঠে পুনঃপুনঃ অস্বীকার করিতেন।

Treaty of Friendship, Co-operation and Peace between the People's Republic of Bangaldesh and the Republic of India

Inspired by common ideals of peace, secularism, democracy, socialism and nationalism.

Having struggled together for the realisation of these ideals and cemented ties of friendship through blood and sacrifices which led to the triumphant emergence of a free, sovereign and independent Bangladesh,

Determined to maintain frateral and good neighbourly relations and transform their border into a border of eternal peace and friendship,

Adhering firmly to the basic tenets of non-alignment, peaceful co-existence, mutual co-operation, non-interference in internal affairs and respect for territorial integrity and sovereignty,

Determined to safeguard peace, stability and security and to promote progress of their respective countries through all possible avenues of mutual co-operations,

Determined further to expand and strengthen the existing relations of friendship between them,

Convinced that the further development of friendship and co-operation meets the national interests of both States as well as the interests of lasting peace in Asia and the world.

Resolved to contribute to strengthening world peace and security and to make efforts to bring about a relaxation of International tension and the final elemination of vestiges of colonialism, recialism and imperialism,

Convinced that in the present-day world international problems can be solved only through co-operation and not through conflict or confronation,

Reaffirming their determination to follow the aims and principles of the United Nations Charter,

The people's Republic of Bangladesh, on the one hand, and the Republic of India, on the other, have decided to conclude the present Treaty,

Article : 1

The High Contracting Parties, inspired by the ideals for which their respective peoples struggled and made sacrifices together, solemnly declare that there shall be lasting peace and friendship between their two countries and their peoples. Each side shall respect the independence, sovereignty and territorial integrity of the other and refrain form interfering in the internal affairs of the other side.

The High Contracting parties shall further develop and strengthen the relations of friendship, good-neighbourliness and all-round co-operation existing between them, on the basis of the above-mentioned principlies as well as the principles of equality and mutual benefit.

Article : 2

Being guided by their devotion to the principle of equality of all peoples and states, irrespective of race or creed, the High Contracting parties condemn colonialism and recialism in all their forms and manifestations and reaffirm their determination to strive for their final and complete elemination.

The High Contracting parties shall co-operate with other states in achieving these aims and support the just aspirations of peoples in their struggle against colonialism and racial discrimination and for their national liberation.

Article : 3

The High Contracting parties reaffirm their faith in the policy of non-alignment and peaceful co-existence, as important factors for easing tension in the world, maintaining international peace and security and strengthening national sovereignty and independence.

Article : 4

The High Contracting Parties shall maintain regular contacts with each other on major international problems affecting the interests of both States, through meetings and exchanges of views of at all levels.

Article : 5

The High Contracting Parties shall continue to strengthen and widen their mutually advantageous and all-round co-operation in the economic, scientific and technical fields. The two countries shall develop mutual co-operation in the fields of trade, transport and communications between them on the basis of the principles of equality, mutual benefit and the most favoured nation principle.

Article : 6

The High Contracting Parties further agree to make joint studies and take joint action in the fields of flood control, river basin development and the development of hydro-electric power and irrigation.

Article : 7

The High Contracting parties shall promote relations in the fields of art, literature, education, culture, sports and health.

Article : 8

In accordance with the ties of friendship existing between the two countries each of the High Contracting Parties solemnly declares that it shall not enter into or participate in any military alliance directed against the other party.

Each of the High Contracting Parties shall refrain from any aggression against the other Party and shall not allow the use of its territory for committing any act that may cause millitary damage to or constitute a threat to the security of the other High Contracting Party.

Article : 9

Each of the High Contracting Parties shall refrain from giving any assistance to any third party taking part in an armed conflict against the other party. In case either Party is attacked or threatened with attack, the High Contracting Parties shall immediately enter into mutual consultations in order to take appropriate effective measures to eleminate the threat and thus ensure the peace and security of their countries.

Article : 10

Each of the High Contracting Parties solemnly declares that it shall not undertake any commitment. secret of open, toward one or more states which may be incompatible with the present Treaty.

Article : 11

The present Treaty in signed for a term of twenty-five years, and shall be subject of renewal by mutual agreement of the High Contracting Parties.

The Treaty shall come into force with immediate effect from the date of its signature.

Article : 12

Any differences in interpreting any article or articles of the present Treaty that may arise between the High Contracting Parties shall be setled on a bilateral basis by peaceful means in a spirit of mutual respect and understanding.

Done in Dhaka on the Nineteenth Day of March, Nineteen Hundred and Seventy two.

(Sheikh Mujibur Rahman)
Prime Miniser
For the People's Republic of Bangladesh

(Indira Gandhi)
Prime Minister
For the Republic of India.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের মধ্যে মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তি

শান্তি, ধর্মনিক্ষেপতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে,

এই আদর্শের বাস্তবায়নের জন্য একযোগে সংগ্রাম এবং রক্তদান ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করার ফলশ্রুতি হিসেবে মুক্ত, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের বিজয় অভ্যুদয় ঘটিয়ে,

সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও সৎপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক রক্ষায় এবং উভয় রাষ্ট্রের সীমান্তকে চিরস্থায়ী শান্তি ও বন্ধুত্বের সীমান্ত হিসেবে রূপান্তরিত করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে, নিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান, পারস্পারিক সহযোগিতা, অপরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে সম্মান প্রদর্শনের মূলনীতিসমূহের প্রতি দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল থেকে,

শান্তি স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা রক্ষার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এবং সম্ভাব্য সকল প্রকারের পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে স্ব-স্ব দেশের অগ্রগতি সাধনের জন্য,

উভয় দেশের মধ্যে বর্তমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো সম্প্রসারণ ও জোরদার করার জন্য দৃঢ় সংকল্প হয়ে,

এশিয়া তথা সমগ্র বিশ্বের স্থায়ী শান্তির স্বার্থে এবং উভয় রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের খাতিরে বন্ধুত্ব ও পারস্পারিক সহযোগিতা আরো সম্প্রসারণের ব্যাপারে স্থিরবিশ্বাসী হয়ে,

বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা জোরদার করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন এবং উপনিবেশবাদ, বর্ণবৈষম্য ও সাম্রাজ্যবাদের অবশেষসমূহ চূড়ান্তভাবে নির্মল করার জন্য প্রচেষ্টা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে,

আজকের বিশ্বে আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের সমাধান শুধুমাত্র সহযোগিতার মাধ্যমে সম্ভব, বৈরীনীতি বা সংঘাতের মাধ্যমে নয়– এ ব্যাপারে স্থিরনিশ্চিত হয়ে,

জাতিসংঘ সনদের নীতিমালা ও লক্ষ্যসমূহ অনুসরণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পুনরুল্লেখ করে এক পক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ অন্য পক্ষে ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বর্তমান চুক্তি স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ এক

চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ, স্ব স্ব দেশের জনগণ যে আদর্শের জন্য একযোগে সংগ্রাম এবং ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মর্যাদার সঙ্গে ঘোষণা করছে যে, উভয় দেশ ও সেখানকার জনগণের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও বন্ধুত্ব বজায় থাকবে। একে অন্যের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডত্বের প্রতি

সম্মান প্রদর্শন করবে এবং অপরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবে। চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয় পক্ষ উপরে উল্লেখিত নীতিমালার ভিত্তিতে এবং সমতা ও পারস্পারিক লাভজনক নীতিসমূহের ভিত্তিতে উভয় দেশের মধ্যকার বর্তমান বন্ধুত্বপূণ সুপ্রতিবেশীসুলভ ও সার্বিক সহযোগিতার সম্পর্কের আরো উন্নয়ন ও জোরদার করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ দুই

জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল রাষ্ট্র ও জনগণের প্রতি সমতার নীতিতে আস্থাশীল থাকার আদর্শে পরিচালিত হয়েই চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয় পক্ষ সর্বপ্রকারের ও ধরণের উপনিবেশবাদ ও বর্নবৈষম্যবাদের নিন্দা করছে এবং তাকে চূড়ান্তভাবে ও সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারে তাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কথা পুনরুল্লেখ করছে।

চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয় পক্ষ উপরোক্ত অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা করবে এবং উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্য বিরোধী সংগ্রাম এবং জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে জনগণের ন্যায়সংগত আশা আকাঙ্খার প্রতি সমর্থনদান করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ তিন

চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয় পক্ষ বিশ্বে উত্তেজনা প্রশমন, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা জোরদার করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে জোট নিরপেক্ষতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির প্রতি তাদের আস্থার পুনরুল্লেখ করছে।

অনুচ্ছেদ ঃ চার

উভয় দেশের স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী নিয়ে চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয় পক্ষ সকল স্তরে বৈঠক ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ পাঁচ

চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয় পক্ষ অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী ক্ষেত্রে পারস্পারিক সুবিধাজনক ও সার্বিক সহযোগিতা জোরদার ও সম্প্রসারিত করে যাবে। উভয় দেশ সমতা ও পারস্পারিক সুবিধার নীতির ভিত্তিতে এবং সর্বাধিক সুবিধাদানের নীতি অনুযায়ী (Most favoured nation policy) বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে পারস্পারিক সহযোগিতা প্রসারিত করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ছয়

বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী অববাহিকার উন্নয়ন এবং জলবিদ্যুৎ শক্তি ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে যৌথ সমীক্ষা পরিচালনা ও যৌথ কার্যক্রম গ্রহণে চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয় পক্ষ একমত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ সাত

চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয় পক্ষ শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও খেলাধূলার ক্ষেত্রে সম্পর্ক প্রসারিত করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ আট

দুইটি দেশের মধ্যকার বর্তমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অনুযায়ী চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয় পক্ষের প্রত্যেকে মর্যাদার সঙ্গে ঘোষণা করছে যে তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোন সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না বা অংশগ্রহণ করবে না।

চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয় পক্ষ একে অন্যের উপর আক্রমণ থেকে নিবৃত্ত থাকবে এবং তাদের এলাকায় এমন কোন কাজ করতে দেবে না যা চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন কোন পক্ষের সামরিক ক্ষতির কারণ হতে পারে বা কোন পক্ষের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

অনুচ্ছেদ ঃ নয়

চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয় পক্ষের কোন এক পক্ষের বিরুদ্ধে তৃতীয় পক্ষ সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হলে চুক্তিকারী প্রত্যেকে এতদউল্লেখিত তৃতীয় পক্ষকে যে কোন সাহায্য প্রদানে বিরত থাকবে। এছাড়া যে কোন পক্ষ আক্রান্ত হলে অথবা আক্রান্ত হবার ভীতি দেখা দিলে এই ধরনের ভীতি নিশ্চিহ্ন করবার উদ্দেশ্যে যথাযথ সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয় পক্ষ সঙ্গে সঙ্গে পারস্পারিক আলোচনায় মিলিত হয়ে নিজেদের দেশের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা এবং শান্তি স্থাপন সুনিশ্চিত করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ দশ

চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয় পক্ষের প্রত্যেকে মর্যাদার সংগে ঘোষণা করছে যে, এই চুক্তির সঙ্গে অসামাঞ্জস্য হতে পারে এ ধরনের গোপন অথবা প্রকাশ্যে এক অথবা একাধিক রাষ্ট্রের সঙ্গে কোন প্রকার অঙ্গীকার করবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ এগারো

এই চুক্তি পঁচিশ বছরের মেয়াদের জন্য স্বাক্ষরিত হলো এবং চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদসম্পন্ন উভয় পক্ষের পারস্পরিক সম্মতিতে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এই চুক্তি সহি হবার দিন থেকে কার্যকরী হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ বারো

এই চুক্তির কোন একটি অথবা একাধিক অনুচ্ছেদের বাস্তব অর্থ করবার সময় চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন মত-পার্থক্য দেখা দিলে তা পারস্পারিক শ্রদ্ধা এবং সমঝোতার মনোভাবের উপর ভিত্তি করে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় নিষ্পত্তি করতে হবে।

ঢাকায় সম্পাদিত। তারিখ উনিশে মার্চ, উনিশ 'শ বাহাত্তর সাল।

(শেখ মুজিবুর রহমান)	(ইন্দিরা গান্ধী)
প্রধানমন্ত্রী	প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে	ভারত সাধারণতন্ত্রের পক্ষে।

ভারত-বাংলাদেশ 'বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও শান্তি' চুক্তির প্রকাশ্য ধারাগুলি পাঠ করিলেই পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির ধারাগুলির কথা আমার স্মরণে আসে। তাই ২০শে মার্চ চট্টগ্রাম জিলা জাতীয় লীগ কর্মী সম্মেলনে ও ২২ শে মার্চ অপরাহ্নে চট্টগ্রাম জাতীয় লীগ কর্তৃক আহূত লালদীঘি ময়দানে প্রকাশ্য জনসভায় আমি উক্ত চুক্তিকে "দাসত্ব-চুক্তি" বলিয়া অভিহিত করি এবং ইহার বাতিল দাবী করি। ইহার কয়েক দিনের মধ্যেই ২৭শে মার্চ (১৯৭২) ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অবাধ বাণিজ্য চুক্তি নামে আরেকটি অসম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আমাদের আশংকাই সত্য হইল। তাই আমরা বাংলা জাতীয় লীগ দিল্লীর দাসত্ব মোচনের দাবীতে "আজাদ বাংলা" আন্দোলনের ডাক দেই। ভারতীয় শক্তি ও বাংলাদেশে ভারতীয় সেবাদাস মহল আমাদের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অবাঞ্ছিত পন্থা গ্রহণ করে। এমনকি জীবন নাশের হুমকি প্রদর্শন করে; আমাকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু 'আজাদ বাংলা' আন্দোলন সমগ্র দেশে ব্যাপ্তি লাভ করে। সে সময়ে ভারতের বিরুদ্ধে এবং ভারতের আশ্রিত মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে জনমতকে আশা ও ভাষাদানের পরিণতিতেই সংঘটিত হয় ১৫ই আগস্টের অভ্যুত্থান, এই অভ্যুত্থানের মাধ্যমেই শুরু হয় বাংলাদেশের সত্যিকার জয়যাত্রা। ফলশ্রুতিতে ২৪শে আগস্ট (১৯৭৫) আমি কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করি। উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ী ভারতীয় বাহিনীর বাংলাদেশে প্রবেশের সংগে সংগে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত একাকার হইয়া যায়। বিনা অনুমতিতে বা বিনা দলিলেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় জনতার পণ্যের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। বাংলাদেশ বাস্তবে ভারতের বাজারে পরিণত হয়। বাংলাদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ গাইট পাট অবাধে সীমান্ত পারের পাটকলগুলির চাহিদা মিটাইতে আরম্ভ করে। ভারতীয় পাটকলগুলির পূর্ণোদ্যমে দুই-তিন শিফটে কাজ চালু হইয়া যায়। এমনকি বাংলাদেশের পাট-লোপাট করিয়া ভারত নূতন করিয়া বিদেশে কাঁচা পাট রফতানী শুরু করিয়া দেয়। স্মর্তব্য, কাঁচা পাটের অভাবে ইতিপূর্বে ভারতীয় পাটকলগুলি অতিকষ্টে এক শিফটে কাজ করিত এবং ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর পাক-ভারত বাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ভারতকে বাধ্যতঃ সিংগাপুরের মাধ্যমে প্রতি বৎসর ১০ হইতে ১৫ লাখ বেল পাকিস্তানী উচ্চমানের পাট চড়ামূল্যে ক্রয় করিতে হইতে। পাক কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন-মুখর শেখ মুজিবর রহমান পাট রফতানীর মাধ্যমে উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পাকিস্তানেরই একাংশ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয়ের বিরুদ্ধে আদা-জল খাইয়া সোচ্চার ছিলেন। অথচ তাঁহারই শাসনামলে ভারত অবাধে বাংলাদেশের পাট

লুণ্ঠন করিয়া চলিল। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশী কাঁচা পাট রফতানী দ্বারা ভারত নিয়মিতভাবে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করিয়া চলিল। অথচ শেখ মুজিব টু শব্দটি উচ্চারণ করিলেন না। ইহা কোন্ স্বার্থের বিনিময়ে কিংবা কোন্ বিশেষ কারণে? তিনি কি জ্ঞাত ছিলেন না যে, ভারতের পাটশিল্পজাত পণ্য রফতানী প্রসূত অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের মাত্র ১৫% হইতে ১৭%; কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতি কাঁচাপাট ও পাটশিল্পজাত পণ্য রফতানী আয়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল? কি মাহেন্দ্রক্ষণেই না বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, আর কি মাহেন্দ্রক্ষণেই না ভারত অবাধ সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য যে, এই সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি ছাড়পত্র বলেই বাংলাদেশের (ক) বিদেশ হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত পণ্যদ্রব্য (খ) ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান হইতে উন্নতমানের আমদানীকৃত পণ্যদ্রব্য (গ) বাংলাদেশের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য ও আমদানীকৃত চাউল ও অন্যান্য সামগ্রী (ঘ) বাংলাদেশের প্রোটিন সমৃদ্ধ ডিম, নদীনালার মাছ, জমির শাক-সব্জি, তরি-তরকারী, গৃহপালিত হাঁস-মোরগ, গরু, বকরি (ঙ) সোনা-রূপা, তামা, ছোট খাট কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সীমান্তের অপর পার ভারতে অবাধে পাচার হইতে থাকে। অপরপক্ষে একই পথে ভারত হইতে আসিতে থাকে তামাক, মসলা প্রভৃতি অনাবশ্যক পণ্য। শুধু তাই নয়, একইভাবে বাংলাদেশ ক্রমে ক্রমে ভারতীয় শিল্পজাত পণ্য দ্রব্যের বাজারে পরিণত হয়। আর ইহারই পরিণতিতে সম্পদে ক্রম-নিঃস্ব বাংলাদেশ অবশ্যম্ভাবী ভাবেই নিপতিত হয় মারাত্মক মুদ্রাস্ফীতির কবলে।

একদিকে মওলানা ভাসানীর সোচ্চার কণ্ঠ এবং অন্যদিকে আমাদের বাংলা জাতীয় লীগের আন্দোলনের ফলে সমগ্র বাংলাদেশ ক্রমশঃ অবাধ বাণিজ্য চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হইয়া উঠে। মুজিব সরকার পরিশেষে জনমতের চাপে পড়িয়াই ১৯৭৩ সালে অবাধ সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি স্থগিত রাখিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে কালো টাকায় পরিচালিত সীমান্ত বাণিজ্য সংঘবদ্ধ চোরাচালানের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে; সর্বনাশা দুর্নীতি অনুপ্রবেশ করিয়াছে জাতীয় জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। আর চরিত্রহীনতা জীবনের ও জীবন যাপনের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। সীমান্তে অবাধ চোরাচালানের সমালোচনার জওয়াবে বাংলাদেশ রাইফেলস প্রধান বিগ্রেডিয়ার চিত্তরঞ্জন দত্ত অকস্মাৎ বেসামাল উক্তি করেন যে, "সীমান্ত চোরাচালান সম্পূর্ণ বন্ধ (dead stop) হইয়াছে এবং ভারত-বিরোধীরাই চোরাচালান সম্পর্কে মিথ্যা প্রচারণা করিতেছে।" যদিও বিগ্রেডিয়ার চিত্তরঞ্জনের অন্যায় মন্তব্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকা সীমান্ত চোরাচালানের উপর তথ্যমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করিয়াছে; ইত্তেফাকের কলামিষ্ট লুব্ধক-তাঁহার 'স্থান-কাল-পাত্র' কলামে বিগ্রেডিয়ার চিত্তরঞ্জনকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়াছেন এবং এমনকি আওয়ামী লীগের কোন কোন সংসদ সদস্যও অবিচ্ছিন্ন চোরাচালানের বিরুদ্ধে সরব কণ্ঠে নিন্দামুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন তথাপি বিগ্রেডিয়ার চিত্তের বিরুদ্ধে দিল্লীশ্বরের ভয়ে মুজিব সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন

নাই।

এইদিকে ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ মিল, ফ্যাক্টরী, কল-কারখানাগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত ঘোষণা করা হয়। দলীয় ও অযোগ্য লোকদের পরিত্যক্ত মিল-কারখানাগুলির প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। সুযোগ পাইয়া নগণ্য সংখ্যক ব্যতিক্রম ব্যতীত সাধারণ শ্রমিক নেতা ও মাতব্বর ধরনের শ্রমিক ও মিল কারখানার প্রশাসকবৃন্দ লুটপাটের অবাধ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সর্বত্র আগ্নেয়াস্ত্রের ঝনঝনানি, সরকারের অমার্জনীয় মৌন সম্মতি, ক্ষেত্র বিশেষে আওয়ামী লীগারদের সহযোগিতা এবং অভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রশাসকদিগকে দালাল আইনে ভীতি প্রদর্শন এবং সর্বোপরি প্রশাসনের চরম ব্যর্থতা ইত্যাকার বহু কারণেই সামগ্রিক উৎপাদন ধসিয়া পড়ে। এককথায় দেশ তীব্র বেগে ধাবিত হইতে থাকে মরহুম ডঃ মাজহারুল হকের ভাষায় "রসাতলের পানে।"

জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে শেখ মুজিবর রহমানের কিছু ঐতিহাসিক কার্যক্রম ঃ

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী মুজিব ভাই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই জাতীয় স্বার্থে কতিপয় যুগান্তকারী কার্যক্রম গ্রহণ করেন যেমন-

ভারতের সাথে প্রবাসী সরকারের গোপন বাণিজ্যিক সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী স্বাধীনতার পর পরই খোলা বাজার ভিত্তিক বাণিজ্যিক কার্য্যক্রম শুরু হয়ে যায়। দু'দেশের সীমান্তের ৩ মাইল খুলে দেয়া হয়। শেখ মুজিব তা বন্ধ করে দেন।

প্রশাসনিক গোপন সমঝোতা অনুযায়ী যশোহর, কুষ্টিয়া ও পাবনা ইত্যাদি জেলায় ভারতীয় কিছু কর্মকর্তা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছিলেন ও অন্যান্য স্থানেও আসার প্রস্তুতি চলছিল। কিন্তু মুজিব ভাই তাদের ফেরৎ পাঠালেন এবং অন্যদের আসা বন্ধ করলেন। দেশীয় অফিসার যাহারা ভারতে যেতে পারেননি বা যাননি এবং যাহারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন তাহাদের সকলকে বহাল রেখেই প্রশাসন চালানোর নির্দেশ দিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের এই সিদ্ধান্ত ছিল যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক। তিনি যদি সেদিন এই সিদ্ধান্ত কঠোরভাবে বাস্তবায়ন না করতেন তাহলে আমাদের যে সমস্ত অফিসার '৭১ এ ভারতে যায়নি তারা সবাই ডিসমিস হতেন। বাঙ্গালী মুসলমানদের শতকরা ৯৫ ভাগ চাকুরী হারাতেন। শূন্যস্থান পূরণ করতো ভারতীয় অফিসাররা। তারাই আমাদের প্রশাসনের নিয়ন্তা হতো ফলশ্রুতিতে আমাদের স্বাধীনতার অস্তিত্ব কতটুকু থাকতো তা সহজেই অনুমেয়। তবে আমাদের সামরিক বেসামারিক প্রশাসনের যাহারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতে গিয়েছিলেন ইতিমধ্যে তাহাদের চাকুরীতে ২ বৎসরের জেষ্ঠতা প্রদান করা হয়। যা ছিল ঘোরতর অন্যায়। কেননা যাহারা পাকবাহিনীর প্রশাসন ছেড়ে দেশ ছেড়েছিলেন তাহারা বিবেকের তাড়নাই তাহা করেছিলেন। দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতেই তাহা করেছিলেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সর্বোচ্চ ত্যাগের আদর্শের মহিমায় তাহারা মুক্তি

সংগ্রামের রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন কোন পুরস্কার, কোন বিনিময় কিংবা প্রাপ্তির জন্য নয়। এই ত্যাগের মহিমাকে কোন কিছুর বিনিময়ে ছোট করা অন্যায় ও অনৈতিক। অথচ ২ বৎসর সিনিয়রিটির নামে এটি করে ত্যাগের মহিমায় ভাস্কর ভবিষ্যৎ ইতিহাসে ওই প্রাপ্তি নিজের কাছেই নিজেকেই ছোট করে দেয়। আর এই কাজটি করেছে দিল্লীশ্বরী ইন্দিরা গান্ধীর বংশবদ বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। ফলে দেশে কোন আদর্শ বা চরিত্র নাই, লোভের হুতাশনে আজ দেশের শিক্ষা, প্রশাসন, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি লণ্ডভণ্ড।

স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দেয় বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্যের অবস্থান। শেখ মুজিব ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ১০ই জানুয়ারী দেশে ফেরার প্রাক্কালে লণ্ডন হয়ে দিল্লীর পালাম বিমান বন্দরে অবতরণের পর দিল্লীতে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সহিত মতবিনিময়ের এক পর্যায়ে দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে দেশ হতে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের সময় জানতে চান এবং অনতিবিলম্বে সৈন্য প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। এতে ইন্দিরা গান্ধী কিছুটা অপ্রস্তুত হলেও সময় মতো প্রত্যাহার করা হবে বলে তাঁকে আশ্বস্ত করতে বাধ্য হন। পরবর্তীতে ফেব্রুয়ারি মাসে কোলকাতা সফরে গিয়ে শেখ মুজিব ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আলোচনাকালে দেশ হতে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের ব্যাপারে পীড়াপিড়ি করে ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক জেনারেল মানেক'শকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দিনক্ষণ ঠিক করতে নির্দেশ প্রদানে বাধ্য করেন। এক পর্যায়ে ইন্দিরা গান্ধী জেনারেল মানেক'শ কে নির্দেশ দিলেন তার বাংলাদেশ সফরের পূর্বেই যেনো সেনা প্রত্যাহারের কাজ শুরু করা হয়। সে মতো ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যাহারের কাজ শুরু হয়। ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য এক ঐতিহাসিক ঘটনা এবং এটা শেখ মুজিবের মতো দৃঢ়চেতা সাহসী নেতার জন্যই সম্ভব হয়েছে। এজন্য জাতি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

পাক সেনাবাহিনীর ৯৩,০০০ যুদ্ধবন্দী সেনা সদস্যের পাকিস্তানে ফেরত নিতে ভারতের সাথে পাকিস্তানের আলোচনার সময় শেখ মুজিব এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অপরাধে বিচার দাবি করেন। এবং বাংলাদেশের সম্মতি ছাড়া তাদের পাকিস্তান ফেরত পাঠানোর বিরোধীতা করেন। পাকিস্তান দাবি করে যে তাহারা ভারতীয় কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে বাংলাদেশ কমান্ডের কাছে নয়। প্রশ্নোত্তরে শেখ মুজিব বললেন ভারতীয় কমান্ড নয় যৌথ কমান্ডের কাছে।

এদিকে ১৯৭২ সালে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদের ব্যাপারে গণচীন তার ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে ফলে বাংলাদেশের জাতিসংঘ সদস্যপদ লাভ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভূট্টোর মধ্যে শিমলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

শেখ মুজিব '৭৩ সালের অক্টোবর জাপান সফরে যান। সেখানে তিনি চীন সম্পর্কে

বলতে গিয়ে বলেন, 'চীন মহান দেশ। চীনের সাথে আমাদের সম্পর্ক সুদীর্ঘকালের তাদের কাছে সৌভ্রাতৃত্ব আর সৌহার্দ্যমূলক আচরণই আমরা আশা করবো। কিন্তু বাংলাদেশকে কেউ দাবায়ে রাখতে চাইলে আমরা মাথা নত করবো না।' এই সময় চীনের সাথে আমাদের সম্পর্কোন্নয়ন অতীব জরুরী ছিল এবং দক্ষ ও সুদূর প্রসারী দুরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের মাধ্যমেই তা সম্ভব ছিল।

১৯৭৪ সালে পাকিস্তানে ইসলামী সম্মেলন। বাংলাদেশকে এতে অংশগ্রহণ করানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানে নিতে আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ারী বুমেদীন তাঁর নিজস্ব বিমান ঢাকা পাঠিয়ে দিলেন। সকলেই দ্বিধান্বিত। তখনও পর্যন্ত পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় নাই। তাজউদ্দীন গং পাকিস্তানে অনুষ্ঠিতব্য ইসলামী সম্মেলনে শেখ মুজিবের যোগদানে সম্মত নয়। সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী ভারতের সাথেও কথা বলতে হয়। তাই তাঁহারা শেখ মুজিবকে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আলোচনা করে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বললে–শেখ মুজিব রাগান্বিত হয়ে তাজউদ্দীনকে বললেন, "আমি কাহারো বংশবদ নই, আমার দেশের সিদ্ধান্ত আমাকেই নিতে হবে। আমি ইসলামী সম্মেলনে যোগ দিতে পাকিস্তান যাবো।' অবশেষে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। অতঃপর ভারতের সাথে কথা না বলেই শেখ মুজিব ইসলামী সম্মেলনে যোগ দিতে পাকিস্তানের লাহোরে চলে গেলেন। বাংলাদেশ ওআইসি সদস্যপদ লাভ করে। পরবর্তীতে '৭৪ সালেই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো শেখ মুজিবের আমন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশ আসেন। অন্যদিকে চীন জাতিসংঘে তার প্রদত্ত ভেটো প্রত্যাহার করে নেয়। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। এটা শেখ মুজিবের কূটনৈতিক সাফল্যেরই ফলশ্রুতি। এটা সম্ভব হয়েছে তার চরিত্রের দৃঢ়তা ও বৈপ্লবিক গুণাবলীর কারণে। তিনি যদি ইসলামী সম্মেলনে না যেতেন, পাকিস্তানের স্বীকৃতি না পেতেন, চীনের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন না করতেন তাহলে জাতিসংঘে চীন তার ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ অব্যাহত রাখতো আর বিরুদ্ধ থাকা মুসলিম দেশগুলোও আমাদের সমর্থন দিতো না। জাতিসংঘে আমাদের সদস্যপদ লাভ শুধু বিলম্বিতই হতো। গোপন সমঝোতা চুক্তির বাধ্যবাধকতায় দেশ পরিচালনায় তাজুদ্দিনের সাথে তার চরম মতদ্বৈততার কারণেই তাজউদ্দিনকে তার মন্ত্রীসভা থেকে বাদ দিতে বাধ্য হন। শুধু মন্ত্রী সভাই নয় পরবর্তীতে 'বাকশাল' গঠনেও দেখা যায় বাকশালের সদস্যপদও তাকে দেয়া হয়নি।

প্রসঙ্গ বেগম মুজিব ঃ

মুজিব সহধর্মীনি বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব আমাদের সম্মানিত ভাবী। তার ত্যাগ-তিতিক্ষা-প্রজ্ঞা আর কষ্ট সহিষ্ণুতা অতুলনীয়। রাজনৈতিক কারণে মুজিব ভাই বছরের পর বছর কারাগারে কাটিয়েছেন। কারাগারের বাইরের জীবনও ছিল আন্দোলন সংগ্রাম আর সংগঠন নিয়ে ব্যপৃত। অন্যদিকে ভাবী সংসার চালানো, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া থেকে শুরু করে দেশের রাজনৈতিক গতিবিধি আর দলের নেতাকর্মীদের

খোঁজ-খবর রাখতেন। প্রয়োজনে উপদেশ দিতেন বুদ্ধি দিতেন। দুর্যোগে দুর্বিপাকে কখনো তিনি মুষড়ে পরতেন না। সাহস হারাতেন না। বুদ্ধিমতি ও সাহসী এই মহিয়সী নারী নেপথ্যে থেকে এদেশের রাজনীতিতে অনেক অবদান রেখেছেন। অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। অনেক দিক-নির্দেশনাও দিয়েছেন। বিশেষ ক্ষেত্রে সংকটময় মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত নিতে মুজিব ভাইকে সহযোগিতা করেছেন। অনেক সময় তাঁকে প্রভাবিতও করেছেন।

আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলায় মুজিব ভাই ক্যান্টনমেন্টে বন্দী। দেশের উত্তাল-উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জেনারেল আয়ুবের মসনদ টলটলায়মান। সে সময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে আয়ুব খান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত রাখার প্রস্তাব করা হলো এবং ইত্তেফাক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, আতাউর রহমান খান, আবুল মুনসুর আহমদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আয়ুবের দেয়া প্যারোলে মুক্তি প্রস্তাব মেনে নিলেন। যদিও গণদাবী ছিল ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের। বেগম মুজিব কিন্তু প্যারোলে মুক্তি নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি ছুটে এলেন আমার কাছে। আমাকে তিনি বললেন যে মামলা প্রত্যাহার না হলে প্যারোলে মুক্তি নিয়ে গোল টেবিলে যাওয়া ঠিক হবে না। তিনি সেটা চান না। তিনি এ ব্যাপারে আমার মত জানতে চাইলেন। আমি তাকে বললাম আমি আপনার সাথে একমত এবং আরো বললাম যে আপনি কি মুজিব ভাইকে ক্যান্টনমেন্টে এই খবর পাঠাতে পারবেন। তিনি বললেন, পারবেন। আমি ভাবীকে বললাম আমার কাজ আমি করবো আপনি মুজিব ভাইকে একথাটি জানিয়ে দিন আর এক্ষুণি আপনি তোফায়েল আহমদসহ ছাত্রলীগের সংগ্রামরত নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করুন এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে বলুন। প্রয়োজনে আপনি ইকবাল হলে চলে যান। ভাবী সে সময় এ ব্যাপারে যা যা তাঁর পক্ষে করণীয় সব কিছুই করেছিলেন। ক্যান্টনমেন্টের কারাগারে মুজিব ভাইয়ের নিকটও যথারীতি খবর পাঠিয়ে দিলেন। এমনকি তিনি মুজিব ভাইকে এমনও বলে দিয়েছিলেন যদি প্যারোলে মুক্তিতে রাজী হন তাহলে তাঁর সাথে চিরদিনের মতো সম্পর্ক ছিন্ন হবে। এর পরবর্তী ইতিহাস সকলের জানা। নেপথ্যে থেকে ভাবী এমনি অনেক কঠোর ভূমিকা পালন করেছেন যা নাকি যে কোন মূল্যায়নে সঠিক ছিল। অনেক ক্ষেত্রে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনে Turing point হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি সন্তানসন্ততিসহ অবরুদ্ধ এই ঢাকা শহরে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় দীর্ঘ নয় মাস অতিবাহিত করেন। ২৫ শে মার্চ '৭১ রাত্রিতে দেশের পরিস্থিতি যখন দ্রুত অবনতিশীল সে সময় মুজিব ভাই ভাবীকে ডেকে বললেন, 'শোন হাসিনার'মা দেশের পরিস্থিতি ভালো নয়। জানি না কপালে কি আছে? আমার যদি কিছু হয় খোকা রইল সে তোমাদের দেখাশুনা করবে। মুজিব ভাই গ্রেফতার হয়ে যাবার পর মুজিব ভাইয়ের আপন ফুফাতো ভাই একমাত্র এই মুমিনুল হক খোকা সেই দুঃসহ দিনগুলোতে নিজের জীবন বাজী রেখে ভাবী ও তাঁর সন্তানদের পাশে

ছিলেন। এমনকি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য শেখ জামালের ভারতে চলে যাওয়ার কারণে তাকে বধ্যভূমিতে পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। আল্লাহর অশেষ রহমতে খোকা বেচে যান। দুঃখের দিনে সুদিনের স্বজনেরা পাশে থাকে না। এ সত্যটি ভাবী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। ২৫ শে মার্চ কালো রাত্রির পর ধানমণ্ডীর ৩২ নং বাসা ছেড়ে সন্তানসন্ততিসহ প্রথমে মালীবাগ পরে মগবাজার এভাবে এ বাসা ও বাসা করে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এরমধ্যে শেখ কামাল ভারতে চলে গেলে তিনি উতলা হয়ে পড়লেন। উপায়ন্তর না দেখে তিনি কামালের খোঁজে খোকাকে ধানমণ্ডীতে তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার পুত্র আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর বাসায় পাঠান। তাতেই যত গন্ডগোল হয়ে গেলো। খোকাকে নিয়ে মঞ্জু ও তার মা বেগম মানিক মিয়াসহ মগবাজারের যে বাসায় ভাবী থাকতেন সে বাসায় হাজির। পরবর্তী অধ্যায়– মঞ্জুর বাসায় আইএসআই প্রধান মেজর জেনারেল ওমরের সাথে খোকার সাক্ষাতের ব্যবস্থা। পরিণতিতে পাক বাহিনীর ঠিক করে দেয়া ধানমন্ডীর ১৮ নং সড়কের বাসায় তাদের প্রহারাধীনে ভাবী তাঁর সন্তানাদিসহ ১৯৭১ এর বিজয় দিবস তৎপরবর্তী ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী মুজিব ভাই এর ঢাকা প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সেই বাড়ীতেই অন্তরীণ ছিলেন। এই যে ভাবী তার সন্তান সন্ততিসহ পাক বাহিনীর পাহারাধীন বাড়ীতে নজরবন্দী অবস্থায়, শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার মধ্যে ছিলেন এটাই সুহৃদ মঞ্জু ও মঞ্জুর মার খেলা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৬ই ডিসেম্বর '৭১ বিজয় দিবসে রেসকোর্স ময়দানে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের পরও ১৮ নং সড়কে যে বাসায় ভাবী থাকতেন সে বাসা থেকে পাকিস্তানী সেনা প্রহরা প্রত্যাহার না হওয়াতে ভাবীসহ পরিবারের সকলের জীবন আশংকা দেখা দেয়। এরই মধ্যে ভারতীয় সেনা বাহিনীর মেজর তারা সেখানে আসলেন এবং পাকিস্তান সৈন্যদের সেখান থেকে সরে না যাওয়ার কারণ জানতে চাইলেন ও চলে যেতে বললে। পাক সেনারা ১ ঘণ্টা সময় চাইল। কিন্তু মোমিনুল হক খোকা তাদের দুরিঅভিসন্ধি আঁচ করতে পেরে মেজর তারাকে অনুরোধ করলেন তিনি যেনো তাদের চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। তার ভয় ছিল যদি মেজর তারা চলে যায় সে সুযোগে পাক সেনারা তাদের সকলকে নিমিষে হত্যা করে ফেলবে। মেজর তারাও ব্যাপারটি বুঝতে পেরে তিনি পাক সেনাদেরকে তার উপস্থিতিতেই সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করে। মুজিব ভাই দেশে আসার পর ভাবী এ প্রসঙ্গটি তাঁকে বলেন এবং মেজর তারার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধে তাকে বাসায় নিমন্ত্রণ করেন। স্বস্ত্রীক মেজর তারা বাসায় এলে ভাবী মিসেস তারাকে একটি হীরার নেকলেস উপহার দেন আর খোকা মেজর তারাকে একটি ওমেগা ঘড়ি উপহার দেন। *[মুক্তিযুদ্ধকালে বেগম মুজিবের সেই দুঃসহ দিনগুলো সম্পর্কে মোমিনুল হক খোকা লিখিত 'অন্তরালে স্মৃতি সমুজ্জল : বঙ্গবন্ধু তাঁর পরিবার ও আমি' বইটি পড়লে বিস্তারিত জানা যাবে।]*

শেখ মুজিবুর রহমানের কারাজীবন

নানা বানোয়াট, ভুল, বিভ্রান্তিকর জনরব ও অতি উৎসাহীদের মিথ্যা-প্রচারণা

অপমোদনের জন্য সরকারী দলিলসহ্ আমার জানামতে সঠিক তথ্য নিম্নে দেওয়া হইল :

Confidential

Government of the People's Republic of Bangladesh. Office of the D.I.G. of Prisons, Dacca Division, Central Jail Dacca.

Memo No. SB dated 1974

To,

The Inspector-General of Prisons,

Bangladesh, Dacca.

Subject : Background materials on the prison life of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Prime Minister of Bangladesh.

Reference : Your Memo No, 258/Con-5/74 dt. 2-7-74.

In obedience to your memo, under reference I am to submit a detailed report regarding detention of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as per records available in Dacca Central Jail.

1. He was committed to Dacca Central Jail on 1-1-1950 under section 18(2) B.P.S.O. VII of 1946.
2. Convicted on 12-9-1950 to R.I. for three months under section 147 P.P.C. and was transferred to Gopalganj Sub-Jail on 26-10-50 to answer a charge and was again readmitted to Dacca Central Jail on 30-8-51 on transfer from Faridpur Dist. Jail as per G.O. No. 1036-H.S. dated 21-3-51 and was retransferred to Faridpur Dist. Jail on 15-2-1952.
3. He was again committed to Dhaka Central Jail on 31-5-1954 in connection with Kotwali P.S Case No 33 (3) 53 u/s 7 (1) 3 by the S.D.O. (S), Dacca and became a security prisoner on 18-8-1954 asper G.O. No. 2577-H.S dt. 12-7-1954 and under G.O. No. 3302-H.S. dt. 3-8-1954 and was released on 18-12-1954 under G.O. No. 145 (P)/54 dated 18-12-11954.
4. Again he was committed to Dacca Central Jail on 12-10-1958 as an under trail prisoner in connection with 5A of E. Pak. Act. LXX-II/58 and u/x. 5(2) of Act II/47 by the S.D.O. (S),

Dacca and became a security prisoner or 20-10-58 under Special Power Ordinance 1958 and was released on 17-12-1959 under G.O. No. 949-H.S. dated 17-12-1959.

5. Again in the year 1962 on 7-2-62 he was committed to Dhaka Central Jail as a security prisoner as per G.O. No. 254-H.S. dated 27-2-62 and 512-H.S. dt. 31-2-62 under section E.P.S.O. 1958 and was released on 18-6-62 under G.O. No. 1159 dt. 19-6-62.
6. Again on 8-5-66 he was committed to Dacca Central Jail under rule 32 D.P.R. 1965. He was convicted on 27-4-67 to suffer S.I. for 1-3-0 months in connection with G.R. No. 189/66 under section 47(5) D.P.R. 1965 under rules 32 of 1965 by Mr, Aftabuddin Ahmed Magistrate, 1st Class, Dacca the trial of which was held inside the Jaill Office and was released on bail on 1-6-67. He was confined in Dacca Central Jail upto 17-1-68 and was taken to Dacca Cantonment in connection with "Agartala Conspiracy Case" from the Jail Gate.

(K. A. AWAL)
Dy. Inspector-General of Prisons,
Dacca Division, Central Jail, Dacca.

The following informations are to be added to the above :

1. Arrested on 11th March 1948 and released on 15th March 1948.
2. Sk. Mujibur Rahman was arrested on 19th April, 1949 for his participation in the movement against expulsion of students by the authorities of Dhaka University in connection with the students support of fourth class employees of the University and (if my memory does not fail me) released on 27th June 1949.
3. Arrested on 17th January 1968 in connection with Agartala Conspiracy case and after the withdeawal of the said case released on 22nd Februaby (1969) from Dhaka Contonment.

4. Sk. Mujibur Rahman again arrested on the night of 25th March 1971 and released from Mianwali Jail, Pakistan on 8th January 1972.

   He suffered imprisonment for a period of about 8 years Since 1948 to 1972 before taking over as the President of Bangladesh.

বঙ্গানুবাদ

গোপনীয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা বিভাগীয় কারা পরিদর্শক-এর কার্যালয় ঢাকা বিভাগ,
কেন্দ্রীয় কারাগার, ঢাকা।

প্রতি

মহা কারা পরিদর্শক

ঢাকা, বাংলাদেশ

বিষয় : বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কারাজীবন সংক্রান্ত তথ্যাবলী।

সূত্র : আপনার স্মারক নং ২৫৮/কন-৫/৭৪ তাং ২-৭-৭৪

সূত্রে বর্ণিত আপনার স্মারক মোতাবেক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রাপ্ত রেকর্ডের ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডিটেনশন সংক্রান্ত একটি বিশদ রিপোর্ট পেশ করিতেছি :

১। ১৯৪৬ সালের বি.পি.এস.ও VII ধারার সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে ১-১-১৯৫০ সালে তাঁহাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক করা হয়।

২। ১২-৯-১৯৫০ সালে ১৪৭ পি.পি.সি. সেকশনের অধীনে তাঁহাকে তিন মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং একটি অভিযোগের জবাব দেওয়ার জন্য ২৬-১০-৫০ গোপালগঞ্জ সাব জেলে বদলী করা হয় এবং ৩০-৮-৫১ তারিখে জি.ও নং ১০৩৬ এইচ.এস তাং ২১-৩-৫১ মোতাবেক ফরিদপুর ডিষ্ট্রিক্ট জেল হইতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আনা হয় এবং ১৫-২-১৯৫২ তারিখে আবার ফরিদপুর ডিষ্ট্রিক্ট জেলে বদলী করা হয়।

৩। আবার ৩১-৫-১৯৫৪ তারিখে ৭(১)৩ ধারার অধীনে পি.এস কেইস নং ৩৩ (৩) ৫৩-এর কারণে ঢাকার মহকুমা অফিসার (সাউথ) কর্তৃক তাঁহাকে আবার ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক করা হয় এবং জি.ও নং ২৫৭৭ এইচ.এস তাং ১২-৭-১৯৫৪ এবং জি.ও নং ৩৩০২ এইচ.এস তাং ৩-৩-

১৯৫৪ অনুযায়ী নিরাপত্তা বিন্দী হন এবং জি.ও. নং ১৪৫ (পি), ৫৪ তাং ১৮-১২-১৯৫৪ অনুযায়ী ১৮-১২-১৯৫৪ তারিখে মুক্তি পান।

৪। আবার ইস্ট পাক এ্যাক্ট LXX-II/৫৮-এর ৫ক এবং এ্যাক্ট II/৪৭-এর সেকশন ৫(২)-এর অধীনে ঢাকা মহকুমা অফিসার (সাউথ) কর্তৃক ১২-১০-১৯৫৮ তারিখে তাঁহাকে বিচারাধীন আসামী হিসাবে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক করা হয় এবং ১৯৫৮ সালের স্পেশাল পাওয়ার অর্ডিন্যান্সের অধীনে ২০-১০-১৯৫৮ তারিখে নিরাপত্তা বন্দী হন এবং জি.ও নং ৯৪৯ এইচ.এস তাং ১৭-১২-১৯৫৯ মোতাবেক ১৭-১২-১৯৫৯ তারিখে মুক্তি লাভ করেন।

৫। আবার জি.ও নং ২৫৪ এইচ.এস তাং ২৭-২-৬২ এবং জি.ও নং ৫১২ এইচ.এস তাং ৩১-২-৬২ মোতাবেক এবং ১৯৫৮ সালের ই.পি.এ.ও এর অধীনে তাঁহাকে ৭-২-৬২ তারিখে নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক করা হয় এবং জি.ও নং ১১৫৯ তাং ১৮-৬-৬২ মোতাবেক ১৮-৬-৬২ তারিখে মুক্তি দেওয়া হয়।

৬। আবার ১৯৬৫ সালের ৩২ ডি.পি.আর-এর অধীনে ৮-৫-৬৬ তারিখে তাঁহাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী করা হয়। ২৭-৪-৬৭ তারিখে ১৯৬৫ সালের ৪৭ (৫) ডি.পি.আর ও ১৯৬৫ সালের রুলস ৩২-এর অধীনে জি.আর নং ১৩৯৩/৬৬ অধীনে জেলখানার অভ্যন্তরে তাঁহার বিচার হয় এবং ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফতাবউদ্দীন আহমদ তাঁহাকে ১ মাস ৩ দিনের সাধারণ কারাগও দেন। ১-৬-১৯৬৭ তারিখে তিনি মুক্তি পান। ১৭-১-৬৮ পর্যন্ত তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক ছিলেন এবং জেল গেট হইতে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র বিচারের ব্যাপারে তাঁহাকে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়।

স্বাক্ষর– ডি.আই.জি প্রিজন
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার।

উপরে বর্ণিত তথ্যাবলীর সহিত নিম্নতথ্যাবলী যোগ করিতে হইবে

১। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ গ্রেফতার ও কারামুক্তি ১৫ই মার্চ ১৯৪৮ইং।

২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিম্ন বেতনভুক কর্মচারী ধর্মঘটকে সক্রিয় সমর্থনের অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ছাত্র বহিষ্কারের প্রতিবাদে আন্দোলন করিবার কারণে শেখ মুজিবর রহমান ১৯শে এপ্রিল ১৯৪৯ইং তারিখ গ্রেফতার হন ও বোধহয় (আমার স্মৃতিভ্রম যদি না হইয়া থাকে) ২৭শে জুন (১৯৪৯) মুক্তি পান– অর্থাৎ ২ মাস ৯ দিন কারাবাস করেন।

৩। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হইয়া ১৯৬৮ সালের ১৭ই জানুয়ারী

গ্রেফতার হন এবং ঐ মামলা প্রত্যাহার করিবার পর ঢাকা সেনানিবাস হইতে ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে মুক্তি পান।

৪। শেখ মুজিবুর রহমান ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালের দিবাগত রাত্রে পুনরায় গ্রেফতার হন এবং ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারী পাক সরকারের মীয়ানওয়ালী কারাগার হইতে মুক্তি পান।

১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মেয়াদে সর্বমোট প্রায় ৮ বৎসর তিনি কারাজীবন ভোগ করেন।

কলকারখানা রাষ্ট্রায়ত্বকরণ

১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ কলমের এক খোঁচায় দেশের যাবতীয় কলকারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইল। পূর্ব হইতে কোন ইনভেন্টরী তৈয়ার না করিয়া প্রশাসকদের তত্ত্বাবধানে মিল-কলকারখানার পরিচালনার দায়িত্বভার দেওয়া হইল। অবশ্য পূর্বেই পরিত্যক্ত মিল-কলকারখানাগুলিতে প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। এইদিকে আবার রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার পর কোন কোন মিল-কারখানার মালিকদের তাহাদের স্ব স্ব মিলের প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা নামধারী শ্রমিকদের অস্ত্রের ঝনঝনানি এবং সাবেক অভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রশাসকদিগকে দালাল আখ্যা দান ও ভীতি প্রদর্শন মিল কারখানার ব্যবস্থাপনাকে প্রহসনে পরিণত করে এবং সামগ্রিক উৎপাদনসমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অধিকাংশ কলকারখানাই অযোগ্য প্রশাসক ও শ্রমিক নেতৃত্বের যোগসাজশে লুটপাটের আখড়ায় পরিণত হয়। অবশ্য ইহাই ছিল স্বাভাবিক। কেননা যখন বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং কলকারখানা ধ্বংসের জন্য ভারতীয় মারোয়াড়ী গোষ্ঠী সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে নানাভাবে লিপ্ত, তখন শেখ মুজিব এবং তাহার সরকার ত্যাগী, সচেতন ও সজাগ দেশপ্রেমিক শক্তিকে সুসংহত ও সুসংগঠিত না করিয়া সর্বনাশা সস্তা বুলির আশ্রয়ে আসর বাজীমাৎ করিবার তালে ছিলেন। আর তাই অন্যকিছু বিবেচনা ও বাস্তবতা বিচার না করিয়াই জাতীয় শিল্প ও অর্থনীতিকে কলমের এক খোঁচায় ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিতে তাহারা এতটুকু কুণ্ঠিত হন নাই। ভারতীয় অভিজ্ঞ নেতৃত্ব তাহাদের শিল্প-কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার মত সর্বনাশা পথ কেন মাড়ায় নাই, তাহা অনুধাবন করিবার মত ধীশক্তি শেখ মুজিব কিংবা আওয়ামী লীগের কোন নেতার ছিল না। তদুপরি ছিল রুশপন্থীদের উস্কানি। ফলতঃ মুজিব সরকারের চরম অবিমৃষ্যকারিতাই দেশের সমগ্র অর্থনীতিকে লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলে। কথায় বলে, দেবদূতগণ যেখানে যাইতে সাহস পায় না মূর্খরা তড়িঘড়ি করিয়া সেখানে প্রবেশ করে।

জেনারেল ওসমানীই সর্বাধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন— কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টির সুযোগ নাই

গণপ্রজাতন্ত্রী প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হওয়ার পর ১২ই এপ্রিল ১৯৭১-এর পূর্বাহ্ন হতে বঙ্গবীর ওসমানীকে মুক্তিবাহিনী গঠন ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে

মন্ত্রীর সমমর্যাদায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীসহ মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক বা কমান্ডার-ইন-চীফ নিযুক্ত করা হয়। চীফ অব স্টাফ বা প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার নিযুক্ত করা হয় মেজর জেনারেল (তখন লেঃ কর্নেল) এম এ রবকে। ডেপুটি চীফ অব স্টাফ নিযুক্ত করা হয় লেঃ কর্নেল এ আর চৌধুরীকে। জাতির প্রতি দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতিস্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বঙ্গবীর ওসমানীকে কর্নেল থেকে জেনারেল পদে উন্নীত করেন যা ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে কার্যকরী করা হয়। গণপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করার জন্য বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানী ১৯৭২ সনের ৭ই এপ্রিল সর্বাধিনায়কের পদ থেকে পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করার পর সর্বাধিনায়কের পদ ও যৌথ কমান্ড বিলুপ্তি ঘোষণা করেন; যা ১৯৭২ সনের ২৭শে এপ্রিল বাংলাদেশ গেজেটে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশিত হয়।

MINISTRY OF DEFENCE NOTIFICATIONS

NO 01/17/72 (NGO) 108 DEF/SECY-7th April. 1972 with a view to effectively participate in the proceedings of the Constituent Assembly as an MCA. General M.A.G. Osmany. p.s.c. M.C.A. resigned his appointment as C-in-C. Bangladesh Forces, and his resignation having been accepted by the president. He vacated the temporary appintment of C-in-C. Bangladesh Forces with effect from 7th April 1972 (forenoon). Accordingly he is reverted to the pension list from the same date. No. 01-31-33/72-110(3) DEF/SECY-7th April 1972 with the vacation of the appointment of Temporary C-in-C. Bangladesh Forces. The combined command of Bangladesh Forces has been abolished with ceffect from 7th April 1972 (forenoon) and replaced by three separate commands for the Bangladesh Army, Navy and Air Force with the following Acting Chiefs of staff with immediate effect and until further orders.

বঙ্গবীর ওসমানী ১২ই এপ্রিল '৭১ ইং থেকে ৭ই এপ্রিল '৭২ ইং পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ গণপরিষদের ১৯৭২ সনের ৩১শে অক্টোবরের অধিবেশনের বিবরণী হতে বঙ্গবীর ওসমানীর বক্তৃতার একটি অংশ নিম্নে প্রদত্ত হলো (সংবিধান সংশোধনের একটি প্রস্তাব দেয়ার সময় তিনি এই বক্তব্য দেন)

মাননীয় স্পীকার সাহেব

"দল, মত, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমগ্র বাঙ্গালী জাতীয় ঐক্যবদ্ধভাবে দৃঢ় সংকল্প আর সাহসিকতার সঙ্গে, বীরত্ব আর নিষ্ঠার সঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন প্রায় হতাশাজনক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে। আর এ সংগ্রামই হল ইতিহাসে প্রথম মুক্তি সংগ্রাম, যেখানে সাংবিধানিক উপায়ে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত

সরকারের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। এই সংগ্রামে আওয়ামী লীগ সরকার বাঙ্গালী জাতিকে বিজয়ের পথে, মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। এতে বাংলাদেশের সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলের সমর্থন ছিল। এই যুদ্ধে আমার অপ্রাপ্য সম্মান ছিল বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব পালন করার।"

যুব সমাজের অধঃপতন ঃ দেশময় নৈরাজ্য

দেশের বিভিন্ন পর্যায় ও শ্রেণীর লোক মুক্তিযুদ্ধে শামিল হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল ছাত্র সম্প্রদায়। "দাসত্ব বরণ অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়" এই ছিল ছাত্র সমাজের দৃঢ় পণ। দেশের স্বার্থে উৎসর্গিত প্রাণ এই ছাত্র সমাজ ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৭১) বিজয় দিবসের পর হইতেই নেতৃত্বের চরিত্রহীনতা ও ভ্রান্তনীতির দরুণ ত্যাগের মহিমা ও দেশপ্রেমের তাৎপর্য অনুধাবন করিবার মত অনুকূল আবহাওয়া হইতে নির্মমভাবে বঞ্চিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিবার কারণে যে ৯ মাস তাহারা পড়াশুনা করিতে পারে নাই, সেই ৯ মাস ছাত্র সম্প্রদায় কর্তৃক ত্যাগ হিসেবেই বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল এবং পরবর্তী শিক্ষা বৎসরের নির্ধারিত পরীক্ষায় তাহাদের যথারীতি অংশগ্রহণ করিবার মধ্যেই নিহিত ছিল জাতীয় স্বার্থ। পক্ষান্তরে সংক্ষিপ্ত কোর্সে পরীক্ষা দিলে বা বিজ্ঞান পরীক্ষায় প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা ব্যতীত ডিগ্রী গ্রহণ করিলে অথবা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবার অজুহাতে ঢালাও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার দাবী আদায় করিলে পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হারাইয়া যায় অর্থাৎ ডিগ্রী অর্থহীন হইয়া পড়ে। জ্ঞানার্জনে বা বিদ্যা শিক্ষায় কোন সংক্ষিপ্ত পন্থা নাই। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের নীতিহীনতার কারণে এবং বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল ও শিক্ষা বিভাগীয় সুপণ্ডিত, জ্ঞানী, গুণী বলিয়া পরিচিত মহল এই সময়ে শিক্ষাঙ্গণে, পরীক্ষা ক্ষেত্রে ও শিক্ষাদানের ব্যাপারে কলঙ্কময় অধ্যায় সংযোজন করিয়াছেন। উহাই যে তরুণ সমাজের নৈতিক অধঃপতনের অন্যতম কারণ বিবেকবান মাত্রই তাহা স্বীকার না করিয়া পারিবেন না। বস্তুতঃ অস্বীকার করিবার উপায়ও নাই যে, নীতিহীন নেতৃত্ব, অস্ত্রের ঝনঝনানির নিকট শিক্ষা গুরুদের আত্মসমর্পণ, শিক্ষাঙ্গণে চরিত্রহীন, উচ্ছৃঙ্খল ও জ্ঞানার্জন বিবর্জিত পরিবেশ সৃষ্টিতে এক শ্রেণীর মতলববাজ মহলের সায় ও উৎসাহ যুব সমাজকে অধঃপতনের আবর্তে ঠেলিয়া দিয়াছিল। এবং শিক্ষাঙ্গনই যেহেতু এই দেশের নাগরিক সচেতনতার মূল কেন্দ্র, সুতরাং পরিণতিতে, দেশময় নৈরাজ্য সৃষ্টিতে দেরী হয় নাই। এই প্রসঙ্গে জগৎবরেণ্য রাষ্ট্রনীতিবিদ স্যার উইনষ্টন চার্চিলের ফরাসী-বিপ্লব মূল্যায়ন সংক্রান্ত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

"Now France gave a frightful demonstration of what happens when the social forces unleashed by reformers break free from all control."

ইহার মর্মার্থ এই যে, সামাজিক যে সব বিধি-বিধান শক্তি হিসাবে সমাজকে পরিচালিত করে-সমাজ সংস্কারকগণ নিজেরাই যখন সেইসব বিধি-বিধানকে নস্যাৎ করতঃ শক্তিকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করেন; তখন অবস্থা যে কি ভয়াবহ হইতে পারে, ফরাসী

দেশ উহার জ্বলন্ত উদাহরণ। অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ একই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

বস্তুতঃ বাংলাদেশের যে কোন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় ছাত্র ও শ্রমিক শ্রেণীর অত্যন্ত সংঘবদ্ধ ও কার্যকর ভূমিকা বিদ্যমান। শিক্ষাঙ্গন ও শিল্পাঙ্গন দুইটিই মূলতঃ যুব শ্রেণীভুক্ত অথচ মুজিব সরকারের নীতিহীনতায় এই দুই গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী হইয়া পড়িয়াছিল ধ্বংসন্মুখ। আজাদী উত্তরকালে উভয় শক্তিকেই দেশ গঠনের যথাযথভাবে নিয়োজিত করিতে মুজিব সরকার ব্যর্থ হন মারাত্মকভাবে। জাতীয় নেতৃত্বের নীতিহীনতায় যুব সমাজে আইন অমান্য হইতে আইন ভঙ্গের প্রবণতা অত্যন্ত উৎকটভাবে দেখা দেয়। সর্বত্রই আইন-শৃঙ্খলা পরিণত হয় অতীতের বস্তুতে। অবস্থা তখন এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যে, কোথাও জানমাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা বলিয়া যে কিছু আছে, তাহা মনে হইত না। শুধু মনে হইত সমাজের সর্বস্তরে অরাজকতা বিরাজমান।

অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাক-সরকার কর্তৃক সংগঠিত রাজাকার, আল্‌বদর, আল্‌সামস ইত্যাদি বাহিনী, দুর্ধর্ষ স্বভাব অপরাধী, মার্ক্সীয় দর্শন অনুসারী বিভিন্ন অস্ত্রধারী বাহিনী ও সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার এক অংশ আইন-শৃঙ্খলার মারাত্মক অবনতির জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল। কিন্তু সব চাইতে বেশী দায়ী ছিলেন মুজিব সরকার। কেননা, সবদেশেই সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পর অস্ত্র উদ্ধার সরকারের অবশ্য করণীয় দায়িত্বের অঙ্গীভূত। ইহার ব্যতিক্রম হইলেই সমাজ জীবনে শান্তি অতীতের কাহিনীতে পর্যবসিত হয়। পরিতাপের বিষয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান এবং তাহার আওয়ামী লীগ সরকার অস্ত্র উদ্ধার কিংবা আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত নিজস্ব বেসরকারী লালবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী কিংবা ভারতের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গঠিত রক্ষীবাহিনীর যথেচ্ছ অস্ত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ দূরে থাকুক, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে উৎসাহ দান করিতে কুণ্ঠিত হইত না। এমন কি ডাকাতি, রাহাজানি, হত্যা, মারপিট, লুট, ধর্ষণ, ছিনতাই, জবর-দখল ইত্যাদি গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ও আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কিছুই করা সম্ভব হইত না। কেননা, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীবর্গ, আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, শ্রমিক লীগ ও ছাত্রলীগ নেতৃবর্গ ও সংসদীয় সদস্যগণের নির্দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশ শুধু নয়, বরং বাংলাদেশ রাইফেলস এবং এমন কি সৈন্য বাহিনী পর্যন্ত তাহাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হইত। প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার আর কাহাকে বলে? কথায় ও কাজের গরমিলের দরুণ প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান অচিরেই আস্থা হারাইয়া ফেলেন। তাই তাঁহার আবেদন সত্ত্বেও অস্ত্রধারীরা অস্ত্র জমা দেয় নাই, অনেকে স্বীয় আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই অস্ত্র লুকাইয়া রাখিয়াছিল। মারাত্মক মারাণাস্ত্রেরও আপন আপন বৈশিষ্ট্য আছে– আর তাহা এই যে, উহা মালিককে অনেকটা বেপরোয়া করিয়া তোলে।

এইভাবে ক্ষতাসীন আওয়ামী লীগের স্বার্থে আইন-শৃঙ্খলা, প্রশাসন এমন কি

আইন-আদালত পর্যন্ত যথেচ্ছ ব্যবহৃত হইবার ফলে, আইন-কানুন ও প্রশাসনিক সদুদ্দেশ্য ও নিরপেক্ষতার উপর দেশবাসী ক্রমশঃ আস্থা হারাইয়া ফেলে। যেখানে আইনের শাসনের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অপপ্রয়াস, সেখানেই অবক্ষয়ের সূত্রপাত। আর কোথাও একবার অবক্ষয়ের সূত্রপাত হইলে তাহা সমাজের বিভিন্ন স্তরে অলক্ষ্যে বিস্তৃতি লাভ করে। শান্তি ও স্বস্তি, স্থিতি ও সমৃদ্ধি হয় অপসৃয়মান। নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে বাংলাদেশে প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয়জীবন, মূল্যবোধ ও চরিত্র এক কথায় সর্বস্তরে এই অবক্ষয়ের দৌরাত্মই পরিলক্ষিত হইত। প্রশাসন কর্মচারীরা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের আশংকায় সর্বক্ষণ ম্রীয়মান থাকিতেন। "রাষ্টপতি আদশে ৯" সরকারী কর্মচারীদের সকল ক্ষমতা, নৈতিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তা, কর্ম উদ্যোগ ও উদ্যম অপহরণ করিয়া নিয়াছিল। ফলে গোটা প্রশাসন ব্যবস্থাই নতজানু প্রশাসনে পর্যবসিত হইয়া পড়িয়াছিল।

আওয়ামী লীগের অবিবেচক রাজনৈতিক পদক্ষেপ

রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক অশান্তি হ্রাস বা দূরীকরণ দেশ ও জাতি গঠনের পূর্বশর্ত। হিন্দু মহাসভা ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ঘোর বিরোধী ছিল। অতীত ভূমিকার সূত্র ধরিয়া পাকিস্তান সরকার হিন্দু মহাসভা কিংবা পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ করে নাই অথবা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা বিরোধী ভূমিকার কারণে কাহাকেও কারাগারে নিক্ষেপ করে নাই। অথচ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে অপরিণামদর্শী বাংলাদেশ সরকার মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাবিরোধী রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। রাজনৈতিক মতভেদ প্রসূত অতীত ভূমিকার দরুণ হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে দালাল আইনে আটক করা হয়। অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির অভাবই উক্ত অবিমৃষ্যকারী পদক্ষেপের জন্য দায়ী। ভারত-ফেরতা শরণার্থী ও অস্ত্রধারীরা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে অবস্থানকারী কোটি কোটি মানুষের বিরুদ্ধে দালালীর অভিযোগ আনে এবং স্বীয় ব্যক্তিগত, পরিবারগত ও গোষ্ঠীগত হীন-স্বার্থ চরিতার্থ করিবার অপপ্রয়াসে গ্রাম-গ্রামান্তরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। ফলে জনতা হইয়া পড়ে হতোদ্যম, নিরাশ ও হতাশ।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি

এইদিকে জীবনযাত্রার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য মুজিব সরকারের ভ্রান্ত নীতির দরুণ সাধারণ ক্রেতার আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া যায়। এক টাকার গামছার দাম হয় সাত টাকা। পাঁচ টাকার শাড়ীর দাম হয় পঁয়ত্রিশ টাকা। তিন টাকার লুংগি পনের টাকা বা কুড়ি টাকা, দশ আনা বা বার আনা সেরের চাউল হয় দশ টাকা। আট আনা সেরের আটা ছয়-সাত টাকা। দুই আনা সেরের কাঁচা মরিচ চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা। তিন-চার টাকা সেরের শুকনা মরিচ আশি-নব্বই টাকা। আট আনা সেরের লবণ চল্লিশ-পঞ্চাশ

টাকা। পাঁচ টাকা সেরের সরিষার তৈল তিরিশ-চল্লিশ টাকা। সাত টাকা সেরের নারিকেল তৈল চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা। এক টাকা সেরের মুসুরির ডাল আট-নয় টাকা। সাত টাকার লাঙ্গল ত্রিশ-চল্লিশ টাকা। ছয় টাকার কোদাল তিরিশ টাকা। একশত সাতচল্লিশ-দেড়শত টাকা ভরি স্বর্ণ নয়শত-এক হাজার টাকা। পনের টাকার কাফনের কাপড় আশি-নব্বই টাকা। দেড় টাকার কাপড় কাঁচা সাবান আট-নয় টাকা অর্থাৎ এক কথায় জীবনযাত্রার সার্বিক সংকট মানুষকে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য করে।

মুদ্রাস্ফীতি ও কালো টাকা মুজিব সরকারের ব্যর্থতার কারণে ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিল আর উহাই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল সর্বগ্রাসী দূর্নীতির মূল। দুর্নীতি দমন আইন ও বিধি ছিল বটে; কিন্তু তাহা যেন সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মুজিব সরকারের শাসনদৃষ্টে যে কাহারও মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, শাসক, শাসকের অনুগ্রহভাজন ও বিত্তবানদের জন্য একপ্রকার এবং শাসিত জনতা ও বিত্তহীনদের জন্য অন্য প্রকার–দেশে এই দুই প্রকার আইন প্রচলিত। তাই পূর্বেবর্ণিত কারণে শঙ্কিত, সর্বক্ষণ দ্বিধাগ্রস্ত, সংশয়াপন্ন ও আড়ষ্ট প্রশাসন যন্ত্র কালো টাকায় বিত্তবান, আওয়ামী লীগ দলীয় ব্যক্তি, সশস্ত্র বেসরকারী বাহিনী ও তাহাদের আশ্রয়পুষ্ট এবং উপর তলার আশীর্বাদপুষ্ট অথচ জঘন্য অপরাধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগে ইতস্ততঃ করিত; পারতপক্ষে আইন প্রয়োগে বিরত থাকিত। ফলে আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসন যন্ত্র এমন কি আইন-আদালত পর্যন্ত অকেজো হইয়া পড়িয়াছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর এই সময়ে কয়েকটি বাক্যাংশে চমৎকারভাবে এই চরম সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির ইংগিত প্রদান করিয়াছিলেন। যথা Frightening flight of capital বা ভয়াবহ মুদ্রা পাচার; Production failure বা উৎপাদান ব্যর্থাতা; exessive supply of money বা অতিরিক্ত মুদ্রা সরবরাহ এবং Absence of law and order- বা আইন শৃংখলার অভাব। যাহা হউক, এই সময়ের ঘটনারাজির পর্যালোচনা স্পষ্ট ইংগিত দেয় যে, শেখ মুজিবের আমলে তদীয় সরকারের পর্বতপ্রমাণ ব্যর্থতার কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্যোদয় সত্ত্বেও অমানিশার ঘোর কাটে নাই; অবহেলায় সুবর্ণ সুযোগ অতিবাহিত হইয়াছে; একটি রক্তক্ষয়ী বিপ্লব-প্রসূত মহাত্যাগ বৃথা গিয়াছে।

কলঙ্কময় অধ্যায় ব্যক্তি শাসন প্রতিষ্ঠা

আগেই বলিয়াছি, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠন করা হইয়াছিল।

গণপরিষদ ১৯৭২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর গৃহীত সংবিধানটি সত্যায়ণ (authenticate) করে। গৃহীত এই সংবিধান মোতাবেক ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরিতাপের বিষয় নির্বাচন অবাধও হয় নাই, সুষ্ঠুও হয় নাই। নির্বাচন পরিচালনায় পূর্তগালের সালাজার, স্পেনের ফ্রাঙ্কো আর বাংলাদেশের শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় নাই।

১৯৭৩-এর মার্চের এই সাধারণ নির্বাচনে প্রশাসনিক ক্ষমতার মারাত্মক অপব্যবহার, চরম দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ, মিডিয়া ক্যু, দলীয় বাহিনীর যথেচ্ছ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার ও ঢালাও হুমকির সহায়তায় প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯৩টি আসন দখল করেন। সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল জঘন্য কারসাজি, কারচুপি আর মিডিয়া ক্যু'র মাধ্যমে উলট-পালট করিয়া তাহাদের অনুকূলে কব্জা করে। আমি যেখানে ২৬ হাজার ভোটের ব্যবধানে নিশ্চিত জয়ের পথে তখন বেতার ও টেলিভিশন-এর মাধ্যমে আমাকে ১০ হাজার ভোটে পরাজিত ঘোষণা করা হয়। পরে আমি ঢাকায় ফিরে এলে শেখ মুজিব টেলিফোনে আমাকে বলেন- "কিরে অলি আহাদ, ইলেকশনে পাস করলি না?" ইহা তাহার দ্বারা সাংবিধানিক গণতন্ত্র, নীতি ও আদর্শ তথা ঘোষিত রাষ্ট্রীয় আদর্শসমূহ লংঘনের জ্বলন্ত উদাহরণ। ইহার ফলে, সাংবিধানিক নিয়মতান্ত্রিক পথে সরকার পরিবর্তনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে জনমনে মরাত্মক সন্দেহের উদ্রেক হয়। বস্তুতঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান এবং আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের সর্বগ্রাসী উদ্ভট ক্ষমতালোভ ও তজ্জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জঘন্য অপব্যবহারের মানসিকতা দেশ ও জাতিকে এক চরম বিপর্যয়ের মুখে নিক্ষেপ করে। এইসব পরিদৃষ্টে দেশী পত্র-পত্রিকাগুলিতে তো বটেই ১৯৭১ সালে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধকালীন অবস্থায় যে সব বিদেশী পত্র-পত্রিকা বাংলাদেশের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন ছিল তাহারাও মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দা ও সমালোচনামুখর তথ্যপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করিতে থাকে। এবং এই সবই শাসকগোষ্ঠীর নাভিশ্বাসের কারণ হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কঠোর সমালোচনার পটভূমিকায় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে শেখ মুজিব ১৯৭৫ সালের ২৫ শে জানুয়ারী সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী বলে দেশে একদলীয় শাসন প্রবর্তন করেন এবং ২৫ শে জানুয়ারীতে ৫ বৎসরের জন্য নিজেই একনায়কসুলভ শাসন পদ্ধতির প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। ইহার ফলাফল অবশ্যই শুভ হয় নাই। এক সামরিক অভ্যুত্থানে ১৪ই আগস্ট দিবাগত রাত্রে শেখ মুজিবুর রহমান স্বীয় বাসভবনে পরিবার-পরিজনসহ নিহত হন। এই সামগ্রিক ঘটনাবলী স্মরণ করাইয়া দেয় মধুসূধন দত্তের অমর কাব্য 'মেঘনাদ বধ'-এর সেই খেদোক্তি ঃ "নিজ কর্মদোষে হায় মজাইলা কনকলঙ্কা, রাজা মজিলা আপনি"।

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রয়াস

উল্লেখ্য যে, শাসক আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সাধারণ নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ার তাগিদে আমরা বাংলা জাতীয় লীগ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (পিকিং), শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল, বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনী সমঝোতায় পৌছি। স্বাভাবিকভাবেই ঐক্য প্রয়াসের মূল মধ্যমণি ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। এই সময়ে অসুস্থতার দরুণ তাঁহাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতলে অবস্থান করিতে হইতেছিল। ইহার মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান একদিন তাঁহার সহিত

সাক্ষাৎ করেন। রোগমুক্তির পর মাওলানা ভাসানী হাসপাতাল ত্যাগ করিলেন বটে, তবে বিরোধী দলীয় প্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় তিনি আর অংশগ্রহণ করেন নাই। দুর্জ্ঞেয় রহস্যেঘেরা তাঁহার এই নির্লিপ্ততা। অবশ্য সবকিছু দেখিয়া শুনিয়া বলিতেই হয় যে, যদিও তিনি ছিলেন বিরোধী দলীয় রাজনীতির অন্যতম দিকপাল ও জাতীয় নেতা, তথাপি ৬০ দশকে সামরিক একনায়ক জেনারেল আইউবের প্রতি ৭০ দশকে গণতন্ত্র বিধ্বংসী শক্তি প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের প্রতি তিনি যে দুর্বলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা জনগণের সার্বভৌমত্ব তথা নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের চরম ক্ষতি সাধন করিয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ ইহাও উল্লেখ্য যে, সাধারণ নির্বাচনে যথেচ্ছ দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ ও ঢালাও কারচুপির অভিযোগে সকল রাজনৈতিক দল শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁহার সরকারকে কঠোর ভাষায় নিন্দা জ্ঞাপন করিলেও ঐক্যবদ্ধভাবে সক্রিয় কোন ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই। আমরা বাংলা জাতীয় লীগের পক্ষ হইতে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি মেজর এম, এম, জলিল, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মস্কো) সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (পিকিং) ভাইস চেয়ারম্যান ডঃ আলীম-আল রাজী ও সাধারণ সম্পাদক কাজী জাফর আহমদ এবং বাংলাদেশ জাতীয় লীগের সভাপতি আতাউর রহমান খানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সাধারণ নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির প্রতিবাদে প্রত্যক্ষ গণআন্দোলনের প্রস্তাব করি। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় নেতৃবৃন্দ নীতিগতভাবে মৌলিক একাত্মতা প্রকাশ করিলেও বাস্তবে জনগণের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার সংগ্রামে গণআন্দোলন সৃষ্টির প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করিয়া নীরব ভূমিকা পালন করেন। যুগে যুগে রাজনৈতিক দলগুলির নীতিবিগর্হিত সচেতন নিষ্ক্রিয় ভূমিকাই দেশে দেশে ডিক্টেটরী শাসকদের পথ সুগম করে এবং ইহাই ডিক্টেরদের মূলধন।

সাধারণ নির্বাচনের পর এপ্রিল মাসে (১৯৭৩) প্রাণপ্রতিম কনিষ্ঠ সহোদর আমিরুজ্জামান, সি, এস, পি'র আমন্ত্রণক্রমে আমি নেপালের রাজধানী কাঠমুণ্ডু গমন করি। অনুজ আমিরুজ্জামান জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বিশেষজ্ঞ। কাঠমুণ্ডু অবস্থানকালেই শেখ মুজিব সরকার আমার দ্বারা সম্পাদিত "সাপ্তাহিক ইত্তেহাদের" বিরুদ্ধে 'কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না,' এই মর্মে কারণ দর্শাইতে আদেশ জারি করে (১৯৭৩ সালের ২রা মে)। উক্ত খবর প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আমি ঢাকা অভিমুখে রওয়ানা হইবার ব্যবস্থা গ্রহণ করি এবং ১৬ই মে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করি।

ভাসানীর অনশন এবং

ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়াই অবগত হই যে, খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য হ্রাসের দাবীতে মাওলানা ভাসানী "আমরণ অনশন ধর্মঘট" শুরু করিয়াছেন। এই সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি অফিসে অনশনরত মওলানা ভাসানীর শয্যা

পার্শ্বে গমন করেন বটে; তবে দাবী-দাওয়া ভিত্তিক ধর্মঘট সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেন এবং সরকারী পর্যায়ে অনশন ভঙ্গের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হইতেও বিরত থাকেন তাঁহার উদ্দেশ্যমূলক নির্লিপ্ততা সমূহ ক্ষতির কারণে পরিণত হওয়ার আশংকায় উদ্বিগ্ন না হইয়া পারি নাই।

কতিপয় সাংবাদিকের অনুরোধে মওলানা ভাসানী ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত হইতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ২২শে মে অনশনরত মাওলানা ভাসানীর অবস্থার অবনতি ঘটে। আমরা কয়েকজন যেমন–জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের মেজর এম এ জলিল ও আ স ম আবদুর রব, বাংলা জাতীয় লীগের আমি ও আনসার হোসেন ভানু, বাংলাদেশ জাতীয় লীগের মিসেস আমেনা বেগম ও জনাব ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের জনাব মোখলেসুর রহমান, কমিউনিস্ট পার্টির (লেলিনবাদী) বাবু অমল সেন ও হায়দার আকবর খান রনো এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ডঃ আলিম আল্ রাজি, জনাব বজলুস সাত্তার ও কাজী জাফর আহমদ, মওলানা ভাসানীকে অনশন ভঙ্গের অনুরোধ জানাই। নিম্নলিখিত শর্তে তিনি অনশন ভঙ্গ করিতে সম্মত হন ঃ

১। ২২ শে মে অপরাহ্নে ন্যাপ কর্তৃক আহূত জনসভাকে সর্বদলীয় জনসভায় পরিণত করিতে হইবে এবং সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দ উক্ত সভায় ভাষণ দিবেন।

২। ২৯ শে মে (১৯৭৩) হইতে আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করিতে হইবে।

৩। ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

তাঁহার শর্তাবলীতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আন্দোলনের কর্মসূচী নির্ধারণকল্পে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সদর দফতরে আমরা বিভিন্ন দলের প্রতিনিধির এক বৈঠকে মিলিত হই। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, কয়েক মিনিটের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া সভাস্থল ত্যাগ করিলেও প্রায় তিন ঘণ্টা পর আ স ম আব্দুর রব সভাস্থলে প্রত্যাবর্তন করেন এবং স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বর্তমানে কোন সক্রিয় আন্দোলনে অবতীর্ন হইবে না। কি চমৎকার নেতাদের চরিত্র! প্রতিশ্রুতিদান ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ যেন তাহাদের নিকট জলবৎ তরলং! তবে মুখ বাঁচানোর জন্য জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল শেষ পর্যন্ত একটি যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিতে রাজী হয়। যুক্ত বিবৃতিটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

তারিখ ঃ ২২/৫/৭৩

"আমারা নিম্নস্বাক্ষরকারী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দ আজ দুপুর ২-১৫ মিঃ-এর সময় অনশনরত মৃত্যু-পথযাত্রী মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সঙ্গে দেখা করেছি। মওলানা সাহেবের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য গঠিত মেডিক্যাল বোর্ডের সর্বশেষ স্বাস্থ্য বুলেটিনে এই কথা বলা হয়েছে যে, তাঁর অবস্থা অত্যন্ত আশংকাজনক এবং যে কোন মুহূর্তে একটি দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক নহে।

মেডিক্যাল বোর্ড আরও বলেছে যে, আজ সকাল ৯টায় তিনি কোলাপস্ করে গিয়েছিলেন, তাঁর শরীরের তাপমাত্রা ৯৬ ডিগ্রিতে নেমে গিয়েছিল। তার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়েছিল। এমতাবস্থায় আমরা মওলানা ভাসানীর মতো জাতীয় অমূল্য সম্পদ একজন সংগ্রামী নেতার জীবনাশংকায় বিচলিত হয়ে পড়ি। আমরা মওলানা সাহেবকে গোটা জাতির পক্ষ থেকে অনশন ধর্মঘট ভংগ করার জন্য অনুরোধ জানাই এবং এই প্রতিশ্রুতি তাঁকে প্রদান করি, যে দাবীর ভিত্তিতে এবং যে লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে তিনি অনশন ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছেন সে দাবী ও লক্ষ্যকে আদায় করার জন্য আমরা আপোষহীন সংগ্রাম করে যাবো। বর্তমানে গণবিরোধী ফ্যাসিবাদী শাসকগোষ্ঠীকে উৎখাত করার জন্য মেহনতি জনতাকে সঙ্গে নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাবো। এবং নিম্ন-স্বাক্ষরকারী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দ সর্বসম্মতিক্রমে মওলানা সাহেবের দাবী এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমান স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠীকে এক আপোষহীন লড়াই-এর মাধ্যমে উৎখাত করার অঙ্গীকার ঘোষণা করছি। আমরা সর্বজন শ্রদ্ধেয় মওলানা সাহেবকে উক্ত আন্দোলনের স্বার্থেই অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। জাতি তাঁর সেবা ও নেতৃত্ব চায়।" উক্ত যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীগণ হলেন ঃ

১। মেজর এম, এ, জলিল	২। অলি আহাদ	৩। আমেনা বেগম
৪। দেবেন শিকদার	৫। আবুল বাশার	৬। মিসির আহমদ ভূঁইয়া
৭। মোখলেসুর রহমান	৮। অমল সেন	৯। হায়দার আকবর খান রনো
১০। আবদুস সোবহান	১১। আ স ম আবদুর রব	১২। আতাউর রহমান খান
১৩। সৈয়দ রিয়াজুল হোসেন।		

অপরাহ্নে ন্যাপ কর্তৃক আহূত পল্টন ময়দানে জনসভার উপর আওয়ামী লীগ গুণ্ডারা হামলা করে জনসভার প্যান্ডেল তছনছ করিয়া দেয়, সভায় উদ্যোক্তা ও বক্তাদের মারধর করে। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সন্ধ্যায় ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে বিভিন্ন দলীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত না হওয়া সত্ত্বেও মওলানা ভাসানী অনশন ভঙ্গ করেন।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সাংগঠনিক শক্তির সঠিক ও বাস্তব মূল্যায়নে ব্যর্থতার দরুণ মওলানা ভাসানীর এই আমরণ অনশন ধর্মঘট সফল হয় নাই। মাত্র কিছুকাল পূর্বে মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে মওলানা ভাসানীর ভূমিকা শাসক আওয়ামী লীগ প্রার্থীবর্গকে প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে নির্বাচন বিজয়ে প্রচুর সহায়তা করিয়াছিল। সাধারণ নির্বাচনে নিজস্ব এই সন্দেহজনক ভূমিকার কারণেই হয়ত তিনি স্বীয় বিবেক দংশনে জর্জরিত হইতেছিলেন। তাই দুই মাসের মধ্যে সরকার বিরোধী ভূমিকার অভিনয়ে অবতীর্ণ হইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্বাহ্নে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ না করিয়াই আমরণ অনশন ধর্মঘটের ন্যায় চরম সিদ্ধান্ত ঘোষণর ফলে তাঁহার সেই ভূমিকা অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল।

যাহা হউক, সময় গড়াইয়া যাইতে থাকে। আমরাও প্রতি পদক্ষেপে বৃহত্তর

আন্দোলনের প্রস্তুতি চালাইয়া যাইতে থাকি। এবং অতঃপর ২৫ সালা ভারত-বাংলাদেশ দাসত্ব চুক্তি, সর্বপ্রকার গোপনচুক্তি ও সমঝোতা এবং অন্যান্য অসম চুক্তি বাতিল করিয়া প্রকৃত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ কায়েমের দাবিতে আমরা বাংলা জাতীয় লীগের পক্ষ হইতে ১৯৭৩ সালের ২৩শে ডিসেম্বর সমগ্র দেশব্যাপী "আজাদ বাংলা" দিবস পালনের ডাক দেই। ঠিক সেই সময়ে, আমার শ্রদ্ধেয় অগ্রজ ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন ও প্রফেসর, মৃত্তিকা বিজ্ঞানী ডঃ আবদুল করিম ১৯৭৩ সালের ২২ শে ডিসেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে ও অপ্রত্যাশিতভাবে পরলোকগমন করেন। তাঁহার অন্তর্ধানে কেবল অপত্য স্নেহ হইতেই বঞ্চিত হইলাম না; হারাইলাম আমার কর্মজীবনের দিক-দিশারী, বিজ্ঞ-বিদগ্ধ দার্শনিক গুরুজন, স্নেহের আধার ও কড়া অভিভাবককেও। আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্তি সত্ত্বেও শ্বাশত জীবন-দর্শন ও মূল্যবোধই তাঁহার জীবন-যাত্রার অঙ্গীভূত বৈশিষ্ট্য ছিল। গুরুজনকে শ্রদ্ধা, কনিষ্ঠজনকে স্নেহ, বন্ধুজনকে ভালবাসা, সত্যনিষ্ঠা, স্পষ্টবাদিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, অধ্যাবসায়, পরিশ্রম, স্বহস্তে গৃহকর্ম পালন ইত্যাদি গুণ ছিল তাঁহার চারিত্রক ভূষণ। যাহা হইক, তাঁহার জানাযা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি পল্টন ময়দানে জনসভায় যোগদান করি। উল্লেখ্য যে, ১৭ই মার্চ (১৯৭৪) জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল পল্টন ময়দানের জনসভা হইতে এক জঙ্গী মিছিলসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মনসুর আলীর বাসভবন ঘেরাও করে। মিছিলকারী ও পুলিশ বাহিনীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বাঁধে এবং অকুস্থলেই জাসদ সভাপতি মেজর এম,এ জলিল, সাধারণ সম্পাদক আ স ম আবদুর রব ও অন্যান্যের নিবর্তনমূলক আটক আইনে গ্রেফতার করা হয়। বলিতে ভুলিয়াছি, ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নির্বর্তনমূলক আটক আইন পাসের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আমরা বাংলা জাতীয় লীগ ২৪ শে সেপ্টেম্বর (১৯৭৩) এক প্রকাশ্য জনসভা অনুষ্ঠান করি এবং উহা প্রত্যাহারের দাবী করি। এইভাবেই দেশের থমথমে পরিবেশে আমাদের এই প্রয়াস কিছুটা সাড়া জাগাইতে সক্ষম হয়। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ক্ষীণ আভাস পরিলক্ষিত হইতে থাকে। এই সময়ে দেশের সার্বিক অবস্থা মূল্যায়নের পর সমগ্র দেশব্যাপী গণআন্দোলন করিবার মানসে ১৪ই এপ্রিল (১৯৭৪) আমরা বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বাংলা জাতীয় লীগ, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল একত্রে নিম্নে বর্ণিত ৪ দফা প্রণয়ন করি এবং মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী গণআন্দোলনের আহবান জানাই। দফা ৪টি এই–

১। (ক) রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি, রাজনৈতিক কারণে হুলিয়া, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও মিথ্যা রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার।

(খ) বিশেষ ক্ষমতা আইন, রক্ষীবাহিনীর আইন, রাষ্ট্রপতির ৮ ও ৯ নং আদেশ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দমন আইন ও শ্রমিক দমন আইন বাতিল।

২। (ক) রক্ষীবাহিনী বাতিল করে উপযুক্তভাবে তাহাদের পুনর্বাসনকরণ।

(খ) দেশের বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধন ও সকল নাগরিকের জানমাল ও ইজ্জতের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান।

৩। (ক) গ্রাম ও শহরের সর্বত্র খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রয়োজনীয় রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে আনয়ন।

(খ) সকল প্রকার দুর্নীতি, চোরাচালান, মুনাফাখোরী, লাইসেন্স-পারমিটবাজি দমন, অসদুপায়ে অর্জিত বা বে-আইনীভাবে দখলকৃত ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি বিধান। এবং

৪। বাংলাদেশের শিল্প ব্যবসাসহ সামগ্রিক অর্থনীতিকে বিদেশী আগ্রাসন ও আধিপত্য থেকে মুক্তকরণ এবং জাতীয় স্বার্থে সার্বভৌমত্ব বিরোধী সকল বৈদেশিক চুক্তি বিশেষ করে ভারতের সাথে সকল গোপন ও অসম চুক্তি বাতিলকরণ।

আমরা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিয়া নিম্নোক্ত দলীয় প্রতিনিধিবৃন্দ সমবায়ে একটি সর্বদলীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠন করি।

প্রতিনিধিবৃন্দরা হলেন ঃ

জনাব মশিউর রহমান	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (পিকিং)
ডঃ আলিম-আল্-রাজি	" " " "
জনাব নূরুর রহমান (বিকল্প সদস্য)	" " " "
জনাব অলি আহাদ	বাংলা জাতীয় লীগ
কাজী জওয়াহেরুল ইসলাম	" " "
জনাব আনসার হোসেন ভানু (বিকল্প)	" " "
জনাব আতাউর রহমান খান	বাংলাদেশ জাতীয় লীগ
মিসেস আমেনা বেগম	" " "
হাজী মোহাম্মদ দানেশ	জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন
জনাব সিরাজুল হোসেন খান	" " "
জনাব আব্দুল ওয়াদুদ খন্দকার (বিকল্প)	" " "
খান সাইফুর রহমান	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল
জনাব মোখলেছুর রহমান	" " " "
জনাব রুহুল আমিন	" " " "
জনাব নাসিম আলী	বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি

জনাব মোস্তফা জামাল হায়দার	বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি (লেনিন)
জনাব হায়দার আকবর খান রনো	" " " "

বাংলা জাতীয় লীগ অফিসকে (৬৩, বিজয়নগর, ঢাকা) সর্বদলীয় ঐক্যফ্রন্টের অফিস হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

দেশবাসীর বহু আকাঙ্ক্ষিত বিরোধী দলীয় ঐক্যের এই বার্তা ও ঐক্যফ্রন্ট কর্তৃক প্রণীত ৪ দফা কর্মসূচী উপস্থাপিত করিবার মানসে মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ২৩শে এপ্রিল (১৯৭৪) অপরাহ্নে ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। জনসভার এই ডাক এত সাড়া জাগায় সে, জনসভা কার্যতঃ জনসমুদ্রে পরিণত হয়। পল্টন জনসভায় লোক সমাগমে ভীত-সন্ত্রস্ত শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাহার সরকার ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোর, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, কুমিল্লা এক কথায় দেশের প্রায় সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারি করিয়া রাজনৈতিক সভা-শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। আমরা ইহাতে হতোদ্যম না হইয়া জেলায় জেলায় কর্মীসভার আয়োজন করি এবং ১৪৪ ধারার প্রত্যাহার দাবী করিতে থাকি।

শেখ মুজিবের দাসখত

বিরোধী দলীয় কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান দিল্লী গমন করেন এবং তথায় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সহিত ১৩ই মে হইতে ১৬ই মে পর্যন্ত এক শীর্ষবৈঠকে মিলিত হন। ১৬ই মে স্বাক্ষরিত চুক্তি ও যুক্ত ইশতেহারে শেখ মুজিবর রহমান কার্যতঃ ভারতের নিকট দাসখত দিয়া আসেন। যেমন- (১) বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ বেরুবাড়ী এলাকা ভারতকে দান। (২) বৎসর শেষে বাংলাদেশের আটটি জেলার প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহের চুক্তি ব্যতীতই ফারাক্কা বাঁধ চালু, পশ্চিমবঙ্গ ও আগরতলার মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগের অধিকার দান, অন্যকথায় বাংলাদেশের ভূমির উপর দিয়া করিডোর দান এবং (৩) ভারত-বাংলাদেশ যৌথ অর্থনৈতিক ভেনচার যথা যৌথ পাট কমিশন, যৌথ শিল্প উদ্যম এবং ভারতীয় পণ্যক্রয় নিমিত্ত ৩৮ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ তথা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ভারতীয় অর্থনীতির উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল করিবার পরিকল্পনা প্রণয়ন।

ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির প্রতিবাদে আমরা সর্বদলীয় ঐক্যফ্রন্টের উদ্যোগে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে ২রা জুন এক সভা অনুষ্ঠান করি। সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সভা-সমিতির সুযোগ দানের নিমিত্ত ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার না করিলে বা মেয়াদান্তে ১৪৪ ধারা পুনঃপ্রবর্তন করিলে সর্বদলীয় ঐক্যফ্রন্ট ৩০ শে জুন (১৯৭৪) ১৪৪ ধারা অমান্য করিবে। মুজিব সরকার স্বীয় অতীত ভূমিকা অস্বীকার করতঃ ২৫শে জুন হইতে পুনঃ ১৪৪ ধারা জারি করিয়া প্রকাশ্য জনসভা ও শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করে। উক্ত অবৈধ আদেশের বিরুদ্ধে ২৮শে জুন আমি ঢাকা হাইকোর্টে রীট আবেদন করি। উল্লেখ্য যে, ৯ই

সেপ্টেম্বর (১৯৭৪) প্রদত্ত রায়ে মাননীয় বিচারপতি দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ও মাননীয় বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী কর্তৃক গঠিত সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ ২৫শে জুন জারিকৃত ১৪৪ ধারা আদেশকে অবৈধ, বাতিলযোগ্য, এক্তিয়ার বহির্ভুত ও সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার পরিপন্থী বলিয়া ঘোষণা করেন এবং মাননীয় বিচারপতিদ্বয় আমাকে মামলার খরচ বাবদ ১৫ টি স্বর্ণমোহর তুল্য অর্থ প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি নির্দেশ দান করেন। সরকার উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে আপীল করে এবং রায়ের কার্যকারিতা মূলতবী রাখিবার আবেদন জানায়। মাননীয় বিচারপতিদ্বয় সরকারকে আপীল করিবার অনুমতি দেন বটে তবে রায়ের কার্যকারিতা "মূলতবী আবেদন" প্রত্যাখ্যান করে। মুজিব সরকারের কারাগারে আটক থাকাকালে আমি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় উক্ত রায় পাঠ করি।

পুনরায় গ্রেফতার

আগেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ঐক্যফ্রন্টের বৈঠকে ৩০ শে জুন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া জনসভা করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে ক্ষিপ্ত মুজিব সরকার সর্বদলীয় ঐক্যফ্রন্টের ১৩ জন সদস্যের মধ্যে সর্বজনাব মশিউর রহমান, নূরুর রহমান ও আমাকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার করিয়া কারাগারে আটক করে এবং সর্বদলীয় ঐক্যফ্রন্টের চেয়ারম্যান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে গ্রেফতার করিয়া টাঙ্গাইলের সন্তোষে তাঁহার নিজস্ব বাসভবনে অন্তরীণাবদ্ধ করে।

১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি মওলানা ভাসানীকে সন্তোষে গৃহবন্দী করা হয়। অশীতিপর বৃদ্ধ নেতা ভাসানী গৃহবন্দী অবস্থায়ই আন্দোলনের ডাক দেন।

তাং ১/৭/৭৪

আমি গৃহবন্দী আন্দোলন চালাইয়া যাও

প্রিয় দেশবাসী,

হিন্দুস্তান আর রাশিয়ার চক্রান্ত এইবার নতুন মোড় নিয়েছে। শেখ মুজিবকে দিয়া আমাকে সন্তোষের ঘরে গৃহবন্দী করা হইয়াছে। ৫০০ পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করিয়া আমার স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা বলিতে যতটুকু ছিল এইবার তাহাও হারাইতে বসিয়াছে।

কিন্তু হতাশ হইবার কিছু নাই যদি জালেমের বিরুদ্ধে আপনারা আন্দোলন চালাইয়া যাইতে পারেন। আমার আকুল আহবান দুর্বার গণআন্দোলন চালাইয়া যান। শত্রুর মোকাবিলা করুক। তাহাদের স্বপ্নসাধ চিরদিনের জন্য ধূলায় মিশাইয়া দিন। আল্লাহ আপনাদের সহায়। নিশ্চয়ই সত্যের জয় অনিবার্য।

মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী

আমাদের গ্রেফতারের পর আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দান দূরে থাকুক, এমনকি কোন কোন নেতা সাংবাদিক সম্মেলনে আমাদের নাম উচ্চারণ করিতেও সাহস পান নাই– মুক্তির দাবির তো কথাই উঠে না। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বাংলা জাতীয় লীগ নেতৃবৃন্দ ও ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকভুক্ত ছাত্রবৃন্দ এই আন্দোলনে অত্যন্ত তৎপর ছিল।

আমাদের গ্রেফতারের পর সরকারী প্ররোচনায় ও স্বীয় চামড়া রক্ষার গরজে সর্বদলীয় ঐক্যফ্রন্টভুক্ত অঙ্গদলগুলি অতঃপর স্ব স্ব পতাকা তলে পৃথক পৃথক রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ করে। এইখানেই গণধিকৃত মুজিব সরকারের জয় ও নিপীড়িত জনতার পরাজয় সূচিত হয়। ৩০শে জুন আমাকে গ্রেফতার করিবার পর বাংলা জাতীয় লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির এক জরুরী সভা ঐদিনই ৬৩, বিজয়নগরস্থ কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আনিসুর রহমানকে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়.। রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে বাংলা জাতীয় লীগের উদ্যোগে ১৭ই নভেম্বর পল্টন ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ থাকে যে, শেখ মুজিবের শাসনামলে এবং পল্টন ময়দানের ইতিহাসে ইহাই সর্বশেষ বিরোধী দলীয় জনসভা। ইহার পর পল্টন ময়দানে আর কোন জনসভা হইতে পারে নাই। তাই ২৮শে ডিসেম্বর জারি হয় সমগ্র দেশব্যাপী 'জরুরী আইন'। ১৯৭৫ সালের ২৫ শে জানুয়ারী চীফ হুইপ শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের সংশোধনী বিল ১১ মিনিটের মধ্যে ২৯৪ জন পার্লামেন্ট সদস্যের ভোটে সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে 'পার্লামেন্টারী কেবিনেট ফরম' প্রেসিডেন্সিয়াল ফরমে রূপান্তরিত হয় এবং শেখ মুজিবর রহমান হন ৫ বৎসরের জন্য ১৯৮০ সাল অবধি নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী অনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ও একদলীয় রাজনীতির সর্বেসর্বা। এবং ১৯৭৩ সালে নির্বাচিত সংসদের মেয়াদ ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বর্ধিত হইল। সর্বদলীয় ঐক্যফ্রন্টভুক্ত অধিকাংশ অঙ্গদলের অদূরদর্শিতা, সংকীর্ণতা, ব্যক্তি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কোন্দল এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বালসুলভ হঠকারী মনোবৃত্তিই শাসক মুজিব এবং তাহার আওয়ামী লীগকে সর্বনাশা পথে অগ্রসর হইতে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে উৎসাহ এবং সাহস যোগাইয়াছে এবং এই কারণে এইভাবেই এক নদী রক্তের বিনিময়ে জনগণ যে পার্লামেন্টারী পদ্ধতি ও কেবিনেট ফরম ও বহুদলীয় রাজনীতির ধরন অর্জন করিয়াছিল নিরঙ্কুশ ক্ষমতালোভী প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান কলমের এক খোঁচায় তাহা উড়াইয়া দিয়া একনায়কত্ব ও একদলীয় শাসন প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন।

বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য

সুপ্রীম কোর্টে বিচারপতি মাননীয় শাহাবুদ্দিন আহমেদ (১৯৯১ সালে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও বিগত ২২.৭.৯৬ ইং তারিখ হইতে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি) আনোয়ার হোসেনের মামলায় ৪র্থ সংশোধনী সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য দেশবাসীর জন্য খুবই প্রণিধানযোগ্য।

The Supreme Court in Anwar Hossain's case has discussed this aspect. An extract from to the judgement of Shahabuddin Ahmed (as his Lordship then was) is quoted; "The trump-card of the learned Atty. Gen. is that some of the past Amendments of the Constitution destroyed its basic structures and disrupted it on several occasions. It is true that such mishaps did take place in the past. The Constitution Fourth Amendment Act, dated 25 January 1975, changed the Constitution beyond recognition in many respects and in place of a democratic Parliamentary form of Government or the basis of multiple party system a Presidential form of Government authoritarian in character on the basis of a single party was brought about overnight thereby. Fundamental rights to form free association was denied, all political parties except the Government party were banned and members of Parliament who did not join this Party lost their seats though they were elected by the people. Fredom of the press was drastically curtailed; Independence of the Judiciary was curded by making the Judges liable to removal at the wish of the Chief Executive, appointment, control and discipline of the subordinate Judiciary along with Supreme Court's power of superintendence and control of subordinate courts were taken away from the Supreme Court and vested in the Government, The change was so drastic and sudden; Friends were bewidered. Enemise of the Liberation had their revenge and the Critics said with glee that it is all the same whether damage to democracy is caused by democratically elected persons or by undemocratic means like military coup.

"Within a short time came the first Martial Law which lasted four years. By Martial Law Proclamation Orders the Constitution was badly mauled on 10 times. Secularism one of the Fundamental State principles, was replaced by 'Bismillah-er-Rahman-Ar-Rahim' in the Constitution and Socialism was given a different meaning. Surpeme Court, one of the symbols of national unity was bifureated for about two years and then was restored. All these structural changes were incorporated in and ratified, as the Constitution Fifth Amendment Act. 1979."

In spite of these vital changes from 1975 by destroying some of the basic structures of the Constitution nobody challenged them in court after revival of the Constitution : Consequently they were accepted by the people and by their acquiescence have become part of the Constitution."

(১৭.৩.৯১ইং তারিখে বাংলাদেশ অবজারভার-এ প্রকাশিত জনাব এন.আই. ফারুকী কর্তৃক লিখিত নিবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।)

শেখ মুজিবের ভন্ডামী

ক্ষমতালোভী শেখ মুজিবের নেতৃত্বে রাশিয়া ও ভারতের সেবাদাস আওয়ামী লীগ, মস্কো ন্যাপ ও মনি সিংয়ের কমিউনিস্ট পার্টি সমবায়ে একদা যে ত্রিদলীয় ঐক্যজোট গঠিত হইয়াছিল, এইভাবেই তাহা ষোলকলায় পূর্ণ হয়। শেখ মুজিব ইহাকেই নির্লজ্জ ভাষায় 'দ্বিতীয় বিপ্লব' আখ্যা দেন। ঠিক যেমন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দখলের পর পাকিস্তান সৈনাধ্যক্ষ জেনারেল আইউব খান নিরস্ত্র দেশবাসীর বিরুদ্ধে স্বীয় ক্ষমতালাভকে 'বিপ্লব' আখ্যা দিয়াছিলেন এবং ক্ষমতা লাভের দিবস ২৭শে অক্টোবরকে 'বিপ্লব দিবস' ঘোষণা করিয়াছিলেন। কৌতুকের বিষয় ভিয়েৎনাম দিবসে আন্তর্জাতিক সংহতি প্রকাশকালে ন্যাপ (মস্কো) ও কমিউনিস্ট পার্টি (মস্কো) সমর্থক বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ১৯৭৩ সালের ১লা জানুয়ারী ইউএসআইএস (UNITED STATES INFORMATION SERVICE) অফিস সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে মতিউল ইসলাম ও আবদুল কাদের নামে ছাত্র ইউনিয়নের ২ জন কর্মী নিহত হয়। উক্ত নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে ২রা জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (Dhaka University Central Student Union-DUCSU)-এর সহ-সভাপতি ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের প্রস্তাবক্রমে মার্কিন সম্রাজ্যবাদের দালাল প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু হিসেবে সম্বোধন না করে শুধু শেখ মুজিবুর রহমান হিসেবে ডাকার এবং শেখ মুজিবকে 'ডাকসু' কর্তৃক দেয় আজীবন সদস্য পদ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উপরোক্ত উত্তেজিত মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম শেখ মুজিবকে প্রদত্ত 'ডাকসু'র আজীবন সদস্য পদের সনদপত্রটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। অন্যদিকে ৩রা জানুয়ারী ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় নূরে আলম সিদ্দিকী ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে হুমকি দিয়ে বলেন যদি তারা শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে উচ্চকিত কটূক্তি প্রত্যাহার না করে এবং 'ডাকসু' আজীবন সদস্যপদ পুনর্বহাল না করে তাহলে এর সমুচিত জবাব দেয়া হবে।

পরবর্তীতে ৪ঠা জানুয়ারী টেলিভিশনে দেখা গেল শেখ মুজিবের সাথে ডাকসু সহ-সভাপতি মোজাহিদুল ইসলাম সেলিমসহ ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের হাস্যোজ্জ্বল ছবি। তারা তাদের সমস্ত বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেয় এবং তাদের কৃতকর্মের জন্য মাফ চেয়ে 'ডাকসু' আজীবন সদস্যপদ পুনর্বহাল করে। এই আপোসের দূতিয়ালী করেন তথাকথিত বামপন্থী কমরেড মনি সিং গং। অতীতের মতো পরবর্তীতে সরকারের সাথে সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করে। ভয্যিতেও যে এরকম আপোসকামী কার্যক্রম করবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়?

উল্লেখ্য যে, ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে ২৮শে অক্টোবর (১৯৭০) জাতির উদ্দেশ্যে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসাবে শেখ মুজিবুর রহমানের রেডিও-টেলিভিশনে দেয় ভাষণের নিম্নলিখিত অংশ এই প্রসঙ্গেই বিশেষ স্মরণযোগ্য ও প্রণিধানযোগ্য :

"তদানীন্তন ক্ষমতাসীন দল (পাকিস্তান মুসলিম লীগ) সমগ্র দেশকে একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, সেই হীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যই আমাদের মহান নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ভাবেই আমরা পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আপোষহীন সংগ্রাম শুরু করি।" (২৯শে অক্টোবর, ১৯৭০, দৈনিক পাকিস্তান দ্রষ্টব্য)।

এই উদ্ধৃতির পর মন্তব্যের কোন প্রয়োজন আছে কি? নেতারা দেশবাসীকে শোনান এক, আর করেন আরেক, মর্মন্তুদ হইলেও ইহা নিরেট সত্য। মনে পড়ে পাকিস্তান গণপরিষদে জনাব আবুল কাসেমের প্রস্তাব ছিল বিশ বৎসরের জন্য মুসলিম লীগকে একমাত্র রাজনৈতিক দল ঘোষণা করা হউক এবং আরও মনে পড়ে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তদানীন্তন আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যের কি তীব্র প্রতিবাদ ও কী ভীষণ গলাবাজি। সবই আজ অতীত ইতিহাস। তবে কেউ ভুলে, কেউ ভুলে না।

বাকশাল গঠন

যাহা হউক, জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্ষমতালোভী শেখ মুজিবুর রহমান তাঁহার পুতুল সংসদের সহায়তায় সকল রাজনৈতিক দল বাতিল ঘোষণা করিয়া ১৯৭৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠনের আদেশ জারি করেন। ১৯৭৩ সালের ২৯শে মে আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (মস্কো) ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মস্কো) ত্রিদলীয় ঐক্যজোট গঠন করিয়াছিল। বাকশাল গঠনের মূল প্ররোচনা ছিল ত্রিদলীয় ঐক্যজোটের। তদানুযায়ী ১. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ২. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ৩. বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, ৪. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ৫. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, ৬. বাংলা জাতীয় লীগ, ৭. বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস, ৮. বাংলাদেশ লেবার পার্টি, ৯. জাতীয় গণতন্ত্রী দল, ১০. জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন, ১১. বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, ১২. ইউনাইটেড পিপলস পার্টি, ১৩. কমিউনিস্ট পার্টি এবং ১৪. শ্রমিক কৃষক সমাজবাদীদলকে বাতিল ঘোষণা করা হয়। এবং ১৯৭৫ সালের ২০শে মে বাংলা জাতীয় লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মস্কো), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও ইউনাইটেড পিপলস পার্টি অফিস তালাবদ্ধ করা হয়। শেখ সাহেব ইহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। নিজ শাসন পাকাপোক্ত করিবার হীন উদ্দেশ্যেই তিনি সকল সংসদীয় সদস্যকে ২৫শে এপ্রিলের মধ্যে 'বাকশালে' যোগ দিবার ফরমান জারি করেন। অন্যথায় সংসদ সদস্যপদ বাতিল। বিরোধী সাংসদ জননেতা আতাউর রহমান খান ২৫শে এপ্রিল সাংবাদিক সম্মেলনে বাকশালে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেও আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্যদ্বয় জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী ও ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন সংসদ সদস্যপদ ত্যাগ করা শ্রেয় মনে করেন। ৬ই জুন (১৯৭৫) জারিকৃত এক ফরমান বলে প্রেসিডেন্ট নিম্নোক্ত

ব্যক্তিদের দ্বারা কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেন :

১. চেয়ারম্যান- শেখ মুজিবুর রহমান, প্রেসিডেন্ট; ২. সৈয়দ নজরুল ইসলাম- ভাইস প্রেসিডেন্ট; ৩. প্রধানমন্ত্রী এম মনসুর আলী- সেক্রেটারী জেনারেল; ৪. আবদুল মালেক উকিল- স্পীকার; ৫. খন্দকার মোশতাক আহমদ-মন্ত্রী; ৬. আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামরুজ্জামান- মন্ত্রী; ৭. মোহাম্মদুল্লাহ- মন্ত্রী; ৮. আবদুস সামাদ আজাদ-মন্ত্রী। ৯. অধ্যাপক এম ইউসুফ আলী- মন্ত্রী; ১০. শ্রী ফনীভূষণ মজুমদার-মন্ত্রী; ১১. ডঃ কামাল হোসেন- মন্ত্রী; ১২. মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন- মন্ত্রী; ১৩. আবদুল মান্নান- মন্ত্রী; ১৪. আবদুর রব সেরনিয়াবাত- মন্ত্রী; ১৫. শ্রী মনোরঞ্জন ধর- মন্ত্রী; ১৬. আবদুল মমিন- মন্ত্রী; ১৭. আসাদুজ্জামান খান- মন্ত্রী; ১৮. মোঃ কোরবান আলী-মন্ত্রী; ১৯. ডঃ আজিজুর রহমান- মন্ত্রী; ২০. ডঃ মোজাফফর আহমদ- মন্ত্রী; ২১. তোফায়েল আহমদ-Special Assistant to the president; ২২. শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন-চীফ হুইপ; ২৩. আবদুল মমিন তালুকদার-প্রতিমন্ত্রী; ২৪. দেওয়ান ফরিদ গাজী- প্রতিমন্ত্রী; ২৫. প্রফেসর নূরুল ইসলাম চৌধুরী- প্রতিমন্ত্রী; ২৬. তাহের উদ্দিন ঠাকুর-প্রতিমন্ত্রী; ২৭. মোসলেম উদ্দিন খান- প্রতিমন্ত্রী; ২৮. মোঃ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর-প্রতিমন্ত্রী; ২৯. কে এম ওবায়দুর রহমান-প্রতিমন্ত্রী; ৩০. ডঃ ক্ষিতিশ চন্দ্র মন্ডল-প্রতিমন্ত্রী; ৩১. রিয়াজুদ্দিন আহমদ- প্রতিমন্ত্রী; ৩২. মোঃ বয়েতুল্লাহ-ডেপুটি স্পীকার; ৩৩. খন্দকার রুহুল কুদ্দুস-প্রেসিডেন্ট এর প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারী; ৩৪. জিল্লুর রহমান- সেক্রেটারী; ৩৫. মহিউদ্দিন আহমদ; ৩৬. শেখ ফজলুল হক মনি-সেক্রেটারী; ৩৭. আবদুর রাজ্জাক-সেক্রেটারী; ৩৮. শেখ শহীদুল ইসলাম; ৩৯. আনোয়ার চৌধুরী; ৪০. বেগম সাজেদা চৌধুরী এমপি; ৪১. বেগম তসলিমা আবেদ এমপি; ৪২. আবদুর রহিম এমপি, দিনাজপুর; ৪৩. আবদুল আওয়াল এমপি, রংপুর; ৪৪. লুৎফর রহমান এমপি, রংপুর; ৪৫. এ কে এম মুজিবর রহমান এমপি, বগুড়া; ৪৬. ডঃ মফিজ চৌধুরী এমপি, বগুড়া; ৪৭. ডাঃ আলাউদ্দিন এমপি, রাজশাহী; ৪৮. ডাঃ আসহাবুল হক এমপি, কুষ্টিয়া; ৪৯. আজিজুর রহমান আক্কাস এমপি, কুষ্টিয়া; ৫০. রওশন আলী এমপি, যশোহর; ৫১. শেখ আবদুল আজিজ এমপি, খুলনা; ৫২. সালাউদ্দিন ইউসুফ এমপি, খুলনা; ৫৩. মাইকেল সুশীল অধিকারী, খুলনা; ৫৪. কাজী আবুল কাসেম এমপি, পটুয়াখালী; ৫৫. মোল্লা জালালউদ্দিন আহমদ এমপি, ফরিদপুর; ৫৬. শামসুদ্দিন মোল্লা এমপি, ফরিদপুর; ৫৭. শ্রী গৌরচন্দ্র বালা, ফরিদপুর; ৫৮. গাজী গোলাম মোস্তফা এমপি, ঢাকা নগর; ৫৯. শামসুল হক এমপি, ঢাকা; ৬০. শামসুজ্জোহা এমপি, ঢাকা; ৬১. রফিকুদ্দিন ভূইয়া এমপি, ময়মনসিংহ; ৬২. সৈয়দ আহমদ, ময়মনসিংহ; ৬৩. শামসুর রহমান খান এমপি, টাঙ্গাইল; ৬৪. নুরুল হক এমপি, নোয়াখালী' ৬৫. কাজী জহিরুল কাইয়ুম এমপি, কুমিল্লা; ৬৬. ক্যাপ্টেন সুজাত আলী এমপি, কুমিল্লা; ৬৭. এম.আর. সিদ্দিকী এমপি, চট্টগ্রাম; ৬৮. এম.এ ওয়াহাব এমপি, চট্টগ্রাম; ৬৯. শ্রী চিত্তরঞ্জন সুতার এমপি; ৭০. সৈয়দা রাজিয়া বানু এমপি; ৭১. আতাউর রহমান খান এমপি, ধামরাই; ৭২. খন্দকার

মোঃ ইলিয়াস; ৭৩. শ্রী মং প্র সুং (King of Manikchari : Chittagong Hill Tracts); ৭৪. অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ (ন্যাপ); ৭৫. আতাউর রহমান (ন্যাপ), রাজশাহী; ৭৬. সৈয়দ আলতাফ হোসেন (ন্যাপ); ৭৭. পীর হাবিবুর রহমান (ন্যাপ); ৭৮. মোঃ ফরহাদ (সিপিবি); ৭৯. বেগম মতিয়া চৌধুরী (ন্যাপ); ৮০. হাজী মোঃ দানেশ (জাগমুই); ৮১. হোসেন তৌফিক ইমাম-সেক্রেটারী, ক্যাবিনেট এফেয়ার্স ডিভিশন; ৮২. নূরুল ইসলাম-সেক্রেটারী ফরেন ট্রেইড; ৮৩. ফয়েজউদ্দিন আহমদ-সেক্রেটারী, স্বরাষ্ট্র; ৮৪. মাহবুবুর রহমান, সেক্রেটারী এস্টাবলিশমেন্ট; ৮৫. আবদুল খালেক-Secretary to the Vice President; ৮৬. মুজিবুল হক-সেক্রেটারী দেশরক্ষা; ৮৭. আবদুর রহিম-Secretary to the President; ৮৮. মঈনুল ইসলাম-সেক্রেটারী, Works, Housing & Urban Development; ৮৯। সৈয়দুজ্জামান- সেক্রেটারী প্ল্যানিং; ৯০. আনিসুজ্জামান-সেক্রেটারী, কৃষি; ৯১. ডঃ এ সাত্তার-Secretary to the President; ৯২. আবু তাহের- সেক্রেটারী ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার; ৯৩. আল-হোসাইনী-সেক্রেটারী পাওয়ার; ৯৪. এ সামাদ-সেক্রেটারী, যোগাযোগ; ৯৫. ডঃ আবুল হোসেন-সেক্রেটারী, স্বাস্থ্য; ৯৬. মতিয়ুর রহমান-চেয়ারম্যান, টিসিবি; ৯৭. মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ Chief of Staff. Bangladesh Army; ৯৮. এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার Chief of staff. Bangladesh Air Force; ৯৯. কমোডর এম এইচ খান Chief of Staff. Bangladesh Navy; ১০০. মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান Director General of Bangladesh Rifles; ১০১. এ কে নাজিরুদ্দিন আহমদ-গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক; ১০২. ডঃ আবদুল মতিন চৌধুরী- ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ১০৩. ডঃ মাজহারুল ইসলাম- ভাইস চ্যান্সেলর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; ১০৪. ডঃ এনামুল হক- ভাইস চ্যান্সেলর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; ১০৫. এটিএম সৈয়দ হোসেন- এ্যাডিশনাল সেক্রেটারী এষ্টাবলিশমেন্ট ডিভিশন; ১০৬. নূরুল ইসলাম- আই.জি.পি; ১০৭. ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম; ১০৮. ডাঃ নূরুল ইসলাম- ডিরেক্টর পিজি হাসপাতাল; ১০৯. ওবায়দুল হক-এডিটর, বাংলাদেশ অবজারভার; ১১০. আনোয়ার হোসেন মঞ্জু- এডিটর, ইত্তেফাক; ১১১. মিজানুর রহমান- চীফ এডিটর বিপিআই; ১১২. মনোয়ারুল ইসলাম- Joint Secretary— President's Secretariate; ১১৩. ব্রিগেডিয়ার এ.এন.এম. নূরুজ্জামান- ডিরেক্টর, জাতীয় রক্ষী বাহিনী; ১১৪. কামরুজ্জামান- সভাপতি, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি; ১১৫. ডাঃ মাজহার আলী কাদরী- সভাপতি, বাংলাদেশ চিকিৎসক সমিতি।

নিম্নোক্ত অঙ্গ সংগঠন গঠন করা হয় :

জাতীয় কৃষক লীগ	সাধারণ সম্পাদক	ফণীভূষণ মজুমদার
জাতীয় শ্রমিক লীগ	,,	অধ্যাপক এম ইউসুফ আলী
জাতীয় মহিলা লীগ	,,	বেগম সাজেদা চৌধুরী

জাতীয় যুবলীগ	,,	তোফায়েল আহমদ
জাতীয় ছাত্রলীগ	,,	শেখ শহীদুল ইসলাম

এবং নিম্নোক্তদের দ্বারা কার্যকরী সংসদ গঠন করেন :

১. শেখ মুজিবুর রহমান– চেয়ারম্যান, ২. সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ৩. এম মনসুর আলী– সেক্রেটারী জেনারেল, ৪. খন্দকার মোশতাক আহমদ, ৫. আবুল হাসনাত মোঃ কামরুজ্জামান, ৬. আবদুল মালেক উকিল, ৭. অধ্যাপক ইউসুফ আলী, ৮. শ্রী মনোরঞ্জন ধর, ৯. ডঃ মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, ১০. শেখ আবদুল আজিজ, ১১. মহিউদ্দিন আহমদ, ১২. গাজী গোলাম মোস্তফা, ১৩. জিল্লুর রহমান–সেক্রেটারী, ১৪. শেখ ফজলুল হক মনি– সেক্রেটারী, ১৫. আবদুর রাজ্জাক– সেক্রেটারী।

পক্ষান্তরে রাজনীতিবিদ, সমর নায়ক, শ্রমিক ও অন্যান্য সংগঠন ও সংস্থা, সরকারী-আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান এমন কি শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিক মহলগুলোতেও বাকশালে যোগদানের হিড়িক পড়িয়া যায়। এইসব সুবিধাবাধী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পতাকা লইয়া ফুলের মালাসহ দলে দলে শেখ মুজিবের চরণ পূজা করিবার নিমিত্ত তাহার নিকট গমন করে। এমন কি এক শ্রেণীর মা-বোনও বাদ যায় নাই। ইহাদের এই ব্যক্তি পূজার মানসিকতায় উৎসাহী হইয়া শেখ মুজিব একদলীয় শাসন টেকসই করিবার নিমিত্ত যে কোন ধরনের সমালোচনার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করিবার অসৎ প্রয়াসে ১৯৭৫ সালের ১৬ই জুন সংবাদপত্র (ডিক্লারেশন বাতিল) অর্ডিন্যান্স জারি করেন। এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমের চারটি দৈনিক ব্যতীত সকল দৈনিক পত্রিকা বাতিল ঘোষণা করা হয়। অর্ডিন্যান্সে ১৭ই জুন (১৯৭৫) হইতে সারা বাংলাদেশে দৈনিক ইত্তেফাক, বাংলাদেশ অবজারভার, দৈনিক বাংলা এবং দৈনিক বাংলাদেশ টাইমস– এই চারটি দৈনিক প্রকাশের কথা ঘোষণা করা হয়। জনাব নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী, জনাব ওবায়দুল হক, শেখ ফজলুল হক মনি ও জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরী যথাক্রমে দৈনিক ইত্তেফাক, বাংলাদেশ অবজারভার, বাংলাদেশ টাইমস ও দৈনিক বাংলার সম্পাদক নিযুক্ত হন।

সরকার আরো ১২২টি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার ডিক্লারেশন বহাল রাখে। আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক ইত্তেহাদসহ বাদবাকী সাপ্তাহিক, মাসিক ও সাময়িকীর ডিক্লারেশন বাতিল ঘোষণা করা হয়।

৯ জন সম্পাদকের বাকশালে যোগদান

বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের সদস্যপদের জন্য যে সব সম্পাদকগণ আবেদন করিয়াছিলেন তাঁহারা হইলেন : ১. জনাব ওবায়দুল হক, সম্পাদক, বাংলাদেশ অবজারভার; ২. জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক; ৩. শামসুল হুদা, সম্পাদক, মর্নিং নিউজ; ৪. জনাব জাওয়াদুল করিম, প্রধান সম্পাদক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস); ৫. জনাব নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী, সম্পাদক,

দৈনিক বাংলা; ৬. জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, সম্পাদক, দৈনিক পূর্বদেশ; ৭. জনাব শহীদুল হক, কার্যনির্বাহী সম্পাদক, বাংলাদেশ টাইমস ও দৈনিক বাংলার বাণী; ৮. জনাব বজলুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, দৈনিক সংবাদ; ৯. জনাব মিজানুর রহমান, সম্পাদক, অধুনালুপ্ত বিপিআই।

প্রথম আবেদনকারী সাংবাদিকবৃন্দ

ইকবাল সোবহান চৌধুরী, অবজারভার; শামসুল হক আলীনূর, পূর্বদেশ; হামিদুজ্জামান, বাসস; মাহবুবুর রহমান রুশো, পিপল; মোহাম্মদ মতিউর রহমান, এনা; জাহাঙ্গীর হোসেন, বাসস; শফিকুল আলম কাজল, আজাদ; খায়রুল আনাম, ইত্তেফাক; আবদুল্লাহ এম হাসান, বাংলাদেশ টাইমস; আমিনুর রহমান, মর্নিং নিউজ; মোঃ নিজামউদ্দিন, ঐ; আমিনুল ইসলাম, ঐ; মোহাম্মদ একরামূল হক লোদী, ঐ; রফিকুল হক, পূর্বদেশ; এ এইচ এম মোয়াজ্জেম হোসেন, অবজারভার; সৈয়দ ইয়াহিয়া বখত, পূর্বদেশ; আতিকুর রহমান, ঐ' মতিউর রহমান, মর্নিং নিউজ; খোন্দকার মনিরুল আলম, বাংলাদেশ টাইমস; হোসেন কামাল, ঐ; জগলুল আহমদ চৌধুরী, বাসস; আলমগীর মহিউদ্দিন, বাংলাদেশ টাইমস; ফখরুল আবেদীন দুলাল, বাংলার বাণী; সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমান, পূর্বদেশ; আজমল হোসেন খাদেম, ঐ; শাহনূর খান, ঐ; খন্দকার ফজলুর রহমান, বাংলাদেশ অবজারভার; মজিদুর রহমান বিশ্বাস, পূর্বদেশ' আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, ঐ; আবদুল মজিদ কামালী, ঐ; শহীদ এনায়েত উল্লাহ, ঐ; আবুল কাশেম, ঐ; জহিরুল হক চৌধুরী, ঐ; মোহাম্মদ আবুল কালাম, ঐ; এ এন এম গোলাম রহমান, ঐ; মোহাম্মদ আবদুল মতিন, ঐ; সালাহ উদ্দিন চৌধুরী, ঐ; সালেহ আহমদ, বাংলার বাণী; আমীন আহমদ চৌধুরী, বাংলাদেশ টাইমস; ওয়াহিদুর রশীদ মুরাদ, বাংলার বাণী; সাদেকুল হক, ঐ; আশরাফ খান, ঐ; আবদুল মান্নান সরকার, ঐ' হালিমুর রশীদ, ঐ; মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, ঐ; মওলা চৌধরী, পূর্বদেশ; আনওয়ার আহমদ, ঐ; আমিনুল ইসলাম, ঐ; খলিলুর রহমান, অবজারভার; আনওয়ার হোসেন, ঐ; সৈয়দ এনায়েত হোসেন, চিত্রালী; অহিদুর রহমান, পূর্বদেশ; আবুল হোসেন নকিব, ঐ; লুৎফুর রহমান, ঐ; মোহাম্মদ শফিকুদ্দীন আহমদ, ঐ; আবদুল মোত্তালেব, ঐ; মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, ঐ; আবদুল আউয়াল, দৈনিক বাংলা; এ টি এম শামসুল আলম, ঐ; ইসহাক চাখারী, ঐ; খোন্দকার মোহসিনউজ্জামান, মর্নিং নিউজ; মোঃ শামসুল হক জাহিদ, ঐ; আবুল আহসান আহমেদ আলী, ঐ; মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, বাসস; সৈয়দ মুস্তাফিজুর রহমান, ঐ; সৈয়দ মাহমুদ, ঐ; সদরুল হাসান, বাংলাদেশ টাইমস; মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, দৈনিক বাংলা; আবদুল হালিম চৌধুরী, পূর্বদেশ, রফিকুর রহমান, বাংলার বাণী; এস এম জহুরুল আলম, বাসস; মোঃ মওসানুজ্জামান, ঐ; মোজাম্মেল হোসেন, বাংলাদেশ অবজারভার; ফারুক কাজী, বাংলার বাণী; রহমান জাহাঙ্গীর, দি পিপল; ইউসুফ পাশা, পূর্বদেশ; গোলাম সারওয়ার,

ইত্তেফাক, বাহাউদ্দিন আহমদ, সদস্য ডিইউজে; লাল ভাই, মর্নিং নিউজ; মোহাম্মদ জহীরুল হক, কোষাধ্যক্ষ, জাতীয় প্রেসক্লাব; এম আকিল খান, পিপল; আজিজ মিসির, জাতীয় প্রেসক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি; এ কে এম তবিবুল ইসলাম, বাসস; সৈয়দ আহমদ জামান, ঐ; মোহাম্মদ এরশাদুল হক, ঐ; আবদুল হালিম চৌধুরী, পূর্বদেশ; এম সাজ্জাদুল করিম, ঐ; রঞ্জন কিশোর চৌধুরী, শেখ আবদুল মজিদ, পূর্বদেশ; ফরিদ উদ্দিন আহমদ, ঐ; চৌধুরী মাজহারুল হক, ঐ; সলিমুল্লাহ, ঐ; এম আবু ইউসুফ, ঐ; সাবির উদ্দিন আহমদ, ঐ; আবদুল মান্নান, ঐ; ফরহাদ হোসেন, সংবাদ; সৈয়দ আখতার ইউসুফ, ইত্তেফাক, কে জি মোস্তফা, জনপদ; শামসুল ইসলাম আলমাজী, দৈনিক বাংলা; রশীদ তালুকদার, সংবাদ; মোকাদ্দেস আলী, অবজারভার; গোলাম মাওলা, দৈনিক বাংলা; বাদল নাগ, মর্নিং নিউজ; শফিকুল করিম, বাসস; শরিফুল আলম, পিপল; বাবু আনসারী, দৈনিক বাংলা; মোহাম্মদ আশরাফ আলী, মর্নিং নিউজ, মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, ঐ; নূরুদ্দিন আহমদ, ঐ; মনিরুজ্জামান, ঐ; আবু বকর সিদ্দিক, পূর্বদেশ; মোঃ খলিলুর রহমান, ঐ; কে এম জাফরুল্লাহ, ঐ; গোলাম হাক্কানী খান, ঐ; মোঃ শামসুদ্দিন ভূঁইয়া, ঐ; মোঃ ইউনুস মজুমদার, ঐ; জোসেফ আইজাক, অবজারভার; এস এফ মকবুল আহমদ, ঐ; মোঃ নাসিরুল আলম, ঐ; মোঃ শাহাজাহান মজুমদার, ঐ; ফজলে রশিদ, ঐ; সৈয়দ মাহবুব আলম, সংবাদ; হোসেন তওফিক চৌধুরী, পূর্বাদেশ; বুদ্ধদেব মুখার্জী, অবজারভার; মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মর্নিং নিউজ; সৈয়দ আহমদ, ঐ; সোহরাব হোসেন, ঐ; মোঃ হাবিলউদ্দিন, ঐ; আবু-আল সাইদ, সংবাদ; এস এন এম আয়াতউল্লাহ, সংবাদ; নোমান চৌধুরী, আজাদ; সুলতান আহমদ, ঐ; আবদুল মান্নান হাওলাদার, ঐ; আতিয়ার রহমান, ঐ; মোঃ ফজলুর রহমান, ঐ; এম মহিউদ্দিন শেখ, ঐ; মোয়াজ্জেম হোসেন বুলু, অবজারভার; আবদুস সাত্তার, বাংলার বাণী; আবুল খায়ের, ঐ; মোঃ আবদুর রব, মর্নিং নিউজ, খোন্দকার এ রাজজাক, ঐ; এ এন এম লুৎফর রহমান, বাংলাদেশ টাইমস; শফিকুল কবির, ইত্তেফাক; শীলব্রত বড়ুয়া, ঐ; ফিরোজ আহমদ, ঐ; খোন্দকার রফিকউদ্দিন আহমদ, ঐ; রকিবুদ্দিন, ঐ; শাজাহান রেজা, ঐ; এ টি এম শফিউল্লাহ, ঐ; জাহান আরা বেগম, বাংলার বাণী; আহমদ ফজল সিদ্দিকী, বাংলাদেশ টাইমস; এ এম মোফাজ্জল, বাংলাদেশ টাইমস; আবদুল মাজেদ চৌধুরী, বাংলার বাণী; মনজুর কাদের, বাংলাদেশ অবজারভার; আবদুল মতীন, পূর্বদেশ; ধীরেন বোস, অবজারভার; এ এস এম এ খালেক, ঐ; এলাহী বক্স, মর্নিং নিউজ; রহমত আলী, মর্নিং নিউজ; আনোয়ার আলী চৌধুরী, ঐ; মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম, ঐ; সুফিয়া সুলতানা, ঐ; আনওয়ারা বেগম, ঐ; সৈয়দা শাহানা বেগম, ঐ; আমিনুল ইসলাম, বাসস; এন কে আলম চৌধুরী, ঐ; এম এ মোহায়মেন, ঐ; জহুরুল ইসলাম, এনা; মোহাম্মদ তোগলক খান, ঐ; শামসুদ্দীন আহমদ চারু, ইত্তেফাক; বজলুর রহমান, ঐ; মোহাম্মদ গাজীউর রহমান, বাসস; হাসান শাহরিয়ার, ইত্তেফাক; মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, দৈনিক বাংলা; আবদুল হাদী, ইত্তেফাক; আসফউদ্দৌলা, ঐ; এ এন এম

বদরুদ্দীন, ঐ; নূরুল ইসলাম বরিন্দি, ঐ; মহিদুল ইসলাম, ঐ; জাকারিয়া মিলন, ঐ; আবু সুফিয়ান, ঐ; শরীফ আবদুল কুদ্দুস, ঐ; প্রশান্ত ঘোলাল, ঐ; আবুল কালাম আজাদ, ঐ; মীর আফতাবউদ্দীন আহমদ, ঐ; সিরাজুল হক, ঐ; রাহাত খান, ঐ; মাহফুজ আলম, বাংলাদেশ টাইমস; রঞ্জু ইসলাম, পূর্বদেশ; কাজী হাসান হাবিব, ঐ; মেহেরুন্নেসা, ঐ; সৈয়দ কামরুজ্জামান, মর্নিং নিউজ; নূরুজ্জামান চৌধুরী, পূর্বদেশ; শহীদুজ্জামান খান, অবজারভার; জহিরুল আলম, ইত্তেফাক; মোজাম্মেল হক, বাসস; এহসানুল করিম হেলাল, ঐ; শামসুদ্দীন আহমদ, ঐ; জিয়াউল হক, পূর্বদেশ; গাজীউল হাসান খান, এনা; শামসুদ্দীন আহমদ, ঐ; আবদুল খালেক ভূঁইয়া, বাংলাদেশ টাইমস; মাহবুবুল আলম, ঐ; মেজবাহউদ্দীন আকন্দ, ঐ; বজল আহমদ, বাসস; এ ই বি রেজা, বাংলাদেশ টাইমস; মৃণাল কৃষ্ণ রায়, ঐ; এ বি এম রুস্তম আলী, মর্নিং নিউজ; এ এফ এম গোলাম রাব্বানী, ঐ; আবদুল হাকিম, বাংলার বাণী, মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক, ঐ; শামসুল ইসলাম, মর্নিং নিউজ; মোহাম্মদ নওয়াব আলী, ঐ; আনিসুর রহমান, পূর্বদেশ; শাহাবউদ্দীন ভূঁইয়া, ইত্তেফাক; সুলতান আহমদ, ঐ; এ ও এম ফখরুদ্দীন, মর্নিং নিউজ; শেহাবউদ্দীন আহমদ, এনা; জাহিদুজ্জামান ফারুক, ইত্তেফাক; এ এফ এম হাবীবুর রহমান, বাসস; রোকনুজ্জামান খান, ইত্তেফাক এবং এ কে এম জামালউদ্দীন, মর্নিং নিউজ।

পরবর্তীতে যাহারা আবেদন করেন

খালেদা এদিব চৌধুরী, পূর্বদেশ, শাজাহান আলী, আজাদ, শাহ সৈয়দ রেহান উল্লাহ, ইত্তেফাক, তোফাজ্জল হোসেন, ঐ; হাবিবুর রহমান মিলন, ঐ; জি. এম. স্বপন, আজাদ, হোসনে আরা বেগম, ঐ; মিসেস সায়েদা খুদসিয়া হাসান, ইত্তেফাক, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, ঐ; সৈয়দ সিরাজুল কবির, এনা; মোহাম্মদ নূর জালাল, সংবাদ; আবদুল মোমিন, ঐ; সুদর্শন চট্টোপাধ্যায়, হাসমতুল হক, ঐ; বাবুলাল সাহা, ঐ; শহীদুল ইসলাম, ঐ; শান্তিময় বিশ্বাস, ঐ; মোহাম্মদ নূরুল আলম, ঐ; স্বপন দত্ত, ঐ; বিনোদ রঞ্জন সেন কর্মকার, ঐ; হাবিবুল্লাহ রানা, ঐ; আবদুর রহমান, ঐ; মোহসিন খায়রুল আনাম, ঐ; হাসান আলী, ঐ; তোজাম্মেল আলী, ঐ; আবুল হাসনাত, ঐ; বাসুদেব ধর, ঐ; বেবী মওদুদ, ঐ; জীবন চৌধুরী, আবুল হাশিম, ঐ; কাজী জাফরুল ইসলাম, ঐ; রুহুল আমীন, ঐ; মোহাম্মদ আতাউর রহমান বাদল, ঐ; মজিবুর রহমান বাদল, ঐ; সুবীর চৌধুরী, ঐ; কাজী আনোয়ারুল ইসলাম, ঐ; চপল বাশার, ঐ; রেজাউল হক সরোজ, ঐ; আহসান হামিদ, ঐ; মোহাম্মদ আবদুর রব, ঐ; রওশনআরা জলি, ঐ; আমানউল্লাহ্ সরকার, ঐ; আবদুল মজিদ, ঐ; বিজন কুমার চক্রবর্তী, ঐ; মিজানুর রহমান, ঐ; অজয় বড়ুয়া, ঐ; কামদা প্রসাদ ভৌমিক, ঐ; জি এম ইয়াকুব, ঐ; ওয়াসিলউদ্দীন, ঐ; হাফিজউদ্দিন আহমদ, ঐ; এম. বশির আহমদ, ঐ; শ্রী সন্তোষ গুপ্ত, ঐ; সৈয়দ শাজাহান, বাংলাদেশ টাইমস, মোহাম্মদ আমিনুল হক, ঐ; আশরাফুল আলম, ঐ; মোহাম্মদ বজলুল হক, ঐ; মোহাম্মদ সামশের তাবরেজ (মিন্টু), ঐ; মোহাম্মদ

শাজাহান আলী, ঐ; শামিম আহ্‌মেদ নাদিম, ঐ; মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, ঐ; খন্দকার আলী আশরাফ, দৈনিক বাংলা; সৈয়দ মর্তুজা আলী, বাংলাদেশ অবজারভার; চট্টগ্রাম, আতাউর রহমান, বাসস; ওবায়দুল হক কামাল, জনপদ; মোহাম্মদ খালেদুর রহমান, দৈনিক বাংলা; এ ওয়াদুদ ফরিদী, বাংলার বাণী, আবদুল করিম, ঐ; মোঃ আবিদুর রহমান, ঐ; কাজী নজরুল ইসলাম, ঐ; মোঃ আমজাদ হোসেন, বাংলাদেশ টাইমস, মোঃ আবু তাহের, ইত্তেফাক; মোঃ নাজিমুল হক, ঐ; শাহিন রেজা নূর, ঐ; আবদুর রশিদ, ঐ; ইয়াসিন আহমদ, ঐ; এম. এ. সোবহান, ঐ; ইমদাদুল হক, ঐ; আঃ রহমান খান, জনপদ; খলিলুর রহমান শরিফ, ঐ; বদিরউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, ঐ; আবদুল ওহাব, ঐ; আসাদুজ্জামান খান, বাংলাদেশ টাইমস; নাজিমউদ্দিন মানিক, বাংলার বাণী; বিনয় কুমার দাস, ঐ; মতিউর রহমান, ঐ; আবদুস সালাম, ঐ; সৈয়দ মোস্তফা হোসেন, ঐ; খন্দকার তোজাম্মেল হোসেন, ঐ; রকিব সিদ্দিকী, ঐ; মমতাজউদ্দন আহমদ, এনা; শাহ আলম, গণকণ্ঠ, ঐ; আনোয়ার হোসেন, সংবাদ; গিয়াসউদ্দিন আহমদ মজুমদার, এনা; আবদুল মান্নান, পূর্বদেশ; হাফিজ আহ্‌মদ, ঐ; নূরুল ইসলাম, ঐ; (সভাপতি সাংবাদিক ইউঃ চট্টগ্রাম); মোহাম্মদ ঈসা, মর্নিং নিউজ; মোঃ আজিজুল হক, ঐ; আব জাফর শেখ, ঐ; মোঃ নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ অবজারভার; আজিজ আহ্‌মদ, ঐ; মোঃ আমির হোসেন, ঐ; মোঃ নূরুল হুদা, ঐ; মাসুকুল হক, ঐ; মোঃ মফিজুল্লাহ, ঐ; মোঃ রফিকুল ইসলাম, ঐ; কাজিমউদ্দিন আহমদ, ঐ; মোঃ আতিকুল্লাহ, ঐ; মাইকেল, ঐ; খন্দকার আবুল হাসনাত, ঐ; মাহ্‌মুদুল হক চৌধুরী, ঐ; এম রিয়াজউদ্দিন আহমদ, ঐ; মোঃ আবুল হোসেন, ঐ; শেখ শহীদুল ইসলাম, ঐ; আবদুল গোফরান, ঐ; তাজুল ইসলাম চৌধুরী, ঐ; মোঃ আশরাফ আলী, ঐ; মোঃ সিদ্দিকুল্লাহ, ঐ; আঃ হাই, ঐ; ফজলুল বারী চৌধুরী, ঐ; আঃ মতিন, ঐ; মদন সাউ, ঐ; মোঃ ইউসুফ হোসেন, ঐ; মোঃ মফিজুর রহমান, বাংলার বাণী; আঃ করিম মোল্লা, ঐ; মোঃ আঃ রহমান, ঐ; কাজী রাশিদুল হক পাশা, ঐ; শেখ গোলাম মোস্তফা, ঐ; মতিউর রহমান, ঐ; ফাতেমা আনসারী, আজাদ; কাজী মোঃ বক্স, বাংলাদেশ টাইমস; আমির খসরু, বাংলার বাণী; হামিদুর রহমান, ঐ; হেদায়েত উদ্দিন খাঁন, জনপদ; আমানুল্লাহ কবির, বাংলাদেশ টাইমস, মোঃ মোকাররম হোসেন, বাসস; হাসানুজ্জামান খাঁন, ঐ; এম শাহরিয়ার, ঐ; হোসাইনুজ্জামান চৌধুরী, ঐ; মোঃ মাসুম, ঐ; আনিস আহ্‌মেদ, ঐ; কাজী মোকসুদুল হাসান, ঐ; মোঃ হাসিবুর রহমান, ঐ; শহীদুল ইসলাম, ঐ; এস এ মাকসুদ, ঐ; ডি পি বড় য়া, ঐ; আ স ম হাবিবুল্লাহ, বাসস (অবৈতনিক সম্পাদক জাতীয় প্রেসক্লাব); নাজির আহমদ, বাসস, চট্টগ্রাম; সৈয়দ শফিকউদ্দিন আহ্‌মদ, দৈনিক স্বাধীনতা, চট্টগ্রাম; শেখ আফতাব উদ্দিন, দৈনিক দেশবাংলা, চট্টগ্রাম; আঃ রাজ্জাক চৌধুরী, দৈনিক পূর্বদেশ; আঃ রহিম, বাংলাদেশ অবজারভার; মোস্তফা তরিকুল আলম, বাংলাদেশ টাইমস; মোঃ মোজাফ্‌ফর হোসেন, ঐ; এ বি এম কামালউদ্দিন শামীম, পূর্বদেশ; মোঃ তোয়াহা খাঁন, সংবাদ; রণেশ দাশ গুপ্ত, ঐ; মোঃ মুটরিব, দি পিপল; নজরুল ইসলাম বুলবুল, জনপথ; জামালউদ্দিন হায়দার, গণকণ্ঠ; হারুনুর রশিদ খাঁন,

সংবাদ হোসেন নূর আলম, এনা; সৈয়দ ইকবাল, ঐ; মোঃ সিরাজউদ্দিন, ঐ; শাহাবুদ্দীন আহমদ, ঐ; কাজী নেসারউদ্দিন আহমদ, জনপদ; শাহাদৎ হোসেন বাবুল, ঐ; মোঃ আবদুল হাই, ঐ; আফতাবউদ্দিন আহমদ, ঐ; মোঃ নূরুল ইসলাম মোড়ল, বাংলার বাণী; আতাউল মালেক, জনপদ; মোঃ রমজান আলী; ফেরদৌস উদ্দিন রহমত-ই খুদা, ঐ; মোজাম্মেল হক, ঐ।

অতঃপর বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বাকশালে যোগদান সমগ্র জাতির জন্য এক বিষণ্ন বিস্ময়।

আতাউর রহমান খানের বাকশালে যোগদান

২৫শে এপ্রিল (১৯৭৫) জনাব আতাউর রহমান খান সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে নিম্নোক্ত বিবৃতির মাধ্যমে বাকশালে যোগদানের কথা দেশবাসীকে জানান :

"দেশের একমাত্র জাতীয় দল কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগে আমি যোগদান করিয়াছি। আমার মনে হয়, এই ব্যাপারে দেশবাসী বিশেষতঃ আমার সহকর্মীদের নিকট একটি কৈফিয়ত দেওয়া আমার কর্তব্য। তাহাদের মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, আমি রাজনীতিতে একটি অভিনব পন্থা গ্রহণ করিয়াছি। পন্থাটি দৃশ্যতঃ অভিনব সত্য; কিন্তু এই পন্থা আমি হঠাৎ গ্রহণ করি নাই। আমি দীর্ঘদিন ভাবিয়া-চিন্তিয়া করিয়াছি। তাহা ছাড়া সহকর্মীদের অনেকের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু সকলের সঙ্গে আলাপ করিতে পারি নাই। তাহাদের সকলকেই আমার বর্তমান চিন্তাধারার সাথী করিবার উদ্দেশ্যেই এই বিবৃতি দিতেছি।

পন্থাটি একান্তভাবেই রাজনীতিক, রাজনীতির শেষ কথা প্রথমে দেশবাসী এবং পরিণামে মানব জাতির কল্যাণ। এই কল্যাণের প্রথম কথা জনগণের আর্থিক সুখ-সমৃদ্ধি। ইহা ব্যতীত জনগণের স্বাধীনতা অর্থবহ হইতে পারে না। সুখ-সমৃদ্ধির প্রথম শর্ত শান্তি ও শৃংখলা। শান্তি-শৃংখলার পূর্বশর্ত জনগণের সার্বিক ঐক্য, জনগণের ঐক্য ব্যতিরেকে শান্তি-শৃংখলা ও জনগণের উন্নতি কোন সরকারের একক চেষ্টায় সার্থক হইতে পারে না। আমাদের দেশে এই গণ ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি এই জন্য যে, আমরা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছি। সকলেই জানেন, সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা স্বাধীনতা অর্জিত হইলে অর্থনীতি বিধ্বস্ত ও শান্তি-শৃংখলা বিপর্যস্ত হওয়া স্বাভাবিক। দেশবাসীর জমাট বাঁধা ঐক্যই কেবল দেশকে এই সংকট হইতে উদ্ধার করিতে পারে। এই ঐক্য প্রতিষ্ঠা বিভিন্ন উপায়ে হইতে পারে। কিন্তু আমাদের শাসনতান্ত্রিক সংবিধান একটি বিশেষ-পথ নির্দেশ করিয়াছে। জনগণের প্রত্যক্ষ নির্বাচিত সার্বভৌম পার্লামেন্ট একটি মাত্র জাতীয় দলের বিধান করিয়াছে। দেশের এই বাঞ্ছিত শান্তি-শৃঙ্খলা আনিতে হইলে জনগণকে বিশেষতঃ তাহাদের নেতৃবৃন্দকে দেশের আইন মানিয়া চলিতে হইবে। আইন-কানুনের মধ্যে আবার সাংবিধানিক আইনই সর্বোচ্চ।

এই পরিস্থিতি লইয়া আমি প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত

বহুবার আলাপ করিয়াছি। আমি আরও উপলব্ধি করিয়াছি যে, তাঁহার এই ঐক্য প্রচেষ্টা আন্তরিক এবং এই কাজে সকল দল ও নেতার সহযোগিতা তিনি একান্তভাবে কামনা করেন। আমার আরো প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, দেশকে এই সংকট হইতে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তরিকভাবেই তিনি আগ্রহশীল। এই অবস্থায় এই কাজে প্রেসিডেন্ট-এর সহযোগিতা করা সকল দেশ-প্রেমিকের বাঞ্ছনীয়। দেশের বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতিতে কোন সচেতন নাগরিকের পক্ষে নীরব দর্শক ও শুধুমাত্র সমালোচকের ভূমিকা পালন করা উচিত নয়। বরঞ্চ তার রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইয়া সরকারের সহিত সক্রিয় সহযোগিতা করাই কর্তব্য। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই কর্তব্যবোধে অনুপ্রাণিত হইয়াই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছি।

আমাদের সমস্যা অনেক, তবে তাহার সমাধানও নিশ্চয়ই আছে। সেই সমাধানের সন্ধানে জাতীয় ঐক্যবদ্ধ চেষ্টায় আমার এই শেষ বয়সে যথাশক্তি লইয়া আমি আত্মনিয়োগ করিতে চাই। জনগণকে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী মর্যাদাবান এবং সম্মানিত জাতি হিসাবে দেখিয়া যাওয়াই আমার জীবনের একমাত্র কামনা। এই সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করিবার জন্য বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ-এর সকল নেতা এবং কর্মীবৃন্দকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাহাদের অনেকেই আমার প্রিয়জন ও পুরাতন সহকর্মী এবং নবাগতরা সবাই আমার স্নেহের পাত্র। আমি যে মহান উদ্দেশ্যে জাতীয় দলে যোগদান করিলাম সে উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য সকলের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা আমার একান্তভাবে কাম্য।

উপস্থিত জাতীয় সম্মানিত সাংবাদিক প্রতিনিধিবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে আপনাদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতা লাভ করিয়াছি। আশা করি, ভবিষ্যতেও আপনাদের সহযোগিতা আমাকে সঠিক পথে দেশের কাজ করিয়া যাইতে সহায়তা করিবে।"

এখানে উল্লেখ্য যে, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক নির্দেশনামায় বলা হয় "জাতীয় সংসদের যে সমস্ত সদস্যবৃন্দ জাতীয় দল- বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগে (বাকশাল) এখনও যোগদান করেন নাই, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৭ খ ধারার ৫ক উপধারা মোতাবেক প্রেসিডেন্ট তাহাদের উক্ত দলে যোগদানের শেষ তারিখ ২৫শে এপ্রিল (১৯৭৫) ধার্য করিয়াছেন।"

প্রসংগত আরও উল্লেখ্য যে, জনাব আতাউর রহমান খান জাতীয় সংসদ সদস্য ছিলেন।

হাজী দানেশসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের বাকশালে যোগদানের আবেদন

বাকশালে যোগদানকালে বামপন্থী নেতৃবৃন্দ সাবেক এমএলএ দ্বয় হাজী মোহাম্মদ

দানেশ, জনাব আবদুল করিম ও জেনারেল আইউব-এর অভ্যুত্থানের যে ঠুঁ ঠুঁ জগন্নাথ ক্ষমতাহীন জাতীয় সংসদ সদস্য ব্যরিস্টার আবদুল হক সাহেবদের বিবৃতি :

মহাননেতা বঙ্গবন্ধু,

"জাতীয় জীবনের এক সংকট সন্ধিক্ষণে আপনার দ্বিতীয় বিপ্লবের ঘোষণা দেশের জনগণের মধ্যে একটি নূতন আত্মবিশ্বাসের জন্ম দিয়াছে, এটা এখন অত্যন্ত স্পষ্ট যে, জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক মুক্তি দ্বিতীয় বিপ্লবের সঠিক বাস্তবায়নের মধ্যে নিহিত।

সার্বিক অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রয়াস গ্রহণের এই শুভলগ্নে মতামত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। আমরা একমাত্র জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগে যোগদানের অনুমতি চাহিতেছি, যেহেতু আমাদের এই প্রতীতি হইয়াছে যে, আপনার দ্বিতীয় বিপ্লবের মহান কর্মসূচীর মাধ্যমেই কেবল জাতীয় আশা-আকাংখার বাস্তবায়ন সম্ভব।

আমাদেরকে পার্টির সদস্যপদ প্রদান করিয়া আপনার মহান নেতৃত্বে জাতিকে সেবা করার অনুমতি দিয়া বাধিত করিবেন।"

জেলা গভর্নর নিয়োগ

২৩শে জুন (১৯৭৫) সারা দেশকে ৬১টি জেলায় বিভক্ত করিয়া ১৬ই জুলাই তারিখে ৬১ জন গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। গভর্নরদের মধ্যে ছিল ৩৩ জন সংসদ সদস্য, ১৩ জন বেসামরিক অফিসার, ১ জন সামরিক অফিসার এবং বাকী ১৪ জনের মধ্যে ছিল জনসাধারণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যেমন আইনজীবী, উপজাতীয় নেতা, প্রাক্তন এমসিএ এবং রাজনৈতিক ব্যক্তি। গভর্নরদের তালিকা নিম্নে দেয়া হইল :

১।	এডভোকেট জহিরুল ইসলাম, প্রাক্তন এম সি এ	কক্সবাজার
২।	জনাব মোহাম্মদ খালেক এমপি	চট্টগ্রাম
৩।	জনাব জাকিরুল হক চৌধুরী	চট্টগ্রাম (উত্তর)
৪।	জনাব মং সু প্রু চৌধুরী বোউমং প্রধান বান্দরবান	বান্দরবান
৫।	জনাব মংপ্রু সুং রাজা মানিকছড়ি	খাগড়াছড়ি
৬।	জনাব এ এম এ কাদের জেলা প্রশাসক, পার্বত্য চট্টগ্রাম	রাঙামাটি
৭।	জনাব খাজা আহামদ এমপি	ফেনী
৮।	জনাব আবদুর রশিদ এমপি	লক্ষ্মীপুর
৯।	জনাব নূরুল হক এমপি	নোয়াখালী
১০।	অধ্যাপক খোরশেদ আলম এমপি	কুমিল্লা
১১।	জনাব আলী আজম এমপি	ব্রাহ্মণবাড়িয়া

১২।	জনাব আবদুল আউয়াল এমপি	চাঁদপুর
১৩।	জনাব মোস্তফা আলী এমপি	হবিগঞ্জ
১৪।	জনাব নূরুল আহামদ জেলা প্রশাসক, বরিশাল	মৌলভীবাজার
১৫।	জনাব মোহাম্মদ রশিদুল হক জেলা প্রশাসক, সিলেট	সিলেট
১৬।	জনাব আবদুল হাকিম চৌধুরী এমপি	সুনামগঞ্জ
১৭।	জনাব আবদুস সাত্তার জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী	কিশোরগঞ্জ
১৮।	জনাব জুবেদ আলী এমপি	নেত্রকোনা
১৯।	রফিকুদ্দিন ভূঁইয়া এমপি	ময়মনসিংহ
২০।	জনাব আবদুল হাকিম এমপি	জামালপুর
২১।	জনাব আনিসুর রহমান এমপি	শেরপুর
২২।	জনাব আবদুল কাদের সিদ্দিকী	টাঙ্গাইল
২৩।	জনাব এম এ তাহের তৎকালীন সচিব, ভূমি সংস্কার	ঢাকা (মেট্রো)
২৪।	জনাব আশরাফ আলী চৌধুরী সাবেক এম সি এ	ঢাকা
২৫।	জনাব মোহাম্মদ শামসুল হক সাবেক এম সি এ	বিক্রমপুর
২৬।	জনাব আফতাব উদ্দিন ভূঁইয়া এমপি	নরসিংদী
২৭।	জনাব এম. নূরুজ্জামান পরিবহন কমিশনার	মানিকগঞ্জ
২৮।	জনাব শামসুদ্দীন মোল্লা এমপি	ফরিদপুর
২৯।	জনাব আবদুল ওয়াজেদ চৌধুরী	রাজবাড়ী
৩০।	জনাব আবেদুর রেজা খান এমপি	মাদারীপুর
৩১।	জনাব এ এইচ এম মোফাজ্জল করিম জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া	গোপালগঞ্জ
৩২।	জনাব এস আর খান, সংস্থাপন বিভাগ	ভোলা
৩৩।	জনাব আমির হোসেন এমপি	ঝালকাঠি
৩৪।	জনাব আমিনুল হক চৌধুরী এডভোকেট	বরিশাল
৩৫।	জনাব এনায়েত হোসেন খান এমপি	পিরোজপুর
৩৬।	জনাব শাহাজাদা আবদুল মালেক খান এমপি	পটুয়াখালী
৩৭।	জনাব এম শফিকুর রহমান জেলা প্রশাসক, রাজশাহী	বরগুনা
৩৮।	জনাব আবদুল লতিফ খাঁন এডভোকেট, সাবেক এমসিএ	বাগেরহাট
৩৯।	কর্নেল মোহাম্মদ আনোয়ারউল্লাহ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	খুলনা
৪০।	কাজী মঞ্জুর-ই-মওলা, জেলা প্রশাসক, বগুড়া	সাতক্ষীরা

৪১।	জনাব রওশন আলী এমপি	যশোর
৪২।	খোন্দকার আবদুল হাফিজ এমপি	নড়াইল
৪৩।	জনাব কে এম এ আজিজ এমপি	ঝিনাইদহ
৪৪।	জনাব লুৎফুল্লাহিল মজিদ, জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী	মাগুরা
৪৫।	জনাব আবদুর রউফ চৌধুরী এমপি	কুষ্টিয়া
৪৬।	জনাব এম ফাইজুর রাজ্জাক জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর	চুয়াডাঙ্গা
৪৭।	জনাব মহিউদ্দিন আহামদ এমপি	মেহেরপুর
৪৮।	অধ্যাপক আবু সাঈদ এমপি	পাবনা
৪৯।	জনাব মোতাহার হোসেন তালুকদার	সিরাজগঞ্জ
৫০।	জনাব এ কে মজিবুর রহমান এমপি	বগুড়া
৫১।	জনাব কাসিমউদ্দিন আহামদ এমপি	জয়পুরহাট
৫২।	জনাব নাজিবুর রহমান এডভোকেট	দিনাজপুর
৫৩।	জনাব এম ফজলুল করিম এমপি	ঠাকুরগাঁও
৫৪।	জনাব এম আবদুর রউফ এমপি	নীলফামারী
৫৫।	জনাব এ.কে.এম জালালউদ্দিন জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ	রংপুর
৫৬।	জনাব লুৎফর রহমান, এমপি	গাইবান্ধা
৫৭।	জনাব শামসুল হক এমপি	কুড়িগ্রাম
৫৮।	জনাব শংকর গোবিন্দ চৌধুরী প্রাক্তন এম সি এ	নাটোর
৫৯।	জনাব আতাউর রহমান	রাজশাহী
৬০।	জনাব মোহাম্মদ আবদুল জলিল এমপি	নওগাঁ
৬১।	জনাব ডঃ এ এ এম মিসবাহুল হক এমপি	নবাবগঞ্জ

আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের সর্বব্যাপক অবাধ দুর্নীতি, রাহাজানি, ডাকাতি, ছিনতাই, লুণ্ঠন, পাচার, গুম, খুন, দেশবাসীকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। সরকারের ব্যর্থ প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক পলিসি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ভারতীয় অর্থনীতির যোগানদার অর্থনীতিতে পরিণত করে, দেখা দেয় এক বিস্ময় ফল। পণ্যদ্রব্যের মূল্য ক্রেতা সাধারণের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। ক্ষেতে-খামারে, কলে-কারখানায়, উৎপাদন চরমভাবে ব্যাহত হয়। কলে-কারখানায় কাঁচা পাটের গুদামে শুরু হয় অগ্নি সংযোগ ও স্যাবোটেজ। সর্বত্র দেখা দেয় ভোগ্যপণ্যের তীব্র অভাব, ১৯৭৪ সালের শেষার্ধে দুর্ভিক্ষ, অনাহারে মৃত্যুবরণ করে অসংখ্য দেশবাসী। বিরোধী কণ্ঠকে বিনাবিচারে আটক করিবার নিমিত্ত বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রণয়ন ও ইহার যথেচ্ছ

ব্যবহারে পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হইয়া শেখ মুজিব দেশব্যাপী ১৯৭৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর জরুরী অবস্থা ঘোষনা করেন এবং তদানুসারে জরুরী আইন প্রণয়ন করা হয়। একইভাবে নিজ বুদ্ধির দোষে, নিজকর্ম দোষে শেখ মুজিব ও তাহার আওয়ামী লীগ সমগ্র বাংগালী জনতার দুশমনে পরিণত হইতে থাকেন। যে শেখ মুজিব ১৯৬৯-৭০-৭১-৭২ সালে ছিলেন বাংগালীর নয়নমণি তিনিই ১৯৭৩-৭৪ সালে রূপান্তরিত হইলেন বাংগালীর চক্ষুশূলে। একদা যিনি ছিলেন জনতার কাতারে তিনি ক্ষমতা ও কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখিবার অদম্য স্পৃহায় ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী সংবিধানে ৪র্থ সংশোধনী সংযোজন দ্বারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া এক দলের একনেতা হিসাবে রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হইলেন। তাহার নিজস্ব ক্ষমতার লোভ, একশ্রেণীর মেরুদন্ডহীন নেতা ও রাজনৈতিক কর্মী, নীতিজ্ঞানহীন বুদ্ধিজীবী ও চরিত্রহীন টেন্ডলের যোগসাজশে বাংলার সর্বত্র নগরে, বন্দরে, কলকারখানায়, গ্রামে-গঞ্জে, ক্ষেতে-খামারে দিল্লীর দাসেরা আওয়াজ উঠাইতে থাকে- 'এক নেতা এক দেশ-বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ।'

১৫ই আগস্টের ঐতিহাসিক পটপরিবর্তন

এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ ও অমানিশার অবসান ঘটে বাংলা মায়ের সাতটি সন্তানের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায়। মৃত্যুঘন্টা বাজে মুজিবী জালেমশাহীর। উদয় হয় অরুণ রাঙ্গা প্রভাত। অকুতোভয় এই সাতটি দামাল সন্তান যেন বাংলাদেশের সাত কোটি মুক্তিপাগল বাঙ্গালীর আশা-আকাংখার সাক্ষাৎ প্রতিনিধি। এক এক কোটির প্রতিনিধি যেন এক একজন। ইহারা হইতেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৭ জন অফিসার লেঃ কর্নেল রশীদ, লেঃ কঃ ফারুক, মেজর পাশা, মেজর হুদা, মেজর মহিউদ্দিন এবং পদচ্যুত মেজর ডালিম ও মেজর শাহরিয়ার। সেইদিন যেমন আপামর বাংগালী জনতা তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতাভরে হৃদয় নিংড়ানো স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানাইয়াছিল, তেমনি স্বাধীনচেতা বাঙ্গালী মাত্রই চিরকাল এই ৭ জন তরুণকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাইবে। বস্তুতঃ জাতীয় নেতৃত্বের অবিমৃষ্যকারিতা ও বিজাতীয় দাসত্বের শৃংখল হইতে মুক্তি পাওয়ার সূর্য সম্ভাবনা হিসাবেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট চিরকাল পরিগণিত হইবে। আজাদী পাগল বাংগালীর জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ১৫ই আগস্ট সত্যিই এক অনন্য দিবস। ইহা ছিল কার্যতঃ দিল্লী ও দিল্লীর দাসত্বের অশুভ শৃংখল মোচনের প্রথম পদক্ষেপ ও শুভ সূচনা।

শেখ মুজিবের গৃহে প্রাপ্ত সম্পদ

৩০শে অক্টোবর (১৯৭৫) দৈনিক ইত্তেফাকের সংবাদ মোতাবেক সাবেক প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডিস্থ ৩২ নং সড়কে অবস্থিত ব্যক্তিগত বাসভবনে প্রাপ্ত সম্পদের বিবরণ :

১। হীরা, মুক্তা, প্লাটিনাম ও স্বর্ণালঙ্কার- ৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা
বাংলাদেশী মুদ্রায় নগদ ৯৪ হাজার ৪ শত ৬১ টাকা,

২। ব্যক্তিগত মোটর গাড়ী– ৩টা,

৩। বৈদেশিক মুদ্রা– ১৭ হাজার ৫ শত টাকা,

৪। বিদেশী রাষ্ট্র প্রদত্ত– ১ লক্ষ টাকার উপহার,

৫। বাতিলকৃত শতকী নোট– ৬ শত ২১ খানা,

৬। ১টি ভারী মেশিনগান, ২টি হালকা মেশিনগান, ৩টি এস.এম.জি, ৪টি স্টেনগান, ৯০টি আধা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, ৬০টি গ্রেনেডসহ গোলাবারুদ ইত্যাদি।

শেখ হাসিনার দিল্লীতে আশ্রয়

নিহত রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা ও তার স্বামী বৈজ্ঞানিক ডঃ ওয়াজেদ আলী মিয়া ও তাহাদের সন্তানদ্বয় পশ্চিম জার্মানীতে অবস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের মারফত ভারতীয় রাজধানী দিল্লীতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া ২১শে আগস্ট (১৯৭৫) চলিয়া আসে। দিল্লীতে ৭ বৎসর অবস্থানের পর ১৯৮১ সালে ১৭ই মে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ চেয়ারম্যান হিসাবে মা-বাবা-ভাই-বোনের স্নেহঘেরা পরিবেশহারা ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে। নিষ্ঠুর রাজনৈতিক জগৎ ব্যক্তিগত, পারিবারিক স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালবাসাকে সহ্য করে না ইহাই অকাট্য সত্য ও নির্মম বাস্তব।

ভাসানীর অভিনন্দন : ভারতের প্রতিক্রিয়া

১৫ই আগস্ট বিপ্লবকে মজলুম নেতা মওলানা ভাসানী 'ঐতিহাসিক পদক্ষেপ' আখ্যায়িত করিয়া অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন আর ভারতীয় সরকারী মুখপত্র আগস্ট পরিবর্তন সম্পর্কে বলেন, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিবর্তনের গতিধারার প্রতিক্রিয়া আমাদের উপর না হওয়ার কোন অবকাশ নাই, কিন্তু এইগুলো বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

(১৭-৮-৭৫, বাংলাদেশ টাইমস)।

ইমাম মদিনীর ওয়ালাইকুম আস্সালাম

১৫ই আগস্ট শুক্রবার জুমার নামাজ আদায়কালে চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা জামে মসজিদের ইমাম মদিনী সাহেব বলেন যে, আমাদের প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ দেশবাসীকে আস্সালামু আলাইকুম বলেছেন আমি প্রত্যুত্তরে তাকে ওয়ালাইকুম আস্সালাম জানাই।

অন্যদিকে দিল্লীশ্বরী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পুনরায় অস্ত্র বলে ঢাকায় ক্ষমতায় বসাইয়া দিবে প্রত্যাশায় ৪০ জনের অধিক সংসদ সদস্য ও টাংগাইলের গভর্নর কাদের সিদ্দিকী সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। হায় আশা কুহকিনী।

১৫ই আগস্ট (১৯৭৫) খন্দকার মোশতাক আহমদ অভ্যুত্থান ও পরিবর্তনের

অগ্রদূতদের অনুরোধে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং জাতীয় জীবনের সেই ঝঞ্ঝাসঙ্কুল উত্তাল তরঙ্গে শক্ত ও সুনিপুণ হস্তে রাষ্ট্রীয় তরণীর হাল ধরেন।

১৫ আগস্ট খন্দকার মোশতাকের ভাষণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আসসালামু আলাইকুম,

প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,

এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এবং বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সঠিক ও সত্যিকারের আকাংখাকে বাস্তবে রূপদানের পূত-পবিত্র দায়িত্ব সামগ্রিক ও সমষ্টিগতভাবে সম্পাদনের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা ও বাংলাদেশের গণমানুষের দোয়ার উপর ভরসা করে রাষ্ট্রপতি হিসাবে সরকারের দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে। বাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের বজ্রকঠিন দায়িত্ব সম্পাদনের পথ সুগম করার জন্য বাংলাদেশের সেনাবাহিনী সত্যিকারের বীরের মতো অকুতভয় চিত্তে এগিয়ে এসেছেন। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, নৌ-বাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস, রক্ষীবাহিনী এবং পুলিশ বাহিনী সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য ও আস্থা প্রকাশ করেছেন। এরা সবাই একযোগে কাজ করে যাচ্ছেন।

৩০ লক্ষ বীর শহীদানের পূত রক্ত এবং দু'লক্ষ মা-বোনের পবিত্র ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা বাংলার সংগ্রামী মানুষকে নতুন জীবনের আস্বাদ ও সন্ধান দেবে এবং স্বাধীন সার্বভৌম দেশে সুখী ও সমৃদ্ধ জাতি হিসাবে বিশ্ব দরবারে আমরা মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াবো, এই ছিলো আমাদের লক্ষ্য ও কামনা। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বন্ধুদেশের অনেকেরই আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। কিন্তু বিগত দীর্ঘকাল দেশের ভাগ্য উন্নয়নের কোনো চেষ্টা না করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা এবং সেই ক্ষমতাকে স্থায়ীভাবে আঁকড়ে রাখার ষড়যন্ত্রের জাল রচনা করা হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে শুধুমাত্র রাজনৈতিক দাবার চাল চালা হয়েছে এবং দেশবাসীর ভাগ্য উন্নয়নকে উপেক্ষা করে দুর্নীতি, স্বাজনপ্রীতি এবং অন্যকে বঞ্চিত করে একশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকদের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত করা হয়েছে। কতিপয় ভাগ্যবানের স্বার্থসিদ্ধির অপচেষ্টায় জনগণের জীবনে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্রমবর্ধমান অগ্নিমূল্য অসহনীয় হয়ে পড়ে। দেশের শিল্প, বিশেষ করে পাটশিল্প ধ্বংসের মুখে। অর্থনৈতিক অবস্থা এমন এক পর্যায়ে এসে পৌছায়, যেখানে বাংলার সর্বশ্রেণীর মানুষ দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও অর্থনৈতিক নির্যাতনের অসহায় শিকারে পরিণত হয়।

একটি বিশেষ শাসকচক্র গড়ে তোলার লোলুপ আকাংখায় প্রচলিত মূল্যবোধের বিকাশ ও মানুষের অভাব-অভিযোগ প্রকাশের সম্মত পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। এই অবস্থায় দেশবাসী একটি শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে অব্যক্ত বেদনায় তিলে তিলে

নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল।

দেশের শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন সর্বমহলের কাম্য হওয়া সত্ত্বেও বিধান অনুযায়ী তা সম্ভব না হওয়ায় সরকার পরিবর্তনের জন্য সামরিক বাহিনীকে এগিয়ে আসতে হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনী পরমতম নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করে দেশবাসীর সামনে সম্ভাবনার এক স্বর্ণদ্বার উন্মোচন করেছেন। এখন দেশবাসী সকল শ্রেণীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে দ্রুত নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে নিষ্ঠার সঙ্গে কঠোরতর পরিশ্রম করতে হবে।

সর্বপ্রকার কলুষ থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। দেশে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং মানুষ যাতে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সে জন্য সমাজে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

দেশপ্রিয় সকল নাগরিককে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সর্বাবস্থায় বাংলাদেশের মানুষ মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও সম্প্রীতি অটুট রাখতে হবে। সমাজের প্রতি স্তরে প্রতিটি মানুষের নাগরিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে সকলকে সেই অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। শান্তি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে দেশবাসীকে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চালু রাখতে হবে। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সমতা ও সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও প্রত্যেক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা এবং একে অপরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অব্যাহত থাকবে। সরকার জোটনিরপেক্ষ নীতি সক্রিয়ভাবে অনুসরণ করে যাবেন।

আমাদের সরকার জাতিসংঘ সনদ ও নীতিমালার প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল। দ্বিপাক্ষিক বা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আমাদের সম্পর্ক নির্ধারণকারী সকল চুক্তি ও দায় সম্পর্কে সরকার মর্যাদাশীল থাকবে।

বর্ণবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং নয়া উপনিবেশবাদ বিরোধী আমাদের নীতি অব্যাহত থাকবে। ইসলামী সম্মেলন, কমনওয়েলথ এবং জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অটুট থাকবে। এইসব মোর্চার সর্বপ্রকার তৎপরতার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও শরীকানা অব্যাহত থাকবে। বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দৃঢ়তর করার প্রচেষ্টা আমরা অব্যাহত রাখবো। এখনো পর্যন্ত যাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব হয়নি, সেইসব দেশের সঙ্গেও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইন্‌শাআল্লাহ আমরা সচেষ্ট হবো। 'সকলের প্রতি বন্ধুত্ব এবং কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়'– এই নীতির রূপরেখার মধ্যে আমরা শান্তি ও প্রগতির পথে আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবো।

সরকার বিশেষভাবে উপমহাদেশে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের প্রচেষ্টা নিচ্ছে। ইসলামী সম্মেলন, কমনওয়েলথ রাষ্ট্রসমূহ, জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন ও বৃহৎ

শক্তিসমূহের সঙ্গে এই সরকার ঘনিষ্ঠতর এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। সরকার ইসরাইলের কবল থেকে আরব পুণ্যভূমি পুনরুদ্ধারের জন্যে আরব ভাইদের ন্যায়সংগত সংগ্রামে ও ফিলিস্তিনী জনগণের ন্যায্য দাবী প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাচ্ছে।

প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা, আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানিয়ে দিতে চাই যে, কোনপ্রকার দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি বা সামাজিক কলুষতার সঙ্গে এই সরকারের কোন আপোষ নাই। আমাদের সামনে পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা সৃষ্টি করেছেন এক অভূতপূর্ব সুযোগ। সেই সঙ্গে আপনাদের সামনে রয়েছে বিরাট চ্যালেঞ্জ।

প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার কাছে কায়মনোবাক্যে এই মোনাজাত করি, তিনি যেন আমাদের সহায় হন এবং তাঁর অপার করুণায় আমাদের সঠিক পথে চালিত করেন। খোদা হাফেজ।

মোশতাকের মন্ত্রিসভা

প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ সমবায়ে তাহার সরকার গঠন করেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ উল্লাহসহ ১০ জন কেবিনেট মিনিস্টার হইলেন :

১. আবু সাঈদ চৌধুরী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী; ২. প্রফেসর ইউসুফ আলী, পরিকল্পনামন্ত্রী; ৩. বাবু ফনীভূষণ মজুমদার, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী; ৪. জনাব সোহরাব হোসেন, পূর্ত ও নগর উন্নয়ন; ৫. জনাব আবদুল মান্নান, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা; ৬. বাবু মনোরঞ্জন ধর, আইন, পার্লামেন্টারী বিষয়াদী ও বিচার; ৭. জনাব আবদুল মমিন, কৃষি ও খাদ্য; ৮. জনাব আসাদুজ্জামান খান, বন্দর, জাহাজ ও আভ্যন্তরীণ জলযান; ৯. ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক, অর্থ; ১০. ডঃ মোজাফফর আহমদ, শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক, কারিগরি গবেষণা ও আণবিক শক্তি।

১১ জন স্টেট মিনিস্টার হইলেন :

১. দেওয়ান ফরিদ গাজী, বাণিজ্য, পেট্রোলিয়াম ও খনিজ; ২. মোমেনউদ্দিন আহমদ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি সম্পদ ও বিদ্যুৎ; ৩. প্রফেসর নূরুল ইসলাম চৌধুরী, শিল্প; ৪. শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, বিমান, পর্যটন, ভূমি, প্রশাসন ও সংস্কার; ৫. জনাব তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, ইনফরমেশন, ব্রডকাস্টিং, লেবার, স্যোসাল ওয়েলফোর, কালচারেল এফেয়ার্স ও স্পোর্টস; ৬. জনাব মোসলেমউদ্দিন খান, পাট; ৭. জনাব নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, যোগাযোগ ও রেলওয়ে; ৮. কে এম ওবায়দুর রহমান, ডাক, তার ও টেলিফোন; ৯. ডাঃ ক্ষিতিশ চন্দ্র মন্ডল, সাহায্য ও পুনর্বাসন; ১০. জনাব রিয়াজউদ্দিন আহমদ, বন, মৎস্য ও পশু; ১১. সৈয়দ আলতাফ হোসেন, যোগাযোগ, রোডস, হাইওয়েজ ও রোডস ট্রান্সপোর্ট।

হাজী দানেশের অভিনন্দন

৪ঠা সেপ্টেম্বর (১৯৭৫) হাজী মোহাম্মদ দানেশ এক বিবৃতিতে দেশে যেভাবে এক ব্যক্তির শাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছিল উহা নস্যাৎ করিয়া দেওয়ার জন্য দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি অভিনন্দন জানান।

তিনি বলেন, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির মূলোচ্ছেদের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা এবং ঘোষিত পররাষ্ট্রনীতির জন্য খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে গঠিত সরকার নিঃসন্দেহে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জনগণের প্রতি সরকারী আহবান সমর্থন করিয়া বর্ষিয়ান নেতা সরকারের প্রতি তাহার পূর্ণ সহযোগিতার কথা ঘোষণা করেন। হাজী দানেশ বলেন, সমগ্র জাতির সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমেই পর্বতপ্রমাণ সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে এবং দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশেই উহা সম্ভব।

উল্লেখ্য, এই হাজী মোহাম্মদ দানেশই জেঃ আইউব-এর সামরিক শাসনকালে আইউব-এর অনুরক্ত, একদলীয় বাকশালের শাসন আমলে বাকশাল সদস্য, জেঃ জিয়ার সামরিক শাসনগর্ভে জন্ম বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সদস্য, আবার লেঃ জেঃ এরশাদ-এর সামরিক শাসন গর্ভে জন্ম জাতীয় সংসদ ও বাংলাদেশে সামরিক কর্তাদের দলীয় সদস্য হইতে এতটুকু বিবেক দংশন বোধ করেন নাই। জনাব আতাউর রহমান খানও একই ধারায় বাকশালে, সামরিক শাসক জেঃ জিয়ার দোসর হওয়ার কার্যক্রমে ব্রত হন এবং সামরিক শাসক জেঃ এরশাদ-এর প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন– কি বিচিত্র ও অনুকরণীয় নেতৃ চরিত্র!

অভ্যুত্থানের মূল সুরকে রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক ও জনজীবনে রূপদানের মহৎ উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদ ১৯৭৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ তথা একদলীয় রাজনীতি আইন বাতিল করেন। ইতিপূর্বে ১৯৭৫ সালের ২৮শে আগস্ট ৬১টি জেলার গভর্নর নিযুক্তি আদেশ বাতিল করেন। ২২শে আগস্ট (১৯৭৫) এক প্রশাসনিক আদেশে দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংবাদকে সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতঃ মূল মালিকের নিকট হস্তান্তর করিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পথে প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ২২শে আগস্টেই তিনি রাষ্ট্রপতি আদেশ ৯ (পি, ও, ৯) বাতিল করেন ও সরকারী কর্মচারীদের মনে নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস পান। সর্বোপরি ৩ অক্টোবরের বেতার ভাষণে তিনি ইহাও ঘোষণা করেন যে, আগামী ১৫ই আগস্ট (১৯৭৬) হইতে দেশব্যাপী রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ শুরু হইবে। ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৯৭৭) তারিখে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নূতন সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। তিনি ইহাও ঘোষণা করেন যে, সকল রাজবন্দীর বিনাশর্তে মুক্তি প্রদান করা হইবে এবং অতঃপর রাজনৈতিক কারণে কাহারো বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হইবে না। এইভাবেই বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠন, বহুদলীয় রাজনীতি প্রতিষ্ঠা, মৌলিক অধিকার পুনঃপ্রবর্তন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার নব অধ্যায় সূচিত হয় খন্দকার মোশতাক আহমদের বলিষ্ঠ

নেতৃত্বে ও সিদ্ধান্তে। বস্তুতঃ খন্দকার মোশতাক আহমদের ৩রা অক্টোবরের ঘোষনা ছিল এক কথায় ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার সুমহান আদর্শের প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসেরই প্রতিধ্বনি।

৩রা নভেম্বর

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বিপ্লবী অভ্যুত্থানের পাল্টা জবাবে ৩রা নভেম্বর (১৯৭৫) মুক্তিযুদ্ধকালে ২নং সেক্টর কমান্ডার মেজর ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে দিল্লী-মস্কো আখ্যায়িত সামরিক অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ সরকারের পতন ঘটায়। দিল্লী-মস্কো বশংবদ সাক্ষী গোপাল ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ক্ষমতায় পাকা-পোক্তভাবে আসীন হওয়ার প্রয়াসকালেই ৬ই নভেম্বর দিবাগত রাত্রে দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান হয় এবং অভ্যুত্থানকালে পলায়নের সময় ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ পথিমধ্যে শেরেবাংলা নগরে নিহত হন।

৭ই নভেম্বর সিপাহী-জনতা সফল অভ্যুত্থানের পর প্রধান বিচারপতি আবু সাদত মোহাম্মদ সায়েম রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অবশ্য ইতিপূর্বে নিহত ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ নিজেকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করিয়া প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক-এর দায়িত্ব গ্রহণ করে ও প্রধান বিচারপতি আবু সাদত মোহাম্মদ সায়েমকে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত করে।

৬ই নভেম্বরে সায়েমের ভাষণ

"প্রিয় দেশবাসী,

আস্‌সালামু আলাইকুম। আজ এক সংকটময় মুহূর্তে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে জনগণের সহযোগিতার উপর দৃঢ় আস্থা রাখিয়া আমি রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছি।

দেশের স্বাধীনতা এবং আপামর জনসাধারণের ও আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুখী-সমৃদ্ধিশালী জীবন নিশ্চিত করার জন্য যে লক্ষ লক্ষ ভাই ও বোনেরা আত্মাহুতি দিয়াছেন এবং জীবন বিপন্ন করিয়াছেন, আজ সর্বান্তঃকরণে তাঁহাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিতেছি। যে আদর্শের বাস্তবায়নের জন্য আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলাম, স্বাধীনতার প্রায় দীর্ঘ চার বৎসর পরেও তাহার আশানুরূপ বাস্তবায়ন হয় নাই। ফলে জনসাধারণ আজও অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত। তাহাদের মনে হতাশা ও নিরাপত্তাবোধের অভাব। দেশের সাধারণ মানুষের এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার ফলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রভূত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ প্রতিফলিত হয় নাই।

আমরা বর্ণবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ এবং নয়া উপনিবেশবাদ বিরোধী নীতি অনুসরণ করিয়া যাইব। ইসলামী সম্মেলন, জোটনিরপেক্ষ ও কমনওয়েলথ সম্মেলনের সংগে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সহযোগিতা বজায় থাকিবে। বিশ্বশান্তি এবং আন্তর্জাতিক

সহযোগিতা দৃঢ়তর করিবার প্রচেষ্টায়ও আমরা সক্রিয় থাকিব। এখনো পর্যন্ত যে সব রাষ্ট্রের সহিত আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই, সে সব দেশের সাথে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমরা প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইব। 'সকলের প্রতি বন্ধুত্ব এবং কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়'– এই প্রতিপাদ্যই হইবে আমাদের পররাষ্ট্র নীতির মূল ভিত্তি।

আমরা উপমহাদেশে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইব। একই সাথে আমরা আমাদের নিকট প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে বিদ্যমান ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরো জোরদার করিবার লক্ষ্যে নিষ্ঠাবান থাকিব এবং বৃহৎ শক্তিসমূহের সঙ্গে আমাদের সরকার ঘনিষ্ঠতর বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা চালাইয়া যাইবে।

ইসরাইলের কবল হইতে পবিত্র আরবভূমি পুনরুদ্ধানের জন্য এবং আরব ভাইদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম ও ফিলিস্তিনী জনগণের ন্যায্য দাবী প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতি আমরা আমাদের অকুণ্ঠ সমর্থন অব্যাহত রাখিব।

পরিশেষে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, জনসাধারণের ভাগ্য উন্নয়ন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ সমাধানে আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করি। ইনশাআল্লাহ, আমরা সফলকাম হইব।

খোদা হাফেজ,
বাংলাদেশ-জিন্দাবাদ।"

খালেদ মোশাররফের পদোন্নতি ও জিয়ার পদত্যাগ

৪ঠা নভেম্বর (১৯৭৫) প্রেসিডেন্টের এক বিশেষ ঘোষণায় বলা হয় ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম পিএসপি'কে ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর পূর্বাহ্ন হইতে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করিয়া চীফ অব আর্মি স্টাফ নিয়োগ করা হইয়াছে। একই দিনে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বীর উত্তম পিএসসি পদত্যাগ করায় তিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন।

৩রা নভেম্বর অভ্যুত্থানের নায়ক ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ কর্তৃক আটক সেনাপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বন্দীদশা হইতে ৭ই নভেম্বর মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

জিয়ার পদত্যাগের আদেশ বাতিল

এতদ্বারা মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বি.ইউ, পি.এস.সি-এর পদত্যাগ গ্রহণ সম্পর্কিত ৩রা নভেম্বর (১৯৭৫)-এর আদেশটি বাতিল করা হইল। শুক্রবার ঢাকায় সরকারীভাবে এই ঘোষণা করা হয়। ফলশ্রুতিতে, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ বি.ইউ.পি.এস.সি-এর চীফ অব আর্মি স্টাফ হিসাবে নিয়োগ এবং তাঁহার মেজর জেনারেল হিসাবে উন্নীত হওয়া সংক্রান্ত আদেশটিও বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৩রা নভেম্বর অভ্যুত্থানের পর প্রধান বিচারপতি আবু সাদত মোহাম্মদ সায়েম রাষ্ট্রপতি পদে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ কর্তৃক নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পুনরায় ৭ই নভেম্বর সফল সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানের পরও রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত রহিলেন।

৭ই নভেম্বরে জিয়ার ভাষণ

নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসাবে ঘোষণা করিয়া ৭ই নভেম্বর ১৯৭৫ইং ভোরে রেডিও বাংলাদেশ হইতে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বলেন :

"প্রিয় দেশবাসী– আস্‌সালামু আলাইকুম– আমি মেজর জেনারেল জিয়া বলিতেছি, বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জনগণ, সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার এবং অন্যান্যের অনুরোধে আমাকে সাময়িকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের চীফ মার্শাল ল' এ্যাডমিনিস্ট্রেটর ও সেনা বাহিনীর প্রধান হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এই দায়িত্ব ইনশাল্লাহ আমি সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

আপনারা সকলে শান্তিপূর্ণভাবে যথাস্থানে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করুন।

দেশের সর্বত্র অফিস-আদালত, যানবাহন, বিমানবন্দর, মিল-কালখানাগুলি পূর্ণভাবে চালু থাকিবে। আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হউন।

খোদা হাফেজ,

বাংলাদেশ-জিন্দাবাদ।

★ বলা দরকার ৭ই নভেম্বর এর সেনা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সেনা সদস্যরা তাঁকে বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করেন। তিনি বেতার ভাষণে নিজেই নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা দেন। তখনো আবু সাদাত মোঃ সায়েম দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। একই দিনে প্রেসিডেন্ট সায়েম জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর প্রধান এবং উপ-সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতার থেকে জিয়াউর রহমান প্রথমে নিজেকে দেশের সরকার প্রধান হিসেবে উল্লেখ করে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এই জিয়াউর রহমানই পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিতব্য দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে প্রেসিডেন্ট সায়েমকে সরিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন এবং তাঁর মনের গহনে লালিত দীর্ঘদিনের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করেন।

৭ই নভেম্বরে মোশতাকের ভাষণ

প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলাইকুম।

আজ বাংলাদেশের সেনা-বাহিনী, বিমান বাহিনী ও নৌ-বাহিনীর বীর সৈনিকরা,

বিডিআর, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর বীর সদস্যরা, জনসাধারণ, শ্রমিক, ছাত্র ও যুবক সকলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যে অভূতপূর্ব বিপ্লব সংঘটিত করেছেন তা দেখে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় আমার চিত্ত আজ আবেগআপ্লুত এবং এই বীরদের প্রতি আমি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা জানাই। একমাত্র পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার অনন্ত ঐশী শক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমেই এই বিপ্লবের ইতিহাস রচনা সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি। তাই সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার কাছে আমি শ্রদ্ধাবনতচিত্তে শুকরিয়া আদায় করি। আজকের বিপ্লবের সকল নায়কদের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর কাছ থেকে আমি ও আমার স্বল্পকালীন সরকার অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট থেকে ২রা নভেম্বর পর্যন্ত বিদ্যমান সরকার যে সহানুভূতি পেয়েছে, মানুষ হিসেবে আমাদের সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে এর চাইতে বেশী কিছু দাবী আমার নেই। আমাদের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য আপনাদের সবার প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

গত ২রা নভেম্বর থেকে আজকের দিন পর্যন্ত যে পরিস্থিতি দেশে বিদ্যমান সে সম্পর্কে আপনারা ওয়াকিফহাল আছেন। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি আলোচনা করতে চাই না। কারণ, এই পরিস্থিতি আজকের বিপ্লবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত রচনা করেছে। এবং সকলের সঙ্গে জাতীয় সত্ত্বাকে আপন মহিমায় বিধৃত করেছে। জাতীয় সত্ত্বার এই মহিমাকে কর্মে প্রয়োগের মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদন শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠন এবং সমাজকে কলুষমুক্ত করাই এই মুহূর্তের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের জন্য সরকারের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে যেমনি জনগণের মধ্যে মতৈক্য থাকা উচিত, তেমনি জনগণ নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারে সরকারের গঠনপদ্ধতি এমনি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমার প্রাণপ্রিয় দেশবাসীর কাছ থেকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনের জন্য আমার কাছে স্বতঃস্ফূর্ত দাবী আসা অব্যাহত রয়েছে। আপনাদের প্রাণঢালা ভালোবাসা ও বিশ্বাসের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস বর্তমান পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে আজ এমন এক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন যিনি হবেন সম্পূর্ণ নির্দলীয় এবং অরাজনৈতিক। এইসব শর্তাদি পালনের জন্য দেশের প্রধান বিচারপতি বর্তমানে যেভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বে আছেন তাই শোভন ও সুন্দর বলে আমি মনে করি। বিচারকের বিচক্ষণতা ও নিরপেক্ষতা দিয়ে তিনি জাতিকে তার নির্ধারিত কক্ষপথে পরিচালিত করতে পারবেন আশা করাটা নিঃসন্দেহে অপ্রত্যাশা নয়। তাই আমি আজ তাঁকে এই জাতীয় দায়িত্ব পালন করতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেছি।

যে দায়িত্ব মহান আল্লাহতায়ালা আমাকে দিয়েছিলেন, সে দায়িত্বের পরিমণ্ডল আমি অতিক্রম করেছি। তথাপি দেশের নগণ্য সেবক হিসেবে আমি আপনাদের সঙ্গেই আছি। কর্মী হিসেবে যেখানেই প্রয়োজন থাকবে ইনশাআল্লাহ আমি নিশ্চয় কর্মের মাধ্যমে সেখানে দেশবাসীর সঙ্গে উপস্থিত থাকবো। দেশবাসীর দোয়া ও আল্লাহর রহমত ছাড়া

আমার আর কিছুই কাম্য নেই।

আমার প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা জেনারেল এম.এ.জি ওসমানীর সংকটকালীন এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পরিসমাপ্ত হয়েছে। দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী এই কর্মবীর যা করেছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আমাদের দেশ ছোট কিন্তু জাতি বড়। এর প্রতি ইঞ্চি ভূমিকে হায়েনার আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে স্বতঃস্ফূর্ত ব্যক্তি ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায়। আবার এর প্রতি ইঞ্চি ভূমিকে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করতে হবে। কলে-কারখানায় পেশী নিংড়ানো শ্রমে সর্বাপেক্ষা বেশী উৎপাদনও করতে হবে। অতঃপর পরস্পরকে সুখী ও সমৃদ্ধ করার চেষ্টায় সকলকে এক জাতীয় মহাপ্রয়াসে নিয়োজিত হতে হবে নিবেদিত চিত্তে।

আজকের বিপ্লবে যেভাবে প্রতিজন সিপাহী এবং নাগরিক সিপাহসালারের ভূমিকা পালন করেছেন, তেমনি সামনের প্রতিটি দিনেই আপনাদের সচেতনতাকে চির সজীব রাখতে হবে।

পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা আমাদের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ,
বাংলাদেশ-জিন্দাবাদ।

৭ই নভেম্বরে সায়েমের ভাষণ

"বিস্‌মিল্লাহের রাহমানের রাহীম।

প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলাইকুম।

গতরাতে আপনাদের উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে কি পরিস্থিতিতে আমাকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়েছে, তার কিছুটা আভাস আমি দিয়েছি। প্রেসিডেন্টের পদে খন্দকার মোশতাক আহমদের পুনর্বহাল হওয়ার পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত দাবী সত্ত্বেও তাঁরই অনুরোধক্রমে আমি প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার চালিয়ে যেতে সম্মত হয়েছি। খন্দকার মোশতাক আহমদের দেশব্যাপী জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের যে মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তা যে কোন উন্নয়নশীল দেশে বিরল এবং সেই দেশের জনগণের জন্য গর্বের বিষয়।

আমার গতরাতের ভাষণে রাষ্ট্রীয় নীতি এবং সরকার পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কে আমি কিছুটা আলোকপাত করেছি। দেশে আইনের শাসন, নিরপেক্ষ প্রশাসন এবং অবাধ সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা সম্পর্কেও আমি গতরাতে আপনাদের অবহিত করেছি।

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণের প্রচেষ্টার সাথে সাথে আমাদেরকে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে। কেননা, আমাদের

জনগণের দারিদ্র্য এবং বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভের আর কোন পথ নেই। এ জন্যে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, শৃঙ্খলার সাথে কঠোর পরিশ্রম করা, কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং একই সাথে অধিক পণ্যসামগ্রী রফতানীর মাধ্যমে অধিকতর বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের জন্যেও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এভাবেই আমরা দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ এবং দ্রব্যমূল্যে স্থিতিশীলতা আনতে সক্ষম হব।

সুখী এবং সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে আমাদের সর্বশ্রেণীর জনগণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অপরিহার্য। এ উদ্দেশ্যে যথাযথ সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের ছাত্র এবং যুব সমাজকে গঠনমূলক কর্মোদ্যমে অনুপ্রাণিত করতে হবে এবং তাদের সৃজনী প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনার জন্য আমরা কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দেশে সামরিক আইন প্রশাসন কাঠামো গঠন করা হয়েছে।

এই কাঠামোতে প্রেসিডেন্ট স্বয়ং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হবেন। এতে তিনজন উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক থাকবেন। তাঁরা হচ্ছেন, সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌ-বাহিনী প্রধান কমোডর মোশাররফ হোসেন খান এবং বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এম জি তোয়াব। দেশের চারটি বিভাগে চারজন আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক থাকবেন।

জননেতাদের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে। এই পরিষদ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করবেন এবং পরামর্শ দিবেন।

সরকারী নীতিমালা বাস্তবায়নের দায়িত্ব বেসামরিক কর্মকর্তাদের উপর ন্যস্ত থাকবে।

আমি ঘোষণা করছি যে, শুধু রাজনৈতিক আদর্শগত কারণে যে সব জননেতা আটক আছেন, তাঁদের অবিলম্বে মুক্তি দেয়া হবে।

পরিশেষে আমি আশা করব যে, নতুন কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা সততা ও আন্তরিকতার সাথে নিজ নিজ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করে যাবো, বর্তমান সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করব। শুধু এর মাধ্যমেই ন্যূনতম সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা বাঞ্ছিত অগ্রগতি সাধনে সফলকাম হতে পারি।

আপনাদের সার্বিক সহযোগিতায় ইনশাল্লাহ আমরা অচিরেই আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে সক্ষম হবো বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

খোদা হাফেজ,

বাংলাদেশ-জিন্দাবাদ।

রাষ্ট্রপতি সায়েমের ৮ই নভেম্বরের '৭৫ ঘোষণা (Proclamation)

GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF BANGLADESH MINISTRY OF LAW, PARLIAMENTARY AFFAIRS AND JUSTICE

(Law and Parliamentary Affairs Division).

Notification Dacca, the 8th November 1975

No. 774-Law.— The following Proclamation made by the President of the Peoples Republic of Bangladesh, on the 8th November, 1975 is hereby published for general information :

PRESIDENT'S SECRETARIAT PROCLAMATION

The 8th November, 1975

Where as the whole of Bangladesh has been under Martial Law since the 15th day of August, 1975; AND WHEREAS Khandaker Moshtaque Ahmed. Who placed the country under Martial Law, has made over the office of President of Bangladesh to me and I have entered upon that Office of 6th day of November, 1975.

AND WHEREAS in the interest of peace order security, progress, prosperity and development of the country. I deem it necessary to keep in force the Martial law proclaimed on the 15th August, 1975; AND WHEREAS for the effective enforcement of Martial Law it has become necessary for me to assume the powers of Chief Martial Law Administrator and to appoint Deputy Chief Martial Law Administrators and to make some modifications in the proclamation of the 20th August, 1975;

NOW, THEREFORE, I, Mr. Justice Abu Sadat Mohammad Sayem, President of Bangladesh, do hereby assume the power of Chief Martial Law Administrator and appoint the Chief of Army Staff Major General Ziaur Rahman B.U. Psc;... as Deputy Chief Martial Law Administrator and declare that—

(c) Parliament shall stand dissolved and be deemed to be so dissolved with effect from the 6th day of November, 1975 and general elections of Members of Parliament shall be held before the end of February, 1977;

(d) The presons holding office as Vice-President, Speaker, Deputy Speaker, Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers and Whips, immedeately before this Proclamation, shall be deemed to have ceased to

hold office with effect from the 6th day of November, 1975.

A. M. SAYEM
President
AND
Chief Martial Law Administrator

জাসদের হঠকারিতা

১৯৭২ সালের ৩০শে অক্টোবর জেনারেল ওভানের প্ররোচণায় গঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) নাকি ৭ই নভেম্বর অভ্যুত্থানে সামরিক বাহিনীর একাংশের সহিত সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত ছিল বিধায় সামরিক বাহিনীর সহিত অভ্যুত্থানে জড়িত অতি উৎসাহী কয়েকজন ট্যাঙ্কসহ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক আ স ম আবদুর রবসহ জাসদ নেতৃবৃন্দকে ৮ই নভেম্বর কারামুক্ত করে। তাহাদের এই হঠকারী অতি বিপ্লবী ভূমিকার কারণে জনমনে ভীতি সঞ্চার হয়। বাধ্য হইয়া সরকার ২৩শে নভেম্বর (১৯৭৫) জাসদের মেজর এম এ জলিল, আ স ম আবদুর রব এবং কর্নেল তাহেরসহ নেতৃবৃন্দকে পুনঃগ্রেফতার করে ও ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রাখে। ইহার পাল্টা জবাবে জাসদ প্রেরিত এক সশস্ত্র স্কোয়াড বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার সমর সেনকে ভারতীয় হাই কমিশন অফিস প্রাঙ্গণ হইতে অপহরণ করিবার (Kidnap) এক দুঃসাহসিক ব্যর্থ প্রচেষ্টা নেয়।

আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করিয়া একটি বিবৃতি প্রদান করি। পত্রিকায় প্রকাশিত বিবৃতিটি নিম্নে দেওয়া হইল :

"ভারতীয় হাই কমিশনার মিঃ সমর সেন যে ঘটনায় শরীরে আঘাত পাইয়াছেন, ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনে আজ সকালে সংঘটিত উক্ত ঘটনা সম্পর্কে জানিতে পারিয়া আমরা মর্মাহত হইয়াছি।"

"আমরা একদল লোকের এহেন কাপুরুষোচিত ও জঘন্য অপচেষ্টার তীব্র নিন্দা করিতেছি। ঘটনাটি দৃশ্যতঃই রাজনৈতিক দুরভিসন্ধির পরিচায়ক এবং বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ইহা করা হইয়াছে।"

"ভারতীয় হাই কমিশনারের উপর পরিচালিত আক্রমণ প্রতিহত করিবার ক্ষেত্রে কর্তব্যরত বাংলাদেশ পুলিশ ও রক্ষীদের উপযুক্ত এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আমরা প্রশংসা করি।"

"আমরা আশা করি যে, সরকার কর্তৃক গৃহীত আশু কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সকল মহল কর্তৃক প্রশংসিত হইবে।"

উপরোক্ত যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন সর্বজনাব আতাউর রহমান খান, তোফাজ্জল আলী, ডঃ আলিম-আল-রাজি, মশিউর রহমান, শাহ আজিজুর রহমান, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ, আসাদুজ্জামান খান, কাজী জাফর আহমদ, অলি আহাদ ও রাশেদ

খান মেনন। (ইত্তেফাক ২৭/১১/৭৫)

১৫ই আগস্ট দুঃসাহসিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে সূর্যসেনারা ভারতীয় নাগপাশ হইতে মুক্ত হওয়ার স্বর্ণদ্বার খুলিয়া দিয়াছিল তাহারা ৩রা ও ৭ই নভেম্বর অভ্যুত্থানের কারণে অধিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষ হইতে একই পারিতোষিক পেয়েছে– ভিনদেশ লিবিয়ায় নির্বাসন জীবনযাপন। কি অদ্ভুত ভাগ্যের লিখন! কি অদ্ভুত কৃতজ্ঞতা জ্ঞান!

জেল হত্যা

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিতে হয় যে, ১৫ই আগস্টের বিপ্লবী পট-পরিবর্তনের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলী, মুক্তিযুদ্ধকালে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, মন্ত্রী কামরুজ্জামানসহ অন্যান্যকে গ্রেফতার এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রাখা হয়। পরিতাপের বিষয় ১৯৭৫ সালের ২রা ও ৩রা নভেম্বর মধ্যবর্তী রাত্রিতে কারাগারে নৃশংসভাবে উপরোক্ত চার নেতাকে হত্যা করা হয়। ইহা সুস্থ ব্যক্তির কল্পনার অতীত– বিপ্লবী সিরাজ সিকদারকে গ্রেফতারের পর পুলিশ প্রহরাধীন আটক থাকাকালে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়– এই ধরনের হত্যাকান্ড হিটলারের জার্মানীতে ও স্ট্যালিনের রাশিয়াতে অহরহ হইয়াছে– সভ্য সমাজে যাহা চিন্তাও করা যায় না।

মোশতাকের নেতৃত্ব

আমরা বাংলা জাতীয় লীগের পক্ষ হইতে দিল্লীর দাসত্ব মোচনের দাবীতে সমগ্র দেশে 'আজাদ বাংলা' আন্দোলনের সূচনা করিয়াছিলাম এবং সর্বপ্রকার প্রতিকূলতার মোকাবেলায় জেল, জুলুম, দৈহিক অত্যাচার ও প্রাণনাশের হুমকিকে তোয়াক্কা না করিয়া আজাদ বাংলা আন্দোলনকে শক্তিশালী করিবার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাইয়াছিলাম। ১৫ই আগস্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ দিল্লীর দাসত্ব মোচনের যে বলিষ্ঠ ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন,– তাহা আজাদ বাংলা আন্দোলনের মর্মবাণী হইতে মোটেও পৃথক নয়।

উল্লেখ্য যে, খন্দকার মোশতাকের এই দৃঢ়তা দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সকল কারসাজিকেও ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। শুধু তাই নয়, তাঁহার নেতৃত্বে ঐক্য ও ঈমানের মন্ত্রে দীক্ষিত ৭ কোটি বঙ্গ সন্তান অত্যন্ত শৃংখলার সহিত জাতীয় জীবনের সকল অমূলক, অকল্যাণ ও অশুভ প্রভাব-প্রতিপত্তিকে মুছিয়া ফেলিতেও সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। জাতীয় জীবনের আভ্যন্তরীণ এই কল্যাণ প্রয়াস বহির্বিশ্বেও সমভাবে অভিনন্দিত হইয়াছে। ইহার প্রত্যক্ষ সুফল, বিশ্বের সর্বাপেক্ষা জনবহুল ও তৃতীয় বিশ্বশক্তি গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই ৩০শে আগস্ট (১৯৭৫) তাঁহার বার্তায় বলিয়াছিলেন, "গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারের পক্ষ হইতে সসম্মানে আপনাকে জানাইতেছি যে, চীন সরকার আজ হইতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতেছে। আমি নিশ্চিত যে, আমাদের দুই দেশের জনগণের চিরাচরিত বন্ধুত্ব

দৃঢ়ভাবে বৃদ্ধি পাইবে।"

উল্লেখ্য যে, চীনের অভিযোগ ছিল, শেখ মুজিব এবং তাহার সরকার দিল্লীর পুতুলমাত্র এবং বাংলাদেশের সাবভৌমত্ব প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়। তাই মুজিব আমলে অনবরত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় নাই। এইদিকে আরব জাহানের তথা মুসলিম জাহানের মধ্যমণি সউদী আরবও একই কারণে দিল্লীর দাস মুজিব সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানাইয়া আসিতেছিল। কিন্তু খন্দকার মোশতাক আহমদ দেশের দায়িত্বভার গ্রহণের পর পরই ১৬ই আগস্ট সউদী আরবের বাদশাহ খালেদ বাংলাদেশকে কেবল স্বীকৃতিই দেন নাই, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডত্ব বজায় রাখিবার ব্যাপারে সউদী আরবের পক্ষ হইতে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানেরও আশ্বাস দেন। স্বল্পতম সময়ের জন্য হইলেও খন্দকার মোশতাক আহমদের এই দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্ব এবং বাংলাদেশকে দিল্লীর দাসত্ব শৃংখল হইতে মুক্ত করিবার ব্যাপারে তাঁহার আন্তরিক ও বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে।

একগুচ্ছ ঐতিহাসিক চিঠি

[রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রচুর সংখ্যক চিঠি গ্রন্থাকারের হেফাজতে রহিয়াছে। ঐতিহাসিক গুরুত্ব হিসাবে যাহার মূল্য অনেক। সেই সকল চিঠির সামান্য কিছু সংকলিত হইলো। স্থানাভাবে সকল চিঠি মুদ্রণ সম্ভব হইলো না।]

টাওয়ার হোটেল

কলিকাতা

৩/৪/৫৫

প্রিয় অলি আহাদ

তুমি আমার পত্র পাওয়ার পর সমস্ত জেলা, মহকুমা আওয়ামী লীগ অফিসে সার্কুলার দিয়া এই মর্মে জানাইয়া দিবে। ১। প্রত্যেক ইউনিয়নে কর্মঠ, নিঃস্বার্থ লোক লইয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ গঠন করিবে। ২। প্রত্যেক থানায় সভা সমিতি করিয়া সরকারের নিকট নিম্নলিখিত মর্মে দাবী জানাইবে। লাহোর ঐতিহাসিক প্রস্তাব অনুযায়ী প্রত্যেক ইউনিটে ফুল অটোনমী চাই। ২১ দফা দাবী নূতন শাসনতন্ত্রে সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লইতে হইবে। সমস্ত রাজবন্দীদিগকে মুক্তি দিতে হইবে। কোন প্রকার টাল বাহানা না করিয়া সত্বর পূর্ব পাকিস্তানে পার্লামেন্টারী শাসন কায়েম করিতে হইবে। ২০ বৎসরের সময় ধার্য না করিয়া নূতন শাসনতন্ত্র কায়েম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উর্দুর সহিত বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিতে হইবে।

মোঃ আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

কলিকাতা
৩/৪/৫৫

প্রিয় অলি আহাদ

আমার প্রেরিত ২১ দফা প্রত্যেক পল্লীতে কৃষক শ্রমিক সকলের নিকট যাহাতে পৌছিতে পারে তাহার জন্য আমেনাকে সর্ব প্রকারের সাহায্য করিয়া বুকলেট ইত্যাদি ছাপাইয়া প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিবে। আওয়ামী লীগের সর্ব প্রকার সাহায্য ও সমর্থন যাহাতে পায় তাহার ব্যবস্থা করিবে। আওয়ামী লীগ অফিস হইতে সমস্ত ছাপান সম্ভব হইবে না। চিটাগাং এর জনৈক আব্দুল বারী পুস্তক ব্যবসায়ীকে অনুমতি দিয়াছি। অন্যান্য জেলায় আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাগণ যদি স্বেচ্ছায় ছাপাইয়া বিক্রয় করে ভাল। অন্যথায় যে কোন লোক বা পুস্তক ব্যবসায়ী ছাপাইয়া বিক্রয় করিতে চায় তাহাকে দেওয়া উচিৎ। ভালভাবে প্রচার না হইলে সংগঠন শক্তিশালী হইবে না। শান্তিপূর্ণভাবে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আওয়ামী লীগকে জোরদার না করিলে শুধু করাচী গিয়া তোয়াজ, তোষামোদ ফুলের মালা প্রদান করিয়া জাতীয় স্বার্থ উদ্ধার হইবে না। দুনিয়ায় ইতিহাসে কোথাও দেখা যায় নাই দরখাস্ত দিয়া হুজুর বিনীত প্রার্থনা করিয়া গণতন্ত্র কায়েম করা সম্ভব হইয়াছে।

মোঃ আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

কলিকাতা

১৭/৪/৫৫

প্রিয় অলি আহাদ

আমার দোয়া জানিও। শুধু বড় বড় নেতার কথাই শুনিওনা আমার মত বোকা লোকের কথায়ও কর্ণপাত করিও। ভাঙ্গা কূলা কাজে লাগে ছাই ফেলিবার সময়। আমার ২১ দফাগুলি অন্ততঃ সাপ্তাহিক এত্তেফাকে, সংবাদে ছাপাইতে চেষ্টা করিও। মাছ যে রকম পানিতে মিশিয়া থাকে সেইভাবে জনসাধারণের মধ্যে সেইভাবে নেতা ও কর্মীদিগকে গ্রামে গিয়া কাজ করিতে হইবে। শুধু ঢাকায় বসিয়া কাজ হইবে না। ১১ই ও ১২ই কাউন্সিল সভা অবশ্যই ডাকিবে। প্রতিষ্ঠানকে অসাম্প্রদায়িক অবশ্যই করিতে হইবে সর্বতঃভাবে চেষ্টা করিবে। সমস্ত জেলা মহকুমার কাজ জোর দিয়া আরম্ভ করিবে। আমার নিজের কাজ যদি পার তা হইলে পাঁচবিবিতে লোক পাঠাইয়া আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদিগকে ৫/৬ দিনের জন্য কলিকাতা পাঠাইবে। ইয়ার মোহাম্মদ খানকে বলিবে আমার বিবৃতি ও ২১ দফা বার বার সাপ্তাহিক এত্তেফাকে ছাপাইতে। অন্যথা কারণে দুঃখিত হইব।

মোঃ আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

বীরনগর পাঁচবিবি

বগুড়া

১৩/৫/৫৫

প্রিয় অলি আহাদ,

মজিবর ও সেরাজকে পত্র দিয়াছি তোমাকে জানাইতে ২২শে মে হইতে ৩০শে মে পর্যন্ত ২১ দফা পালন করিতে সমস্ত জেলা, মহাকুমা ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ অফিসকে জরুরী নির্দেশ দিবে এবং সভা, শোভাযাত্রা, ২১ দফা বই বিতরণ, রাজবন্দীদের মুক্তি চাই, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, জমিদারী প্রথা বিনা খেসারতে উঠাইয়া চাষীদের মধ্যে জমি বিতরণ চাই, সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল চাই, উচ্চপদের কর্মচারীদের বেতন কমাইয়া গরীব কর্মচারী ও শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি চাই, পূর্ব পাকিস্তানে লাহোর প্রস্তাবানুযায়ী স্বায়ত্তশাসন চাই ইত্যাদি শ্লোগানে সারা পূর্ব পাকিস্তানে আওয়াজ তুলিতে হইবে। ছাত্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে সমর্থন ও বিবৃতি দেওয়াইবে আমার নামে ও তোমরা বিভিন্ন নামে প্রত্যেক দিন বিবৃতি দিবে।

–মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

সমস্ত আওয়ামী লীগ অফিসে সার্কুলার নোটিশ দিবে কলেরা, বসন্ত রোগে কত মারা গিয়াছে এবং কত গ্রাম আক্রান্ত হইয়াছে তাহার বিবরণ পাঠাইতে।

–ভাসানী
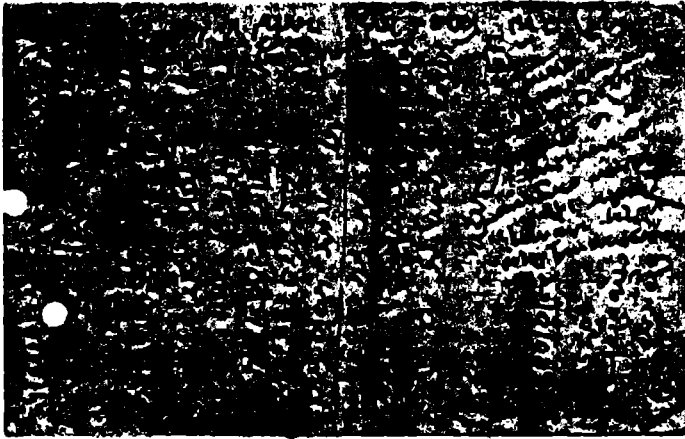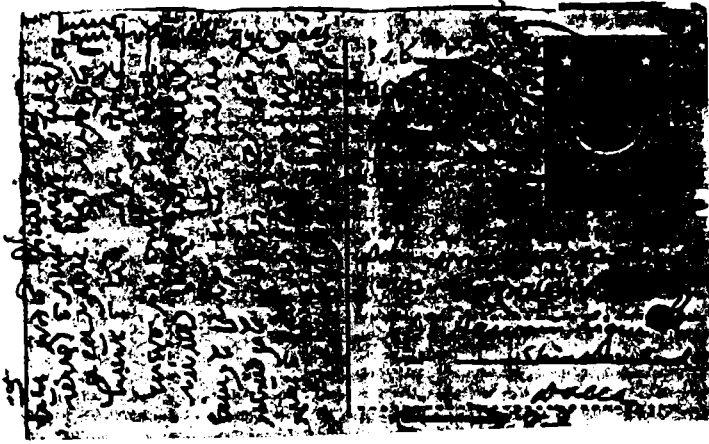
কাগমারী

২৯/১২/৫৫

প্রিয় অলি আহাদ, আবদুল হাই ও

অন্যান্য আওয়ামী লীগের কর্মীগণ,

আমার এই পত্রখানা তার মনে করিয়া সারা পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন মিশ্র নির্বাচন উপলক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহ করিবার জন্য আমার নামে তোমাদের নামে প্রত্যেক জেলা, মহকুমা, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের নামে বিভিন্ন জেলা হইতে স্বাক্ষর সংগ্রহ করিবার জন্য অভিযান চালাইবার ব্যবস্থা করিবে। সারাদেশ হইতে স্বায়ত্তশাসন এবং মিশ্র নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন নামের পত্র সংবাদপত্রে ছাপাইতে ব্যবস্থা করিবে। আগামী ৬ই জানুয়ারী (১৯৫৬) প্রতিবাদ দিবস সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য ভালভাবে পারলে মিটিং দিবার ব্যবস্থা করিবে।

সাড়ে চারি কোটি বাংগালীর জীবনমরণ সমস্যার সময় আওয়ামী লীগের সকল রকম চেষ্টা করিতে হইবে। আমি এই অনুরোধ বহু পূর্বেই করিয়াছিলাম। তোমরা কর্ণপাত কর নাই, এখন শেষ সময় যদি আমার উপদেশ শুনা উচিত মনে কর তাহা হইলে সকল রকমের অসুবিধার ভিতরেও এই কাজ অবশ্যই করিবে।

মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

২৯/১২/৫৫

প্রিয় অলি আহাদ

বাবুকে শাসাইয়া ভর্তি করিয়া দিবে এবং ভালভাবে পড়াশুনা না করিলে বাবুর সহিত আমার কোন সংশ্রব থাকিবে না ইহা বলিয়া দিবে। মিথ্যা বলা ও ফাকী দেওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করিতে বলিবে। বাহুল্য পয়সা খরচ করিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিবে। আমার হাতে মোটেই পয়সা নাই মজিবর যদি দেয় এবং মহিবুচ্ছামাদের নিকট হইতে কিছু টাকা লইয়া সত্বর কাগমারীতে পৌছাইবে– কর্মীদের খাওয়ার ব্যবস্থা না করিলে চলিবে না।

মোঃ আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

প্রিয় অলি আহাদ,

গত রাত্রি হইতে হঠাৎ রক্তের চাপ অত্যধিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এরূপ অবস্থা আর কখনও হয় নাই। গত রাত্রি ভয়ানক কষ্টে গিয়াছে। অদ্যই যমুনা নদীতে যাইতেছি।

আমার এখানকার কাজকর্ম মোয়াজ্জেম কিভাবে করে তাহা তোমাকে বলিতে চাই না। তোমরা ভালভাবে জান যে একটা কাজের জন্য মাহমুদ আলীর নিকট যাইতেছে, তাহার সহিত জানাশুনা নাই। তুমি নিজ দায়িত্বে কাজ নিজের মনে করিয়া মাহমুদ আলীর দ্বারা করা সম্ভব হইলে করিবে। মোয়াজ্জেম কোন ফেভার পাই নাই। আওয়ামী লীগের জন্যই সে যাইতেছে। এখানকার আওয়ামী লীগারদের দ্বারা কোন কাজ হয় নাই, হইবেও না। আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া দেখিও তাহার কাজটা যাহাতে হয়।

আগামী ২৬শে মার্চ হইতে হয়ত অনশন আরম্ভ করিব। আল্লাহ্ হাফেজ।

প্রেস টেলিগ্রাম দিয়াছি। তাং ধার্য্য হয় নাই। এক ইউনিট সম্বন্ধে ২টি বিবৃতি সত্বর দিও। কিন্তু প্রস্তুত করিও জনগণের দাবী আদায়ের জন্য।

মোঃ আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

উপনির্বাচনে এলাকায় যাওয়া সম্ভব নহে জানাইয়া দিও।

—ভাসানী

ময়মনসিংহ

২০/২/১৯৫৭

প্রিয় অলি আহাদ, তাজউদ্দিন আহমদ ও

ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্য সাহেবান,

অদ্য আমি ময়মনসিংহ হইতে নালিতাবাড়ী মিটিং-এ খোদা করেন রওনা হইব। তথা হইতে আগামীকল্য ফিরিব। পরশু জ্বর উঠিয়াছিল গতকল্য জ্বর আসে নাই। আল্লা ভরসা তোমরা আগামী ওয়ার্কিং কমিটিতে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টিকে নির্দেশ দিবে। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সুপারিশ করতঃ প্রস্তাব আনয়ন করা বিশেষ জরুরী কাজ জানিবে। অপজিশন হইতে প্রস্তাব আসিবে আমাদের পক্ষ হইতে প্রস্তাবের নোটিশ না দিলে বা আনয়ন না করিলে জনসাধারণের নিকট মুখ দেখানো যাইবে না। অপজিশনের প্রস্তাবে বাধ্য হইয়া ভোট দিতে হইবে, বিশেষ জরুরী কাজ মনে করিতে প্রত্যেক মেম্বরকে আমার পক্ষ হইতে অনুরোধ করিবে। রাষ্ট্রভাষার দাবীতে নাজিমউদ্দিন সাহেব প্রস্তাব আনিয়া পূর্ব-পাক এসেমব্লিতে পাস করাইয়াছিল। নুরুল আমিন মন্ত্রী সভা পূর্বপাকের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করিয়া প্রস্তাব পাস করাইয়াছিলেন। এই সময় এবং আগামী নির্বাচনের পূর্বে জরুরী প্রস্তাব পাস না করাইলে আওয়ামী লীগের পক্ষে নেহায়েত ভুল হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের লিডারের নিকটও অনুরোধ জানইবে, উভয় পাকিস্তানের সংহতি কায়েম করিবার জন্য পার্টি মির্টিং-এ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী পেশ করিতে। কাগমারী মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ খোলার পারমিশন চাহিয়া সত্বর দরখাস্ত ইউনিভার্সিটি বরাবর দিবে এবং অল্প দিনের মধ্যে যাহাতে অনুমতি পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা অবশ্যই করিবে। কলেজের জন্য বিভিন্ন সাবজেক্টে পড়াইতে উপযুক্ত ও আদর্শবাদী জন প্রফেসর সংগ্রহ করিতে তোমরা সকলে চেষ্টা করিবে। ভুলিয়া যাইও না, আমার দোয়া ও সালাম জানিও। আমার শরীর খুব দুর্বল। তাই মিটিং-এ উপস্থিত হইতে পারিব না।

– আব্দুল হামিদ খান

অলি আহাদ, তাজউদ্দিন,

৫৬ নং সিম্পসন রোড, আওয়ামী লীগ অফিস

Dated 26/7/1957

প্রিয় অলি আহাদ

আমার প্রেরিত ২১ দফা যাহা আমেনার কাছে আছে সংবাদে সাপ্তাহিক এত্তেফাকে ছাপাইবে। বুকলেট করিয়া ছাপাইতে পারিলে তাহাও ছাপাইয়া বিতরণ করিবে। অন্যথা না হয়। মজিবরকে পত্র দিয়াছি। ১১ই ১২ই জুন অবশ্যই পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভা ডাকিবে অন্যথা না হয়। করাচীর লোভ একবারে ত্যাগ না করিলে আওয়ামী লীগ বাঁচিবে না। করাচী কিছুই করিবে না। আমি করাচীর আশা কোনদিন করি নাই। আল্লার মর্জি কখনও করিব না। তোমরা মিটিং না ডাকিলে আমি নিজেই ডাকিব। এইবার আমার কথানুযায়ী মিটিং না ডাকিলে ও কাজ না করিলে তোমাদের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইব। করাচীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এবং মন্ত্রী হইবার লোভে আওয়ামী লীগ ধ্বংশ হইল। আর ধ্বংশ হইতে দিতে পারি না।

মোঃ আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

প্রিয় অলি আহাদ

আজ পর্যন্ত কাউন্সিলারদের নোটিশ সর্বত্র পৌছে নাই। ময়মনসিংহ আসে নাই। সত্বর পাঠাইবে। আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র মেম্বরদিগের রশিদ যত বেশী সম্ভব ছাপাইয়া কাউন্সিল মিটিং এর এক সপ্তাহ পূর্বে সব আমার নিকট পাঠাইবে অন্যথা করিও না। যদি পয়সার অভাবে ছাপাইতে না পার গঠনতন্ত্রের একখানা কপি পাঠাইয়া দিবে। আমি টাঙ্গাইল হইতে কোন প্রকারে বাকী করিয়া ছাপাইয়া লইব। রশিদ বহি যত বেশী পার ছাপাইয়া আনিবে। কাউন্সিল ও কালচারাল কনফারেন্সের প্রচার খুব কম হইতেছে। ভালভাবে প্রচার করিবে। আবু জাফরকে আমার সহিত এড্রেসের নকল সহ সত্বর সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইবে। সমস্ত প্রদেশের প্রচার ভালভাবে করিবে। কাউন্সিলের নোটিশ পাঠাইতে বিলম্ব করিলে ভয়ানক অসুবিধা হইবে। আওয়ামী লীগের– ১লা ফেব্রুয়ারী কাগমারীতে লইয়া উপস্থিত হইবে। অন্যথা না হয়। ছামাদকে সত্বর পাঠাইবে। শ্রমিকদের অবস্থা ও প্রতিকারের রিপোর্ট ছাপাইতে বলিবে।

মোঃ আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

D. O. No.

Rofique Uddin Bhuian,
Chairman.

DISTRICT BOARD
MYMENSINGH

Dated ____________ 195

প্রিয় অলি আহাদ

আজ কয়েকদিন যাবৎ অনবরত বৃষ্টি ও তুফান হওয়ায় সিরাজগঞ্জ, পূর্ব বগুড়ায় যাওয়া মোটেই সম্ভব হইতেছে না। এখানে অনেকদিন অনুপস্থিত থাকায় প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম বন্ধ হইয়াছে। আমার শরীর খুব দুর্বল। আল্লাহ জানেন, শরীর ভালো হইবে কতদিনে। আওয়ামী লীগের কাজ তোমরা মনোযোগ দিয়া করিও, আমাকে বোদহয় ৬ মাসের জন্য সভাপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম লইতে হইবে এবং শেষ জীবনের প্রতিষ্ঠান গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। এখানে কাজকর্ম করিবার লোক মোটেই নাই এবং যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন, দেশের আর্থিক অবস্থা ভয়ানক খারাপ, স্থানীয় লোকের পক্ষে কোনপ্রকার সাহায্য করা সম্ভব নহে। শরীর ভালো হইলে দুই মাসের জন্য আসামে যাইবার আশা আছে। তুমি আমার জন্য যে ভাবেই পার ১০টি লিচুর কলম, ১০টি আমের কলম এবং সোফেদার কলম ৫টা, ভালো লেবুর কলম ৫টা পাঠাইলে যারপরনাই উপকৃত হইব। ঢাকা হইতে হাতেম অথবা রফিক ভূঁইয়ার নিকট ময়মনসিংহ ঠিকানায় পাঠাইলে তাহারা জি টি কোং মোটরে টাংগাইলে পাঠাইয়া দিবে। পাঠাইবার সময় লিখিয়া দিতে হইবে যে, চারাগুলি যেন কাগমারীতে পৌছাইয়া দিতে জি, টি, কোং ড্রাইভারকে বলে। আন্দোলনের গতি বারবার ভাটা ফেলিয়া হতাশার ভাব আর কতকাল থাকিবে জানি না। সারা দেশময় ভূখা মিছিল, সভা সমিতি নতুন উদ্যমে যখন চলিতেছিল তখন হঠাৎ তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ১৪৪ ধারা ব্রেক করিবার মত সাহসী ২/৪ শত কর্মী– নেতা যে অর্গানাইজেশনে নাই তাহার দ্বারা ভবিষ্যতের আশা বৃথা। এখন বুঝিতেছি সকলেই কেবল গদির জন্যই ব্যস্ত।

খোদা হাফেজ

মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী

আমাদের ট্রেজারারকে বলিলে কিছু আনারসের চারা আনিয়া দিবে। কৃষি কর্ম করিতে অনেক কিছু লাগে, বিরক্ত হইবা না। বহু কৃষককে শিক্ষা দেওয়া যাইবে। গঠনমূলক কাজও করা দরকার।

– ভাসানী

ভালো আনারসের চারা সামাদকে বলিলেও সিলেট হইতে আনিয়া দিবে। ঢাকায় যাহা পাওয়া যায় তাহাই দিবে।

Narayanganj City Awami League
President—A.K.M. Shamsuzzoha
Secretary—Nurul Islam Mullick

Office ....
NARAYANGANJ
Date ....

প্রিয়,

আতাউর রহমান খাঁন, মজিবুর রহমান

উপ নির্বাচনের সমস্যা বড় জটিল হইল। এই নির্বাচনে সীট হারাইলে যারপরনাই ক্ষতি হইবে। অতএব সত্ত্বর মহকুমা আওয়ামী লীগের কর্ম-কর্তাগণকে জানাইবেন সংবাদপত্রে নোটিশ ও তার দিয়া নমিনেশন পেপার পুঃ পাক আওয়ামী লীগ অফিসে পাঠাইতে মহকুমা আওয়ামী লীগ সোপারেশ করিয়া জেলা আওয়ামী লীগের জরিয়তে পুঃ আওয়ামী লীগ অফিসে পাঠাইবে। মজিবর, ইয়ার মোহাম্মদ, অলি আহাদ এই তিনজন বাই ইলেকশনের এলাকায় সর্ট টাইমের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া জনমত লইবে জনপ্রিয় প্রার্থী হওয়া একান্ত আবশ্যক। ২৫০, টাকা অথবা যাহা তোমরা সঙ্গত মনে কর সেই পরিমাণ টাকা জমা দিতে বলিবে গোপালগঞ্জে হিন্দু প্রার্থী ঠিক করিবে। ইলেকশনের প্রোপাগাণ্ডা ইত্যাদি কাজের জন্য ২/৩টি কমিটি করিবে। আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং ডাকিবে। ইলেকশনের বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিবে। অবহেলা করিবে না। সিট হারাইলে অনুতাপ করিতে হইবে– আল্লার উপর ভরসা করিয়া সর্বোতভাবে চেষ্টা করিবে। সহিদ সাহেবকে তার করিয়া জানাইবে। যাহা কিছু করা দরকার সমস্তই করিবে অঙ্গিকার পত্র ছাপাইবে।

মোঃ আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

৩০/৪/৫৬

প্রিয় অলি আহাদ   ৩১-১২-৫৭

তোমার নিকট বারবার পত্র লিখিয়াও কোন উত্তর পাই নাই। তুমি আমার নেহায়েত ভক্ত থাকা সত্ত্বেও কেন বিরূপ হইলে জানিনা। খোদা হাফেজ। মফিজুল ইসলাম খুব ভাল প্রার্থী। কিন্তু অর্থ এবং সমস্ত ন্যাপ প্রতিষ্ঠানের শক্তি একযোগে ঝাঁপাইয়া পড়ে তাহা হইলে আমি তিন চারিটা মিটিং করিয়া দিব। আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়া যতদূর করা সম্ভব করিব। কিন্তু সমস্ত প্রদেশের শক্তি ব্যতীত কিছু সম্ভব হইবে না। খুব ভালভাবে চিন্তা করিয়া কাজ করিবে। এখানে আসিলে সুখী হইব।

–ভাসানী

THE
ITTEFAQ
PREMIER BENGALI DAILY

GOVERNOR
EAST BENGAL

৭৮৬

GOVERNMENT HOUSE
DACCA.

জনাব মওলানা সাহেব -

আচ্ছালামু আলায়কুম বাদ আরজ এই আপনার সাথে আমার অতি জরুরী কথা আছে। পূর্ব্ব বাংলার স্বার্থের দিক হইতে আপনার ও আমার সাক্ষাৎকার অদ্যই অত্যাবশ্যক এতদার্থে পত্র বাহককে আপনার খেদমতে পাঠাইলাম। আমার অনুরোধ আপনি পত্র পাঠ পত্র বাহকের সংগে অদ্যই ঢাকায় তশরিফ আনিবেন। আশা করি আপনি কুশলেই আছেন। ইতি

আপনার

A.K. Fazlul Huq

এ. কে. ফজলুল হক

বরাবর মওলানা
আবদুল হামিদ খাঁন ভাসানী
কাগমারি টাঙ্গাইল
ময়মনসিংহ।

জনাব মাওলানা সাহেব,

তসলিম বাদ আরজ– আশা করি শারীরিক কুশলে আছেন। আব্দুর রহমান ও হামিদ, হক সাহেবের পত্র নিয়া আপনার খেদমতে যাইতেছে। আমার সঙ্গে হক সাহেবের আলোচনা হয়েছে। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় আপনার এখানে তশরিফ আনা অত্যাবশ্যক।

আমরা আগ্রহের সহিত আপনার এন্তেজার করিতেছি।

ইতি,

আরজ গোজার

আবুল মনসুর আহমদ

Phone : 2897

9, Hatkhola Road

DACCA, (East Pakistan).

Dated 20/8/1953

[illegible]

Basanta Kumar Das, M.L.A., M.P.

Supreme ADVOCATE

FEDERAL COURT OF PAKISTAN

&

DACCA HIGH COURT

(৭)

Date 7/8/56

[illegible]

Karachi City Awami League

গভর্নর শাসন প্রবর্তনের পর আত্মগোপন করি। কুমিল্লায় আত্মগোপন থাকাকালে জনাব আতাউর রহমান খান নিম্নোক্ত চিঠি লিখেন :

আতাউর রহমান খান, এডভোকেট
সদস্য, পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ

ফোন নং ৩৯৮৪
২৫, সোয়ারীঘাট, ঢাকা
তারিখ ঃ ১৯-৯-৫৪

প্রিয় অলি আহাদ

আমরা ভয়ংকর বৈরী পরিস্থিতির শিকারে পরিণত হইয়াছি এবং আল্লাহই কেবল জানেন, এই জটিলতা হইতে আমরা কখন মুক্ত হইব। আমাদের কর্মীরা যে নির্যাতন স্বীকার করিতেছে তাহা আমাদের সংগঠনের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করিয়াছে। কেবল নির্যাতনের মাধ্যমেই আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করিতে এবং ইপ্সিত আদর্শ বাস্তবায়ন করিতে পারিব। তোমার নাম লিষ্টে আছে কিনা বলিতে পারিব না। কারণ আমি গেজেট দেখিতে পারি নাই। আগামীকাল দেখিয়া নিব।

সহসা পার্লামেন্টারী সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে না, অন্ততঃ শহীদ সাহেবের ফিরা পর্যন্ত নয়। ইহার জন্য আমরা কঠিন প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছি।

যদি তোমার নাম লিষ্টে দেখি তাহা হইলে আমার উপদেশ হইবে আত্মসমর্পণ করা।

অন্যরা সব ভাল। স্নেহ এবং তোমাকে প্রয়োজনীয় সাহস প্রদানের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনাসহ

তোমারই
স্বাক্ষর/ আতাউর রহমান

তারিখ ঃ ১-১০-৫৪

প্রিয় আহাদ,

তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। ইহা দুর্ভাগ্যজনক যে, আমরা তোমার সম্পর্কে প্রকৃত পরিস্থিতি নিরূপণ করিতে পারি নাই। হয়ত শুনিয়াছ যে, কে এম মোশতাক তাহার গ্রামের বাড়ী হইতে গ্রেফতার হইয়াছে। সে এখানে নিরাপদ ছিল এবং ঢাকার বাহিরে না গেলে নিরাপদই থাকিত। এম এ সামাদও উদ্বেগের মধ্যে আছে। আগামী দিনে কি আসিতেছে সেটা অজানা।

আমি মাওলানা সাহেবকে (মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী) ফিরিয়া আসার জন্য অনুরোধ করিয়াছি– পরিণতি যাহাই হউক। এ সময়ে তাহার বাহিরে থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

জি, জি-এর (গভর্নর জেনারেল) ক্ষমতাকে দারুণভাবে খর্ব করা হইয়াছে। ফলে গণপরিষদ এখন সব অবৈধ আইনকে বৈধ করিতে পারিবে এবং গণতন্ত্রের নামে সবরকম অগণতান্ত্রিক কাজ করিতে পারিবে। সুতরাং তুমি আমাদের প্রিয় পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আঁচ করিতে পার।

আমি মানকীর শরীফের পীর সাহেবের সিদ্ধান্তকে কোন গুরুত্ব দেই না। তবে শুনিতেছি তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিয়াছেন।

বর্তমান পরিস্তিতি বুঝার জন্য মানিক মিয়া ও রফিক করাচী গিয়াছেন।

আমাদেরকে অপেক্ষা করিতে হইবে, দেখা যাক কি হয়।

সবার প্রতি শুভেচ্ছাসহ

তোমারই

স্বাক্ষর/ আতাউর রহমান খান।

গ্রন্থাকারের নিকট করাচী হইতে শেখ মুজিবের চিঠি :

(বঙ্গানুবাদ)

৭, সমারসেট হাউস
করাচী
৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৫৬

প্রিয় অলি আহাদ,

তোমার চিঠি পাইয়াছি। আমি জানি, ওয়ার্কিং কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠানের জন্য তুমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। আমরা এখনও সংবিধানের খসড়া পাই নাই যদিও জানা গিয়াছে যে, কোয়ালিশন পার্টি মোটামুটি একটি ফর্মূলায় সম্মত হইয়াছে; ইহাও জানা গিয়াছে যে, ইউ.এফ (যুক্তফ্রন্ট) পূর্ববঙ্গের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। খসড়াটি পাইলে হয় আমি ইহা নিয়া আসিব আর যদি না আসিতে পারি তাহা হইলে তোমার কাছে পাঠাইয়া দিব এবং ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহবান করিবার জন্য তোমাকে অথারাইজ করিব। গণপরিষদে আমরা কি অবস্থান (স্ট্যান্ড) নিব সে ব্যাপারে ফিরিয়া আসিয়া তোমার ও মাওলানা সাহেবের সহিত আলোচনা করিবার জন্য আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। সম্ভবতঃ তুমি ৮ শত টাকা পাইয়াছ। আমি আওয়ামী লীগের জন্য আরও টাকা যোগাড় করিবার চেষ্টা করিতেছি। দয়া করিয়া পূর্ববঙ্গের অবস্থা এবং জেলে আটক আমাদের কর্মী সম্পর্কে আমাকে জানাইবে। জনাব আবদুস সামাদ ও আমাদের অন্যান্য কর্মীদের মুক্তির ব্যাপারে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিবে। আমি জানি, তুমি অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করিতেছ। কারণ তোমার কাজের ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য সহযোগিতা করিবার মতো লোক খুব কম। দয়া করিয়া মহকুমা কমিটিগুলির সাথে যোগাযোগ করিবার চেষ্টা করিবে এবং আমাকে তোমার অসুবিধা সম্পর্কে জানাইবে।

হাই কোথায়? তাহাকে আমার কাছে চিঠি লিখিতে বলিবে এবং তাহার বাড়ীর ঠিকানা দিবে। তার স্ত্রী কোথায়? তোমাকে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে একটু অনুরোধ করিতে চাই। আমার ছেলে কামাল উদ্দীনকে সেন্ট জেভিয়ার্স কনভেন্ট স্কুলে এবং মেয়েকে (হাসিনা) কামরুন্নেছা গার্লস স্কুল অথবা বাংলাবাজার স্কুলে ভর্তি করাইবার জন্য দয়া করিয়া চেষ্টা করিবা। তাহাদের জন্য একজন ভাল শিক্ষক যোগাড় করিবার চেষ্টা করিবা। সব সময়েই তোমার ভাবীর সহিত যোগাযোগ রাখিবার চেষ্টা করিবা। সেও খুব নিঃসঙ্গ বোধ করিতেছে। আমি ভাল। আমার কাছে চিঠি দিও।

তোমারই
স্বাক্ষর/ মুজিব ভাই

7, Somerset House,
KARACHI.
4th January, 1956.

My dear Oli Ahad,

Received your kind note. I know that you are very anxious about a meeting of the Working Committee. We have not yet got the draft of the Constitution although it has been learnt that the coalition party has agreed to some formula and also the U.F. have betrayed the case of East Bengal. When I get the draft, either I will come with it or I will send it to you and authorise you to call the meeting of the Working Committee if I fail to come. I am very anxious to be back and to discuss with you and the Maulana Saheb about our stand in the Constituent Assembly. Perhaps you must have received the Rs 800/- and I am still trying to get some more money for the Awami League. Please inform me about the position in East Bengal and about our workers who are in jail. Please try to meet the East Bengal Chief Minister in connection with the release of Mr. Abdus Samad and other workers of ours. I know that you are feeling lonely because very few are there to help you and co-operate with you as far as your work is concerned. Please try to contact the sub-divisional committees and write to me of your difficulties.

Where is Hai ? Please tell him to write a letter to me and give his home address and where is his wife ?

May I request you to do something for me - for my personal matters. Try to get admission for my son, Kamaluddin, in St. Xavier's Convent and for my ~~xxxxxxx~~ daughter in the Qamrunneesa Girls' High School or in the Bangla Bazar school.

Also try to get a good tutor for them and always try to keep contact with your Bhabi who, too, is feeling lonely.

I am O.K. Please write to me.

Yours sincerely,

Mujib

(বঙ্গানুবাদ)

সমারসেট হাউস
করাচী
২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬

প্রিয় অলি আহাদ,

তোমার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আশা করি, গণপরিষদ হইতে আমাদের 'ওয়াক আউট'-এর পর ২রা মার্চ ঢাকায় ফিরিব।

তোমার অসুবিধা সম্পর্কে আমি পুরাপুরি জানি ও অনুভব করি। আমাদের সংগঠনের কিছু টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য আমি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিতেছি।

৩রা ও ৪ঠা মার্চের প্রস্তাবিত সভা তুমি বাতিল করিয়াছ জানিয়া আমি খুশী হইয়াছি। কারণ তুমি জান যথাযথ প্রস্তুতি ছাড়া এমন একটি বিরাট সভা অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। অবশ্যই একটি কাউন্সিল সভা করা আমাদের দরকার। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির পরই আমরা সভার সময় ও তারিখ ঘোষণা করিব।

তুমি আমাদের সংগঠনের জন্য অত্যন্ত উদ্যমের সাথে ও নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিতেছ জানিয়া আমি অত্যন্ত সুখী। এখানে আমরা গণপরিষদে আমাদের সংগ্রামের ব্যাপারে ব্যস্ত। কারণ, আমরা জানি যে, আসন্ন সংগ্রামের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে। শহীদ সাহেব ছাড়া আমাদের পার্টি ভুক্ত সব সদস্যই সম্ভবতঃ ২রা ও ৩রা মার্চ অথবা কাছাকাছি সময়ে ঢাকায় পৌঁছিবে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় খবর তোমাকে দিব।

দয়া করিয়া মাওলানা সাহেবকে জানাইও যে, আমি তাঁহার টাকা নিয়া আসিতেছি। আমাদের সকল কর্মীর প্রতি রইল আমার প্রীতি ও সালাম। আশা করি তুমি ভাল আছ।

তোমারই

স্বাক্ষর/ মুজিব ভাই

Somerset House,
Karachi.
27th February, 1956.

My dear Oli Ahad,

Thanks for your letter. I expect to return to Dacca on March 2 after we walk out of the Constituent Assembly.

I fully well know and realise your difficulties, and I am earnestly trying to get some money for our Organisation.

I am very glad to hear that you have cancelled the proposed meeting on March 3 and 4 because, as you know, such a big meeting cannot be held without due and proper preparation. We require definitely to hold a council meeting and after making the necessary preparations, we will declarem the time and dates of the meeting.

I am very happy to know that your are working so zealously and selflessly for our Organisation. We, on our part, are very busy here for our fight in the Consembly, for, we know that we have to get ourselves ready for the forthcoming struggle. Almost all the members of our Party, except Shaheed Sahib, will very probably arrive in Dacca or March 2 or 3 or thereabouts I'll give you necessary information in this regard.

Please inform Maulana Sahib that I am arriving with his money .

My love and salaams to all our workers and the hope that you are well.

Yours affectionately,

[signature]

স্নেহের অলি আহাদ,

আমার ভালবাসা নিও। তোমার কোন খোঁজ খবর বহুদিন পাই না। শুনলাম তুমি কুমিল্লা কারাগারে বন্দী আছ। তোমার ভাবী তোমার জন্য খুব ব্যস্ত কারণ তোমার কোন্ খবর জানতে পারছে না। কেমন আছ এই খবরটি আমাদের দিলেই সুখী হব। শরীরের প্রতি যত্ন নিও। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে তোমার হতভাগা ভাইকে লেখতে ভুলিও না। অর্থ উপার্জনে ব্যস্ত আছি কারণ টাকার খুব প্রয়োজন। তোমার ভাবী প্রায় দুই মাস অসুস্থ ছিল, এখন একটু ভাল। চিন্তা করিও না খোদা সহায় আছেন। আমার হাইকোর্টের মামলা এখনও শেষ হয় নাই। বোধহয় শীঘ্রই হতে পারে। সকলকে ছালাম দিও।

ইতি

তোমার মুজিব ভাই

Kalkana - 6812/81 (First Prize)
Compet... - 450
Sheikh Mujibur Rahman
CENSORED
Dacca—2
Dated 24.4....1961
Superintendent,
Rajshahi Central Jail

Phone: 3221/134

THE EAST PAKISTAN AWAMI LEAGUE

[CENTRAL OFFICE]

56, Simpson Road,
Sadarghat,
DACCA
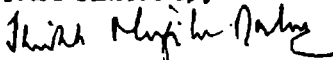
Dated the......8. 9.......195 8.

To

The President,
East Pakistan Awami League.

Sir,

With due respect I want to inform you that I can not continues as General Secretary of your organisation for my ill health.

I hope that you will treat this letter as my resignation, and/accept it as soon as possible otherwise the organi-sation will suffer.

to

Yours sincerely,

Sheikh Mujibur Rahman

(Sheikh Mujibur Rahman),
General Secretary,
E.P.A.L.

১৯৫৪ সালে শেরেবাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে পদচ্যুত করে পূর্ব পাকিস্তানে মেজর জেনারেল ইসকান্দার মীর্জার গভর্নর শাসন প্রবর্তন করে। তখন আত্মগোপন থাকাকালে গ্রন্থাকারের নিকট তাজউদ্দিন আহমদের চিঠি। চিঠিতে ছদ্মনাম ব্যবহৃত হইয়াছিল।

My dear Rahmat,

Received your letter this morning. I am really very sorry and plead guilty for not replying to your earlier note. But you may rest assured that we take interest in you though we have not been able as yet to do anything tangible for you. At my request Mr. A.R. Khan talked to the chief Secretary about your case, and at his own accord. Mr. Khan very often goes to the chief Secretary and speaks for he political prisoners in general and the Awami Leaguers in particular. He takes much interest in you and Mr. Toha. I was shown a letter of yours by Mr. Kamruddin, and your suggestion regarding the attitude of Awami League in respect of Nezam-e-Islam and Krishak Sramic parties has been brought to the notice of Mr. A. R. Khan who appreciated your view point in view of the grim realities. You might have noticed the latest composition of the Flood Relief Committee. We have done our best to see that undesirable elements do not get predominance, but at the same time the solidarity of the U.F. party must not be at a jeopardy, and at least from outside no rift in the U.F. Party can be detected by interested quaters both innocent well wishers and the zealous cavilers. Even your bad friends (I do'not use "enemy") feel the need of your presence in these days of great cataclysm.

It transpires from the talk of Mr. A. R. Khan and the authorities of the present East Bengal Govt, that the Govt. will take a lenient view in respect of the Awami Leaguers. But they will tighten their grip over the people belonging to other Organisations, namely, P.S.U.Y.L and G. Dal whome they take rightly or wrongly to be the follow travelers of the Communists. To your surprise you will learn that the Govt. Think that P.S.U. is the recruiting organ, the Y.L. is the elementary training phase and the G. Dal is the parliamentary front of the communist party. This is the analysis of the Home Department. Mr. Toha Awami Leaguer, but belongs to Y.L. also. Yar Mohd. Khan also falls into the same category. Therefore its is our common view that you should wait for sometime more till the eminent Govt. officials are convinced that there are more things in the heaven and earth than are reported by their over zealous promotion hunting worthless I. B. reporters. We hope better sense will soon dawn on the Govt. I realize your difficulty,

but we are destined or we rather chose, the travel through the thorny path. No sufferings of patriots have ever gone in vain and undaunted spirit and unadulterated patriotism always guide the lovers of humanity as a beacon light towards the cherished goal. No amount of afflictions can deter them from the path of truth.

Moulana Sb. writes letters and like you always proposes to rush headlong into the open without caring for the consequences. But Mr. Suhrawardy puts his rein, and advises him not to come before Mr. Suhrawardy gets here in Pakistan, We discussed about you and are of opinion that you also should await Mr. Suhrawardy's arrival. He had undergone a third operation a fortnight or so ago. He in recovering fast. I saw a letter to Messrs A. R. Khan and Kamruddin each written by him recently. Please be at rest and wait a bit further, you had always been a tower of strength and we are quite confident that you will be able to bear up all sufferings and privations manfully and never give way to despair.

Yours sincerely,

Sd/ Tarique

N.S. : No question of surrender at this stage can at all arise.

Sd/ Tarique

বঙ্গানুবাদ

প্রিয় রহমত,

আজ সকালে তোমার চিঠি পাইয়াছি। তোমার আগের চিঠির উত্তর দিতে না পারার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত এবং নিজের দোষ স্বীকার করিতেছি। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পার যে, আমরা তোমার ব্যাপারে সচেতন যদিও এখন পর্যন্ত কার্যকর কিছু করিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার অনুরোধে জনাব এ.আর খান (আতাউর রহমান খান) তোমার মামলার ব্যাপারে চীফ সেক্রেটারীর সাথে আলাপ করিয়াছেন। জনাব খান প্রায়ই চীফ সেক্রেটারীর কাছে যান এবং রাজবন্দীদের ব্যাপারে বিশেষ করিয়া আওয়ামী লীগ দলীয় রাজবন্দীদের সম্পর্কে আলাপ করেন। তিনি তোমার এবং জনাব তোয়াহার ব্যাপারে খুবই সক্রিয়/ উদ্যোগী। জনাব কমরুদ্দিন তোমার একটি চিঠি আমাকে দেখান এবং নেজামে ইসলাম ও কৃষক শ্রমিক পার্টি সম্পর্কিত তোমার মতামত জনাব আতাউর রহমান খানের দৃষ্টিগোচর করা হয়। জনাব খান রূঢ় বাস্তবতার আলোকে তোমার মতামত সঠিক মনে করেন। তুমি হয়ত বন্যা ত্রাণ কমিটির সর্বশেষ কমিটির সদস্যদের নাম দেখিয়াছ। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি যাহাতে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিবর্গ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিতে না পারে। সাথে সাথে ইহাও বিবেচনায় রাখিতে হইয়াছে যাহাতে যুক্তফ্রন্ট পার্টির সংহতি অটুট থাকে অন্তত যাহাতে বাহির হইতে সহজ-সরল শুভাকাংখীবৃন্দের কিংবা ঈর্ষাপরায়ণ শত্রুর চোখে যুক্তফ্রন্ট পার্টির কোন আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব যেন ধরা না পড়ে। তোমার খারাপ বন্ধুরা (আমি 'শত্রু' বলিব না) বতর্মান কঠিন বিপর্যয়ের দিনগুলিতে তোমার প্রয়োজন অনুভব করে।

পূর্ববঙ্গ সরকারের বর্তমান কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে জনাব আতাউর রহমান খানের আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়া বুঝা যায় যে, সরকার আওয়ামী লীগ সদস্যদের সম্পর্কে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করিবেন কিন্তু অন্যান্য দল যেম পি.এস.ইউ, ইয়ূথ লীগ এবং গণতন্ত্রী দলভুক্তদের উপর তাহাদের বজ্রমুষ্টি আরও দৃঢ় করিবে– যাহাদেরকে তাহারা ভুলবশতঃ অথবা সঠিকভাবেই কমিউনিস্টদের সহযাত্রী মনে করে। তুমি জানিয়া বিস্মিত হইবে যে, সরকার পি,এস.ইউকে কমিউনিস্ট পার্টির রিক্রুটিং শাখা, ইয়ূথ লীগকে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দানকারী প্রতিষ্ঠান এবং গণতন্ত্রী দলকে কমিউনিস্ট পার্টির পার্লামেন্টারী ফ্রন্ট হিসাবে বিবেচনা করে। ইহা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যা। জনাব তোয়াহা আওয়ামী লীগ দলের কিন্তু আবার ইয়ূথ লীগেরও সদস্য। জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খানও একই শ্রেণীভূক্ত। সুতরাং ইহা আমাদের অভিন্ন মত যে, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা কর যতক্ষণ পর্যন্ত না সর্বোচ্চ সরকারী কর্মকর্তারা ইহা অনুধাবন করিতে পারেন যে, তাহাদের পদোন্নতি শিকারী অকর্মন্য আই.বি রিপোর্টারদের রিপোর্টের বাহিরেও স্বর্গ মর্তে অনেক সত্য রহিয়াছে। আমরা আশা করিতেছি, শীঘ্রই সরকারের মনে শুভবুদ্ধির উদয় হইবে। আমি তোমার কষ্ট অনুভব করি কিন্তু কণ্টকাকীর্ণ পথ যাত্রা আমাদের নিয়তি এবং ইহা স্বেচ্ছায়ই আমরা বাছিয়া নিয়াছি। দেশপ্রেমিকদের কোন

ত্যাগই বৃথা যায় নাই, নির্ভীক চেতনা ও অবিমিশ্র দেশপ্রেম মানবতার পূজারীদের ইপ্সিত লক্ষ্যের পানে আলোকবর্তিকার মত পথ-নির্দেশ করে। কোন দুঃখ-বেদনাই তাহাদেরকে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করিতে পারে না।

মওলানা সাহেব (মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী) চিঠিপত্র লেখেন এবং তোমার মতই পরিণতির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়াই সরাসরি মাঠে অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষপাতি। জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁহার (মওলানার) রাশ ধরিয়া রাখিতেছেন এবং তিনি পাকিস্তানে না আসা পর্যন্ত মওলানা সাহেবকে না আসার পরামর্শ দিতেছেন। আমরা তোমার ব্যাপারে আলোচনা করিয়াছি এবং ইহা আমাদের মত যে, সোহরাওয়ার্দী না আসা পর্যন্ত তোমার অপেক্ষা করা উচিত। প্রায় এক পক্ষকাল আগে তাঁহার তৃতীয় অপারেশন হইয়াছে। তিনি দ্রুত আরগ্যলাভ করিতেছেন। জনাব এ.আর. খান ও জনাব কমরুদ্দীন-এর নিকট তাঁহার সম্প্রতি লিখা আলাদা আলাদা চিঠি আমি দেখিয়াছি। দয়া করিয়া কিছুদিন স্থির থাক এবং আরও কয়দিন অপেক্ষা কর। তুমি আগাগোড়াই সাহসিকতার একটি স্তম্ভ এবং আমরা নিশ্চিত যে, তুমি পুরুষের মত সকল নির্যাতন ও বঞ্চনা সহ্য করিতে পারিবে এবং কখনই হতাশাগ্রস্ত হইবে না।

তোমার বিশ্বস্ত

স্বাক্ষর/- তারিক

পুনশ্চঃ বর্তমান পর্যায়ে আত্মসমর্পণের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

স্বাক্ষর/- তারিক

প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা জনাব আব্দুল হক আত্মগোপন অবস্থায় অবৈধ সেনাপতি শাসক জালেম আইউব খানের আমলে কারামুক্তির পর ১১ই ডিসেম্বর ১৯৬২ইং তারিখে আমার নিকট লিখা চিঠিটা মুদ্রিত হইল :

(৮)

Bhai

[illegible]

সাহাজাদপুর

১/১০/৫৬

প্রিয় আহাদ সাহেব,

সালাম জানবেন। দেশের অবস্থা যেন আয়ত্বের বাইরে। মানুষ ধুকে ধুকে মরতে বসেছে। তাদের এ অবস্থা আমরাও মনে হয় তাদের বাঁচাতে পারবো না। মানুষের হাতে পয়সা বলতে নেই। রিলিফ ও কন্ট্রোলের জিনিস শতকরা ২৫ জনের বেশী পায় না। এর মধ্যেও শতকরা ৫০ ভাগ চলে যায় মাতব্বর-মেম্বারদের নিজেদের আত্মীয় ও পেয়ারের লোকদের জন্য। গরীব লোকদের যারাও কন্ট্রোলের ধান চাল পাচ্ছে তারা এগুলি কেনার পয়সা জোগাড় করতে পারছে না।

বাজারে ধান চালের দাম যথাক্রমে ২৪ টাকা ও ৪৫ টাকা এ এক কল্পনাতীত অবস্থা। মানুষ রবি শস্যের বীজ খেয়ে ফেলেছিল। এখন বীজের দাম চড়েছে মণকে ৪০ টাকা। গরীব কৃষকেরা পেট বাঁচাবে না বীজ কিনবে? মাঠকে মাঠ বীজের অভাবে শূন্য পড়ে আছে। এতে অবস্থা আরও জটিল আকার ধারণ করেছে। আর আমলাতন্ত্রতো প্রকাশ্যেই আমাদের কুৎসা রটনা করে বেড়াচ্ছে। তারা এ ৯ বৎসর যে ব্যাভিচারের আস্বাদন পেয়েছিল তা থেকে তাদের বঞ্চিত করে কার সাধ্য? আশ্চর্য। এগুলি চিন্তা করছেন কি? আমাদের সংগঠন এ সকল জটিল প্রশ্নের কি জবাব দেয়?

৬ই অক্টোবর ঈশ্বরদী থানা আওয়ামী লীগ কন্‌ফারেন্স হচ্ছে সাহাপুর গ্রামে। ৭ই অক্টোবর হচ্ছে সাহজাদপুর থানা আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলন সাহজাদপুরে। এই দুটো কন্‌ফারেন্সেই আপনাকে আসতে হবে। মওলানা সাহেব কথা দিয়েছেন তিনি উভয় সম্মেলনেই উপস্থিত থাকবেন। তিনি না আসলে কিন্তু মহা বেইজ্জত হবে। তাঁকে সঙ্গে আনবেন। অন্ততঃ একবার স্মরণ করিয়ে দেবেন।

কাগজে দেখলাম আপনি ঈশ্বরদী থানা কন্‌ফারেন্সে আসছেন। সাহজাদপুরেও আসতে হবে।

সংগঠন সম্পর্কে আরও কিছু আলোচনার আছে, তা সাক্ষাতেই হবে।

জহুর ভাইকে ও ভাইদের সালাম জানাবেন।

ইতি

আব্দুল মতিন

পুনঃ 5th Oct ঈশ্বরদীতে পাবনা জেলা Food Conference হচ্ছে। আপনি উপস্থিত থাকলে ভাল হয়। কতকগুলি কাগজে একটু কষ্ট করে খবরগুলি পাঠিয়ে তাড়াতাড়ি ছাপাবার ব্যবস্থা করবেন।

ইতি– মতিন

গ্রন্থাকারের নিকট বগুড়া জেল হইতে নিরাপত্তা রাজবন্দী, বগুড়া জেলা যুবলীগের প্রেসিডেন্ট ছমিরউদ্দিন আহমদের চিঠি :

বগুড়া জেল

১২/৪/৫৬

প্রিয় বড় ভাই,

আমার ছালাম জানবেন, পর ইত্তেফাকে প্রথম দিন বন্ধুবর ইমাদুল্যার অবস্থা আশংকাজনক সংবাদ পেয়ে মনে সন্দেহ জেগেছিল। তার পরের সংবাদ পড়ে অত্যন্ত ব্যথিত হলাম। বন্ধুবর ইমাদুল্যাকে আর আমরা আমাদের মধ্যে দেখতে পাব না। আপনে ও তার নিকটতম বন্ধু বান্ধবদের মত তার অকাল মৃত্যুতে আমিও আঘাত পেলাম এবং একজন বন্ধু হারালাম। আপনার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত যুবলীগ ইমাদুল্যাকে জড়িয়ে আছে। '৫২ সাল হতে আপনার দায়িত্ব সে-ই গ্রহণ করেছিল। যে সময় আমাদের সমবেত নেতৃত্ব আপনাকে যুবলীগ হতে বিচ্ছিন্ন করতেছিল। সেই সময় একমাত্র বন্ধু ইমাদুল্যার মুখে কথা ছিল "ছমির মিঞা, অলি আহাদকে হারালে যুবলীগ প্রাণ হারাবে"। ঢাকায় সে-ই নিজকে জাহির করার দলের মধ্যে তার মুখে '৫২ সালে বাস্তবমুখী চিন্তার প্রকাশ দেখে সত্যই সেই দিন হতে তাকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতাম। '৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে মাতব্বরদের দরবারে যখন অপবাদ পেলাম তখন ইমাদুল্যাকে সহই অলি আহাদের গ্রুপের লোক বলে গালি সমান ভাবে গ্রহণ করতে পেরেছিলাম। যাক এগুলি কথা খুব পুরাতন হয়েছে। অসার বলে প্রতিপন্নও হয়েছে অনেক কাজ ও কথা। অপরপক্ষে আপনে আজ সম্মানজনক স্থানে প্রতিষ্ঠিত। আপনাকে তার জন্য অভিনন্দন জানাই।

আপনেই ইমাদুল্যার প্রথম বন্ধু ও পথ প্রদর্শক নতুন যাত্রা পথের। ইমাদুল্যার পরিবারের ঠিকানা আমার ভুল হয়ে গেছে। আপনার মারফতে তার শোকাকুল পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। আপনাদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ইমাদুল্যা স্মৃতি রক্ষা কমিটি গঠনের জন্য অভিনন্দনসহ কমিটির সাফল্যতা কামনা করছি। ইতি−

আঃ ছমির উদ্দিন আহমদ

−নিরাপত্তা বন্দী বগুড়া জেল।

বইটি সম্পর্কে ইংরেজী সাপ্তাহিক ‘হলিডে’র মন্তব্য

ধীরে অথচ নিশ্চিত প্রত্যয়ে আত্মজীবনীমূলক লেখাগুলো আমাদের তমসাচ্ছন্ন রাজনৈতিক স্মৃতির আকাশ আলোকিত করে তুলেছে। .... এই সমস্ত আত্মজীবনী শুধুমাত্র অতীতকে জানার রসদই জোগায় না বরং আমাদের রাজনৈতিক আত্মার উৎসকে বিশ্লেষিত করে। অলি আহাদ যে কোন হিসেবেই আমাদের কালের অন্যতম বিতর্কিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং বিতর্কমূলক রাজনৈতিক বক্তব্যের জনক প্রকৃতপক্ষে একজন নির্ভেজাল দলীয় রাজনীতিবিদের পরিচয়কে ছাপিয়ে সামরিক শাসন বিরোধী তাঁর আপোষহীন ভূমিকা ও সমালোচনা তাঁকে স্বনামধন্য করেছে।
যদি কোন কিছু তাঁর ব্যক্তিত্বকে গৌরবোজ্জ্বল করে থাকে তা হচ্ছে তাঁর সদা সাহসী স্পষ্টবাদিতা।
যাঁরা সমস্ত প্রলোভনকে জয় করে স্বীয় বিশ্বাসে নিবেদিত তা ভুলে বা নির্ভুল যাই হোক না কেন, আজকের দিনে নিশ্চিতভাবেই সেই চরিত্রের লোকের সংখ্যা বিরল।
সহজ, সরল, স্পষ্টবাদী অথচ খুবই ঝাঁঝালো স্বরগ্রামে বাঁধা ৫৭৫ পৃষ্ঠার এই বই একটি চলন্তিকা যেন। এ স্মৃতিচারণায় মোলায়েমভাবে কথা বলার বাসনা অলি আহাদের নেই। তা তিনি করেনও নি। .... তাঁর দৃষ্টিকোণ হচ্ছে একজন একগুঁয়ে ব্যক্তির, যিনি লোকে কি বলবে বা ভাববে তার তোয়াক্কা করেন না। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, যখন ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে দ্বিচারণই সার্বজনীন, তখন অলি আহাদের ক্রুদ্ধ ও সত্যনিষ্ঠ আওয়াজ বহুলাংশে প্রেরণাদায়ক। .... এমনকি তাঁর মতামতসমূহও মৌলিক। এবং যেহেতু তিনি তাঁর অতীতের কোন কাজকে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রমাণ বা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেননি, সেগুলো “সত্য” বলে সপ্রমাণিত এবং এজন্য সেগুলো মূল্যবান।
বহু স্মৃতিকথা ও অভিমতের সমন্বয়ে অলঙ্কার বিবর্জিত এই বইটি একটি প্রধান ঐতিহাসিক দলিল। কারণ এটি আমাদেরকে বাংলাদেশের এমন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের .... পটভূমি বুঝতে সাহায্য করে যিনি তাঁর রাজনৈতিক সততা ও দুর্নীতিমুক্ত চরিত্রের জন্য সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন, যদিও কারো কারো কাছ থেকে এসেছে ঈর্ষামিশ্রিত শ্রদ্ধা।

‘হলিডে’র পুরো মন্তব্য অত্র গ্রন্থের ভূমিকার পরে দেওয়া হইয়াছে।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা